বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

(Institutional Trend of Oriental Painting in Bengal)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মলয় বালা
পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের ফেলো
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৪
শিক্ষাবর্ষ ২০০৯-১০
প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার
অধ্যাপক
প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

(Institutional Trend of Oriental Painting in Bengal)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

মলয় বালা

প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা* [Institutional Trend of Oriental Painting in Bengal] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণা। এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

তারিখ :

(মলয় বালা)
পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের ফেলো
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৪
শিক্ষাবর্ষ ২০০৯–১০
প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের গবেষক জনাব মলয় বালা (পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৪, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯–১০, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢা.বি.) কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা* [Institutional Trend of Oriental Painting in Bengal] শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোনো যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়। গবেষণাকর্মটি গবেষকের স্বকীয় এবং মৌলিক গবেষণাকর্ম।

এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত গভীরভাবে পাঠ করেছি এবং মৌলিকত্ব বিচার করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

(অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার)
প্রাচ্যকলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা [Institutional Trend of Oriental Painting in Bengal] বিষয়ক গবেষণাকর্মের অভিসন্দর্ভ পূর্ণাঙ্গরূপে রচনা ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের সহযোগিতা আত্মার আত্মীয়তারূপে চিত্তে গ্রহণ করেছি। প্রথমেই আমি স্মরণ করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার মহোদয়কে। তাঁর তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার বলেই আমার মতো আনাড়ির হাতে এ কর্মটি সম্ভব হয়েছে। তাঁর একান্ত সান্নিধ্য ও ব্যক্তিত্বের দ্যূতিতে আমার পরিকল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছে বারবার। তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়ে এই গবেষণাকর্মের একেকটি দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, নির্দেশনা ও গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধান করেছেন—কখনো ছাত্র হিসেবে, কখনো সহকর্মী হিসেবে, কখনো স্নেহাস্পদ ভাই বা শিষ্য হিসেবে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞ (চিত্রকলা ও তাত্ত্বিক লেখালেখিতে) এই গবেষণাকর্মের উৎসাহ হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মের প্রথম পর্যায়ে Synopsis (গবেষণা প্রস্তাব) তৈরিতে সাহায্য করেছেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক। গবেষণার পদ্ধতিগত শিক্ষা Methodology বিষয়ে সর্বাধিক সাহায্য করেছেন এবং কাজের অগ্রগতি নিয়ে নিরন্তর তাগাদা দিয়েছেন, সকল বিষয়ে শুভ পরামর্শ দিয়েছেন ভাস্কর্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুকুল কুমার বাড়ৈ। এ দুজনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আক্তারুজ্জামান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক লালা রুখ সেলিমের কাছে নানা প্রসঙ্গে সহযোগিতা পেয়েছি। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সেমিনার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ ও সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নানান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পকলা ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন ও মৃৎশিল্প বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ (চঞ্চল)। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণাকর্মে ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত ও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক নাসরীন বেগম। প্রয়াত শিল্পী শওকাতুজ্জামানের তথ্য-উপাত্ত দিয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান এবং শওকাতুজ্জামানের ছোটো ভাই শহীদুজ্জামান শিল্পী। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া রফিক আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের

শিক্ষক ও ছাত্র-শিল্পীবৃন্দ, যাঁরা সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মে যিনি গভীরভাবে সঙ্গ দিয়েছেন তিনি *The Daily Star* পত্রিকার সংস্কৃতিবিষয়ক সাংবাদিক বন্ধুবর জাহাঙ্গীর আলম। তিনি আমার এই গবেষণাসংশ্লিষ্ট ইংরেজি গ্রন্থ তর্জমা করতে সাহায্য করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ডিন অফিসের সেকশন অফিসার আলম ফারুকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ আমার অনুরোধে তিনিই চারুকলা অনুষদের পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের ফাইলগুলো প্রস্তুত করায় অনুষদে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম চালু হয়, যার প্রথম ফেলো আমি। ভারত থেকে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বই ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সরকার (বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ফেলো)। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন তক্ষশীলা, বিদিত ও মধ্যমা প্রকাশন সংস্থা। আমি উল্লেখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি যাঁদের সাহায্যে রূপায়ণ হয়েছে তাঁদের মধ্যে চারুকলা অনুষদের উপগ্রন্থাগারিক জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভুঁইয়া, ডিন অফিসের হামিদা, প্রদীপ; পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের মজুমদার বিপ্লব, দৈনিক কালের কণ্ঠের সাংবাদিক আবীর নজরুল অন্যতম। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। গোপাল, অমিত, আরিফ, সুমন, রিয়াজ প্রয়োজনীয় ফটোগ্রাফ করে দিয়ে এবং যখন যা বলেছি করে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারের (চারুকলা অনুষদ লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার) সাহায্য নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে যাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁদের একজন আমার সহকর্মী গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী। তাঁর বিশাল ব্যক্তিগত লাইব্রেরির নানান বই ও তাঁর সাহায্য না পেলে এ কাজ সম্ভব হতো না। বাকি দুজন আমার একান্ত আপন—আমার স্ত্রী লতা সমাদ্দার ও কন্যা শেওলা ব্রততী আত্মজা। তাদের সাথে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক নয়। কারণ লতাকে যতটা বঞ্চিত করেছি ততটা তার ভালোবাসার শক্তি দিয়ে সে বঞ্চনা অতিক্রম করেছে। তার সার্বিক সহযোগিতায় এই অভিসন্দর্ভ জন্ম নিয়েছে। তবে আমার কন্যা—যে গবেষণাকর্মের সাথে বেড়ে উঠেছে। গবেষণার যত্ন নিতে গিয়ে তার যত্ন নিতে পারিনি ইচ্ছানুযায়ী। পড়ার টেবিলে মুখ উঁচিয়ে অনুচ্চারিত ভঙ্গিতে যে আবদার জানাত, তার সবটা পূরণ করতে পারিনি। তার প্রতি আমার অসীম স্নেহ ও ভালোবাসা।

মলয় বালা

অ্যাবস্ট্রাক্ট (সারসংক্ষেপ)

বৃহৎ বঙ্গের অতীত শিল্প-ঐতিহ্য সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী সময়ে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতান ও মোগল এবং কিছুটা ইউরোপীয় শিল্পকলার বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতিই বাংলার শিল্পকলার উত্তরাধিকার। এই সুদীর্ঘ সময়ের চিত্রকলায় একই সুরের ঐকতান লক্ষণীয়। যে সুরটিতে মিশ্রিত হয়েছে বৃহৎ প্রাচ্যশিল্পের নানান অনুষঙ্গ। যা দুটি ধারায় বিকশিত হয়েছে—একটি শাসকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় *দরবারি চিত্রকলা*, অন্যটি গ্রামীণ জীবনের চাহিদা স্বপ্ন অভিজ্ঞতাপুষ্ট *লোকজ চিত্রকলা*। গুপ্ত সম্রাটগণ বৌদ্ধ ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের গুরুত্ব দিলে বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চার সাথে শুরু হয় চিত্রচর্চা। এই চর্চা আলপনা, পটচিত্র ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও এর প্রাপ্ত নিদর্শন নেই বলেই ধরে নেয়া যায়। চিত্রচর্চার এই ধারাবাহিতার প্রথম নিদর্শন মেলে পাল যুগের তালপাতা পুথিচিত্রে। এরপর সেন, সুলতান, আফগান এবং মোগলদের প্রভাব পড়ে বাংলার চিত্রশিল্পে। মোগলদের সময়ে পশ্চিমা শিল্পীরা ভারতে আসতে থাকলে ভারতের শিল্পজগতে পরিবর্তন আসতে থাকে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনামলে ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা চালু হয়। প্রতিষ্ঠাননির্ভর শিল্পশিক্ষায় পাশ্চাত্য একাডেমিক শিল্পধারার প্রবর্তন হয়। ফলে বাংলার পরম্পরায় শিল্পধারা ক্ষমতার কেন্দ্রের জনসমষ্টির নিকট অবহেলিত ছিল। এ কারণে লোকসমাজে এই ধারা শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে প্রবাহিত হয়।

১৯ শতকের প্রথম দশকে কলকাতা আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় একদল বাঙালি শিল্পী স্বদেশ চেতনায় জাগ্রত হয়ে চিত্রকলার দেশজ সত্তার শিকড় সন্ধানে ব্রতী হন। অধ্যক্ষ ই.বি হ্যাভেলের প্রচেষ্টায়, অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষকতায় কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রাচ্য-পরম্পরায় চিত্রীতির আদর্শগত চিত্রীতির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে এই সময় থেকে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার ধারা শুরু হয় বলা যেতে পারে। যে ধারা পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য নন্দলাল বসুর শিক্ষকতায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের শিল্পশিক্ষায় চর্চা হতে থাকে। এবং তারও অনেককাল পরে (দেশবিভাগের পর) ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রাচ্যকলা বিভাগ (Oriental Art) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই গবেষণায় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উভয় বাংলার (অবিভক্ত বাংলা ও বাংলাদেশ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা কীভাবে অগ্রসর হয়ে আসছে তা সুশৃঙ্খলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এই ধারার পথিকৃৎ শিল্পীগণের কাজে প্রাচ্যচিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও প্রাচ্যচিত্রকলায় তাঁদের অবদান প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া উভয় বাংলার নির্বাচিত শিল্পীদের জীবন ও শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করে প্রাচ্যচিত্রকলার স্বাতন্ত্র্যধর্মী মাধ্যম, টেকনিক ও পাঠ্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে বিভিন্ন পর্বের যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার

সারাৎসার বিন্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ উভয় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারবাহিক ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে এই গবেষণায়।

এই গবেষণার বলা যেতে পারে যে, বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার শুরু থেকে বর্তান অবধি বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা (প্রাচ্যকলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত) চর্চায় শিল্পীরা নানা-পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করে পাশ্চাত্য রীতির চিত্রকলার সমান্তরালে স্বতন্ত্র একটি দর্শন ও দৃষ্টিনন্দন শৈলী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, প্রাচ্যরীতির স্বাতন্ত্র্যধর্মী মাধ্যম (জলরং ওয়াশ, টেম্পারা, ফ্রেসকো) এবং বিষয় (ক্যালিগ্রাফি, পাণ্ডুলিপি চিত্রণ) বিশ্বশিল্পকলার প্রেক্ষাপটে নিজস্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাচ্যের শিকড়-সন্ধানী অভিপ্রায়ে প্রাচ্যশিল্পের মূল লক্ষণ প্রাচ্যের (ভারতীয় ও চায়নিজ) 'ষড়ং' ব্যবহার করে পাশ্চাত্যের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চার মূলনীতিকে অন্ধ অনুকরণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। বিশেষত বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় এই ধারার শিল্পীরা স্বদেশি চেতনাসমৃদ্ধ এক নতুন আন্দোলন গড়তে সমর্থ হয়েছেন।

এ ছাড়া প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা ষড়ংকে (প্রধানত ভারতীয়, চৈনিক ও পারস্য ধারা) কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, বিষয় ও আঙ্গিকে, নিজেদের সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে আসছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পকলার প্রাচ্য-ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সৃজনশীলতা ধারা অব্যাহত রেখেছেন। যদিও বর্তমান সময়ের চারুকলায় স্থানিক ও বৈশ্বিক শিল্পধারায় সময়সঞ্জাত আধুনিকতা মিলেমিশে একাকার হয়ে এক নতুন শিল্পধারা জন্ম দিয়েছে। তার পরও একথা বলা যেতে পারে যে, প্রাচ্যচিত্রকলার এই ধারা তা তার স্বাতন্ত্র্য শৈলীর জন্যই ভবিষ্যৎ শিল্পকলার নিজস্ব স্থান বজায় রেখে সগৌরবে বিকশিত হতে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র	i
প্রত্যয়নপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii-iv
সারসংক্ষেপ	v-vi
ভূমিকা	১-৭

প্রথম অধ্যায়
অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

		পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	: অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট	৮-২২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩-৭৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: নন্দলাল বসু	৮০-১৫৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: অন্যান্য শিল্পী	১৫৯-২০২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা	২০৩-২১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

		পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	: বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট	২১৫-২২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: আব্দুস সাত্তার	২২১-২৭৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: রফিক আহমেদ	২৭৫-২৯১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: শওকাতুজ্জামান	২৯২-৩১১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: নাসরীন বেগম	৩১২-৩৫৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	: অন্যান্য শিল্পী	৩৫৯-৪৬৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ	: প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা	৪৭৯-৪৯৬

উপসংহার	৪৯৭-৫০৪
গ্রন্থপঞ্জি	৫০৫-৫২১
চিত্রসূচি	৫২২-৫৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিশ্বশিল্পকলার বর্ণাঢ্য সমারোহের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্যশিল্প একটি উল্লেখযোগ্য ধারা; যার রূপগত এবং নান্দনিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। প্রাচ্যশিল্পের মূল প্রেক্ষাপট সুবিশাল ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, কোরিয়া, নেপাল, পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় দেশগুলোর অতীত-ঐতিহ্যের প্রবহমান শিল্পধারা। প্রায় ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে প্রবহমান শিল্পধারা ভারতবর্ষে নানাভাবে মোড় নিয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছিল ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার ঐতিহ্য। উনিশ শতকের শেষ দশকে ঠাকুর পরিবারের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে *বৈষ্ণব পদাবলী* অবলম্বনে ‘কৃষ্ণলীলা’ সিরিজ চিত্র এঁকেছিলেন জলরঙে বিশেষ পদ্ধতিতে। এই সিরিজের শিল্পরীতির মাধ্যমে তিনি ভারতীয় চিত্রকলাকে প্রাচ্যমুখী করে তোলা এবং তার ভিত্তিতে স্বকীয় চরিত্রে সেই চিত্রকলার নানামুখী বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে ই.বি হ্যাভেল কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে আসার পরে অবনীন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৫ সালে। দুজনের একমুখী চিন্তাভাবনায়, চেষ্টায় ও পরস্পরের সহযোগিতায় ভারতীয় রূপকলার চর্চা প্রাচ্যধারায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা থেকে শিল্পকে মুক্ত করার জন্য চিত্রে বিশুদ্ধ ভারতীয়তার চর্চা করেছেন। একদিকে চীন-জাপানের চিত্রশৈলী, অন্যদিকে অজন্তা ও মোগল ভারতের চিত্রশৈলী আর কিছুটা হলেও পশ্চিমের একাডেমিক জলরঙের ব্যাকরণ মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নতুন চিত্রশৈলী গড়ে তুলেছিলেন। শিল্পতাত্ত্বিকেরা এই শৈলীকে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি বলে অভিহিত করেছেন। এই নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি প্রাচ্যশিল্পের নির্যাস ও মূলনীতিকে আশ্রয় করে পুষ্ট হয়েছে। সুতরাং এই শৈলীর ব্যপ্তি শুধু নব্য-বঙ্গীয় বা নব্য-ভারতীয় বলে প্রচার হলেও একে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার গোড়াপত্তন বলা যায়।

হ্যাভেল কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে ইন্ড্রাস্টিয়াল আর্ট বা কারুশিল্প এবং ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প বিভাগে ভাগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য কারুশিল্প বিভাগে নকশা ও প্রাচ্যশিল্প (Oriental Art) শেখানো। এরপর অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন ১৯১৬ ভাগ করেন ফাইন আর্ট ও ইন্ডিয়ান পেইন্টিং নামে। ইন্ডিয়ান পেইন্টিং নাম হলেও এই বিভাগের শিক্ষাব্যবস্থায় বৃহৎ প্রাচ্য-ঐতিহ্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে আসছে। এ ছাড়া কলকাতায় ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট’-এর নিজস্ব শিল্পশিক্ষায় ও রবীন্দ্রনাথের ‘বিচিত্রা স্টুডিয়ো’তে নব্য-বেঙ্গল স্কুলে অবনীন্দ্র শিষ্য ও অনুসারীরা প্রাচ্যচিত্রকলার চর্চা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলাল বসু বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারাকে বিচিত্র খাতে সমৃদ্ধ করেছেন।

দেশবিভাগের পর ১৯৫৫ সালে ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রাচ্যকলা বিভাগ (Oriental Art) চালু হয়। ১৯৮৪ সালে রাজশাহী

Dhaka University Institutional Repository

চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে (বর্তমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ) ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের আদলে প্রাচ্যকলা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়ে আসছে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারুকলার কলেজগুলোতে প্রাচ্যকলা বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। বাংলাদেশে এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা মূলত নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির ফলপ্রসূ রূপ। নামে প্রাচ্যকলা বা ওরিয়েন্টাল আর্ট হলেও এই বিষয়ের চর্চা কেবল চিত্রকলা।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক এই প্রাচ্যধারার চিত্ররীতি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রবহমান। ভৌগোলিক অবস্থান, সময় ও চিন্তাচেতনার পার্থক্যের কারণে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যপ্তি, অবদান ও সৃষ্টির মধ্যে নানান বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বাংলার এই প্রাচ্যচিত্রকলার বিকাশ, বিস্তার ও অবক্ষয় সম্পর্কে কিছু গবেষণা পরিচালিত হলেও ১৯৪৭-উত্তর বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা (Oriental Art) চর্চার ইতিহাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। ঢাকার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান অবধি এই ধারার শিল্পী ও তাঁদের রচিত শিল্পকর্ম সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। আর সে কারণেই বাংলায় প্রাচ্যশিল্প চর্চার একটি বিস্তারিত ইতিহাস উপস্থাপনের লক্ষ্যে *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা* (Institutional trend of Oriental Painting in Bengal) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চায় প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার অবদান এবং বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চায় প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা পঠন-পাঠনের সুদীর্ঘ ৫৭ বছরের (১৯৫৫–২০১২) অবদান যৌক্তিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া উভয় বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চিত্রকলায় স্বাতন্ত্র্যত এবং বাংলাদেশের শিল্পকলায় ও বিশ্বশিল্পকলার প্রেক্ষাপটে এ ধারার চিত্রকলার অবদান তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে এবং যথাযথ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে—

তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ : গবেষক নিজেই একজন প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পী। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতিতে এই অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার শিল্পীগণের চিত্রকলা, সাক্ষাৎকার, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, ব্রুশিয়ার প্রভৃতি প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সাথে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাননির্ভর সংগঠন ও কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত এই গবেষণার প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে গণ্য করে তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রাথমিক ও পরোক্ষ উৎস : উভয় বাংলার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সংগ্রহমালার ফিল্ড স্টাডি, সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য; বিভিন্ন গ্যালারি, সংগ্রহশালা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহের চিত্রকর্ম প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিষয়সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতবর্গের সাথে আলোচনা, পরামর্শ, উপদেশ প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিল্পী ও শিল্পকর্মের আলোচনা, সমালোচনা, বিবরণ, বিভিন্ন প্রদর্শনীর ক্যাটালগ ও সুভ্যেনিয়র, প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও আলোকচিত্র পরোক্ষ বা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এসব তথ্য-উপাত্তের গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে জগমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত *গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা* গ্রন্থের নিয়ম-নীতি অধিক পরিমাণে অনুসৃত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের বানানরীতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসৃত করার চেষ্টা হয়েছে। তবে পাদটীকা, গ্রন্থপঞ্জি এবং ক্যাটালগে ব্যবহৃত বানান অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে।

শিল্পী নির্বাচন : অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার জনক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি নন্দলাল বসুসহ এই ধারার প্রধান শিল্পীদের উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রেও এই রীতি অনুসারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের নির্বাচন করা হয়েছে।

আলোকচিত্র : যেহেতু চিত্রকলাবিষয়ক প্রসঙ্গ এবং চিত্রকলা নিজেই এক পরিপূর্ণ ভাষা সেহেতু আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট চিত্রাবলির পর্যাপ্ত আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এসব আলোকচিত্র শিল্পীদের মূল কাজের ফটোগ্রাফ থেকে এবং যেসব চিত্রের মূল কাজের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি সেসব চিত্র ইন্টারনেট এবং প্রকাশিত গ্রন্থের আলোকচিত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণাটি পরিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেয়া হয়েছে। এই ভাগ দুটি দুটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায় : অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা, দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা। উভয় অধ্যায়ই কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার চিত্রকলার আদি প্রাপ্ত নিদর্শন পাল যুগের চিত্রকলা। কিন্তু পাল যুগের চিত্রবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে অনুমান করা যায়, এ দেশের চিত্র-ঐতিহ্য অনেক পুরনো। এবং নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারায় পুরনো ঐতিহ্যবাহী পরম্পরায় প্রাচ্যদেশীয় শিল্পশৈলীকে পুনরাবিষ্কার এবং গ্রহণ-বর্জন ও সংশোধন করে চিত্রচর্চা করেছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সে বিষয়গুলোই বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্তক এবং বাংলায় প্রাচ্যচিত্রকলার মর্ম প্রতিস্থাপনের প্রথম স্মরণীয় শিল্পী ও পথদ্রষ্টা। তাঁর জীবন-ইতিহাসের মধ্যেই প্রাচ্যচিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের প্রথম পর্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে প্রাচ্যশিল্পের পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় কীভাবে নিজস্ব চিত্ররীতির চরিত্রদান; তাঁর ছাত্রদের কীভাবে যোগ্য উত্তরসাধক; সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে নব-প্রবর্তিত শিল্পীধারাকে কীভাবে সে সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক ভারতীয় শৈলীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবনে সাহিত্য ও চিত্রকলার নানা সৃজনশীল বাক পরিবর্তন বাংলার প্রাচ্যশিল্প চর্চায় যে অবদান রেখেছে এবং একজন

Dhaka University Institutional Repository

নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে একজন স্বার্থক শিল্পশিক্ষক হিসেবে, একজন শিল্পগুরু হিসেবে সর্বোপরি তাঁর শিল্পসাধনার কল্যাণে অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় যে পথ তৈরি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ্য উত্তরসাধক শিল্পী নন্দলাল বসুর হাত ধরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সুতরাং অবিভক্ত বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ নন্দলাল বসুকে কেন্দ্র করে। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিল্পশিক্ষায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রতিভায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় নন্দলাল বহুমুখী চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব, এই পরিচ্ছেদে নন্দলাল বসুর ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস কালক্রমে অনুসারে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনে হাল ধরার পর শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় তাঁর অবদান প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি কীভাবে বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি, ধাঁচ, টেকনিক অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করেছেন; কীভাবে নব্য-বঙ্গীয় রীতির সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে উত্তরণ করেছেন; কীভাবে অসংখ্য শিল্পী-শিষ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন; কীভাবে তাঁর নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক লেখা ও উপদেশ বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার নন্দনতাত্ত্বিক ভিত গঠন করেছে প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার অন্যান্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম ও অবদান বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিক্ষিত শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত সাতজন শিল্পীর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রাচ্যচিত্রকলায় তাঁদের অবদান তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্বের নির্বাচিত শিল্পীরা হলেন অসিতকুমার হালদার (১৮৯০–১৯৬৪), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫–১৯০৯), সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৭–১৯৬৪), শৈলেন্দ্রনাথ দে (১৮৯১–১৯৭২), ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯০–১৯৭৫), সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯২–১৯৭০) ও বীরেশ্বর সেন (১৮৯৭–১৯৭৪)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে অবিভক্ত বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা নিয়ে। অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয় ১৮৫৪ সালে কলকাতায় ‘স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যার পরিবর্তিত রূপ ‘কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল’। এই স্কুলে ই.বি হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বিশ শতকের প্রথম দশকে প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চায় প্রাচ্যচিত্রকলার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। যে ধারা চলমান অভিসন্দর্ভের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির ধারা। এই ধারায় ফলপ্রসূ বিস্তার ঘটেছে শান্তি-নিকেতন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অতএব অবিভক্ত বাংলায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ, শিল্পীদের কজের ধরন, উত্থান-পতন, পাঠ্যক্রম ও এই ধারার পৃষ্ঠপোষক সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অবদান মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারার দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে, *বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা*। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। যেখানে দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যচিত্রকলা ঘরানা সৃষ্টির প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস ও এর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকদের মধ্যে আব্দুস সাত্তার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা বাংলাদেশের সকল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকতা করছেন। অতএব অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিল্পগুরু যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনি বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিক্ষার প্রধান পুরুষ আব্দুস সাত্তার। বহু মাধ্যমে কুশলী এই শিল্পী প্রাচ্যচিত্রকলায় নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ দেখিয়েছেন। যে পথ ধরে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলাকে আধুনিকতায় উন্নীত করেছেন। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিল্পী আব্দুস সাত্তারের অবদান মূল্যায়ন করার জন্য এই পরিচ্ছেদে তাঁর ধারাবাহিক জীবনইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। যে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পীজীবন, শিক্ষাজীবন, শিল্পকর্ম ও প্রাচ্যচিত্রকলায় তাঁর অবদান খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া একজন শিল্পসমালোচক, প্রাবন্ধিক, নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে গড়ে ওঠার বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। এই পরিচ্ছেদে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের সিরিজচিত্র আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে বহু মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উত্তরণের দিকগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাঁকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প-আলোচকের মন্তব্য তুলে ধরে তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে শিল্পী রফিক আহমেদ, শিল্পী শওকাতুজ্জামান ও শিল্পী নাসরীন বেগমের শিল্পকর্ম, শিল্পদর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পী হিসেবে তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে। কারণ শিল্পী আব্দুস সাত্তারের পর এই তিন শিল্পী তাঁদের জীবন ও কর্মের মধ্যে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে শিল্পী শওকাতুজ্জামান ও শিল্পী নাসরীন বেগম আব্দুস সাত্তারের সুযোগ্য উত্তরসূরি। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার শিক্ষক হিসেবে এই দুই শিল্পীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন শিল্পীর কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প-আলোচকের মতামত প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার নির্বাচিত শিল্পীদের সার্বিক মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে অন্যান্য শিল্পীদের তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে সেই সকল শিল্পীর ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে যাঁরা বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার প্রতিষ্ঠালগ্নে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলায় শিক্ষিত নির্বাচিত বিশজন শিল্পীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় ভাগে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলায় শিক্ষিত না হয়েও যে সকল শিল্পীদের কাজে প্রাচ্যরীতির নানান অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায় তার সচিত্র বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি এই

Dhaka University Institutional Repository

তিন স্তরের নির্বাচিত শিল্পীদের কাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে ঢাকা আর্ট স্কুলে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যচিত্রকলা—প্রাচ্যকলা (Oriental Art) নামে চর্চা শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সালে থেকে। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠাননির্ভর এই শিল্পধারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট কলেজের মধ্যে ব্যপ্তি লাভ করেছে। এই পরিচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ, পাঠ্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে প্রতিষ্ঠাননির্ভর সংগঠন এবং প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার প্রদর্শনীগুলোর বিবরণ। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় Oriental Art বা প্রাচ্যকলা বিভাগে মিনিয়েচার, ওয়াশ, গোয়াশ, টেম্পারা, মুরাল টেকনিকের কাজ; ক্যালিগ্রাফি, পাণ্ডুলিপি চিত্রণের মতো স্বাতন্ত্যধর্মী বিষয় ও মাধ্যমের কাজ প্রসঙ্গেও আলোকপাত করা হয়েছে। যা পশ্চাত্যধর্মী বিষয়, মাধ্যম ও টেকনিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ধারাবাহিক এই আলোচনায় প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় সুদীর্ঘ ৫৭ বৎসরের (১৯৫৫–২০১২) চিত্রচর্চার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহারে গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় চারুকলার অন্যান্য মাধ্যমের মতো বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার একটি ধারাবাহিক বিন্যাস, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চায় প্রাচ্যকলা বিভাগের সুদীর্ঘ ৫৭ বছরের (১৯৫৫–২০১২) অবদান এবং প্রাচ্যশিল্প বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য বহন করে কি-না ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচনাসংশ্লিষ্ট চিত্রবলির আলোকচিত্র পাঠ-মধ্যবর্তী স্থানে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে প্রবন্ধপাঠের মধ্যবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট চিত্রমালার ভাব-আবেদন চোখের সামনে থাকে। চিত্রমালার পর্যাপ্ত আলোকচিত্র ব্যবহার করার কারণে কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, আব্দুস সাত্তার, শওকাতুজ্জামান, নাসরীন বেগম এই পাঁচ শিল্পীর জীবন-ইতিহাসের ও কর্মের সাথে উভয় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সুতরাং তাঁদের জীবন-ইতিহাসের সূত্র ধরে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার নানা বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, দেশভাগের আগে ও পরে দুই বাংলাতেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চারত শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহাসিক শেকড় সন্ধানের পাশাপাশি তাঁদের নিজস্ব অস্তিত্ব খোঁজার তাগিদ অনুভব করেছেন। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীগণের অধিকাংশই এখনো কর্মরত, সৃষ্টিশীল এবং তরুণ প্রজন্ম। অর্থাৎ সমকালীন শিল্পী। দেখা গেছে, ১৯৫৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হলেও স্বাধীনতার ১৯৭১ পূর্ব পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী শিল্পচর্চায় যুক্ত থেকেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এর ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে এবং বলা যায় বিশ শতকের ৯০-এর দশক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যুক্ত হয়েছে। একুশ শতকের প্রথম দশকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক মৌলিক তথ্য ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে শিল্পীর দর্শন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন লেখক ও

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকের তত্ত্বগত ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের এই শিল্পীদের কাজে প্রাচ্য-ঐতিহ্যের করণ-কৌশলের সাথে পাশ্চাত্য করণ-কৌশল মেলাবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এঁদের কাজে ধ্রুপদী রীতির নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রোমান্টিক অভিব্যক্তি, লোকায়ত দৃষ্টি, মরমি দার্শনিকতা, সমসাময়িক বাস্তবতা প্রভৃতি বিষয় লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে বড়ো যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাঁদের প্রত্যেকের কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যতা, বিষয় চিন্তনে স্বতন্ত্রতা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রবণতা আছে। যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ বাংলাদেশের শিল্প-শিক্ষার্থীদের তত্ত্বগত, শৈলীগত ও উপকরণগত বিষয়কে প্রণিধান করার জন্য বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাঁদের শিল্পচর্চায় উৎকর্ষ লাভ করতে বিশেষ সহায়ক হবে। এ ছাড়া পরবর্তী গবেষক, শিল্পসমালোচক এবং প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গের প্রেরণার জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রথম অধ্যায়

অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট

শিল্পকর্ম চর্চা মানুষের চাহিদার মৌলিক পরিশীলিত অবস্থানগুলোর অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে, বলতে গেলে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক সময়ে ভিম-ভেটকার গুহাগাত্রে বিচিত্র কর্মরত নারী থেকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো বিভিন্ন শিল্পকর্ম হয়ে বৈদিক যোগাশ্রয়ী জনমানসের চিত্রিত যজ্ঞবেদী থেকে মৌর্য যুগের ভারতভূমে শিল্পকলার বিস্ময়কর জাগরণ—সুঙ্গ গুপ্ত হয়ে পাল পর্যন্ত শিল্পের যে অভিযাত্রা, তার একটি মহান ঐতিহ্যের প্রধানতম অনুষঙ্গ বাংলা অঞ্চলের শিল্পকলা। এ ছাড়া এর সাথে যুক্ত হয়েছে সুলতানি ও মোগল দরবারি শৈলীর প্রভাব, যাতে পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শৈলীরও কিছুটা সম্মিলন ঘটে।

চলমান গবেষণার মূল লক্ষ্য বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা অর্থাৎ বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা। কিন্তু বাংলায় প্রতিষ্ঠাননির্ভর চিত্রকলা এবং প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার শুরুর পূর্বে যে প্রেক্ষাপটে শিল্পচর্চা চর্চিত হয়ে আসছিল, তারই ধারাবাহিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চা শুরু হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে। যার মূল সুর ছিল প্রাচ্য-ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ। এখানেই ঐতিহ্য বলতে কী বুঝি তা বুঝে নেয়া দরকার।

ঐতিহ্য হলো পরম্পরাগত বা পুরুষানুক্রমিক ধারা।[১] মুকুল কুমার বাড়ৈ[২] এর মতে, ঐতিহ্য হলো গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে কালের আবর্তনে বিবর্তিত প্রাচীনতর শৈলীসমূহের সাম্প্রতিক অবস্থা। যাকে স্থানিক আদিম অভিব্যক্তি, লোক-পরম্পরা সঞ্জীবিত করে।[৩] উল্লিখিত পরম্পরাগত বা পুরুষানুক্রমিক ধারার আলোকে বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে। এ ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী সময়ে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতান, মোগল, ইংরেজ শাসনামলের শিল্পকলায় যে বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটে, সেটাই বাংলার চিত্রকলার প্রকৃত উত্তরাধিকার তথা ঐতিহ্য। এবার পরিষ্কার হওয়া দরকার, অবিভক্ত বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমা কতটুকু; যা এ প্রবন্ধের আওতায় পড়ে। সেক্ষেত্রে বাংলাভাষী অর্থে বাংলা অঞ্চল নির্দিষ্ট করা যায়। এজন্য প্রথমে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল ও ওই কালে বাংলাভাষী মানুষের বসবাসরত ভৌগোলিক সীমারেখা চিহ্নিত করার প্রয়োজন পড়ে।

বঙ্গদেশে আর্যরা এসেছিলেন খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আর্যরা বঙ্গদেশে আসার প্রায় ১৫০০ বছর পরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় বলে অনুমান করা যায়।[৪] অর্থাৎ আর্যদের ভাষা নানা রকমের পরিবর্তনের[৫] মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা যে রূপ পেয়েছে, তা হাজার বছরের আগে নয়। কিন্তু ভাষা বিচারের বাইরের হিসাব অনুযায়ী অখণ্ড বাংলার অঞ্চলগুলো কতগুলো নামে পরিচিত ছিল। সেই নামগুলো হচ্ছে—অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, বরেন্দ্র, গৌড়, পুণ্ড্র প্রভৃতি। এই অঞ্চলগুলোকে অবিভক্ত বাংলায় আবদ্ধ করতে মোটামুটি একটা হিসাব দেয়া যায়। যে হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমে বিহার, পূর্বে ত্রিপুরা ও বার্মা, উত্তরে আসাম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকে চিহ্নিত করা যায়। বাংলার এই ভৌগোলিক পরিসীমা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল অনেককাল

Dhaka University Institutional Repository

পরে ইংরেজ কর্তৃক ১৯৪৭ সালে, যা বর্তমানে পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা, যা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত।

এই নিবন্ধে ১৯৪৭-পূর্ব বাংলা অর্থাৎ অবিভক্ত বৃহৎ বঙ্গের চিত্রকলা চর্চার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, বৃহৎ বঙ্গ তৎকালীন ভারতবর্ষেরই একটি অংশ। সুতরাং বঙ্গের বা বাংলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটের সূত্র খুঁজতে সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্রকলার নানা অনুষঙ্গ একত্রীকরণের প্রয়োজন পড়ে। কারণ ভৌগোলিক সীমারেখা ঐতিহ্যকে সীমায়িত করে রাখে না; যা আত্তীকৃত হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যশিল্পের নানান প্রভাবজনিত কারণে। আর এর প্রধান কারণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন হয়েছে বহু কালে। এখানে আর্য, মোগল, পাঠান, তুর্কি, আরবীয়, পর্তুগিজ, ইংরেজদের আগমন ঘটেছে ব্যবসা-বাণিজ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে এবং তারা শাসন করেছে বিভিন্ন সময়ে।

'খ্রিস্টপূর্বকাল থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে ভারতীয় বাণিজ্যপোত পণ্যবহন করে নিয়েছে, সৃষ্টি করেছে ভারতের সাংস্কৃতিক উপনিবেশ।'[৬] ফলে ভারতীয় চিত্রকলার সাথে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন চিত্রকলার একই সুরের ঐকতান লক্ষ্যণীয়। চিত্রকলার এই সুরটিকে মূলত প্রাচ্যচিত্রকলা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যা দুটি ধারায় ভারতীয় উপমহাদেশে বিকশিত হয়েছে। একটি শাসক-শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় *দরবারি চিত্রকলা*, অন্যটি গ্রামীণ জীবনের চাহিদা, স্বপ্ন আর অভিজ্ঞতাপুষ্ট *লোকজ চিত্রকলা*। এ দুই প্রকার চিত্রকলায় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে চিত্রকলার রূপে বৈচিত্র্য এসেছে এবং বলা যায়, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা প্রাচ্যচিত্রকলার রূপ নিয়ামকের ভূমিকা রেখেছে। এর অন্যতম কারণ রাজ্য ও সাম্রাজ্যের বহু পরিবর্তন। রাজ্য শাসক যে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, চিত্রকলা সে আদর্শেই রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা চিত্রকলাকে প্রভাবিত করলেও শিল্পীরা নিজের সামগ্রিক সত্তা দিয়ে, স্বভাব দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ ও আনন্দকে খুঁজেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে।

সূত্র অনুসারে প্রাচ্যচিত্রকলার চরিত্র সম্পর্কে বলতে গেলে ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতার মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে প্রাচীন। এরপর আর্য আগমনে বৈদিক ও মহাকাব্যিক কালে শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ ব্যতীত বাস্তবে কোনো নিদর্শন নেই। এর কারণ হতে পারে আর্দ্র আবহাওয়া এবং যে মাধ্যমে তাঁরা চিত্রচর্চা কারেছেন তাঁর ক্ষণস্থায়িত্বতা।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থের কাহিনি থেকে অনুমান করা যায়, খ্রিস্টপূর্বকালে উত্তরবঙ্গে সমৃদ্ধ নগরী পুণ্ড্রবর্ধনে চিত্রকর্মের প্রচলন ছিল।[৭] এ ছাড়া তিন হাজার বছর পূর্বে হরপ্পা সভ্যতার সমগোত্রীয় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেখানে কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে ধূসর সাদা বর্ণের রেখাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

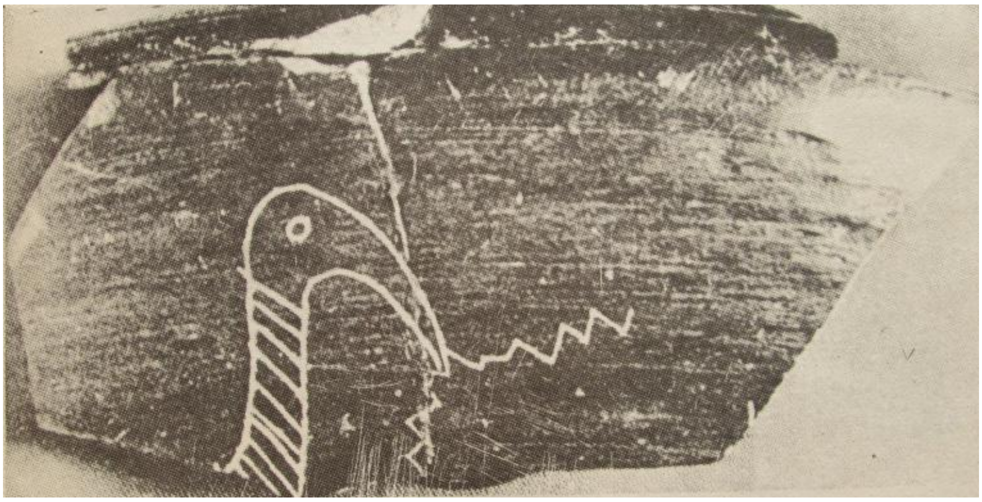

চিত্র ০১ : কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে শ্বেতবর্ণে আঁকা সর্পাহারী ময়ূর, আঃ ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

সিন্ধু সভ্যতা কিংবা বাংলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে মৃৎপাত্রের রেখাচিত্র নয়, প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের প্রমাণ মেলে। কারণ চিত্রকলায় উৎকর্ষ না এলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এমন গড়ন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পাল যুগ-পূর্ব ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের উৎকর্ষই চিত্রকলার অস্তিত্ব অনুমান করা প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসংগত।

চব্বিশ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতু গড়ে বঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্যের নমুনা এবং এখানেই প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, বাসনকোসন, হাতির দাঁতের অলংকার পাওয়া গেছে। চন্দ্রকেতুর মতো বগুড়ার মহাস্থানেও পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে। এই পুরাকীর্তি সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছরের আগেকার।[৯]
এ ছাড়া কুমিল্লার ময়নামতী, পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহারের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শনে বাংলার চিত্রকলা অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে পাল যুগের বিভিন্ন পুথিতে অঙ্কিত চিত্রাবলি উক্ত ধারণার সপক্ষে বাস্তব উদাহরণ। কারণ পোড়ামাটির ফলকে টেরাকোটা মূর্তি। ফলকগুলোতে খোদিত আছে নারী-পুরুষের কর্মরত চিত্র। পাহাড়পুর বিহারের ভিত্তিগাত্রে ৬৩টি পাথরের তৈরি ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, যার সময়কাল ঐতিহাসিকরা গুপ্ত যুগের বলে ধারণা করেছেন।[১০]

ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রকলার প্রথম ও প্রধান নিদর্শন অজন্তা গুহাচিত্র। অর্থাৎ গুপ্ত যুগের গুহাচিত্রগুলোই (দেয়ালচিত্র) প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যের সর্বভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী চিত্রকলার প্রথম নিদর্শন। আর বাংলার চিত্রকলার প্রথম নিদর্শন পাল পুথিচিত্র। পাল রাজারা বরেন্দ্রবাসী; কিন্তু তাঁদের রাজ্য গড়ে উঠেছিল বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে উত্তর প্রদেশেও। তাঁরা দীর্ঘ সাড়ে চারশ (অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত) বছর রাজত্ব করেছেন। তখন ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্রকলা প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

পাল যুগের চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তালপাতার পুথিচিত্র। এই পুথিচিত্রে লেখার পাশাপাশি বুদ্ধের নানা জাতক কাহিনি ও মুদ্রার নানা নামের ছবি; দেব-দেবীর ছবি—বিশেষত নানা নামে তারা চিত্রিত ছিল গ্রন্থের মালিকদের সব রকম আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য।[১১] এই পুথি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। এই চিত্রের শৈলীর সাথে অজন্তার গুহাচিত্রের শৈলীর মিল পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ০২ : পাল যুগের তালপাতার পুথির একটি পাতা

চিত্র ০৩ : বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি
অজন্তা, প্রথম গুহা

চিত্র ০৪ : বোধিসত্ত্ব সমীপে মহাজনক অজন্তা, প্রথম গুহা

ধর্মপাল এবং দেবপালদের সময়কার ধীমান ও তাঁর পুত্র বিটপাল নামে উত্তরবঙ্গের দুজন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা দুজন ভাস্কর্য নির্মাণে, ধাতুমূর্তি গড়নে ও চিত্রকর্মে ছিলেন নিপুণ ও পারদর্শী।[১২] শিল্পীদের এই চিত্রগুণের সমন্বয়ের কারণেই পাল পুথিচিত্রে ভাস্কর্যের ফর্মের মিল লক্ষণীয়। ভাস্কর্যের মডেলিং গুণ লক্ষণীয়। অতএব পাল-পূর্ব সময়কালের ভাস্কর্যই প্রমাণ করে সে সময় চিত্রকলার চর্চা হতো, উপকরণের ক্ষণস্থায়িত্বের কারণে এখন পর্যন্ত যার কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পাল-পরবর্তী সেন রাজত্বকালে এই পুথিচিত্রের পরম্পরা চলমান ছিল। শুধু তা-ই নয়, নেপালি চিত্রে সে সময় পাল যুগের পূর্বভারতীয় রীতিরই সম্প্রসারিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়।[১৩] এখানে উল্লেখ্য যে, বাঙালি পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে লামা ধর্মগুরু ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। উক্ত ঘটনায় পূর্বভারতীয় শিল্পরীতির সাথে তিব্বতীয় শিল্পরীতির সমন্বয় যে ঘটেছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

চিত্র ০৫ : পাল পুথিচিত্র (মহাশ্রী তারা-নেপাল), সময়কাল : ১০৭৩ খ্রি.

পাল পুথিচিত্রের অধিকাংশই প্রামাণ্য মহাযানগ্রন্থ 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র অনুলিপি। এ ছাড়া পরবর্তীকালের বজ্রযান মতগ্রন্থের অনুলিপি। এসব চিত্র গ্রন্থের চিত্ররূপায়ণ নয়; বরং স্বমহিমায় স্বতন্ত্র সত্তায় চিত্রজগুণে গুণান্বিত। অর্থাৎ বাংলার এই চিত্রকলাকে গুপ্ত-সম্রাটদের শাসনকালের (খ্রি. ৩২০–৫৭৬) ও এর নিকটবর্তী সময়ের বাঘ, অজন্তা ও বাদামির গুহাচিত্রের মার্গরীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ধরা যায়। এক্ষেত্রে বলা যায়, গুপ্ত যুগের মার্গরীতির এই রূপাদর্শ পরবর্তীকালে পাল পুথিচিত্র ও ভারতীয় কলাশিল্পের বিকাশে চিরায়ত আদর্শ হিসেবে অনুসৃত হয়ে আসছে। পুথিচিত্রের গ্রন্থ যাতে নষ্ট না হয়, এ জন্য কাঠ দিয়ে বইয়ের মলাট তৈরি করা হতো। এই কাঠের মলাটে চিত্র অঙ্কন করা হতো। একে 'পাটাচিত্র' বলা হয়। পাল-পরবর্তী মধ্যযুগে চৈতন্যদেব-আশ্রিত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের চিত্রকলায় পাটাচিত্র উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

পাল চিত্রকলার সমসাময়িক পশ্চিম ভারতের জৈন পাণ্ডুলিপি বা পুথিচিত্র 'মধ্যযুগীয়' চিত্ররীতি দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় রীতির উদ্ভব ইলোরার ভিত্তিচিত্রে, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডৌলবিহীন তীক্ষ্ণ রেখা এবং মণ্ডনগুণহীন সমতল রঙের প্রলেপ।[১৪] পাল পুথিচিত্রে এই মধ্যযুগীয় রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যযুগীয় চিত্ররীতি পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় চরিত্র ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। পালদের সেনাবাহিনী কর্মরত দক্ষিণ ভারতীয় ভাড়াটে বেতনভুক, চাকরিরত ভারতীয় সৈন্যরা পালদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণী চিত্রকলার প্রভাব দেখা যায়। এই সেন ও বর্মণরা সমাজের সর্বস্তরে সংস্কৃত্যায়ন করেছেন। কারণ বাংলার মাটির সাথে, ভাষার সাথে তাঁদের সংশ্রব ছিল না। এমনকি মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্বন্ধ কম ছিল। তাঁদের রুচি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ বাংলা অঞ্চল থেকে ভিন্ন। সাময়িক ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে এ অঞ্চলে কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আরোপ করে সামাজিক বিভক্তি সৃষ্টি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ফলে এ অঞ্চলের লোকায়ত মূল্যবোধ, যা তার সাংস্কৃতিক অঙ্গ রূপে চিত্রকলা ভাস্কর্যে প্রতিফলিত হয়ে আসছিল, এর পথ অবরুদ্ধ হয়ে কঠিনভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারায় শিল্পকর্ম গড়ে উঠেছিল, যা বাংলা অঞ্চলের লোকায়ত হিন্দুদের মধ্যে তেমন প্রভাব রাখেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সেনদের এ রকম সামাজিক স্তরবিন্যাস ফলপ্রসূ ও শাসন ক্ষমতার একটা স্থায়ী রূপ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা হয়েছিল।

সেন ও বর্মণ রাজবর্গের তুলনায় বড় বিপর্যয় হয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনায়। এ সময় ইসলামধর্মী তুর্কি-অধিনায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয় করেন। সেই বিজয় শুধু একটি প্রশাসনিক বা ক্ষমতার বিজয় ছিল না, এর সাথে চলে আসে ইন্দ-পারসিক ও মোগল ঘরানার নতুন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এই সময়ে জনজীবনের অল্পবিস্তর শিল্পকর্ম হতে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধরনের শিল্পকর্ম হতে থাকে তা একান্তভাবেই ইসলাম ধর্ম-আশ্রিত।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে স্থাপত্যের ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়। রক্ষণশীল ইসলামি মতবাদ অনুসারে মানুষ ও পশুপাখির রূপায়ণ নিষিদ্ধ হওয়ায় চিত্রশিল্পীর রূপভাবনায় যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তা গৌড়-পাণ্ডুয়ার সুলতানি স্থাপত্যকর্মের অলংকরণস্বরূপ নানান নকশায়।[১৫] চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সুলতানি শাসনে নবযুগের সূচনা হয়। ইলিয়াস শাহের (১৩৪২–৫৭ খ্রি.) আমল থেকে বাংলা স্বাধীন সুলতানরা সুশাসন প্রবর্তনে সক্ষম হন। রাজনৈতিক শক্তি এবং বিশেষ এক আঞ্চলিক সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বাংলার বৈশিষ্ট্য সর্বভারতীয় স্বীকৃতি অর্জন করে। সুলতানরা দেশজ সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ যত্নবানের কারণে *রামায়ণ*, *মহাভারত* প্রমুখ গ্রন্থকে বাংলা অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই পৃষ্ঠপোষকতা হুসেন শাহি (১৪৯৩–১৫৩৮ খ্রি.) শাসনকালেও ব্যাপ্তি লাভ করে। পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশে ব্যবহৃত ভাষা ছিল বাংলা ও ফারসি। নসরৎ শাহ (১৫১৯–১৫৩২ খ্রি.) বাংলার দরবারে আনুকূল্য করেছেন সুদূর পারস্যের বিশিষ্ট চিত্ররীতি।[১৬] 'পূর্বভারতের বৌদ্ধ ও পশ্চিম ভারতের জৈন পুথিচিত্রের পরম্পরার পর এই সুলতানেদের দরবারেই নতুন এক ধারার অনুচিত্র বা মিনিয়েচারের অনুশীলন শুরু হয়। নতুন এই চিত্ররীতির উৎস হলো পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার অনুসৃত সুসমৃদ্ধ পারসিক বা ইরানীয় পাণ্ডুলিপি-চিত্রকলা। নসরৎ শাহের দরবারে এই সমৃদ্ধ পারসিক চিত্রশিল্পের ধারা এসে পৌঁছেছিল।'[১৭]

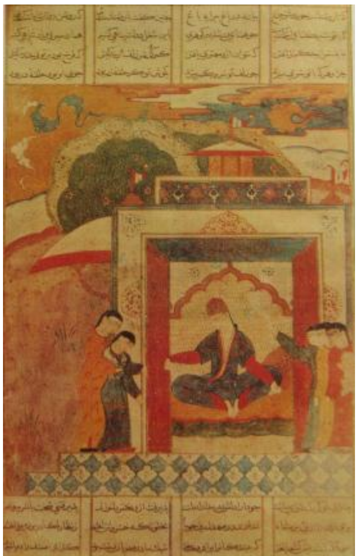

চিত্র ০৬ : আলেকজান্ডার কর্তৃক দারা-কন্যা রোশানকে গ্রহণ
নিজামী রচিত 'ইস্কান্দারনামা'র পাণ্ডুলিপি-চিত্র, ১৫৩১–৩২ খ্রি.

হুসেন শাহি আমলের কয়েক দশক পরে দিল্লিতে মোগল রাজত্ব শুরু হয়েছিল। অজন্তা ও পাল চিত্রকলার পর মোগল চিত্রকলা ভারতীয় চিত্র-ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান দিক। মোগল চিত্রকলায় মিনিয়েচার চিত্র অঙ্কন হয়েছে। এই মিনিয়েচার দুই রকমের—রাজপুত ও মোগল। রাজপুত চিত্রের উৎপত্তি হিন্দু রাজপুত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, আর মোগল চিত্রের উৎপত্তি মোগল দরবারে। মোগলরা ভারতে এসেছিল মধ্য-এশিয়া হতে। এরা আমির তৈমুরের বংশধর। ষোলো শতকের মধ্যভাগে মোগলরা বঙ্গদেশ দখল করে সতেরো শতকে ক্ষমতার চরম সীমায় ওঠে। আঠারো শতকে তাদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়।

সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে মোগল চিত্রকলার সূচনা। তিনি তাঁর দরবারে দুজন পারস্য চিত্রকর নিযুক্ত করেছিলেন। সম্রাট আকবরের সময় মোগল চিত্রকলার প্রতিষ্ঠা পায় এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগল চিত্রকলা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। গোঁড়া মুসলমান আওরঙ্গজেবের কালে অবনতি হয়। মোগল মিনিয়েচার চিত্রে পারসিক, ভারতীয় ও ইউরোপীয় রীতির সমন্বয় ঘটেছিল। ভারতের বংশানুক্রমিক শিল্পীরা মিনিয়েচার চিত্রকলার রীতি মোগলদের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। হিন্দু শিল্পীদের হাতে এই মিনিয়েচার রীতি নতুন রূপ পায়। রাজপুতানা এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশে রাজপুত শিল্পীদের হাতে রাজস্থানী চিত্র নাম পায়। তাঁরা এঁকেছিলেন পৌরাণিক বিষয়, হিন্দু ধর্মের এবং হিন্দু জীবনের নানা বিষয়ের চিত্র। মোগল শিল্পীরা দরবারের দৃশ্য, শোভাযাত্রা, শিকারের দৃশ্য, প্রতিকৃতি প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ চিত্র এঁকেছেন।[১৮]

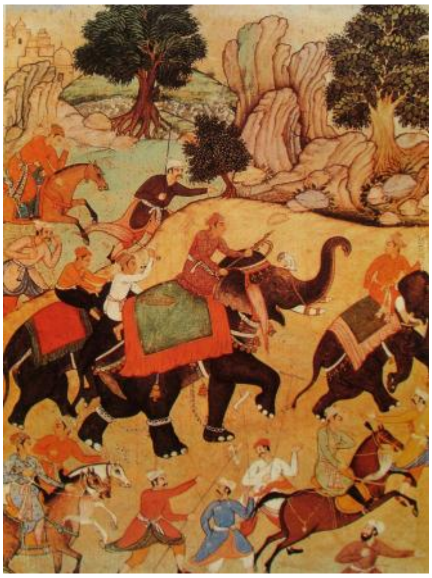

চিত্র ০৭ : হস্তি ও অশ্বপৃষ্ঠে শিকার, মোগল চিত্রকলা, আনুঃ ১৫৯০

আওরঙ্গজেবের বীতস্পৃহায় মোগল চিত্রকলার বিপর্যয় ঘটে। বলা যায়, ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল চিত্রের গৌরবময় যুগ এবং ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অধঃগতি এবং মৃত্যুর কাল।[১৯] মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে শিল্পীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যান এবং কয়েকটি প্রাদেশিক স্কুলের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ গিয়ে লক্ষ্ণৌ কলম এবং হায়দ্রাবাদে গিয়ে ডেকান কলম সৃষ্টি করেন। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদে যেসব শিল্পী গেলেন সেখানে তৈরি হয়েছিল মুর্শিদাবাদ শৈলী। বাংলার নবাবশাহির রাজধানী

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদাবাদের নবাব তখন মুর্শিদকুলী খান। তাঁর আমলে ধর্মীয় কারণে কিছু দাক্ষিণ্যলাভ করেছেন দিল্লি থেকে সমাগত শিল্পীরা। মুর্শিদাবাদ কলমের বিকাশ ঘটেছিল মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকালের পর তাঁর পুত্র সুজাউদ্দিনের সময়কালে। আলিবর্দী খাঁ ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে মসনদে অসীন হওয়ার পরই মুর্শিদাবাদ শৈলীর প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল। আলিবর্দীর প্রশ্রয়ে তাঁর দৌহিত্র সিরাজ ছিলেন বিলাসী যুবক। তাঁর প্রভাবে শিল্পীরা দরবারি পরিবেশের বাইরের বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতেন। ফলে এ শৈলীতে বৈচিত্র্য ও সজীবতা প্রবেশ করল। শিল্পীরা নতুন স্বাচ্ছন্দ্যে নব নব রূপবিন্যাসে আঁকলেন 'রাগমালা' সিরিজের ছবি। এই ছবির কোনোটিতে নায়কের চরিত্রে সুপুরুষ সিরাজের রূপনির্মিতিতে মুর্শিদাবাদ শৈলীতে নিজস্বতা এলো। জ্যামিতিক বিন্যাসকে নানাভাবে ভেঙেচুরে, এমনকি বর্জন করে শিল্পীরা চিত্রপটে স্বতঃস্ফূর্ততা আনলেন। বিভিন্ন রাগের চিত্রমালায় প্রকৃতি, আকাশ, সময় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল।[২০]

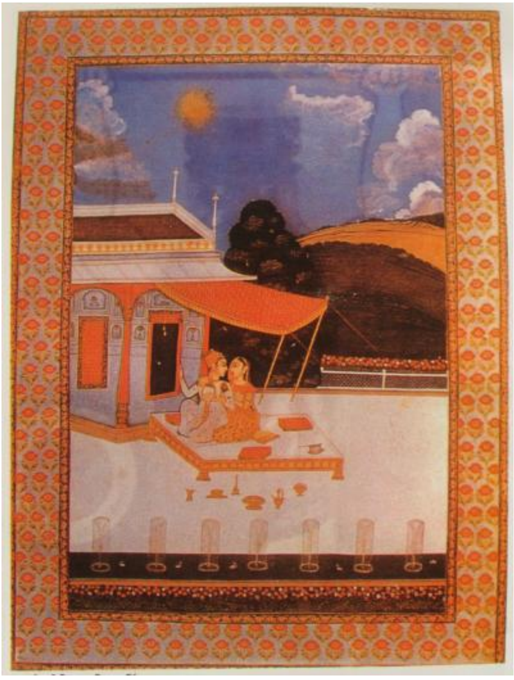

চিত্র ০৮ : মধুমাধবী রাগিণী, মুর্শিদাবাদ, আনুঃ ১৭৬০ খ্রি. চিত্র ০৯ : মধ্যমাদি রাগিণী, প্রাদেশিক, মুর্শিদাবাদ, আনুঃ ১৭৬০ খ্রি.

এ ছাড়া এসব ছবিতে গ্রামবাংলার জীবনধারাও চিত্রিত হয়েছে। চিত্রিত হয়েছে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি। মীর কাসিমের আমলে লক্ষ্ণৌ শিল্পীরা মুর্শিদাবাদে এসে কাজ করার ফলে সামাজিকভাবে মুর্শিদাবাদ শৈলীতে লক্ষ্ণৌ শৈলীর প্রভাব পড়ে। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ শৈলীর শিল্পীরা মোগল পদ্ধতির ঘন জলরঙের ছবির সাথে সূক্ষ্ম তুলির হালকা খয়েরি বা ছাই রঙের ফুটকি দিয়ে মুখের আদল নিটোল করে তুলতে শুরু করেন।[২১] অর্থাৎ নবাবদের আমলে বঙ্গদেশে যেসব ছবি আঁকা হয়েছিল, সেসব ঠিক মোগল মিনিয়েচারের রীতিতে অঙ্কিত নয়, তাঁদের মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। যাকে বলা যায় বঙ্গীয় রীতি।[২২] বা বাংলার নিজস্ব রীতি। মিরজাফরের সময় মুর্শিদাবাদ শৈলীর দ্রুত অবনতি হলো। এ ছাড়া ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মন্বন্তরের ধাক্কায় অবক্ষয়িত ধারার লুপ্ত হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে শিল্পীদের অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের হাতে

Dhaka University Institutional Repository

মোগল ও পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণে কোম্পানি শৈলী সৃষ্টি হলো। সপ্তদশ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত গ্রামবাংলার চিত্রকলার প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল চৈতন্যদেব ও তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমভক্তিরসে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষই আপ্লুত ছিল। ফলে এই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক চিত্র পাটার ওপর, পটে, পুথিচিত্রে, মন্দিরের ভেতরে ফ্রেসকোতে আঁকা ছাড়াও মোগল পরম্পরায় মুর্শিদাবাদ শৈলীতে আঁকা হয়েছে।

চিত্র ১০ : অজ্ঞাতনামা শিল্পী নবদ্বীপে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তন, আনুঃ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ

চৈতন্যদেব ও তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম-আশ্রিত চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণলীলা লোকপ্রিয়তার কারণে বাংলার পটচিত্রের প্রবহমান ধারা বেশি গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছে।

বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটে মার্গীয় বা দরবারি শৈলী ছাড়াও চিত্রকলায় অন্য একটি শক্তিশালী রূপ প্রবহমান ছিল, যা লোকজ চিত্রকলা। বাংলার এই লোকজ চিত্রকলার ভাণ্ডার ভারত উপমহাদেশের বৃহত্তর লোককলাকৃতির অংশ। এ প্রসঙ্গে প্রদ্যোত ঘোষের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য :

> যে শিক্ষা কোন বিকাশশীল সমাজে প্রত্যক্ষ, অথচ ভৌগোলিক অথবা সংস্কৃতিগত কারণে তথাকথিত ভদ্র-বিলাসী-সম্প্রদায় থেকে পৃথক তাকে লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এটি বিশিষ্ট কলাপদ্ধতি ও স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন ও রুচির অনুগ এবং এ সব শিল্পসৃষ্টি আদিম আবেগের এক বিশিষ্ট জটিল ফসল।[২৩]

বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের বিচিত্র জনগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ ও আঞ্চলিক পরিবেশের লোকচিত্রকলার ঐতিহ্য ভাণ্ডার রঙিন। প্রকৃত শেকড়ের সন্ধান এবং প্রাচীন শৈল্পিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিবর্তন লোকশিল্পীদের কাজের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ জনপদের এ সকল শিল্পী ‘পটুয়া’ নামেই পরিচিত। ‘আমাদের দেশে এবং বলা যায় বিশ্বের সর্বত্র এখনকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না, যা ছিল কালানুপাতিক পরম্পরা শিক্ষা। তা কখনো গুরু কখনো বংশধারা।’[২৪] ফলে এ সময় শিল্পীদের কাজে রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পটচিত্র, লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি, আলপনাসহ নানাবিধ উৎসব-পার্বণের চিত্রবিদ্যার সম্ভারে পরিপুষ্ট বাংলার লোকচিত্রকলায়, ঐতিহ্যকে লালন করার প্রতি শিল্পীদের বিশেষ আগ্রহই পরিলক্ষিত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক ঔপিনিবেশিক দরবারি ও লোকজ চিত্রকলায় অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশ যুগলবদ্ধ হয়ে রূপের অন্তরালে অরূপের প্রকাশে মননের উদ্বোধন হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিকতা ও রেখার ব্যঞ্জনাময় বিন্যাস পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী (Three Dimentional) গুণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। অতএব বাংলার চিত্রকলায় ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট নির্ণয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই বাংলার পটচিত্র ধারা সম্পর্কে বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে।

লোকশিল্পের প্রাচীন মাধ্যমের অন্যতম হচ্ছে পটচিত্রকলা। এই পটচিত্রকলা বাঙালির রূপকলা সাধনার সব থেকে সহজ, সাবলীল ও স্বকীয় প্রকাশ। পটচিত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও সর্বব্যাপী আবেদন অন্য কোনো ধারার ছবিতে নেই।[২৫] ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম পর্বেই পটচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের জীবনী ও পূর্বজন্ম-সংক্রান্ত জাতকের গল্প-সংবলিত পট মস্করী ভিক্ষুরা প্রদর্শন করতেন।[২৬]

সপ্তম শতাব্দী, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পটুয়ারা সক্রিয় ছিলেন। পনেরো শতকে রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা কাহিনি পটে প্রচলন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের বাণী প্রচারে পট ব্যবহৃত হতো। একই শতকের কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* পটের উল্লেখ আছে।[২৬] এ ছাড়া পনেরো শতকে গাজির পটের প্রচলন ছিল। এই বিভিন্ন ধরনের পটচিত্রকে অশোক ভট্টাচার্য বিষয় বিচারে চার ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। ভাগগুলো হলো :

১. সাঁওতাল উপজাতির জন্মকথা ও তাদের মধ্যে প্রচলিত চক্ষুদান পট;
২. যমপট;
৩. গাজিপট;
৪. হিন্দু পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা পট।[২৭]

এই পটচিত্রের ধারা বর্তমান সময়েও ক্ষীণভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এমনকি আধুনিক যুগে গ্রামগঞ্জ ও শহরের হাট-বাজারে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য এই পটচিত্রের আধুনিক উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। তবে এখন এই ধারাটি বাংলায় বিলুপ্তপ্রায় বলাই সংগত। পটের চিত্রশৈলী প্রাচীন দেয়ালচিত্র, যা অজন্তার দেয়ালচিত্রের অনুরূপ বলা যায়। অঙ্কনশৈলী বিচার করলে প্রবহমান প্রাচ্য-ঐতিহ্যের ফ্রেসকো চিত্র এবং পাল পুথিচিত্রের সাথে মিল পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম থেকে কলকাতা ও এর আশপাশে, বিশেষত কালীঘাটকে কেন্দ্র করে যে পটশৈলী গড়ে উঠেছিল, এর নাম কালীঘাট পটচিত্র। কালীঘাট পটচিত্রই বাঙালির নিজস্ব শিল্প-অভিব্যক্তির অন্যতম প্রকাশ, যা দেশ-বিদেশের বিশেষ শিল্পমর্যাদার অধিষ্ঠিত। নানা কারণে এই পটশৈলী শিল্পমর্যাদার চরম শিখরে পৌঁছেছিল।

আয়-রোজগারের আশায় গ্রামবাংলার পরম্পরা শিল্পীরা কলকাতার কালীঘাটের আশপাশে এসছিলেন। তাঁরা ক্রেতাদের প্রয়োজন ও রুচির কথা বিবেচনা করে পটচিত্রের প্রক্রিয়া ও প্রকরণে, বিষয় নির্বাচনে নতুনত্ব নিয়ে এসছিলেন। এই নতুনত্বই কালীঘাটের পটচিত্রে স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি আনতে সহায়তা করেছে। অর্থাৎ তাঁরা ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত কাজ করে দেয়ার জন্য কাপড়ের পরিবর্তে কাগজে দ্রুত তুলির টানে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ, এমনকি হাস্য-পরিহাস বিষয় নিয়ে চিত্র অঙ্কন করেছেন। নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান রেখা ও স্বচ্ছ বর্ণের সুমিত বিন্যাসে এসব চিত্র এঁকেছেন।

চিত্র ১১ : শিবের বুকে কালী, কালীঘাট, পটচিত্র
৪৭.৫ × ৩৬ সেমি, ১৮৮৯

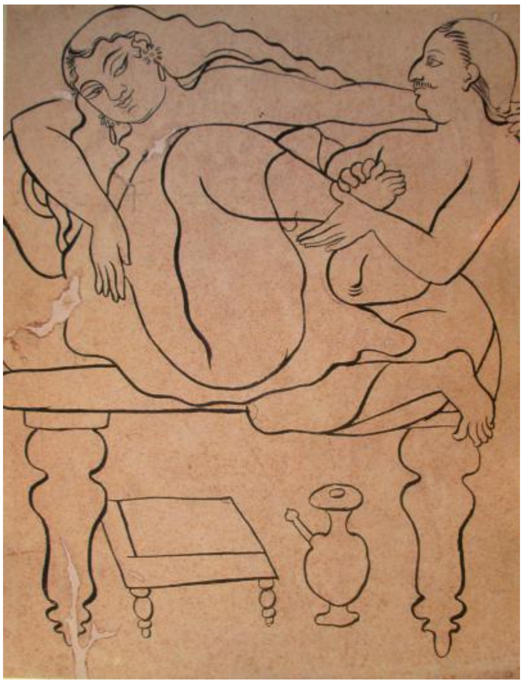

চিত্র ১২ : প্রেমিক দ্বারা আদৃত হচ্ছেন এক প্রেমিকা
কালীঘাট পটচিত্র, পেপার, ৪৭.৫ × ৩৬ সেমি, ১৮৮৯

তাঁদের পটচিত্রে কালী ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবী এবং কলকাতা শহরের সাহেবপাড়া ও দেশিপাড়ার সংস্কৃতির রূপ বিষয় হিসেবে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ বাবু কালচারের বিলাস-ব্যসন ধরা পড়েছে কালীঘাট পটচিত্রে। বাদ পড়েনি সেকালের বারবনিতার রূপ। দেব-দেবী ও সাধারণ মানব-মানবীর রূপ নির্মিতিতে বিশেষ রূপাদর্শ ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিশেষ রূপাদর্শই কালীঘাট পটের বৈশিষ্ট্য। আদর্শ পুরুষ রচনার পটল-চেরা চোখ, ধনুকাকৃতি ভ্রূ, বাবরি চুল এবং আদর্শ নারীর ক্ষেত্রে সুপুষ্ট দেহসৌষ্ঠব ও লীলায়িত ভঙ্গিমা এঁকেছেন, যা ভারতীয় পরম্পরায় চিত্রকলা থেকেই শিল্পীরা গ্রহণ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, কালীঘাট পটচিত্র অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার অন্যতম ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট। কারণ পরবর্তী আধুনিক চিত্রকলায় শিল্পীরা কালীঘাট পটশৈলীর নানান অনুষঙ্গ তাঁদের চিত্রে ব্যবহার করেছেন। যামিনী রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ভারতীয় উপমহাদেশে চিত্রকলায় ঔপনিবেশিক শিল্পকলার প্রভাব পড়েছিল প্রায় ২০০ বছরের (১৭৫৭–১৯৪৭) ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের ফলে। বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে আগত পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের শিল্প-সংস্কৃতির আগমন ঘটে এ উপমহাদেশে। ফলে পরম্পরার ঐতিহ্যে লালিত চিত্রকলার নন্দনতাত্ত্বিক ঐক্যসূত্রের ধারাবাহিকতার পথ রুদ্ধ হয়। 'উপনিবেশের রক্তচক্ষু আমাদের শাসিয়েছে, আমরা মানুষের চেয়ে এক ইঞ্চি ছোট। আমরা বর্ণে হীন। আমাদের বিশ্বাস সংস্কার ভাবনার সর্বত্র মূঢ়তা, আমাদের জন্য যা কিছু স্বাভাবিক তাই বর্জনীয়। কারণ প্রভুর সংস্কৃতি উচ্চ সংস্কৃতি।'[২৮] এই মানসিকতা পোষণ করে এবং নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মোগল দরবারে শিল্পীরা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতার অধীন হলে মোগল ও পাশ্চাত্য শৈলীর মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল কোম্পানি শৈলীর চিত্রকলা। প্রাচ্যের মাটিতে এই কোম্পানি শৈলীর চিত্রকলাই ঔপনিবেশিক চিত্রকলায় প্রথম সোপান। কোম্পানি আমলের ঔপনিবেশিক ইংরেজদের

Dhaka University Institutional Repository

বিলাস-ব্যসন, রুচির ব্যবহারিক প্রয়োজনে আগত ইংরেজ শিল্পীরা ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত (১৭৬৮ খ্রি.) রয়েল একাডেমির প্রচলিত ধারা অনুযায়ী ব্রিটিশ পরম্পরায় মুর্শিদাবাদ শৈলীর পরে বাংলার চিত্রকলায় যে চর্চা হয়, তার নাম কোম্পানি শৈলী। কোম্পানি আমলের ইংরেজ পেশাদার শিল্পীরা স্বচ্ছ জলরং ও তেলরঙে ছবি আঁকেন। এসব তেলরং ও জলরঙের চিত্রকলা ভারতীয় অভিজাত শ্রেণির মন আকর্ষণ করে। ফলে বহুজনের চাহিদা, কৌতুক ও নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ মেটাতে কোম্পানি নিযুক্ত দেশি শিল্পীরা ইংরেজদের রুচি অনুযায়ী চিত্র আঁকতেন। এভাবেই নবাব ও অভিজাত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা হারানো এ দেশের পরম্পরায় প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা ঔপনিবেশিক চিত্রকলা রীতি-পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হন। তাঁরা মোগল পরম্পরায় ঘন জলরঙের (gouache) বদলে ব্রিটিশ স্বচ্ছ জলরঙে (Water Colour) কাজ করতে অভ্যস্ত হলেন। অভ্যস্ত হলেন লিথোগ্রাফ, এনগ্রেভিং, তৈলচিত্র, কাঠের ওপর ছবি করতে। বিদেশি কাগজ ও রঙের ব্যবহার করতে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ব্রিটিশ শিল্পীদের অঙ্কিত ভারতীয় দৃশ্যাবলির প্রিন্ট বাজার থেকে কিনে দেশীয় শিল্পীরা নকল করার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের করণ-কৌশল দ্রুত আয়ত্তে আনার চেষ্টা করতেন। অতএব একথা বলা যায় যে, কোম্পানি শৈলীর হাত ধরেই দেশীয় শিল্পীরা অন্ধ অনুকরণের মধ্য দিয়ে চিত্রকলায় বাস্তবানুগতার প্রয়োগ কৌশলে পাশ্চাত্য ধারা আত্মস্থ করেন। পাশ্চাত্য এই চিত্ররীতির ছাপ গ্রামীণ 'পটুয়া' শিল্পীদের কাজেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কোম্পানি আমলে ইংরেজ পেশাদার শিল্পীদের স্টুডিয়ো (Studio) করে স্বাধীন চিত্রকলা অঙ্কন ও রোজগারের পথ ধরে এ দেশে বাস্তবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই পরবর্তী প্রকাশ পাশ্চাত্যরীতিতে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন। প্রথম এসব স্কুল কারিগরি বিদ্যা শেখানোর জন্য চালু হলেও ধীরে ধীরে আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষিত অধ্যক্ষদের পরিচর্যায় উচ্চাঙ্গের আর্ট স্কুলে পরিণত হয়েছে।[২৯] তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার শিল্পশিক্ষা। দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথভাবে অনুকরণ ও ব্যবহারিক ছবি ও নকশা আঁকায় ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলা। অর্থাৎ 'নূতন উপকরণ ও বিভিন্ন করণ-কৌশল তথা technology-র শক্তিতেই পাশ্চাত্যশিল্প এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে, আদর্শ দ্বারা নয়।'[৩০] স্বচ্ছ জলরং এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফ, তৈলচিত্র ইত্যাদির পরম্পরা আমাদের দেশে ছিল না, সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় এসব মাধ্যমের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় নতুন শিক্ষা ও নতুন আলোর আস্বাদ পেয়ে দেশীয় চিত্ররীতিকে অবজ্ঞা করতে শেখেন।

'শিল্প যে বিলাসিতার অনুষঙ্গ নয়, জাতীয়-জীবনে শিল্পের গভীর তাৎপর্য এবং সে তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য সমকালীন শিল্পশিক্ষার বিধি-ব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল এই কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন আর্ট স্কুলের অন্যতম অধ্যক্ষ ই.বি হ্যাবেল।'[৩১]

১৮৯৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন হ্যাভেল। ই.বি হ্যাভেলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ কয়েকজন শিষ্য ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা থেকে চিত্রকলাকে মুক্ত করার জন্য চিত্রে বিশুদ্ধ ভারতীয়তার চর্চা শুরু করেন। একদিকে চীন-জাপানের চিত্রশৈলী, অন্যদিকে অজন্তা ও মোগল ভারতের চিত্রশৈলী আর কিছুটা হলেও পশ্চিমের একাডেমিক রীতির ব্যাকরণ মিলিয়ে এক নতুন চিত্রশৈলী গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

তুললেন, যা পরবর্তীকালে 'নব্য-বেঙ্গল স্কুল বা নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতি' গড়ে ওঠার নেপথ্যে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও সামজিক প্রেক্ষাপটের স্বদেশি আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে পরিতোষ সেন যথার্থই লিখেছেন :

> শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতীয়রা এই সত্যটি তখন উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্যকে পুনরুদ্ধার করে স্বদেশি শিল্প ও চারুকলার পুষ্টিসাধনে গভীরভাবে লিপ্ত না হতে পারেন, তা হলে আরোপিত প্রভাবশালী ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।[৩২]

এই মনোবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায়, চিত্রকলার ক্ষেত্রে স্বদেশ চেতনা ও আত্মপরিচয়ের নবজাগরণ ঘটালেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, ঐতিহ্যের পরম্পরা এবং মৌলিকতার শেকড় সন্ধানে তাঁর আবিষ্কৃত চিত্রচর্চায় ফিরে আসে প্রাচ্যের হাজার হাজার বছরে অস্থি-মজ্জায় প্রবহমান দর্শন ও রুচিবোধের ভাবনির্ভর রূপনির্মাণ। অজন্তা ও মোগল চিত্রের প্রাণী ও মানব-মানবীয় ইন্ডিয়ান বাস্তবধর্মী আবেদনের সমহারে তাঁর চিত্রকলা ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা হয়ে ওঠে। এ সময়ে জাপানের শিল্প প্রবক্তা ওকাকুরা তেন্‌শিনের আগমন এবং স্বদেশি চেতনা জাগানো বক্তৃতা (Asia is One) নব্য-বঙ্গীয় চিত্র আন্দোলনের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছে। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* গ্রন্থে গোলাম মুরশিদ অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ঘরানার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> তিনি একই সঙ্গে অজন্তা, রাজপুত, পারসিক, মোগল ও পাহাড়ী মিনিয়েচার এবং লোকশিল্পের স্টাইল দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমন কি, এক জাপানী শিল্পীর কাছে তিনি জাপানী রীতিও শিখেছিলেন। এই নানা রীতির সমাহার তাঁর ছবিতে একদিকে যেমন বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিলো, অন্যদিকে তেমনি কোনো কোনো সময়ে দুর্বলতা হিসেবে কাজ করেছে। কারণ, তাঁর ছবিতে এতো বিচিত্র ধরনের ভঙ্গি এসে মিশেছে যে, কোনো রীতির সমালোচনাকেই তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেননি। এবং তাঁর ফলে তিনি এমন বিশিষ্ট রীতির ছবি কমই এঁকেছিলেন, যাকে দেখতে অভ্রান্তভাবে তাঁর ছবি বলে মনে হতে পারে।[৩৩]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা আর্ট স্কুলে ১৯০৫ সালে অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চায় হাল ধরেন। তাঁর পরিচর্চায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এ ধারায় চিত্ররীতির ব্যাপক চর্চা হতে থাকলে ১৯০৫–১৫ সাল পর্যন্ত চরম উৎকর্ষ লাভ করে। যা পশ্চিম ভারতের অস্বীকৃতি ব্যতীত সর্বভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার মর্যাদা লাভ করে, গোলাম মুরশিদ এই ঘরানাকে 'বাঙালি ঘরানা' বলে অভিহিত করেন।[৩৪]

অতএব অবিভক্ত বাংলায় নিজস্ব একটি চিত্রকলা ধারা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সিন্ধু সভ্যতা থেকে কোম্পানি শৈলী পর্যন্ত বিবর্তনের যে প্রেক্ষাপট, সেটাই পরবর্তী সময়ের অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট। যে ঐতিহ্যের নির্যাস নিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ভারতীয় পাঁচ দিকপালের (অবনীন্দ্র ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দনাল বসু, যামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) হাত ধরে প্রাচ্যচিত্রকলা বিশ্বায়নের পথে ধাবিত হয়েছে। এই পাঁচ দিকপাল সমকালের জীবন-ভাবনাকে প্রতিফলিত করার মানসেই প্রত্যেকে মৌলিক চিত্ররীতি গড়তে সমর্থ হয়েছিলেন। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলগুলোতে পাশ্চাত্য ধারার চিত্রচর্চা অব্যাহত আছে। তবে একাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এ দুই শৈলীর পরস্পরবিরোধী মতানৈক্য থাকলেও অবিভক্ত বাংলায় শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব একটি প্যাটার্ন তৈরি করতে

সমর্থ হয়েছেন। যাকে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' বলা যায়। অর্থাৎ নব্য-বেঙ্গল স্কুল-পূর্ব ঐতিহ্যিক ধারাবহিকতা এবং নব্য-বেঙ্গল স্কুলের নানাবিধ অনুষঙ্গ দ্বারা পুষ্ট হয়ে অবিভক্ত বাংলার শিল্পরীতি গড়ে উঠেছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সং, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৯৫ [৫ম পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩]

২. মুকুল কুমার বাড়ৈ, সহযোগী অধ্যাপক, ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. গবেষকের সাথে মুকুল কুমার বাড়ৈ-এর সাক্ষাৎকার, ১৬ অক্টোবর ২০১৩

৪. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা, অবসর, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৬

৫. টীকা : ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, আর্যদের মুখের ভাষার নাম ছিল প্রাকৃত। এই প্রাকৃত ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে রূপ নেয়, তার নাম অপভ্রংশ। অপভ্রংশ পরিবর্তিত হয়ে হয় অবহট্ট। এবং সেই ভাষার নমুনাই চর্যাপদ। চর্যাপদ-পরবর্তী বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট হয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে। যার নমুনা বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। যে বিস্তীর্ণ এলাকাকে বঙ্গদেশ বলা হয়, সেই এলাকা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চল এক একটি অখণ্ড এলাকা অথবা দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শামসুদ্দীন শাহ এই বিভক্ত অঞ্চলগুলোকে একই শাসনের অধীনে একত্র করেন। মোটামুটি সেই সময়ে এ অঞ্চলের ভাষাও সত্যিকার বাংলা হয়ে ওঠে। (দ্র. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ ও ২৩)

৬. নির্ম্মল কুমার ঘোষ, *ভারত শিল্প*, কলিকাতা, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৭৩, পৃ. ২১৯

৭. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৪, পৃ. ১২

৮. প্রাগুক্ত

৯. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪

১২. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০–৪১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৮. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, আনন্দ, আগস্ট ১৯৯৫ [প্র. প্র. ১৯৭৫], পৃ. ৯০

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

২০. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬–৫৭

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২২. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

২৩. প্রদ্যোৎ ঘোষ, *বাংলার লোকশিল্প*, কলকাতা, ঋজীক, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৪

২৪. হরিহর দে, শিল্পে পরম্পরা, বর্ধমান, এন.জি আর্ট স্টুডিয়ো, ২০০৮, পৃ. গ

২৫. অশোক ভট্টাচার্য, পৃ. ৮৮

২৬. তোফায়েল আহমদ, *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৯, পৃ. ৯৬

২৭. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

২৮. সেলিম আল দীন, “শিল্পে সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাঙালীর অন্বেষণ : নাট্যপর্ব” থিয়েটার স্টাডিজ, সংখ্যা ৯, জুন ২০০২, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৪

২৯. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, “শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি”, দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), বিশ্বভারতী পত্রিকা (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২–২০০৬ : প্রসঙ্গ শিল্প ও সংগীত), কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২০০৭, পৃ. ১৭১–৭৪

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. পরিতোষ সেন, *কিছু শিল্পকথা*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৪১

৩৩. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯

Dhaka University Institutional Repository

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১–১৯৫১) জোড়াসাঁকোর ঐতিহ্যবাহী ঠাকুরবাড়ির বহুমুখী প্রতিভাধর শিল্পীব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সূক্ষ্ম রসবোধ ও সংবেদসম্পন্ন শিল্পতাত্ত্বিক, নন্দনতত্ত্ববিদ, লোকশিল্পের সংগ্রাহক, সর্বোপরি চিন্তাশীল এবং মজলিশি ব্যক্তি। তিনি নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্তক, বাংলায় প্রাচ্যচিত্রকলার মর্ম প্রতিস্থাপনের প্রথম স্মরণীয় শিল্পী ও পথদ্রষ্টা এবং নব্য ভারতের রূপশিল্পের পথিকৃৎ।

আমাদের জানা যে, সুবিশাল ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রবহমান শিল্পধারাই প্রাচ্যশিল্প। প্রাচ্য সংস্কৃতির বড়ো ক্ষেত্র অবিভক্ত ভারতবর্ষের শিল্পকলা একটা বৃত্তের মধ্যে নিবদ্ধ থাকেনি। বাইরের অভিঘাত ইতিহাসের পর্বে পর্বে নানা উপাদান এনেছে, যা আত্তীকৃত হয়েছে ভারতবর্ষে। ফলে প্রবহমান ধারা-উপধারার মধ্যে এমন চরিত্রলক্ষণ বিদ্যমান যার দ্বারা ভারতবর্ষের মাটিতে কাজ হয়েছে বোঝা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারা পাশ্চাত্য একাডেমিক শিল্পরীতির প্রভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছিল। তখন পশ্চিমের অভিঘাতমুক্ত করার জন্য কিংবা ঐতিহ্যকে আধুনিকতায় উন্নীত করার জন্য কোনো শিল্পী কাজ করেননি। একমাত্র রাজা রবিবর্মা (১৮৪৮–১৯০৬) পাশ্চাত্য রীতিতে দেশীয় বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন। তারপর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশি মূল্যবোধের জাগরণ ঘটে সমসাময়িক কলকাতায়। একই ঐক্যসূত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল'কে কেন্দ্র করে চিত্রকলায় স্বদেশি ধারা বহাল রাখার আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে *বেঙ্গল স্কুল* বা *নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা* নামে খ্যাতি লাভ করে। যেহেতু নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার মূল সুর ছিল প্রাচ্যশিল্পের নির্যাস, সেহেতু নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলাকেই *বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারা* বলে অভিহিত করা যায়। এই শিল্পধারা থেকেই বাংলার তথা ভারতের আধুনিক চিত্রকলার উন্মেষ ঘটেছে। প্রাচ্যশিল্পের পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় কীভাবে নিজস্ব চিত্ররীতির নির্দিষ্ট চরিত্রদান করেছেন, তাঁর ছাত্রদের কীভাবে যোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে গড়ে তুলেছেন, সংগঠকের ভূমিকা নিয়ে নব-প্রবর্তিত শিল্পধারাকে কীভাবে সে সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক ভারতীয় শৈলীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হবে এই নিবন্ধে। তা ছাড়া তাঁর বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবনে সাহিত্য ও চিত্রকলার নানা সৃজনশীল বাঁক পরিবর্তন বাংলার প্রাচ্যশিল্প চর্চায় যে অবদান রেখেছে; ভারতীয় শিল্পের আধুনিকতায় যে ভূমিকা রেখেছে এবং শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে, একজন সার্থক শিল্প-শিক্ষক ও শিল্পগুরু হিসেবে, সর্বোপরি তাঁর শিল্পসাধনার কল্যাণে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার যে পথ তৈরি হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হবে উদ্দেশ্য। এজন্য তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও সমকালীন প্রেক্ষাপটের দ্বৈত সমন্বয়ে তাঁকে উপস্থাপন করে তাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে। চিত্রকলার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তাঁর লিপিশিল্পও আলোচিত হবে। কারণ হিসেবে অশোক মিত্রের মন্তব্য যুক্তিসংগত। তিনি বলেছেন, 'সাহিত্যে যখন ঠেকে যেতেন বা ক্লান্তি আসত তখন চলে যেতেন ছবিতে; ছবিতে যখন আটকে যেতেন বা ব্যতিব্যস্ত হতেন তখন চলে যেতেন সাহিত্যে। সেই হেতু

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়ই তাঁর ছবি ও গদ্য হত অভিন্নাত্মা। ছবিতে আসত সাহিত্যিক কল্পনা, বিষয়, মন। গদ্যে আসত চিত্রময় কল্পনা, নিছক চিত্ররূপ।'[১] অর্থাৎ যে নন্দনতাত্ত্বিক বোধ শিল্পে ও সাহিত্যে ধরা আছে তা একে অন্যের পরিপূরক।

এই নিবন্ধে প্রথমে তাঁর ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস কালক্রম অনুসারে উপস্থাপন করা হবে। এতে তাঁর শিল্পীমনস্ক হয়ে ওঠার নেপথ্য পরিবেশ, তৎকালীন সমাজব্যবস্থার রূপচিত্র, ব্যক্তি-শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য ও নন্দনতাত্ত্বিক বোধ তৈরিতে যেসব প্রভাব পড়েছে তার আলেখ্য ধরা পড়বে। এসব তথ্যের অনেক কথা ধরা আছে তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ *জোড়াসাঁকোর ধারে*, *ঘরোয়া*, *আপন কথা* বইয়ে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এই বাড়ির প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো শিল্পচর্চায় রত ছিলেন। ফলে গোটা ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তার প্রধান আধুনিক উদ্গাতা হয়ে উঠেছিল এই ঠাকুরবাড়ি। এই বাড়ির উত্তরসূরিরাই শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পদচারণ করে বাংলার শিল্প-সাহিত্যকে শক্ত ভিত দিয়েছেন। প্রচলিত গল্পে জানা যায়—ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষগণ *পীরালি* ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ম্লেচ্ছসংসর্গ-দুষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন।[২]

পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়েছেন। তিনি ১৮৪৩ সালের ৭ পৌষ ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ঠাকুর পরিবারে একাংশের (রবীন্দ্রনাথের পরিবার) ব্রাহ্ম সমাজের রীতিনীতি পালন, অপরাংশের (অবনীন্দ্রনাথের পরিবার) হিন্দুব্রত ও আচার-অনুষ্ঠান চর্চা, সর্বোপরি ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথের (১৭৯৪–১৮৪৬) জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭–১৯০৫) ও মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথের (১৮২০–৫৪) দুটি শাখা ঠাকুরবাড়ির শিল্প-সাহিত্যের প্রাণভূমি। প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম পরিবার ছয় নম্বর বাড়িতে ও মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথের হিন্দু পরিবার পাঁচ নম্বর বাড়িতে বাস করতেন। পাঁচ নম্বর বাড়িতে ছিল বিশাল বৈঠকখানা ঘর আর ছয় নম্বর বাড়িতে ছিল দক্ষিণের বারান্দা। এই পাঁচ নম্বর ও ছয় নম্বর বাড়ির প্রতিভাধর শিল্পীব্যক্তিত্ব ও মনীষীদের মাঝখানে অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে। গান-বাজনা, নাটক-অভিনয়, সাহিত্যালোচনা, স্বদেশিয়ানা, সমাজসেবা, যুগান্তকারী মনীষীদের পদচারণ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছেন। তিনি গিরীন্দ্রনাথের শাখায় গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৭–৮১) তৃতীয় সন্তানরূপে ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন মাতা সৌদামিনী দেবীর গর্ভে। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দুই ভাই গগনেন্দ্রনাথ (১৮৬৭–১৯৩৮), সমরেন্দ্রনাথ (১৮৭০–১৯৫১) ও কনিষ্ঠ বোন সুনয়নী দেবী (১৮৭৬–১৯৬২) ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্পী।

এক

১৮৭৬ সালে পাঁচ বছর বয়সে চিৎপুর নর্মাল স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের মতোই অবনীন্দ্রনাথের স্কুলপ্রীতির অভাব ছিল। স্কুলে যেতে ভালোবাসতেন না। তাই নানান অজুহাত সাজাতেন। স্কুলের বাইরে সবকিছুতেই তাঁর মন পড়ে থাকত। স্কুলের মধ্যে শুধু কাচের আলমারিতে তুলে রাখা একটা খেলনা জাহাজ ও কয়েকটি নানা আকারের শঙ্খ তাঁর মন আকৃষ্ট করত। এই জাহাজখানা পাবার

প্রবল ইচ্ছে আর জাহাজের কাপ্তেন হবার সাধ ছিল শিশুমনে। এ ছাড়া মন আকৃষ্ট করত বড়দের ড্রয়িং ক্লাস। তাই তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে ড্রয়িং ক্লাস দেখতেন। ঐ ক্লাসের ছাত্র ভুলুর সাথে সখ্য গড়ে ক্লাসে আঁকানো মেটে কুঁজো ও মেটে গ্লাস আঁকা শিখে নেন অবনীন্দ্রনাথ। ভুলুর কাছে এই ড্রয়িং শেখাই অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার হাতেখড়ি।[৩] লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, মাধব পণ্ডিত, হরিনাথ পণ্ডিতের কাছে তিনটি শ্রেণিতে বাংলা ও সংস্কৃত পড়া শেষে ইংরেজি পড়ানো মাস্টারমশাইয়ের শ্রেণিতে পাঠ নেয়ার সুযোগ পান। ইংরেজি শিক্ষক ক্লাসে Pudding-এর উচ্চারণ *পাডিং* করাতে অবনীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেন, ‘মাস্টারমশাইয়ের, এর উচ্চারণ তো পাডিং হবে না, হবে পুডিং, আমি যে বাড়িতে এ জিনিস রোজ খাই!’[৪] এই ঘটনায় মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে বেত্রাঘাত ও শাস্তি ভোগ করেন। প্রসঙ্গত গুণেন্দ্রনাথ স্কুল বন্ধ করে বাড়িতে গৃহশিক্ষক যদু ঘোষালের কাছে পড়া শুরু করালেন। বাড়িতে চাকর-বাকরদের হেফাজতে আর গৃহশিক্ষকের কাছে বন্দি হয়ে লেখাপড়া করা অবনীন্দ্রনাথের ভালো লাগত না। বাড়ির সমবয়সী খেলার সাথীরা স্কুলে গেলে একাকিত্বে ভুগতেন। এভাবে চলতে থাকায় এবং বাইরের জগৎ দেখতে না পারায় অন্দরমহলের সবকিছু প্রত্যক্ষণ করতেন; কল্পনার জগতে ভাসতেন। *জোড়াসাঁকোর ধারে* বইয়ে স্মৃতিচারণায় বলেছেন, ‘ঐ অমনি করে একলা থাকতে থাকতেই চোখ আমার দেখতে শিখল, কান শব্দ ধরতে লাগল। তখন থেকেই কত কী বস্তু, কত কী শব্দ যেন মন-হরিণের কাছে এসে পৌঁছতে লেগেছে।’[৫]

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর রোজ ভোরে উঠে কালীসিংহের মহাভারতের গল্প পড়ে শোনাতেন। বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের বাবা গুণেন্দ্রনাথ ও কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি আঁকার ঘরে প্রবেশাধিকার ছিল না কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানায় ওস্তাদি গানের যে মজলিশ বসত তা শুনতেন। পাশের বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোর সাথে রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছেন। ছবি আঁকা না দেখলেও ছোটো পিসিমা কুমুদিনী দেবীর ঘরে দেশি ধরনের তৈলচিত্র দেখেছেন, যা ছিল ধর্মীয় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি চিত্রণ। মূলত ঘরে-বাইরে তাঁর প্রত্যক্ষণ এক একটা ছবি হয়ে মূর্ত হতো। প্রকৃতির ছবি প্রসঙ্গে নিজের ভাষায় বর্ণনা—‘কোনো কোনো দিন বা দেখি ঘূর্ণি হাওয়ায় লাল ধুলো পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে গেল। বাইরের ছবিও দেখি। আবার খেলাধুলো শেষে ঘরের কোনায় সন্ধেবেলা পিতলের পিলসুজের উপর পিদিম জ্বলে, তারই কাছে টিকটিকি নড়েচড়ে পোকা ধরে, তাও দেখি চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ। এইরকম ঘর-বাইরের কত কী ছবি দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছি।’[৬]

দুই

১৮৮১ সালে পিতা গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার অবসান ঘটে এবং নিয়মিত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে ৯ বছর (১৮৮১–৮৯/৯০) পড়াশোনা করেছেন। এই সময় বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। নিজে নিজে ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। সহপাঠী অনুকূল চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও সহায়তায় লক্ষ্মী সরস্বতীর চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তাঁর চিত্রকলা চর্চার ভিত্তি রচনা হয়। অবনীন্দ্রনাথ অনুকূল চট্টোপাধ্যায়কে ‘প্রথম শিল্পশিক্ষার মাস্টার’ বলে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন।[৭] এই সময়ের মধ্যে ১৮৮৩ সালে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৭৬–১৯৫৩) উদ্যোগে পারিবারিক গঙ্গাভ্রমণে তিনি জল রঙে ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন। ১৮৮৬ সাল থেকে কলেজে পড়া অবস্থায় ক্রমান্বয়ে (gradually) পোর্ট্রেট আঁকা শুরু করেন। বাড়ির চাকর, আগত ফেরিওয়ালা ছাড়াও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাঁরা আসতেন তাঁদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতেন।

১৮৮৮ সালের[৮] অক্টোবর মাসে অবনীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো তখন ভূজঙ্গভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুহাসিনী দেবীর (১৮৭৮–১৯৪২) সাথে বিবাহ হয়। বিবাহের পর মায়ের নির্দেশে বিশেষ ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে (St. Xavier's College)। এখানে বছরখানেক ইংরেজি সাহিত্য অনুশীলন করেন।[৯] এরপর তিনি পড়ালেখার পাট চুকিয়ে সংগীত ও চিত্রকলা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ জোড়াসাঁকোর শিল্পীসাহচর্যে তৈরি হয়েছিল। এই পরিবারে অপেশাদার চিত্রচর্চার রেওয়াজ ছিল। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে জলরং ও তেলরং মাধ্যমে প্রতিকৃতি ও ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কনে পারদর্শী। তাঁর বাবা গুণেন্দ্রনাথ ও কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ) কলকাতা আর্ট কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৯–১৯২৫) অসংখ্য মুখচ্ছবি (পোর্ট্রেট) অঙ্কনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। দাদা গগনেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে (রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়) হরিনারায়ণ বসুর কাছে তেলরঙে ছবি আঁকতে দেখেছেন। মেজদাদা সমরেন্দ্রনাথ দিল্লিওয়ালার কাছে যে হাতির দাঁতে ছবি আঁকতেন, তাও দেখেছেন ছোটোবেলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে। এ ছাড়া পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র অঙ্কন করতে আসা একাধিক ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীর চিত্রকর্ম, কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী যদুনাথ পালের মূর্তি রচনা, হিন্দুমেলায় প্রদর্শিত দিল্লির মিনিয়েচার চিত্র আশৈশব প্রত্যক্ষ করেছেন ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলার প্রতি আরো উৎসাহের কারণ হচ্ছে—তিনি তাঁর বাবার কক্ষে সজ্জিত দেখেছেন পাশ্চাত্য রীতির তৈলচিত্র, কুমুদিনী দেবীর ঘরে দেখেছেন জয়পুরী চিত্রকলা, কালীঘাট চিত্রকলা, সূচিশিল্প, কৃষ্ণনগরের পুতুল। *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় দেখেছেন চিত্র, পরিবারের বৈঠকখানায় দেখেছেন দেশ-বিদেশের সমসাময়িক বই ও সাময়িকপত্রের ছবি। কখনো উৎসাহিত হয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে আগ্রা দিল্লির পট (কালীঘাট লক্ষ্মৌ পটের মতো) উপহার পেয়ে। সুতরাং বলা যায়—অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার শিক্ষা তাঁর পারিবারিক পরিবেশ থেকেই পেয়েছিলেন।

শুধু চিত্রকলা নয়; সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথও ১৮৮০ সালের শেষ সময় থেকে বাড়ির বড়োদের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। এ সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে *এসরাজ* বাজাতেন। পারিবারিক সাময়িকপত্র *সাধনায়* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *স্বপ্নপ্রয়াণ* কবিতার ইলাস্ট্রেশন করেছেন। এই ইলাস্ট্রেশনের লিথোগ্রাফ করেছেন ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা। ১৮৯১ সালে *সাধনার* প্রথম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১২৯৮) স্বপ্নপ্রয়াণের ইলাস্ট্রেশন (অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত চিত্র) প্রকাশিত হলে পরিবারের জ্যেষ্ঠদের দৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথের ওপর পড়ে। বলা যায়, স্বপ্নপ্রয়াণের ইলাস্ট্রেশন দিয়েই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীজীবনের ক্যারিয়ার (Career) শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথের 'বধূ ও বিম্ববতী' কবিতার ইলাস্ট্রেশন করেন।

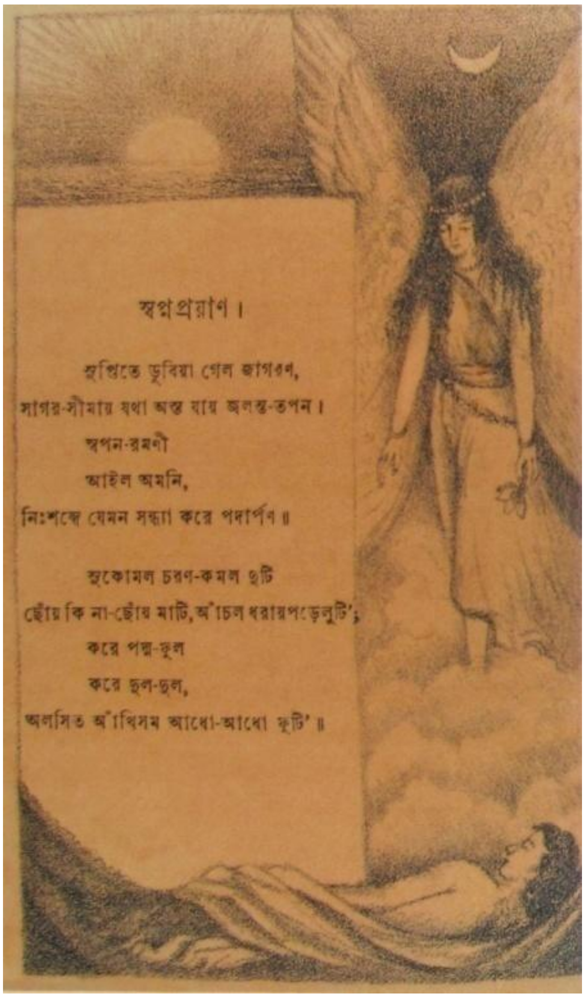

চিত্র ০১ : স্বপ্নপ্রয়াণ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কবিতার চিত্রায়ণ, ১৯৯১)

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ছবি আঁকার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী খুব উৎসাহ জোগাতেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রতি আসক্তি অনুভব করে কুমুদনাথ চৌধুরীর (স্যার আশুতোষ চৌধুরীর ভাই) সহায়তায় তৎকালীন কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ওলিন্ডো গিলার্ডির (Olindo Gilhardi) কাছে সাপ্তাহিক পাঠের মাধ্যমে ছবি আঁকা শেখার ব্যবস্থা করে দেন। ওয়েলেসলি স্কোয়ারে অবস্থিত গিলার্ডির বাড়িতে ১৮৯১ সালের শেষ থেকে ১৮৯২ সালের প্রথম দিকের ছয় মাস ড্রয়িং, তেলরং ও প্যাস্টেল চিত্র অনুশীলন করেছেন।[১০] ইতালিয়ান শিল্পী গিলার্ডি অবনীন্দ্রনাথকে যত্নের সাথে শেখাতেন। অবনীন্দ্রনাথও শিখেছেন তেলরঙের কাজ ও প্রতিকৃতি আঁকতে। তেলরঙে ইতালিয়ান বাঁধা গতের তুলি চালানো তাঁকে আনন্দ দিত না, তাই তিনি ছয় মাসের মধ্যেই গিলার্ডির কাছে শিক্ষা গ্রহণ শেষ করেন এবং অনুভব করেন ছবি আঁকার জন্য একটা স্টুডিয়ো দরকার। এ উপলব্ধি থেকে তিনি বাড়িতে ইউরোপীয় কেতায় স্টুডিয়ো দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য সমাপ্ত নাট্যকাব্য *চিত্রাঙ্গদা* ইলাস্ট্রেশন করতে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ৩২টি লিথোচিত্র নিয়ে *চিত্রাঙ্গদা* ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম সচিত্র বই। সেই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সচিত্র বইয়ের প্রথম ইলাস্ট্রেটর।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

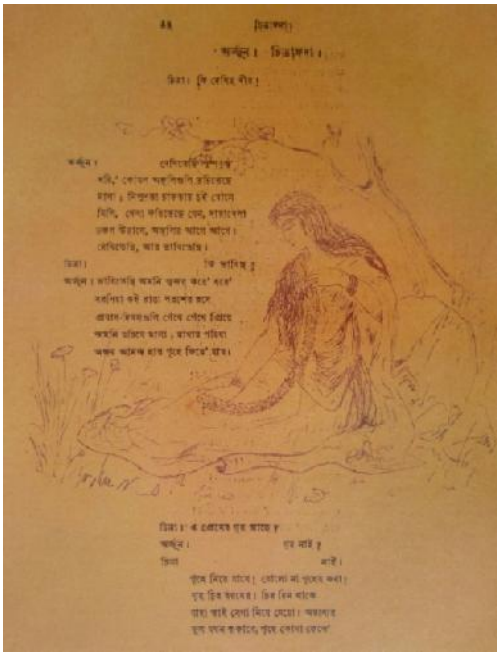

চিত্র ০২ : চিত্রাঙ্গদা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের চিত্রায়ণ)

অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিয়োতে ইলাস্ট্রেশন আর প্যাস্টেল ড্রয়িং চলত। যাঁরা স্টুডিয়োতে আসতেন তাঁদের প্রতিকৃতি প্যাস্টেলে আঁকতেন। অক্ষয় মজুমদার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তির প্রতিকৃতি প্যাস্টেলে এঁকে হাত পাকিয়েছেন। তৎকালীন স্বনামধন্য শিল্পী রবিবর্মাও এসেছিলেন তাঁর স্টুডিয়োতে। কাজ দেখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন।[১২]

স্টুডিয়োতে বসে প্যাস্টেলে দক্ষতা অর্জনের পর তৈলচিত্র (Oil Painting) ভালো করে শেখার ইচ্ছে হয়। তাই তিনি ১৮৯৩ সালে কলকাতায় আগত লন্ডনের South Kensington School-এর[১৩] শিক্ষক চার্লস এল পামারের (Charles Lewis Palmer) কাছে তৈলচিত্র অনুশীলন করেন। *জোড়াসাঁকোর ধারে* বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মডেল দেখে মানুষ আঁকতে শিখেছেন। তবে ন্যুড (Nude) অর্থাৎ নগ্নচিত্র আঁকতে ইতস্তত করতেন। তৈলচিত্রের পাশ্চাত্য করণ-কৌশল অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করেছেন। পামার তাঁর দক্ষতা দেখে পরবর্তী ধাপ হিসেবে অ্যানাটমি স্টাডি করতে *মড়ার মাথা* আঁকতে দিয়েছিলেন। মনের বিরুদ্ধে ও পামারের অনঢ় আদেশে *মড়ার মাথা* আঁকতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের জ্বর হয়েছিল। এই ঘটনার রেশ ধরে অবনীন্দ্রনাথের মা পামারের কাছে ছবি আঁকা শেখা বন্ধ করে দিয়ে বাসায় মাস্টার হ্যামারগ্রেন (Hamergren)-এর কাছে ফ্রেঞ্চ পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ পড়ায় অবনীন্দ্রনাথের মন বসত না। তিনি ফ্রেঞ্চ পড়ার খাতায় হ্যামারগ্রেনের স্কেচ করতেন।[১৪] রামন শিবকুমারের হিসাব অনুসারে ১৮৯৩ সালে অবনীন্দ্রনাথ পামারের কাছে তেলরং শিক্ষার তালিম নিয়ে ১৮৯৪ সালে ফ্রেঞ্চ শিক্ষকের কাছে ফ্রেঞ্চ শেখা শুরু করেন। পুনরায় ১৮৯৪ সালের প্রথম দিকে জলরং শেখার জন্য তাঁর কাছেই যান এবং ১৮৯৪ সালের শেষ অথবা ১৮৯৫ সালের প্রথম পর্যন্ত তালিম নেন।[১৫] এরপর অবনীন্দ্রনাথ পামারের অনুমতি নিয়ে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকলার নির্দিষ্ট পথ খোঁজার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম উৎসাহদাতা এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন অন্যতম মন্ত্রণাদাতা, সহযোগী ও সমর্থক। তৎকালীন বিদগ্ধ লেখকদের নিকট উপেক্ষিত শিশুসাহিত্য লিখতে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন। মুখে মুখে গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'তুমি লেখো-না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।'[১৬] অবনীন্দ্রনাথ উৎসাহ পেয়ে লেখেন *শকুন্তলা।* শকুন্তলা মহাকবি কালিদাস রচিত *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*-এর কাহিনি কিন্তু তিনি লিখেছেন শিশুদের উপযোগী করে। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার অনেক প্রশংসা করেন। অবনীন্দ্রনাথের লেখালেখির ভীরুতা কমে যায়। *শকুন্তলা* ঠাকুর পরিবার কর্তৃক প্রকাশিত *বাল্যগ্রন্থাবলী* পর্যায়ের প্রথম বই হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। এরপর ১৮৯৬ সালে *বাল্যগ্রন্থাবলী* পর্যায়ের তৃতীয় বই হিসেবে অবনীন্দ্রনাথের *ক্ষীরের পুতুল* প্রকাশিত হয়। *ক্ষীরের পুতুল* বহুল প্রচলিত অতি পরিচিত রূপকথা। তিনি এই রূপকথার কাহিনি অভিন্ন রেখে বলার ভঙ্গিতে স্বকীয়তা এনেছেন।

তিন

পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় ছবি এঁকে অবনীন্দ্রনাথের মন ভরছিল না। ঔপনিবেশিক শিল্পশিক্ষার আরোপিত পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতিকে ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পশিক্ষার ও চর্চার একমাত্র পথ বলে মেনে নিতে পারছিলেন না অবনীন্দ্রনাথ। তিনি ভারতীয় তথা প্রাচ্য চিত্রকলায় আধুনিকতার ক্ষেত্রে স্বদেশ চেতনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ি জুড়েও স্বদেশি হাওয়া বইছিল ১৮৯৫ সালে *খামখেয়ালী* সভায় রবীন্দ্রনাথের *ক্ষুধিত পাষাণ* পাঠ হবার পর থেকে। লাইব্রেরি ঘর থেকে বিলিতি ছবি আর আসবাবপত্র সরিয়ে দেশীয় জিনিসপত্রে সাজিয়েছিলেন কর্তাব্যক্তিরা।[১৭] অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটো দাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছোটো ভাই) ছবি খোঁজ করতে গিয়ে ফ্রান্সের অ্যামেচার আর্টিস্ট মিসেস মার্টিনডেল (Martindale)-এর নিকট থেকে উপহার পেলেন তাঁর ইলুমিনেট করা এক সেট *আইরিশ মেলডি*র (Irish Melodies illuminated) ছবি। অর্থাৎ আইরিশ কবিতার চারদিকে নকশা করা দশ-বারো খানা বড়ো ছবি। একই সময় তাঁর ভগিনীপতি শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের (বিনয়িনী দেবীর স্বামী) কাছ থেকে পেয়েছিলেন দিল্লি কলমের পার্শিয়ান ছবির একখানা অ্যালবাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উপহার দেন রবিবর্মার চিত্রের কতগুলো আলোকচিত্র।[১৮] রবিবর্মার ছবি তখন ভারতীয় চিত্রের আদর্শ। পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ইলুমিনেটেড ছবি ও ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রকলার নিদর্শনের (দিল্লি কলমের ছবি) মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ মিল খুঁজে পেলেন। নিজের মনের সাথে হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে, রাজা রবিবর্মার পাশ্চাত্য রীতিতে দেশীয় বিষয়চিত্রের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে, ভারতশিল্পের সঠিক পথ কী হওয়া উচিত তা স্থির করলেন। সাথে যুক্ত হলো রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। তিনি এও বলে দিলেন—চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে পরিণত রূপ দিতে হবে।[১৯] অ্যালবাম প্রাপ্তির অনুভূতি, রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ, নিজের মনোবল একসাথে মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের সাহিত্য *বৈষ্ণব পদাবলী* পাঠ করে গোবিন্দদাসের কবিতা অবলম্বনে প্রথম দেশি ধরনের ছবি আঁকলেন *শুক্লাভিসার*। প্রকরণ ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা

Dhaka University Institutional Repository

ও আঙ্গিক সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে এই ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সেজন্য ছবিতে মোগল মিনিয়েচার টেকনিকে সোনা-রুপার ব্যবহার শিখলেন পবন মিস্ত্রির কাছে। এরপর শুরু করেন মধ্যযুগের সাহিত্যের রূপায়ণে চিত্র আঁকা। এক বছরে *কৃষ্ণলীলা* সিরিজের ২০টি চিত্র আঁকলেন। এসব ছবিতে বৈষ্ণব পদাবলীর পদ্যাংশ জুড়ে দিতেন বাংলা হরফে। ছবির পরিচয়দানে এই বাংলা হরফ লিখতেন পার্শিয়ান কায়দায়।

চিত্র ০৩ : অভিসার, জলরং, ১৮৯৭

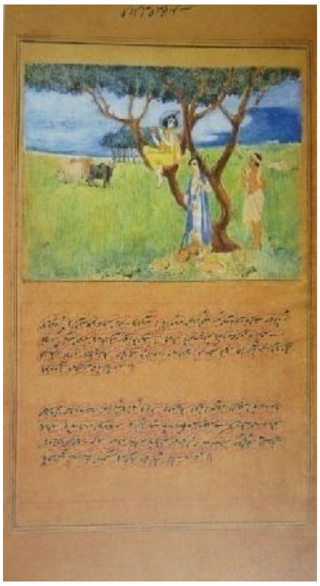

চিত্র ০৪ : রাখালকৃষ্ণ—গোচারণ, জলরং
২১.৫৯ × ১২.৭ সেমি, ১৮৯৭

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *জোড়াসাঁকোর ধারে* বইয়ে বলেছেন, কৃষ্ণলীলা সিরিজের ২০ খানা চিত্র এঁকেছেন এক বছরে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী কৃষ্ণলীলা সিরিজচিত্রের অঙ্কন সময়কাল ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ সাল।[২০] মূলত তারিখবিহীন অবনীন্দ্র চিত্রের সময়কাল নির্ণয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও ইতিহাসের ওপর নির্ভর করতে হয়।

এই চিত্রগুলোতে তাঁর সদ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ইউরোপীয় চিত্রবিদ্যার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষ্ণলীলা আবহমান ভারতীয় চিত্রকলায় বহু ব্যবহৃত বিষয়চিত্র। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের হাতে এই সিরিজচিত্রে ঠিক পুরনো আমলের প্রকাশরীতি অনুসৃত হয়নি। পশ্চিমি আঙ্গিকে অর্জিত দক্ষতা এবং পশ্চিমি মিনিয়েচার চিত্রের প্রভাবে এই সিরিজের ছবিতে এমন অভিনব প্রকাশভঙ্গি ঘটেছে, যাকে রাজপুত বা কাংড়া কলমের অনুবর্তন বলা যায় না। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতে :

> রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে অতীতের পরম্পরা অপেক্ষা আধুনিক মনের প্রকাশ হওয়ার কারণেই এই রচনা থেকেই ভারতীয় শিল্পের সূচনা এবং এই দিক দিয়েই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য। রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেক্ষা চিত্র-নির্মাণের তাগিদ যে প্রধান তা উক্ত ছবিগুলির সাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে। পৌরাণিক বিষয়-আশ্রিত হলেও ছবিগুলিতে মানবীয় চেতনা প্রকাশিত হয়েছে নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে। এই

Dhaka University Institutional Repository

ছবিগুলিতে নাটকীয় পরিবেশের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের বৈশিষ্ট্য এবং এই নাটকীয় উপাদান তাঁর পরবর্তী সকল রচনার একটি বিশেষ লক্ষণ।[২১]

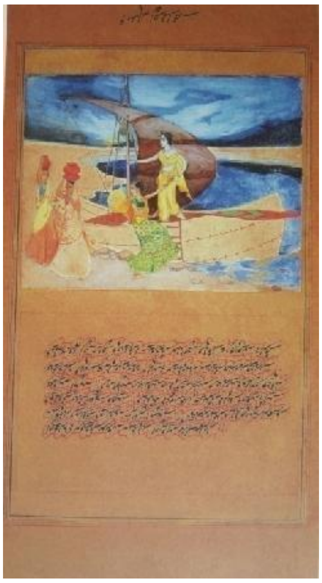

চিত্র ০৫ : মাঝিরূপে কৃষ্ণ—নৌ-বিহার, জলরং
২১.৫৯ × ১২.৭ সেমি, ১৮৯৭

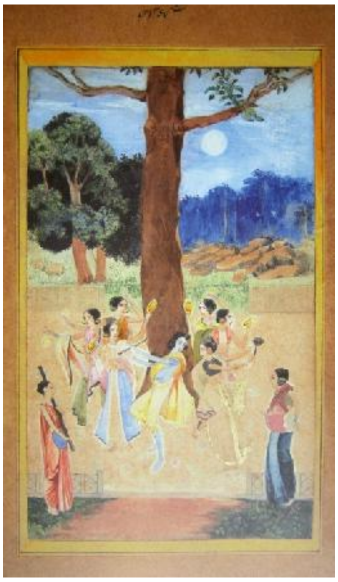

চিত্র ০৬ : চাঁদের আলোয় নৃত্য—রাস, জলরং
২০.৩২ × ১২.৭ সেমি, ১৮৯৭

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণলীলা (বিনোদবিহারী বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ) সিরিজচিত্রের মাধ্যমেই অবনীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র ঘরানার সূচনা করেন, যা প্রাচ্যচিত্রকলার পুনরাবিষ্কার কিংবা ভিত গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

চার

ভারতশিল্পের অনুরাগী আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল (E.B Havell)-এর সাথে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ১৮৯৭ সালে কৃষ্ণলীলা সিরিজচিত্র দেখানোর মাধ্যমে। হ্যাভেল শিশির ঘোষের নিকট অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকৃতির খোঁজ পান এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা সিরিজচিত্র দেখে বিমুগ্ধ হন। তিনি কৃষ্ণলীলা সিরিজচিত্রে নতুন চিত্ররীতির ইঙ্গিত পেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং তখন থেকেই হ্যাভেলের সাথে অবনীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বলা যায়, এই দুই মনীষীর যোগসূত্রে প্রাচ্যচিত্রকলা ভাবনায় মণিকাঞ্চনযোগ হয়েছিল।

ই.বি হ্যাভেল ছিলেন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি ১৮৯৬ সালের ৬ জুলাই যোগদান করেন। ১৮৫৪ সালে 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৮৯৬ সালে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলের রীতি-পদ্ধতি ছিল পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি-পদ্ধতির অনুরূপ। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তথা বাংলার চিত্রকলা ইউরোপীয় চিত্রকলার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হবে ও এর সাফল্য আসবে, এ ছিল উচ্চাভিলাষীদের বিশ্বাস। ফলে থেমে ছিল পরম্পরায় প্রবাহিত ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্য শিল্পচর্চা। হ্যাভেলের চেতনা ছিল ব্যতিক্রম। ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম আর্ট স্কুলের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন।

হ্যাভেলের ভারতশিল্প-প্রীতি ও চেতনা কলকাতা আর্ট স্কুলে যোগদানের পূর্ব থেকেই ছিল। মাদ্রাজের সরকারি আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ থাকাকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের হয়ে দক্ষিণের কয়েকটি প্রদেশে পরম্পরাগত শিল্পে বিশেষত কারুশিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁর এই বোধের জন্ম হয়েছিল। তিনি ভারতীয় কলাশিল্পের নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতীয়দের শিল্পশিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত তাদের নিজের দেশের শিল্পকলা। পাশ্চাত্যের অনুকরণ কখনোই শিল্পে মুক্তি আনবে না। তাই তিনি আর্ট স্কুলের শিক্ষা সংস্কারে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে কারুশিল্প ও চারুশিল্পে ভাগ করে কারুশিল্প বিভাগে ডিজাইন অনুশীলনে জোর দেন এবং একই বিভাগে প্রাচ্যশিল্প বা ওরিয়েন্টাল আর্ট শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[২২] তিনি শিক্ষার্থীদের ভারতীয় পরম্পরার পরিচয় করাতে ভারতীয় কারুশিল্পের কয়েকটি বিষয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। আবার তাঁদের দেশের স্টেইন গ্লাস, ডিজাইন, ফ্রেসকো প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[২৩] শুধু তা-ই নয়, কারু ও প্রাচ্যদেশীয় শিল্পশিক্ষার বিভাগে স্বল্প বেতন চালু এবং আর্ট গ্যালারির ইউরোপীয় ভাস্কর্য ও তৈলচিত্রের নিদর্শন বিক্রি করে ভারতীয় পরম্পরাগত কারু ও চারুশিল্পের নিদর্শন রেখেছিলেন। হ্যাভেলের এই উদ্যোগের প্রতিবাদ হিসেবে একদল ছাত্র স্কুল ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৭) *জুবিলি আর্ট একাডেমি*তে ভর্তি হয়েছিলেন। এ ঘটনায় কলকাতার সাধারণ মানুষ ও পত্রপত্রিকার তোপের মুখে পড়েছিলেন হ্যাভেল। দেশীয় প্রথায় শিক্ষা চালু করতে গিয়ে হ্যাভেল যে অবস্থার শিকার হয়েছিলেন সে সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'খাঁচা থেকে পাখীকে টেনে বার ক'রে বনস্পতির ডালে তাকে বসিয়ে দিতে গেলে সে যেমন মানুষটাকেই কামড় দিতে থাকে তেমনি ঘটনা ঘটল এ-দেশীয় শিল্পী ও হ্যাভেল সাহেবের মধ্যে—আর্ট-স্কুলের প্রথম শিক্ষাসংস্কার কালে।'[২৪]

১৮৯৭ সালের পর হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ একযোগে নতুন দৃষ্টি নিয়ে প্রাচ্যশিল্পের অনুশীলন করেছিলেন। হ্যাভেলের উৎসাহে অবনীন্দ্রনাথ মোগল শৈলীর সূক্ষ্ম অলংকরণ, রং ব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্য নিবিষ্টভাবে অনুশীলন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন শিল্পশৈলীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং এভাবেই প্রাচীন শিল্পীদের টেকনিক, দক্ষতা ও আদর্শের সংমিশ্রণে নিজের বিশিষ্ট চিত্রশৈলী উদ্ভাবনের পরীক্ষায় ধাপে ধাপে এগোচ্ছিলেন। বলা যায় হ্যাভেলের সাথে পরিচয় সূত্রেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তায় প্রাচ্যবাদ জোরালো হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ এই ভারতপ্রেমিক মনীষীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেছেন জ্যেষ্ঠের মতন। পক্ষান্তরে হ্যাভেলও তাঁকে ছোটো ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। সহকর্মী (Collaborator) বলে ডাকতেন, কখনও আদর করে বলতেন—*চেলা*।[২৫]

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত দুজনের মধ্যে অনেক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড চলমান ছিল। হ্যাভেলের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম রাজপুত ও মোগল চিত্রকলার মূল চিত্র দেখেন এবং ১৮৯৭–১৯০০ সালের মধ্যে অঙ্কিত চিত্রগুলোতে ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্রকলার রঙের উজ্জ্বলতা ও ডেকরেটিভ কম্পোজিশনের প্রভাব পড়ে।[২৬] তাঁর কাজ মিনিয়েচার চিত্রের আঙ্গিকের পরিমণ্ডলেই বিকশিত

হতে থাকলেও *বুদ্ধের জন্ম*, *বুদ্ধ ও সুজাতা*, *তাজের নির্মাণ*, *সাজাহানের মৃত্যু* ইত্যাদি ছবিতে আধুনিক ভারতীয় রীতির পরিচয় ফুটে ওঠে।

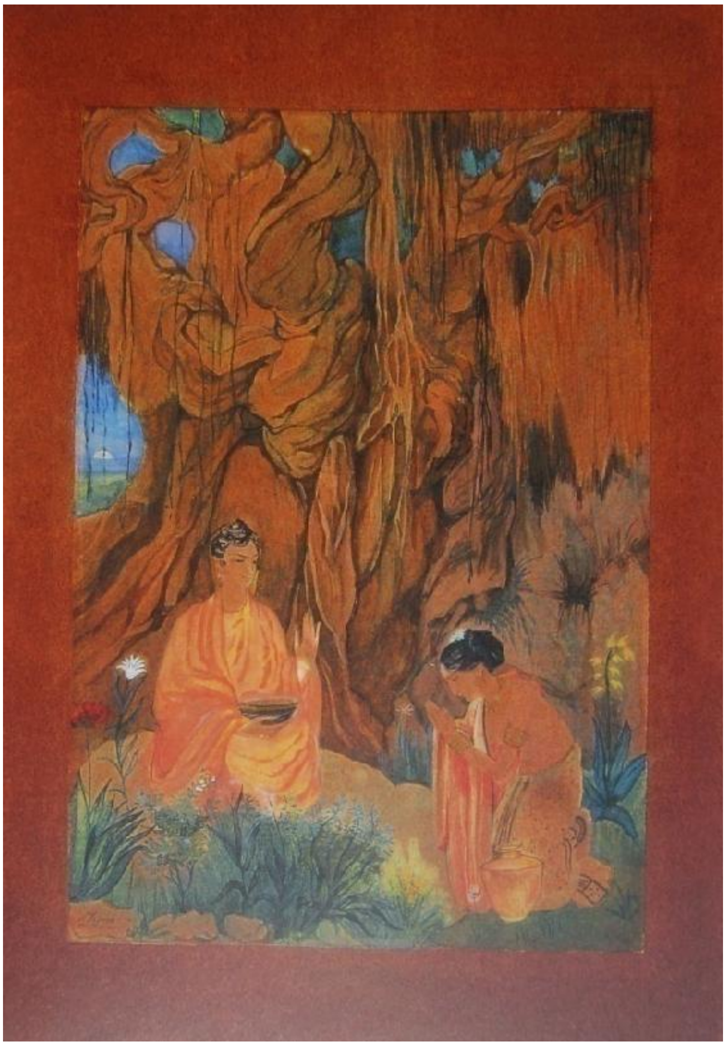

চিত্র ০৭ : বুদ্ধ ও সুজাতা, জলরং, ১৮.১ × ১২.৭ সেমি, ১৯০১

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের ছাত্র না হলেও হ্যাভেলের আমন্ত্রণে তাঁর *পদ্মাবতী* ও *বেতাল পঞ্চবিংশতি* সিরিজের কিছু ছবি ছাত্রদের ২য় চিত্র প্রদর্শনীতে ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রদর্শিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে জনসমক্ষে বিশেষ সম্মানে তুলে ধরাই ছিল হ্যাভেলের উদ্দেশ্য। এরপর তিনি কলকাতার Congress Industrial Exhibition (১৯০১–২)-এ অংশগ্রহণ করে স্বর্ণপদক (gold medal) লাভ করেন। হ্যাভেলের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ Delhi Durbar Exhibition (২০০২–০৩)-এ তাঁর অন্তিম শয্যায় শাহজাহান (Passing of Shahjahan), বাহাদুর শাহের গ্রেপ্তার (The Capture of Bahadur Sha), তাজের নির্মাণ (The Building of Taj) ছবিগুলো প্রদর্শনীর জন্য পাঠান। প্রদর্শনীটি সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বড়লাট লর্ড কার্জনের সময়ে *দিল্লিতে* অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের তিনটি ছবিই মোগল বিষয় নিয়ে আঁকা ছিল। কাঠের পাটার ওপর তেল রঙে আঁকা *অন্তিম শয্যায় সাজাহান* (Passing of Shahjahan) ছবিটি দ্বিতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ রৌপ্যপদক (silver medal) অর্জন করেন।[২৭] এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও পুরস্কার প্রাপ্তিতে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকৃতির খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে যায় এবং প্রদর্শিত চিত্রকলার মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

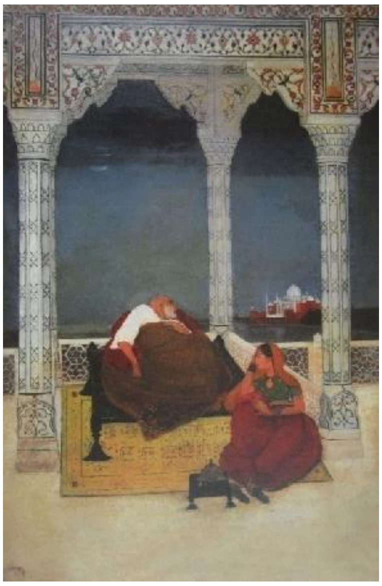

চিত্র ০৮ : অন্তিম শয্যায় সাজাহান, তেলরং
৩৫.৫৬ × ২৫.৪ সেমি, ১৯০২

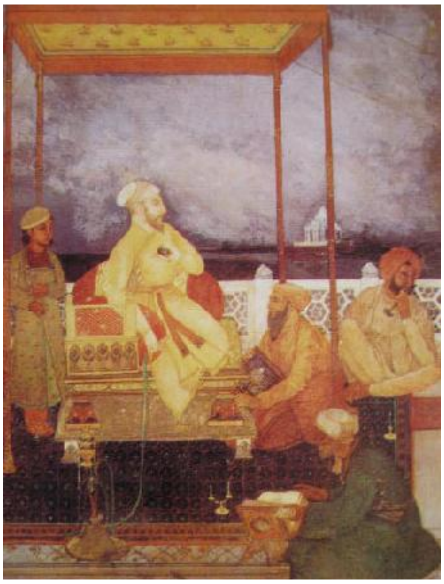

চিত্র ০৯ : তাজের নির্মাণ, অস্বচ্ছ জলরং, ১৯০১

১৯০২ সালে অবনীন্দ্রনাথের কন্যা তাপসীর (শোভা) প্লেগ রোগে মৃত্যু হয়। আদরের কন্যার মৃত্যুতে অবনীন্দ্রনাথ বেদনাকাতর ছিলেন। *অন্তিম শয্যায় সাজাহান* ছবিটি তাপসীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আঁকা। অবনীন্দ্রনাথ মেয়ের মৃত্যুর সব ব্যথা ঢেলে দিয়ে এই ছবিটি এঁকেছিলেন। তা ছাড়া মোগল মিনিয়েচার চিত্রের মধ্যে তিনি যে ভাবের অভাব লক্ষ করেছিলেন, এই ছবিতে তা পূরণ করে এঁকেছেন। ১৯০৪ সালে ছবিটি মাদ্রাজের চতুর্থ বার্ষিক কংগ্রেস Industrial Exhibition-এ প্রদর্শিত হলে তিনি স্বর্ণপদক পান।[২৮] অবনীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠার জন্য হ্যাভেল প্রচারকার্য চালিয়েছেন যথাসাধ্য। তিনি এক বছরের ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ডে অবস্থান করার সময় ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পত্রিকা *The Studio*-তে ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে *Some Notes on Indian Pictorial Art* শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতির গুণগান। প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের ছয়টি ছবি মুদ্রিত হয়। ফলে অবনীন্দ্রনাথের পরিচিতি ও জয়মাল্য পাশ্চাত্যের শিল্পরসিকদের মন জয় করতে সমর্থ হয়।

পাঁচ

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশ এবং তাঁর প্রবর্তিত চিত্ররীতির বিবর্তনে বিশ শতকের সূচনালগ্নের দুটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। একটি বাংলার স্বদেশি আন্দোলন; অন্যটি জাপানি পরম্পরাগত চিত্রকলার মহান প্রবক্তা কাকুজো ওকাকুরা তেন্‌শিন (Kakuzo Okakura Ten-Shin, ১৮৬৩–১৯১৩)-এর সংস্পর্শ। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[২৯] বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে কাকুজো ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর সাথে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ১৯০২ সালে। তখন তেন্‌শিনের বয়স ৩৯, অবনীন্দ্রনাথের বয়স ৩১। তেন্‌শিনের কাজের ক্ষেত্র শিল্প জগতের। স্বদেশে তাঁর পরিচয় ছিল জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির শ্রেয়ত্বের উদ্গাতা হিসেবে।[৩০] পশ্চিমি প্রভাবাক্রান্ত জাপানের পরম্পরাগত চিত্রকলাকে সংরক্ষিত করে

Dhaka University Institutional Repository

ওকাকুরা ভারতে এসেছিলেন *Asia is one* অর্থাৎ এশিয়ার আত্মিক স্বরূপ অভিন্ন—এই মন্ত্র প্রচার করতে। ওকাকুরা কলকাতায় এসে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাড়িতে বাস করেন এবং অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার গভীর আকর্ষণে দক্ষিণের বারান্দায় নিয়মিত আড্ডা দিতেন। তিনি এসেছিলেন এশিয়ার জাতিগুলোর মধ্যে মৈত্রী-সূত্রের অনুসন্ধানে ও স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে। ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার স্বদেশি ঘরানায় মুগ্ধ হয়ে জাপানের চিত্রকলার যোগসাধনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়ে ১৯০৩ সালে বিজুৎসু গাক্কোর প্রথম স্নাতক করা তাঁর ছাত্র ইয়োকোইয়ামা তাইকান (১৮৬৮–১৯৫৮) এবং হিশিদা শুনসোকে (১৮৭৪–১৯১১) ভারতে পাঠান। তাইকান ও হিশিদা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে থেকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে জাপানি চিত্রকলার করণ-কৌশল বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। চীন-জাপানের ওয়াশ টেকনিক আয়ত্তের মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজস্ব ওয়াশ পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। জাপানি শিল্পীরাও শিখেছেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। এ প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘এঁদের এখানে আসবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রেশমী কাপড়ের পটে জাপানী আঙ্গিকে ভারতীয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ দেব-দেবীর চিত্র ও এদেশের দৃশ্যাবলীর অঙ্কন। অবনীবাবু এঁদের পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তির রহস্য ও রূপ ইত্যাদি দিতেন বুঝিয়ে। তার পরে তাঁরা তার রূপদান করতেন।’[৩১]

পরিতোষ সেন জানিয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথ এই শিল্পীদ্বয়ের কাছে জাপানি তুলির টানের জাদুকরি কায়দা-কানুন (ক্যালিগ্রাফি), ওয়াশ দিতে চ্যাপটা তুলির ব্যবহার শিখে চিত্রে একদিকে রহস্যময়তা, আরেকদিকে নানা ধরনের মেজাজ এবং রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছিলেন।[৩২] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন, তিনি জাপানি শিল্পীদের মোগল ছবির নানা টেকনিক শেখাতেন, আর জাপানি শিল্পীদের বিশেষত তাইকান-এর কাছে শিখেছেন—ধীরে ধীরে তুলি চালানোর কৌশল। এ ছাড়া ছবিসুদ্ধ কাগজ জলে ডুবিয়ে ছবিতে নতুন এফেক্ট (effect) আবিষ্কার ও নতুন ওয়াশ পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন জাপানি শিল্পীদের ওয়াশ অনুপ্রেরণায়।[৩৩] তাইকানের সাহচর্যে তিনি শিখেছেন, ছবি আঁকা অনেকটা পূজার মতো, ধ্যানের মতো। কাজের পরিবেশে পরিচ্ছন্নতা রাখতে হয়। আবেগ-উদ্দীপনা সংহত করে ধ্যানদৃষ্টিতে সামান্য রঙে বর্ণাঢ্যতা স্ফুটন করতে হয়, ছবিতে শূন্য অংশকে মর্যাদা দিতে হয়। চীনে অক্ষর খোদাইকৃত সিল ওকাকুরা অবনীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ জাপানি কায়দায় ছবিতে নামাঙ্কিত সিল ব্যবহার করেছেন, যা জাপানি প্রভাবের প্রকাশ।[৩৪]

জাপানের কলারসিক ওকাকুরার কর্মপ্রয়াস ও প্রভাবে Oriental সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল, যার মূল কথা Oriental একটা স্বতন্ত্র সত্তা যা চীন-জাপান, আরবদেশ ও ভারতবর্ষের ভেতরে বয়ে চলেছে। এরা যদিও বহু কিন্তু এক। Orient is one। এ প্রসঙ্গে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় ওকাকুরার বিখ্যাত গ্রন্থ *The Ideals of the East*, যার প্রথম বাক্য Asia is one।

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায় ওকাকুরার প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা গোটা প্রাচ্য ঐতিহ্যের ব্যাপ্তিতে বিরাজমান ছিল। ফলে কলাশিল্পের আন্দোলন ভারতের গণ্ডি ছড়িয়ে প্রাচ্য নামধারণ করেছিল। তাঁদের শিল্পদর্শনের ভিত্তিতত্ত্ব সত্যজিৎ চৌধুরী বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> শিল্পীকে, বিশেষত প্রাচ্যের একালের শিল্পীকে বর্তমানের কাছে দায়বদ্ধ থেকেও নিজস্ব ঐতিহ্যের মর্ম উপলব্ধির জন্য শিল্পের স্বদেশের ভেতর জগতে প্রবেশ করতে হবে। উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা এবং ব্রতপার্বণে ধর্মে কর্মে জড়ানো লৌকিক শিল্পের মর্ম বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত, চোখ মেলে দেখতে হবে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনের প্রাণিত বৈচিত্র্য। প্রকৃতিই রূপের গড়ন বর্ণের বৈভব যোগায় নিরন্তর। শিল্পীর চেতনা সতেজ এবং সক্রিয় থাকবে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে যোগে। . . . তৃতীয়ত, অবনীন্দ্রনাথদের নন্দন ভাবনায় গুরুত্ব পেল শিল্পীর স্বাধীনতার তত্ত্ব। কোনো নীতি কোনো ধর্মতত্ত্ব বা মতবাদ কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিল্পীর হাত সর্বদাই শুদ্ধ। শাস্ত্রীয় বিচারে নয়, নান্দনিক বিচারে।[৩৫]

ভারতীয় সংস্কৃতির সাহিত্য ও কৃষ্টিতে স্বদেশ চেতনা ১৯ শতকের মধ্যভাগ পরবর্তী সময় থেকে শুরু হয়েছিল। চিত্রকলায় এই সচেতনতা আসে ১৯ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে। বিশেষত শিল্পে জাতীয়তাবাদ চেতনা জোরালো হয়েছিল ১৯০৫ সালে কার্জনকৃত বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে। এর পূর্বে শিল্পের বিষয়, মাধ্যম, শৈলী প্রক্রিয়ায় *ভারতীয়ত্ব কী*, এ জাতীয় প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৩৬] বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সমস্ত বাংলাকে বিপুলভাবে প্রতিবাদী করে তুলেছিলো। স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনতা অর্জন ও ব্রিটিশকে বিতাড়িত করার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি স্বদেশ চেতনার জোয়ার ছিল। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের *ভারতমাতা* চিত্রটি অনেক সাড়া জাগিয়েছে। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের তথ্যানুসারে অবনীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে *বঙ্গমাতা* ছবিটি এঁকেছিলেন। ১৯০৫ সালে সিস্টার নিবেদিতার নামকরণে *বঙ্গমাতা*, *ভারতমাতা* হয় এবং চিত্রটি স্বদেশি পতাকাতে ব্যবহৃত হয়।[৩৭] অবনীন্দ্র-কন্যা উমা দেবী (১৮৯২–১৯৭৮) তাঁর *বাবার কথা* বইয়ে বলেছেন, স্বদেশি যুগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি সংগীত লিখতেন, অবনীন্দ্রনাথ সেই গানকে ছবিতে রূপ দিতেন। রবীন্দ্রনাথের "আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি / তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী" গানের বর্ণ ব্যঞ্জনায় অঙ্কিত বঙ্গমাতা ছবি।[৩৮]

চিত্র ১০ : ভারতমাতা, জলরং, ২৬.৬৭ × ১৫.২৪ সেমি, ১৯০৫

১৯০৬ সালে নিবেদিতা *প্রবাসী* পত্রিকায় (১৩১৩ ভাদ্র সংখ্যা) *ভারতমাতা* চিত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন, 'ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে—ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।'[৩৯]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রাক-মুহূর্তে জন্ম হয় *বঙ্গীয় কলা-সংসদ*। এই সংগঠনের অগ্রণী উদ্যোক্তা অবনীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন আর্ট স্কুল ও আর্ট স্টুডিয়োর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১৯০৫ সালের ১০ জুন অবনীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলা সংসদ গঠনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। আরো দুটি সভার পরে সভাপতি নির্বাচিত হন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, সম্পাদক হন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৪০] বাঙালি শিল্পীদের সংঘবদ্ধ করা এবং শিল্পানুশীলনে তাঁদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল। কার্যালয় ছিল অবনীন্দ্রনাথের গৃহে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষের পদে যোগদান করলে সভাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[৪১]

পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চা ও তাঁর অনুসারীদের স্বদেশি ঘরানার শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বদেশি আন্দোলন বিরাট ভূমিকা রেখেছে। বলা যায় স্বদেশি আন্দোলনের যোগসূত্র থেকে শিল্প আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ।

ছয়

হ্যাভেলের উদ্যোগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ (Vice Principal) পদে যোগদান করেন। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলে যোগদানে তৎকালীন বাঙালিবাবু সমাজ ও নব্য-ভারতীয় শিল্পধারা প্রতিষ্ঠায় যে ঘটনা ঘটেছিল সে প্রসঙ্গে আবুল মনসুর-এর অভিমত স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বলেছেন :

> হ্যাভেল যখন বাঙালি ভদ্রসন্তান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষের পদ গ্রহণে সম্মত করতে সক্ষম হলেন, তখন একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। প্রথমত, অবনীন্দ্রনাথের যোগদানের মাধ্যমে আর্ট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি বাঙালিবাবু সমাজের তাচ্ছিল্য দূরীভূত হয়, দ্বিতীয়ত, হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে অজন্তা, মুঘল ইত্যাদি ঐতিহ্যিক শিল্পের প্রতি আগ্রহী করে একটি নব্যভারতীয় শিল্পধারা রচনায় অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন।[৪২]

আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র নন্দলাল বসু (১৮৮৩–১৯৬৬) এবং পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দুই পাশে দুইজন ছাত্র নিয়ে গুরুগৃহের আদলে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই ছবি আঁকতেন। এই গুরুশিষ্য পদ্ধতিতে শুরু হয় অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষকতা। স্কুলে প্রতিদিন রামায়ণ, মহাভারত পড়ে শোনাতেন রজনীকান্ত পণ্ডিত। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে শিষ্যরা ছবি আঁকতেন। অবনীন্দ্রনাথ শিষ্যদের ছবিতে ওয়াশ দিয়ে ছবির ভাবমূর্তি এনে দিতেন। কখনো একটু রঙের টাচ্ দিতেন।

আর্ট স্কুলের চিত্রকলা চর্চার সূত্র ধরেই ভারত-শিল্প মানুষের দৃষ্টিতে আসে। এই ১৯০৫–০৬ সালকে নব্য-ভারতীয় শিল্প আন্দোলনের সূত্রপাত বলা যায়। কারণ এই সময় থেকেই অবনীন্দ্র অনুসারীরা তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

ভাবধারায় চিত্র রচনা শুরু করেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে কৃষ্ণ ভেঙ্কটাপ্পা (১৮৮৭–১৯৬৫), অসিতকুমার হালদার (১৮৯০–১৯৬৪), হাকিম মহম্মদ, শৈলেন্দ্রনাথ দে (১৮৯১–১৯৭২), ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১–১৯৭৫) ও সামিউদ্দিন তাঁর ছাত্র হিসেবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৪৩] লক্ষণীয়, এই সকল ছাত্ররা শুধু বাংলা নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের নিয়ে গুরুমুখী শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ও রুটিন অনুযায়ী পাঠ দিতেন না। নিজেদের প্রবণতা অনুসারে ছাত্ররা স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবে এবং বিধিনিষেধের চাপে স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হবে না—এমন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শিল্প আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন স্কুলে। আসলে এটাই ছিল সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার যথোপযুক্ত সূতিকাগৃহ। দেশীয় মানসিকতার সঙ্গে যোগ ঘটাবার জন্য ছাত্রদের তিনি দেশের লোকসংস্কৃতি, পুরাণ-ইতিহাস, মহাকাব্যের আখ্যান ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে উপদেশ দিতেন। মাঝে মাঝে নাটক দেখতে বলতেন। ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও ভাবকল্পনা বিকাশে অবনীন্দ্রনাথের এই শিক্ষণ পদ্ধতি—শিল্প-শিক্ষা পদ্ধতির সর্বোত্তম পন্থা হিসেবেই মূল্যায়ন করা যায়। বাংলার প্রাচ্যশিল্প চর্চা তথা ভারতবর্ষে নবশিল্প আন্দোলন অবনীন্দ্রনাথের প্রয়াসেই ঘটেছিল।

হ্যাভেলের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ইউরোপীয় শিল্পরসিকরা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রকর্ম দেখতেন সরকারি আর্ট স্কুলে। অবনীন্দ্রনাথের কাজে মুগ্ধ হয়ে এই বিদেশি শিল্পরসিকদের সমন্বয়ে ১৯০৭ সালে গঠিত হয়েছিল *ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট*। প্রতিষ্ঠার পর সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন কমান্ডার ইন-চিফ আল কিচেনার। সহসভাপতি হয়েছিলেন স্যার রবার্ট ফুলটন। যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিনক্লেয়ার অ্যান্ড মারে কম্পানির সিনিয়র পার্টনার নর্মান ব্লান্ট। এ ছাড়া সোসাইটির সাথে দেশি সমঝদার ও কলাপ্রেমী লোকজন জড়িত ছিলেন।

নব্য-বঙ্গীয় রীতির প্রচার প্রচারণা এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও বিকাশের পথ তৈরি করা ছিল সোসাইটির মূল লক্ষ্য। এজন্য বাৎসরিক প্রদর্শনী, প্রাচ্যদেশীয় শিল্পের শিক্ষামূলক বক্তৃতার আয়োজন, দেশ-বিদেশের নানারকম কলাবিষয়ক পত্রিকা কিনে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ, নব্য-বঙ্গীয় রীতির উৎকৃষ্ট ছবি জাপান থেকে কাঠের ব্লকে প্রতিলিপি করে আনা এবং প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এই রীতির চিত্রকর্ম প্রকাশ ইত্যাদি বহুমুখী কর্মকাণ্ড সোসাইটি গঠনের পর পরিচালিত হয়ে আসছিল।

সাত

আর্ট স্কুল ও সোসাইটির কাজকর্মের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের শিল্পসাধনা অব্যাহত রেখেছেন। ছবি আঁকার পাশাপাশি সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ববিষয়ক লেখালেখি চালিয়েছেন। তিনি ১৯০৬–০৯ সালের মধ্যে তাঁর *ওমর খৈয়াম* সিরিজ-চিত্র এঁকেছেন। ১৯০৯ সালে হিতবাদী লাইব্রেরি কর্তৃক *রাজকাহিনী* ১ম ভাগ ও *ভারতশিল্প* প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটা সাহিত্যবিষয়ক ও দ্বিতীয়টা শিল্পবিষয়ক বই। *ভারতশিল্প* মূলত ছাত্রদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণের গোছাল রূপ। মস্তিষ্ক বিকৃতিজনিত কারণে হ্যাভেল অসুস্থ হলে ১৯০৬

Dhaka University Institutional Repository

সালের জানুয়ারি মাসে হ্যাভেলের জায়গায় অবনীন্দ্রনাথ চার বছর কার্যকরী অধ্যক্ষ (Officiating Principal) হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের জায়গায় উপাধ্যক্ষ হয়েছিলেন হরিনারায়ণ বসু।

হ্যাভেলের পর স্থপতি পার্সি ব্রাউন (Percy Brown) লাহোরের মোয়া স্কুল অব আর্ট থেকে কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে। তখন অবনীন্দ্রনাথ অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদ থেকে পুনরায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। হ্যাভেলের অধ্যক্ষতাকালে এবং নিজের অস্থায়ী অধ্যক্ষতা সময়ে স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি নিজস্ব গুরুশিষ্য ঘরানায় পরিচালনা করলেও পার্সি ব্রাউন অবনীন্দ্র শিক্ষানীতিকে স্কুলের শৃঙ্খলা পরিপন্থী মনে করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে না বেঁধে ইচ্ছাসুখে কাজ করার যে সুযোগ দিতেন পার্সি ব্রাউন তা পছন্দ করতেন না। ফলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে পার্সি ব্রাউনের সাথে অবনীন্দ্রনাথের তিক্ততা বাড়তে থাকে।

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে অবন প্রবর্তিত চিত্ররীতির প্রদর্শনীর আয়োজন শুরু হয়। তার ধারাবাহিকতায় ১৯০৯ সালে সোসাইটির দ্বিতীয় প্রদর্শনী সিমলাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের *ওমর খৈয়াম* সিরিজের কয়েকটি চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ১৯১০ সালে ইংল্যান্ডের ললিতকলা সাময়িক *দ্যা স্টুডিয়োর* উদ্যোগে *ওমর খৈয়াম* সিরিজের একটি Portfolio প্রকাশিত হয়। *ওমর খৈয়াম* সিরিজ-চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। মোগল চিত্রের আঙ্গিকগত উপাদান নিজের মতো ব্যবহার করে এবং ইউরোপের জলরঙের আঙ্গিক সমন্বয় করে দক্ষতা আর স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। *ওমর খৈয়াম* সিরিজ-চিত্রে তাঁর স্বকীয়তার সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ করি। এ প্রসঙ্গে রমন শিবকুমারের মন্তব্য স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, 'They are his first mature works; in them, the possibilities of the wash technique are explored to full, and in them medium and sensibility coalesce to give shape to a personal style with an unmistakable tenor'.[৪৪]

চিত্র ১১ : রুবাইয়াৎ অব ওমর খৈয়াম, ভার্স-২, জলরং
২৩.৫ × ১৬ সেমি, ১৯০৭–০৯

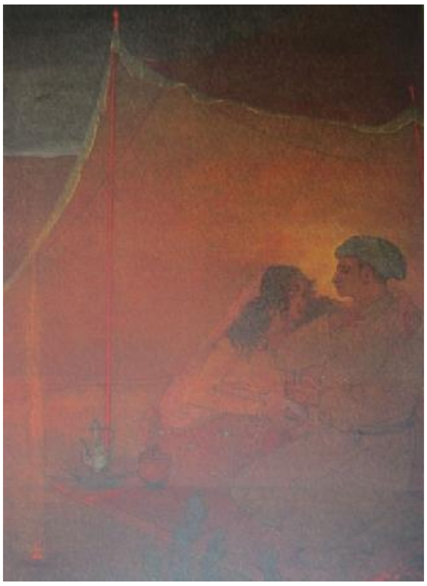

চিত্র ১২ : রুবাইয়াৎ অব ওমর খৈয়াম, ভার্স-৩৮, জলরং
১৮ × ১৩.৫ সেমি, ১৯০৭–০৯

Dhaka University Institutional Repository

লন্ডনের *ইন্ডিয়া সোসাইটি*র উদ্যোগে[৪৫] শ্রীমতি সি.জে হেরিংহ্যাম (Mrs. C.J Herirngham)-এর নেতৃত্বে ভারতের অজন্তা গুহা চিত্রাবলির নকলের কাজ চলে ১৯০৯–১১ সাল পর্যন্ত। এই সময় হেরিংহ্যামের কাজে সহযোগিতা করার জন্য ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্র নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তকে নিজের খরচে পাঠিয়েছিলেন। ছাত্ররা অজন্তায় থাকাকালীন তাঁদের উৎসাহ দিতে জগদীশচন্দ্র বসু সস্ত্রীক সেখানে গিয়েছিলেন।[৪৬] স্বদেশ শিল্পের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মানোর জন্যই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের অজন্তায় পাঠিয়েছিলেন।

১৯০৯ সালে পাঁচ নম্বর বাড়ির স্থায়ী অতিথি হয়ে আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী ভারতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্য শিল্পকলার শুভাকাঙ্ক্ষী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর উৎসাহ ও সান্নিধ্য পেয়েছেন। ১৯১১ সালে সরকারি উদ্যোগে এবং ব্যয়ে *রূপম* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ও.সি গাঙ্গুলি ভারতীয় ঐতিহ্যের শিল্পরীতির প্রচারণা চালান। আনন্দ কুমারস্বামী Indian Heritage-এর মুখপাত্র হিসেবে দেশে-বিদেশে হিন্দু কৃষ্টি-কলার মাহাত্ম্য প্রচার করেন।[৪৭] শুধু কুমারস্বামীর সান্নিধ্য নয়, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সাথে রোদেনস্টাইনের পত্র-যোগাযোগ হতো। রোদেনস্টাইন ১৯১১ সালে লন্ডন থেকে বেনারস এসেছিলেন। সেখান থেকে অবনীন্দ্রনাথকে খুশি করতে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এসেছিলেন।[৪৮] রোদেনস্টাইন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য শিল্পবিষয়ক বইয়ের সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমে রোদেনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। পরবর্তীতে রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাণ্ডুলিপি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। যার বদৌলতে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বজয় করেছেন। অতএব এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়ের নেপথ্যে অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা অপরিসীম।

আট

১৯১১ সালে পার্সি ব্রাউনের সাথে অবনীন্দ্রনাথের সম্পর্কের তিক্ততা বাড়ে। অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল থেকে অব্যাহতি নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তিনি বাড়িতে বসে ক্লাস নিতে শুরু করেন এবং গ্রীষ্মে পুরী ভ্রমণে যান। পুরী ভ্রমণের অনুষঙ্গে তিনি অনেক নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন। এসব নিসর্গ চিত্রে জাপানি চিত্রের কলাকৌশল কাজে লাগিয়েছেন। অল্প রেখা ও শূন্য ক্ষেত্র ব্যবহার করে নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন।

চিত্র ১৩ : কোনারকের পথে, তুলি ও কালি
১৭.৭৮ × ১২.৭ সেমি, ১৯১১

চিত্র ১৪ : কোনারকের পথে, তুলি ও কালি
১৭.৭৮ × ১২.৭ সেমি, ১৯১১

মৃণাল ঘোষ অবনীন্দ্রনাথের পুরী সিরিজ চিত্রের মূল্যায়নে বলেছেন, ‘অল্প রেখার আভাসে অনেকটা শূন্য ক্ষেত্র ছেড়ে নিসর্গের বিরাট ব্যাপ্তিকে প্রকাশ করার অনবদ্য এক কৌশল পাই এই ছবিগুলিতে। . . . অনৈসর্গিক সৌন্দর্য রয়েছে আমাদের চারপাশের প্রকৃতিতে, যার প্রতি তাঁর আশৈশব আকর্ষণ, পরিণত বয়সে নিজস্ব আঙ্গিকে সেই অসীমের অনুভবকে তিনি সীমার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।’[৪৭]

১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথের মায়ের মৃত্যু হয়। ১৯১২ সালে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *বেঙ্গল অ্যাক্টরস* সিরিজ অঙ্কন করেন। এই সিরিজচিত্রের চরিত্র এসেছে উনিশ শতকের থিয়েটার ও অভিনয়ধর্মী শিল্পমাধ্যম থেকে। এখানে প্রণয়রত নট এবং নটী, আড়ষ্ট শিব, মেমসাহেব, দাম্ভিক রাজা প্রভৃতি চরিত্র ফুটে উঠেছে।

চিত্র ১৫ : রতি, ভালোবাসার দেবী, জলরং
২২.৮৬ × ১৫.২৪ সেমি, ১৯১২

চিত্র ১৬ : কামদেব, জলরং
২৭.৯৪ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১২

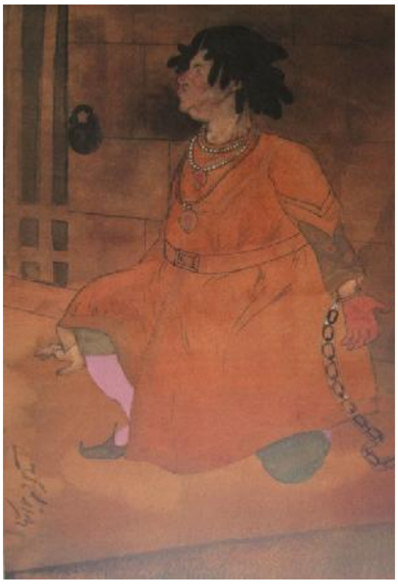

চিত্র ১৭ : প্রেমিক, জলরং, ২৭.৯৪ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১২

চিত্র ১৮ : রাজা, জলরং, ২৬.৬৭ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১২

অবনীন্দ্রনাথের মায়ের মৃত্যুর পর ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরি (King Edward V and Queen Mary) ভারতবর্ষ ভ্রমণে এসে কলকাতায় আর্ট গ্যালারি দেখতে আসেন। অবনীন্দ্রনাথের দায়িত্ব ছিল তাঁদের ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবার। এই দায়িত্ব পালনকালে রানি অবনীন্দ্রনাথের *তিষ্যরক্ষিতা* ছবি পছন্দ করে নিয়ে যান।[৫০] ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে অবনীন্দ্রনাথ এক বছরের ছুটি নেন। ছুটি চলাকালীন তিনি দক্ষিণের বারান্দায় ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন এবং দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর তত্ত্বাবধান করতেন।[৫১] এক বছরের ছুটি শেষ হলে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে পুনরায় যোগদান করেন। এ সময় পার্সি ব্রাউন ছুটিতে থাকার কারণে অবনীন্দ্রনাথ ১৯১৩-এর জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৫২] ছুটি শেষে পার্সি ব্রাউন আর্ট স্কুলে যোগদান করলে অবনীন্দ্রনাথ স্কুল থেকে পদত্যাগ করার প্রস্তুতি নেন।

চারুকলায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালের জুনে সি.আই.ই (C.I.E) খেতাব পান। বড়লার্ট লর্ড হার্ডিঞ্জ অবনীন্দ্রনাথকে সি.আই.ই (Companion of the Indian Empire) খেতাবদানে সম্মানিত করেন। তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড কারমাইকেল।[৫৩] কারমাইকেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের অনুশীলন কেন্দ্র ও দপ্তর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথ কারমাইকেলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। কারমাইকেল-পরবর্তী গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের সঙ্গেও হৃদ্যতা ছিল অবনীন্দ্রনাথের। এই সৌহার্দ্য সম্পর্কসূত্রেই ১৯১৯ সালে রোনাল্ডসের আমন্ত্রণে গভর্নমেন্ট হাউসে ইন্ডিয়ান সোসাইটির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং রোনাল্ডসে ইন্ডিয়ান সোসাইটির পুনর্গঠন ও আর্ট জার্নাল প্রকাশের জন্য আর্থিক মঞ্জুরি দেন।[৫৪]

অবনীন্দ্রনাথের *ভারতশিল্পে মূর্তি* ১৯১৩ সালে প্রবাসী (১৩২০ পৌষ ও মাঘ) সংখ্যায় *মূর্তি* প্রবন্ধ নামে প্রকাশিত হয়। সুকুমার রায় কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ *Some Notes on Indian Artistic Anatomy* ১৯১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং আঁদ্রে কার্পেলের ফরাসি অনুবাদে ১৯২১ সালে প্যারিস থেকে *Art et Anatomic Hindous* নামে প্রকাশিত হয়।[৫৫] তাঁর ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ প্রবন্ধাবলি ১৯১৪ সালে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট ১৯২১ সালে *Sadanga,* or *the six limbs of painting* শিরোনামে এ প্রবন্ধগুলো ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। ১৯২২ সালে ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ* শিরোনামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে।[৫৬] এ ছাড়া ১৯১৪ সালে সিস্টার নিবেদিতার *Myths of Hindus and Buddhists* গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের পাঁচটি ছবি ছাপা হয়। এই গ্রন্থে প্রাচ্যরীতির মোট বত্রিশটি ছবি অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়েছিল।

নয়

পার্সি ব্রাউনের সাথে অবনীন্দ্রনাথের চরম অসন্তোষ চললে তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদ থেকে ইস্তফা দেন। বিভিন্ন বইয়ের তথ্যানুযায়ী অবনীন্দ্রনাথ স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে ইস্তফা দেন।

শোভন সোম তাঁর *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত* বইয়ে এই তথ্য ভুল প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের চিঠির সূত্র ধরে। তাঁর মতে, অবনীন্দ্রনাথ চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন ১৯১৪ সালে।[৫৭] এই প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের চাকরি ছাড়ায় সময়কাল ১৯১৫ সালকেই যুক্তিযুক্ত বলে ধরে নেয়া হয়েছে। চাকরি ছাড়ার ইতিহাস হিসেবে প্রতিমা দেবী তাঁর *স্মৃতিচিত্রে* বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ মুসৌরী পাহাড় ভ্রমণে যাবার ছুটি চেয়েছিলেন। পার্সি ব্রাউন ছুটি দিতে রাজি না হওয়ায় অবনীন্দ্রনাথ রাগ করে ইস্তফা দেন।[৫৮]

অবনীন্দ্রনাথ চাকরি ছাড়লেও শিক্ষকতা ছাড়েননি। তিনি স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে *ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট* সংস্থায় শিক্ষকতা শুরু করেন। গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথের সহায়তায় সোসাইটির চারুকলা কেন্দ্র ও দপ্তর প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। জোড়াসাঁকোর ভবনে বিচিত্রা ক্লাব ও ১৯২০ সাল পর্যন্ত *ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট* সংস্থায় অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে শিল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫–১৯৭৯), সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯৪–১৯৭০), মুকুল দে (১৮৯৫–?), দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৮৯০–১৯৫৫), ওয়ারিয়ান, পুলিনবিহারী দত্ত, রূপকৃষ্ণ।[৫৯] বিশ এবং তিরিশের দশকে *ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট* সংস্থার তত্ত্বাবধানে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের গুরুশিষ্য পরম্পরায় শিল্পীরা হলেন ললিতমোহন সেন (১৮৯৮–১৯৫৪), চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০০–৩১), চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৪– ?), চিন্তামণি কর (১৯১৫– ?), প্রাণকৃষ্ণ পাল (১৯১৫– ?)।[৬০]

১৯১৪ সালে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার জন্য গৃহশিক্ষক হিসেবে মাসিক ষাট টাকা বেতনে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৬১] তখন থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পচর্চার উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা নেন এবং তার ফলশ্রুতিতে ১৯১৬ সালে ঠাকুরবাড়িতে *বিচিত্রা*র উদ্বোধন হয়। *বিচিত্রা* সভার সহযোগী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। *বিচিত্রা*র কার্যক্রম ছিল বিচিত্র। চারুকলা শিক্ষাদান, সাহিত্যচর্চা, নাটক অভিনয় প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হতো বিচিত্রায়। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন কর, কাশীনাথ দেবল, মুকুল দে প্রমুখ ব্যক্তি বিচিত্রার শিল্পশিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে জাপানি চিত্রশিল্পী কাম্পো আরাই সন (১৮৭৮–১৯৪৫) বিচিত্রায় জাপানি পদ্ধতিতে চিত্র আঁকা শিখিয়েছেন।[৬২] রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা অজিত চক্রবর্তী সাহিত্য পাঠের ক্লাস নিতেন। *বৈকুণ্ঠের খাতা*, *ঋণ-শোধ*, *ফাল্গুনী*, *ডাকঘর* প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে বিচিত্রায়। বিচিত্রা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯১৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এই স্বল্প সময়ের কার্যক্রমে বাংলার শিল্প ঋদ্ধ হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচিত্রায় শিল্পালোচনার বক্তৃতা দিতেন। তিনি ১৯১৭ সালে *ভারতের চিত্র-শিল্পের ধারা*, ১৯১৮ সালে *শিল্প ও শিল্পী* এবং *রূপ ও রেখা* শিরোনামে বক্তৃতা দিয়েছেন।

১৯১৭ সালে বিচিত্রায় অবনীন্দ্রনাথের *ফাল্গুনী* নাটক মঞ্চস্থ হয়। অবনীন্দ্রনাথ শ্রুতিভূষণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে তিনি সহজ পদ্ধতিতে কস্টিউম, মেক-আপ ও মঞ্চসজ্জায় নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি *ফাল্গুনী* নাটককে উপজীব্য করে তাঁর *ফাল্গুনী* সিরিজচিত্র এঁকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দশ

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সিরিজচিত্র রসিক মহলে সুনাম অর্জন করেছিল। নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির প্রচার প্রসারের জন্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট সংস্থার উদ্যোগে ১৯২০ সালের জানুয়ারি থেকে ত্রৈমাসিক *রূপম* পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি। দীর্ঘ ১১ বছর এই পত্রিকা নব্য-বঙ্গীয়রীতির চিত্রকলার প্রচার কাজ চালিয়েছিল। শুধু চিত্রকলা নয়, অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যও তখন সমানে প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৯১৯ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স প্রকাশ করেন *পথে বিপথে*।[৬৩] ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত হয় *বাংলার ব্রত*। ১৯২১ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত হয় *খাতাঞ্চির খাতা*। খাতাঞ্চির খাতা James Matthew Barrie-র *Peter Pan* গল্পের ভাবানুবাদ।[৬৪] পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্বে খাতাঞ্চির খাতার গল্পগুলো সুকুমার রায় সম্পাদিত *সন্দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এই সব গল্পের চিত্রায়ণ করেছিলেন সুকুমার রায়।

অবনীন্দ্রনাথ ১৯১৯–২০ সালে ল্যান্ডস্কেপ চিত্র *দার্জিলিঙ* সিরিজ অঙ্কন করেন। ১৯২৫ সালে *খেলারসাথী* (Playmate) সিরিজ অঙ্কন করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের প্যাস্টেল অঙ্কিত প্রতিকৃতি (Portrait) খুব গুরুত্বপূর্ণ।[৬৫]

চিত্র ১৯ : দার্জিলিঙ সিরিজ : কাঞ্চনজঙ্ঘা
জলরং, ২৫.৪ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১৯

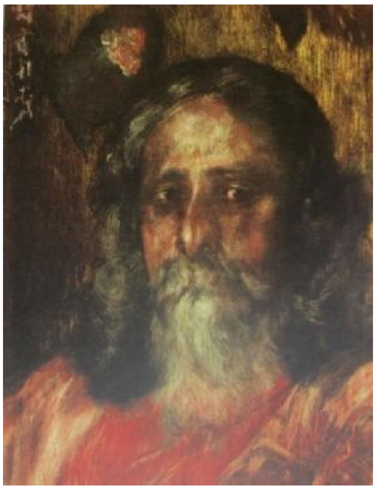

চিত্র ২০ : রবীন্দ্রনাথ (প্রতিকৃতি), প্যাস্টেল
৪১×৩৪ সেমি, ১৯৩০

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম *রানি বাগেশ্বরী প্রফেসার অব ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস* পদে যোগদান করেন। শিল্পাদর্শের প্রকৃত ব্যাখ্যাতারূপে তিনি ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে মোট ২৯টি বক্তৃতা দিয়েছেন। এসব প্রবন্ধ পরবর্তীকালে *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*তে মুদ্রিত হয়েছে। এই বক্তৃতায় তাঁর পরিণত বয়সের শিল্পভাবনার সারাৎসার ধরা আছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তন আয়োজন করে ১৯২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর।[৬৬] ওই সমাবর্তনে অবনীন্দ্রনাথকে সম্মানসূচক *ডক্টর অব*

লিটারেচার ডিগ্রি দেয়া হয়। ১৯২৩ সালে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ভ্রমণে যান। রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্রা* থেকে শান্তিনিকেতন কলাভবনে ততদিনে শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। শান্তি-নিকেতনের হাল ধরেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য নন্দলাল বসু। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে জার্মানির বার্লিন শহরে আধুনিক চিত্র প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে। ১৯২৪ সালে লন্ডনে *ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে* অবনীন্দ্রনাথের *রাধিকা, ফিড দি লিভিং গড, ওমর খৈয়াম* চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল।[৬৭]

অবনীন্দ্রনাথ পশুপাখি সিরিজচিত্র এঁকেছেন। এই সিরিজচিত্র অঙ্কনের নির্দিষ্ট সময়কাল বলা যুক্তিসংগত নয়। কারণ বিভিন্ন সময়ে পশুপাখি নিয়ে চিত্র এঁকেছেন। তবে ১৯২৪–২৫ সালে বেশির ভাগ কাজ করেছেন।

শাহাজাদপুর সিরিজচিত্র অবনীন্দ্রনাথের মাধুর্যমণ্ডিত ল্যান্ডস্কেপ সিরিজচিত্র। এই সিরিজচিত্র তিনি ১৯২৫–২৭ সালের মধ্যে এঁকেছেন। শাহজাদপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন চিত্রিত হয়েছে এই সিরিজচিত্রে। এসব চিত্র তিনি স্পটে বসে আঁকেননি। তাই কোনো নির্দিষ্ট দৃশ্যকে রিপ্রেজেন্ট করে না। তিনি তাঁর স্মৃতিতে ও মনে যা ধারণ করেছিলেন এবং যেসব জায়গা থেকে প্রণোদিত হয়েছিলেন তার একটা সাধারণ ধারণা ফুটে উঠেছে এই সিরিজচিত্রে। এসব চিত্রে অসংখ্য মানুষের ছবি আছে, যা ঐ স্থানের ঐতিহ্য বহন করে। নদী, নৌকা, গ্রাম প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে শাহাজাদপুর সিরিজচিত্রে।

চিত্র ২১ : শাহজাদপুর ল্যান্ডস্কেপ, জলরং
৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭

চিত্র ২২ : শাহজাদপুর খাল, জলরং
২৬.৬৭ × ২০.৩২ সেমি, ১৯২৭

শাহাজাদপুর সিরিজের অন্যান্য ডিটেল ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে—করতোয়া নদী, উল্লাপাড়া স্টেশান, শাহজাদপুর ব্রিজ, জমিদারের কাছারী বাড়ি, নৌকা, মোকাদম সাহেবের গোর প্রভৃতি।[৬৮] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর æA Chronology of Abonindranath’s Paintings” প্রবন্ধে এই চিত্রগুলোকে *বেঙ্গল ল্যান্ডস্কেপ* হিসেবে আখ্যা দিয়ে এর সময়কাল ১৯২৬–২৭ সাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

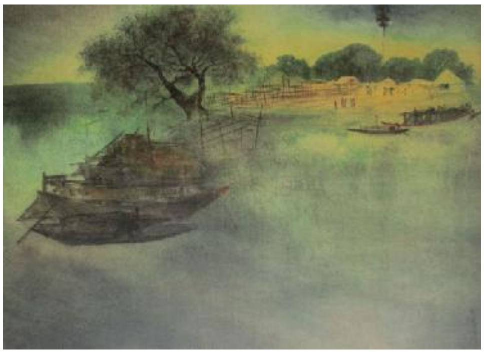

চিত্র ২৩ : তালগাছি হাট, জলরং
৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭

চিত্র ২৪ : উল্লাপাড়া স্টেশন, জলরং
৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭

চিত্র ২৫ : মোকাদম সাহেবের গোর, জলরং
৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭

চিত্র ২৬ : শাহজাদপুর ব্রিজ, জলরং
৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭

এই ল্যান্ডস্কেপ শাহজাদপুর ভ্রমণ শেষে কলকাতায় ইনডোর স্টুডিয়োতে এঁকেছেন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আলোক ঝলমল বাঙলার এই দৃশ্যচিত্রগুলিতে প্রকৃতির যে রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সে ক্ষেত্রে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা একটি শাশ্বত প্রাকৃতিক আবেদন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল বর্ণের সমন্বয় ও সংঘাতের সাহায্যে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের লক্ষণ সত্ত্বেও কোনও দিক দিয়েই বাঙলার দৃশ্যচিত্রে বাহুল্য লক্ষ্য করা যায় না।'[৭০]

১৯২৯ সালে অবনীন্দ্রনাথ *মুখোশ সিরিজ* অঙ্কন করেন। তিনি পোর্ট্রেট আঁকতে মানুষের চেহারায় মুখোশ অনুভব করেন। অনুভব করেন সব মানুষের মুখের চামড়ার ঠিক তলায় একটা মুখোশ থাকে। এই ভেতরের রূপই মানুষের আসল রূপ। এই অনুভব থেকে মুখোশ আঁকা শুরু করেন। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য মতে, অবনীন্দ্রনাথ এই সিরিজের ৬০–৭০টি মুখোশ এঁকেছেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের *তপতী* নাটকের চরিত্র নিয়ে ১০টি মুখোশ এঁকেছেন।[৭১] *তপতী* নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আদলে চিত্রিত মুখোশ দেখে প্রকৃত মানুষদের অনুমান করা যায়। মুখোশ সিরিজের এই চিত্রগুলো কোনোটা মাটির পাত্র, কোনোটা ঘুড়ি, কোনোটা জাপানি প্রতিকৃতি সদৃশ কিংবা কোনোটা শুধুই কাল্পনিক আকৃতির মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে আর. শিবকুমার অবনীন্দ্রনাথের মুখোশ ও প্রতিকৃতি প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা স্মরণ করছি :

> Abanindranath saw the mask not as a camouflage that one wore to hide one's real face behind it but as the real thing that could be found behind every face. The mask thus became the character, and character became the portrait in late Abanindranath.[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

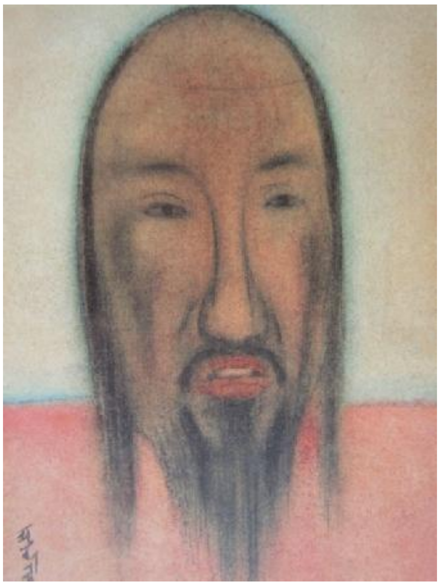

চিত্র ২৭ : মুখোশ, জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯

চিত্র ২৮ : কুমারসেনের অভিনয়ে আলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯

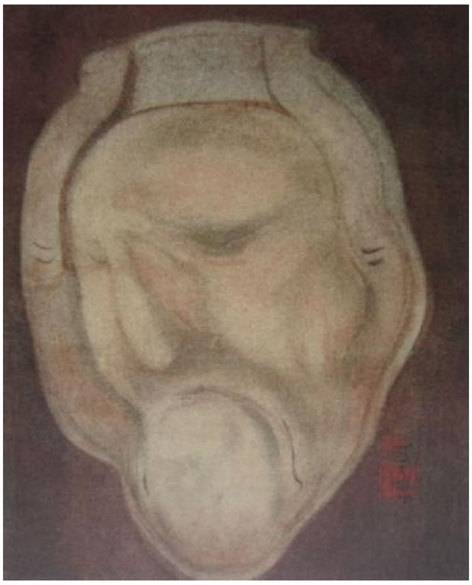

চিত্র ২৯ : মুখোশ, বিক্রমদেবের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯

চিত্র ৩০ : মুখোশ, জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯

১৯২৯ সালে ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় অবনীন্দ্রনাথের *চিত্রাক্ষর* মুদ্রিত হয়। লিথোতে ছাপা এ বইয়ে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিটি বর্ণমালাকে কেন্দ্র করে এক একটি ছড়া লিখেছেন। এ ছাড়া ১ থেকে ৯ সংখ্যার বর্ণনাও ছিল এ বইয়ে।

১৯২৯ সালে *ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট*-এর শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হয়।[৭৩] রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন অবন প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন বাস্তব নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্তু উপায় ছিল না। ফলে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য নন্দলালের মাধ্যমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের শিল্পশিক্ষায় সেই

প্রতিবন্ধকতার উত্তরণের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন আধুনিকতার পথ ধরে। ঐ বৎসর অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রম পরিদর্শন করতে আসেন। শান্তিনিকেতনের পক্ষ থেকে মহাসমারোহে অবনীন্দ্রনাথকে আম্রকুঞ্জে অভিনন্দিত করা হয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। উক্ত অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে শিল্পের সমকালীন অবস্থা-ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রধান শিষ্য নন্দলাল ও অন্যদের কাছে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ কুটিরশিল্পের জাগরণ দাবি করেন। শিশুদের কল্পনারাজ্যে বিরাজের জন্য খেলনা দেখানোর ব্যবস্থা করতে বলেন এবং প্রত্যেক শিল্পীকে স্বাধীনভাবে নিজের আদর্শ বজায় রেখে চিত্র আঁকতে উপদেশ দেন।

১৯৩০ সালে ডিসেম্বরের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ *আরব্য রজনী* (Arabian Night) সিরিজচিত্রের ৪৫টি ছবি অঙ্কন করেছেন। রাজপুত মোগল এবং পাহাড়ি ধ্রুপদী ঘরানার মিনিয়েচার চিত্রের ক্ষেত্র বিভাজন, জ্যামিতিক ব্যবহার, নকশার বিন্যাসের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কারিগরি সূক্ষ্মতা ও মননশীল উৎপ্রেক্ষায় এই সিরিজচিত্রে সংযুক্ত হয়েছে বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার পরিপূর্ণ শিল্পবোধ। ওয়াশের ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা নেই এই চিত্রে। বরং উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে রঙের দীপ্তি ফুটে উঠেছে।

বিষয়ের ক্ষেত্রে লৌকিক জীবনের দৃশ্য ও মানুষ এঁকেছেন। আর শিবকুমার লিখেছেন, 'চিত্রকল্পগুলি যেন চিৎপুর রোডের আশেপাশের থেকেই সাপটে উঠে এসেছে ফ্রেমে। অতীত থেকে উঠে আসা সাহিত্যিক পাঠ্য এবং বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার যেন এক সংমিশ্রিত সহাবস্থান।'[৭৪]

আরব্য রজনীর গল্পগুলোর মধ্যে যেগুলো তাঁর মনে ধরত তার বিশেষ মুহূর্তের ছবি আঁকতেন। গল্পের চরিত্র আরবের মানুষের হলেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে প্রতিদিনের দেখা সমকালের ভারতীয় লোকজনের চেহারার প্রতিচ্ছবি বসিয়েছেন। এমনকি নিজের মুখচ্ছবিও বাদ পড়েনি। আর শিবকুমারের মতে, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে যে সমসাময়িক বাস্তবতার মোটিফ তুলে ধরেছেন সেগুলো নিরপেক্ষ নয়। তৎকালীন সমাজের নব্য-উপনিবেশের প্রভাবে যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছিল তা প্রহসনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন কাল্পনিক উপস্থাপনায়। এসব ছবি বাস্তবঘেঁষা হলেও নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন আবেদন আনতে সক্ষম।[৭৫]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর "ভারতীয় চিত্রকলার নূতন উন্মেষ" প্রবন্ধে বলেছেন, 'আরব্য উপন্যাসের বাধাহীন কল্পনা সম্ভব অসম্ভবে জড়িয়ে আশ্চর্য কল্পনার জগৎ তৈরি হয়েছে, '. . . অবনীন্দ্রনাথের আরব্য উপন্যাসের চিত্রের মধ্য দিয়ে আর এক কল্পনার জগতের সাক্ষাৎ আমরা পাই। . . . লেখকের ভাষায় যা প্রকাশিত হয় নি, ছবিতে তার সাক্ষাৎ পাই, এই আশ্চর্য কল্পনাশক্তি অবনীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব।'[৭৬]

অগ্নিমিত্র ঘোষ-এর কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শিল্পী যোগেন চৌধুরি অবনীন্দ্রনাথের *আরব্য রজনী* সিরিজচিত্রের যে মূল্যায়ন করেছেন তা হচ্ছে—'আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলির সঙ্গে আমি তাঁর শিল্পীজীবনের বিবর্তনের বেশি সংযোগ দেখতে পাই। ছবিগুলির মধ্যে মজা আছে, লুকিয়ে আছে বৈঠকি মেজাজ, আর আছে 'fantasy'।[৭৭] এসব ছবিতে ফার্সি হরফের অনুকরণে বাংলা লেখা ব্যবহার করেছেন। উমা দেবী জানিয়েছেন, ফার্সি হরফ অনুকরণে বাংলা অক্ষর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

আরব্য রজনী থেকে নেয়া গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছেন বিভিন্ন কিস্‌সার কোলাজে সাজিয়ে। একাধিক পটবিন্যাসের সমবায়ে দর্শকমনে বোধ তৈরি হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ *নূর-অল-দিনের বিবাহ* চিত্রটি।

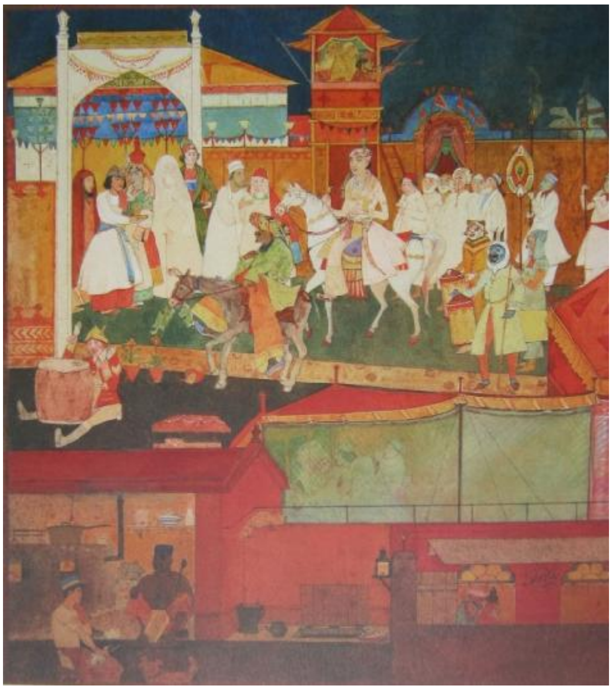

চিত্র ৩১ : নূর-অল-দিনের বিবাহ, জলরং, ২৬.৬৭ × ২৪.১৩ সেমি, ১৯৩০

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন এই আরব্য রজনী সিরিজচিত্র। এই চিত্রমালা শেষ করে তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, 'এই ধরে দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সব-কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।'[৭৯]

চিত্র ৩২ : বণিক এবং চার ভ্রমণসঙ্গী, জলরং
২৫.৪ × ২৪.১৫ সেমি, ১৯৩০

চিত্র ৩৩ : নাবিক সিন্দাবাদ, জলরং
২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯৩০

আরব্য রজনী সিরিজ চিত্র প্রসঙ্গে তপন ভট্টাচার্যের মূল্যায়ন স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

> ১৯৩০ থেকে শুরু করেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সিরিজ আরব্য উপন্যাসভিত্তিক চিত্রাবলী। তাঁর এই চিত্রাবলীতেও তেমন কোনো violence-এর সাক্ষাৎ নেই বরং তুলনায় বড়ই ব্যঞ্জনাময়, বাস্তব-অবাস্তব মেশানো কল্পনার চিত্ররূপ, যাতে জোড়াসাঁকো ও কোনও মরুভূমির ধূ ধূ প্রান্তর মিশে গেছে। অবনীন্দ্রনাথ দূর দেশে ভ্রমণ করেন নি, কিন্তু তাঁর ছবির জগৎ যেন তাঁর না-করা-ভ্রমণেরও জগৎ। প্রায়শই আমরা লক্ষ করি একটা ধ্রুপদী ছোঁওয়া যাতে আবেগের আতিশয্য বা বাহুল্যের কোন স্থান থাকছে না।[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

এগারো

আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলি আঁকা শেষ হলে অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘ ১৯৩০–৩৮ সাল পর্যন্ত কোনো ছবি আঁকেননি। এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা ও দেশ-বিদেশে চিত্রপ্রদর্শনী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আর অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা বন্ধ রেখে যাত্রাপালা রচনায় মন দিয়েছিলেন। ছবি না আঁকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'কি জানো রবিকা, এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি; সেজন্যই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্য মন ব্যস্ত।'[৮১]

এই সময় বিদেশি উৎসুক এক সমঝদার বিলেত থেকে ছুটে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা দেখবেন বলে। ভদ্রলোক ছবি আঁকা প্রসঙ্গ তুললে, কথাপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানা রকম শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কি রকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।'[৮২] এ ছাড়া ছবি না আঁকার কারণ প্রসঙ্গে অন্যান্য জিজ্ঞাসুদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের এই বিভিন্ন মতের উত্তরের মধ্যে খেয়ালিপনা যুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। সেক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথের পক্ষাঘাতজনিত দীর্ঘদিনের অসুস্থতা ও একই সময়ে স্ত্রীর অসুস্থতাও এর কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনি নিয়ে এই সময় যা কিছু লিখেছেন তা *পুথি, যাত্রাপালা, যাত্রাগানে রামায়ণ* এবং *খুদ্দুর যাত্রা* শিরোনামে মৃত্যুপরবর্তী সময়ে মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশ ভবন কর্তৃক প্রকাশিত *অবনীন্দ্র রচনাবলী*র ৫ম খণ্ডে পুঁথিগুলো সংকলিত হয়েছে। পুঁথির ভঙ্গিতে রামায়ণের গল্প নিয়ে এগুলো রচিত। যাত্রার ঢঙে লিখিত ক্ষুদ্রাকার যাত্রাপালাগুলো সংকলিত হয়েছে রচনাবলির ৬ষ্ঠ খণ্ডে। দীর্ঘ একটি পালা *যাত্রাগানে রামায়ণ* সংকলিত হয়েছে রচনাবলির ৭ম খণ্ডে। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের মূল রচনার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনা মিশিয়ে বিশেষ কৌতুকভরা স্বাদ এনেছেন *যাত্রাগানে রামায়ণ* পালায়। অবনীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এ রচনাগুলো সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭ সালে ২৭ মে লিখিত তাঁর একটি পত্রে অবনীন্দ্রনাথের এই রচনাকে *বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প* আখ্যা দিয়েছিলেন।[৮৩]

অবনীন্দ্রানাথের যাত্রাপালাগুলোর একটির পাণ্ডুলিপি *খুদ্দুর যাত্রা*। দীর্ঘদিন এটি অপ্রকাশিত ছিল। ২০০৯ সালে প্রতিক্ষণ প্রকাশন কর্তৃক ভূমিকা ও পাঠ সমন্বিত সম্পূরক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১ম খণ্ডে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল পাণ্ডুলিপির হুবহু প্রতিচিত্র এবং ২য় খণ্ডে ভূমিকা ও মূল পাণ্ডুলিপির স্পষ্ট পাঠ মুদ্রিত হয়েছে। যাত্রার ঢঙে এই লেখাটি অবনীন্দ্রনাথ ১৯৩৪–৩৫ সালে শুরু করে ১৯৪২ সাল নাগাদ শেষ করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি একটি মূল শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। কারণ পাণ্ডুলিপিটি চিত্রিত করেছেন নানা মুদ্রিত চিত্রের কোলাজ-এ। বড়ো মাপের লাইনটানা খাতায় ছোটো হরেফে লিখিত ২৪১ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি *খুদ্দুর যাত্রা* লেখার সঙ্গে প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন চিত্র থেকে নানারকম চিত্র দিয়ে চিত্ররূপ দেয়া আছে লিখিত গল্পের। এই পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন গিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে। জসীমউদ্দীন সেই বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর *ঠাকুর-বাড়ির আঙ্গিনায়* বইয়ে :

Dhaka University Institutional Repository

> অবনীন্দ্রনাথ অনেকগুলি খবরের কাগজ লইয়া কাঁচি দিয়ে অতি সাবধানে ছবিগুলি কাটিয়া লইতেছেন। কত রকমারি বিজ্ঞাপনের ছবি—সেগুলি কাটিয়া কাটিয়া যাত্রার পাণ্ডুলিপির এখানে ওখানে আঠা দিয়া আটকাইয়া লইতেছেন। এ যেন বয়স্ক-শিশুর ছেলেখেলা। ছবিগুলির কোনটার মাথা কাটিয়া অপরটার মাথা আনিয়া সেখানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবিগুলি তাতে এক অদ্ভুত রূপ পাইয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমার যাত্রার বই ইলাসট্রেট করছি"। [৮৪]

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *খুদ্দুর যাত্রা* পাণ্ডুলিপি ইলাসট্রেট করতে নকশা, চিত্রণ, ফ্যাশনের ছবি, জীবজন্তুর ছবি, আলংকারিক রেখাবিন্যাস, আঁকিবুঁকি, প্রতীকচিহ্ন, পদমর্যাদাসূচক চিহ্ন, লেবেল, মোরক, ঘোষণাপত্র, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, ব্যঙ্গচিত্র, তথ্যাশ্রিত আলোকচিত্র, খেলনাপাতির ছবি, শিল্পকর্মের প্রতিচিত্র, খবরের কাগজ, সাময়িকপত্র, বই, ক্যাটালগ থেকে কর্তিত লেখা ও ছবি; পোস্টকার্ড বা পণ্যতালিকা, প্যাকেজিং সব কিছুই সংযোজিত করেছেন। অর্থাৎ গল্প, গুজব, পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, আজগুবি সব বিষয় একত্রিত করেছেন *খুদ্দুর যাত্রায়*।

তাঁর এই পাণ্ডুলিপি দেখলে নানা প্রশ্ন জাগে শিল্পরসিকদের মনে। প্রশ্ন জাগে শুধুই কি উদ্ভট রস সৃষ্টি করেছেন, নাকি দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের কটাক্ষ করেছেন, নাকি নিজের অতীত কাজের প্রতিবাদ করেছেন, নাকি রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত ভাষার বিপরীতে ভাঙনের খেলায় মেতেছিলেন। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন :

> পাগলামিই হোক আর তার ভিতরকার কোনো সমালোচনাই হোক, শেষ পর্যন্ত তা সমগ্রের কোনো বাঁধন পায় না অবনীন্দ্রনাথের হাতে, পুঞ্জ পুঞ্জ সম্ভাবনা নিয়ে আলস্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তারা। . . . বাইরে থেকে যাকে মনে হয় বিশৃঙ্খল, তাকে গড়ে তুলতে হলেও একটা অন্তর্লীন শৃঙ্খলা চাই নিশ্চয়। কিন্তু ছবি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কলম হাতে বসেছেন যখন অবনীন্দ্রনাথ, তখন এই শৃঙ্খলাকে সর্বাথে ভেঙে দেবার দিকেই তাঁর ঝোঁক এত বেশি যে এখানে কেবল বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে থাকে শিল্পের বাহুল্য আর বিচিত্র নানা উপাদান, শেষ পর্যন্ত কোনো সংহত শিল্পের রূপ পায় না তারা। চানও না তা তিনি। [৮৫]

*খুদ্দুর যাত্রা*র পাণ্ডুলিপি আপাদমস্তক শিল্পকর্ম হিসেবে বিচার করা যায়। কারণ, পাঠ্যবস্তুর আখ্যান পরিসরে যেসব চিত্র ও চিহ্ন ব্যবহার করেছেন তা বাঁধাধরা নিয়মে নয়—যা পাণ্ডুলিপির সাথে কোথাও সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্রায়ণ; কোথাও চিত্রিত বা সংযোজিত কোলাজ নিজেই অর্থপূর্ণ আবেদন সৃষ্টি করে। সেজন্য, এই শিল্প উপভোগে পাঠক হয়ে ওঠেন পাঠক ও দর্শক—এই কোলাজের অন্তরঙ্গে খুঁজে পান দাদাবাদী, কিউবিস্ট ও উত্তর পরাবাস্তববাদ আবেদনের অনুষঙ্গ।

এবার খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হবে উত্তর আধুনিক কালের ধারণা-প্রধান (Conceptual Art) শিল্পের সাথে অবনীন্দ্রনাথের *খুদ্দুর যাত্রা*র মিল আছে কিনা। প্রথমত স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, আলোচ্য ক্ষেত্রে ধারণা-প্রধান শিল্প বলতে কী বুঝি। এর উত্তরে বলা যায়, ক্যানভাসের উপর নানান উপকরণের সংযুক্তি। যেমন, ফটোগ্রাফ, প্রিন্ট, বিভিন্ন ধাতব বস্তু, প্লাস্টিক ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মিশ্রণে আবেগের বিশেষ মাত্রা যোগ করেন শিল্পীরা—যাকে ধারণা প্রধান শিল্পের প্রাথমিক প্রকাশ বলা যায়। নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন-এর *দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের* আলোকে এই ধারণা-প্রধান শিল্পের অভিন্ন স্বরূপ প্রমাণ করা সম্ভব। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'এই মতবাদে আধুনিককালে সংজ্ঞাভূক্ত নানা শিল্প মাধ্যমের কোন

Dhaka University Institutional Repository

একটির আঙ্গিক ও রীতির পরিবর্তে একটি মুক্ত আঙ্গিক গ্রহণ বা সৃজনের কথা বলা হচ্ছে। যার অর্থ সকল দ্বৈত শিল্পরীতিভেদ অস্বীকার পূর্বক রচনার কাঠামো, ভঙ্গি ও সর্বোপরি শিল্পের নানা উপাদানের একটি স্বতঃস্ফূর্ত মিশ্রণ যা সর্বাংশে মৌলিক এবং নানা রীতির সংযোগ সত্ত্বেও অভেদাত্ম।'[৮৬] তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্প আঙ্গিকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন।

শুধু সাহিত্য নয়, বাঙালির আবহমান কালের শৈল্পিক কর্মকাণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ধারাতেই উনবিংশ শতাব্দীর পৃষ্ঠকাল পর্যন্ত বাহিত হয়ে এসেছিল লোকজ ধারায়। চিত্রকাল সংযুক্ত শিল্পকর্মের শেকড় সন্ধান করলে এর প্রমাণ মেলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—বাংলার আদি মৃৎশিল্পের মধ্যে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও ছাপচিত্রের ইঙ্গিত আছে। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের *খুদ্দুর যাত্রা*র মিশ্রমাধ্যম ও করণকৌশল আধুনিক ইউরোপ থেকে ধার করা নয়। শেকড়সন্ধানী শিল্পী আবহমান বাংলার লোকজ ধারাকেই নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন।

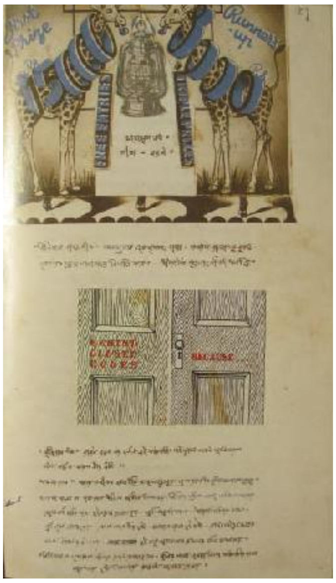

চিত্র ৩৪ : খুদ্দুর যাত্রার চিত্রায়ণ

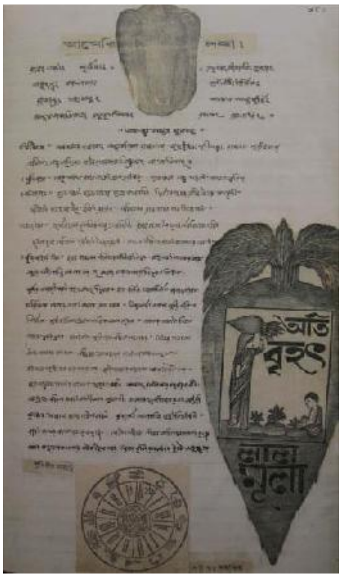

চিত্র ৩৫ : খুদ্দুর যাত্রার চিত্রায়ণ

কুটুম-কাটাম অবনীন্দ্রসৃষ্ট আরেক ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পকর্ম। ছবি না আঁকার সময়ে ১৯৩৩ সালে ৬২ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ নতুন রূপজগতে প্রবেশ করেছিলেন, যাকে চারু ও কারুশিল্পের যুক্ত প্রয়াস বলা যায়। সুনীল কুমার পাল-এর পিতৃব্যদেব শান্তি পালের সাথে আলাপচারিতায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *কুটুম-কাটাম* শিল্প প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি এখন আর্টের তিনতলায় এসে বসে আছি।'[৮৭] এ উক্তিই প্রমাণ করে অবনীন্দ্রনাথ কোন শিল্পচেতনায় তাঁর *কুটুম–কাটাম* গড়েছেন।

কুটুম-কাটামের মূল উপাদান গাছের শেকড়, ভাঙা ডাল, বাকল, কাঠের টুকরো, বাঁশের টুকরো, তালের আঁটি, পেরেক, টিনের পাত, রাঙতা প্রভৃতি অব্যবহার্য পরিত্যক্ত বস্তু। প্রকৃতির রাজ্যে আপনা হতে তৈরি হওয়া কাঠামোগুলো অবনীন্দ্রনাথের কাছে আত্মীয়ের মতো বা কুটুমের মতো ধরা দেয়। তাই তার মধ্যে তিনি খুঁজে পান অখণ্ড চিত্রের সন্ধান। অর্থাৎ এসব বস্তুর মধ্যে তিনি তৃতীয় নয়ন দিয়ে রূপকল্প আবিষ্কার করেন হৃদয়ের কুটুম বলে। এসব আকৃতি তিনি বিশেষ যত্নে কোনোটা ঝেড়ে পুঁছে নিয়ে, কোনোটার প্রয়োজনমতো

Dhaka University Institutional Repository

ছেঁটে বা অতিরিক্ত যোগ করে নতুন শিল্পরূপ দিয়েছেন। এসব শিল্পকর্মকে ছোটো ভাস্কর্যও বলা যায়। শিল্প ইতিহাসে এই শিল্পটির নাম Assemblaged sculpture বা Found object sculpture, যার শুরু Collage থেকে। দ্বিমাত্রিক ছবিতে ত্রিমাত্রিক ধারণা দেয়ার জন্য পাবলো পিকাসো এ রীতির প্রচলন করেছিলেন। তবে পিকাসোর এরকম কোলাজ ভাস্কর্যের সাথে অবনীন্দ্রনাথের *কুটুম-কাটাম* ভাস্কর্যের মিল নেই। অবনীন্দ্রনাথ যা করেছেন তা পুতুলধর্মী ভাস্কর্য। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর মতে :

> সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি-বর্জিত শিশুসুলভ আনন্দের প্রকাশ শিল্পের ক্ষেত্রে কমে এসেছে। অবনীন্দ্রনাথের এই খেলনাগুলির মধ্যে সেই লুপ্তপ্রায় শিশুজনোচিত অহেতুক আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। . . . অবনীন্দ্রনাথের কারীগরীসুলভ দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে এই খেলনাগুলির প্রতি অংশে। ভঙ্গুর উপাদান এবং নির্মিত রূপের স্থিতিশীলতা উভয় দিকের সংযোগে যে চাপা উত্তেজনা (tension) প্রকাশ পেয়েছে সেটিকে এই খেলনার অন্তর্নিহিত গুণ বলা যেতে পারে।[৮৮]

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *কুটুম-কাটাম* তৈরির কাজ অব্যাহত রেখেছেন শেষ জীবন পর্যন্ত। বরানগরের বাড়ির বাগান থেকে ও বিশ্বভারতীর আচার্যপদে দায়িত্ব পালনের সময়ে শান্তিনিকেতনের মাঠ থেকে তিনি *কুটুম–কাটামে*র উপকরণ সংগ্রহ করতেন। তাঁর চোখে যে উপকরণ ভালো লাগত তা সযত্নে তুলে আনতেন। তারপর ঘরে বসে একটার সাথে আরেকটা জোড়া দিয়ে তৈরি করতেন। এভাবে তিনি তৈরি করেছেন পল্লিবধূ, নর্তকী, মা ও মেয়ে, বাদ্যকর, বাউল, বেড়াল, মাছ, প্রজাপতি প্রভৃতি। আবার কখনো বিষয় হিসেবে এসেছে দিনান্তে গাছতলায় বসে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার দৃশ্য, রুগ্‌ণ বৃদ্ধ বাদশা, শিখরে বাজপাখি নিয়ে একজোড়া উড়ন্ত পাখি, মুক্তদণ্ডী রাজকন্যা, ভূতের গাধা, রং, ছুট ময়ূরী, পক্ষী পরিবার, ছোটো পাখি মাছ ধরে খাচ্ছে, পাহাড়ি বাচ্চা ছাগল, বালিকা হীরামণি, খচ্চরের পৃষ্ঠে আরোহী, বাচ্চা সারস, ডিমবুড়ো, ঘোড়া, গণেশের নৃত্য, বামন বুড়ো ছুটছে, ভৈরবী প্রভৃতি।

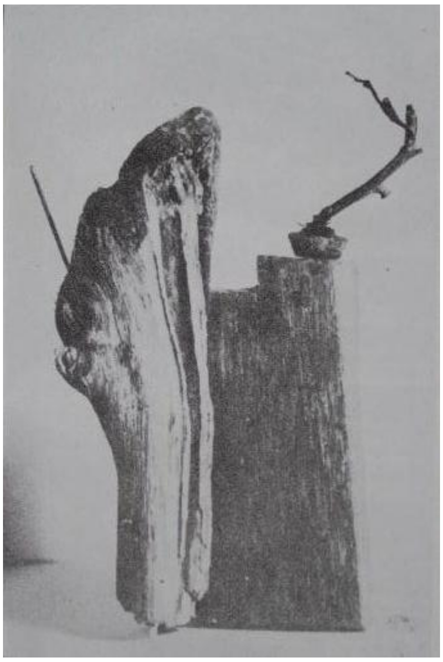

চিত্র ৩৬ : কুটুম-কাটাম

চিত্র ৩৭ : কুটুম-কাটাম

Dhaka University Institutional Repository

বারো

ইন্ডিয়ান সোসাইটির ষান্মাসিক মুখপত্র *Journal of Society of Oriental Art* ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির যুগ্ম সম্পাদনা করেছেন স্টেলা ক্র্যামরিশের সাথে। ১৯৩৫ সালে পঞ্চম জর্জের পঁচিশ বছর রাজ্যকাল পূর্তি উপলক্ষে সিলভার জুবিলি মেডেল (Silver Jubilee Medal) গ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পুরনো ছাত্র মুকুল দের অনুরোধে পুনরায় ছবি আঁকায় মন দেন। এ সময় তিনি আঁকেন *কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজ* ও *কবি-কঙ্কন চণ্ডী সিরিজ* চিত্র। সত্যজিৎ চৌধুরীর হিসেব মতে ১৯৩৮–৩৯ সালে তিনি চার মাসের মধ্যে এই সিরিজের ৮০টি চিত্র এঁকেছেন।[৮৯] কবিকঙ্কন চণ্ডী কালকেতু উপাখ্যান কাহিনি, যেখানে কালকেতু এক দুঃসাহসী যুবক, অন্নদা এক লৌকিক ঘরোয়া দেবী। জীবনের প্রথম তিনি রাধার সাথে কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি এঁকেছিলেন। কৃষ্ণমঙ্গলে বালক কৃষ্ণের বধ ও অসুর বধ ও অন্যান্য কাহিনি এঁকেছেন। দুটো সিরিজচিত্রের কাহিনি ধর্মীয় আখ্যাননির্ভর হলেও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে কোথাও ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার ঘোর লাগেনি। এসব চিত্রে মানবিক ও বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপট ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শোভন সোম-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'এ দেশ যখন উপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত, স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন তুঙ্গে এবং বিশ্ব জুড়ে যখন ঔপনিবেশবাদী শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবিস্তারের কারণে যুযুধান, তখন অসুরানিসুদন কৃষ্ণের ছবির রূপকার্থ সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[৯০]

চিত্র ৩৮ : কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজ

চিত্র ৩৯ : নেকড়ে বাঘ ও খেঁক শিয়ালের কথোপকথন
জলরং, ২৭.৯৪ × ২০.৩২ সেমি

চিত্র ৪০ :
কবি কঙ্কন চণ্ডী সিরিজ

এই চিত্রগুলো তিনি এঁকেছেন পটচিত্রের সহজ আঙ্গিকে। মোটা রেখা, উজ্জ্বল রং, অলংকরণবর্জিত জোরালো অভিব্যক্তি এসব পটচিত্রের আঙ্গিক। অর্থাৎ তিনি তাঁর ধ্রুপদী আঙ্গিক থেকে সরে এসে গ্রামীণ ও লোকজ শিল্প আঙ্গিকে চিত্র এঁকেছেন। তাঁর এই পরিবর্তনের যোগসূত্র খুঁজলে দেখা যায়—তিনি ১৯৩০–৩৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছবি না এঁকে যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন। এই যাত্রাপালা লিখতে গিয়ে তাঁর লৌকিক শিল্প ও লৌকিক জীবন সম্পর্কে গভীর প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল। আর সে কারণেই হয়তো *কবিকঙ্কন চণ্ডী* ও *কৃষ্ণমঙ্গল* চিত্রমালায় লোকজ আঙ্গিক ও বিষয় এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম *রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক* হিসেবে ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে যে ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন থেকে ১৯৪১ সালে *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। ১৯২০–২১ সালে *মৌচাক* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের *বুড়ো আংলা* ১৯৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। Selma Lagerlof-এর The wonderful Adventures of Nils কাহিনির প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *বুড়ো আংলা* লিখেছেন।[৯১]

শ্রীমতি রানী চন্দের[৯২] কাছে অবনীন্দ্রনাথ গল্পচ্ছলে অনেক মূল্যবান কাহিনি বলেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গল্প সংগ্রহে রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথই উৎসাহিত করেছিলেন। এসব পারিবারিক গল্প কাহিনির লিখিত রূপ *ঘরোয়া* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের কথক অবনীন্দ্রনাথ। লিপিকার রানী চন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরোয়ার পাণ্ডুলিপি পড়ে লিখেছেন :

> কী চমৎকার—তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠল। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে—এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে— এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে।[৯৩]

১৯৪১ সালে অবনীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তির জন্মদিন আড়ম্বরের সাথে পালন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথকে এই বিশেষ সম্মান কেন দেয়া উচিত সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'অবন কিছু চায় না, জীবনে চায় নি কিছু। কিন্তু এই একটা লোক যে শিল্প-জগতে যুগপ্রবর্তন করেছে, দেশের সব রুচি বদলে দিয়েছে! সমস্ত দেশ যখন নিরুদ্ধ ছিল, এই অবন তার হাওয়া বদলে দিলে। তাই বলছি, আজকের দিনে এঁকে যদি বাদ দাও তবে সবই বৃথা।'[৯৪] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই জন্মোৎসবের পূর্বেই অসুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরে এলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট। দিনটি ছিল অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু খবরে অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন—'অগণিত জনসমুদ্রের মাথায় রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রা'।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ১৯৪১ সালের ১৯ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন যথাযোগ্যভাবে পালন করা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে।[৯৫]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর চিরচেনা বাস্তুভিটা ছাড়ার শোক পেয়েছেন। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অবনীন্দ্রনাথের তিন ভাইয়ের পরিবার বিশাল ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ঋণ শোধ করতে ১৯৪১ সালে দ্বারকানাথের ৫ নম্বর বৈঠকখানা বাড়ি ও সংলগ্ন বাগান বেচে অবনীন্দ্রনাথের পরিবার বরানগরের গুপ্তনিবাসে[৯৬] ভাড়াবাড়িতে চলে আসেন। স্মৃতিবিজড়িত জোড়াসাঁকোর বাড়ি ত্যাগ করে ভাড়াবাড়িতে যেতে অবনীন্দ্রনাথের অনেক কষ্ট হয়েছিল।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর আচার্য হন এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ১৯৪৬ সালে আচার্য পদ থেকে অব্যাহতি নেন।[৯৭] বিশ্বভারতীতে আচার্য পদে যোগদানের পর

Dhaka University Institutional Repository

বরানগরের গুপ্তনিবাস ও শান্তিনিকেতনে যাতায়াতের মধ্যে থাকতেন। কিছুদিন বরানগরে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাটাতেন। এই সময় ১৯৪২ সালে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রতিদিনের সাথী স্ত্রী সুহাসিনীকে হারিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যু শোকে দাড়ি রাখতেন। সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়— অবনীন্দ্রনাথ গুপ্তনিবাসের পুবের দেয়ালে ফ্রেসকো এঁকেছিলেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে হিমালয়ের আভাসসহ হরপার্বতীর মুখ ও সরস্বতী এঁকেছিলেন।[৯৮]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শান্তিনিকেতন শোকগ্রস্ত ছিল। অবনীন্দ্রনাথ আচার্যের পদ গ্রহণ করে বুকভরা স্নেহমমতা দিয়ে, সবাইকে উৎসাহ দিয়ে যার যার কাজে ফিরিয়েছেন। বয়স ভুলে সকলের সাথে আনন্দ করতেন। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের ছবির গুরুত্ব ও ছবির সঙ্গে ভাব জমানোর রহস্য বলে দিতেন। কী করে ছাত্রদের আপন পথে চলতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষকদের উপদেশ দিতেন। কিন্তু আচার্য অবনীন্দ্রনাথ সারা জীবন শিল্পশিক্ষায় যে বাঁধা নিয়মের বিপক্ষে ছিলেন, এতদিন পর শান্তিনিকেতনে সেই বাঁধাধরা নিয়ম তাঁকে ব্যথিত করে তুলল। কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রিয়তম শিষ্য নন্দলালের সাথেও তাঁর মতপার্থক্য ঘটেছিল।

অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে তাঁর *কুটুম-কাটাম* গড়েছেন। প্রাতঃভ্রমণকালে শান্তিনিকেতনের মাঠ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতেন। এমনকি শান্তিনিকেতনের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও এসব উপকরণ জোগাড় করে দিত। শান্তিনিকেতনের উদয়নের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতেন। রানী চন্দের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়—অবনীন্দ্রনাথ রানী চন্দকে খেলাচ্ছলে ছবি আঁকা শেখাতেন। তিনি রানী চন্দকে দিয়ে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন স্থানের পেন্সিল স্কেচ করাতেন। এরপর উদয়নের বরান্দায় বসে এই স্কেচ-এর ওপর রং করতেন রানী চন্দের উপস্থিতিতে। ছবির প্রয়োজন অনুসারে কিছু অংশ বাদ দিতেন কিংবা কিছু জুড়ে দিয়ে রং করতেন। ছবি আঁকা শেষ হলে ছবির কোনায় নিজের নাম লিখতেন এবং রানী চন্দের নাম লিখে দিতেন। এমন করে যৌথ প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনের উদয়ন, শ্যামলী, আম্রকুঞ্জ, সিংহসদন, দিনান্তিকা, বকুলবীথি, ঘণ্টাতলা প্রভৃতি জায়গায় এক সেট ছবি এঁকেছিলেন।[৯৯]

এ ছাড়া নিজে আলাদা করে প্রতিদিন ছবি আঁকতেন। উদয়নের বারান্দাতে রানী চন্দ কাগজ, বোর্ড, জল সাজিয়ে দিতেন। অবনীন্দ্রনাথ বোর্ডখানা কোলের ওপর তুলে ছবি আঁকতেন। এই ছবি আঁকা তাঁদের ভাষায় *দুর্গানাম জপ করা*। ছবি আঁকতে ইচ্ছে হলে রানী চন্দকে বলতেন, একখানা কাগজ দাও, দুর্গানাম জপ করি। আঁকা শেষ হলে বলতেন 'দুর্গানাম জপ হল'।[১০০]

১৯৪৪ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে অবনীন্দ্রনাথের *জোড়াসাঁকোর ধারে* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেরও কথক অবনীন্দ্রনাথ, লিপিকার রানী চন্দ। এই বইয়ে গল্প দিয়ে তাঁর সারা জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর স্মৃতিচারণায় জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে অবনীন্দ্রনাথের *সহজ চিত্রশিক্ষা* প্রকাশিত হয় এবং সিগনেট প্রেস থেকে *আপন কথা* প্রকাশ হয়। চিত্র রচনার নানা কৌশল অর্থাৎ টান-টোনের রহস্য, আকৃতির ছাদ ও বাঁধ, আঁকা-জোঁকার তাল-মান, চিত্রে ভাবভঙ্গি, চিত্রে রং ঢঙ, আলো-আঁধারের লুকোচুরি প্রভৃতি বিষয়ের

প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন। বইটির প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পী নন্দলাল বসু এঁকেছেন। অবনীন্দ্রনাথ এই বইয়ের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচনা করেছেন কবিতার ভাষায়। কখনো কবিতার শব্দচয়ন দিয়ে গদ্যের ভাষা সাজিয়েছেন। ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় কথার ভাষা রূপের ভাষাকে হার মানিয়েছে।

১৯৪৭ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশ হয় *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, ভারতশিল্পের মূর্তি* ও *আলোর ফুলকি*। ফরাসি লেখক Edmond-Eugene Rostand-এর রূপক কাব্যনাট্য Chantecter কাহিনির ভাব অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *আলোর ফুলকি* লিখেছেন, যা ১৯১৯ সালে *ভারতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।[১০১]

১৯৪৯ সালে নবীন শিল্পীদের প্রতিষ্ঠান *রূপযানী*র উদ্যোগে অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। *রূপযানী*র সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেন। এই উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ বহু শিল্পী, সাহিত্যিক এবং নাগরিক বরানগর বাসভবন গুপ্তনিবাসে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। অবনীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, তাঁর সময়ে আর্ট নিয়ে যে লড়াই হয়েছিল তার দরকার ছিল। কিন্তু সারা জীবনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি দিয়ে তিনি বুঝেছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রূপ ভিন্ন হলেও রসের ধারা এক।[১০২]

১৯৫১ সালের ৫ ডিসেম্বর মহান শিল্পস্রষ্টা ঋষি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বরাহনগর শহরতলির গুপ্তনিবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুপরবর্তীকালে এই মহান স্রষ্টার বেশ কিছু সাহিত্যের বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে *মারুতির পুঁথি* (১৯৫৬), *চাইবুড়োর পুঁথি* (১৯৬৯), *রং-বেরং* (১৯৫৮), *যাত্রাগানে রামায়ণ* (১৯৬৯), *খুদ্দুর যাত্রা* (২০০৯), পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *অগ্রন্থিত অবনীন্দ্রনাথ* (২০১১) উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত আলোচনায় অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের ক্রমইতিহাস তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর সাহিত্য ও শিল্পকর্মের মূল্যায়ন এবং বাংলার প্রাচ্যশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অবদান মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

তেরো

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্পনার রঙে তুলি ডুবিয়ে রূপকথার গল্প লিখেছেন, শিল্পশাস্ত্র নিয়ে লিখেছেন মন্ত্রমুগ্ধ তত্ত্বকথা। উভয় ক্ষেত্রে তাঁর লিপিকলার বৈশিষ্ট্য হলো—শব্দের সাথে রূপ জড়ানো 'উচ্চারিত ছবি'। তাঁর লিপিকলার স্বাদ, গুণ, রসের বৈচিত্র্য ও বিস্তার এত যে, একটি ছবি না আঁকলেও তিনি তাঁর লেখার জন্যই থাকতেন অবিস্মরণীয়। পদ্য, গদ্য, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক, যাত্রাপালা, পুঁথি, স্মৃতিকথা, নন্দনতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র, অনুবাদ, গ্রন্থ-সমালোচনা, চিঠি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান প্রকাশরীতি। কেবল লালিত্যে নয়, গঠনরীতিতে বিচরণ করতেন অনুভবের পরা-চৈতন্যলোকে। স্বপ্নের মায়াঞ্জনমাখা লিপি বুলিয়ে তিনি ঐশ্বর্যময় করে গেছেন বাংলা সাহিত্যের শিল্পলোক।

Dhaka University Institutional Repository

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পালোচনার প্রধান মাধ্যম তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য। প্রবন্ধের কথা ভাবতেই প্রথমে আমাদের মনে তত্ত্বকথা কিংবা গুরুগম্ভীর বাণীতে বুদ্ধিদীপ্ত গভীরতার কথা মনে আসে। তা যদি হয় শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধ তবে শিল্পতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচনা ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাখ্যায় মন নীরস হয়ে ওঠে—একথা আমরা শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব পাঠ করতে স্বীকার করি। তবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিল্পালোচনায় শিল্পের গঠনরূপ ও শ্রেণি পরিচয় সংক্রান্ত তত্ত্ব, সৌন্দর্য বিচার সম্পর্কিত তত্ত্ব, বিভিন্ন উপমা, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ প্রয়োগ করে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বকেও হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিয়েছেন নাটকীয় গল্পচ্ছলে। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, শিল্পায়ন, ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ, ভারতশিল্পে মূর্তি, বাংলার ব্রত, অগ্রন্থিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, রচনা ও বিভিন্ন চিঠিপত্রে কখনো সাধু ভাষায় কখনো চলিত ভাষায় যে শিল্পালোচনা করেছেন, তাতে অতিসূক্ষ্ম ও সাধারণের পক্ষে দূরূহ বিষয়গুলো উপমা-উদাহরণ ব্যবহারে সরস, সুন্দর ও নান্দনিক রূপ পেয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণামূলক পুস্তিকা *বাংলার ব্রত*-এর মধ্যে জীবন সভ্যতার উৎসমূলের সন্ধান দেখিয়েছেন কথাকথিত ব্রাত্য জীবনের আদি উৎসের মধ্যে। তিনি প্রমাণ করেছেন মানব-মানবীর কামনার প্রতীক ব্রত নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীকালের ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে।

শিল্পকলাসংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা, তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচারবিষয়ক বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধমালায় রয়েছে অপরূপ কথাচিত্রে উপমা উদাহরণ। ফলে রূপতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের গদ্যবিন্যাস হয়েছে সহজবোধ্য। প্রবন্ধমালার প্রতি কথা জুড়েই রয়েছে সরস উদাহরণ। উপমা ও কথকী ভঙ্গি। *শিল্পায়ন* বাগেশ্বরী ভাষণমালার সংশোধিত রূপ। এ গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে শিল্পের তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিক নিয়ে নানান প্রশ্ন, একই সঙ্গে আবার নির্দেশ করেছেন সেসব প্রশ্নের স্বাদু ও সরস সদুত্তর।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের নির্যাস নিয়ে ভারত ও চীন চিত্রকলার ছয়টি অঙ্গের (রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ) ব্যাখ্যা করেছেন, তুলনামূলক আলোচনা করেছেন—সম্মোহনী ভাষার গাঁথুনি দিয়ে। গল্প আর অসাধারণ উদাহরণ টেনে তথ্য থেকে সত্যের উপলব্ধিতে নিয়ে গেছেন পাঠককে। অবনীন্দ্রনাথের এই জাদুকরী ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেন, "অবনীন্দ্র-ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যই ছিল এই,—বাগর্থ নিয়ে এক চারুক্রীড়া,—যার অন্তরঙ্গে ছবি আর গান, বহিরঙ্গে অশিক্ষিতপটু অপরিমার্জনার ছদ্মবেশে অনুশীলনতীক্ষ্ণ ভাষাবিদ্ মনের কৌতুক-হাসির ঝলক—যুগপৎ মন আর মননের 'দুষ্টুবুদ্ধি'-ভরা মিশোলে গড়া।"[১০৩]

প্রকৃতি প্রত্যবেক্ষণের গভীর মনোযোগ ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির প্রমাণ মেলে তাঁর শিল্পালোচনায়। অর্থাৎ সমাজ, প্রকৃতি ও জীবনের নিবিড় পাঠের সারাংশকে রূপ দিয়েছেন বিভিন্ন উপমা, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ ও যুক্তিতে। তিনি অদ্ভুত ধরনের উপমা সৃষ্টি ও উদাহরণ প্রয়োগে প্রমাণ করেছেন—একটি বিষয়কে কত গভীর মনোযোগ সহকারে উপলব্ধি করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেষ্টা করব।

শিল্পে অনধিকার প্রবন্ধে শিল্পে Inspiration ব্যাখ্যা দিতে বললেন :

Dhaka University Institutional Repository

> Inspiration অমন হঠাৎ আসে না! মনাগুনের জ্বালায়, অম্বলশূলের জ্বালায় ভেদ আছে। শিল্পজ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ Inspiration পেয়ে অমন রোগের জ্বালার মতো জ্বলে না, কাউকে জ্বালায়ও না, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে— স্নেহভরা প্রদীপে, তবেই আলো হয় দপ্‌ করে। একেই বলে inspiration ।[১০৪]

রসের বিচারে শিল্পী ও কারিগরকে ভিন্ন ভিন্ন জয়মাল্য দিতে বললেন :

> মৌচাক আর বোলতার চাক—সমান কৌশলে আশ্চর্যভাবে দুটোই গড়া। গড়নের জন্যে বোলতায় আর মৌমাছিতে পার্থক্য করা হয় না; কিংবা মৌমাছিকে মধুকরও নাম দেওয়া হয় না—অতি চমৎকার তার চাকটার জন্যে। মৌচাকের আদর, তাতে মধু ধরা থাকে বলেই তো! তেমনি শিল্পী আর কারিগর দুয়েরই গড়া সামগ্রী, নিপুণতার হিসেবে কারিগরেরটা হয়তো বা বেশি চমৎকার হল কিন্তু রসিক দেখেনু শুধুতো গড়নটা নয়, গড়নের মধ্যে রস ধরা পড়ল কি না। এই বিচারেই তাঁরা জয়মাল্য দেন শিল্পীকে, বাহবা দেন কারিগরকে। [১০৫]

সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

> আর্টিস্টের কাছে যা সুন্দর তার রূপটি হচ্ছে পরিপক্ব রসালের সীমারেখাটির মতো সুডৌল। কিন্তু জ্যামিতির গোলটার মতো একেবারে বাঁধা—নিশ্চল গোলাকার নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু টোল আছে, পূর্ণ-চন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়।
> বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে।
> সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের চাবি ভিতরের দিকে, নিজের ভিতরের দিক থেকে দ্বার খুলল তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মনোমন্দিরে।[১০৬]

ভারত-ষড়ঙ্গ প্রবন্ধে প্রমাণ ও লাবণ্যের পার্থক্য বোঝাতে লিখেছেন :

> প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন, সুনিশ্চিত একটি সুন্দর সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মতো জোরে রাশ টানিয়া অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না, কিন্তু তাহার স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাস্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে; আর লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।[১০৭]

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ বইয়ে ও *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*র অনেক প্রবন্ধে নিজের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যাতে তাঁর ব্যাপক শাস্ত্রচর্চার পরিচয় মেলে। তিনি বাৎস্যায়নের কামসূত্র, ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্র, মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ, কঠোপনিষদ, ঋগ্বেদসংহিতা, রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি, জগন্নাথের ভামিনীবিলাস, বাণভট্টের কাদম্বরী, শুক্রাচার্যের শুক্রনীতি, চৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টক, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ছান্দাগ্য উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ; কালিদাসের ঋতুসংহার, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌, রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতি সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন প্রাচীন শাস্ত্র আধুনিক সংকল্পকে কীভাবে সমর্থন করে এবং তিনি প্রমাণ দেখিয়েছেন শাস্ত্রের মধ্যে সমকালীন ও চিরকালীন শিল্পধর্মের কথা রয়েছে।

শুধু প্রাচীন শাস্ত্র নয়, আধুনিক ভাস্কর্যের প্রবর্তক রদ্যাঁ, আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম জনক কানডেন্স্কি, জাপানের শিল্পপ্রবক্তা ওকাকুরা; সাহিত্যিক কবীর, Millet, রবীন্দ্রনাথসহ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীর—বিভিন্ন বই ও উদ্ধৃতি নিয়ে নিজের বক্তব্যের সমর্থন টেনেছেন। এজন্য তাঁর পড়াশোনার গভীরতা দেখে অবাক হতে হয়।

প্রধানত চিত্রশিল্পই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পালোচনার বিষয়। কিন্তু তাঁর শিল্পালোচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—চিত্রশিল্প আলোচনার মধ্যেই শিল্পের অন্যান্য শাখার সাধারণ ধারণা ও শিল্পসিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দেয়া। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকলা নির্ভর বিচার-বিবেচনাকে অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয় হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ তাঁর নন্দনতত্ত্বের পরিধি যেকোনো শিল্প। শিল্পতত্ত্বে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তাঁকে কখনো মনে হয় আনন্দবর্ধন বা বুদ্ধঘোষের মতো ভাববাদী, কখনো অ্যারিস্টটলের মতো ক্লাসিক, কখনো ক্রোচের মতো সজ্ঞাবাদী।[১০৮] এক্ষেত্রে অবনীন্দ্র গবেষক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়-এর মূল্যায়ন যথার্থ বলে আমরা মেনে নিতে পারি। তাঁর মতে, 'শিল্পতত্ত্বের প্রচলিত ভাবনার বেড়াজালে কখনো ঘুরপাক খাননি অবনীন্দ্রনাথ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হয়েছে তাঁর শিল্পভাবনা। শিল্পসৃষ্টির কাজে বিবিধ-বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনে। সেই অভিজ্ঞতার অন্তঃসার প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধমালায়।[১০৯] এসব প্রবন্ধমালায় উপমা-উদাহরণ ব্যবহারে যা লিখেছেন তার মধ্যে চিত্রজগুণ ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ চিত্রশিল্পের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে গ্রথিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যাকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়—তিনি বলেন, 'শব্দের সঙ্গে রূপ দিয়ে জড়িয়ে বাক্য হল উচ্চারিত ছবি। তেমনি চিত্র হল রূপ-রঙ ভাব-ভঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে চিত্রিত কথা।'[১১০]

মা যেমন তার সন্তানকে চাঁদ দেখাবার ছলে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেয়, অবাধ্য ও অমনোযোগী সন্তান চাঁদ দেখার ছলে খাওয়ার অনিচ্ছা ভুলে চাঁদের সম্মোহনী শক্তিতে অতৃপ্তি ভুলে তৃপ্তিতে খেয়ে নেয়। তেমনি উপমা-উদাহরণ প্রয়োগে, ভাষার জাদুতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে শ্রোতা-পাঠকের মনের গভীরে পৌঁছে দিয়েছেন সম্মোহনী শক্তিতে। যে শক্তিতে পাঠক মুহূর্তের মধ্যে কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করে আলোচ্য বিষয়ের সমধর্মী সাদৃশ্য চিত্র দেখতে পান।

অবনীন্দ্রনাথ রচয়িতাদের মাপকাঠি প্রসঙ্গে শিল্প ও দেহতত্ত্ব প্রবন্ধে বলেছেন, 'ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক'।[১১১]

তাঁর এই উক্তি দিয়েই তাঁর রচনা বিচার করা সম্ভব। আর এই অঘটনটি হচ্ছে তাঁর রচনাশৈলী। যে রচনাগুণে পাঠক অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে পারেন। ফলে অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলি পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে প্রাঞ্জল ও রসজ্ঞ পাঠ।

চৌদ্দ

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন অনন্য, তেমনি ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার মর্মগঠনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপুরুষ। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রকলার এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে অবাধ বিচরণ করে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। দুজনেই প্রথম বয়সে চর্চিত শিল্প শাখায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করে শেষ বয়সে শিল্পের শাখা বদল করে নিয়ে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। চিত্রকলার নির্দিষ্ট পথ খুঁজতে এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের মন্ত্রণাদাতা, সহযোগী ও সমর্থক। সজনীকান্ত দাস যথার্থই লিখেছেন :

> পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবি ভাবের সাধক, শিল্পী রূপের সাধক। রূপকুশলী কবি ও ভাবকুশলী শিল্পী অতি দুর্লভ, সহস্র বৎসরে তাঁহাদের একবার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু একই দেশে একই কালে মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

> দশ বৎসরের ব্যবধানে রূপদক্ষ কবির এবং ভাবদক্ষ শিল্পীর অভ্যুদয় পরমাশ্চর্য ব্যাপার। পৃথিবীর চরমতম আশ্চর্য—এইরূপ দুইজন বিরাট্ পুরুষের জন্ম একই ঠিকানায় ঘটিয়াছে।[১১২]

সজনীকান্তের মূল্যায়নের সুর ধরে আমরা বলতে পারি—অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে আছে কাব্যগুণ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আছে চিত্রজগুণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবপ্রধান কিন্তু চিত্রকলা কল্পনাপ্রধান। পক্ষান্তরে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ভাবপ্রধান কিন্তু তাঁর লিপিকলা কল্পনাপ্রধান।

মজার হলো—তাঁদের দুজনের জন্ম ও মৃত্যু সালের শেষ অঙ্কটি **১**। অর্থাৎ জন্ম যথাক্রমে **১৮৬১, ১৮৭১** এবং মৃত্যু যথাক্রমে **১৯৪১, ১৯৫১**। দুঃখের হলো—অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস আড়ম্বরের সাথে শান্তিনিকেতনে পালনের পরিকল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু **১৯৪১** সালের ৭ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিবসেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালনের জন্য তিনি যে ভাষণ তৈরি করেছিলেন তাতে লিখেছেন :

> আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিস্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। . . . আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।[১১৩]

রবীন্দ্রনাথ যেমন অবনীন্দ্রনাথের কাজের সহযোগী সমর্থক ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথও তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কাজের সহযোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যের চিত্রায়ণ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করেছেন, মৌলিক কল্পনায় স্টেজ বেঁধে রবীন্দ্রনাথের অনেক আকঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে এসরাজ বাজাতেন, লৌকিক সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ও উদ্ধারের কাজে সহযোগিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে গ্রামীণ সমাজের 'মাতৃভাণ্ডারে' সঞ্চিত অজ্ঞাতপরিচয়ে প্রচলিত শিশু-মনোরঞ্জনের মূল্যবান ছড়া সংগ্রহ করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির নেপথ্যে অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা। মূলত রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে প্রচণ্ড স্নেহ করতেন। অবনীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথকে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ জাপান ভ্রমণে গিয়ে সেখানে জাপানি চিত্রকলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঘরকুনো ভাইপোকে বিদেশ ভ্রমণে উৎসাহী করবার জন্য চিঠি লিখেছেন। সে চিঠিতে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[১১৪] এর প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের *আন্তর্জাতিকতাবাদ*। তাঁর প্রাচ্যবাদও এশিয়ার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। তিনি পশ্চিমের বৌদ্ধিক ঐতিহ্যগুলো মুক্তচিত্তে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। পক্ষান্তরে অবনীন্দ্রনাথের প্রাচ্যবাদ ছিল সচেতন চর্চার বিষয়। তিনি প্রতিটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিজস্ব উত্তরাধিকার ও প্রকাশবৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়েই জীবনের আরেকটি নান্দনিক এবং গভীরভাবে তৃপ্ত জীবনবোধের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন।[১১৫] এবার রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবন ও তাঁদের শিল্পকৃতির বিশ্লেষণ নিয়ে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে অবনীন্দ্র ও রবীন্দ্র স্বরূপ পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব। সমর ভৌমিক লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতার মধ্যে লেখার চিত্রধর্মিতা ও চিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

লিখনধর্মিতার যুগল মিলন ঘটেছে, অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমনি আমরা দেখতে পাই বাচ্য ও দৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে ছন্দস্পন্দের মণিকাঞ্চন সংযোগ।'[১১৬]

ভূদেব চৌধুরী *লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ* বইয়ের অবতরণিকায় লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান যেমন কবিতা আর সংগীতের মিশ্ররূপ; অবনীন্দ্রনাথের ছবিও তেমনি অংশত গান-কবিতা এবং অংশত চিত্রকলা।'[১১৭] আবার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখেছেন, 'পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য ছিল নিবিড়, শৈশব-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যও কম নয়। তবু ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে দুজনে ছিলেন পরস্পর বিপরীত। একজন আজন্মপরিণত যদি হন—আর একজন চিরশিশু।'[১১৮] রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বিচারে এই উক্তিগুলোর সাথে আমরা একমত পোষণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে নাম প্রবর্তন করেননি। দর্শকের বোধ ও অনুভূতির সমন্বয়ে রস আস্বাদনের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই নাম দিয়েছেন। কেন নাম দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিকেই আমরা সঠিক বলে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর যুক্তি হলো—মৃদু ইঙ্গিত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের রূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায়। সেই ইঙ্গিতের নাগাল ধরাতেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে নামের প্রবর্তন করেছেন।[১১৯]

শিল্প ও ব্যক্তি চরিত্র বিশ্লেষণে এই দুজন দ্রষ্টার সম্পর্কে বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ সবকিছুর মাঝখানে থেকেও সবার উর্ধ্বে। অবনীন্দ্রনাথ যেখানে সবকিছুর উর্ধ্বে, সেখানেও নিজেকে মিলিয়ে দিতেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা অনেকটা তাঁদের শৈলীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু শিল্প দর্শন ও মননে তাঁদের মধ্যে মিলই বেশি। এ প্রসঙ্গে ড. সুধীর কুমার নন্দীর *অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ* প্রবন্ধের ব্যাখ্যার সাথে আমরা একমত পোষণ করতে পারি। সুধীর কুমার নন্দী এই দুই ব্যক্তির শিল্প চেতনার অনেক ঐক্য বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের রচনার উদ্ধৃতি তুলে ধরে। তিনি দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্র শিল্পে ও শিল্পদর্শনে আনন্দবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উভয়েই শিল্পানন্দ ও ব্রহ্মানন্দকে এক কোটির বলে স্বীকার করেছেন। দুজনের শিল্পদর্শন ব্যাখ্যা প্রধানত স্বজ্ঞা বা Intution আশ্রয়ী। আনন্দের সন্ধানকে এঁরা দুজনেই রূপের সন্ধান বলে গ্রহণ করেছেন। দুজনেই অনুকৃতি তত্ত্বের বিরোধী অর্থাৎ গ্রিক দার্শনিক আরিস্ততলের সমগোত্রীয় এবং এঁরা উভয়েই তাঁদের পরবর্তী যুগকে প্রতিফলিত করেছেন আপন শিল্পচিন্তায় ও শিল্পদর্শনে।[১২০] সর্বোপরি বলা যায়—সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের স্ব স্ব সৃষ্টির রাজ্যে ভারত সংস্কৃতির মূলধারা অর্থাৎ অধ্যাত্ম সংস্কৃতিকে স্বীকার করে চিরাচরিত দেশকালধৃত বহুল ব্যবহারে জীর্ণ শিল্পরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।[১২১]

পনেরো

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও শিল্পদর্শন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিকগণ তাঁদের মতামত দিয়েছেন এবং অনুধাবন ব্যক্ত করেছেন। এ পর্যায়ে সেই সব মূল্যায়নগুলোর উদ্ধৃতি তুলে ধরে

অবনীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেষ্টা করা হবে। যা পরে গবেষণালব্ধ অনুধাবনের মতামতটি তুলে ধরতে সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে।

শিল্পী নন্দলাল বসুর মতে, আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীন্দ্রনাথ।[১২২] তিনি ভারতশিল্পকে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় শিল্পশৈলী অর্থাৎ অজন্তা, মোগল, কাংড়াশৈলীর বিধিবদ্ধ কারুকুশলতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে রসানুভূতি প্রকাশের অব্যাহত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।[১২৩] অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর মতে, শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্প শৈলীই নয়—অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্প প্রতিভায় বিভিন্ন দেশজাত বিভিন্ন শিল্প কলমের সার্থক সমন্বয় করেছিলেন। শিল্পসৃষ্টির পরীক্ষামূলক সন্ধানে তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছিলেন ব্যকরণনির্ভর দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থেকে। তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে আবেগপ্রবণ, গীতময়, স্বপ্নাচ্ছন্ন চিররহস্যময় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায়।[১২৪] কৃষ্ণলাল দাস-এর ব্যাখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ সবরকম শিল্পমত ও পথকে তাঁর নিজস্ব স্রোতের আবর্তে যুক্ত করেছেন অনুকরণ না করে। মোগল ও রাজপুত চিত্রের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করেছেন পশ্চিমদেশীয় শিল্প অধ্যয়নকে ব্যবহার করে। তাঁর আলোছায়া প্রয়োগ কৌশলে রেখার কঠোরতা ঘুচে গেছে এবং ভারতীয় রীতির প্রাণকণিকা আহত না হয়ে বরং রেখা সঞ্জীবিত ও পুষ্ট হয়েছে। মডেলিং তুলেছেন এমন কৌশলে যাতে ভারতীয় ভাবধারা ক্ষুণ্ন না হয়ে শিল্পীর উন্নত রূপানুভূতি ও প্রতিভা প্রতিভাত হয়েছে।[১২৫] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশৈলীর উৎকর্ষ নিয়ে লিখেছেন, 'পাশ্চাত্য শিল্পের আঙ্গিককে তার স্বধর্মে স্থিত রেখে ভারতীয় বা চীনা বা জাপানী আঙ্গিকের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটানো আধুনিক প্রাচ্য শিল্পীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা ছিল। অবনীন্দ্রনাথ সেই সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন; সেই হিসাবে আধুনিক প্রাচ্য শিল্পের ইতিহাসে তিনি অনন্য।'[১২৬]

অবনীন্দ্রনাথের ল্যান্ডস্কেপ বিশ্লেষণে তপন ভট্টাচার্য লিখেছেন, ওয়াশ টেকনিকের সাথে তিনি জলে-ধৌত প্রকৃতি এঁকে বাংলার সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন নিজস্ব ভাষায়। চীন-জাপানের ছবির প্রভাব শিল্পীর নিজস্ব ভাষা হিসেবে প্রকাশের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। তাঁর ল্যান্ডস্কেপ স্মৃতিনির্ভর করে আঁকা। যা দেখতে ফরাসি impressionist-দের মতো মনে হয়। সাদৃশ্যকে মৃন্ময়, চিন্ময়, রহস্যঘেরা করে আঁকার এক রোমান্টিক প্রবৃত্তি।[১২৭]

সৈয়দ মুজতবা আলী অবনীন্দ্র চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে এক অদ্ভুত আস্বচ্ছ রূপ আছে—এ রূপ পৃথিবীর অন্য কোনো চিত্রে দেখা যায় না। এই অবর্ণনীয় রূপ তিনি সঙ্গীত হইতে গ্রহণ করিয়া চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই জানেন অবনীন্দ্রনাথ বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্গীত সাধনা করেন। সঙ্গীত ধ্বনি দৃষ্টিবহির্ভূত; তিনি ধ্বনিকে রূপায়িত করিয়াছেন—তাই তাঁহার চিত্রের এই আস্বচ্ছ শৈলী।[১২৮]

অশোক মিত্রের মতে, প্যাস্টেল বা ক্রেয়নের সাহায্যে ছবিতে ভিনিশান রং আনতে অবনীন্দ্রনাথই প্রায় একমাত্র পারদর্শী শিল্পী। তিনিই প্রথম তেলরঙের রীতিকে জলরঙের রীতিপদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতীয় চিত্র-জগতে ল্যান্ডস্কেপ ও পোর্ট্রেট-এ তাঁর দান অত্যন্ত বেশি। পোর্ট্রেট শিল্পে তাঁর সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেউ ছিলেন না। পোর্ট্রেটে শরীরের চামড়ার বুননি ও টেক্সচার তাঁর মতো আর কেউ আনতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেননি। ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে ইউরোপীয় রং ব্যবহার করে দেশি ভাবাদেশ সৃষ্টি করেছেন। ল্যান্ডস্কেপ এই রীতি বর্ণনাত্মক।[১২৯]

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর বিশিষ্টতা হোল গীতিকবিতার মত মাধুর্য ও লাবণ্যমণ্ডিত; সর্বদা স্বপ্নালু ও রসাবেশময়। অথচ বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। প্রত্যক্ষবাদী স্থূল রূপের অনুকরণমূলক নয়। আদর্শবাদী রচনার শিহরণ ও স্পন্দনে পরিপূর্ণ। তুচ্ছকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর চিত্ররচনার আর একটি বিশিষ্ট গুণ।[১৩০] ১৯৫৫ সালে কমলকুমার মজুমদার 'অবনীন্দ্রনাথের শেষের কাজ' প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> ছোট্ট একটি পিউরীর ফোঁটা যে কি অসম্ভব সত্য, কি অদ্ভুতভাবেই না সে-ফোঁটা দেখা শোনা জগতের বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তা অবনীন্দ্রনাথের 'সাঁওতালী মেয়ে' ছবিটি দেখলে বোঝা যায়। ছোট ফোঁটা দিয়ে বিরাট অস্তিত্বকে ধরার রহস্য একমাত্র তাঁরই জানা ছিল। এইরূপে কোথাও ফিরোজা, কখনও লাল, ক্কচিৎ সবুজে পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুরই মূল কথাটি অবনীন্দ্রনাথ আমাদের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন; রঙ এখানে একাধারে যেমন বাস্তবতাকে আনে, তেমনি সেই সঙ্গেই চিত্রের অন্তর্নিহিত কাব্যকে উল্লেখ করে।[১৩১]

এই সূত্রে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী, রূপকার, যোগী নন, দার্শনিক নন। একের সাধনা তিনি করেননি, বিচিত্র রূপ-লীলার প্রতিটি প্রকাশকে রেখা-বন্ধনে চিরন্তন করা ছিল তাঁর শিল্পী-মনের ধর্ম, তাঁর সাধনা। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে বিশ্ব-বিশ্লেষণ তাঁর এলাকা নয়, কার্যকারণের হেতু দেখানো তাঁর কাজ নয়। প্রতিটি লীলার রস-ঘন রূপ-রেখায় ফুটিয়ে তোলা তাঁর কাজ।[১৩২]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়নেও একই সুর ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন, 'শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের জীবন ভারতের সহজিয়া সাধকদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ তাঁর শিল্প ও শিল্পচিন্তা অনায়াসে আত্মপ্রকাশ করেছে। তথ্যের ভারে তাঁর জীবনের কোনো অংশই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রতিভার এই সহজ গতি আধুনিক কালের ইতিহাসে দৈবাৎ লক্ষ্য করা যাবে।'[১৩৩] অবনীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থচিত্রণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের *নদী* কবিতায়। কবিতাটি ছাপা হওয়ার পর, সেই ছাপানো হরফের ও ৩ লাইনের ফাঁকে ফাঁকে সরু রেখার প্রত্যেক স্তবকের আলাদা আলাদা দৃশ্যরূপ ফুটিয়েছেন। পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছেন—'বাংলা গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের এই দুঃসাহসী দক্ষতায় তৈরি আশ্চর্য সৃষ্টির জুড়ি নেই আর। হয়তো পৃথিবীতেও তা দোসরহীন।'[১৩৪]

চিত্র ৪১ : নদী কবিতার অলংকরণ (মুদ্রিত গ্রন্থের পাতায়)

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও বিভিন্ন গুণিজনের বিশ্লেষণ ও মন্তব্য তুলে ধরার অবকাশ আছে। সেক্ষেত্রে বিনোদবিহারীর মূল্যায়ন যুক্তিসংগত। তিনি অবনীন্দ্রনাথের প্রধান ক্ষেত্র সাহিত্য না চিত্রকলা সে প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মূল্যায়ন হচ্ছে, 'সাহিত্যিকের অনুভূতি, চিত্রকরের দৃষ্টি—এই দুইয়ের মিশ্রণ এবং অন্যদিকে দুয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে।'[১৩৫] ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্যে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সার্বিক চরিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, "অবনীন্দ্রনাথ চিত্র-ভাষার ঐ 'করণ-কৌশলকে লিপির ভাষাতেও সমর্পণ করতে পারলেন প্রতিভার আশ্চর্য যাদুস্পর্শে। ফলে, তাঁর লিপি-শিল্পের সর্বাঙ্গ জুড়ে জমেছে অর্থবন্ধনমুক্ত কল্পনার অবাধ-প্রসার,—ছবির ভাষার মত সর্বজনীনতাই যার আন্তরিক স্বভাব;—অথচ কিছুতেই যা অর্থহীন নয়।"[১৩৬] পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর *রূপসী বাংলার দুই কবি* গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথকে *কবি* আখ্যা দিয়েছেন।[১৩৬(ক)] এই গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশ ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্প চেতনা ও শিল্পসম্ভারের অন্ত্যমিল ব্যাখ্যা করে দুজনকেই রূপসী বাংলার কবি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ষোলো

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দিক—তিনি একজন সার্থক ও মহৎ গুরু। শিল্পজগতের ইতিহাসে তাঁর মতো সার্থক গুরু দুর্লভ। নির্দিষ্ট রুটিন ধরে পাঠ দেয়ার বিরোধী ছিলেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরার আদর্শ নীতিতে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও ভাবকল্পনা গড়ে তোলার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পড়ে শোনাতেন, নাটক দেখতে বলতেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তিনি ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা দিয়েছেন। শিল্পক্ষেত্রে তিনি যে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন তার অগ্নিশিখা স্নেহভরা মমতায় প্রজ্বালন করে দিয়েছেন ছাত্রদের মাঝে। ছাত্রদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তি প্রতিভাকে বিকশিত হতে সাহায্য করতেন। তাঁকে অনুসরণ করতে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন না এবং নিজের মতামত ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না। অসীম ধৈর্য নিয়ে স্নেহভরে ছাত্রদের কাজের ভুলত্রুটি শুধরে দিতেন। নিজের কাজে ভুল দেখিয়ে ছাত্রদের শেখাতেন। অ্যালবাম দেখাতেন, গল্প শোনাতেন। সবসময় চাইতেন তাঁর ছাত্ররা যেন তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। শুধু শিল্পশিক্ষা নয়, ছাত্রদের সকল অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ রাখতেন। ছাত্রদের মুখ দেখে তাদের অভাবের ভাষা বুঝতেন, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করতেন। ভারতবর্ষের বিচিত্র পরিবেশ ঘুরে দেখার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে স্কলারশিপ দিতেন।[১৩৭] ছাত্রদের উৎসাহিত করতে তাঁদের ছবি কিনতেন; অনেক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতেন না এই ভেবে, পাছে ছাত্রদের ছবি বিক্রিতে অসুবিধা হয়। ১৯২৩ সাল থেকে অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য নন্দলাল বিশ্বভারতীর কলাভবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর শিল্পশিক্ষা পরিচালনায় গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিতেন। অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বাৎসরিক প্রদর্শনীর কাজগুলো দেখে মতামত দিতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংশোধন করে দিতেন এবং পোস্টকার্ডে কলাভবনের শিল্পীদের কাছে নানান প্রশ্ন পাঠাতেন। যার মধ্যে থাকত শিল্পের অনেক গভীর উপলব্ধিমূলক উক্তি।[১৩৮] শান্তিনিকেতন থেকে নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এলে তাঁদের মধ্যে গুরু-শিষ্যে যে আলাপ হতো সে প্রসঙ্গে জসীম উদ্‌দীনের বর্ণনায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটি ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'মুখের কথায় নয়। যেন অন্তরে অন্তরে—যেন

হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বিনিময় হইত। গুরুর সামনে একটি চেয়ার লইয়া নন্দলাল বসিতেন। গুরু ছবি আঁকিয়া যাইতেন, মাঝে মাঝে দু-একটি কথা। ডাহুক-মাতা যেন গভীর রাত্রিতে তার বাচ্চাদের আদরের কথা শুনাইতেছে।'[১৩৯]

অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছেন যেসব শিল্পী ও শিষ্য তাঁদের মধ্যে মুকুল দে ও দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর মন্তব্যে গুরু হিসেবে অবনীন্দ্রনাথকে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য ব্যক্ত করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে। মুকুল দে অবনীন্দ্রনাথকে বিশ্বশিল্পী আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা—'অবন ঠাকুর না থাকলে কি মুকুল দে কখনো তৈরি হত?'[১৪০] দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 'গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েক বছর' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে সর্বসমক্ষে আমার আত্মমর্যাদা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত করে দিতাম। তাঁহার পদধূলি মাথায় নিয়ে জানাতাম, তোমার দেওয়া যৎকিঞ্চিৎ নিয়েই আমার পরিচয়।'[১৪১]

সতেরো

ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য শিল্পের মানদণ্ডে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মকে কেউ কেউ পুনরুজ্জীবনবাদী (Revivalist) বলে ব্যাখ্যা করেন। সত্যিকার অর্থে অবনীন্দ্রনাথ পুনরুজ্জীবনবাদী ছিলেন না। তাঁর শিল্পচর্চাকে ভারতীয়ত্বের মাপকাঠিতে বিচার করাও অনুচিত। কারণ তাঁর প্রতিভা ভারতীয়ত্ব ছাপিয়ে বিশ্বত্বে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মৌলিক শিল্প রচনা করেছেন। জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণায় পাশ্চাত্যের আরোপিত প্রভাবের বিপর্যয় ঠেকাতে সাময়িক উপায় হিসেবে তিনি প্রাচীন শিল্প চর্চার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্ম নিষ্কাশন করে নিয়ে তার সাথে নিজের প্রতিভা যুক্ত করে শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকতার ভাষা নির্মাণ করেছিলেন, যা ভারতীয় প্রাচীন হতে অতি নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠিত কোনো শিল্পরূপ ও শিল্পশৈলীর অনুবর্তন নয়। তিনি শুধু শিল্পের শেকড় সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। অতএব, অবনীন্দ্রনাথ রিভাইভ্যালিস্ট ছিলেন না। রামন শিবকুমারের মতে, আদি গুণমুগ্ধদের সীমাবদ্ধতার কারণে অবনীন্দ্রনাথ পুনরুজ্জীবকের ভুল ব্যাখ্যার আবর্তে পড়েছিলেন। বাংলায় জাতীয়তাবাদের জোয়ারের সমকালে তাঁর শিল্পীজীবনের সূত্রপাত হওয়ায় গুণমুগ্ধ সমালোচকরা অবনীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবাদী ঘরানার নেতা হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর শিল্পকর্মের নতুন পদক্ষেপ বিবেচনা না করে পুরাতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ হিসেবে। এই ভুল ব্যাখ্যাই পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীকুল ও শিল্পালোচকরা মেনে নিয়েছেন।[১৪২] প্রকৃতপক্ষে, অবনীন্দ্রনাথের কাজের মধ্যে কোনো একটা পুরনো ধারার পুনরাবৃত্তি খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। যিনি *খুদ্দুর যাত্রা* ও *কুটুম-কাটাম*-এর মতো উত্তর-আধুনিক শিল্পকর্মের স্রষ্টা তাঁকে 'পুনরুজ্জীবনবাদী' শিল্পী হিসেবে মূল্যায়ন করা অর্থহীন। তাঁর নন্দনতত্ত্বের মধ্যে তাঁর শিল্পের আদর্শ লুকানো, যা প্রমাণ করে তিনি রিভাইভ্যালিস্ট নন। কারণ তিনি বলেছেন—'এটা মনে রাখা চাই যে আগে শিল্পী ও তাঁহার সৃষ্টি, পরে শিল্পশাস্ত্র ও শাস্ত্রকার—শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র।'[১৪৩] তা ছাড়া, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী যিনি লিখেছেন, যাঁর নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক কোনো লেখায় পুনরুজ্জীবনবাদের সমর্থন নেই তাঁর প্রথম পর্যায়ের গুটিকতক কাজের বিচারে তাঁকে পুনরুজ্জীবনবাদী আখ্যা দেয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু 'পুনরুজ্জীবনবাদী' আখ্যাই নয়, তাঁর নিজস্ব সাধনায় আবিষ্কৃত প্রাচ্যরীতির চিত্রনির্মাণ যখন জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব ব্যাখ্যায়িত হয়ে শিষ্যদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে আন্দোলনে রূপ নিল তখন তাঁকে অনেক বিদ্রূপও সইতে হয়েছিল। তাঁর প্রবর্তিত ধারা নব্য-বঙ্গীয় শিল্পধারা আখ্যা হলেও এই রীতির চিত্রকলায় বাংলার বিশেষ কোনো ঐতিহ্য বহন করেনি। সমগ্র ভারতবর্ষে ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারার শেকড় থেকে এবং প্রাচ্যদেশীয় শিল্পধারার মিশ্রণে রূপ পেয়েছিল তাঁর চিত্ররীতি। যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারার গৌরব স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল এবং যেহেতু সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে বাংলায় নব-প্রবর্তিত শিল্পধারাটি ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারার পরম্পরার সাথে সংগতি রেখে সৃষ্টি হয়েছিল সেহেতু এই রীতিকে ভারতের আধুনিক রীতির সূচনা বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই আন্দোলন বাঙালি শিল্পীদের সাধনায় বাংলায় জন্ম হয়েছিল বলেই নব্য-বঙ্গীয় শিল্পধারা নামে প্রচারিত হয়েছে।

নব্য-শিক্ষিত বাবু ও ঔপনিবেশিক শাসনে দাসত্ব মনোভাবকারী শিল্পবোদ্ধারা শেকড়সন্ধানী ভারতীয় তথা প্রাচ্যধারার আবহ তৈরির এই নতুন শৈলীকে সহজে মেনে নেননি। ফলে অবনীন্দ্রনাথের কাজকে নতুন পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা না করে অতীতচারিতার মিথ্যে অপবাদ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দোষত্রুটি দেখিয়ে অপব্যাখ্যা করেছেন। নব্য শিক্ষিত সমাজ কারিগরি কাজ দেখে এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে শিল্পবস্তু ও রসবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন না। তাঁর পাশ্চাত্যের আলোছায়া, পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবানুগ অঙ্গসংস্থান বিদ্যাকে আদর্শ ধরে চিত্র-সমালোচনা করতেন। তাঁরা যুক্তির চেয়ে বিদ্রূপ এবং রসের পরিবর্তে কৌশলের প্রতি জোর দিয়েছেন। তাঁরা ভুলেছিলেন প্রকৃত শিল্পে তত্ত্ব বিচার করে ব্যাখ্যা অবিচার। এই শ্রেণির শিল্প-বিশ্লেষকদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির[১৪৪] ভূমিকাই অগ্রগণ্য।

অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলো প্রথমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত *সাহিত্য* পত্রিকায় তিনি বিদ্রূপ সমালোচনা করতেন। কলা-সমালোচনার ক্ষেত্রে *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লিখতেন। ফলে তাঁর সমালোচনা হতো নিজস্ব শাস্ত্রজ্ঞান, রুচি ও মতামতে।

আঠারো

ভারতে আধুনিক চিত্রকলার সূচনায় অবনীন্দ্রনাথ প্রথম পুরুষ, একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যেতে পারে। কারণ তাঁর প্রবর্তিত চিত্ররীতির পথ ধরেই ভারতে আধুনিক চিত্রকলার সূচনা ঘটেছিল। তাঁর উত্তরসূরিরা মহাদেশীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রাচ্যের নিজস্ব শিল্পপন্থায় কাজ করেছেন। সেক্ষেত্রে প্রাচ্যশিল্প বিকাশে অবনীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম।

*কলকাতা আর্ট স্কুল*কে কেন্দ্র করে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা বিকাশ লাভের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিষ্যরা এসেছেন, যাঁরা ভারতের বিভিন্ন আর্ট স্কুলে শিক্ষক হয়ে শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন। ফলে তাঁদের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার বিস্তার ঘটেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এই চিত্ররীতি প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলার গভর্নর, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও শিল্পরসিকদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্কই ছিল প্রধান।

তিনি জাতীয় জীবনে একটা আর্ট মুভমেন্ট দিয়েছেন ও চেতনা জাগিয়েছেন আমাদের দেশজ ঐশ্বর্যের প্রতি। ফলে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরা নানা পথ ও নানান অভিজ্ঞতার মিশ্রণে নিজেকে চিনে নিতে পারছেন উত্তরোত্তর আধুনিকতায়।

চারুকলা চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষানীতি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আদর্শ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন অনেক গুণী শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে ভারতের শিল্পজগতে।

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর বিভিন্ন দায়িত্বভার পালন করে তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা প্রচার প্রসারে অনেক অবদান রেখেছেন। ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষকতা, সোসাইটির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি শিল্প-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শিল্প বিষয়ের আলোচনা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি নানান বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জলরং টেকনিকের সমন্বয় করে চিত্রকলায় তিনি *ওয়াশ পদ্ধতি*র উদ্ভাবন করেছেন। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা বিকাশে এই ওয়াশ পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। বলা যায়, বর্তমান অবধি ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলায় কোনো-না-কোনোভাবে এই ওয়াশ টেকনিকের প্রভাব থাকছে।

নিজের ঐতিহ্যকে চিনে নিতে, উন্নত শিল্পবোধ ও রুচিবোধ তৈরি করতে তাঁর শিল্পবিষয়ক বই ও প্রবন্ধাবলি প্রাচ্যরীতির শিল্পীদের মানস গঠনে ভূমিকা রাখছে।

বৃহত্তর ভারত-শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা, চারু ও কারুকলা শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষার মানোন্নয়ন করেছেন।

লাহোরবাসী মুসলিম চিত্রকর আবদুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৪–১৯৭৫) অবনীন্দ্র চিত্ররীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচ্যরীতির এক নিজস্ব শৈলী রচনা করেন। তাঁর কাজ অবিভক্ত ভারতে মুসলিম সমাজে এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা বিকাশে অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো দিক হচ্ছে বর্তমান ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে *ইন্ডিয়ান আর্ট* নামে যে শিল্পশিক্ষা চালু আছে তা কলকাতা আর্ট স্কুলের ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সংস্কারিত নাম। তা ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিল্পশিক্ষায় অবন প্রবর্তিত রীতির চর্চা হচ্ছে।

উনিশ

কবিসুলভ রোমান্টিক অভিব্যক্তি ও আভিজাত্যের সৌরভে আচ্ছন্ন অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। এ কারণেই হয়তো তাঁর চিত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বয়ে চলা বৃহত্তর জীবনসংস্কৃতির উপস্থিতি কম। এটা তাঁর কাজের একটি দুর্বল দিক। তা ছাড়া ১৯০২ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের

বাঁধভাঙা জোয়ারের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে চিত্রকলার বিষয়ের ক্ষেত্রে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষিত হয়ে শুধুই স্বদেশি ভাবে ভরা অতীত সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর হয়েছে।

শিল্পী দর্শক সমালোচক গ্রন্থে আবুল মনসুর অবনীন্দ্রনাথের প্রধান দুর্বলতা হিসেবে তাঁর কারিগরি দিককে চিহ্নিত করেছেন, যা তাঁর মোগল পদ্ধতির সিরিজচিত্রে লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, এসব চিত্রের রেখা দ্বিধাগ্রস্ত, রং ম্যাটমেটে এবং ছবির নির্মাণে অনিশ্চয়তা। এ ছাড়া শিল্পকলায় সর্বভারতীয় উপাদান সংযোজনের অভাবকে দ্বিতীয় দুর্বলতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৪৫]

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিশৈলীকে কেন্দ্র করে নব্য-বঙ্গীয় তথা প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এর পেছনে কারণ খুঁজলে কয়েকটি দুর্বল দিক চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন বাদে তাঁর সমকক্ষ উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন শিষ্য ছিলেন না। তাঁরা শুধু অবনীন্দ্রনাথকে নকল করতে চাইতেন। ফলে চিত্রকলা ভাবাবেগপূর্ণ পুনরাবৃত্তিময় হয়ে এই ধারা হীনবল হয়ে পড়ে। মুকুল দে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও কিছুটা দায়ী করেছেন। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল, অসিতকুমার ও সুরেন কর প্রমুখ প্রাচ্যরীতির শিল্পীকে নিয়ে যাওয়ায় কলকাতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের শিল্পশিক্ষায় ভাটা পড়েছিল।[১৪৬]

উপরিউক্ত কারণগুলো স্বীকার করে নিয়ে আমরা বলতে পারি, প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা রচনার প্রধান টেকনিক ওয়াশ অনেক সময়সাপেক্ষ ও আরাধ্য বিষয়। সে ক্ষেত্রে শিল্প-শিক্ষানবিশরা পাশ্চাত্যের জলরং ও তেলরং টেকনিকের ওপর আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং নব নব সৃজনীশক্তির অভাবে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অতীতচারিতা, অতিপ্রাকৃত অভিব্যক্তি, প্রকৃতির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য, সমসাময়িক শিল্প সমঝদার এবং শিল্প-রসিকদের মন আকৃষ্ট করতে পারেনি। ফলে এ ধারার চিত্ররীতি স্তিমিত হচ্ছিল।

বিশ

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর শিল্পীজীবন, শিল্পকর্ম, শিল্পভাবনা ও বাংলার প্রাচ্যশিল্পে তাঁর অবদান নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো নজরে এসেছে তা নিম্নরূপ :

(১) রবিবর্মাদের সহজ বাস্তবতা[১৪৭] থেকে ছবিকে মুক্তি দিতে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্ররীতি গড়ার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পশ্চিমি অভিঘাত থেকে মুক্তি ও ঐতিহ্যকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করার প্রত্যয়ে তিনি ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার সূচনা করেছেন।

(২) একাধারে তিনি প্রাচীন রসশাস্ত্রের রাগ ও রংকে মিলিয়ে নিয়ে ছবি এঁকেছেন[১৪৮] এবং তিনিই কাজের মধ্যে প্রথম প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আদান প্রদান ঘটিয়েছেন।

(৩) তিনি ইউরোপীয়, ভারতীয় ও জাপানি শিল্প প্রকরণ আত্মস্থ করেছেন এবং এসব শিল্প প্রকরণের বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে নিজস্ব শিল্প প্রকরণ উদ্ভাবন করেছেন। এজন্য তাঁকে *সার-সংগ্রহকারী* শিল্পী বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) ঔপনিবেশিক শাসনের আগ্রাসনে ভারতীয় চিত্রকলার সংকট মুহূর্তে-বিশ্বের সামনে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার গরজে চিত্রকলায় জাতীয়তা ও পরম্পরার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা সমগ্র প্রাচ্যের পক্ষে ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় সংমিশ্রণজনিত শিল্পরীতি।

(৫) তিনি বৃহত্তর ভারত-শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। চীন, জাপান ও ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ নিয়ে তুলানামূলক আলোচনা করেছেন। নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। ফলে ঐহিত্য ও আধুনিকতার নিষ্পত্তিতে গোটা প্রাচ্যের পক্ষে আমরা পেয়েছি আধুনিক নন্দনতত্ত্ব।

(৬) মনের ঐশ্বর্য ও স্বপ্নবিলাসে তিনি পঠিত বিদ্যা কিংবা উপলব্ধ সত্যকে রূপ দিতে পারতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—তাজমহল না দেখে বর্ণনা পড়েই তাজমহলের ছবি এঁকেছেন।

(৭) ভারতের নিসর্গ চিত্রের ঐতিহ্য অনুসারে তিনি তাঁর নিসর্গ চিত্রণে আদর্শবাদী ও ভাবারোহী চিত্ররূপ দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে তিনি নিসর্গের যে রূপ আত্মস্থ করেছেন পরবর্তী সময়ে ইনডোর স্টুডিয়োতে বসে তার রূপায়ণ করেছেন, যা ইউরোপের নিসর্গ চিত্রণ পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

(৮) প্রতিকৃতি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিকৃতি ও মুখোশ সিরিজচিত্রে সমসাময়িক বাস্তবতার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়েছে। আরব্য রজনী উপন্যাসভিত্তিক সিরিজচিত্রে সমসাময়িক কলকাতার স্থানীয় জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন নব্য উপনিবেশের প্রভাবজনিত সাংস্কৃতিক ও মানবিক রদবদল চিত্র ফুটে উঠেছে। *কবিকঙ্কন চণ্ডী* ও *কৃষ্ণমঙ্গল* সিরিজচিত্রে, *খুদ্দুর যাত্রা*র পাণ্ডুলিপিতে রূপক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন বাস্তবতা। এ ছাড়া পুরী ভ্রমণের *নিসর্গ চিত্র*, *দার্জিলিং* সিরিজচিত্র, *শাহাজাদপুর* সিরিজচিত্রে সমসাময়িক নৈসর্গিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত হয়েছে চিরকালীন আবেদনে। সুতরাং বলা যায়, অবনীন্দ্রনাথের কাজ শুধু সাহিত্যনির্ভর নয়। সমকালীন অবস্থার প্রতিচিত্রণ বটে।

(৯) অবনীন্দ্র-সাহিত্যের উপাদানগুলো পৌরাণিক কাহিনি, রূপকথা, ইতিহাস, লোককথা, গৌতমবুদ্ধের গল্প, বিদেশি লেখকদের রচনা ইত্যাদি থেকে ধার করা। এই ধার করা উপাদান দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্বতা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ ধার করা সাহিত্যকে তিনি নতুন আঙ্গিকে নতুন রূপ দিতে পারতেন। এ ছাড়া জোড়াসাঁকোর ধারে, ঘরোয়া, আপন কথা ইত্যাদি নিজের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও এর রয়েছে পরিপূর্ণ সাহিত্যিক মূল্য।

(১০) অবনীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন গ্রন্থচিত্রণ দিয়ে। গ্রন্থচিত্রণে তিনি অত্যন্ত সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল বিজয়ের পর রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে। এসব রচনার চিত্রায়ণে অবনীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছেন অন্য শিল্পীদের সাথে। রবীন্দ্রনাথের The Crescent Moon (1920), The Parrot's Training (1918), Gitanjali & Fruit-Gathering (1918) গ্রন্থের জন্য অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্র স্বতন্ত্র চিত্র হিসেবেও মূল্যবান। বিশেষত *The Crescent Moon* গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও অসিত হালদারের নব্য-বঙ্গীয় চিত্র দ্বারা শোভিত হয়েছে। সুশোভন অধিকারীর দৃষ্টিকোণ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'সদ্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত লেখার সঙ্গে গাঁথা বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

এই চিত্রকলা—একই সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছে সমগ্র বিশ্বের দরবারে। সেদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত তৎকালীন নব্য বঙ্গীয় ছবির আন্দোলনের ও এই চিত্রশোভিত বইটির ভূমিকা বড় একটা কম নয়।'[১৪৯]

চিত্র ৪২ : The Crescent Moon (১৩২০) গ্রন্থচিত্রণ
'জগৎ পারাবারের তীরে'

চিত্র ৪৩ : Gitanjali & Fruit-Gathering (১৯১৮) গ্রন্থচিত্রণ
'গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি'

(১১) চিত্রকলায় তিনি পৌরাণিক, বৌদ্ধ-বিষয়ক, ঐতিহাসিক, প্রতিকৃতি, দৈনন্দিন জীবনচিত্র, পশু-পাখি চিত্রণ, স্থানচিত্র, ব্যঙ্গচিত্র, পুস্তক চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করেছেন। আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদ্য, গদ্য, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক, যাত্রাপালা, পুঁথি, স্মৃতিকথা, নন্দনতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র, অনুবাদ, গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে লিখেছেন। অতএব সাহিত্য ও চিত্রকলায় তাঁর বিচরণ বিচিত্রমুখী।

(১২) তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, আরবিসহ বিভিন্ন ইসলামি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এসব ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত দখলের প্রমাণ মেলে তাঁর রচনায়।

(১৩) ভালো এসরাজ বাজাতেন, গানের প্রতি ঝোঁক ছিল। তাই তাঁর লেখায় রসের জোগান দিতে গিয়ে রামপ্রসাদী, বৈষ্ণবগান, কাঙাল হরিনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকের অনেকরকম গানের প্যারোডি ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর প্রতিভার স্বচ্ছন্দ উল্লাসের প্রকাশ।

(১৪) ফটোগ্রাফিক ড্রয়িং ও আলোছায়া ব্যবহার না করে তিনি স্বাভাবিক ড্রয়িংকে কাব্যিক প্রয়োজনে ছন্দোময় করেছেন। ফলে তাঁর চিত্র অসামঞ্জস্য না হয়ে দেহগত অংগসংস্থান যুক্তিসংগত বাস্তবধর্মী হয়ে লাবণ্যময় হয়েছে।

(১৫) তিনি চিত্রের মধ্যে আরবি ও উর্দু হরফের আদলে বাংলা লেখার উদ্ভাবক।

(১৬) গবেষণামূলক পুস্তিকা *বাংলার ব্রত*-এর প্রতিবেদনে ব্রতের বিস্তারিত বিবরণ দিতে অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ও নারীসমাজের মনের কথা তুলে ধরেছেন। এতে তাঁর লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও গভীর জ্ঞান প্রতীয়মান হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(১৭) আলপনা বাংলার আদিম নিবাসীদের অপরূপ চিত্ররীতি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম[১৫০] এই চিত্র সংগ্রহ করে তাঁর 'বাংলার ব্রত' পুস্তিকায় ব্রতকথার ছড়ার সঙ্গে প্রকাশ করেন। ফলে বাংলার এই প্রাচীন চিত্ররীতির সৌন্দর্যের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হয়েছি।

(১৮) অবনীন্দ্রনাথ লোকশিল্পের সংগ্রাহক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের সাথে অবনীন্দ্রনাথ গ্রাম-বাংলার ছড়া সংগ্রহ করেছেন। বাংলার এই লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের প্রমাণ মেলে তাঁর "ছেলেভোলানো ছড়া" প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি ছড়ার প্রাণকথা, ছড়ায় দেশ কালের ছাপ, ছড়ার চিত্রধর্মী খবর; ছড়ার উদ্দেশ্য, ছড়ার বৈশিষ্ট্য, ছড়ার রস প্রভৃতি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন।

(১৯) ছোটো পরিসরে ছবি আঁকা, নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বড়ো মাপের কম্পোজিশনের সংঘাত ও তীব্রতা তাঁর মন টানেনি। তুলির সূক্ষ্ম খেলার মেজাজ তাঁর পছন্দ ছিল।

(২০) তিনিই প্রথম স্বচ্ছ জলরঙে ছবি আঁকার প্রচলন করেছেন। এর পূর্বে এ দেশে অস্বচ্ছ জলরং বা গোয়াশ পদ্ধতিই চালু ছিল। এ ছাড়া মিশ্র মাধ্যমকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর *কবিকঙ্কন চণ্ডী* ও *কৃষ্ণমঙ্গল* সিরিজচিত্রের মিশ্র মাধ্যমের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

(২১) সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরও ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রশিক্ষা দেয়া উচিত, এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন[১৫০(ক)] এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত অপূর্ব শিশু চিত্রশিক্ষার বই *সহজ চিত্রশিক্ষা*।

(২২) অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা থাকায় তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতির খুঁটিনাটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও লিপিশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একে অপরকে সমভাবে প্রতিফলিত করেছেন। অর্থাৎ এ দুই শিল্প প্রতিভার সমন্বিত প্রকাশই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা।

একুশ

উপসংহার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে, চিত্রকলায়, গবেষণায়, সংগঠন পরিচালনায়, গল্প বলায় ছিলেন অনন্য। সাহিত্য, চিত্রকলা, দর্শন, শিক্ষা, ব্রতকথা যা কিছু নিয়ে তিনি কাজ করেছেন সবকিছুতেই সৃজনশীলতার নজির রেখেছেন। বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সার্থক উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

তাঁর ড্রয়িং-এ আছে শৈল্পিক গড়ন, ওয়াশ টেকনিকে আছে কাব্যময় ব্যঞ্জনা, রঙের ব্যবহারে আছে জাদুকরী দ্যুতি, পোর্ট্রেট রচনায় আছে নাটকীয়তা। তিনি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচ্যের চিত্রকলার ধারা থেকে পাঠ নিয়েছেন। পৈতৃক ঐশ্বর্য চিনবার জন্য আমাদের মনে একটা চেতনা জাগিয়েছেন। তিনি তাঁর চিত্রকলায়, লেখায়, বক্তৃতায় ভারত-শিল্পের আধুনিকতার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দেখানো পথ ধরেই ভারতীয় চিত্রকলায় নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলায় যে পরিবর্তন এনেছিলেন তা অতীতের প্রতিষ্ঠিত রূপ ও ধারণায় রূপান্তরিত হয়ে সমসাময়িক উৎকর্ষে উন্নীত হয়েছিল এবং নতুন রূপ, রস ও অভিব্যক্তিতে বিকশিত হয়েছিল বলে তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার তথা ভারতশিল্পের আধুনিকতার জনক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ আত্মসচেতনতা। শিল্পের আত্মা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির শেকড়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলায় এই শেকড়ের সন্ধানী ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে যেটুকু অতীতচারিতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল তা ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর অন্যান্য সিরিজচিত্রে সেই অতীতচারিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং উত্তর-আধুনিক শিল্পকলায় তাঁর মূল্য অনেক বেশি।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সঠিক আদান-প্রদান অবনীন্দ্রনাথের তুলিতেই প্রথম হয়েছিল। বাংলার তথা ভারতবর্ষে প্রাচ্যরীতির শিল্পধারা প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলে নিজস্ব শিল্পধারা বিকাশের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম স্থানীয় শিল্পী, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পধারার মধ্যে গঠনমূলক সমন্বয় সাধন করেছেন। পরবর্তীতে অবনীন্দ্র অনুসারীদের প্রচেষ্টায় এই শিল্পরীতির একটি নির্দিষ্ট চরিত্র গড়ে উঠেছিল, যাকে গোলাম মুরশিদ *বাঙালি ঘরানা* নামে অভিহিত করেছেন।[১৫১] আসলে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল অবনীন্দ্র শিল্পরীতি। বাংলায় প্রথম এ আন্দোলন বিস্তার ঘটায় এর পরিচিতি নব্য-বঙ্গীয় শিল্পরীতি নামে। যেহেতু এই রীতি সমগ্র ভারত-শিল্পের আধুনিকতার অগ্রদূত হিসেবে বিস্তৃত হয়েছে সেহেতু একে *ভারতীয় আধুনিক শিল্পরীতি* আখ্যা দেয়া যায়। আবার এই শিল্পধারায় প্রাচ্যের দেশগুলোর শিল্পবৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়েছে। তাই প্রাচ্যরীতির শিল্প হিসেবেও পরিচিতি আছে।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন জাত-রসিক। ভারতশিল্পকে আধুনিক সংস্কারে তিনি কিছুটা জাতিবদ্ধ হলেও তাঁর ঔদার্য গণ্ডিতে বাঁধা পড়েনি। মুখোশ সিরিজ, কুটুম-কাটাম সিরিজ, কবিকঙ্কন চণ্ডী সিরিজ, কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজচিত্রে তার প্রমাণ মেলে। শিল্প সম্পর্কে শাস্ত্র লিখলেও তিনি শাস্ত্রসম্মত ছবি আঁকেননি। তাঁর চিত্রে বস্তুর গুণ প্রকাশ না হয়ে রূপের প্রকাশ হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির সর্বাঙ্গে লাবণ্যদীপ্তি।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পে প্রত্যক্ষধর্মী রূপের প্রকাশ করেননি। অবন-পরবর্তী ভারত শিল্পের পথিকৃৎরাও তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের চিত্রকলায় প্রত্যক্ষধর্মী রূপের প্রকাশ করেননি। শুধু নন্দলাল, যামিনী রায় কিংবা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাই নয়, বর্তমান অবধি ভারত-শিল্পের নানা ধারা-উপধারায় প্রত্যক্ষধর্মী রূপের প্রকাশ বর্জন করা হয়েছে। সেদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। ইংরেজ প্রবর্তিত একাডেমিক শিল্পশিক্ষার পর ভারতের শিল্পশিক্ষায় মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিকল্পনায় অবনীন্দ্রনাথ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্পের মানে ছিল 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা'। অর্থাৎ তাঁর মতে, শিল্প বিধাতার নিয়ম বহির্ভূত নিজের নিয়মে চলে। দায়ভাগের দোহাই বহন না করে।[১৫২] এই বিশ্বাসের জায়গা ধরেই অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের বিচার সম্ভব। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল শিল্প অনুধাবনের ক্ষেত্রে তিনিও ভাবচক্ষুর পক্ষপাতী ছিলেন।

চির-রসিক এই শিল্পী সারা বিশ্বের কল্পনালোক থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর সঞ্চয়ী মনে ধরে রাখতেন এবং ধ্যান, জ্ঞান ও বাস্তব দৃষ্টির সমন্বয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মে নব নব রসে রূপ দিয়েছেন। কি সাহিত্যে, কি চিত্রকলায়, তাঁর সৃষ্টির মূলতত্ত্ব রস।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে এ কথা বলা যায়—বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বিকাশে অবনীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের একাডেমিক শিল্পশিক্ষায় প্রাচ্যরীতির শিল্পচর্চা সে রীতির পথ ধরেই এগোচ্ছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা*, ১ম আনন্দ সং, কলকাতা, আনন্দ, মে ১৯৯৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫

২. কৃষ্ণ *কৃপালনী*, *দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ*, দ্র. ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনূদিত, নতুন অক্ষরবিন্যাসে দ্বিতীয় মুদ্রণ, নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০০, পৃ. 5

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯–১০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪–২৫

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৮. মুকুলেশ বিশ্বাস অবনীন্দ্রনাথের জীবনপঞ্জিতে অবনীন্দ্রনাথের বিবাহের সন ১৮৮৯ লিখেছেন। (মুকুলেশ বিশ্বাস, "অবনীন্দ্রনাথ : জীবন ও জীবনকথা", দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, *পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা*, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩২–৩৬, পৃ. ১৫৮) রামন শিবকুমার লিখেছেন ১৯৮৮ সালের অক্টোবর। (R Siva Kumar, *Painting of Abanindranath Tagore*, Kolkata, Pratikshan, 2008) বিভিন্ন বইয়ের তথ্যে অবনীন্দ্রনাথের বিবাহের বয়স সতেরো উল্লেখ আছে। সে হিসাব মতে রামন শিবকুমারের তারিখটি সংগতিপূর্ণ।

৯. অনির্বাণ রায়, *অবনীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, প্যাপিরাস, ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৬

১০. R Siva Kumar, *Painting of Abanindranath Tagore*, Kolkata, Pratikshan, 2008, P. 31 ও কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৭

১১. পূর্ণেন্দু পত্রী, "রবীন্দ্রনাথের লেখার ছবি", দ্র. অর্চি মিত্র (সংকলন ও সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথের লেখার ছবি*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, শ্রাবণ ১৪১৮

১২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১৩. *South Kensington School* ছিল তৎকালীন উপনিবেশিক আর্ট স্কুলের মডেল।

১৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬–১৫৭

১৫. R Siva Kumar, op. cit., P. 33

১৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

১৭. মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, *দক্ষিণের বারান্দা*, বিশ্বভারতী সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১৫৭

১৮. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

২০. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, কলকাতা, অরুণা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৩৬৭

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

২২. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৪, পৃ. ১২০

২৩. গৌতম দাস, *বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*, কলকাতা, পুনশ্চ, বইমেলা ২০০০, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

২৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঈ বী হ্যাভেল", দ্র. শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ বসু (সম্পা.), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর *প্রবাসী* ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১১

২৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২৬. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

২৭. কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৮

২৮. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২–১৬৩

২৯. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২–১৯৪০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন ঠাকুর পরিবারের *খামখেয়ালী সভার* উৎসাহী সভ্য। তিনি ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে যোগদানের মধ্যে দিয়ে নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৯০২ সালের প্রথম দিকে বিখ্যাত জাপানি শিল্পশাস্ত্রী কাজুজো ওকাকুরা কলকাতায় এলে–সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের বাড়িতে আতিথ্য দেন। সুরেন্দ্রনাথ ও ওকাকুরা একত্রে ভারতবর্ষ পরিক্রম করেছিলেন।

৩০. সত্যজিৎ চৌধুরী, "ওকাকুরা তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ", দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), *বিশ্বভারতীয় পত্রিকা : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২–২০০৬*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৫৪–২৫৫

৩১. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও.সি গাঙ্গুলী), *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*, কলিকাতা, এ. মুখার্জী, এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ২৩৮

৩২. পরিতোষ সেন, *কিছু শিল্পকথা*, সংশোধিত সংস্করণ, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪২–৪৩

৩৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৩৪. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৩৫. সত্যজিৎ চৌধুরী, "অবনীন্দ্রনাথ : নান্দনিক নিবন্ধমালা", দ্র. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য*, কলকাতা, করুণা, জুলাই ২০০৫, পৃ. ৭৮–৭৯

৩৬. রীণা ভাদুড়ী, *সমুদ্র-হিমাদ্রির মহাসঙ্গমে : ঠাকুরবাড়ি-আশুতোষ পরিবার সংযোগ*, কলকাতা, অঞ্জলি, জুলাই ২০১১, পৃ. ১১৯

৩৭. ড. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, [এ ছাড়া বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা, ও সি গাঙ্গুলী প্রমুখ লেখকদের বিভিন্ন রচনায় *ভারতমাতা* চিত্রের সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে।]

৩৮. উমা দেবী, *বাবার কথা*, দ্র. অরুণ দে (ভূমিকা, টীকা, সম্পা.), কলকাতা, দে'জ, আগস্ট ২০১০, পৃ. ২৮

৩৯. নিবেদিতা, "ভারত-মাতা", দ্র. শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ বসু (সম্পা.), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর *প্রবাসী* ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪

৪০. কমল সরকার, *রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ*, কলকাতা, রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৫৫

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫–৫৬

৪২. আবুল মনসুর, "বাঙালিবাবুর শিল্পযাত্রা", *কালি ও কলম*, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৯২

৪৩. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "অবনীন্দ্রনাথের শিল্প–প্রতিভা", দ্র. সাগরময় ঘোষ (সম্পা), *দেশ*, সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন ১৯৩৩–১৯৮৩, কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৬১

৪৪. R Siva Kumar, *op. cit.*, P. 86

৪৫. কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, প্রাগুক্ত, ১৯৮৪, পৃ. ১১

৪৬. অসিতকুমার হালদার, *অজন্তা*, দ্র. প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌম্যেন পাল (টীকা. সম্পা. সংযোজনা), সটীক লালমাটি সং, কলকাতা, লালমাটি, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩

৪৭. রীণা ভাদুড়ী, *সমুদ্র-হিমাদ্রির মহাসঙ্গমে : ঠাকুরবাড়ি-আশুতোষ পরিবার সংযোগ*, কলকাতা, অঞ্জলি, ৬ জুলাই ২০১১, পৃ. ১২০

৪৮. বারিদবরণ ঘোষ, "অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ", দ্র. তাপস ভৌমিক (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব*, কলকাতা, কোরক, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২০১

৪৯. মৃণাল ঘোষ, *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৩৯

৫০. প্রতিমা দেবী, *স্মৃতিচিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*, দ্র. সুনীল জানা (সংকলন ও সম্পা.), পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নূতন সং, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৯–৪১

Dhaka University Institutional Repository

৫১. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, কলকাতা, বাণীশিল্প, ১৯৮৫, পৃ. ১৫

৫২. শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, দিল্লী, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ১৯৯৮

৫৩. কমল সরকার, *রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৫৫. দ্র. "গ্রন্থ-পরিচয়", *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ২০১১, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১

৫৭. শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, দিল্লী, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ১৯৯৮, পৃ. ২৩২

৫৮. প্রতিমা দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৫৯. চিন্তামণি কর, *শিল্পী ও রূপকলা*, ২য় সং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ. ১২

৬০. সমীর ঈশা, "ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এক ঐতিহাসিক অধ্যায়—এক যুগান্তকারী সংগঠন", দ্র. অশোক ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), রাজ্য চারুকলা পর্ষদ পত্রিকা, *চারুকলা*, কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৪র্থ সংখ্যা, ২০০৯, পৃ. ৩৬

৬১. গৌতম দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৬২. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *কবি ও শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৬৮

৬৩. দ্র. "গ্রন্থ-পরিচয়", *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৬৪. দ্র. "গ্রন্থ-পরিচয়", *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩

৬৫. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২–৩৭৩

৬৬. কমল সরকার, *রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬৭. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও.সি গাঙ্গুলী, *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*, কলিকাতা, এ. মুখার্জী, এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ২৮৭–২৮৮

৬৮. কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬৯. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৭১. মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, *দক্ষিণের বারান্দা*, বিশ্বভারতী সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ৬৩

৭২. R Siva Kumar, *op. cit.*, P. 444

৭৩. শঙ্খ ঘোষ, *কল্পনার হিস্টিরিয়া*, প্যাপিরাস সংস্করণ, কলকাতা, প্যাপিরাস, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ২২

৭৪. আর. শিবকুমার, "অবন ঠাকুরের আরব্য রজনী : দিশি ফ্ল্যানেরি এবং উপনিবেশবিরোধী কিস্‌সা", দ্র. বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পা.), *আরব্য রজনী*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি, ২০০৪, পৃ. ২৮২

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩–২৮৪

৭৬. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

৭৭. যোগেন চৌধুরীর সাথে অগ্নিমিত্র ঘোষ-এর সাক্ষাৎকার, "*অবনীন্দ্রনাথের ছবি*", দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩২–৩৬, পৃ. ৯৭

৭৮. উমা দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৭৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৮০. তপন ভট্টাচার্য, *শিল্পী ও শিল্পভাবনা*, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, বইমেলা, ২০০৭, পৃ. ৪৪

৮১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

৮২. মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, "দক্ষিণের বারান্দা", দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩২–৩৬, পৃ. ৩৬

৮৩. প্রদীপ্ত সেন, "অবন ঠাকুরের পুঁথিপত্তর : মহাভারত থেকে রামায়ণ", দ্র. দিব্যজ্যেতি মজুমদার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩২–৩৬, পৃ. ১২২

৮৪. জসীম উদ্দীন, *ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়*, কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৮, পৃ. ১১৭

৮৫. শঙ্খ ঘোষ, "পাগলামির কারুশিল্প", দ্র. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *খুদ্দুর যাত্রা*, পাণ্ডুলিপি সংস্করণ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০০৯, ভূমিকা ও পাঠ সমন্বিত সম্পূরক খণ্ড, পৃ. ১২

৮৬. সেলিম আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর", দ্র. *থিয়েটার স্টাডিজ*, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, পৃ. ১১০

৮৭. সুনীল কুমার পাল, *কিছু স্মৃতিকথা কিছু শিল্পভাবনা* , দ্র. প্রশান্ত দাঁ (সম্পা), , কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা পুস্তকমেলা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯

৮৮. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৮৯. সত্যজিৎ চৌধুরী, *অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নতুন সংস্করণ, কলকাতা, সুচেতনা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২১৭

৯০. শোভন সোম, "বাংলার বিশ শতকের শিল্পকলা : একটি নিরীক্ষণ", দ্র. হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৩২১

৯১. দ্র. "গ্রন্থ-পরিচয়", *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪

৯২. রানী চন্দ শিল্পী মুকুল দে-এর ছোট বোন। এবং পারিবারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব অনিলকুমার চন্দের পত্নী ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালে প্রায় ষোলো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন।

৯৩. অনির্বাণ রায়, *অবনীন্দ্রনাথ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৯৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, *ঘরোয়া*, সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৩৭৭, পৃ. ১২

৯৫. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, আগস্ট ১৯৯৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩০

৯৬. স্বনামধন্য ডা. ডি গুপ্ত পরিবারের বাগানবাড়ির নাম গুপ্ত নিবাস। বাড়িটি ছিল কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে বারনগরে।

৯৭. শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৯৮. সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৌষ ১৪০৫, পৃ. ১১৯

৯৯. রানী চন্দ, *সব হতে আপন*, সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০১, পৃ. ২৪২–২৪৩

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

১০১. দ্র."গ্রন্থ-পরিচয়", *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩

১০২. সুনীল কুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪–৯৬

১০৩. ভূদেব চৌধুরী, *লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ.৭৯

১০৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, ১ম আনন্দ সং, কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ৮

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১০৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিল্পায়ন*, ১ম আনন্দ সং, কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩৪

১০৭. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪, পৃ. ৩৬, ৩৭

১০৮. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, ১ম পরিমার্জিত দে'জ সং, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৪৬

১০৯. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "কথামুখ", দ্র. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), *অগ্রন্থিত অবনীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, পত্রলেখা, মে ২০১১, পৃ. ১১

১১০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিল্পায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১১১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

১১২. সজনীকান্ত দাস, “অবনীন্দ্রনাথ”, দ্র. ড. সাগর মিত্র (সংকলন ও সম্পা.), *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা, নাথ, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ২১৯

১১৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪০৭, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ. ১২৫

১১৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, *শিল্প সংক্রান্ত*, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ২০–২১

১১৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ*, ঢাকা, নান্দনিক, একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ১২৯–১৩১

১১৬. সময় ভৌমিক, *ঠাকুরবাড়ির চিত্রকর*, কোলকাতা, ২৭৬/১, নগেন্দ্রনাথ রোড থেকে রানী ভৌমিক কর্তৃক প্রকাশিত, বৈশাখ ১৪০৮, পৃ. ৯২

১১৭. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১১৯. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১–২৬১

১২০. সুধীর কুমার নন্দী, *এবং রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, সুচেতনা, শ্রাবণ ১৪১৭, পৃ. ২২৫–২৩১

১২১. অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী'র “আশীর্বাণী”, দ্র. রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আদিপর্বের শিল্পকর্ম*, ১ম বাংলা সং, কোলকাতা, ভারতীয় সংগ্রহশালা, ১৯৬৬ [পুনর্মুদ্রণ-২০০৬], পৃ. ৯

১২২. নন্দলাল বসু, “ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ”, দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩২-৩৬, পৃ. ২৪

১২৩. নন্দলাল বসু'র “আশীর্বাণী”, দ্র. রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আদিপর্বের শিল্পকর্ম*, ১ম বাংলা সং, কোলকাতা, ভারতীয় সংগ্রহশালা, ১৯৬৬ [পুনর্মুদ্রণ-২০০৬], পৃ. ৯

১২৪. অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর “আশীর্বাণী”, দ্র. রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আদিপর্বের শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১২৫. কৃষ্ণলাল দাস, *শিল্প ও শিল্পী*, ২য় সং, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৩৯৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩

১২৬. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের “আশীর্বাণী”, দ্র. রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আদিপর্বের শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১২৭. তপন ভট্টাচার্য, *শিল্পী ও শিল্পভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১২৮. সৈয়দ মুজতবা আলী, “অবনীন্দ্রনাথ”, দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩২–৩৬, পৃ. ৫৭

১২৯. অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা*, ১ম আনন্দ সং, কলকাতা, আনন্দ, মে ১৯৯৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬–১১০

১৩০. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও.সি গাঙ্গুলী), *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১৩১. দ্র. রাহুল সেন (সম্পা.), *বিভাব*, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা–৮৭, ১৪১০, পৃ. ৩৩

১৩২. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, “অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা”, দ্র. আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সম্পা.), *সমকালীন : নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন*, কলকাতা, করুণা, ৩য় খণ্ড, বইমেলা ২০০৬, পৃ. ২৭১

১৩৩. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

১৩৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, “রবীন্দ্রনাথের লেখার ছবি”, প্রাগুক্ত, শ্রাবণ ১৪১৮

১৩৫. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, “অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা”, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১৩৬. ভূদেব চৌধুরী, *লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১৩৬ (ক) পুর্ণেন্দু পত্রী, *রূপসী বাংলার দুই কবি,* ১ম সং, কলিকাতা, আনন্দ, নভেম্বর ১৯৮০ পৃ. ১১–২২

১৩৭. মুকুল দে, *আমার কথা*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২, পৃ. ৩৩

১৩৮. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫–১৫৬

১৩৯. জসীম উদ্‌দীন, *ঠাকুর-বাড়ির আঙ্গিনায়*, কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৮, পৃ. ৮৩

১৪০. মুকুল দে, *আমার কথা*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

১৪১. দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, *শিল্প-প্রবন্ধাবলী*, দ্র. প্রশান্ত দাঁ (সম্পা.), কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০০৬, পৃ.১৩

১৪২. রাম শিবকুমারম, " *খুদ্দুর যাত্রা* বিষয়ে একটি প্রাথমিক নিবেদন", দ্র. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *খুদ্দুর যাত্রা*, পাণ্ডুলিপি সংস্করণ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০০৯, ভূমিকা ও পাঠ সমন্বিত সম্পূরক খণ্ড, পৃ.২৪

১৪৩. দ্র."গ্রন্থ-পরিচয়", *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ২০১১, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭

১৪৪. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেয়ের ঘরের নাতি। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও সমালোচক। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত *সাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের পার্থক্য ও চিত্রবিচারের বাঁধা ছক তিনি মানতেন না।

১৪৫. আবুল মনসুর, *শিল্পী দর্শক সমালোচক*, চট্টগ্রাম, শিল্প সমন্বয়, বৈশাখ ১৩৯১, পৃ. ৫৭

১৪৬. মুকুল দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

১৪৭. অবনীন্দ্রনাথ আবির্ভাবের আগে ভারতীয় চিত্রকলায় বদ্ধভাব ছিল। অর্থাৎ অজন্তা মোগল রাজপুত আর্টের পর কোম্পানি আমলে চিত্রকলা ছিল বিদেশিদের দ্বারা পরিচালিত। শুধু কালীঘাটের পট ছিল নিজস্ব। এমতাবস্থায় বিশেষত অবনীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ কেরালার শিল্পী রাজা রবিবর্মা ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের আশ্রয়ে ইউরোপীয় রীতি কাঠামোয় চিত্রে ভারতীয় বিষয়বস্তর আবহ সৃষ্টি করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ সেই রীতির ভারতীয় কাঠামো রচনা করেছেন, যা আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম প্রকাশ।

১৪৮. সুধীর কুমার নন্দী, *রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব–সূত্র*, ১ম সং, কলকাতা, পি.এম.বাক্‌চি, বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ১৩।

১৪৯. সুশোভন অধিকারী, "রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্রণ : একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান", সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, *পরিকথা*-২৬, কলকাতা, ত্রয়োদশ বর্ষ। ২য় সংখ্যা, মে ২০১১, পৃ. ২২

১৫০. অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, "বাংলার চিত্র শিল্প" দ্র. রঞ্জনকুমার দাস (সম্পা.), *শনিবারের চিঠি*, শিল্প ও শিল্পী-সংখ্যা, ১ম সং, কলকাতা, নাথ, এপ্রিল ১৯১৯, পৃ. ৪৮

১৫০. (ক) রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, *সংস্কৃতি ও শিল্পভাবনা*, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৬৫।

১৫১. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা, অবসর, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৪৪৯

১৫২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

নন্দলাল বসু

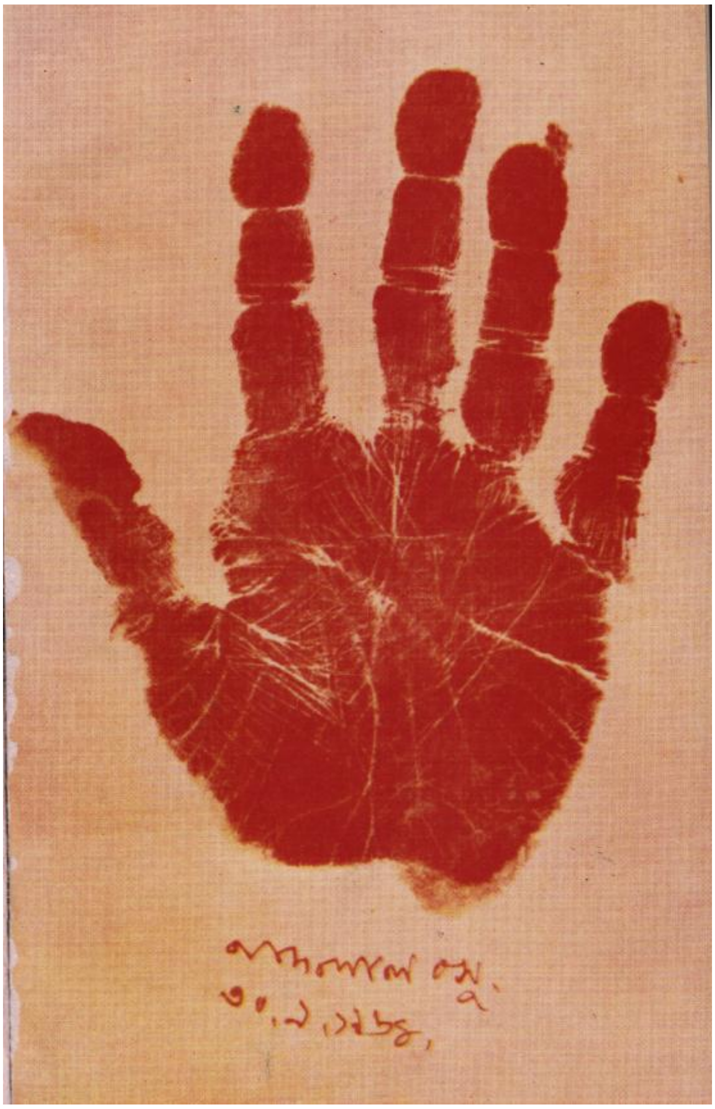

নন্দলালের হাতের পাঞ্জা, ১৯৬৪ (লাল লিথো-তৈল কালি)

Dhaka University Institutional Repository

নন্দলাল বসু

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু (১৮৮২–১৯৬৬) ভারতশিল্পের পথিকৃৎ। তিনি নানা গুণে গুণান্বিত শিল্পীব্যক্তিত্ব। ভারতশিল্পের ইতিহাসে প্রথিতযশা শিল্পী, শিক্ষক, নন্দনতাত্ত্বিক, দেশপ্রেমিক, নীরবকর্মী ও সাধক হিসেবে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা বিকাশের প্রথম ও প্রধান পুরুষ এবং বাংলার প্রাচ্যকলা আন্দোলনের অগ্রদূত। তিনি বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক। এই শিল্পী রসসৃষ্টির জগতে বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সততরত স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত স্নেহধন্য শিষ্য ও সহকর্মী ছিলেন। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সান্নিধ্য ও সাহচর্যে ঋদ্ধ হয়েছেন। ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা বিকাশের উত্তরণের পর্বে ও পর্বোত্তরে দীর্ঘ সময় অভিভাবকের ভূমিকায় ছিলেন। বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারা বিকাশে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন 'গুরু' হিসেবে নমস্য ছিলেন তেমনি বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু নমস্য ছিলেন 'মাস্টারমশাই' নামে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর শিল্পকর্মকে ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। তুলির সাধনায় তিনি ছিলেন সত্যিকারের সাধক।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য শিল্পকলার নির্যাস নিয়ে উনিশ শতকের শেষ দশকে নিজস্ব শিল্পশৈলী সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষায় অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষকতার মাধ্যমে এই শৈলীর বিকাশ ঘটেছিলIযা পরবর্তীতে নব্য-বঙ্গীয় শিল্পান্দোলনে রূপ নিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কৃতী ছাত্র নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও অন্যান্য ভাবশিষ্যের মধ্য দিয়ে এই ধারার শিল্পরীতির বিস্তার ঘটতে থাকে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের সৃষ্ট শৈলীর উত্তরাধিকারী করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক শিল্পীর ছবি তাঁর মতো হোক।

ফলে শিষ্যরা তাঁর শৈলীকে হুবহু অনুসরণ করেননি। প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্বতাকে খুঁজে নিয়েছেন স্বাধীনভাবে। শিল্প সৃষ্টিতে এই স্বাধীন চেতনাই ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল এবং বাংলার চিত্রকলায় নির্দিষ্ট হয়েছিল শিল্পস্বাতন্ত্র্যে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে সারা ভারতে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবনীন্দ্র-শিষ্যরাই নির্বাচিত হয়েছিলেন শিল্পশিক্ষার দায়িত্বে। ফলে সর্বগামী বিচিত্র শিল্পপ্রচেষ্টা বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছিল আধুনিক ভারতীয় তথা বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারা হিসেবে।[১] কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারা পরবর্তীতে বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনের শিল্পশিক্ষায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রতিভায়। অর্থাৎ ভারতীয় তথা প্রাচ্য শিল্প-ঐতিহ্য এবং ধারার মূল সূত্র ধরে নব্য-বাংলার শিল্পধারা (New Bengal School) 'শান্তিনিকেতন শিল্পধারা' নামেও পরিচিত হয়েছিল।[২] রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই ধারার মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন নন্দলাল বসু। বেঙ্গল স্কুল বা বাংলা ঘরানাIচিত্রকলাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু নন্দলাল বসুর প্রচেষ্টা ও প্রতিভায়

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় বাংলা ঘরানা শিল্পের বিচিত্র খাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। নন্দলাল বিশ্বাস করতেন ভারতীয় রুচি ও আদর্শকে ঠিক রেখে আধুনিক হতে হবে ভারতবাসীকে। নিজের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব হারানোর মধ্যে যে নকল আধুনিকতা তা মৃত্যুর সমান। এই বোধের কারণেই গুরু অবনীন্দ্রনাথের চিত্র আঁকার পদ্ধতি হুবহু গ্রহণ করেননি। স্বকীয় পদ্ধতিতে নতুন ধারার প্রবর্তন ও বহুমুখী চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রাচ্যশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অতএব, এই নিবন্ধে নন্দলাল বসুর ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস কালক্রম অনুসারে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে শিল্পীজীবনের পর্বে পর্বে শিল্পবিষয়ক তত্ত্ব গঠনে বহু মনীষীর সান্নিধ্য ও সাহচর্যে তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত শান্তিনিকেতনে হাল ধরার পর শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় অবদান প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এ ছাড়া নানা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সময়ে তিনি কীভাবে ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন; কীভাবে বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি, ধাঁচ, টেকনিক অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করেছেন; কীভাবে নব্য-বঙ্গীয় রীতির সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে উত্তরণ করেছেন; কীভাবে চারু ও কারুকলাকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন; কীভাবে অসংখ্য শিল্পী ও শিষ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন; কীভাবে সমাজ ও রাজনীতির সাথে শিল্পের মিলন ঘটিয়েছেন তা উদ্ধার করতে চেষ্টা করা হবে এই নিবন্ধে। সর্বোপরি চিত্রাঙ্কন ছাড়াও তাঁর মূর্তিকলা, বাস্তুবিদ্যা, ছাপাই ছবি; রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জা; উৎসব ও গৃহসজ্জা, মণ্ডনকলা, কুটিরশিল্প, সমাজসেবা, সংগঠন পরিচালনা আলোচনা করা হবে। এবং তাঁর শিল্পতত্ত্ব বিশ্লেষণ; নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক লেখা ও উপদেশ বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার যে নন্দনতাত্ত্বিক ভিত গঠন করেছে তা পর্যালোচনা করা হবে।

এক

নন্দলালের পৈতৃক নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শৈবতীর্থ তারকেশ্বরের নিকট সস্ত্যানগাছি গ্রামে। প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন সপরিবারে সস্ত্যানগাছি ছেড়ে বসতি স্থাপন করেন কলকাতার কাছাকাছি হাওড়া জেলার রাজগঞ্জ-বানুপুরে। পূর্ণচন্দ্র বসু নন্দলালের পিতা। তিনি ছিলেন ওভরসিয়রশিপ পড়া একজন দক্ষ নকশাবিদ।খাল, সেতু ও সড়কের তদারকিতে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি দ্বারভাঙ্গা মহারাজের খড়্গপুর তহসিলের ম্যানেজার ছিলেন। পিতার কর্মস্থল বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে নন্দলালের জন্ম হয় ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর। বাল্যকাল ও শৈশবের ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত খড়্গপুরে কেটেছে। নন্দলালের মাতা ছিলেন ক্ষেত্রমণি। গ্রামীণ কারুশিল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্তা। কাঁথা সেলাই, পুতুল তৈরি, ছাঁচ-কাটা ইত্যাদি গৃহকর্মের খুঁটিনাটি কাজকর্মে নান্দনিক রুচির ছাপ থাকত তাঁর কাজে। তিনি নন্দলালের চিত্ত-বিনোদনের জন্য স্বভাবসিদ্ধ পটুতায় নতুন নতুন খেলনা পুতুল বানাতেন। ফলে শিল্পরুচির প্রথম পাঠ নন্দলাল তাঁর মমতাময়ী মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এ ছাড়া বাবার কর্মজীবনে আঁকা খাল, সেতুর পরিপাটি নকশা দেখে, কিংবা পিতার লাইব্রেরিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানান বই এর ছবি দেখে ছবি আঁকায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ছেলেবেলায়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেমন ছেলেবেলার শৈল্পিক ভিত গড়ে উঠেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বহু প্রতিভাধর শিল্পী-সাহিত্যিকের মধ্যে বেড়ে ওঠায়, তেমনি তাঁর শিষ্য নন্দলাল বসুর শৈল্পিক বোধ গড়ে উঠেছিল বাল্যকালে খড়্গপুরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও পারিপার্শ্বিক কারু-শিল্পীদের প্রতিভা প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে। খড়্গপুরের সমগ্র অঞ্চল ঘিরে নিবিড় গাছপালায় ভরা আরণ্যক পরিবেশে বন্যপ্রাণীদের মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বাল্যকালে। ফলে বাল্যকালের মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশ তাঁর প্রকৃতিচেতনার ভিত মজবুত করেছিল। বাড়ির পাশের কামার, ছুতোর, পুতুল-গড়িয়েদের কর্মপ্রবাহ দেখে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আঞ্চলিক মেলা ও নানান উৎসবের জন্য ধর্মীয় ও পশুপাখির মূর্তি দেখে নিজে মূর্তি তৈরিতে প্রেরণা পেয়েছেন। হিন্দু ধর্মের পূজার মণ্ডপ সাজানো এবং মুসলিম ধর্মের ধর্মীয় উৎসবের তাজিয়া তৈরি দেখে বাল্যকালে অনুকরণ করে চেষ্টা করেছেন খেলাচ্ছলে। সুতরাং নন্দলাল প্রকৃতি ও সৌন্দর্য পাঠে ভারত সংস্কৃতির স্বাদ পেয়েছেন খড়্গপুরের পরিবেশে । এই অর্জনের কথা তাঁর স্বগতোক্তিতে ধরা পড়ে। তিনি ড. পঞ্চানন মণ্ডলের *ভারতশিল্পী নন্দলাল* গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাঙ্গালার বাইরে মুঙ্গের-খড়্গপুরে আমার জন্ম। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত ওখানেই কাটে। ঐখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ প্রথম স্থাপিত হয়। সেই অকৃত্রিম প্রণয়বন্ধন আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে।'[৩]

পারিবারিক বন্ধুত্ব ও সহপাঠী হওয়ার সূত্রে রাজশেখর বসুর সাথে নন্দলালের সখ্য ছিল। এই রাজশেখরই সাহিত্যিক রাজশেখর বসু। নন্দলাল বসুর পরিবার হিন্দু ধর্মপ্রবণ ছিল। মা ক্ষেত্রমণির ভগবদ্‌ভক্তি ছিল প্রবল। সেজন্য নন্দলাল ধর্মীয় সংহতিমূলক মনোভাবে রামায়ণ-মহাভারত কাহিনি ছেলেবেলা থেকেই জেনেছেন। মা-বাবার শৈল্পিক কর্মকুশলতা আর অবারিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে নন্দলাল আট বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ার কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

দুই

সাধারণত শিল্পী মানুষদের শৈল্পিক ভিত গঠন হয় পারিবারিক ও প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশ ধরে। নন্দলালেরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর এই শৈল্পিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষেরা বেড়ে ওঠা থেকেই নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনাকে বাধা মনে করেন কিংবা গতানুগতিক পড়াশোনাকে পছন্দ করেন না, এটাই চলতি হিসাব। সে হিসাব অনুযায়ী নন্দলাল পড়াশোনা অপেক্ষা চারপাশের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপজগতের পাঠ নিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ছেলেবেলায় পাঠশালা এবং পরবর্তীতে খড়্গপুরের ভার্নাকুলর মিডল স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। এখানে তিনি ভাষা, ইতিহাস, গণিত এবং কথ্য হিন্দির কিঞ্চিৎ বুনিয়াদি জ্ঞান লাভ করেছিলেন। স্কুলে মুসলমান শিক্ষকদের কথ্য হিন্দির সঙ্গে উর্দু মেশানো ভাষাও রপ্ত করেছিলেন। এই স্কুলে চার বছর পড়াশোনা করেছেন হিন্দি ভাষায়। এসময় বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে পিতা পূর্ণচন্দ্র পুত্র নন্দলালকে বাংলা শিখিয়েছিলেন।

১৮৯৫ সালে নন্দলালের তেরো বছর বয়সে তাঁর মমতাময়ী মা ক্ষেত্রমণি পরলোকগমন করেন। ১৮৯৭ সালে পনেরো বছর বয়সে বাল্যের স্মৃতিবিজড়িত খড়গপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন বিদ্যালয়ের ওপরের ক্লাসে পড়ার জন্য। কলকাতায় এসে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণিতে। কান্তিচন্দ্র ঘোষ[৪] ছিলেন সহপাঠী। ক্লাসে ও শিক্ষকদের সাথে নানা দুষ্টুমিতে পটু ছিলেন কান্তিচন্দ্র। কান্তিচন্দ্রের এসব দুষ্টুমির্কো্নেপথ্যে থেকে উৎসাহ ও সমর্থন জোগাতেন নন্দলাল। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে মনের খোরাক মিটত না কিন্তু ড্রয়িং ক্লাসে প্রথম উৎসাহ পেয়েছিলেন ছবি আঁকবার। তাই স্কুলের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের হিতোপদেশের গল্প পড়ে কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ১৯৮০ সালে প্রথম এঁকেছিলেন একটি রঙিন ছবি।[৫] ১৯০২ সালে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে মহাবিদ্যালয় শাখায় ভর্তি হন। মহাবিদ্যালয়ে ড্রয়িং ক্লাস ছিল না, সুতরাং পুথিগত বিদ্যায় মনোযোগী হতে পারেননি। ক্লাসে কবিতা পড়ানোর সময় ক্লাসনোট নেয়ার বদলে ওঅর্ডসঅর্থের কবিতার চারপাশে ছবি এঁকে কবিতার চিত্ররূপ দিতেন। ফলে প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ১৯০৩ সালে পিতা-মাতার পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী খড়গপুরের প্রকাশচন্দ্র পালের মেয়ে সুধীরা দেবীর সাথে নন্দলালের বিবাহ হয়।

বিবাহের সময় নন্দলালের বয়স একুশ এবং সুধীরা দেবীর বয়স বারো। গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, সুতনুকা সুধীরা দেবী ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। বিবাহের পর নন্দলাল জেনারেল এসেমব্লি কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে এফ.এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন এবং দ্বিতীয় বার এফ.এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ১৯০৩–০৪ সালে জেনারেল এসেমব্লি কলেজে পড়ার সময় বার্ডস্বার্থের বইয়ের মার্জিনে আট-দশখানা রঙিন ছবি এঁকেছিলেন।[৬]

পিতা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় নন্দলালের পড়াশোনার পরামর্শের দায়িত্ব ছিল নন্দলালের শ্বশুরকূলের প্রতি। মূলত শিল্পী নন্দলালের প্রকৃত সাফল্য ছিল ছবি আঁকায়, তাই পাঠ্যপুস্তকের নীরস চর্চায় আনন্দ পেতেন না। কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁর কাছে সম্ভবপর নয় অনুধাবন করে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে দাদাশ্বশুরকে চিঠি লিখেছিলেন। সেসময় শিল্পবৃত্তিকে সমাজে অসম্মানজনক বৃত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো বলে শ্বশুরকুল তাঁর এই ইচ্ছায় সম্মতি দেননি। ফলে অভিভাবকদের নির্দেশানুযায়ী ১৯০৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন।[৭] এখানেও পাঠে তাঁর মন বসেনি। বেতন দেয়া অনাবশ্যক মনে করে সেই টাকায় কিনতেন ছবিওয়ালা বই ও রংতুলি। আসলে বাল্যকালে খড়গপুরে বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ দেখেছিলেন এবং পাঠ নিয়েছিলেন তা কলকাতায় এসে পাননি। তাই ১৮৯৭–১৯০৫ অবধি পুথিনির্ভর বিদ্যাভ্যাসে তাঁর নিরানন্দ লাগত। এ সময় তিনি নানারকম পশু-পাখি পালন করে তৃপ্ত হয়েছেন। পুথিনির্ভর বিদ্যাভ্যাসে অনবরত অসাফল্যে ক্রমে তাঁর মন শিল্পজীবিকার দিকে আকর্ষিত করে চলেছিল। সেই সময় তাঁর পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে Draughtsmanship পড়তেন। অতুল মিত্র নন্দলালের বাড়িতে থাকতেন। নন্দলাল তাঁর কাছে মডেল দেখে ছবি আঁকার নানান কৌশল শিখেছিলেন ঘরে বসে। মনের ইচ্ছা আর সংকল্পকে রূপ দেয়ার জন্য, শিল্পবিদ্যা পড়ার যোগ্য হবার জন্য তাঁর এই নিভৃত চর্চাই ছিল একাডেমিক শিল্পচর্চার হাতেখড়ি। এ ছাড়া এই

Dhaka University Institutional Repository

সময়কালের (১৮৯৭–১৯০৫) মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের বিবিধ স্তরে এক নবজাগরণের প্রবাহ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ধর্মে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দীপ্যমান আধ্যাত্মিক প্রবাহ; ভারতীয় ঐতিহ্যে স্বামী বিবেকানন্দের সপ্রশংস প্রচারণা; সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীপ্ত পদচারণা; শিল্পে রবি বর্মা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন।

সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রবাসী* পত্রিকায় দেশ-বিদেশের শিল্প সংবাদ ও শিল্পীদের শিল্পকর্মের প্রতিলিপি ছাপা হতো। নন্দলাল বসু এই পত্রিকা নিয়মিত সংগ্রহ করে অনুঅঙ্কন করতেন। এ ছাড়া পুরনো বইয়ের দোকানে দোকানে তিনি বিদেশি বইয়ের সচিত্র পাতা উল্টে রাফায়েল প্রমুখ ইউরোপীয় ধ্রুপদী চিত্রকরদের ছবির প্রতিলিপি সংগ্রহ করতেন এবং এসব ছবির অনুকৃতি করতেন। *প্রবাসী*র মাধ্যমে তিনি রবি বর্মা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক পরিচয় পেয়েছিলেন। *প্রবাসী*তে ছাপা অবনীন্দ্রনাথের 'সুজতা ও বুদ্ধ' ও 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' ছবি দেখে দেখে নন্দলাল গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শুধু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রই নয়, তাঁর ১৯০২–০৩ সালে দিল্লি প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাওয়ার খবর আগ্রহ নিয়ে বাংলা পত্রিকা থেকে জেনেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নানান তথ্য জানতেন আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কাছে। এর মধ্যে আর্ট স্কুলের এন্‌গ্রেভিং ক্লাসের ছাত্রIপাড়ার ছেলে বন্ধু সত্যেন বটব্যালের কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার ও মজলিশি মেজাজের অনেক কথা শুনেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার স্বাতন্ত্র্য তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। নন্দলাল অনুধাবন করতে পারলেন অন্যান্য শিল্পীর মতো অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দেশি পোশাকে বিদেশি মানুষ নেই। এসব কারণে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য তিনি মনস্থির করেছিলেন।

তিন

কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন নন্দলাল। পুথিনির্ভর লেখাপড়ায় তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ হবে না বলে অভিভাবকদের কাছে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার আর্জি জানিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। এরপর সত্যেন বটব্যালকে সঙ্গে নিয়ে আর্টস্কুলে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে দেখে পড়াশোনায় অমনোযোগী স্কুল পালানো ছাত্র ভেবেছিলেন। এজন্য তাঁর সার্টিফিকেটও দেখতে চেয়েছিলেন।[৮]

পরবর্তীকালে নিজের আঁকা এক বান্ডিল ছবি ও এন্ট্রাস পাসের সার্টিফিকেট নিয়ে আর্ট স্কুলে উপস্থিত হন। নন্দলালের কাজ দেখে অধ্যক্ষ হ্যাভেল খুশি হলেন। ভর্তি পরীক্ষা নিলেন শিক্ষক ঈশ্বরীপ্রসাদ ও হরিনারায়ণ বসু। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন থেকে আঁকতে নির্দেশ দিলেন। নন্দলাল আঁকলেন 'সিদ্ধিদাতা গণেশ'। ছবিতে পাকা হাতের ছাপ অনুভব করলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ। হরিনারায়ণ বসু পরীক্ষা নিয়েছিলেন মডেল ড্রয়িংয়ের। এই পরীক্ষায় নন্দলাল তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরীক্ষা দেয়ার পালা শেষ হলে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে পছন্দনীয় শেখার বিষয় বেছে নিতে বললেন। উত্তরে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের ওপর

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্য স্বীকার করে অবনীন্দ্রনাথের অভিমত-পদ্ধতির পাঠ নিতে সম্মত হয়ে গুরুবরণ করলেন। ভর্তি হলেন ১৯০৫ সালে।

আর্ট স্কুলে হরিনারায়ণ বসু ও লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে তাঁর শিল্পপদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল। কিছুদিন তাঁদের কাছে শেখার পর অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে নিজের ক্লাসে নিয়ে আসেন। অবনীন্দ্রনাথও সেই থেকে আর্ট স্কুলে ক্লাস নেয়া শুরু করলেন এবং নন্দলালই তাঁর ক্লাসের প্রথম ছাত্র। দ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন সুরেন গাঙ্গুলী। ভারতীয় পরম্পরায় তাঁদের গুরুশিষ্য সম্পর্ক স্থাপিত হলো। নন্দলালকে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন নব্যভারত-শিল্পের চিত্রচর্চা। প্রথম দিকের সময়ে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে বৃহৎ পরিসরে শিক্ষা নিয়েছেন। কোনো বিশেষ মেজাজ দ্বারা শিক্ষা নেননি। হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কথা তাঁর কাছে বাস্তব ছিল এবং ভারতীয় ভাস্কর্য তাঁর কাজে প্রভাব ফেলেছিল।[৯]

চার

আর্ট স্কুলে ভর্তির পর নন্দলাল একাডেমিক ঘরানায় ছবি আঁকতে মনোযোগী হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সঠিক গুরু। তিনি ছাত্রদের সাথে ছবি আঁকতেন, গল্প বলতেন, পুরাণকথা শোনাতেন; হাস্য-পরিহাস-কৌতুক করতেন; ক্লাসে বসে রাজপুতদের শৌর্য-বীর্য ও অনুরাগের কাহিনি শোনাতেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন দক্ষ আলাপক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের ছবি আঁকায় মৌলিক কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উজ্জীবিত করা।

এই সময় ইংরেজি শাসকশ্রেণির বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের মধ্যে স্বাদেশিকতার জোয়ার চলছিল। সাহিত্য-সংগীত-ইতিহাস-শিল্পকলায় জাতীয়তাবোধের ব্যাপক জাগরণ চলছিল। এই জাগরণ জাতীয় শিল্পের উত্তর-দায়িত্বের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হতে এবং ভবিষ্যৎ পথ নির্ণয়ে নন্দলালকে সাহায্য করেছিল। আর্ট স্কুলে অধ্যয়নকালে নিবেদিতা কুমারস্বামী, ওকাকুরা, রামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী ও ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের ভারততত্ত্ববিদদের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে হিন্দু-বৌদ্ধ পুরাণ; ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও তত্ত্ব বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন। নন্দলাল বিশেষত রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। ছিলেন বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। বিবেকানন্দের হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতির মতবাদে তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজশিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন।[১০] রামকৃষ্ণ ছবি আঁকতে জানতেন। তাঁর আঁকা দুটি ছবি দেখেছিলেন নন্দলাল দক্ষিণেশ্বরে। ছবি দুটিতে দক্ষ হাতের ছাপ খুঁজে পেয়েছিলেন নন্দলাল।[১১]

শিল্পীজীবনের শুরুতে শিল্পের তত্ত্বগঠনে স্বামী বিবেকানন্দের মেজো ভাই পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের (১৮৭২–১৯৭২) ভূমিকা ছিল। আর্ট স্কুলে ভর্তির পূর্বে কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়েই মহেন্দ্রনাথ নন্দলালের গৃহশিক্ষক ছিলেন।[১২] আর্ট স্কুলে ভর্তির পর স্কুল থেকে ফেরার পথে সহপাঠী শৈলেন্দ্রনাথ দে-কে সাথে নিয়ে মহেন্দ্রনাথের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল মহেন্দ্রনাথের। এ ছাড়া বহু ভাষায় তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। নন্দলাল ও শৈলেন্দ্রনাথ এলে বৈঠকখানায় চলত আড্ডা। আড্ডার বিষয় ছিল বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিষয়ে। নন্দলাল ঐ সময় অবনীন্দ্রনাথের কাছে হাতে-কলমে যে শিল্প শিখতেন

Dhaka University Institutional Repository

মহেন্দ্রনাথের কাছে তার তত্ত্ব জানতেন। শুধু তখন পর্যন্ত শিল্প বিষেয়ে কোনো শাস্ত্র বা রসশাস্ত্র পড়েননি। মহেন্দ্রনাথের গল্পের মাধ্যমে শিল্পের গোড়ার কথা বুঝেছিলেন। এবং এ কারণেই আর্ট স্কুলে শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে পাঠ নেয়ার সময় আলোচ্য বিষয় দ্রুত রপ্ত করতে পারতেন। এজন্য বলা যায় শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে নন্দলালের প্রথম জ্ঞানার্জন মহেন্দ্রনাথের কাছে। শুধু শিল্পতত্ত্ব নয়; অধ্যাত্ম বিষয়, সাধনার বিষয়সহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাঠ নিয়েছেন মহেন্দ্রনাথের কাছে।

রামকৃষ্ণ মিশনকে কেন্দ্র করে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ও শিল্পানুরাগীদের সাথে সম্পর্ক হয়েছিল নন্দলালের। মিশনের উদ্বোধন কোষাধ্যক্ষ গণেন মহারাজ (গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে বন্ধু হয়েছিলেন। এ ছাড়া মিশনকেন্দ্রিক শরৎ মহারাজ (সারদানন্দ), রাখাল মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ), দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ),'[১৩] সুধীরা বসু (সিস্টার নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান) প্রমুখ ব্যক্তির কাছে পুরাণ ইতিহাস, দেবদেবী কাহিনি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে শিল্পবিষয়ক পাঠ নিয়েছেন। নন্দলাল শিল্পীজীবনে রামকৃষ্ণ মিশন ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর প্রভাব শেষ জীবনের কর্ম পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছিলেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের উক্তিতে। তিনি বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে লিখিত এক পত্রে লিখেছেন : 'পুণ্যদর্শন ও শ্রদ্ধেয় ভূপেনবাবু এবং অপরাপর ঠাকুরের ভক্তদের কাছে যা শুনেছি, তাঁহাদের সেই উপদেশগুলি হজম করবার চেষ্টা করছি মাত্র এবং শিল্পকাজে তাহার প্রয়োগ করবার আজীবন প্রচেষ্টা করেছি, তথাপি তাহা শেষ হয় নাই।'[১৪]

নন্দলাল বসু আর্ট স্কুলে হাত পোক্ত করেছিলেন হিন্দু দেবদেবীর ছবি এঁকে। এসব হিন্দু দেবদেবীর চিত্রচিন্তার আদর্শ স্থাপনে রসদ নিয়েছিলেন উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতশিল্পকলার মহাপ্রতিভাধর প্রবক্তা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭০–১৮৯৯) রচনাবলি থেকে। শুধু নন্দলাল নন, অবনীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা যেসব হিন্দু পৌরাণিক বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন তার মডেল বলেন্দ্রনাথের রচনাবলি থেকে নেয়া। বাঙালি হিন্দুসমাজে ও ধর্মে সত্য-শিব-সুন্দর যা আছে সেসব খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করে গেছেন। "হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" প্রবন্ধে আদর্শ দেবদেবীর চিত্র কী হওয়া উচিত।সেই রূপের গড়ন আর দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এবং দেবদেবী সৃষ্টির মূলে যে সৌন্দর্য কল্পনা নিহিত আছে সেই সৌন্দর্য চিত্রকরের আয়ত্ত করা কর্তব্য মনে করতেন তিনি।[১৫] এক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেবদেবীর রূপ-মাহাত্ম্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলো নন্দলালকে হিন্দু দেবদেবী-বিষয়ক চিত্র আঁকতে উৎসাহিত করেছে। এবং আমরা এও বলতে পারি, ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতির কাব্য-মহাকাব্য অবলম্বনে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম ইতিহাসাশ্রিত চিত্র রচনায় বাংলার প্রাচ্যশৈলীর নিজস্ব পথ উদ্ধারে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

এ ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের হিন্দু দেবদেবীর চিত্র আঁকার জন্য রূপ বর্ণনা বা আইডিয়া দিতেন। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের ধারণা মতেIঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমারস্বামীর কাছ থেকে সিংহলী সংস্কৃত পুরাতন পুথি *রূপমালার* ইংরেজিতে অনূদিত কপি পেয়েছিলেন। রূপমালা গ্রন্থের শ্লোকে দেবদেবীর রূপচিন্তা বর্ণিত ছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের এই গ্রন্থ থেকে হিন্দু দেবদেবী আঁকার আইডিয়া দিতেন। পরবর্তীকালে নন্দলাল

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থটি উত্তরাধিকার সূত্রে অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।[১৬] এভাবেই নন্দলাল তাঁর প্রথম দিকের কাজে হিন্দু দেবদেবী আঁকতে উৎসাহিত হয়েছেন।

পাঁচ

একদিকে জাতীয়তাবাদ অপরদিকে অধ্যাত্মবাদ এবং ভারত-শিল্প ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টায় প্রাচ্য একাডেমিক ঘরানায় শিল্পশৈলী গড়ার অভিপ্রায়ে নন্দলালের প্রথম দিকের কাজে অবনীন্দ্র উদ্ভাবিত ওয়াশ পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯০৭ সালে তাঁর আঁকা 'সহমরণের সতী' শিল্পকর্মটি নব্য-ভারত চিত্রকলার জয়যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। ইতোমধ্যে নব্য-বাংলায় চিত্রকলা প্রসারের প্রচেষ্টায় ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। সোসাইটির প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯০৮ সালে। প্রদর্শনীতে 'সতীর দেহত্যাগ' আর 'সহমরণের সতী' ছবি দুটির অঙ্কন-বৈশিষ্ট্যের জন্য নন্দলাল নগদ পাঁচশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এর পূর্বে দ্বিতীয় বর্ষে ভালো ফললাভে উত্তীর্ণ হবার জন্য তিনি বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ ও মাসিক বৃত্তি পেতে শুরু করেছিলেন।

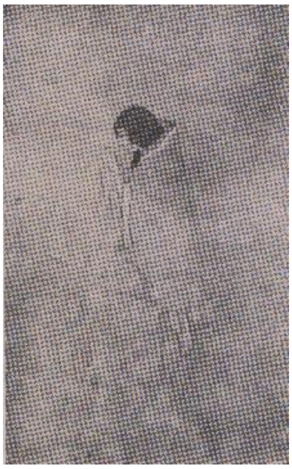

চিত্র ০১ : সহমরণের সতী
ওয়াশ ও টেম্পারা
৩৫.১ ×২৫, সেমি, ১৯০৭

চিত্র ০২ : সতী, ওয়াশ ও টেম্পারা এবং স্বর্ণের ব্যবহার, ৩২.৪ × ২২.৭ সেমি, ১৯৪৩ (প্রথম অঙ্কন, ১৯০৭)

চিত্র ০৩ : সতীর দেহত্যাগ, ওয়াশ
২২.৮৬ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯০৯

শিল্পের পথে সিদ্ধি অর্জনের জন্য এবং দেশের পরম্পরা জানতে পুরস্কারের অর্থ দিয়ে চিত্রকর প্রিয়নাথ সিংহকে সাথে নিয়ে নন্দলাল উত্তর-ভারতের নানা শিল্পতীর্থ পর্যটন করেছিলেন। প্রথমে তাঁরা পাটনা যান। পাটনা থেকে কাশী, সারনাথ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি, ফতেপুরসিক্রি, গয়া, বুদ্ধগয়া, সাসারাম প্রভৃতি স্থান ঘুরে দেখেন। এসব স্থানের প্রাচীন ঐতিহ্যের চিত্রকলা ও শিল্পসামগ্রী এবং ধর্মীয় আচার ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কোথাও কোথাও স্কেচ করেছেন। প্রায় এক মাস ধরে ভ্রমণ শেষে তিনি স্ত্রী সুধীরা দেবী ও সদ্যজাত কন্যা গৌরী দেবীর কাছে চলে আসেন খড়গপুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভ্রমণসঙ্গী প্রিয়নাথ সিংহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী। নন্দলালের সাথে পরিচয়ের পর তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। প্রিয়নাথের মাধ্যমেই নন্দলাল নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

আলাপচারিতায় শিল্পের নানা বিষয় জানতে পেরেছিলেন নন্দলাল। তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন‌‌I‘বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে, তাকে প্রকাশ করা’[১৭] হচ্ছে আর্ট।

১৯০৮ সালের শেষের দিকে শিল্পরসিক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মোট পাঁচজনের একটি দল দক্ষিণ ভারতের শিল্পতীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন। পাঁচজনের মধ্যে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার ছিলেন সেই সময়ের উঠতি আইনজীবী ও শিল্পসমালোচক। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক। এই ভ্রমণে নন্দলালের যাতায়াতের খরচ অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বহন করেছিলেন। তাঁরা কলকাতা থেকে প্রথমে গেলেন পুরী ও ভুবনেশ্বরে। এখানে নন্দলাল মধ্যযুগীয় ওড়িশার মন্দির স্থাপত্য ও মূর্তিকলার সৌকর্য ও সৌন্দর্য খুঁটে খুঁটে দেখেছেন ও স্কেচ করেছেন। এরপর মাদ্রাজে গিয়ে তার আশপাশের মন্দির দেখেছেন। মাদ্রাজ থেকে চিঙ্গলীপুটIপক্ষীতীর্থ আর মহাবলিপুরম, কাঞ্জিভরম, ভেলুপুরম, চিদম্বরম, মায়াভরম, কুম্ভকোর্ণম, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লি, মাদুরা, টিনিভ্যালি, কেপ-কমরিন, রামনাদ, রামেশ্বরম, ধনুষ্কোটি, পাদুকোটাই, শ্রীরঙ্গম, বৃদ্ধাচলম ঘুরে ফের মাদ্রাজ এসে ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।[১৮]

উত্তর ভারতের ইসলামিক স্থাপত্যের জ্যামিতি ও পুষ্পলতার মণ্ডন থেকে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরলগ্ন পল্লব ও চোল আমলের মূর্তিশিল্পInটরাজ, পার্বতী, সুন্দেরা প্রভৃতি অবিস্মরণীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মহাবলিপুরমে মসুদ্রবেলার উন্মুক্ত মন্দির এবং দক্ষিণশৈলীর সমুন্নত শিখর মন্দিররাজি নন্দলালের দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শনের মূর্তরূপ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল।[১৯] নন্দলালের এই উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের নানা স্মৃতি তাঁর সারা জীবনের চিত্রসাধনায় বিচিত্র রূপ পেয়ে এসেছে। ভ্রমণসূত্রে অর্জিত পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতির বিশদ অভিজ্ঞতায় তাঁর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল।

ছয়

১৯০৯ সালে অজন্তা দর্শন ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ছিল অবিস্মরণীয় শিক্ষাপর্ব। নন্দলালকে অজন্তায় পাঠানোর ব্যাপারে সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন প্রধান প্রযোজিকা। ভারতশিল্পের নবজাগরণে তাঁর দান অসামান্য। কলকাতায় আসার পর হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের সাথে নিবেদিতার যোগাযোগ হয়। ১৯০৭–১৯১১ সাল পর্যন্ত নিবেদিতা *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখার আংশিক ভার নিয়েছিলেন। চিত্রকলার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে ব্যাখ্যা করার সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। নব্য-বঙ্গীয় শিল্পীদের প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত বহু চিত্রের পরিচয় তিনি লিখেছিলেন। আর্ট স্কুলে নন্দলালের সাথে নিবেদিতার প্রথম পরিচয়ে নন্দলালের ‘কালী’ ও ‘সত্যভামার মান’ চিত্র দুটির ভাব ও সামঞ্জস্যের তাত্ত্বিক ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক ছবির প্রসঙ্গে মন্তব্য করে নন্দলালের ছবি আঁকায় সহযোগিতা করেছিলেন।

হ্যাভেলের বন্ধু Dr. W. Herringhan-এর স্ত্রী Mrs. C.J Herringham (শ্রীমতি ক্রিশ্চিয়ানা হেরিংহ্যাম) ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন অজন্তা গুহাচিত্রাবলির নকল নেয়ার জন্য। সিস্টার নিবেদিতার যোগাযোগে নন্দলাল এবং অসিতকুমার হালদার হেরিংহ্যামের নকলের কাজে সাহায্য করতে

Dhaka University Institutional Repository

অজন্তা গিয়েছিলেন। নন্দলাল অজন্তার শিল্পৈশ্বর্যে মোহিত হয়েছিলেন। এই ছবির অনুকৃতির সূত্রে নন্দলাল ভারতশিল্পের উৎসমুখের সন্ধান পেয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ১৯১৫ সালে *অজন্তা ফ্রেসকোস* বই প্রকাশ হয়। এ বইয়ে নন্দলালের অজন্তার দুটি অনুলিপি চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল।[২০]

অজন্তা দর্শনে নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি প্রসঙ্গে সত্যজিৎ চৌধুরীর মূল্যায়ন প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, অজন্তার অভিজ্ঞতায় ভারতীয় ভাস্কর ও চিত্রকরের কাজে গভীর মিল খুঁজে পেয়েছিলেন এবং অজন্তার কাজে এপিক কোয়ালিটি, নির্মাণগত কুশলতা, কারিগরি দক্ষতা, রীতিবদ্ধ চর্চার আরোপিত সংযমে গভীর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তিনি। তিনি লক্ষ করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে আঁকা এবং বিদেশি উপাদানের সংযোগেও মূল শৈলীর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়নি এবং ইউরোপীয় শিল্পের বাস্তবধর্মিতা বর্জন করেও অজন্তার শিল্পীরা বাস্তব জীবনের সত্য তুলে ধরেছেন।[২১]

মূলত উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শিল্পদৃষ্টির সাথে ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্যের ঐক্য অনুভব করেছিলেন অজন্তায়। দেশীয় শিল্পকলার এই রীতিবদ্ধ প্রকাশভঙ্গি নিজের তত্ত্ব সংগঠনে, ব্যক্তিগত স্টাইল বিকাশে ও পরবর্তী চিত্রকর্ম অঙ্কনে প্রভাব ফেলেছিল। ভারতশিল্পের শিক্ষা অর্জনে অজন্তা পাঠ তাঁর শিল্পোপলব্ধিতে বিরাট দৃষ্টি দিয়েছিল। ছাত্র প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে সেরকম অনুধাবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ অজন্তার একটা ছবি দেখে নন্দলালের মনে হয়েছিলIকতকাল আগে তিনিই ছবিটি এঁকেছিলেন। তিনি নিজেকে অতীতের শিল্পীদের সগোত্র বলে আবিষ্কার করেন।[২২] নন্দলালের এই আবিষ্কারের ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট হয় তাঁর নিজের বর্ণনায় :

> অজন্তার ছবির সঙ্গে আমাদের দিশী পটের আঁকা পট আর পুঁথির পাটার ওপর আঁকা ছবিতে শিল্পছন্দে বেশ একটা মিল রয়ে গেছে। তাছাড়া, ওড়িষ্যার যে পট ও পাটা-শিল্প তার সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদের পট ও পাটার ছবির বিষয় আর অঙ্কনপদ্ধতির মিল আছে। এতে আমার মনে হয়, এই দিশী চিত্রবিদ্যার শেকড় খুব পুরাতন কালের; আর এদেশের এই শিল্পধারা দ্বীপময় ভারতেও ছড়িয়েছিল।[২৩]

অজন্তার ভিত্তিচিত্র দর্শন, অনুকরণ ও হেরিংহ্যামের শিল্পালোচনায় নন্দলাল পরম্পরাগত শিল্পৈশ্বর্যের দিকে আকৃষ্ট হন। অজন্তার স্থাপত্যরেখার বিন্যাস; রূপবন্ধে বস্তুভার, ঘনত্ব ও মূর্তিধর্মিতা; ড্রয়িং-এর আলংকারিক গুণ, সংরচনে নৃত্যছন্দের দ্যোতনা, পরম্পরাগত লিপ্য পদ্ধতির অনচ্ছ স্পষ্টতা; রং নির্বাচনে ও বিন্যাসে ড্রয়িং-এর আদর্শায়নে রূপবন্ধের সন্নিহিতিতে, দেহঘেরে ক্ষয়বৃদ্ধিসূচক রেখার ব্যবহারে নতুন আঙ্গিক সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষার মনোভাব ফুটে উঠেছে জতুগৃহদাহ (১৯১০), পার্থসারথি (১৯১২) এবং রামায়ণ (১৯১১) চিত্রমালিকায়।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

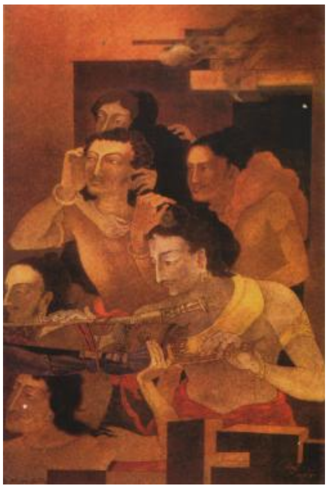

চিত্র ০৪ : জতুগৃহদাহ, ওয়াশ
২২.৭ × ৩১.৭৫ সেমি, ১৯১০

চিত্র ০৫ : পার্থসারথী (পার্থের মুখ)
৭৮.৭৪ × ৫৩.৩৪ সেমি, ১৯১২

১৯০৯ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথ ঠকুরের সংস্পর্শে আসেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা বেঁধে দিয়েছিলেন।[২৫]

চিত্র ০৬ : পদ্মিনী ও ভীমসিংহ, ওয়াশ
১৭.৭৮ × ১২.৯৮ সেমি, ১৯০৯

চিত্র ০৭ : বেতালপঞ্চবিংশতি
২২.৮৬ × ২০.৩২ সেমি, ১৯০৮

এর আগে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের 'সাবিত্রী ও যম' ছবির 'যম'-এর সুন্দর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯০৯-এর মধ্যে নন্দলাল হিন্দু দেবদেবীর চিত্র আঁকায় অনন্যসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁর ছবি ও কবিতায় মোড়া *চয়নিকা* কাব্য সংকলনের জন্য ছয়টি ছবি এঁকেছিলেন। ছবি আঁকার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাগুলো নন্দলালকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, নন্দলাল দিয়েছেন চিত্ররূপ। ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথের সচিত্র *চয়নিকা* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেখানে নন্দলালের মোট সাতটি চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের উষ্ণ স্নেহে নন্দলাল গ্রন্থচিত্রণে আদি দীক্ষা লাভ করেছিলেন। নন্দলাল চয়নিকার ছবিগুলো রং রেখায় বিচিত্র ধারায় এঁকেছিলেন। টেম্পারা, ওয়াশ, কালি-তুলির রেখায় অঙ্কিত চিত্রগুলোতে নব্যবাংলার শিল্প ঘরানার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর গ্রন্থচিত্রণের চিত্রগুলো স্বতন্ত্রভাবে

Dhaka University Institutional Repository

দেখলে অনুমান করা যায়, নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের কবিতার হুবহু অনুসরণ করেননি। কবিতার বর্ণনা অবলম্বন করে নতুন জগৎ রচনা করেছেন, যা ঐ কবিতার বিশেষ ঘটনার চিত্ররূপের বাইরে স্বতন্ত্র ছবি হিসেবে স্বকীয়তার দাবি রেখেছে। অর্থাৎ এই কাজে নন্দলাল শুধু একজন সাধারণ ইলাস্ট্রেটর নন, তিনি প্রকৃত একজন স্রষ্টা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্র ০৮ : রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' অলংকরণ
(যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও)

চিত্র ০৯ : রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' অলংকরণ
(হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ)

নন্দলাল যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্ররূপায়ণ করেছেন রবীন্দ্রনাথও নন্দলালের চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখেছেন। ১৯০৯ সালে অঙ্কিত 'দীক্ষা' চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯১০ সালে *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' কবিতাটি লিখেছিলেন।[২৬] নন্দলাল ১৯০৯–১০ সালের মধ্যে সতী, গান্ধারী, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, সাবিত্রী ও যম, পদ্মিনী ও ভীমসিংহ, একলব্য, অহল্যা উদ্ধার প্রভৃতি বিখ্যাত ছবি এঁকেছেন।

নন্দলালের প্রথম সন্তান গৌরী জন্মেছিলেন ১৯০৭ সালে। এরপর ২য় সন্তান বিশ্বরূপ বসু ১৯১০ সালে এবং ৩য় সন্তান যমুনা ১৯১২ ও ৪র্থ সন্তান গোরা ১৯১৪ সালে জন্মেছেন। ১৯১০ সালে ইন্ডিয়া সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর ৪র্থ প্রদর্শনীতে নন্দলাল রৌপ্যপদক লাভ করেন। এই প্রদর্শনী ১৯১১ সালে এলাহাবাদে হয়েছিল। ১৯১০ সালে তিনি পড়াশোনার পাঠ শেষ করেন। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনীতে সর্বস্তরের কলারসিকদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অর্জন করেন তাঁদের প্রশংসা। শুধু প্রশংসাই নয়, গর্ভনর থেকে শুরু করে শিল্পরসিক ইংরেজ ও ধনিক শ্রেণির লোকেরা তাঁর ছবি লুফে নিতেন।

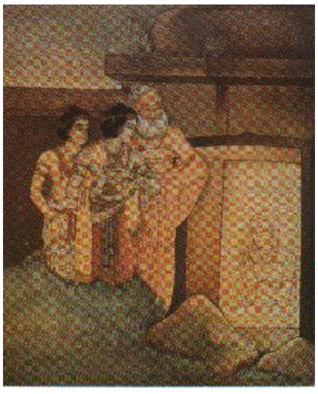

চিত্র ১০ : অহল্যা উদ্ধার, ওয়াশ
২১.৫৯ × ১৬.৫১ সেমি, ১৯১০

চিত্র ১১ : নৌকাবিহার, ওয়াশ ৫৩.৩৪ × ৩৮.১ সেমি, ১৯০৯

Dhaka University Institutional Repository

সাত

আর্ট স্কুলের শিক্ষার পার্ট শেষ করলে কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন তাঁকে আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। গুরু অবনীন্দ্রনাথের সাথে পার্সি ব্রাউনের মতানৈক্য ও আর্ট স্কুলের বাঁধাধরা কাজ অপছন্দনীয় হওয়ায় এবং ঔপনিবেশিক সরকারের অধীন চাকরি করবেন না বিধায় নন্দলাল আর্ট স্কুলের চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবনে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এই পর্বে দেশ-বিদেশের প্রদর্শনীতে প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কনে খ্যাতি লাভ, অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, বিচিত্রা ও সোসাইটিতে শিক্ষকতা, রবীন্দ্রনাথের সাথে শিলাইদহ ভ্রমণ, শান্তি-নিকেতনে সংবর্ধনা গ্রহণ, কুমারস্বামী ও ওকাকুরার সান্নিধ্য ও তাঁদের কাছে প্রাচ্য শিল্পতত্ত্ব দীক্ষা গ্রহণ, বিজ্ঞান বসু মন্দিরে ভিত্তিচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল নন্দলালালের শিল্পীজীবন।

আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিজের স্টুডিয়োতে কাজ করায় জন্য আহ্বান জানালে নন্দলাল মাসিক ষাট টাকা বেতনে ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের চিত্রকলা শেখাতেন। ঠাকুরবাড়িতে কাজের সূত্রে জাপানের বিখ্যাত মনীষী কাউন্ট ওকাকুরা ও আনন্দ কুমারস্বামীর সাথে নন্দলালের পরিচয় হয় এবং তিনি আনন্দ কুমারস্বামীর সাথে ঠাকুরবাড়ির শিল্প ও কারুশিল্প সংগ্রহের সুনিয়ন্ত্রিত তালিকা প্রস্তুতে সাহায্য করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে দেশীয় পরম্পরার শিল্প-ঐতিহ্যের অনেক দুর্লভ ছবির দেখা পেয়েছেন। এসব অ্যালবামের চিত্র দিয়ে কুমারস্বামী অনেক বই ছেপেছেন। নন্দলাল ঠাকুরবাড়ির চিত্রকলার বিপুল সংগ্রহের পাঠ নিয়েছেন এবং কুমারস্বামীর তাত্ত্বিক আলোচনা শুনে ঋদ্ধ হয়েছেন। চিত্রকলার এই শিক্ষাপর্বে অবনীন্দ্রনাথের Studio ঘরে নন্দলাল, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ কীভাবে আলোচনা ও কাজে মত্ত ছিলেনI কুমারস্বামীর সত্তর বছরের জন্মজয়ন্তীতে নন্দলাল অঙ্কিত স্মৃতি স্কেচে তা ফুটে উঠেছে।

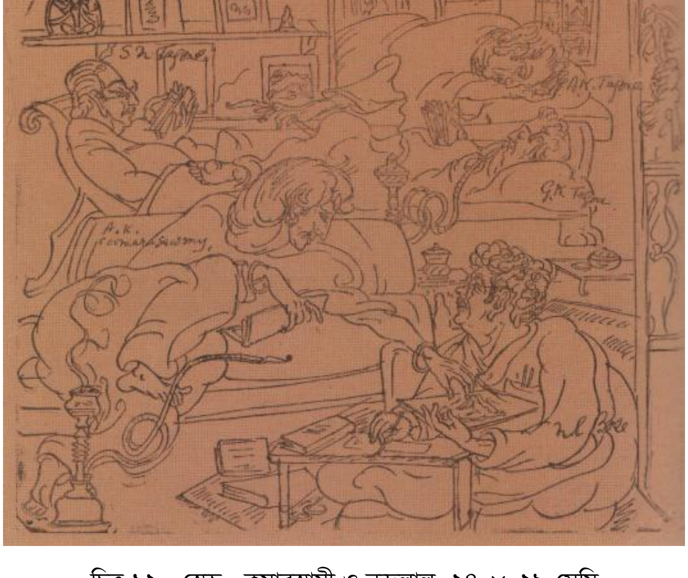

চিত্র ১২ : স্কেচ : কুমারস্বামী ও নন্দলাল, ২৪ × ২৯ সেমি

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময় পুরাতন আর্টিস্টদের স্কেচ বুক থেকে মোগল ইরোটিক ছবির কপি করেছিলেন কুমারস্বামীর অনুরোধে কুমারস্বামীর জন্য। সদা ধর্মপ্রাণ ও লাজুক প্রকৃতির নন্দলাল ইরোটিক চিত্র আঁকতে প্রথমত ইতস্তত হয়েছিলেন। ১৯১১ সালে সিস্টার নিবেদিতা নন্দলালের 'ষষ্ঠীপূজা' ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

চিত্র ১৩ : ষষ্ঠীপূজা, ওয়াশ, ১৭.৭৮ × ১২.৭ সেমি, ১৯১১

ভগিনী নিবেদিতা ও কুমারস্বামী কর্তৃক যুগ্মভাবে লিখিত *Myths of the Hindus and Buddhists* গ্রন্থের জন্য নন্দলাল কিছু চিত্র এঁকেছিলেন। তিনি নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুদিন চিত্রবিদ্যার ক্লাস নিয়েছিলেন। এই বালিকা বিদ্যালয়ে রিলিফে কিছু মূর্তি তৈরি করেছিলেন।[২৭] ১৯১১ সালে অজন্তা পদ্ধতির অনুকরণে রামায়ণের একগুচ্ছ ছবি এঁকেছিলেন।[২৮]

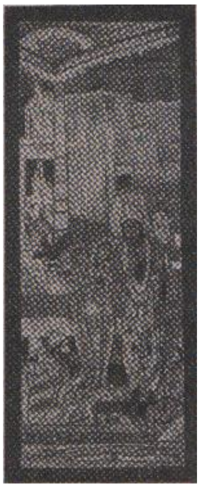

চিত্র ১৪ : নন্দলাল অঙ্কিত রামায়ণী পট
(হর ধনুভঙ্গের পরে সীতার রামচন্দ্রকে মাল্যদান)

চিত্র ১৫ : নন্দলাল অঙ্কিত রামায়ণী পট
(বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের তাড়কাবধে যাত্রা)

নন্দলাল বেলুরমঠে রামায়ণ পাঠ শুনতেন। ধারণা করা যায়, এই রামায়ণী চিত্র আঁকার প্রেরণা তিনি সেখান থেকেই পেয়েছিলেন। এ সময় (১৯১২–১৩) নন্দলাল স্বদেশি যুগের বিভিন্ন মনীষীর সাহচর্যে শিল্পতত্ত্বালোচনার মধ্য দিয়ে ভারতশিল্পতত্ত্ব বুঝতে চেয়েছেন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে। বিশেষত মহেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ ব্যক্তির সাথে চলত তাঁর ভারত-শিল্পতত্ত্বালোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে। এই গল্পের সাথে ছাপা হয় নন্দলালের *কাবুলিওয়ালা ও মিনি* ছবিটি। ছবিতে প্রাচ্যরীতির পূর্ণ প্রকাশ লক্ষণীয়।

চিত্র ১৬ : কাবুলিওয়ালা ও মিনি

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র* গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছিলেন নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়ের পর ১৯১৩ সালে প্রকাশিত *The Cresent Moon* বইয়ে ছাপা হয় The Home (শৈশব সন্ধ্যা) এবং The Hero (বীরপুরুষ) কবিতার দুটি ছবি।

চিত্র ১৭ : The home (শৈশব সন্ধ্যা)

চিত্র ১৮ : The Hero (বীরপুরুষ)

ছবি দুটির চরিত্রগত ব্যাখ্যা সুচারুরূপে ফুটে উঠেছে সুশোভন অধিকারীর বিশ্লেষণে। তিনি লিখেছেন :

> 'দি ক্রিসেন্ট মুন' বইতে 'দি হোম' কবিতার সঙ্গে নন্দলালের আঁকা মা ও শিশুর ছবিটি একটি বিশেষ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। নন্দলালের এ ছবিতে উজ্জ্বল লাল রঙের দ্বিমাত্রিক প্রেক্ষাপটে, মা আর ছেলের ফিগারে ফর্মের যে সরলতা ও তুলির আঁচড়ে সহজ সপাট স্বতঃস্ফূর্তির প্রকাশ ঘটেছেোতা নিঃসন্দেহে লোকশিল্পীদের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। . . . নন্দলালের অন্য ছবি 'দি হিরো'Iতার আঙ্গিক ও শৈলীতে একেবারে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করে। ওয়াশ ও টেম্পারা পদ্ধতির মিশ্রণে আঁকা এই ছবিটির গায়ে বাংলা কলমের সুস্পষ্ট টিপছাপ থাকলেও, চিত্রবিন্যাসে নন্দলালের রেখা ও আকার মাত্রিক বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন সহজেই ধরা পড়ে।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

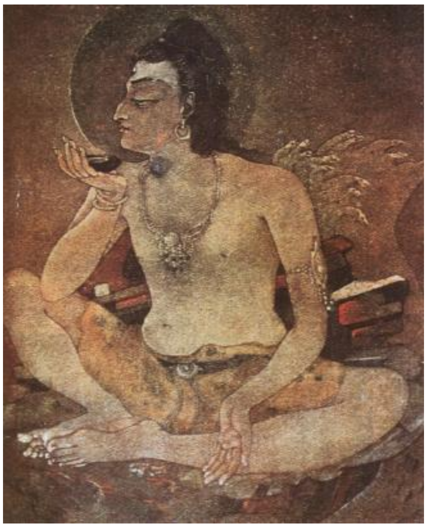

চিত্র ১৯ : শিবের বিষপান, ওয়াশ
২৫.৫ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১৩

চিত্র ২০ : উমার তপস্যা, ওয়াশ
১২.৭ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯১৩

আসলে বাংলার পরম্পরার সংস্কৃতি ও চিত্রকলার অভিজ্ঞতা এই চিত্রে আভাস বহন করে। প্রথম চিত্রে কালীঘাটের পটের প্রভাবও তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ছাত্রাবস্থায় পেটো পাড়ায় ঘুরে পট সংগ্রহ করেছেন। কালীঘাটের পটুয়াদের কাছে গিয়েছেন। তাঁদের রেখার বলিষ্ঠতা ও দ্রুত ছবি আঁকার দক্ষতা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। সুতরাং ইলাস্ট্রেশন ছাপিয়ে নব্য-বাংলার প্রাচ্যরীতির সৃজনশীল স্বকীয়তাই এ চিত্রের প্রমাণ মেলে। নন্দলালসহ নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার তিন শিল্পীর কাজ নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের লেখার মাঝে ছাপা হওয়ায় সারা বিশ্বে বাংলার প্রাচ্যরীতির চিত্রধারা প্রচার পেয়েছিল। নন্দলাল তাঁর চিত্রকলায় প্রাচ্যরীতির বিভিন্ন অনুষাঙ্গের সংশ্লেষ ঘটাতে ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়[‘গরুর’ চিত্রটির কথা। এ চিত্রটি তিনি কাম্বোডিয়ার, আর পুথির পাটার পটের অনুসরণে এঁকেছেন।[৩০]

১৯১৩ সালে মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে মেদিনীপুর পট-পাটা সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯১৩ সালে তাঁর অঙ্কিত বিখ্যাত ছবি ‘শিবের বিষপান’ ও ‘উমার তপস্যা’।

সমসাময়িক দেশ-বিদেশে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত নন্দলালের চিত্রকলা প্রাচ্যরীতির সুউচ্চ প্রশংসা অর্জন করতে থাকে। ভারতের *ভারতী*, *প্রবাসী*, *মডার্ন রিভিউ*, *গৃহস্থ* পত্রিকায় নন্দলাল ও অন্যান্য প্রাচ্যরীতির শিল্পীদের চিত্র অধিক ছাপা হতো এবং চিত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতো। অবশ্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত *সাহিত্য* পত্রিকায় প্রাচ্যরীতির বিরূপ সমালোচনা হতো। ১৯১৪ সালে সোসাইটির প্যারিস প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে বিদেশি সংবাদপত্রগুলোতে নব্য-বঙ্গীয় রীতির প্রচার হতে থাকে এবং প্রশংসা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের শৈল্পিক প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। শান্তিনিকেতনে এই প্রতিভাবান শিল্পীকে সংযুক্ত করার বাসনাও ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের। এর বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে নন্দলালের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা। তিপান্ন বছরের প্রবীণ কবি ত্রিশ বছরের শিল্পী নন্দলালকে ১৯১৪ সালের পহেলা মে (১২ বৈশাখ ১৩২১) আম্রকুঞ্জে সংবর্ধিত করেছিলেন নন্দলালের সৃজনকর্মের জন্য এই সংবর্ধনার ভিন্ন একটি গুরুত্ব জানা যায় শোভন সোমের তথ্যে। তিনি লিখেছেন, ‘এই সম্বর্ধনা ছিল গভীর

Dhaka University Institutional Repository

তাৎপর্যবাহী কেন না এর আগে বা পরে কোনো তরুণ প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ এভাবে সম্বর্ধিত করেন নি।'[৩১] অসিত কুমার হালদার, পিয়ার্সন সাহেব, অ্যান্ড্রুজ সাহেব, ক্ষিতিমোহন সেন, ভীমরাও শাস্ত্রী, বিধু শেখর শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জের কাঁচা-মাটির বেদিতে। নন্দলালের বর্ণনায় :

> তখন একটি কাঁচা-মাটির বেদী ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, পদ্মপাতা পেতে রাখা হয়েছে; আর মাটির ওপর গাঁইতি দিয়ে ডোবা কেটে, পদ্মের পাপড়ির ডিজাইন এঁকে, সেই গর্তগুলো লাল কাঁকড় দিয়ে ভরতি করে, পদ্ম এঁকে রেখেছে। বেদীর সামনে আলপনা আঁকা . . . গুঁড়ি গুলিয়ে আলপনাও দেওয়া হয়েছিলIবোধহয় বৈদিক মতে।
>
> কবি এলেন। ওখানে আমি বসতেই শাঁখ বাজানো হলো। অসিত কিংবা ছেলেদের কেউ মালা দিলে আমার গলায়। কবি আমার হাতে অর্ঘ্য দেবার পর খানিক বললেন। আমি বললুম অল্প।Iবিশেষ করে বললুমI'আমি ধন্য হয়েছি'। এর পরে কবি এই কবিতাটি পড়লেন :

ওঁ
শ্রীমান নন্দলাল বসু
পরম কল্যাণীয়েষু
তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত–ভারতী–চিত্ত!
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত!
ভাগ্যবিধাতা আশিষ মন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণেI
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ!
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।
চিরসুন্দরে কর গো তোমার
রেখাবন্ধনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক্ তব তুলি
চিররস–নিষ্যন্দী![৩২]

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় নন্দলাল অলৌকিক অপার্থিব অনুভূতির আনন্দ পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর অগ্রগতি হয়েছিল। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে চিত্রবিদ্যা শেখানোর জন্য ১৯১৫ সালে নন্দলালকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১১১৬ সালের ফেব্রুয়রিতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে নন্দলাল, মুকুলচন্দ্র দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। শিলাইদহের পক্ষ ও নিসর্গ সৌন্দর্যের চিত্র শিল্পীদের তুলিতে আঁকা হবে এই অভিপ্রায় ছিল রবীন্দ্রনাথের।[৩৩] ভ্রমণ শেষে নন্দলালের চিত্রকলায় শিলাইদহের প্রভাব লক্ষ করা যায় 'শীতের পদ্মা' ছবিতে। এতদিন পর্যন্ত নন্দলালের ছবির প্রেরণা ছিল সাহিত্য-আশ্রিত কল্পনা। প্রত্যক্ষ জগতের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির অন্তরাত্মার আবিষ্কার করে নিসর্গচিত্র আঁকার সূত্রপাত ঘটে রবীন্দ্রনাথের সাথে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায়। শোভন সোমের ধারণা মতে, নিসর্গ চিত্রকলার একটি

সমৃদ্ধ প্রবাহের উৎসমুখ খুলে দেয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষের সান্নিধ্যে সচেতনভাবে শিলাইদহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[৩৪]

ভারতশিল্পী নন্দলাল গ্রন্থে পঞ্চানন মণ্ডলের কাছে শিলাইদহ ভ্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়ে নন্দলাল যে ভাষ্য দিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর শিল্পীজীবনের মোড় ফেরার সাক্ষ্য আছে। তিনি বলেছেন, 'পদ্মার ধূ ধূ চর, পাখীর বিচরণ ও সময়ানুসারে তার গতিবিধি, সর্বোপরি পদ্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাখা করেছেন বরীন্দ্রনাথ। যা তাঁর শিল্পী জীবনের হাতে কলমে নেচার-স্টাডির হাতেখড়ি। আর্ট স্কুলে শাস্ত্র পুরাণ পড়ে ছবি আঁকার আইডিয়া নিতেন। কিন্তু এখানের প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য থেকে প্রথম আইডিয়া নিয়ে চিত্র এঁকেছিলেন।'[৩৫] রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, 'শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের কাছে ওঁদের যোগ দেবার ইচ্ছা জাগানোর উদ্দেশ্য ছিল কবির মনে।'[৩৬]

আসলে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সবগুলোই হতে পারে। তবে শিলাইদহে অবস্থানকালে নন্দলাল শুধু পদ্মার সৌন্দর্যই নিরীক্ষণ করেননি।রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে গ্রাম-সমাজের অনেক ঘটনার স্বাক্ষর আছে তাঁর চিত্রে। তাঁর প্রত্যক্ষণের সেসব স্বাক্ষর আছে তাঁর স্কেচের মধ্যে। স্কেচ, কালি-তুলি ও রঙিন ছবি ওখানে বসে এঁকেছেন। কতক কলকাতায় ফিরে এসে এবং পরে শান্তিনিকেতনে এসেও এঁকেছিলেন। তারিখযুক্ত সেরকম একটা চিত্র হচ্ছে 'এরফান মাতব্বর'। চিত্রে প্রজারা হুকুম শুনছিলেন, এরকম দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

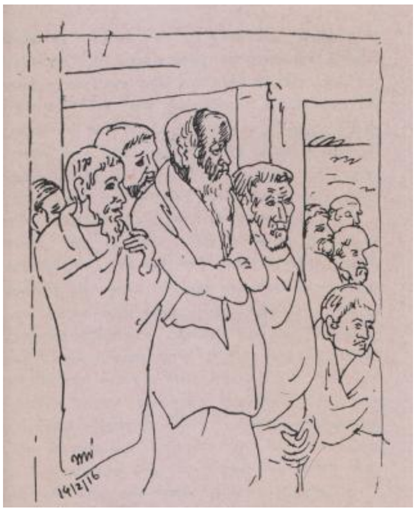

চিত্র ২১ : এরফান মাতব্বর, স্কেচ ১৯১৬

রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের সান্নিধ্যে আসার পর পরবর্তী সকল ভ্রমণেই নন্দলালকে আশা করতেন। ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণে এসে জাপানের চিত্রকলা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জাপানের চিত্রকলার গুণকীর্তন করে তাঁদের জাপানে আসতে বলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে জাপান চিত্রকলার শিক্ষণীয় দিকটা আমাদের দেশের শিল্পীদের গ্রহণ করার জন্য নন্দলালকে উপযুক্ত মনে করে নন্দলালকে আসতে বলেছিলেন।

শিলাইদহ ভ্রমণ শেষে ঠাকুরবাড়ির *বিচিত্রা*র শিল্প-শিক্ষক নিযুক্ত হলেন নন্দলাল। নন্দলালের বাড়িতে বসে অবনীন্দ্রনাথের অন্য ছাত্রদের সমবায়ভিত্তিক শিল্পচর্চার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে 'বিচিত্রা' রক্ষা পেয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

'দ্য বিচিত্রা স্টুডিয়ো ফর আর্টিস্টস অব দ্যা নিয়ো বেঙ্গল স্কুল' নামে। বিচিত্রার কার্যক্রম মাত্র দেড় বছর চলেছিল। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের নানান প্লাটফর্ম ছিল বিচিত্রায়। গান-বাজনা, নাটক অভিনয়, ছবি আঁকা, জলসা, নানান সংস্কৃতিচর্চার সামাজিক কেন্দ্র ছিল। বিচিত্রায় সুকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির সাহচর্য ও মননের সংস্পর্শ পেয়েছেন নন্দলাল। বিচিত্রার সাহিত্য-সভায় অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রবন্ধ, সংগীতের রাগ-রাগিণীর আলোচনায় নন্দলালের শিল্পবোধ শানিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণ সূত্রে বিচিত্রাতে শিল্পশিক্ষার জন্য সে দেশের শিল্পী কাম্পো আরাই সান এসেছিলেন। কাম্পো আরাই সানের কাছ থেকে নন্দলাল জাপানি পদ্ধতিতে স্কেচ ও চিত্রাঙ্কনরীতি, জাপানি কালি-তুলির কাজ শিখেছিলেন। এ সময় তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন। বাবার মৃত্যুশোক কাটাতে নন্দলাল সপরিবারে পুরী গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে পরবর্তীতে কাম্পো আরাই সান তাঁদের সাথে যোগ দিয়ে পুরী ও কোনারক ভ্রমণ করেছেন। পুরী ও কোনারক ভ্রমণের সময় তিনি আরাই সানের নেচার স্কেচ করার কৌশল দেখেছেন।

১৯১৬ সালেই নন্দলাল অসিতকুমার হালদারের সাথে রাঁচি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফ্রেনোলজি' অর্থাৎ মাথা টিপে টিপে মানুষের পোর্ট্রেট স্কেচ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন নিজে মডেল দিয়ে।[৩৭] রাঁচি ভ্রমণে গিয়ে সেখানে 'কোল-ডান্স'-এর দেখেছিলেন। নন্দলালের করা 'কোল-ডান্সের' স্কেচ থেকে অবনীন্দ্রনাথ লাইফ সাইজ অয়েল পেইন্টিং করেছিলেন।[৩৮] নন্দলালের পট আর পুথির পাটা সংগ্রহে আগ্রহ ছিল। ১৯১৩ সালে ছাত্রজীবনে মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে মেদিনীপুর তমলুকে বর্গভীমা দেখতে গিয়ে সেখানকার পট-পাটা সংগ্রহ করেছেন এবং তার আগে-পরে সব সময়ই পট সংগ্রহ করেছেন সতীর্থদের সাথে কালীঘাটে গিয়ে। বিচিত্রায় যোগদানের পূর্বে বানুপুরের বাড়িতে বসে কালীঘাট পটের আদলে প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন এবং স্বল্পমূল্যে সাধারণের নিকট বিক্রি করে উপার্জন করেছেন। ১৯১৬ সালের বিচিত্রা প্রতিষ্ঠিত হবার পর গুরু অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে পট করতে বলেন কালীঘাট ট্র্যাডিশনাল টেকনিকে নতুন বিষয় নিয়ে। তাই প্রস্তুতির জন্য নন্দলাল পুরাতন বই থেকে জন্তু-জানোয়ারের ছবির স্কেচ করেছেন পটের ধরনের। বানুপুরের বাড়িতে বসে অঙ্কিত পটের ছবিগুলো অবনীন্দ্রনাথ অধিক দামে কিনে নিলে নন্দলালের পট আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। নন্দলালের এই পট আঁকার দক্ষতা পরবর্তীকালে হরিপুরা কংগ্রেসে কাজে লেগেছিল।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সাথে শিল্প সম্পর্কে অনেক আলোচনা হতো নন্দলালের। জগদীশচন্দ্র নন্দলালকে ছবি আঁকার আইডিয়া দিতেন। ১৯১৭ সালে জগদীশচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ির বৈঠকখানায় আর নবপ্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দেয়ালে প্যানেল করে ফ্রেসকো পদ্ধতিতে ভিত্তিচিত্র এঁকেছিলেন। ছবির বিষয় ছিল মহাভারতের এবং অজন্তার অনুকরণে। তাঁর সহশিল্পী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। এই ভিত্তিচিত্রই তাঁর ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের প্রথম প্রয়াস। এ ছাড়া একই সময়ে তিনি তাঁর কলকাতার হাতিবাগানের বাড়ির দেয়ালে ফ্রেসকো পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছিলেন।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৬–১৭ সালে নন্দলাল গাংটা, পুরী, কোনারক ঘুরে স্কেচ করেছেন। কোনারকের সূর্যমন্দিরের প্রত্নকীর্তি ও সমুদ্রসৈকত তাঁকে বিমোহিত করেছিল। এ সময় এঁকেছিলেন বিখ্যাত চিত্র 'বৃষ্টিস্নাত কোনারক'। এই বছর তিনি রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান* গ্রন্থের জন্য তিনখানি ছবি এঁকেছেন।

চিত্র ২২ : বৃষ্টিস্নাত কোনারক, ওয়াশ, ১৫০ × ৬৫ সেমি, ১৯১৭

১৯১৭ সালের মধ্যভাগে বিচিত্রার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রার শিল্পশিক্ষাকে শান্তি-নিকেতনের মহাপরিসরে রূপ দিতে পরিকল্পনা করেন। শান্তিনিকেতনে সুরেন্দ্রনাথ কর যোগদান করেন। এ সময় কলকাতায় সরকারি অর্থানুকুল্যে সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ শিল্পশিক্ষা চালু হয়। নন্দলাল ১৯১৮ সালে সোসাইটিতে চাকরি নিয়েছিলেন দু'শ টাকা মাসিক বেতনে। এই সময় (১৯১৮) রবীন্দ্রনাথের রচনা *তোতাকাহিনি*র রবীন্দ্রকৃত অনুবাদ The parrot's Training প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের প্রচ্ছদ করেন নন্দলাল। এ ছাড়া ১৯১৮ সালে ম্যাকমিলান কোম্পানি ছবি দিয়ে গাঁথা রবীন্দ্রনাথের *Gitanjali and Fruit Gathering* গ্রন্থ প্রকাশ করে। এ গ্রন্থে নন্দলালের তেরোটি চিত্র সংকলিত হয়।

চিত্র ২৩ : Frontispiece

চিত্র ২৪ : Art thou abroad on this stormy night
(আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৫ : I asked nothing from thee (কুয়ার ধারে)

চিত্র ২৬ : When I bring you coloured toys (কেন মধুর)

চিত্রগুলোতে প্রাত্যহিক জীবনের ভাব বাঙ্ময় হয়েছে। রীতির দিক থেকে প্রাচ্যরীতির পূর্ণ প্রকাশ লক্ষণীয়। 'হেথা যে গান গাইতে আসা', 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়' চিত্রে জাপানি চিত্রকলার স্পেস বিভাজনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

আট

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর (৮ পৌষ) বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজ শুরু হয় ১৯১৯ সালের ৩ জুলাই। এ সময় বিশ্বভারতীর অঙ্গ হিসেবে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শিল্প ব্যবস্থার স্বদেশি জবাব দেয়া। শুরুতে কলাভবনের শিল্প-শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর।

নন্দলাল কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে থাকার সময় থেকে শান্তিনিকেতনের খবর রাখতেন। তিনি শান্তিনিকেতনের অসিতকুমার হালদারের সাথে 'সচিত্র' কার্ড লিখে যোগাযোগ রাখতেন। সচিত্র কার্ডের প্রতীকে থাকত বিশুদ্ধ কৌতুক রস, শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতি শিশুসুলভ কৌতূহল ও অহেতুক প্রীতিবোধ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রতিষ্ঠানে একান্তভাবে নন্দলালকে চেয়েছেন। এ সময় নন্দলাল কলকাতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের শিল্প-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯১৯ সালের জুন পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেছেন। ১৯১৮–১৯২১ ব্যাপ্তিকালে নন্দলালের জীবনব্যবস্থা নানা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কেটেছিল। এ সময় বড়ো ছেলে বিশ্বরূপ বসু শান্তিনিকেতনে পড়তেন। বড়ো মেয়ে গৌরী পড়তেন নিবেদিতার স্কুলে। ছোটো ছেলে গোরা রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। নন্দলাল পারিবারিক বিচ্ছিন্নতারোধে রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় পরিবারের সদস্যদের শান্তিনিকেতনে রেখে আসেন। এ সময় নন্দলাল সপ্তাহে একবার শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করতেন। সোসাইটির নিয়ম-কানুন নন্দলালের

Dhaka University Institutional Repository

অপছন্দ ছিল। হাজিরা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার বিষয় নিয়ে গগনেন্দ্রনাথের সাথে মনোমালিন্য ঘটেছিল। এই সূত্র ধরে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে সোসাইটির চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নিয়মিত শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে যোগদানের পূর্বে সপ্তাহে এক দিন শান্তিনিকেতনে ক্লাস নিতে যেতেন।

একদিকে সরকারি অর্থানুকুল্যে কলকাতায় গুরু অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে সোসাইটির শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র অন্যদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের কলাভবন। এই দুই শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নন্দলালের মতো শিল্পী-শিক্ষকের প্রয়োজন। নন্দলাল কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চাকরিতে গেলে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে সোসাইটিতে ফিরে আসতে চিঠি লেখেন। একদিকে গুরু অবনীন্দ্রনাথ অন্যদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। নন্দলালকে নিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ চলতে থাকে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে। নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে ধরে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> নন্দলালকে যে চিঠি দিয়েছ সেইটি পড়ে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছি। তার জন্যে আমাকে অনেক ব্যবস্থা ও খরচ করতে হয়েছে এবং আশাও অনেক করেছিলুম। আমার আশা নিজের জন্যে নয়।দেশের জন্যে, তোমাদেরও জন্যে। এই আশাতেই আমি আর্থিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও বিচিত্রায় অকৃপণভাবে টাকা খরচ করেছিলুম। তোমরা দেশে যে বীজ বপন করেছ সেটাই যাতে অঙ্কুরিত এবং স্থায়ী হয়ে সমস্ত দেশের চিরন্তন জিনিষ হয় এই আমার কামনা ছিল। কেন না আমি জানি যে আমাদের দেশের যা কিছু স্থায়ী ও গভীর মঙ্গল তা স্বদেশের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব।কারণ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টির জিনিষ স্বাধীনতাপ্রসূত।তার গৌরবই তাই। এই গৌরব যদি আমরা দেশের লোক নিজের চেষ্টায় অর্জন করি তাহলেই সেটা যথার্থ National হয়। যাই হোক এই মনে করেই আমি ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করি নি।আজও করি নে। কলকাতায় ভাল করে শিকড় লাগল না বলেই এখানে কাজ ফেঁদেছি। সফলতার সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েছে। ছাত্রেরা উৎসাহিত হয়েছে, শিক্ষকেরাও।একটা atmosphere তৈরি হয়ে উঠছে। নন্দলালের নিজের রচনাও এখানে যেমন অব্যাহত অবকাশ ও আনন্দের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে এমন কলকাতায় হওয়া সম্ভবপর নয়-সেইটেই আমার কাছে সবচেয়ে লাভ বলে মনে হয়। নন্দলাল এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন।বাহির থেকে তার উপরে কোনো দায়িত্ব চাপানো হয় নি।তা ছাড়া এখানে তার নিজের কাজের ব্যাঘাত করবার কোনো প্রকার উপসর্গ নেই। আরও একটি সুবিধা এই, এখানে সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য চর্চায় নন্দলাল যোগ দেওয়ায় মনের মধ্যে সে যে একটি নিয়ত আনন্দলাভ করছে সেটা কি তার প্রতিভার বিকাশে কাজ করবে না? তোমাদের সোসাইটি প্রধানত চিত্র প্রদর্শনীর জন্যে।এখান থেকে তার ব্যাঘাত না হয়ে বরঞ্চ আনুকূল্যই হবে। তারপরে নন্দলালের লম্বা লম্বা ছুটি আছে। প্রয়োজনমত কখনো কখনো সে ছুটি বাড়াতেও পারে। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে নন্দলাল এখানে থাকাতে তোমাদেরই কাজের সুবিধা হচ্ছে।অথচ এতে আমার আনন্দ। যদি তোমরা এর ব্যাঘাত কর তাহলে আমার যা দুঃখ এবং ক্ষতি তাকে গণ্য না করলেও এটা নিশ্চয় জেনো নন্দলালের এতে ক্ষতি হবে এবং তোমাদেরও এতে লাভ হবে না। যদি সাংসারিক উন্নতির টানে নন্দলালের এই সুযোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো কথাই নেই।কিন্তু আমার একান্ত অনুনয় এই, তুমি গুরু হয়ে তাকে এ ক্ষেত্রে ডেকো না।কেন না তোমার ইচ্ছা তাকে বিচলিত করবে।অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও করবে। নন্দলালের পরে আমার কোনো জোর নেই।কিন্তু ওর পরে আমার অনেক আশা আছে।নিশ্চয় জেনো, সে আমার কাজের দিক থেকে নয়।দেশের দিক থেকে। গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আমি অর্থের প্রতিযোগিতা করতে পারব না।কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই মঙ্গল কামনা এবং আমাদের সম্মিলিত তপস্যার দ্বারা আমরা ওর যে সাহায্য করতে পারব টাকার দ্বারা তা কখনই হবে না। এখানে আমরা স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে ঈশ্বরের নাম করে যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, টাকার চেয়ে তার কি বড় inspiration নেই।আর সেই inspriration কি সমস্ত সৃষ্টিকার্যের সব চেয়ে বড় প্রেরণা নয়? আমার কথাটাকে তোমরা বড় করে এবং মনকে নিরাসক্ত করে চিন্তা কোরো।তবু যদি তোমাদের অন্যরূপ ইচ্ছা হয় তবে তাই আমি ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব; এ পর্যন্ত যেমন একলাই আমার সব কাজ করেছি এই চেষ্টাতেই আবার সেইরকম একলাই চলতে থাকব।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা তথা ভারত-শিল্পের বিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন। ফলে অবনীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে নন্দলাল পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন।

নন্দলাল ১৯২০ সালে স্থায়ীভাবে যোগ দেয়ার সময় কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন অসিতকুমার হালদার। কলাভবনে অসিতকুমারের ছাত্র আর সোসাইটি থেকে আসা ছাত্রদের নিয়ে শিল্পশিক্ষা চলছিল নতুন উদ্দীপনায়। নন্দলাল শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী বিভিন্ন মনীষী প্রতিবেশীদের সাহচর্যে এলেন। এঁরা হলেনIজগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, অ্যান্ড্রুজ পিয়ার্সন, সিলভঁ লেভি, অধ্যাপক ইউন্টারনিজ, লেসনি, স্টেলা ক্রামরিশ, আঁদ্রে কার্পেলেস, বোগদানফ প্রমুখ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার সঠিক পরিবেশে নন্দলালের চিন্তাজগৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯২১ সালে সরকারি অর্থানুকূল্যে বাগগুহা চিত্র অনুলিপি করার জন্য নন্দলাল অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর গোয়ালিয়রে গিয়েছিলেন। এখানে গিয়ে তিনি বাগগুহার স্কেচ করেছেন। *গায়ত্রী* গ্রন্থের জন্য ছবি এঁকেছেন। ওকাকুরার শিল্পচিন্তা কাজে লাগিয়ে কলাভবনে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই বছর ১ম ব্যাচের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রচলন করেন শিক্ষাভ্রমণের। তিনি নালন্দা, রাজগীর, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া ইত্যাদি প্রত্নকীর্তিবহুল ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেছেন। এসময়ে তাঁর আঁকা বিখ্যাত ছবি ‘উমার প্রত্যাখ্যান’।

১৯২২ সালে নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ওই বছরের শেষের ভাগে স্টেলা ক্রামরিশ শন্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এবং গথিক-আর্টের ওপর সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ভারতীয় শিল্প প্রতিভা, বাইজানটাইন, ইটালিয়ান আর্ট প্রসঙ্গ নিয়েও ছাত্রদের বোঝাতেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ে খুব ভালো জানতেন এবং ছাত্রদের জানাতেন। তাঁর তত্ত্বালোচনায় কলাভবনের শিল্পধারায় পাশ্চত্য প্রভাবের সূত্রপাত হয়।

শুধু শিক্ষকতাই নয়, নন্দলাল শান্তিনিকেতনে সমাজকর্মের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গান্ধির আদর্শে শান্তিনিকেতনে ১৫ মার্চ ‘গান্ধি পুণ্যাহ’ পালন করা হতো। নন্দলাল এই সেবাব্রতে প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করতেন। সমাজকর্মের এই প্রচেষ্টা শান্তিনিকেতনের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। ১৯২২ সালে কেন্দুলির পৌষ সংক্রান্তির মেলায় অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নানাবিধ পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। তাঁর অধ্যক্ষতাকালের শুরুতেই (১৯২২–২৪) শান্তিনিকেতনে প্রাথমিকভাবে শিল্পশাস্ত্রের চর্চা শুরু করেছিলেন শ্রীহরিদাস মিত্রের সাথে। তাঁর সাথে থাকতেন অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দনাথ কর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই শাস্ত্রচর্চার কারণেই পরবর্তীকালে শিল্পতত্ত্ব নিয়ে বই লেখার মানসিকতা জন্মেছিল।[৪১]

১৯২১–২৪ সালের মধ্যবর্তী শিক্ষাবিস্তার প্রকাশ পাওয়া যায় *শান্তিনিকেতন* পত্রিকায় (১৩৩১, পৌষ) প্রকাশিত ‘ছবির পরখ’ লেখার মধ্য দিয়ে। ‘পাখি’ ও ‘বাংলার পাখি’ বইয়ের জন্য কয়েকটি ছবি এঁকেছিলেন। এই বই ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছবিতে বাংলার পাখির প্রতি আচার্য নন্দলালের সূক্ষ্ম

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই পাখি অঙ্কনকে আমরা তাঁর শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি প্রত্যক্ষণ ও স্টাডির চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

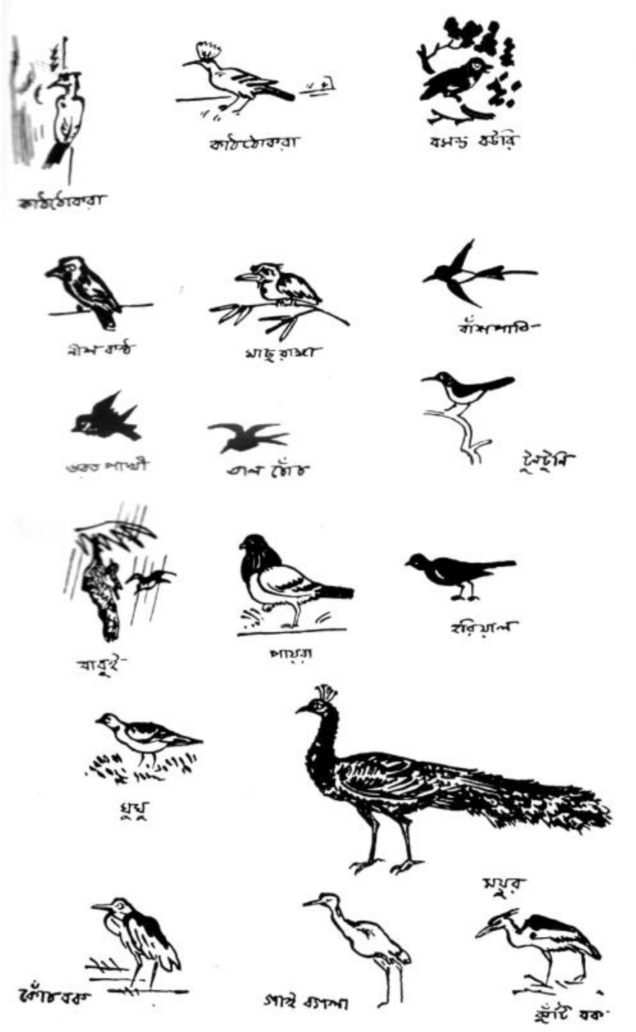

চিত্র ২৭ : 'বাংলার পাখি' বইয়ের জন্য নন্দলাল অঙ্কিত স্কেচ

১৯২৩ সালে পরিবারের সদস্য, ছাত্র-শিক্ষক বীরভূমের বক্রেশ্বর ভ্রমণ করেছন। দেখেছেন শৈবতীর্থ রাজনগর, গড়জঙ্গল প্রভৃতি স্থান। শুধু ভ্রমণ নয়, এই সময় বিশ্বভারতীতে নানা গুণী-জ্ঞানী লোকের সমাগম হতো যাঁদের সাথে নন্দলাল শুধু কর্মরত অবস্থায় নয়, সামাজিক মানুষ হিসেবে সম্পর্ক রাখতেন।

এঁদের মধ্যে মহাস্থবির ধর্মাধার, ধর্মপাল, ভীমরাও শাস্ত্রী, গৌরগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার রায়, সুইস-ফরাসি অধ্যাপক বেনোয়া, কাজিনস; মোহেনজোÍদড়োর গবেষক ও ভাষাতত্ত্ববিদ ড. মার্ক কলিন্স; হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত ফাবরি, প্যাট্রিক গেডিস, আর্থার গেডিস, স্টেন কোনো, ফার্মিকি প্রমুখ।[৪২]

ওকাকুরার আদর্শে অনুপ্রাতি নন্দলাল মৌলিক রচনা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরাÍএই তিনের মিলনে তাঁর প্রথম পর্বের ছাত্রদের নিয়ে নিজস্ব শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রথম পর্বের ছাত্ররা হলেনÍহীরাচাঁদ দুগার, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. হরিরণ, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিনায়ক

Dhaka University Institutional Repository

মাসোজী, বীরভদ্র রাও, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রকৃতিনির্ভর কলাভবনে প্রকৃতি দেখে শিক্ষা ও স্টাডি করাতেন এবং সবশেষে ছাত্রদের কম্পোজিশন করাতেন। অশোক ভট্টাচার্যের মতে, 'নন্দলাল নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতিকে উন্মার্গতার ক্ষেত্র থেকে সজীব প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জগতের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।'[৪৩]

নন্দলালের শিল্পশিক্ষার আদর্শ ছিল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের আদর্শের অনুরূপ। তিনি ছাত্রদের সাথে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ছাত্রদের সাথে শিল্প বিষয়ে আলোচনা করতেন। ছাত্রদের মৌলিক প্রতিভা বিকাশে উৎসাহ প্রদান করতেন। এ ছাড়া শিক্ষাভ্রমণ, ছুটিকালীন ছাত্রদের সাথে সচিত্র পত্রালাপ, ছাত্রদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানো তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে নতুন মাত্রা এনেছিল। আর এজন্যই তাঁর প্রথম পর্বের ছাত্ররা ভারতীয় চিত্রকলার নানা অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমসাময়িক এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকর অদ্রেঁ কারপেলেস্ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯২৩ সালে। তাঁর মাধ্যমে ইউরোপের এক্সপ্রেশনিস্ট কাঠখোদাইয়ের ধারণা শান্তিনিকেতনের শিল্প শিক্ষার্থীরা পেয়েছিলেন।[৪৪]

নয়

১৯২৪ সাল নন্দলালের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরে ২১ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে চীন-জাপান ভ্রমণের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। এই দূরপ্রাচ্য যাত্রায় অন্যান্য সঙ্গী ছিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস নাগ, লেনার্ড এলমহার্স্ট এবং শ্রীমতী গ্রিন। দীর্ঘ চার মাসব্যাপী এই ভ্রমণের শুরু থেকে যা কিছু দেখেছেন তার খসড়া ছবি চাক্ষুষ দিনলিপির মতো এঁকেছেন। আশ্রমের বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন, সহকর্মী ও ছাত্রদের তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত চিঠিসহ ছবি ও কার্ডে আঁকা ছবিতে প্রেরণ করেছিলেন। এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় পরম্পরাগত বিচিত্র প্রাচ্যশিল্পের মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছেন। প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন চীন। চীনের খাস ও বৌদ্ধ শিল্প দেখেছেন নন্দলাল। চীনে-সংগীতের রাগরাগিণীতে ভারতীয় রাগরাগিণীর চিত্ররূপ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এপ্রিল থেকে মে চীন দেশে কাটিয়ে মে মাসের শেষে জাপানে পৌঁছেছিলেন। ১৯১৬ সালে জাপানে রবীন্দ্রনাথ প্রথম এসেছিলেন। তখনই জাপানি চিত্রকলা দেখার জন্য নন্দলালের কথা ভেবেছিলেন। এই সফরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই ইচ্ছা পূরণ হলো। জাপানে টোকিয়োতে নামার পর 'বিচিত্রা' পর্বে জাপানি পরিচিত শিল্পী আরাইকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ করেন। টোকিয়োতে বিজুৎসু-ইন সমিতির শিল্পীদের সাথে পরিচিত হন। সমিতির শিল্পীদের মাধ্যমে জাপানি বিভিন্ন চিত্রশালায় গিয়ে সমকালীন জাপানি চিত্রকলা দেখেছিলেন। জাপানি শিল্পীদের ছবি আঁকার পরিবেশের শুদ্ধাচার লক্ষ করলেন। শিল্পীর কাজের জায়গা, শিল্পের উপকরণ ব্যবহারে পবিত্র পরিচ্ছন্নতা ও ছবিতে সরলতা ও স্পষ্টতার বিষয়টি দেখে নন্দলাল অভিভূত হন। তিনি জাপানের কিওটোতে হিরিত্তজি মন্দিরে অজন্তাগুহাচিত্রের অনুঅঙ্কন দেখেছেন। এই ভ্রমণে নন্দলাল ভারত-শিল্পের সাথে চীন-জাপান শিল্পের তুলনামূলক ঐক্য ও পার্থক্য অনুধাবন করেছেন। সব মিলিয়ে বৃহৎ প্রাচ্যশিল্পের শিল্পসম্ভারের বৈচিত্র্যময় জ্ঞানলাভ করেছেন। সেই সাথে কলাভবনের জন্য নিয়ে এসেছিলেন চীনা-জাপানি শিল্প নিদর্শন। বিভিন্ন বই, সেখানকার নানা কৌশলে আঁকা ছবি।

জাপানে নন্দলালের সাথে বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর দেখা হয়। রাসবিহারীর ইচ্ছায় ও সহযোগিতায় পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিল্পশিক্ষার্থীদের জাপানে পাঠিয়েছিলেন নন্দলাল। প্রথম ১৯৩০ সালে পাঠিয়েছিলেন ছেলে বিশ্বরূপ বসু ও ছাত্র হরিহরণকে। সেখানে তাঁরা জাপান পদ্ধতির বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম শিখে কলাভবনে ফিরে এসেছেন। চীন-জাপান ভ্রমণে নন্দলাল দূরপ্রাচ্যের শিল্পবোধ আত্মস্থ করে শান্তিনিকেতনে কলাভনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে তাঁদের শিল্পকৌশল শিখিয়ে শান্তিনিকেতন ধারায় প্রাচ্যশিল্পের সমৃদ্ধতর রসদ জোগাতে সহায়তা করেছেন। বাংলার আধুনিক চিত্রকলার ভাবধারার দূরপ্রাচ্যের দৃশ্য সংস্কৃতির আদর্শের প্রভাব এই ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। চীন-জাপান চিত্রকলার আধ্যাত্মিক বোধ, সীমার মধ্যে অসীমের অনুরণনI ভ্রমণ-পরবর্তীকালের অজস্র নিসর্গমালায় প্রেরণা হিসেবে লক্ষ করা যায়।

চিত্র ২৮ : Floating a canoe, কালি তুলি, ৩৪ × ৮২.৬ সেমি, ১৯৪৭

১৯২৪ সাল থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথ জগানন্দ রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯২৪–২৫ সালে মালদহ, গৌড়, পাণ্ডুয়া ভ্রমণ করেছেন। গৌড়ের সুলতানি স্থাপত্য-কীর্তির নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যে সেই রীতির প্রবর্তন করেছেন সুরেন্দ্রনাথ করের সহযোগে। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন সামাজিক উৎসব ও রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে ঋতু উৎসবের উপযোগী পরিবেশ রচনা ও সুরুচিপূর্ণ সাজসজ্জার উদ্ভাবন করেছেন। ১৯২৫ সালে ভারতের নানা স্থানে কলাভবনের ছবির প্রদর্শনী হয়। লক্ষ্ণৌ প্রদর্শনী থেকে নন্দলাল তাঁর কাজের পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক অর্জন করেন।[৪৫] দ্বিজেন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, কুমারস্বামী প্রমুখের স্বদেশি শিল্পচিন্তা নন্দলালকে উদ্বুদ্ধ করত। তাই তিনি চারুশিল্পের সঙ্গে কারুশিল্পের যোগ ঘটাতে পছন্দ করতেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের লোকশিল্পের শিক্ষা দেয়ার অভিপ্রায়ে কারুশিল্পের নান্দনিক গুণসম্পন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করতেন। বংশপরম্পরায় প্রশিক্ষিত লোকশিল্পীদের দিয়ে শিল্প শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতেন। এজন্য ভারতের নানা প্রদেশের প্রাচীন ধারাবাহী কারুশিল্পীদের আনানোর ব্যবস্থা করতেন। ১৯২৬–২৭ সালে তিনি জয়পুরী আরায়েস পদ্ধতির ভিত্তিচিত্রের করণ-কৌশলী নরসিংলালকে আমন্ত্রণ করে

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন। নন্দলাল এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা নরসিংলালের কাজে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে জয়পুরি আরায়েস দেয়াল চিত্র পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন।

১৯২৭ সালে মাসিক পত্রিকা *বিচিত্রা* প্রকাশ হয়। ১৩৩৪ আষাঢ় (১৯২৭) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা প্রকাশিত হয়, যার অলংকরণ করেছিলেন নন্দলাল। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা বইয়ের অলংকরণ ও শিল্পবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সুশোভন অধিকারীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> বই তৈরির ক্ষেত্রে আজকে যে শব্দগুলি ঘুরে ফিরে বার বার আমাদের কানে আসে সেই 'পেজ লে-আউট, পেজ মেক-আপ ইত্যাদির কাজ এখানে অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে। বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবির বৈচিত্র লক্ষ করার মতো, কোথাও ক্যালিগ্রাফির সপাট আঁচড়ে রচিত হচ্ছে সাজেস্টিভ ছবির অসাধারণ উদ্ভাস, কোথাও আবার ডেকরেটিভ আমেজে মাখা দৃষ্টিনন্দন রেখায় তৈরি ছবিতে মুগ্ধ হয়ে উঠছে পাঠক বা দর্শকের দুই চোখ। 'প্রত্যাশা', 'দীপালি', 'শরতের ধ্যান', 'বৈশাখ-আবাহন' বা শিমুল ফুলের ছবি তাদের টান-টান ঋজুতায় যেমন মনকে আকর্ষণ করে, তেমনি এর পাশাপাশি 'বসন্ত' 'দোল', 'শরৎ' ইত্যাদি অজস্র রেখাঙ্কন, পুষ্পিত পলাশের গুচ্ছ বা ফুটন্ত আশোকের মঞ্জুরী তাদের আলঙ্কারিক মাধুর্যে চোখকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়। এবং সেদিকে দেখতে গেলে এ বইয়ের চিত্রমালা নন্দলালের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সমস্ত দিকগুলি আশ্চর্য রকমভাবে প্রতিফলিত করে![৪৬]

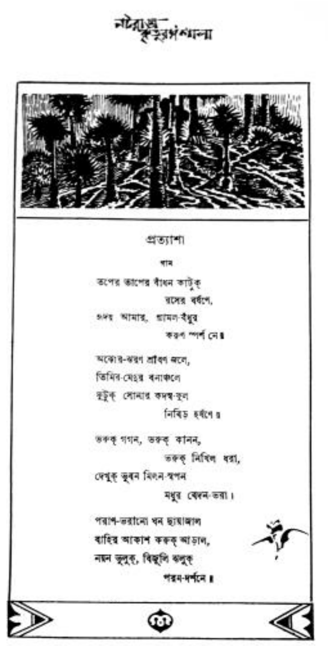

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা

প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে॥

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্ব-ফুল
নিবিড় হর্ষণে॥

ভরুক্ গগন, ভরুক্ কানন,
ভরুক্ নিখিল ধরা,
দেখুক্ ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদন-ভরা।

পরাণ-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক্ আড়াল,
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক
পরম-দর্শনে॥

চিত্র ২৯ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা গ্রন্থের অলংকরণ

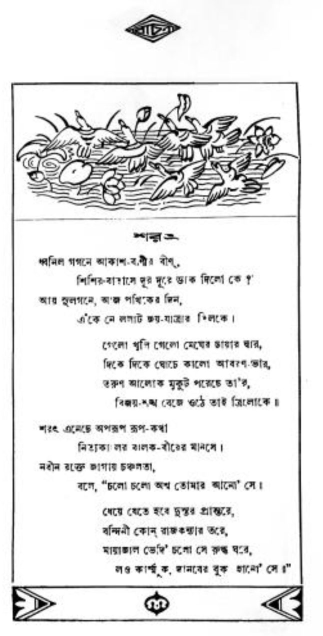

শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীণ,
শিশির-বাতাসে দূর দূরে ডাক দিলো কে?
আর ফুলবনে, আজ পথিকের দিন,
এঁকে নে ললাটে জয়-যাত্রার টিলকে।

গেলো খুলি গেলো মেঘের তাহার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণ-ভার,
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তা'র,
বিজয়-শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে॥

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপ-কথা
নিত্যকালের বালক-বীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে, "চলো চলো অশ্ব তোমার আনো' সে।

ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি' চলো সে রুদ্ধ ঘরে,
লও কার্ম্মুক, দানবের বুক হানো' সে॥"

চিত্র ৩০ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা গ্রন্থের অলংকরণ

১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতনে 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়। নন্দলাল বসুর বড় মেয়ে গৌরী বসু এই নাটকের সার্থক রূপদান করেছিলেন নৃত্যকলার মাধ্যমে।

চিত্র ৩১ : নটীর পূজা, সিল্কের ওপর জলরঙে টেম্পারা, ১৯২৭

১৯২৭–২৮ সালে শিক্ষাভ্রমণে পাহাড়পুর গিয়ে সেখানকার পালযুগের শিল্পকর্ম থেকে তিনি ভারতশিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেন। পাহাড়পুরের আদর্শে তখনকার কলাভন সন্তোষালয়ে শিশুদের স্নানাগার মণ্ডন

করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ১৫ জুলাই শ্রীনিকেতনে প্রথম হলকর্ষণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নন্দলাল গ্রামের বিবিধ সামগ্রী ও নানান শস্য দিয়ে আলপনা করেছিলেন। অর্থাৎ নন্দলাল বসুর পরিকল্পনায় সভামণ্ডপ নতুনভাবে সাজানো হয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় ও চিরন্তন করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি উন্মুক্ত দেয়ালে ইতালীয় ফ্রেসকো পদ্ধতিতে সুবিশাল ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এ ভিত্তিচিত্রের নাম 'হলকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ'।

১৯২৯ সালে তিনি কার্সিয়াং ভ্রমণ করেন। সেখানকার হিমালয়ের অপূর্ব দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে এঁকেছিলেন 'যোগমূর্তি-কাঞ্চনজঙ্ঘা'। এই বছর প্রকাশ হয় *ফুলকারি গ্রন্থ*। প্রকৃতিজাত বস্তুর অর্থাৎ ফুলপাতার গতি ও গড়নকে মণ্ডনরূপে নকশায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারটি দর্শানোই নন্দলালের উদ্দেশ্য ছিল এই বইয়ে।

দশ

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি শিল্পীপল্লী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই পরিকল্পনায় ১৯৩০ সালে 'কারুসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল কলাভনে পাঠ শেষ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরির চেষ্টায় দেশে-বিদেশে না গিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কমার্শিয়াল কাজের অর্ডার নিয়ে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করবেন, যাতে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী শিল্পতীর্থ গড়ে ওঠে। স্বাধীন উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে শিল্পীরা শিল্পচর্চা অব্যাহত রাখতে পারবেন। এ ছাড়া এ প্রক্রিয়ায় কারুকর্মের সঙ্গে চারুশিল্পের মিলন ঘটবে। শিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সাধারণ লোকের শিল্পরুচি উন্নত করতে পারবেন। উপার্জিত অর্থ দিয়ে কারুশিল্পবিষয়ক বই প্রকাশ করতে পারবেন। সর্বোপরি পরস্পরের সহায়তায় বাংলার প্রাচ্যশিল্পীরা উন্নত হবে।

কারুসংঘের প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সমিতির পাঁচজন সদস্য পাঁচশ টাকা দিয়ে পাঁচ বিঘা জমি ক্রয় করেছিলেন। কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি থেকে দেয়ালচিত্র, পুস্তক-প্রসাধনসহ বিভিন্ন প্রকার অর্ডার সংগ্রহ করে সমিতির সদস্যরা অর্ডারদাতার নিকট ফেরত পাঠাতেন। কারুসংঘের সদস্য ইন্দুসুধা ঘোষের লেখা সুচের কাজের ওপর *সীবনী* বই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩০ সালে তাঁর সুবিখ্যাত চিত্রসৃষ্টি হলো। 'ডান্ডিমার্চ'। লিনোকাটে আঁকা চিত্রটির রেখার ব্যবহারকে শোভন সোম গজালধর্মী রেখার সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, চাক্ষুষ রূপ অপেক্ষা ভাব এবং অন্তর্গত চরিত্রের রূপায়ণ হয়েছে চিত্রটিতে।[৪৭] লিনোকাট ছাপায় এ ছবির হাজার হাজার কপি সারা ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই চিত্রের মাধ্যমে গান্ধীর রাজনৈতিক ও ব্যক্তি আদর্শকে সর্বসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে শিল্পকে রাজনৈতিক উপাকারে নিয়ে এসেছিলেন।

চিত্র ৩২ : ডান্ডিমার্চ, লিনোকাট, ৩৪.৯ × ২২.৫ সেমি, ১৯৩০

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রচিত শিশুশিক্ষার বই *সহজ পাঠ* প্রকাশিত হয়। নন্দলাল বসু এ বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সচিত্রকরণ করেছেন লিনোকাটের ছাপচিত্রের মাধ্যমে।

চিত্র ৩৩ : সহজ পাঠ প্রথম ভাগের অলংকরণ

চিত্র ৩৪ : সহজ পাঠ প্রথম ভাগের অলংকরণ

লিনোকাট বা উডকাটের অসামান্য নিদর্শন সহজ পাঠের প্রথম ভাগের ছবিগুলো। দ্বিতীয় ভাগ এঁকেছেন আলংকারিক বা বস্তুধর্মী রেখায়। শিশুর মনস্তত্ত্বের দিক বিবেচনা করে প্রথম ভাগের চিত্রে সাদা-কালোর সমতলীয় ক্ষেত্র বিভাজনে রূপবন্ধের সরলীকরণ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে দেখতে শেখানোর জন্য বস্তুধর্মী

রেখায় রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং রূপের অনুপুঙ্খ দেখতে শেখানোর জন্য বস্তুধর্মী রেখায় রূপের অনুপুঙ্খ এঁকেছেন।

চিত্র ৩৫ : সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের অলংকরণ

প্রথম ভাগের ছবিতে দৃশ্যবাস্তবতাকে সরলীকরণ করে পাঠ্য বিষয়ের চিত্রানুবাদ গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে অভাবনীয় নতুনত্ব এনেছেন নন্দলাল। এ ছাড়া আমরা এই চিত্রকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসেবে মর্যাদা দিতে পারি। কারণ রস বিচারে এসব অলংকরণের প্রত্যেকটি চিত্রই স্বতন্ত্র সত্তা বহন করে।

গ্রন্থচিত্রণের উপস্বত্ব কলাভবনের জন্য দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নন্দলাল এই টাকায় কলাভবনে শিক্ষার কাজে বিভিন্ন কারুশিল্পীকে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোর ব্যয়ভার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়, শিক্ষকদের শিখতে বাধ্য করতেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে চলে গেলেও শিক্ষকরা স্থায়ী; সুতরাং কারুশিল্পের ধারাকে প্রবহমান রাখতে শিক্ষকদের শেখাতে বাধ্য করতেন। শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কারুশিল্পীদের নয়; চীন, জাপান, জাভা, আরও অন্য বিভিন্ন প্রাচ্য দেশের শিল্পকর্ম সমারোহের মাধ্যমে বিশ্বভারতীতে ভারতশিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপসৃষ্টির কল্পনা ছিল নন্দলালের। তাঁর স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে পঞ্চানন মণ্ডলের কাছে বলেছেন, 'বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কারিগর আনিয়ে তাদের কাজে উৎসাহ দিয়ে, আমাদের ধারায় তাদের ধারা মিলিয়ে মিশিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী ভারতশিল্পের প্রবাহ বহাতে আমি চেয়েছিলুম বিশ্বভারতীতে'।[৪৮]

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সাথে ভূপালে ভ্রমণ করেন এবং সাঁচির স্তূপ দেখেন। একই বছর নন্দলালের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করে নন্দলালকে কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। এই কবিতায় বিধাতার সমধর্মী নন্দলালের স্বতঃউৎসারিত প্রশস্তি প্রকাশ করেছেন। নন্দলালের শিল্পপথের পথিক শিল্প হিসেবে প্রকাশ করে লিখেছেন :

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষায় ডোবা, Í
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তা'রে, ছুটেচে মন তোমার পথে যেতে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মসমর্পণ ১৯৩০ সালের ২৯ জুন লিখিত পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রে শুধু নন্দলাল নয়; শান্তিনিকেতনের চিত্রকলার আদর্শকেও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। তিনি লিখেছিলেন :

আমার ছবিগুলি শান্তিনিকেতন-চিত্রকলার আদর্শকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেচে। এই খ্যাতির প্রধান অংশ তোমাদের প্রাপ্য। কেননা তোমরা নানা দিক থেকে তোমাদের আলেখ্যে উৎসবে আগ্রহে আনন্দে অন্তরে অন্তরে আমাকে উৎসাহিত করেচ। তোমরা রূপকলার প্রাণনিকেতন ওখানে গড়ে তুললে।এ তো আর্ট স্কুল নয় এ খাঁচা নয়, এ যে নীড়, তোমাদের জীবন দিয়ে এ রচিত। সেইজন্যে এই হাওয়াতে আমার বহুকালের অফলা একটি শাখায় হঠাৎ ফল ধরল। তোমরা তো জানো বাঁশ গাছ সুচিরকাল পরে কোন্, অপ্রত্যাশিত অবকাশে তার শেষ ফুল ফুটিয়ে আপন জীবনলীলা সাঙ্গ করে।আমারও সেই দশা।রঙের ভাণ্ড পশ্চিম দিগন্তে উজাড় করে দিয়ে তবে অনন্তসমুদ্রে ডুব দেওয়া। আমার বাঁশ থেকে এতদিন কেবল বাঁশিই তৈরি হয়েছিল; আজ তোমাদের কলা-বাসন্তীর স্পর্শ-পুলক তাতে পুষ্পমঞ্জরী মূর্তিমতী।[৫০]

১৯৩২ সালে জয়পুরী কাজের অনুসরণে ছাত্রদের নিয়ে দেয়ালচিত্র এঁকেছেন। এই মুরাল চিত্রে শান্তিনিকেতনের পারিপার্শ্বিক গ্রাম্যজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। নন্দলাল স্বতন্ত্রভাবে এঁকেছেন, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ দুর্গা, কালীর নৃত্য ইত্যাদি। ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্রিতা* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে উৎসর্গ করেছেন। এই কাব্য সংকলনে ৩১টি কবিতা। কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথ শিল্পীদের চিত্র অবলম্বনে লিখেছেন। যেসব চিত্র দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন সেসব চিত্র অবলম্বনে এঁকেছেন। এই গ্রন্থে নন্দলালের স্যাকরা, পসারিণী, কন্যা বিদায় চিত্র অবলম্বনে কবিতা সংযুক্ত হয়েছে।

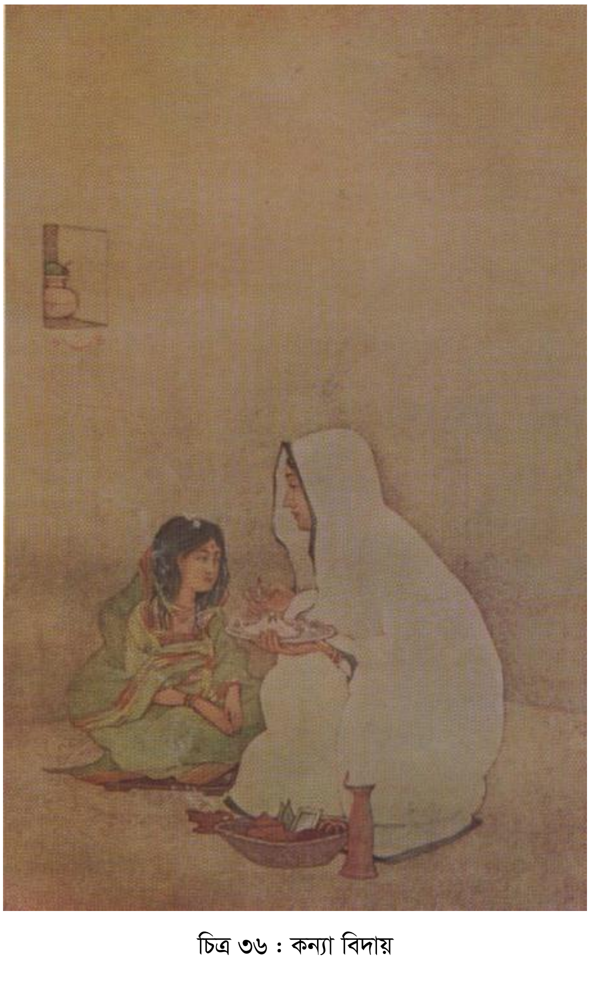

চিত্র ৩৬ : কন্যা বিদায়

১৯৩৩ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সাথে মুম্বাই নগরীতে গিয়েছিলেন। সেখানে কলাভবনের শিক্ষাকর্মের প্রদর্শনী ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলি প্রদর্শিত হয়েছিলIরবীন্দ্রসপ্তাহ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে। এই ভ্রমণে এলিফ্যান্টা কেভের ডাকঘরে বসে অজস্র পোস্টকার্ড-স্কেচ এঁকেছেন নন্দলাল।[৫১]

১৯৩৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলি, নন্দলাল ও তাঁর কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রসমূহ এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্প নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছিল। এই ভ্রমণে তিনি শ্রীগিরির বৌদ্ধ চিত্রকলা দেখেছেন। মহাবলীপুরমের স্কেচ করেছেন। ১৯৩৫ সালে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষাভ্রমণকালে শ্রীমতি ইন্দিরা নেহেরু (পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী) নন্দলালকে ট্রেন-দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে যোগদানের পর থেকে নন্দলাল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নানা কর্মময় অভিজ্ঞতায় ভারত-শিল্পের বিকাশে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের ইচ্ছামতো শিক্ষকের কাছে শিখতেন। ১৯৩০ পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি চক্র পদ্ধতি (Wheel System) চালু করেছিলেন। ১৯৩২ সালে গৌরী ভঞ্জ আলংকারিক শিল্প-শিক্ষক হিসেবে কলাভবনে যোগ দেন। ১৯৩৩ সালে বিশ্বরূপ বসু ও রামকিঙ্কর বেইজ কলাভবনে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বিশ্বরূপ বসু জাপানের কাঠখোদাইয়ের কারিগরি বিষয় এবং রামকিঙ্কর বেইজ ভাস্কর্য বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতেন। শিক্ষানীতিতে শুধু চক্র পদ্ধতিই নয়Iশিক্ষাভ্রমণ ও ছাত্রদের নিয়ে প্রদর্শনী করতেন। নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি কারুশিল্পীদের এনে তাঁদের পদ্ধতিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করতেন। প্রকল্পভিত্তিক কাজে ছাত্রদের হাতেকলমে শিক্ষা দিতেন। বাংলার প্রাচ্যশিল্পের মূলধারা চিত্রকলা ছাড়াও বাটিকের কাজ, লিথোগ্রাফি, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, মূর্তিকলা, কাঠখোদাই, আলপনা, ভাস্কর্য প্রভৃতি কাজ চর্চা করতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতেন।

১৯৩৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্য পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের আবাস 'শ্যামলী'র বাইরের গায়ের উচ্চাবচ কাজগুলো নন্দলালের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের ফলকের আদর্শে করেছেন। এরূপ বিভিন্নমুখী উদ্যোগের মূল্যায়নে আমরা স্পষ্টত বলতে পারিInন্দলাল তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অপেক্ষা মুক্ত অভিজ্ঞতাভিত্তিক নিরন্তর শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষাদানে প্রয়াসী ছিলেন। শুধু ব্যবহারিক নয়, তাত্ত্বিক বিষয় প্রসঙ্গেও ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করতেন। ১৯৩৪–৩৫ সালে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় কলাভবনে শিল্পকলা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

এগারো

১৯৩৬–১৯৩৮ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনটি মহাসম্মেলনে শিল্পী নন্দলাল কংগ্রেস অধিবেশনের রূপ সৌষ্ঠবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে শিল্পে রূপ দিয়েছিলেন ঐতিহ্যের স্বাভাবিক উৎকর্ষের তত্ত্ব ধরে। আমাদের ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির ধারার চাপা পড়া ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার হয়েছে তাঁর এই কাজে।

Dhaka University Institutional Repository

মহাত্মা গান্ধী লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশন (১৯৩৬)-এর রূপ সৌষ্ঠবের কাজের জন্য ডেকেছিলেন। গান্ধীর কাছে শিল্প ও নন্দলাল ছিলেন সমার্থক। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজী ও অসিতকুমার হালদার নন্দলালের সহশিল্পী হিসেবে কাজ করছেন। মুম্বাইয়ের স্থপতি মহাত্রে নন্দলালের নকশা অনুসারে তোরণ নির্মাণের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এই অধিবেশনে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সেই প্রদর্শনীতে সমস্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন রীতির ছবির সহযোগে ভারতীয় ঐতিহাসিক পরম্পরার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন নন্দলাল। অজন্তা ও বাগ ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপি, মধ্য যুগীয় জৈন রাজপুত ও মোগল চিত্রকলা, কালীঘাটের পট এবং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের ছবি আনিয়ে এই প্রদর্শনী সাজিয়েছিলেন নন্দলাল।[৫২] এছাড়া এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন যুগের ভারতীয় ভাস্কর্যের ফটো তারিখ অনুযায়ী সাজিয়েছিলেন। ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে প্রথম ভারতীয় অয়েলপেন্টার শশী হেঁসের ছবি এনে প্রদর্শন করেছেন অয়েলপেন্টিং সেকশনে।[৫৩]

নন্দলাল মণ্ডপের প্রদর্শনী ঘর সাজিয়েছিলেন শবকাঠির বেড়া দিয়ে। বেঞ্চি করেছিলেন বাঁশ দিয়ে। ঢেউ-তোলা টিনে ঢাকা একটা খালি জায়গা পূরণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যামিনী রায়কে দিয়ে ১০' × ৬০' মাপের ছবি আঁকিয়ে সে স্থান পূরণ করেছিলেন।[৫৪] গান্ধীজি তাঁর উদ্বোধন–ভাষণে নন্দলালের ভূয়সী প্রসংশা করেছিলেন।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর ১৯৩৭ সালে ফৈজপুর অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেও নগর সাজসজ্জার কাজের ভার ছিল নন্দলাল ও স্থপতি মহাত্রের ওপর। ফৈজপুর মণ্ডপ-সজ্জার নির্মাণ কার্জ।স্থানীয় জিনিস ও স্থানীয় শ্রমের সহযোগে সম্পন্ন করেছিলেন। বাঁশ ও বল্লী দিয়ে তোরণ ও মঞ্চ সাজিয়েছিলেন। এটা ছিল ভিলেজ কংগ্রেস। তোরণে স্থানীয় কারিগর দিয়ে মাটির রিলিফ ওয়ার্ক করিয়েছিলেন নিজের স্কেচ থেকে। কলাভবনের শিল্পবস্তু দিয়ে 'ক্রাফট প্রদর্শনী' এবং স্থানীয় গ্রামের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে 'খেরাথিল প্রদর্শনী' সাজিয়েছিলেন। খেরাথিল মানে গ্রাম্য। রথ বানিয়েছিলেন গরুর গাড়ির ওপর বাঁশ দিয়ে। হাতে কাজ করা পালান ও ঝালর দিয়ে গরুগুলোর গা সাজিয়েছিলেন। চাঁচ দিয়ে রথের বলদ বানিয়েছিলেন। মূল মণ্ডপে প্রদর্শনীর জায়গার মাঝখানে খুঁটির চারপাশে গমের অঙ্কুর বসিয়েছিলেন। এসব প্রাকৃতিক উপায়ে সৌন্দর্যসাধনের এই আয়োজন দেখে সবাই প্রশংসা করেছিলেন। বিশেষত গান্ধীজি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে নন্দলালের ভূয়সী প্রশংসা করে 'যাদুকর' আখ্যা দিয়েছিলেন।[৫৫] কংগ্রেস অধিবেশনের সাজসজ্জার কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক শিল্প রূপায়ণে পরিবেশ ও উপকরণগত অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ শিক্ষার দৃষ্টিতে প্রাচীরচিত্রও পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করেছেন। তোরণ, মণ্ডপ ও পরিবেশগত উদ্যান রচনা করে ব্যবহারিক শিল্পকে উন্নত করেছেন। এই কাজের জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান শিল্পী।

১৯৩৮ সালে গুজরাট রাজ্যের হরিপুরায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্যান্ডেল আর গেট সাজিয়েছিলেন। বিঠলভাই পটেল-এর নামাঙ্কিত বিঠলনগর-এর বিরাট এলাকা জুড়ে এই কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনেও গ্রামের শিল্পবস্তু দিয়ে প্রদর্শনী সাজিয়েছিলেন। এই অধিবেশনের সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। হরিপুরার গোটা কংগ্রেস নগরকে নন্দলাল পরিবেশগত শিল্পের নিদর্শনে পরিণত করেছিলেন। তোরণ, স্তম্ভ, প্রদর্শনী, দোকানপাট, কুটির, উদ্যান, সভামণ্ডপ, আবাসস্থল সব কিছুকেই গ্রামীণ উপকরণে সাজিয়েছিলেন। ফলে সমস্ত সাজসজ্জায় গ্রামীণ পরিবেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। এ ছাড়া বাইরের দেয়ালকে সজ্জিত করার জন্য কিছু চিত্র এঁকেছিলেন। এই চিত্রমালা হরিপুরা মুরাল, হরিপুরা প্যানেল, হরিপুরা পোস্টার, হরিপুরা চিত্রমালা বিভিন্ন নামে খ্যতিলাভ করেছে। আমাদের নিবন্ধে 'হরিপুরা চিত্রমালা' নামকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচনায় এনে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছি।

ভারতের জীবনভিত্তিক এই চিত্রমালা এ দেশের শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ অবদান হিসেবে স্বীকৃত। ভারতের খেলাধুলা, সংগীত, গৃহজীবন, কুটির শিল্পের বিভিন্ন পেশা; গন্ধর্ব, পশু ও অলংকরণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে মোট ৮৩টি ছবি এঁকেছিলেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ভরা এই চিত্রমালার প্রত্যেকটির আকৃতি ছিল ২৪ × ২৪ ইঞ্চি এবং প্রতিটি ছবির দৃশ্য একটি নির্দিষ্ট বাঁকানো খিলানের মতো আকৃতির পরিসীমার দ্বারা আবদ্ধ। প্যানেলের মতো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পর পর বিন্যস্ত করার জন্যই এমনটি এঁকেছিলেন। হাতে তৈরি কাগজের ওপর দেশীয় মেটে রং আর রঙিন ব্লু–এর সাহায্যে অস্বচ্ছ জলরঙে ছবিগুলো আঁকতে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সহকারীরা মূল রেখাচিত্রের ওপর রং চাপাতেন, নন্দলাল অনবদ্য রেখায় চিত্রের আকৃতি আনতেন।

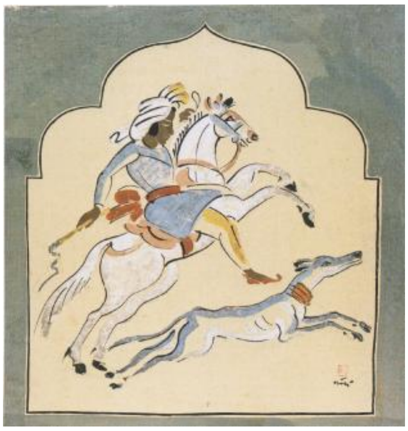

চিত্র ৩৭ : হরিপুরা চিত্র (ঢাকি), টেম্পারা ৬৩.৮ × ৫৯.৭ সেমি, ১৯৩৭ চিত্র ৩৮ : হরিপুরা চিত্র (শিকারি), টেম্পারা ৬৩.৫ × ৫৯.৪ সেমি, ১৯৩৭

চিত্র ৩৯ : হরিপুরা চিত্র (বুল হ্যান্ডেলার)
টেম্পারা ৬৩.৪ × ৫৯.৭ সেমি, ১৯৩৭

চিত্র ৪০ : হরিপুরা চিত্র (মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে)
টেম্পারা ৬০.৩ × ৫৬.২ সেমি, ১৯৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে :

> পরম্পরা ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার অনবদ্য সংযোগ এই চিত্ররাজির সর্বত্রই বিদ্যমান। শিল্পী কোনো একটি বিশেষ প্রাচীন বা নবীন শিল্পআদর্শকে স্বীকার না করে সাময়িক মতিমেজাজ অনুযায়ী এই চিত্রগুলি রচনা করেন। রূপে বর্ণে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন হয়েও হরিপুরা চিত্রাবলীর অন্তরে যে প্রবাহের ভাব সেটি রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণের পরিমাণ ও অবস্থানের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। বিষয়-নিরপেক্ষ রূপ-রঙের প্রবাহ থাকার কারণেই এই ছবিগুলিকে নন্দলাল রচিত-ভিত্তিচিত্রের সগোত্রীয় বলা চলে।[৫৬]

শোভন সোমের বর্ণনায় :

> বাংলার সরার মতো সরলীকৃত প্রয়োজনীয় রূপবন্ধে সমতলীয় রঙ লাগিয়ে কয়েকটি সাঙ্কেতিক রেখায় রূপগুলি স্পষ্টীকরণের কারণে এগুলিতে সরার গুণ অনুভূত হয়। . . . ছবির ভিতরে কুলুঙ্গির মতো যে ফ্রেমের ব্যবহার করা হয়েছে, সে ধরনের ফ্রেমের ভিতরে রূপবিন্যাস বাংলার পোড়ামাটির ভাস্কর্যে দেখা যায়।[৫৭]

ভিত্তিচিত্র, বাংলার সরার গুণ এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্যের সাদৃশ্য হরিপুরা চিত্রমালায় থাকলেও অঙ্কন কৌশলের উৎস ছিল কালীঘাট পটের অংকন কৌশল। তিনি ১৯১৬ সালে বানুপুরের বাড়িতে কালীঘাটের পর্বের আদলে ছবি এঁকেছিলেন। ১৯০৮–০৯ সালের পূর্বে কালীঘাটের পটো–পাড়ার পট সংগ্রহ করেছেন এবং স্কেচ করেছেন। নন্দলালের মর্তোIতিনি কালীঘাটের পটের অনুশীলন হরিপুরা চিত্রমালায় কাজে লাগিয়েছেন কালীঘাটের পটের বৃহত্তর খেলা হিসেবে।[৫৮]

রামকিঙ্কর বেইজ হরিপুরা চিত্রমালাকে মূল্যায়ন করেছেন কালীঘাট পটের পরবর্তী উত্তরণ হিসেবে।[৫৯] এই উত্তরণের প্রসঙ্গটি আবুল মনসুরের ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝে নেয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> কালিঘাট পটুয়াদের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে রেখা একটানা ও অবিচ্ছিন্ন, উদ্দেশ্য–তুলি যথাসম্ভব না তুলে বস্তুর অবয়বকে নির্দেশ করা। স্থানে স্থানে তুলিতে ঈষৎ চাপ দিয়ে মডেলিং ফোটানো হয়েছে। মানুষ ও পশুপাখীর আদলে সবসময়ই বাংলার পুতুল ও প্রতিমার প্রভাব পরিদৃশ্যমান। নন্দলালের রেখা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও ক্ষিপ্র। এখানে রেখা অবয়বকে প্রকাশের চেয়েও শরীরের পেশী ও মোচড় কিংবা গতিকে প্রকাশ করে। হরিপুরার রেখার যে তীব্র গতিময়তা তা একেবারেই নেই কালিঘাটের রেখায়। নন্দলালের রেখার যে স্পন্দিত প্রাণময়তা ও পরিশীলিত শুদ্ধতা তা কালিঘাট বা অন্য কোন লৌকিক রেখায় পাওয়া যাবে না।[৬০]

আবুল মনসুরের মতে, নন্দলালের হরিপুরা চিত্রমালায় ব্যবহৃত রেখা নন্দলালের পূর্ববর্তী ভিত্তিচিত্রের আলংকারিক রেখা অপেক্ষা বেশি তাৎক্ষণিক ও দ্রুতIযা আগের ব্যবহৃত রেখার মতো একটানা ঢেউ খেলানোর পরিবর্তে ছোটো ছোটো ইতস্তত ভাঙা ভাঙা দ্রুত রেখা, টান ও ফুটকি যুক্ত ক্যালিগ্রাফিসদৃশ। এবং এজন্যই তিনি চীন-জাপান ভ্রমণের ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক উপলব্ধির ফসল হিসেবে ধারণা করেছেন।[৬১] আবুল মনসুরের যুক্তি অনুসারে হরিপুরা চিত্রমালার রেখা ব্যবহারকে চীন-জাপানের ক্যালিগ্রাফিক চিত্রের সংশ্লেষ বলা যায়।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, হরিপুরা চিত্রমালার জনজীবন চিত্রণের পেছনে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিল নন্দলাল। কারণ, বিবেকানন্দ ভক্ত নন্দলাল স্বামীজির আশা ও আশ্বাসময় উক্তিI'বেরুক নতুন ভারত চাষার কুটীর ভেদ করে' বাণীকে মর্মে ধারণ করেছেন বলেই চিত্রে গ্রামের জনজীবনচিত্র তুলে ধরেছিলেন।[৬২] ভারতের প্রত্যেকটি সামাজিক ইতিহাসIস্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রমালায় বিচিত্রিত আছে। নন্দলাল বসুর হরিপুরা চিত্রাবলিতে সেই ঐতিহ্যের নবতম প্রকাশ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বারো

১৯৩৭ সালে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ থেকে রবীন্দ্রনাথের *ছড়ার ছবি* প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের মোট ৩২টি কবিতাই রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে রচনা করেছেন। এসব চিত্রের অধিকাংশই স্কেচ।

চিত্র ৪১ : ছড়ার ছবি (ছাগল), এচিং, ২০.৬ × ২৭ সেমি, ১৯৩৭

হরিপুরা কংগ্রেসের কাজের পর নন্দলাল বরোদার মহারাজা কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র এঁকেছেন। এটা নন্দলালের জীবনের বড় কাজ। ছয়শ বর্গফুটের এই কাজ মন্দিরের দেয়াল জুড়ে এঁকেছেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে তিনি চার দফায় এই ভিত্তিচিত্র রচনা করেছেন। ১৯৩৯-এ প্রথমবার এসে আঁকেন 'গঙ্গাবতরণ'। ১৯৪০-এ গিয়ে আঁকেন 'মীরাবাঈয়ের জীবন ও গান নিয়ে ছবি'। ১৯৪৩-এ 'নটীর পূজা', ১৯৪৫–৪৬ সালে মহাভারতের ঘটনার আধারে এঁকেছেন 'কুরুক্ষেত্র মহারণ'-এর কেন্দ্রীয় বিষয়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, যুদ্ধ, পূর্বকথা স্মরণ, স্মৃতিতর্পণ এই চারটি দৃশ্যমালার মধ্যে মর্মস্পর্শী নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন। মহাভারতের চারটি উপখ্যানকে একত্রে গ্রথিত করা হলেও, আলাদা এবং ধারাবাহিক নয়।[৬৩]

চিত্র ৪২ : অভিমন্য বধ, মুরাল (কীর্তিমন্দির), ১৯৪৬

১৯৩৯–১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নন্দলাল বরোদার কীর্তিমন্দিরের মুরাল চিত্র করার সময় নানাবিধ শিল্পকর্ম করেছেন, ভ্রমণ করেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন বিশ্বপ্রকৃতিকে। প্রায় প্রতি বছরই ভারতের শিল্পতীর্থগুলো বার বার ঘুরে দেখেছেন, ছবি এঁকেছেন। স্কেচ করেছেন। ১৯৩৮ সালে দার্জিলিং ভ্রমণের নানান দৃশ্য এঁকেছেন। দার্জিলিং-এর রামকৃষ্ণ-বেদান্ত–আশ্রমের প্রবদ্ধানন্দজির সঙ্গে আলোচনার ফলে 'শিল্পপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯৪০ সালে মহাত্মাজি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে এসে নন্দলালের শিক্ষাপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৪১ সালে শারীরিক সুস্থতার আশায় কাশী গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের *সহজ পাঠ* তৃতীয় ভাগ চিত্রভূষিত করেছেন। ১৯৪২ সালে গিয়েছিলেন দুমকার হিজলা পাহাড়ে এবং আলমোড়ায় মায়াবতী

অদ্বৈতাশ্রমে। অদ্বৈতাশ্রমের স্বামী পবিত্রানন্দজির সঙ্গে আলাপের পর লিখেছেন "শিল্পসাধনা" প্রবন্ধ। একই বছর চিনা ভবনে টাচ রং-এর মুরাল চিত্র এঁকেছেন 'নটীর পূজা'। নটীর পূজা আঁকতে তিনি প্রচলিত উপকরণ ব্যবহার করেননি। পোড়া হাঁড়ির ভুষো কালি লাগানো ভাঁজ করা কাপড় দিয়ে তিনি একজনকে ছবি আঁকতে দেখেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শুকনো জমিতে আঁকা এই মুরাল চিত্রে তিনি তুলির পরিবর্তে রঙে ডোবানো ভাঁজ করা কাপড় ব্যবহার করেছেন। রং ব্যবহারে বাহুল্য বর্জন আর অপ্রচলিত উপকরণ ব্যবহার তাঁর নিরীক্ষামূলক প্রক্রিয়ার সফল প্রয়াস ঘটেছে। ১৯৪৩ সালে তিনি আঁকেন অন্নপূর্ণা।

চিত্র ৪৩ : অন্নপূর্ণা, কাগজে টেম্পারা
৪৩.৮ × ২৯.৮ সেমি, ১৯৪৩

চিত্র ৪৪ : তাক ধুমা ধুম বইয়ের জন্য ইলাস্ট্রেশন
ওয়াশ, ১৪.৬১ × ১১.৪৩ সেমি

১৯৪৪ সালে (১৩১৫ সালের ১ শ্রাবণ) বিশ্বভারতীর *গল্পসল্প* সিরিজের ২য় বই 'তাক ধুমা রুম'-এর জন্য অনেক রঙিন ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন। এই ইলাস্ট্রেশনের মোট ১০টি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে ২০১১ সালে কলকাতার একটি প্রদর্শনীতে। ১৯৪৫ সালে ভ্রমণ করেছেন মুঙ্গের, খড়গপুর, ভীমবাঁধ ও দার্জিলিং।

চিত্র ৪৫ : দার্জিলিং এবং কুয়াশা, টেম্পারা, ৩৬.২ × ৩৪.৬ সেমি, ১৯৪৫

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী কলাভবন দেখতে আসেন। তখন আশ্রম পরিচালনা সম্পর্কে গান্ধীর সাথে আলোচনা করেন নন্দলাল এবং এই বছরই কলাভবন থেকে তাঁর *শিল্পকথা* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে (পৌষ ১৩৫৩) বিশ্বভারতী থেকে অবনীন্দ্রনাথের *সহজ চিত্রশিক্ষা* প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনানুসারে নন্দলাল এ বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করেছেন। সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রশিক্ষা দেওয়া উচিত, এই প্রসঙ্গে একমত পোষণ করতেন। শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাধা গুরু-শিষ্যের সম্মিলিত চেষ্টার ফসল *সহজ চিত্রশিক্ষা*। রবীন্দ্রনাথ সামন্তের মতে, 'বক্তব্য আর ছবির পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলন ঘটেছে গুরুশিষ্যের সমানুপাতিক সহযোগিতায়।[৬৪]

নন্দলাল ১৯৪৭ সালে ভ্রমণ করেছেন রাজগীর গোপালপুর, মাদ্রাজ ও ওয়ালটেয়ার এবং এই বছর কলাভবনে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। ১৯৪৮ সালে তাঁর পরিকল্পনায় রামকৃষ্ণদেবের মন্দির তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরের স্থাপত্যকর্মে উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় লক্ষণীয়। এই সময় জওহরলাল নেহেরুর অনুরেধে 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মবিভূষণ' খেতাবের জন্য পদ্মের পাপড়ির গ্রেড দিয়ে চৌকা করে প্রতীক এঁকে দিয়েছেন। আর 'ভারতরত্ন' এঁকেছেন অশ্বত্থপাতার প্রতীকে। ভারতশিল্পে বহুল ব্যবহৃত পদ্মের নকশাকে নন্দলাল ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের পদচিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করতেন। বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে ১৮.০৭.১৯৫৪ তারিখে লিখিত পত্রে তেমনটিই লিখেছেন : 'পদ্ম দেখলেই বুঝতে হবে ভারতীয়।এ যেন ভারতীয় সভ্যতার শীলমোহর।'[৬৫]

১৯৪৯ সালে তিনি ভ্রমণ করেছেন বুদ্ধগয়া। এই বছর তিনি শ্রীকৃষ্ণকথার নানা চিত্র ও প্রকৃতির নানা বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন এবং নন্দনে তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে। ১৯৫০ সালে কলাভবনে পুরী স্কেচ চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। এই বছর রাষ্ট্রপতি জওহরলাল নেহেরুর নির্বন্ধে হস্তলিখিত ভারতীয় সংবিধান অলংকরণ করেছেন। এই নকশার কাজে সহযোগী শিল্পী ছিলেন পুত্র বিশ্বরূপ বসু, কন্যা গৌরী ভঞ্জ ও কন্যা যমুনা সেন, অরুণাচল পেরুমল, কৃপালসিং শেখাবত ও কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা।[৬৬] এই সংবিধানের নকশা প্রসঙ্গে Pramod Chandra & Sonya Rhie Quintanilla এর Nandalal Bose and the History of Indian Art প্রবন্ধের তথ্য উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। তাঁরা লিখেছেন :

> The Illustrations Nandalal created for India's constitution are based on a history of Indian art from the time of the Indus Valley civilization up to independence in 1947 each drawing upon a specific shyle from a historical phase; this in dicates that he saw the very essence of the nation as being irrevocably in tertwined with its artistic histry. [৬৬/১]

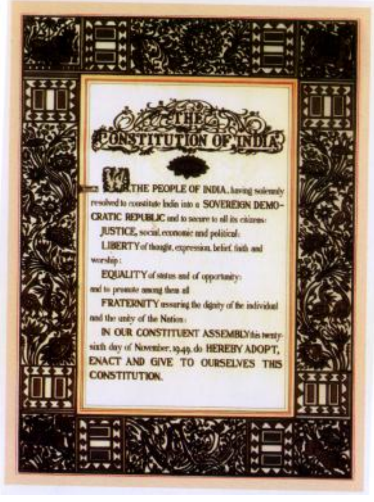

চিত্র ৪৬ : ভারতীয় সংবিধানের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি

উপর্যুক্ত বর্ণনায় স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় শিল্পতীর্থক্ষেত্র ভ্রমণে নন্দলাল বসু ছিলেন নিত্যপথিক। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে প্রতিবছর শিক্ষাভ্রমণ করেছেন। এ ছাড়া নিজস্ব উদ্যোগ ও বিভিন্ন কর্মের খাতিরে তিনি ভ্রমণ করেছেন শিল্পতীর্থ ও নৈসর্গিক পরিবেশ বেষ্টিত এলাকা। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, স্কেচ করেছেন এবং চিত্র এঁকেছেন। পৌরাণিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সারা জীবনই কাজ করেছেন। প্রকৃতির বিশুদ্ধ রস নিয়ে ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদ ও লোকায়ত বিষয় নিয়ে তিনি প্রতিনিয়তই চিত্র এঁকেছেন।

চিত্র ৪৭ : নটীর পূজা, পলেস্তারে টেম্পারা, ১৯৪৬

১৯৩৬–৩৯ সালের মধ্যে কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর শিল্পনৈপুণ্য এবং বরোদার কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র তাঁর বৃহৎ কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্রে 'নটীর পূজা' অঙ্কন-নৈপুণ্য দেখার জন্য সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৪৩ সালে বরোদা গুজরাট থেকে তাঁর এক বান্ধবীকে কবিতাকারে নিমন্ত্রণপত্রে লিখেছেন :

নন্দলালের দেয়াল ছবি

তুর্কী নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলিগুপ্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে গোঁফ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তিমান্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরেI
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে
হচ্ছে 'নটীর পূজা'[৬৭]

এই বর্ণনায় নন্দলালের কর্মযজ্ঞের চিত্র ফুটে উঠেছে।

এই সময়ের মধ্যে তিনি শান্তিনিকেতনে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বিকাশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংশ্লেষে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর কাজের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত রেখেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষাভ্রমণ করেছেন। যে জায়গায় ভ্রমণ করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতিপাঠ নিতে উৎসাহিত করেছেন। নন্দলালের ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের শুধু ছবি আঁকায় নয়, আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেদের দীক্ষিত করতে পেরেছেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে নিউ এডুকেশন ফেলশিপের বঙ্গীয় শাখার অধিবেশনে 'শিক্ষায় শিল্পের স্থান' সম্পর্কে বলেছেন। এই বছরই বাংলার প্রাচ্যশিল্পের অনুরাগী ও উদ্যোগী ই.বি হ্যাভেল তাঁর সংগৃহীত ভারতশিল্প বিষয়ক নিজের ও অন্যের রচনার ও সংবাদে পেপার কাটিং, প্রাচ্য ধারার চিত্রাবলি ও কাগজপত্র উপহার দিয়েছেন। এগুলো যথোচিতভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহের জন্য ১৯৩৮ সালে নন্দনে ‘হ্যাভেল হল’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজে নন্দলাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৪৭ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে ড. পঞ্চানন মণ্ডল কলাভবনের কর্মপ্রয়াস প্রসঙ্গে লিখতে শুরু করেন। ড. পঞ্চানন মণ্ডল শান্তিনিকেতনের কর্মপ্রয়াসের সাথে নন্দলালের জীবনপঞ্জি ও কর্মধারা জুড়ে *ভারতশিল্পী নন্দলাল : যেমনটি বলেছেন* ১৯৪২–১৯৬৬ গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে নন্দলাল বর্ণিত বাংলার প্রাচ্যশিল্পের প্রত্যক্ষ ইতিহাস ধরা আছে। বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ইতিহাসে নন্দলালের এই প্রত্যক্ষ বর্ণনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

নন্দলালের শিক্ষকতার গুণে শুধু ভারত নয়; সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান থেকে ছাত্র এসেছে। ফলে উনিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালি ঘরানার যে নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়েছিলIঅবনীন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্য নন্দলাল রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিল্পশিক্ষায় সেই রীতিকে বেগবান করেছেন নব নব সম্ভাবনায়। নন্দলাল তাঁর কর্মে ও জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা বাংলার বাইরে বিস্তার লাভ হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে। যাঁদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ, মনীন্দ্রভূষণ ও অর্ধেন্দ্রপ্রসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। শিল্পসাধনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি হয়েছেIতার অবদানে শান্তিনিকেতন শিল্পগোষ্ঠীর অবদান অতুলনীয়।

তেরো

১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে নন্দলাল অবসর গ্রহণ করেছেন। বিশ্বভারতী এ বছরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। নন্দলাল ‘ইমেরিটাস প্রফেসর’ হয়ে অধ্যাপনারত রইলেন।

নন্দলালের দীর্ঘকালের শিল্পসাধনা এবং ভারতশিল্পে তথা বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার বিস্তারে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মাননা ও উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। ১৯৫০ সালে কাশী–হিন্দু–বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘ডক্টর অব লেটার্স’ উপাধি দিয়েছে। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি দিয়েছে। ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ দান করেছে এবং একই বছর তিনি লাভ করেছেন ‘দাদা ভাই নওরোজী স্মৃতি পুরস্কার’। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে ‘পদ্মবিভূষণ’ উপাধি দিয়েছে। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সংবর্ধিত করেছে। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘ডক্টর অব লিটরেচার’ উপাধি দিয়েছে। ১৯৫৮ সালে একাডেমি অব ফাইন আর্টস ‘রজতজয়ন্তী স্বর্ণফলক’ প্রদান করেছে।

১৯৫৬ সালে নন্দলাল দিল্লির ললিতকলা একাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরই তাঁর *শিল্পচর্চা* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে পুরাতন বাঙ্গালা রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল কাব্যের কাহিনি অবলম্বন করে ছবি এঁকেছেন, কার্ডে অসংখ্য রেখাচিত্র করেছেন এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে ও পদ্ধতিতে কাগজ কেটে সেঁটে দিয়ে ছবি এঁকেছেন কার্ডে। কোলাজ প্রকৃতির এই কার্ডচিত্র অবনীন্দ্রনাথের কুটুম-কাটাম খেলনার মতো স্বাধীন খেলাচ্ছলের কাজ। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে কালি বা রঙে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পোস্টকার্ডের এই রেখাচিত্র স্বজনদেরও পাঠিয়েছেন। কার্ডচিত্র অঙ্কন বিষয়ে নন্দলালের আটপৌরে মনের প্রকাশ ঐক্যের জন্য ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সাথে তুলনা করেছেন। এবং শেষ পর্বের চিত্রগুলোতে রূপের প্রাধান্য ও যুক্তি গৌণতার জন্য রূপকথার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৬৭/১]

১৯৬৩ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রভারতী থেকে পেয়েছেন ডি.লিট উপাধি। ১৯৬৪ সালের 'রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী পদক' পেয়েছেন ১৯৬৫ সালে। দিয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৬৫ সালের ১৬ অক্টোবর দেহে ও মনে অচল ও নির্বাক হন। এই অবস্থায় ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল শান্তিনিকেতনের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বের ১৫ বছর তিনি প্রতিদিন একটি করে ছবি এঁকেছেন। এসব ছবিতে সারা জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর কাজে সরলীকরণ করেছিলেন। হ্যান্ডমেড কাগজে কালি-তুলিতে এঁকেছেন। নন্দলালের শেষ পর্বের কাজের ধরন সম্পর্কে A. Ramchandran-এর মূল্যায়ন উল্লেখের দাবি রাখে :

> Through these works, Nandalal had become a *sanyasi*, one who has experinced all the turbulence of life. Like Rabindranath in his last years, he too dedicated his final works to the eternal crealor. His brushstrokes became minimal and the picture space served as the ground for etervnal *lila*, addressed to nobody but god. After having traversed the boundaries of a professional artist, Nandalal's art became his prayer, each brushstroke counting the beads of a rosary.[৬৮]

নন্দলালের সৃষ্টি জাতীয় গৌরব। দেশবাসী গৌরাবান্বিত হয়ে তাঁকে প্রভূত সমানে ভূষিত করেছিলIকিন্তু এই বিবিধ সম্মান সত্ত্বেও নন্দলাল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অহংমুক্ত চিত্তের অধিকারী ছিলেন। ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার তাঁর শিল্পকর্মকে 'চারুকলা সম্পদ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৮৫ (অগ্রহায়ণ ১৩৯২) সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী দৃষ্টি ও *সৃষ্টি* গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ১৯৮২ সালে জন্মশতবর্ষে ড. পঞ্চনন মণ্ডলের *ভারতশিল্পী নন্দলাল* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে, ৩য় খণ্ড ১৯৮৮ সালে এবং ৪র্থ খণ্ড ১৯৯৩ সালে। তাঁর জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে বহির্ভারতে তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবনের ক্রম-ইতিহাস তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর শিল্পকর্মের সার্বিক মূল্যায়ন ও বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারায় তাঁর অবদান বিশ্লেষণের জন্য শিল্পীজীবনে বিভিন্ন মনীষীদের প্রভাব, শিক্ষানীতি, শিক্ষামাধ্যম, শিক্ষাদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হবে। পরিশেষে নন্দলাল প্রসঙ্গে শিল্পতাত্ত্বিকদের মতামত তুলে ধরে তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য, গুণ ও অবদানের সারাৎসার তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে ।

চৌদ্দ

নন্দলাল বসুর শিল্পীজীবনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। শিল্প পথের পথিক নন্দলাল বসু শিল্পের পাঠ নিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। আদর্শ শিক্ষক ও গুরুর সান্নিধ্যে শিল্পাদর্শের স্বরূপ অনুধাবন করেছেন প্রথম জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন নন্দলাল। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর সাহচর্য ছিল সারা জীবন ধরে। ফলে

ধর্মচেতনা তাঁর শিল্পবোধকে সৌম্যতা দান করেছে। তিনি ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক চিত্র অঙ্কনে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর চিত্রকর্মে ধর্মীয় বিষয়চিত্রের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় নতুন মাত্রা সংযুক্ত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। মিশনের রামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আমার ঐহিক ও পারত্রিক জীবন মিশনের মহারাজদের উদার অনুকল্পায় পরিচালিত হয়ে চলেছে। আপদে বিপদে অদ্ভুত সে আনুকূল্য নিরুদ্বেগ করেছে আমার মনকে।'[৬৯]

স্বদেশি আন্দোলনের উদ্দীপ্ত জোয়ারের মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পীজীবনের গোড়াপত্তন করেছেন। সেই সূত্রে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী মন তাঁর ছিল। গান্ধীজির রাজনীতি ও ধর্মের সমন্বয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নন্দলাল তাঁর জীবন ও শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। গান্ধীজিও নন্দলালকে সমীহ করতেন। গান্ধীজির কাছে শিল্প ও নন্দলাল ছিলেন সমার্থক। ফলে শিল্পের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উঠলেই গান্ধীজি নন্দলালকে ডাকতেন। গান্ধীজির ডাকে নন্দলাল ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের (লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর, হরিপুরা) সাজসজ্জার কাজ করেছিলেন।

নন্দলালের সাথে পরিচয়ের পর রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই ভ্রমণ করতেন নন্দলালকে সঙ্গী হিসেবে পেতে ভালোবাসতেন। ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণকালে নন্দলালের অভাব অনুভব করেছিলেন। জাপানের সংস্কৃতি ও চিত্রকলার সাথে সংযোগ ঘটানোর জন্য নন্দলালকে যথোপযুক্ত মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই অভাব ১৯২৪ সালে পূরণ হয়েছিল চীন-জাপান ভ্রমণের মাধ্যমে। এই ভ্রমণে নন্দলাল, ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস নাগ ও এলমহার্স্ট ছিলেন। এলমহাস্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ পর্যায়ের সেক্রেটারি ও ইংরেজ বন্ধু। এলমহার্স্ট নন্দলালের সঙ্গকে এডুকেশনের সাথে তুলনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই মতকে সমর্থন করেছেন এবং মতের সমর্থনে লিখেছেন, 'আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেইজন্যই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন।'[৭০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন নন্দলাল। শান্তিনিকেতনের শিল্পশিক্ষায় নব্য-বাংলার শিল্পধারাকে আধুনিকতা দান ও আবিশ্ব বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও তাঁর সাথে অজস্র কর্মকাণ্ডের সংযোগে। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের শিল্পসত্তাকে জাগ্রত ও পরিপূর্ণ রূপ দিতে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথই নন্দলালের মধ্যে আধুনিক বিশ্ববোধকে উন্মীলিত করেছেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথও নন্দলালের সান্নিধ্য পেয়ে তাঁর সৃজন প্রতিভাকে বিশিষ্ট দিকে রূপায়িত করেছেন। নন্দলালের সমর্থন ও স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিল। নন্দলালের চিত্রাবলি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা-সংগীত রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর শেষ বয়সে চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠার নেপথ্য প্রেরণা ছিল নন্দলালের সাথে পারস্পরিক সংযোগ ও প্রীতির সম্পর্ক। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক দুজনের সৃজন প্রতিভাকে নানাভাবে বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের চিত্রকলা এবং শিক্ষানীতিতে ভারতশিল্পের আধুনিকতা এসেছে এবং শান্তিনিকেতন ঘরানায় এসেছে বিশ্বায়িত আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথের সাথে নন্দলালের অন্তমিল প্রসঙ্গে John M. Rosenfleld লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

The encyclopedic range of his vision was in harmony with that of Rabindranath Tagore : both searched for synthesis of old and new, of spiritual and material, of East and West, and of Hindu and Muslim.[৭০/১]

নন্দলাল নিতান্ত তুচ্ছের মধ্যে নিত্যের আনন্দজ্যোতি প্রত্যক্ষ করার দৃষ্টি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। বিশ্ব প্রকৃতিই যে শিল্পের বড় শিক্ষক, এই পাঠও পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ফলে পুরাণকল্পের চিত্র থেকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির বাস্তবতার চিত্রে এঁকেছেন। নব্য-বাংলা ঘরানার সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে শিল্পচর্চা করেছেন আবিশ্ব মনন নিয়ে। বিভিন্ন মাধ্যম ও রীতির চর্চায়, কারু ও চারুশিল্পের নতুনতর উপস্থাপনায়, রবীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জা এবং পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় নতুন নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উষ্ণ স্নেহে গ্রন্থচিত্রণের দীক্ষা পেয়েছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনে তিনি গ্রন্থচিত্রণে পরিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করেছেন। পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর 'নন্দলাল বসুর গ্রন্থচিত্রণ' প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন পৃথিবীর অনেক কবির প্রভাব পড়েছে শিল্পীর সত্তা বিকাশে, আর শিল্পীর প্রভাব পড়েছে কবির সৃষ্টি উন্মেষে। কবি পল এলুয়া ও শিল্পী পিকাসোর পরস্পরনির্ভর সৃজনশীলতার মতো রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের পরস্পর-বিনিময়ের সৃষ্টি-উদ্যমকে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৭১]

নন্দলাল প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে প্রধানত পণ্ডিতদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন . . . এঁদের কেউই রসস্রষ্টা ছিলেন না . . . একমাত্র নন্দলালই এই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় বাতাবরণের মাঝখানে অপ্রমত্ত চিত্তে আপন সৃষ্টিকর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন।'[৭২]

বাংলার প্রাচ্যশিল্পের মূল বাণী ছিল 'ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার'। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বিভিন্ন ঐতিহ্যের মিলন ও আত্তীভবনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার সমগ্র অর্জনকে শ্রদ্ধা করেছেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-সমবায়ে শিল্পকলার আবশ্যিকতাকে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে যথাযথ রূপদান করতে সমর্থ হয়েছিলেন নন্দলাল। অতএব আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মতো এমন যুগন্ধর প্রতিভার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যেই নন্দলালের প্রতিভায় পূর্ণতা এসেছিল।

নন্দলালের শিল্পীজীবনে গুরু অবনীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। অবনীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর ছিল আজীবন সম্পর্ক। নিজের চিত্রকলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রকলার উত্তরণ পর্বগুলোতে তিনি অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিয়েছেন সারা জীবন। অবন প্রবর্তিত বাংলার নব্য কলারীতির বিস্তার ও বিকাশে নন্দলাল ছিলেন যোগ্য উত্তরসূরি। সেক্ষেত্রে গুরু অবনীন্দ্রনাথকে অনুকরণ না করে প্রাচ্যরীতির শিল্পধারাকে কীভাবে উত্তরণ করেছেন সে হিসাবটা বুঝে নেয়া সহজ হবে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ঐক্য-পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালে।

অবনীন্দ্রনাথ নিজের পারিবারিক আভিজাত্যের প্রভাবে মার্জিত আধুনিক ও মননশীল ছিলেন। তিনি সচেতনভাবে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে শিল্পের আধুনিকতার যোগসূত্র গড়তে প্রয়াসী ছিলেন। নন্দলাল এসেছেন আধুনিকতা বর্জিত গ্রামনির্ভর পরিবেশের মধ্যবিত্ত এবং ধর্ম ও লোকচারপ্রবণ পরিবার থেকে। তাই তিনি শিল্পে আধুনিকতা খুঁজেছেন আবহমান দেশীয় শিল্পের মধ্যে।

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রভাগ্য ছিল। সেজন্য তাঁর নির্দেশিত প্রাচ্যরীতির আদর্শকে ছাত্রদের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে বিস্তার ঘটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের কাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রবলভাবে অনুপস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। ফলে বাংলার এই চিত্ররীতি সমকালে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। এসব প্রশ্ন ছিলI শিল্পে আধুনিকতার সংকট বিষয়ে। নন্দলাল তাঁর শিল্পকর্মে বস্তুর স্বভাব আশ্রিত বাস্তবতা বজায় রেখে তাকে অনির্বচনীয়তার দিকে তুলে ধরে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।[৭৩]

নন্দলালের ছাত্রভাগ্য অবনীন্দ্রনাথের মতোই পরিপূর্ণ ছিল। নন্দলালের ছাত্ররা সময়ের দাবি, আধুনিকতার চাওয়া মিটিয়েছেন প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার নানান আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ রঙে, নন্দলালের তুলিতে রং অপেক্ষা রেখার শক্তি অধিক। অবনীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র আয়তনিক জমিতে ওয়াশ পদ্ধতিতে চিত্র আঁকতে ভালোবাসতেন, নন্দলাল ছবির বক্তব্য স্পষ্ট করতে ওয়াশ পদ্ধতির পরিবর্তে অনচ্ছ জলরং (গোয়াশ) ও টেম্পারায় কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। এ ছাড়া বড় আয়তনিক ভিত্তিচিত্র অঙ্কনে বিশেষ কুশলী ছিলেন। তাই অবনীন্দ্রনাথের কাজ মোগল মিনিয়েচারধর্মী, নন্দলালের কাজ অজন্তার মুরালধর্মী। অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে মোগল-সিদ্ধ এবং শিষ্য নন্দলালকে শিব-সিদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন।

অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে সামন্তসুলভ আভিজাত্য ও ইসলামিক রুচির উৎকর্ষ দেখা যায়। তাঁর চিত্রে ইসলামিক বিষয় ও ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষণীয়। নন্দলালের কাজে হিন্দু পৌরাণিক বিষয়বস্তু বেশি লক্ষণীয়। সত্যিকার অর্থে অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্নেহ ও সান্নিধ্যে নন্দলাল ভাগ্যবান ছিলেন। উভয়ই ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার বিরাট পুরুষ। দুজনেই সাহিত্যিক ও নন্দতাত্ত্বিক। এই দুই মহান স্রষ্টার সাহচর্য প্রসঙ্গে নন্দলাল যে অভিমত প্রকাশ করেছেন প্রাসঙ্গিকতার জন্য তা তুলে ধরছি :

> কলকাতার অবনীবাবুর ছাত্র হয়ে শিল্পকর্ম শিক্ষা করেছি। শিল্পকল্পনা ও সৃষ্টির সন্ধান আমি পেয়েছি আমার গুরু অবনীবাবুর কাছ থেকে। কিন্তু শহুরে ইট-কাঠের সে পাষাণ-পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আবার চাক্ষুষ মিলন হলো শান্তি-নিকেতনে এসে। এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের মর্মকথার সে নূতন দীক্ষা দিলেন আমাকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। . . .
> ‘মানুষকে আপন করার শিক্ষাও অবনীবাবুর আর গুরুদেবের। . . . ছাত্রদের স্নেহ কি করে করতে হয় সে শিক্ষাও অবনীবাবুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। . . .
> . . . যখন আমার যা অভাব পড়েছে, যা দরকার হয়েছে সব দিয়েছেন অবনীবাবু আর গুরুদেব।[৭৪]

পনেরো

নন্দলাল বসু **১৯২৩** থেকে **১৯৫১** পর্যন্ত কলাভবনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সময়ে কলাভবনের শিক্ষানীতি ও যাবতীয় কাজকর্ম নন্দলালের একচ্ছত্র পরিচালনায় পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর জাদুকরী শিক্ষকতা ও ব্যবস্থাপনার গুণে কলাভবন ভারতের অন্যান্য শিল্প-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে অভিনব ও মৌলিক সৃজনশীল শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং সারা ভারতের শিল্পকলার বিবিধ ক্ষেত্রে নন্দলালের ছাত্ররাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাকতায় বিবিধ গুণ ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কিরূপ সম্পর্ক বজায় রাখতেন তা দিনকর কৌশিকের মূল্যায়নধর্মী বর্ণনা থেকে আমরা জেনে নিতে পারি :

> নন্দলাল ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতেন পুত্রকন্যার মতো। তাঁরা অসুস্থ হলে সেবা করতেন, ওষুধ এনে দিতেন, পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। ছাত্ররাও কোনো সমস্যায় পড়লে সোজা তাঁরই কাছে যেতেন উপদেশ নিতে। তাঁদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে হলে নন্দলাল এমন বিনয়ের সঙ্গে তা করতেন যে মনে হত ওঁরা সেই সাহায্য নিলে

Dhaka University Institutional Repository

> তিনি কৃতার্থ বোধ করবেন। বিনয় ছিল তাঁর স্বভাব মাধুর্য, ভুল ত্রুটির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বকুনি দিলে আবার কিছুক্ষণ বাদে তিনি ফিরে এসে বলতেন যে মেজাজের জন্য স্বভাব দায়ী, ব্যক্তি নয়।স্বভাবই ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে। এমনই মানুষ ছিলেন নন্দলাল; আঘাত না দিয়ে শোধরানোর দিকে তাঁর লক্ষ থাকত।[৭৫]

উপরিউক্ত বর্ণনায় নন্দলালের মানসিকতার দিকটি স্পষ্ট হয়েছে। একজন ভালো বন্ধু ও মানবিক সত্তার পরিচয় লক্ষ করা যায় তাঁর চরিত্রে। তিনি ছাত্রদের সামনে বকলেও আড়ালে প্রশংসা করতেন। বিদেশ ভ্রমণ শেষে ফেরার সময় ছাত্রদের জন্য রংতুলি বা কিছু একটা উপহার আনতেন। নন্দলাল এই বন্ধুসুলভ স্বভাব প্রয়োগ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মৌলিকতা ও নতুনত্ব এনেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। জাপানি শিল্পতাত্ত্বিক ওকাকুরার মতানুযায়ী শিল্পীর স্বকীয়তা, বস্তুর স্বভাব ও ঐতিহ্যের পরম্পরা।এই তিনের সমন্বয়ের আদর্শকে নিজের কাজে ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছেন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় প্রবহমান করতে তিনি যে প্রক্রিয়ায় ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন তাতে কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনি গুরু-শিষ্যের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্বন্ধ বজায় রাখতেন, শিল্পবিষয়ে আলোচনা করতেন ও এই বিষয়ে জ্ঞানলাভে উৎসাহী করতেন; ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত করতেন, প্রকৃতি প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে বস্তুর স্বভাব সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করতেন। সর্বোপরি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষাভ্রমণ করতেন। ভ্রমণকালে গান, নৃত্য, কৌতুক, অভিনয়ের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার স্বাভাবিক গুণকে আবিষ্কার করতেন। আলাপ-আলোচনা ও গল্পচ্ছলে ছাত্রদের শিল্পের সৌন্দর্যবোধ ও চিত্র অঙ্কনের কৌশল শেখাতেন। তাঁর এই শিক্ষাভ্রমণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি বৃদ্ধি পেত এবং পারস্পরিক সহমর্মিতাবোধ বৃদ্ধি পেত। শুধু শিক্ষামূলক ভ্রমণ নয়; ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণবেগকে সক্রিয় রাখার জন্য চড়ুইভাতি, শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবে সাজসজ্জা, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, সাহিত্যসভা, বক্তৃতাসভা ইত্যাদি কর্মসহযোগে উৎসবমুখর শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। শুধু চিত্রকর্ম নয়, ভাস্কর্য ও নানাবিধ কারুকর্মে উৎসাহ দিতেন। সর্বপ্রকার ভারতীয় চিত্রকলার টেকনিক হাতে-কলমে শেখাতেন। বিশেষত অজন্তা ও জয়পুরী ফ্রেসকো রীতির চিত্র তিনি একাধিকবার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সমবায়ে করেছেন। শিক্ষক-ছাত্রের সমবেত প্রয়াসে শিক্ষা চালু করতে ছাত্রদের পাশাপাশি কাজ করেছেন। শিক্ষকের ভেদাভেদ ভুলে কাজ করতেন এবং ছাত্রদের কাজ থেকে শিক্ষা নিতে কার্পণ্য করতেন না। ভাস্কর্যের মডেলিং ক্লাসের শিক্ষকের অভাব হলে নিজেই মডেলিং ক্লাসের ভার নিতেন।[৭৬] এই দক্ষতা প্রসঙ্গে ছাত্র প্রভাতমোহনের সাক্ষ্য উল্লেখের দাবি রাখে।

> প্রতিকৃতি এবং কাল্পনিক মূর্তি কিভাবে চার দিক থেকে দেখতে হয় কোনো দিক থেকে যাতে রচনাটি অসুন্দর না দেখায় তার জন্য কিভাবে তাকে ছাটতে বা বাড়াতে হয় সে-সব যখন শেখাতেন, তখন মনেই হত না, তিনি আসলে চিত্রকর, অতি শৈশবে ছাড়া মূর্তি গড়া তাঁর কোনদিন অভ্যাস ছিল না।[৭৭]

নব্য-বঙ্গীয় শিল্পকলার রীতিতে ছাপাই ছবির চর্চা ছিল 'বিচিত্রা' সভার প্রেসকে কেন্দ্র করে। নন্দলাল শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় ছাপচিত্রের ধারাকে সম্প্রসারিত করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির ধারায় ছাপচিত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রমাণ মেলে তাঁর কাজে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মূল নিদর্শন সমন্বিত শিল্প দেখানোর জন্য কলাভবনে আসার পর নন্দলাল নিরবচ্ছিন্নভাবে নান্দনিক গুণসম্পন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করেছেন। এসব সংগ্রহ দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেত।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বিশ্বভারতীর কাছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে ছিল বিদেশি শিল্পীদের শান্তি-নিকেতনে এনে তাঁদেরকে কাজের পরিবেশ করে দেয়া।যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের কাজ দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মূর্তিকলার ছাঁচ বা অনুকৃতি দিয়ে আশ্রম সজ্জিত করা এবং বিখ্যাত চিত্রের অনুকৃতি দিয়ে ভিত্তিচিত্র করা, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা একনজরে বিশ্বশিল্পের পরিচয় পান। তৃতীয় প্রস্তাব ছিল কারিগর ও কারুশিল্পীদের আনিয়ে তাঁদের পদ্ধতি ও প্রকরণ ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো। অর্থাভাবে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এই পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতিতে তাঁর মুক্ত অভিজ্ঞতাভিত্তিক নিরন্তর শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।[৭৮]

নন্দলালের শিক্ষকতার অসামান্য প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্পশিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে শান্তিনিকেতনের অন্যান্য শিক্ষা ভবনের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাচর্চায় আগ্রহী হয়েছেন, চর্চা করেছেন, শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন।

নন্দলালের স্নেহধারা অন্য শিক্ষাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা পেয়েছেন। খুব কম কথায় অতি সহজভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে পারতেন। জটিল বিষয় ইঙ্গিতে প্রকাশ করতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের তিরস্কারের পরিবর্তে গাম্ভীর্যতা দিয়ে শাস্তি দিতেন। ছবি আঁকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও গোছালো রাখাটা তাঁর শিক্ষার অঙ্গ ছিল। শিক্ষা বিষয়ে আনাড়ি কিংবা নিরাশ শিক্ষার্থীদের মনের জোর জাগিয়ে তাঁদের কাজে ফেরাতে পারতেন জাদুকরের মতো। গল্পের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ছবির মর্ম বোঝাতেন ও ছবি আঁকার প্রেরণা দিতেন। বেড়াতে নিয়ে গিয়ে স্কেচ করাতেন। এটা ছিল চলন্ত ক্লাস। নাটক দেখার সময় স্কেচ করাতেন। শিক্ষার্থীদের আপন পথে তার নিজস্ব ভাবনাকে জাগিয়ে তুলে তার দোষগুণ, গলদ, স্বাদের পরিমাণ বুঝিয়ে দিতেন। ভারতীয় পদ্ধতি ছাড়া পাশ্চাত্যের Cubism, Abstraction ইত্যাদি রীতির পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীর রচনায় প্রকাশ পেলে সমালোচনা করে পরক্ষণে ঔদার্যের সাথে মেনে নিতেন। প্রিয় ছাত্র ইন্দ্রভূষণ রক্ষিতকে পাঠানো পোস্টকার্ডে একটি ছবিতে মুরগি খাবার খাচ্ছে এবং মুরগির বাচ্চাকে কীভাবে খাওয়াতে হয় তা শেখাচ্ছে। পাশে লিখেছেন।আমরণ শিক্ষককে শিখতে হবে, ছাত্রদের শিখতে হবে। এই সরল অথচ গভীর উক্তিতে তাঁর শিক্ষকতার ধরন ও নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে।

চিত্র ৪৮ : কার্ড ড্রয়িং (মুরগি বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে), ৭.৬২ × ১০.১৬ সেমি, ১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ষোলো

বাংলার প্রাচ্যশিল্পের বিকাশে নন্দলাল বিশেষ কয়েকটি মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করেছেন। এর মধ্যে ভিত্তিচিত্র, ছাপচিত্র, পত্রচিত্রণ, পোস্টকার্ড, স্কেচ ও কোলাজচিত্র, টার্চ ওয়ার্ক (ছোপের কাজ) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

ভিত্তিচিত্র : নন্দলাল বসু বৃহৎ পরিসরে ছবি দেখেছেন অজন্তা ও বাগের ভিত্তিচিত্রে। ১৯১৭ সালে তিনি প্রথম ভিত্তিচিত্র এঁকেছেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। এরপর শান্তিনিকেতনে ভিত্তিচিত্রের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আধুনিক ভারতে ভিত্তিচিত্রের বৈপ্লবিক সূচনার পুরোধা হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯২৩ সালে পাঠভবন অফিসে ভূমিজ রঙের বাঁধুনি হিসেবে ভাতের মাড় ব্যবহার করেছেন। ১৯২৮ সালে শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ' এঁকেছেন ইতালির ফ্রেসকো বুয়োনো পদ্ধতিতে। ১৯৩৩ সালে পাঠভবনের একতলার বারান্দায় ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের জন্য রাজস্থান থেকে জয়পুরী আরায়েস পদ্ধতির কারিগর নরসিংহলালকে এনেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই পদ্ধতির কারিগরি জ্ঞান অর্জন করা। ১৯৩৫ এ 'শ্যামলী' বাড়িতে নতোন্নত পদ্ধতিতে করেছেন স্থানীয় জীবন ও পরম্পরায় শিল্পের নানা অনুষঙ্গ। ১৯৪২ সালে চীনা ভবনে 'নটীর পূজা' করেছেন ডিম মেশানো টেম্পারায়। ১৯৩৯–৪৬ সালের মধ্যে করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বরোদার কীর্তি মন্দিরের ভিত্তিচিত্র। এক্ষেত্রে তিনি রঙে ডিমের কুসুমের বাঁধুনি দিয়ে লিপ্য-তে (এগ টেম্পারা) এঁকেছেন। উল্লিখিত ভিত্তিচিত্রে বিভিন্ন রীতি ও টেকনিক ব্যবহার করেছেন। টেকনিকের বৈচিত্র্যের সাথে সাথে বিষয় ও আঙ্গিকে ভারতীয় পরম্পরাকে আধুনিকতায় উপস্থাপন করেছেন। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের কাছে 'দেওয়াল চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

> জগন্নাথের পট, পুরাতন পুঁথির কাঠের পাটার ওপর ছবি, তিব্বতী পদ্ধতিতে আঁকা টঙ্গা, ওয়াসলীর ওপর মিনিয়েচার ছবি চা-ও কৃত পদ্ধতি, চিকন শিল্পের কাজ, রেশমী কাপড়ের ওপর ছবিIচীনে জাপানী পদ্ধতিতে, সিংহলী ভিত্তিচিত্র জয়পুরী আরায়েস, আমাদের পঙ্কের কাজ, আর অংশতঃ ইটালীয়ান ফ্রেস্কো-পদ্ধতি মিলিয়ে মিশিয়ে আমরা শান্তিনিকেতনে আমাদের ফ্রেস্কো পদ্ধতি গড়ে তুলেছি।[৭৯]

সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে বর্তমানে অনেকেই শিল্পকলা এবং পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। কে.জি সুব্রহ্মণ্যন-এর মতে, যার শুরু হয়েছিল নন্দলালের ভিত্তিচিত্রের মাধ্যমে। এমনকি তাঁর সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রামকিঙ্কর বেইজ খোলা আকাশে ভাস্কর্য নির্মাণ করে জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন।[৮০] ভিত্তিচিত্রের সিদ্ধি প্রসঙ্গে মৃণাল ঘোষ লিখেছেন, 'চলমান জীবনের অন্তর্গত মহাজীবন ধারার রূপায়ণ প্রবণতা ফুটে উঠেছে তাঁর ম্যুরালগুলির মধ্যে।'[৮১] দেবাশীষ ব্যনার্জীর বর্ণনায় :

> Nandalal's murals are also remarkable their extreme versatility and variety of styles. These highly original creative adaptations range from the quasi-naturatistic, through the Indian classical, the Pahari and the Bengali *Pata*, to the flat contrasting color planes and forms of Japanese *rimpa*. In these paintings Nandalal found a seale, freedom and contextual coherence unprecedented in his previous work, and he made full creative use of these opportunities. [৮১/১]

ছাপচিত্র : বাংলার প্রাচ্যরীতি অর্থাৎ নব্য-বঙ্গীয় শিল্পধারায় অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী শিল্পীরা সাহিত্য অবলম্বন করে চিত্র এঁকেছিলেন। নন্দলাল শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় পারিপার্শ্বিক জীবন ও প্রকৃতিনির্ভর শিল্পধারা গড়ে তুলেছিলেন এবং শান্তিনিকেতন চিত্রকলা ধারায় নতুন দুটি স্বতন্ত্র দিক সংযুক্ত করেছিলেনIযার একটি

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিচিত্র বা দেয়াল চিত্র অন্যটি ছাপচিত্র। এই দুই ধারাকে সমৃদ্ধ, সম্প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠা করতে নন্দলালের প্রয়াস পথিকৃতের।

নব্য-বঙ্গীয় কলাশিল্পের আন্দোলনে ১৯১৬ সালে 'বিচিত্রা' সভায় প্রথম ছাপাই ছবির চর্চা হয়েছে। বিশেষত গগনেন্দ্রনাথ তাঁর সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিচিত্রায় লিথো প্রেস চালু করেছিলেন। এই প্রেসকে কেন্দ্র করে নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীর শিল্পীরা ছাপাই ছবি করেছেন।[৮২] নন্দলাল তাঁর প্রথম লিথোগ্রাফ চিত্র 'সাঁওতাল নৃত্য' (১৯১৮) বিচিত্রায় এঁকেছিলেন।

চিত্র ৪৯ : সাঁওতাল নৃত্য : উমাকে আশীর্বাদ, লিথোগ্রাফ

চিত্র ৫০ : আব্দুল গফ্ফর খান, লিনোকাট
২৯.৮ × ১৮.৭ সেমি, ১৯৩৬

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসার পর এই ছাপাই মেশিনটা শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। বিখ্যাত চিত্রকর ম্যুরহেড বোন-এর এচিং ও ড্রাই পয়েন্টের ছবি দেখে এবং মেক্সিকোর কলারসিক ফ্রাইম্যানের কাছে জাপানি রঙিন উডকাট পদ্ধতি বিষয়ে অবহিত হয়ে নন্দলাল ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ছাপাই ছবির বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন।[৮৩] ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন অদ্রেঁ কারপেলেস্। তাঁর মাধ্যমে ইউরোপের এক্সপ্রেশনিস্ট কাঠখোদাইয়ের ধারণা পেয়েছেন নন্দলাল ও কলাভবনের ছাত্র-শিক্ষক। এ সময় নন্দলাল ভঙ্গুর ও অনুপুঙ্খ জটিলতা বর্জন করে *সহজপাঠ*-এর ছবিগুলোতে দৃশ্যকে সাজিয়েছিলেন সাদা ও কালোর চওড়া এলাকায়। নন্দলাল ও তাঁর ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজ শান্তিনিকেতনে লিথোগ্রাফ, উডকাট, উড-এনগ্রেভিং, লিনোকাট, এচিং, ড্রাই পয়েন্ট ও অন্যান্য রীতিবহির্ভূত পদ্ধতিতে ছাপাই ছবি করে উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

নন্দলালের ছাত্র রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছাপাই ছবিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার সময় শান্তিনিকেতন ছাপাই ছবির ধারা তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিস্তার করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্র-শিল্পী হলেনাবাংলাদেশের শফিউদ্দিন আহমেদ ও ভারতের হরেন্দ্রনারায়ণ দাস। আবার শফিউদ্দিনের উল্লেখযোগ্য ছাত্র সোমনাথ হোর। শফিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের একাডেমিক চারুকলা চর্চায় প্রথপ্রদর্শক। তাঁর ছাত্ররা বাংলাদেশের ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, নন্দলাল শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় ছাপচিত্রের যে উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে উভয় বাংলার শিল্পকলায় বিশেষ অবদান রাখছে এবং বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার একটা বিশেষ রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পোস্টকার্ড : নন্দলাল অঙ্কিত শিল্পকর্মের একটি বিশেষ দিক পোস্টকার্ড চিত্র। পোস্টকার্ড চিত্রের অঙ্কন বিষয়ের মধ্যে শিল্পীর আটপৌরে মনের ছাপ প্রকাশ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সাথে তুলনা করেছেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা।[৮৪] সত্যিকার অর্থে পোস্টকার্ডের স্কেচকে চিত্রিত চিঠি বলা যায়। মনের ভাব প্রকাশের জন্য দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার ছাপ এঁকে ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধুবান্ধবদের কাছে পাঠাতেন। এ রকম অনেক পোস্টকার্ড চিত্রের ছবি ও লেখায় নন্দলালের কৌতুকপ্রিয় মনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৮৫] মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত লিখেছেন, 'পোস্টকার্ড চিত্রগুলিকে কার্টুন আখ্যা দেওয়া যায়; অল্প কথায় অল্প পরিসরের মধ্যে এরূপ রস বিতরণ করার চেষ্টা আর-কোনো শিল্পীর মধ্যে দেখা যায় না, এ-সব ড্রয়িং-এর মধ্যে বেশ একটা humour আছে। স্কেচের বিষয়গুলির মধ্যে অত্যন্ত বৈচিত্র্য আছে।'[৮৬]

চিত্র ৫১ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, ৮.৮৯ × ১৩.৯৭ সেমি

চিত্র ৫২ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, ৮.৮৯ × ১৩.৩৪ সেমি, ১৯১৭

ক্যালিগ্রাফিভিত্তিক রেখাগুলোতে তাঁর অনুরাগ শক্তিশালীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চীন-জাপানের ক্যালিগ্রাফির ব্যবহারের সাথে অন্তমিল পাওয়া যায়। তাঁর কার্ডস্কেচগুলোকে মিনিয়েচার চিত্রও বলা যায়। কারণ ছোটো আয়তনের এই স্কেচচিত্রের প্রতিটিই পূর্ণাঙ্গ ও অনেকক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর পুক্ষানুপুঙ্খ চিত্ররূপ দিয়েছেন। শুধু চীন-জাপান ক্যালিগ্রফিক ব্যবহার নয়, এই পোস্টকার্ড চিত্রে দেখা যায় বিভিন্ন শিল্পের কৌশলগত প্রতিফলন যা তিনি সারা জীবন বিভিন্নভাবে সঞ্চয় করেছেন। আশ্চর্য এই রেখাগুলোর পুনরুক্তি হয়নি। পূর্ণেন্দু পত্রীর ব্যাখ্যানুসারে, পোস্টকার্ডের ছবিতে আঙ্গিক নিয়ে এক্সপ্রেরিমেন্টের উদার খেলাধুলা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য শিল্পের বিভিন্ন ইজম ও সাদৃশ্য বর্জিত শিল্পরূপের ছাপ পড়েছিল।[৮৭]

চিত্র ৫৩ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, মিশ্র মাধ্যম
১৩.৩৪ × ৮.৮৯ সেমি, ১৯৪৮

চিত্র ৫৪ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, জলরং
৮.৮৯ × ১৩.৩৪ সেমি, ১৯৪৮

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫৫ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, মিশ্র মাধ্যম
১৩.৯৭ × ৮.৮৯ সেমি

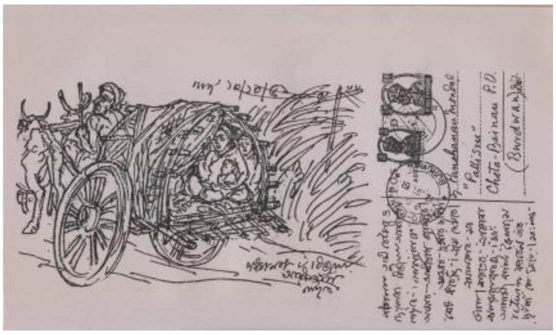

চিত্র ৫৬ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং

নন্দলাল তাঁর অন্তরের ভাবনাকে প্রকাশের জন্য বহুজনের কাছে বহু বিষয় নিয়ে পত্রালাপ করেছেন। নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য লেখার সাথে ছবি এঁকে দিতেন। কখনো ছবির সঙ্গে ক্যালিগ্রাফিক ছন্দে, কিংবা চিঠির উল্টো পিঠে ছবি এঁকে দিতেন। রং, কালি, কলম, পেন্সিল অর্থাৎ হাতের কাছে যখন যে মাধ্যম থাকত তাই দিয়েই স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনাকে রূপের ছাঁচে রূপ দিতেন, যার মধ্যে অরূপকে দেখার আভাস থাকত। তাঁর কাছে পোস্টকার্ড ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী। ১৯৩৫–১৯৫২ সাল পর্যন্ত নন্দলালের স্নেহের ছাত্রী ইন্দুলেখা ঘোষকে লিখেছেন ১৬১টি পত্র।[৮৮]

চিত্র ৫৭ : পোস্টকার্ড চিত্র
৮.৮৯ × ১৩.৯৭ সেমি, ১৯৪৩

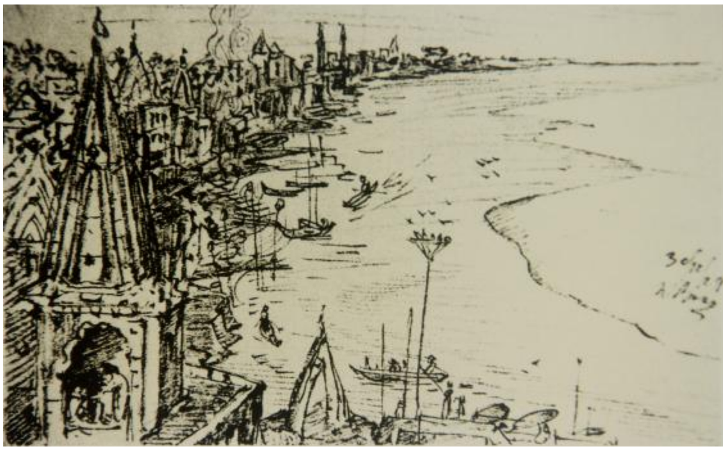

চিত্র ৫৮ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং (বেনারস), কালি তুলি, ১৯২৯

এসব পত্রচিত্রে জীবনবোধ, শিল্পবোধ, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব রসের ধারা, অরূপকে দেখার আভাস, প্রকৃতি প্রত্যক্ষণ সব কিছুই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতি প্রত্যক্ষণে ও সাহিত্যিক ভাষার এমন একটি উদাহরণ হচ্ছে ১৯৪৩ সালে ইন্দুলেখাকে লিখিত পত্রেÍ'এবার উত্তরায়ণের বাগানে অশোক ফুল এসেছে। যেন রাজার ঘরে রাণী এসেছে। দূর থেকে একবার উঁকি মারি। আর কত নূতন ফুল রথীবাবুর বাগানেÍযেন মেম সাহেব মিহি গলায় কথা কয়। সব ভাষা বুঝি না। বেল, যুঁই সব হাত ধরাধরি করে সারি নৃত্য সারা রাত্তির জুড়ে দিয়েছে।'[৮৯]

এরূপ অসংখ্য পত্রচিত্রণে শিল্পীসত্তা ও মনুষ্যসত্তা একীভূত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পত্রছবির সঙ্গে লিখিত বক্তব্য কখনো মুখ্য আবার কখনো গৌণ হয়ে ছবির নিজের বক্তব্যই বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্কেচ : নন্দলাল প্রতিনিয়ত স্কেচ করতেন। স্কেচ ছিল কবিতা লেখার মতো নৈমিত্তিক কাজ। কালি, কলম, জলরং-সহ বিচিত্র উপাদানে স্কেচ করেছেন। নন্দলালের স্কেচের সাথে রেমব্রান্টের স্কেচের মিল আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা ও তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিশেষত্বে চিত্রে Structure, Form, Volume, Mass ইত্যাদি শিল্পগুণ অনায়াসে চলে এসেছে। এসব কার্ডচিত্র করার সময় প্রথমে তিনি যেখানে যেতেন সেখানের তাৎক্ষণিক অবস্থা ও ভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া করে নিতেন। এই খসড়ায় structure ও ভঙ্গি থাকত। পরবর্তীতে ঘরে এসে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতেন। কিছু কিছু স্কেচ সরাসরি কালি তুলিতে করতেন। এই স্কেচগুলোর আকার অত্যন্ত ছোটো হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দিনলিপির মতোই মূল্যবান। যে ভৌগোলিক পরিবেশ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল এবং যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণ তিনি বিশেষভাবে লক্ষ করতেন তার পূর্ণ ইতিহাস অঙ্কিত হয়েছে এই স্কেচ চিত্রে। পূর্ণেন্দু পত্রীর বিচারে, নন্দলালের স্কেচ চিত্রে দ্বৈত ভাব প্রকাশিত। একটা বাস্তবের অনুকৃতি যা শিল্পীর চোখে দেখা রূপের প্রতিরূপ। অন্যটা মননের অবলোকনে অঙ্কিত বস্তুর সত্তারূপ।[৯০]

নন্দলালের স্কেচ রেখা, ছন্দ ও গতি-প্রধান। পেন্সিল, কলম, কিংবা তুলিতে সব মাধ্যমেই রেখার বলিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। তিনি আজীবন স্কেচ করেছেন। এটা ছিল তাঁর সাধনার মতো নৈমিত্তিক। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ধরনের বিষয়বস্তুর প্রাণসত্তাকে খুঁজেছেন তাঁর স্কেচের মধ্যে।

কাগজের কোলাজ : নন্দলাল শেষ বয়সে কোলাজ করেছেন। শারীরিক অসুস্থতায় অধিকাংশ সময় বাড়িতে সময় কাটাতেন। এই পরিস্থিতির অনুকূল হিসেবেই কোলাজ করতেন। সাদা কাগজ কোনো একটা আকারে ছিঁড়ে রঙিন কাগজের পটভূমিতে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতেন। রঙিন কাগজ ছিঁড়ে সাদা কিংবা ব্রাউন পেপারের পটভূমিতে লগিয়ে দিতেন। এরপর প্রয়োজন অনুসারে কলমে বা তুলিতে রেখা সংকেতে রূপগুলোকে স্পষ্টতর করতেন। এই কাজের নাম দিয়েছিলেন 'হেলাফেলার কাজ'।

চিত্র ৫৯ : কোলাজ, ৮.৮৯ × ১৩.৯৭ সেমি, ১৯৫৯

চিত্র ৬০ : রঙিন কোলাজ
১৫.২৪ × ১০.৮০, ১৯৩৪

এই কাজের চরিত্র বর্ণনায় শোভন সোমের মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে :

> শিশুর খেলার মতো এই কাজ ছিল অনায়াস। তাঁর অন্য ছবিতে সংরচনের ও ড্রইংয়ের সম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে এগোবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়; অপরপক্ষে এই ছবিতে রূপের কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই, কাগজ ছেঁড়ার আকস্মিকতার ফলে জেগে ওঠা রূপের মধ্যে সাদৃশ্যের আভাস খোঁজা হতো। অ্যাকসিডেন্ট বা আকস্মিকতা ছিল এই কাজের ভিত।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা নন্দলালের এই চিত্রগুলোর মূল্যায়নে লিখেছেন :

> এই চিত্রগুলিকে রূপকথার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে রূপকেরই প্রাধান্য, যুক্তি গৌণ। কিন্তু মনের কল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিয়াই ইহাদের সৃষ্টি। . . . চিত্রগুলির আবেদন সহজ সরল হইলেও দৃঢ় ও আনন্দদায়ক।[৯১/০]

নন্দলালের প্রতিভার বড়ো দিক তিনি কারুশিল্পী ও মণ্ডনশিল্পী। শান্তিনিকেতনের সকল উৎসব অভিনয়, মঞ্চসজ্জা অনুষ্ঠানের সাজসজ্জায় সহজ ও অনাড়ম্বর ভাব থাকত। তবু এর মধ্যে সুন্দর ও সংহত রুচির প্রকাশ থাকত। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সাজসজ্জার এই সহজ সৌন্দর্য বিকাশের ধারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সাথে নন্দলালের রূপচিন্তার মিলনে সম্ভব হয়েছিল।

টাচ ওয়ার্ক (touch work) : জাপানি কালি তুলির ব্যবহার থেকে তিনি টেম্পারা পদ্ধতির সমতল রঙের ব্যবহারকে কয়েকটি স্তরের মধ্যে সাজিয়ে আধুনিক ব্রাশ ওয়ার্কের বিশ শতকের আধুনিকতার চাহিদা মিটিয়েছেন। এগুলোকে টাচ ওয়ার্ক (touch work) বলা হয়। New clouds (1937), Sabari in Hes youth (1941), Burning pine (1942), Alakanada (on the way to Mayavati), Darjeeling and fog (1945) নন্দলালের টাচ ওয়ার্কের উদাহরণ।

চিত্র ৬১ : Sabari in Hes youth, টেম্পারা টাচ ওয়ার্ক, ১৯৪১

চিত্র ৬২ : New clouds, টেম্পারা টাচ ওয়ার্ক ৪২.২৪ × ৬৯.৮৫, সেমি, ১৯৩৭

চিত্র ৬৩ : Alakananda (on the way to Mayavati) টেম্পারা (টাচ ওয়ার্ক), ১৯৪২

শিল্পচর্চা গ্রন্থে নন্দলাল টাচের ছবি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> টাচের ছবি, তখনই সম্ভব যখন চিত্রকর করণ-কৌশলে ওস্তাদ হয়েও সব কৌশলের কথা ভুলে যানIতুলি-চালনার কায়দা তার সহজাত ক্ষমতার মতো, Second nature-এর মতো হয়ে যায়। এমন-কি, বস্তুর বাহ্যিক রূপের ও গুণের কথাও তিনি ভুলে যান।[৯১/১]

তিনি অতি সামান্য নগণ্য তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন। নাটকের পোশাক সজ্জায় তিনি পরিচ্ছদের ভাব ও দেহের সঙ্গে তার ছন্দসাম্য বজায় রাখতেন। তিনি আসল মানুষের রূপ ঢেকে ফেলে সাজাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মাপজোক করে মোগল আমলের সাজানো বাগান না করে শান্তিনিকেতনের পুরনো পথ বাঁচিয়ে কলাভবনের চারপাশ সাজিয়েছেন যোগ্য-অযোগ্য নানারকম ফুল-ফলের গাছ দিয়ে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে আরোপিত সৌন্দর্যে সাজাননি।

চিত্র ৬৪ : 'শাপমোচন' অভিনয়ের জন্য শান্তিদেব ঘোষকে সাজাচ্ছেন নন্দলাল

বিভিন্ন উৎসব সাজাতে আলপনা রচনা করেছেন চাল, গম, ডাল, তিল, শর্ষে দিয়ে। কখনো ফুল, পাতা ও ফুলের পাপড়ি ব্যবহার করেছেন আলপনায়। বাংলার প্রাচীন চিত্রকলা আলপনাকে তিনি উৎসবে পূজা-পার্বণে নতুন রূপে ব্যবহার করে সাধারণের মধ্যে শিল্পরুচি তৈরি করেছেন। আলপনাকে ঐহিক (Secular) করে তুলেছিলেন। অজন্তার গুহাচিত্রের বিভিন্ন ফুল-ফল-লতাপাতার আলংকারিক দিক থেকে উৎসাহিত হয়েছেন। এবং প্রকৃতিমনস্ক হওয়ায় আলপনায় প্রচলিত ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের পরিবর্তে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাকে নকশায় রূপান্তর করে আলপনায় এনেছেন প্রকৃতির ছন্দ ও উপাদান।[৯২] অর্থাৎ নন্দলাল আলপনা চরিত্রের ভারতীয় ধারা বজায় রেখে উৎসব অনুষ্ঠান সাজসজ্জার আলপনাকে শিল্প হিসেবে নতুন মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কংগ্রেস প্রাঙ্গণ সাজিয়েছিলেন গ্রামীণ কারুশিল্পের উপকরণ দিয়ে। এসব উপকরণ অবহেলায় পড়ে থাকে। তাঁর প্রকৃত শিল্পদৃষ্টি সৌন্দর্যের এসব সহজ উপাদান দিয়ে অসাধারণ মণ্ডপ ও তোরণ সাজিয়েছিলেন। নন্দলাল-কন্যা ও শান্তিনিকেতন আলপনার পরবর্তী উত্তসূরি গৌরী ভঞ্জ লিখেছেন : উৎসব প্রাঙ্গণ, ধূপ, ধূনা, আলপনা দেওয়া, সম্মানীয় অতিথিকে শঙ্খধ্বনিসহ মালাচন্দন দান করে অভ্যর্থনা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে ও সংগীতে অনুষ্ঠানের সূচনা ও সমাপ্তি, নৃত্যগীত বাদ্যসহকারে ধূপ দীপ অর্ঘ্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক বহন করে সুন্দর বেশে সজ্জিত হয়ে বালক-বালিকাদের সভাঙ্গনে প্রবেশ।এ সবের সমন্বয়ে এক বিচিত্র এবং অভিনব পরিবেশ রচনার যুগ আরম্ভ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। তা মূলত রবীন্দ্রনাথের ডাকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ও নন্দলাল এই ধারা প্রবর্তন করেছিলেন।[৯৩] এতে উৎসবের দৃশ্যপট রচনায় শিল্পানুভূতি ও অধ্যাত্মিক চেতনা এসেছে এবং হৃদয়ের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ স্থাপত্যের বিষয়গুলো দেখতেন। নন্দলাল স্থাপনা সহযোগে সার্বিক পরিবেশের সৌন্দর্যের বিকাশে দৃষ্টি রাখতেন। বিভিন্ন ভবনের দেয়াল চিত্রণ ও উৎসব অনুষ্ঠানে সাজসজ্জা আলপনার নতুনত্ব এনেছিলেন নন্দলাল। আলপনার কাজে প্রথমদিকে তাঁকে যোগ্য সহায়তা দেন সুকুমারী দেবী।

নন্দলাল বসুর পরামর্শে এবং নির্দেশে সুকুমারী দেবীর আলিম্পন শক্তি বিকশিত হয়েছিল। তিনি ১৯২৪ সালে আলপনা ও সেলাই শেখাবার কাজে বিশ্বভারতীর কলাভবনে যোগ দেন। নন্দলাল-কন্যা গৌরী ভঞ্জ সুকুমারী দেবীর ছাত্রী। তিনি শান্তিনিকেতন আলপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈলী যোগ করে এক অভিন্ন শিল্পসুষমায় উন্নীত করেছিলেন। নন্দলালের অন্য কন্যা যমুনা দেবী ও ছাত্র ননীগোপাল ঘোষ শান্তিনিকেতন আলপনার ঐতিহ্যকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন।[৯৪]

সতেরো

নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু শান্তিনিকেতনে দীর্ঘজীবনের শিক্ষকতায়, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপচারিতায়, শিল্পালোচনায় কিংবা ঘরোয়া কথোপকথনে শিল্পদর্শন ব্যক্ত করেছেন। শিল্পতত্ত্ব, শিল্পদর্শন নিয়ে লিখেছেন কম কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী সহকর্মী ও অন্যান্য সুহৃদIযাঁরা নন্দলালের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁদের স্মৃতিধৃত আলোচনায় নন্দলালের শিল্পদর্শন উঠে এসেছে। সারাজীবনে বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিকের সাহচর্যে আলাপ-আলোচনায় তাঁর শিল্পবোধ পরিপূর্ণ হয়েছিলIএঁদের মধ্যে গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মিত্র, কুমারস্বামী, স্টেলা ক্র্যামরিশ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

নন্দলাল বসু শিল্প প্রসঙ্গে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। পড়াশোনা করেছেন এবং সারা ভারতবর্ষ ও চীন-জাপান শিল্পকলা ও শিল্প নিদর্শন প্রত্যক্ষণ করেছেন বার বার। শিল্প সম্পর্কিত তাঁর ধারণা তিনি সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন লেখায় ও আলোচনায়। গভীর দার্শনিক তত্ত্বকেও প্রকাশ করেছেন শিক্ষকসুলভ অভিব্যক্তিতে।

বাংলার প্রাচ্যশিল্প তথা ভারতীয় শিল্পালোন্দলনের তত্ত্ব গঠনে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা বিষয় রচনা যুগস্মরণীয়। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি নন্দলাল লেখালেখিতে কিছুটা সংকোচ বোধ করতেনIকিন্তু তিনি যা লিখেছেন তা অমূল্য ভূমিকা রাখছে বাংলার তথা প্রাচ্যের শিল্প ও শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে। নন্দলালের লেখা প্রসঙ্গে কে.জি সুব্রহ্মণ্যন লিখেছেন :

> তাঁর ভাষণ, প্রবন্ধাদি, ঘরোয়া আলোচনা-কথোপকথন থেকে সংকলন করে অন্যরাই তাঁর রচনাগুচ্ছ প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশ অবশ্যই তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। এ পরিস্থিতি সত্ত্বেও নন্দলালের রচনার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমে না। এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, বিশ্লেষণধর্মী মন, সংক্ষিপ্ত তুলনা-উপমার ভাস্বরতা দিয়ে গাঁথা সরল-প্রাঞ্জল অননুকরণীয় বাচনভঙ্গি পৃষ্ঠা থেকে পৃষ্ঠান্তরে এক অদ্বিতীয় নন্দলালকে উদ্‌ঘাটিত করে।[৯৫]

শিল্পকথা (কার্তিক ১৩৫১/১৯৪৪ খ্রি.), *শিল্পচর্চা* (বৈশাখ ১৩৬৩/১৯৫৩ খ্রি.), *দৃষ্টি ও সৃষ্টি* (অগ্রহায়ণ ১৩৯২/১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ), *ফুলকারি* (১৯২৯), *রূপাবলী* (১৯৪৯) নন্দলালের অমূল্য গ্রন্থ, যা ছাত্রদের জন্য রচিত। এ ছাড়া তাঁর রয়েছে অসংখ্য চিঠি ও সাক্ষাৎকার। বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কতগুলো চিঠি সংকলিত করেছেন "শিল্পজিজ্ঞাসা শিল্পীদীপঙ্কর নন্দলাল" শিরোনামে। পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, এই গ্রন্থে ১৯৪২–১৯৬৬ পর্যন্ত নন্দলাল মুখে যেসব কথা বর্ণনা করেছেন তেমনটিই লিখেছেন পঞ্চানন মণ্ডল। এই গ্রন্থে বাংলার প্রাচ্যশিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের নানা ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকথা তাঁর শিল্পবিষয়ক অমূল্য গ্রন্থ। শিল্পের গতিপ্রকৃতি, আদর্শ-উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে নয়টি প্রবন্ধে সাজানো এই গ্রন্থ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর* মতোই শিল্প দর্শনের বই। শিল্পালোচনায় এরূপ প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার নন্দনতত্ত্বে দুর্লভ। সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা রয়েছে এ বইয়ে। "শিক্ষায় শিল্পের স্থান" প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত।'[৯৬]

এই প্রবন্ধেIশিল্পশিক্ষার অভাবে জাতির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছেন এবং শিক্ষায় শিল্পশিক্ষা থাকলে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের ক্ষেত্রে কীভাবে সত্যদৃষ্টি আসে তা প্রাঞ্জল ও যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্পসাধনায় তিনি বিশুদ্ধ আনন্দের পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য রসের বিচারে শিল্পবিচার হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, 'কবিতা, মূর্তি, চিত্র, নাচ, গান, সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগ-সাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার মিল আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য সন্ধান করা হয়I**একের** সন্ধান করা হয় যাকে জানলে সব-কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও ঠিক ঐ ভাবে বিরাট **একের** সন্দর্শন-মনেসে চলেছে।'[৯৭] তিনি "শিল্পসাধনা" প্রবন্ধে প্রাঞ্জল যুক্তিতে বুঝিয়েছেন বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করতে সাধক ও শিল্পীর ধারা অভিন্ন।

নন্দলাল বসু শ্রীরামকৃষ্ণের রূপের অদ্বৈত মতবাদ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। শিল্পসৃষ্টির বস্তু নির্বাচনে রূপের অদ্বৈত মতবাদ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, যা তাঁর উক্তির মধ্যে প্রতীয়মান :

> হিন্দুঘরে জন্মে হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এক কালে বিশেষ করে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধারণ জীবনের ছবিও তেমনি এঁকে থাকি; উভয়েতেই সমান আনন্দ পেতে যত্ন করি। দেবতার রূপকল্পনাই উঁচুদরের জিনিস, আশপাশের সাধারণ জিনিসের রূপ তুচ্ছIএই ধারণা পূর্বে ছিল। মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রূপকেই আর প্রধান করে দেখি নে; তাদের প্রত্যেকটিকে একই সত্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ হিসাবে দেখি। সমুদয় জগৎ, অন্তরে বাহিরে সকল রূপ যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান সত্তার সেই প্রাণছন্দকেই খুঁজি সমস্ত রূপেIকী সাধারণ আর কি অসাধারণ। অর্থাৎ, পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে যত্ন করি-মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।[৯৮]

"শিল্পে শারীরস্থানবিদ্যার প্রয়োগ" প্রবন্ধে চারটি প্রশ্ন উত্থাপন ও মীমাংসা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের শারীরস্থানবিদ্যার প্রয়োগ, ব্যবহার, শিক্ষাপদ্ধতির পার্থক্য আলোচনা করেছেন। তাঁর এই সচিত্র আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের মৌলিক দর্শন ব্যক্ত হয়েছে। শিল্পশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্ব কত সহজ ভাষায় বোঝানো সম্ভব তার উদাহরণ :

> বিলাতি শিল্পে শারীরস্থানের জ্ঞান বলতে বোঝায় ব্যবচ্ছেদ করে দেহের গঠন সম্বন্ধে যা জানা যায়। কিন্তু, দেহের আকৃতি ও বিচিত্র গতিভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে দেহের গঠন সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, প্রাচ্য শিল্পে বোঝায় তাই। বিলাতি শিল্পী দেহের আঙ্গিক বিশ্লেষণ থেকে তার সমগ্রতায় পৌঁছোন, প্রাচ্য শিল্পী দেহের সমগ্রতাবোধ থেকে আঙ্গিক বিশ্লেষণে আসেন। একজন বিজ্ঞান বা 'ব্যাকরণ' থেকে শুরু ক'রে প্রাণছন্দে বা Life movement এ উপস্থিত হবার চেষ্টা করেন। আর-একজন প্রাণছন্দ থেকে শুরু ক'রে বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ শিক্ষা পূরা করেন।[৯৯]

শুধু সহজ ভাষা নয়, একজন শিক্ষকের শিল্পতত্ত্ব বিশ্লেষণে উপমা-উদাহরণ দৃষ্টান্ত ব্যবহার কৌশলও আমরা লক্ষ করি এই লেখায়। শিল্প সৃষ্টিতে চীন ষড়ঙ্গের প্রাণছন্দতে (Rhythime vitality) গুরুত্ব দিতেন। তাঁর বর্ণনায় :

Dhaka University Institutional Repository

> রসপ্রেরণার প্রথম আবেগেই যে ছন্দের সৃষ্টি হয় তাকেই বলি প্রাণছন্দ; যে বিশেষ রসটির মূর্তি দিতে হবে এই প্রাণছন্দের ভঙ্গিতেই তার বিশেষ চরিত্র ও গুণ নিহিত থাকে। চিত্রে চরম-প্রাণবন্ত একটি রেখাতেই এর অস্তিত্ব জানা যায়, এই রেখাটিতেই সমস্ত চিত্রটির প্রথম প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। এই একটি রেখাপাতমাত্রে চিত্রে অখণ্ড ঐক্য ও বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে।[১০০]

"শিল্পসৃষ্টির মূলসূত্র" প্রবন্ধে শিল্পসৃষ্টির গোড়ার কথা হিসেবে শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের বোধ প্রভৃতিকে নির্দিষ্ট করেছেন। জাপানি শিল্পতাত্ত্বিক ওকাকুরা কাকুজো বর্ণিত শিল্পসাধনার মূলসূত্র স্বকীয়তা (Originality), স্বভাব (Nature), পরম্পরা (Tradition)-কে শিল্পসাধনার মূলসূত্র হিসেবে মানতেন। তিনি এই তিনের সমন্বয়ে নিজের শিক্ষকর্ম সৃষ্টি করেছেন ও ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। নন্দলাল তাঁর কাজে চীন-জাপান ও ভারত ষড়ঙ্গের শিল্পসূত্রকে ব্যবহার করে বাংলার প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাকে রূপদান করেছেন।

"শিল্পপ্রসঙ্গ" প্রবন্ধে 'শিল্পবস্তু কাকে বলে?'Iপ্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, শিল্প হলো কল্পনা; সৃষ্টি; শিল্পীর ধ্যান বা চিন্তা; ছন্দ।[১০১] এ ছাড়া কীভাবে শিল্পবস্তু দেখা দরকার, শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির দান কী, বুদ্ধমূর্তির তাৎপর্য কী এসব প্রশ্নের সদুত্তর ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। *শিল্পকথা* গ্রন্থ প্রসঙ্গে কে.জি সুব্রহ্মণ্যন-এর মন্তব্য যথোপযুক্ত। তিনি *দৃষ্টি* ও *সৃষ্টি* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাস্তবিকপক্ষে নাতিবৃহৎ হলেও 'শিল্পকথা'য় এমনই অনেক মৌলিক ভাবনা নিহিত রয়েছে এবং প্রথম পাঠে যে শব্দার্থ ধরা দেয়, তার চেয়ে বৃহত্তর ভাবার্থের দিকে তা নিয়ে যায়।'[১০২]

শিল্পচর্চা নন্দলালের শিক্ষাপদ্ধতির অমূল্য দলিল। এই গ্রন্থে তিনি শিল্পের আঙ্গিক পদ্ধতি ও আঙ্গিক পদ্ধতির যৌক্তিকতার বিষয় অবতারণা করেছেন। এই গ্রন্থে করণ ও উপকরণ, প্রকরণ, অঙ্কনের রীতি-প্রকৃতি বিষয়ে সচিত্রিত আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ জীবনে ভাবের ও রসের সাধনায় যেসব নূতন-পুরাতন ও অপরিচিত প্রকরণ নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন, গবেষণা করেছেন, নিজের কাজে প্রয়োগ করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থ শিল্প প্রকরণে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের স্মারকই নয়, পরবর্তী শিল্পশিক্ষার প্রাচীন পদ্ধতি সংরক্ষণের দলিল হিসেবেও মূল্যবান। এই গ্রন্থে প্রাচ্যশিল্প ধারার বিভিন্ন টেকনিক নথিবদ্ধ করে তিনি বাংলার প্রাচ্য শিল্প চর্চায় অনন্য অবদান রেখেছেন।

নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শ্রীঅম্লান দত্ত ও শ্রীকল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন সম্পাদিত *দৃষ্টি ও সৃষ্টি* গ্রন্থে শিল্পকথা ও শিল্পচর্চা ছাড়াও নন্দলাল লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ, চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া শ্রী কানাই সামন্তের সাথে আলাপচারিতার সুভাষিত : সংকলন *দৃষ্টি ও সৃষ্টি* গ্রন্থিত হয়েছে। এসব চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও সুভাষিত সংকলনে নন্দলালের শিল্পীমানস ও তাঁর বস্তুজগৎ উপলব্ধির ও শিল্পবিষয়ক নানা মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এ ছাড়া *রূপবলী প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ* এবং *তৃতীয় ভাগে* ভারত তথা প্রাচ্যশিল্পের অতীত ঐতিহ্য অজন্তা, বাগ, সিংহলের সিগিরিয়া গুহাচিত্র, কোণার্ক মন্দিরের প্রস্তর মূর্তি, বাংলার প্রস্তর মূর্তি, কাশ্মীরি চিত্র, দাক্ষিণাত্যের প্রস্তরমূর্তি, বুদ্ধগয়ার প্রস্তরমূর্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। প্রথম ভাগে মানুষের মুখের, দ্বিতীয় ভাগে হাত-পায়ের বিশেষ মুদ্রার ভাব-ভঙ্গি ও তৃতীয় ভাগে দাক্ষিণাত্যের

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টধাতুনির্মিত সুন্দরমূর্তি, কোণার্ক-মন্দিরের প্রস্তরমূর্তি (জননী); বুদ্ধগয়ার উৎকীর্ণ পাষাণমূর্তি (যক্ষিণী পূজারত নাগরাজ); অজন্তা গুহাচিত্র (আনমনা দ্বারবর্তিনী প্রণতা) কোণার্ক মন্দিরের উৎকীর্ণ পাষাণমূর্তি (প্রসাধনরতা, চিন্তান্বিতা) ইত্যাদি প্রাচীন প্রাচ্য ঐতিহ্যের শিক্ষারীতির মূল আদর্শের ড্রয়িং করেছেন। এই ড্রয়িং-প্রধান বই নন্দলালের আদর্শ শিক্ষকতার পরিচয় বহন করে। কারণ ভারত-শিল্প শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থের ড্রয়িং থেকে প্রাচ্য শিল্পের পূর্বাদর্শের শিল্পরীতির (ভাস্কর্য, চিত্র) সঠিক রূপ অনুধাবন ও অনুশীলন করতে পারবেন। এই চিত্রাদর্শে ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গের গুণাবলি বিদ্যামন। অতএব শিল্পশিক্ষায় নন্দলালের *রূপাবলী* গ্রন্থ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য থেকেও মূল্যবান। কারণ এই ড্রয়িং প্রাচ্যরীতির রীতিপদ্ধতির ভিজ্যুয়াল রূপ।

চিত্র ৬৫ : দ্বারবর্তিনী, অজন্তা-গুহা খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক–খ্রিস্টীয় ১ম সতক

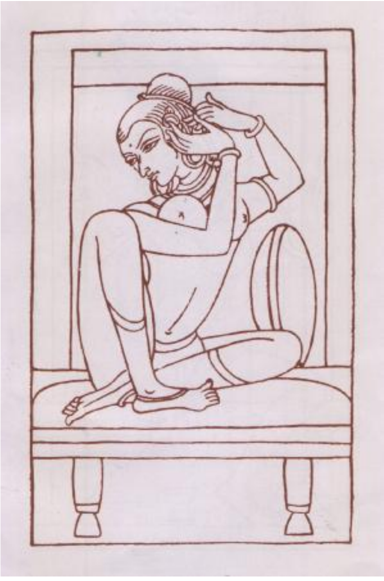

চিত্র ৬৬ : প্রসাধনরতা, উৎকীর্ণ পাষাণমূর্তি কোণার্ক-মন্দির, খ্রিস্টীয় ১১শ শতক

চিত্র ৬৭ : যক্ষিণী, উৎকীর্ণ পাষাণমূর্তি বুদ্ধগয়া খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক-খ্রিস্টীয় ১ম শতক

গুরু অবনীন্দ্রনাথের *জোড়াসাঁকোর ধারে* এবং *ঘরোয়া* গ্রন্থ রানী চন্দ কর্তৃক শ্রুতিলিপি। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ড. পঞ্চানন মণ্ডল *ভারতশিল্পী নন্দলাল* গ্রন্থ লিখেছেন। সেখানে নন্দলালের সারা জীবনের স্মৃতি বিধৃত হয়েছে। এই গ্রন্থে আছে বাংলার প্রাচ্য শিল্পের ইতিহাসের বর্ণাঢ্য তথ্যবহুল বর্ণনা। এখানে নন্দলাল পঞ্চানন মণ্ডলকে যেভাবে বলেছেন তিনি সেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প-ইতিহাস ছাড়াও নন্দলালের অনেক শিল্পদর্শন বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চানন মণ্ডল শিরোনাম সহকারে এসব কথা হুবহু লিখেছেন। যেমন : ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ, শিক্ষাপদ্ধতি-শিশুদের উপযোগী, শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের জন্য লিখা, শিল্প-শিক্ষায়তনে শেখানোর চক্র-পদ্ধতি, শিল্পসৃষ্টি বিষয়ে কয়েকটি কথা, ছবির পরখ, চীনের চিত্রকলা সম্বন্ধ কিছু, জাপানের চিত্রকলা সম্পর্কে কিছু, ভারতবর্ষের চিত্রের কথা, গথিক ও পারসিক চিত্রের সাদৃশ্য কোথায়, মুসলমান যুগের আগে ভারতীয় শিল্প, আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা, শিল্পীর চোখে সাদা-কালর আর্যা, দেওয়ালচিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অজন্তার ভিত্তিচিত্র, সিংহলী ভিত্তিচিত্র, নেপালী ভিত্তিচিত্র, শিল্পদৃষ্টি, রেনেসাঁ-আরম্ভ ও হেতু, শিল্পসৃষ্টিতত্ত্ব, রেখার রীতি ও প্রকৃতি, শিল্প প্রসঙ্গ।

গ্রন্থ ও রচনার বাইরে নন্দলাল বিভিন্ন পত্রিকায় শিল্পবিষয়ে লিখেছেন। এই সমস্ত লেখা থেকে আমরা নন্দলালের শিল্পবিষয়ে মনোভাবের কতগুলো মূল নীতি স্পষ্ট করতে পারি। তা হলো, তাঁর চিন্তাধারা আধুনিক। স্পষ্ট ভাষায় কৌতুক আশ্রিত ব্যাখ্যায় শিল্পের গূঢ়ার্থ প্রকাশ তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। নিজের যুক্তি সমর্থনে ভারত ও চীনের শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের আশ্রয় নিখেছেন। নিজের যুক্তি সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা, কুমারস্বামী, সিষ্টার নিবেদিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্যক্তির মতাদর্শের আশ্রয় নিয়েছেন। গতিবান এক আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যথোপযুক্ত যুক্তি উপস্থাপনায়।

ফলে শিল্পবিষয়ক ভাবনা আধুনিক প্রাচ্য শিল্পের সমকালীন রূপ চিরকালীন দৃষ্টিকোণ এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে দিকনির্দেশনা রচিত হয়েছে, যা বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার রূপ বিকাশে বর্তমান অবধি প্রায়োগিক। তাঁর সান্নিধ্য শিষ্যত্ব ও ভাব বিনিময় প্রেরণায় শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে গড়ে উঠেছিল নতুন প্রজন্ম ধারা। যাঁদের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, দিনকর কৌশিক, কে.জি সুব্রহ্মণ্যন অন্যতম। এই শিষ্যদের প্রশ্ন করে তিনি শিল্প বিষয়ে নানা সমস্যার উত্তর খুঁজে দিতেন। এমন উদাহরণ আছে ১৯৪৩ সালে শীতের এক সকালে বিনোদবিহারীর ৩৪টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। [১০৩] তার লেখনীর বিশেষ দিক হলো তিনি প্রাচ্য ও অন্যান্য পরম্পরানির্ভর শিল্পের ধারাবাহিকতাকে অখণ্ড মতবাদে বিশ্লেষণ করে আধুনিক সময়োপযোগী এবং সৃজনাত্মক তত্ত্ব গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

নন্দলালের শিল্পতত্ত্ব বাংলাদেশের শিল্পীদের শিল্পমনন গঠনে কতটা ভূমিকা রেখেছিল তার প্রমাণ মেলে জয়নুল আবেদিনের নাসির আলী মামুনের জন্য অঙ্কিত ছোটো উপহার চিত্রে। এই কার্ডচিত্রটি সম্প্রতি 'তার আলো তার ছায়া' শিরোনামে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টে (১৮-২৫ ডিসেম্বর, ২০১২) প্রদর্শিত হয়েছে। এই চিত্রটি নন্দলালের সচিত্র কার্ডচিত্রের প্রভাব। এ ছাড়া নন্দলালের শিল্পচিন্তার বিস্তার কিভাবে হয়েছিল তার প্রমাণ লক্ষ করা যায়। এখানে 'শিল্প চর্চা' প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি৷যা শিল্পের দর্শন হিসেবে প্রচারের জন্যই জয়নুল আবেদিন এই চিত্রে ব্যবহার করেছেন।

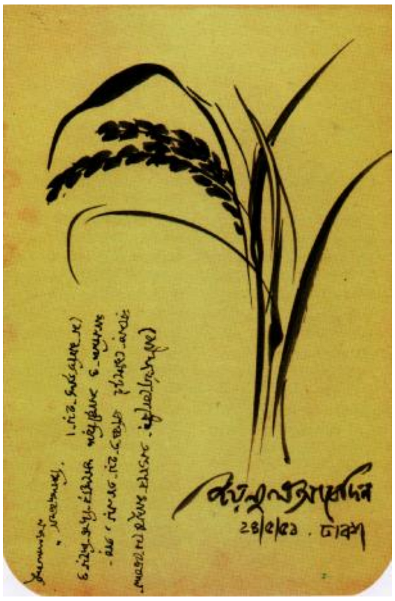

চিত্র ৬৮ : জয়নুল আবেদিন : Shiaf of rice, কাগজের ওপর কালি তুলি, ১২.৫ × ৭.৫ সেমি, ১৯৫১

Dhaka University Institutional Repository

আঠারো

নন্দলাল বসুর শিল্প ও তাঁর শিল্পদর্শন প্রসঙ্গে তাঁর অনুরাগী, সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক নানা প্রসঙ্গে নন্দলালের শিল্পকৃতি ও শিল্পদর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। চলমান নিবন্ধে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে। এতে বিভিন্ন মনীষীর মতামতের মধ্যে তাঁর স্বরূপ যেমন স্পষ্ট হবে তেমনি বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার প্রেক্ষাপটে নন্দলালের শিল্পীজীবন, ব্যক্তি চরিত্র, কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

নন্দলাল বসু শিক্ষক হিসেবে "মাস্টারমশাই" নামে পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'মাস্টারমশাই বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি সেই চরিত্র বা মারমুখী বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। অতি সহজভাবে শিক্ষার্থীর ভুলকে শুধরে দেবার জন্য শিক্ষকই যেন বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির প্রথম কথাই ছিল, ছবির রূপকে ভয় কোর না।'[১০৪] প্রবীর কুমার দাস নন্দলাল বসুর ব্যক্তিচরিত্র বর্ণনায় লিখেছেন :

> 'নন্দলাল বসুর ব্যক্তিজীবন ছিল অত্যন্ত পরিশীলিত। তিনি কৃত সংকল্পের জন্য এতটাই নিজেকে নিয়োজিত করতে পারতেন যে অন্যের খ্যাতি, নিন্দা তাকে স্পর্শ করত না বললেই চলে। ভাবগম্ভীরতায় পূর্ণ নন্দলাল কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। বিত্ত-বৈভবে তার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। দয়া, মায়া, স্নেহ-ভালবাসার অকৃত্রিম আভরণ ছিল তার সমগ্র জীবন সত্তায়। একজন শিল্পীর যে যে গুণগুলি থাকা দরকার তার কোনটিরই অভাব ছিল না নন্দলালের চরিত্রে।[১০৫]

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দলালের দীর্ঘ সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, নন্দলাল কোনোদিন কারুর নিন্দা করেননি।[১০৬] রামনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের জবাবে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নন্দলালের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে : 'জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বুঝেছি বড় শিল্পী আর বড় মানুষ এ-দুটি এক সঙ্গে পাওয়া দূর্লভ। নন্দলাল হচ্ছেন সেই দূর্লভ সমন্বয়ের প্রতীক।'[১০৭]

নন্দলালের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" প্রবন্ধে লিখেছেন :

> ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।[১০৮]

বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন মোগল চিত্রে পারেদর্শী, নন্দলাল শিবচিত্রে পারদর্শী এবং ক্ষিতিন্দ্রনাথ চৈতন্য চিত্রণে পারদর্শী। নন্দলাল পৌরাণিক চিত্র বিশেষ করে শিব-পার্বতীকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চিত্র এঁকেছেন। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শৈবচিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> শিবলীলার চিত্রে নন্দলালের সৃষ্টিশক্তির অপূর্ব পরিচয় আমরা পাই। বাংলাদেশে প্রাচীন পটে এবং যাত্রাগানের অভিনয়শিল্পে স্থূলোদর, শ্মশ্রুযুক্ত যে বৃদ্ধের আদর্শ শিবের প্রাচীন কল্পনাকে বিকৃত করিয়াছিল নন্দলাল সেই দুষ্ট পন্থা বর্জন করিয়া এক কমনীয়কান্তি, শ্মশ্রুহীন, চিরকুমার, অনন্তযৌবন অতিমানুষের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা মধ্যযুগের শিবমূর্তির কল্পনাকে নূতন মর্যাদা ও পরিণতি দান করিয়াছে।[১০৯]

বুলবন ওসমান লিখেছেন, 'তিনি সর্বপ্রথম চিত্রশিল্পী যিনি ভারতীয় পৌরাণিক ছবির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। তিনি ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনীকে প্রবল শিল্পরসে জারিত করেছেন।'[১১০] কলকাতার

Dhaka University Institutional Repository

গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটে ১৯৮৪ সালে নন্দলালের জন্মশতবার্ষিকী প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ সামন্ত নন্দলাল অঙ্কিত নানারকম মুখের ছবি দেখেছেন। বিশেষত "শিবের বিষপান" চিত্রে শিবের মুখের গড়ন, নাকের গড়ন চোখের আদল দেখে লিখেছেন, 'এমন মুখ যিনি আঁকতে পারেন তাঁর দরকার কি অন্য মুখ আঁকার। এমন মুখ যিনি দেখেছেন তাঁর সুখ কিসের অন্য মুখ দেখায়!'[১১১]
পুলিনবিহারী সেন ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রদর্শনী দেখে নন্দলাল অঙ্কিত পৌরাণিক কাজকে বিষয়নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তার আবেদন অনুভব করে লিখেছেন, "এই সব চিত্র পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হইলেও এগুলি আর 'ইলাস্ট্রেশন' বা কাহিনি চিত্রণ নয়।বিষয় এখানে গৌণ, শিল্পরসই প্রধান।"[১১২]
রবীন্দ্রনাথের *ছড়ার ছবি* গ্রন্থের "ছবি আঁকিয়ে" চিত্রাঙ্কিত "ছাগলের ছবি" প্রসঙ্গে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তুমি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাঠিয়েছ এ উর্ব্বশীর সহোদর ভাই নয় কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে। এর থেকে প্রমাণ হয় আর্টে সুন্দর হবার জন্যে সুন্দর হবার কোনো দরকার হয় না। আর্টের কাজ মন টানা, মন ভোলানো নয়।'[১১৩]

রবীন্দ্রনাথ রচিত শিশুশিক্ষার বই *সহজ পাঠের* প্রশংসা করতে মৃণাল ঘোষ লিখেছেন, 'এই ছবিগুলিতে নন্দলাল দৃশ্যবাস্তবতাকে কল্পনায় পরিশীলিত করে সাদা-কালোর বিভাজনে পাঠ্য বিষয়ের চিত্রানুবাদ করে বিষয়ের পরিপূরকভাবে যে দৃশ্য উপস্থাপন করেন গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব।'[১১৪]নন্দলালের পত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে রবি পাল লিখেছেন, 'এক ঝটকায় নিজেকে প্রকাশ করার নুতন এক আঙ্গিক। এখানে নন্দলালের শিল্পীসত্তা ও মনুষ্যসত্তা মিলে মিশে একাকার। এই পত্রছবির সঙ্গে লিখিত বক্তব্য কখনও মুখ্য আবার কখনও গৌণ হয়ে ছবি নিজের বক্তব্যেই বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছে।'[১১৫]
শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত গ্রন্থে মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত লিখেছেন :

> শুধু মানুষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যই তাঁহার স্কেচে ধরা পড়ে নাই, পশু-পক্ষী, কীট–পতঙ্গ নানাপ্রকার উদ্ভিদ ফুল প্রভৃতি যাহা–কিছুই তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে, তাহাই তিনি আঁকিয়াছেন। . . . অনুশীলনের বিষয়ের এরূপ ব্যাপকতা কেবল লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কাজের মধ্যে দেখা যায় . . .।[১১৬]

আবার পোস্টকার্ড চিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, পোস্টকার্ড চিত্রগুলোকে কার্টুন আখ্যা দেয়া যায়, অল্প কথায় অল্প পরিসরের মধ্যে এরূপ রস বিতরণ করার চেষ্টা আর কোনো শিল্পীর মধ্যে দেখা যায় না, এসব ড্রয়িং-এর মধ্যে বেশ একটা humour আছে। স্কেচের বিষয়গুলোর মধ্যে অত্যন্ত বৈচিত্র্য আছে।[১১৭] পোস্টকার্ড চিত্রের ব্যাখ্যা দিতে Debdutta Gupta লিখেছেন :

> He drew so many letters that his artistic endeavor soon almost turned into a force of production. Yet surprisingly, these drawings never became repetitive; each was unique and individually separate, no matter how many letters he wrote and drew. Nandalal was an artist who led the modes of production into the realm of aesthetics. A tree with its many branches growing in different directions Nandalal's endeavor was like that. His roots were in the soil and the branches of his artistic expression soared independently up into the greater sky.[১১৮]

অধ্যাপক আবুল মনসুর 'হরিপুরা চিত্রমালা'র রেখার স্পন্দিত প্রাণময়তা ও পরিশীলিত শুদ্ধতাকে কালীঘাট পটুয়াদের রেখা থেকে পার্থক্য করে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী মন্তব্যে লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রশিল্পের আধুনিক আঙ্গিক সম্পর্কে নন্দলালের ভাবনাও আমরা ‘হরিপুরা চিত্রমালায়’ লক্ষ করতে পারি। আলো, ছায়া ও ছায়ের পর্যায়ের মাধ্যমে চিত্রতলে ত্রিমাত্রিকতার আভাস তৈরীর কোন চেষ্টা না করে চিত্রের তলকে চূড়ান্ত দ্বিমাত্রিকতায় প্রকাশ করবার আগ্রহ এখানে পরিস্ফুট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই চিত্রমালায় নন্দলালের ব্যাপক জীবনাগ্রহ, গভীর সামাজিক দায়িত্ব-চেতনা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। একদিকে রয়েছে এখানে আঙ্গিকের আধুনিক ও পরিশীলিত প্রয়োগ, অন্যদিকে সারল্যে ও স্বতঃস্ফূর্ততায় তা লোকচিত্রের মতই বিষয়ের মূল সত্যকে এবং দর্শকের সংবেদকে অতি সহজেই স্পর্শ করে। লৌকিক শিল্পের সহজতার সঙ্গে এখানে এসে মিলেছে আধুনিক মননের দীপ্তি।[১১৯]

বিশ শতকের অর্থনীতিকে ভিত্তি করে প্রখর বাস্তবের শিল্পরূপ হিসেবে নন্দলাল অঙ্কিত ‘বোলপুরের পথে’, বিহার সাঁওতাল পরগনার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের বর্ধমান গমন নামক চিত্রটিকে বাংলার উল্লেখযোগ্য চিত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন শোভন সোম। তাঁর মতে, মৃত্তিকাসংলগ্ন আনামা মানুষদের ছবিতে তুলে ধরে এ দেশের শিল্পভাবনাকে সমাজচেতনার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন নন্দলাল।’[১২০]

চিত্র ৬৯ : বোলপুরের পথে, টেম্পারা

নন্দলালের ছবির রীতিগত বিবর্তন সম্পর্কে শোভন সোম তিনটি কারণ দর্শিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় :

প্রথমত, কয়েকটি লক্ষণের নিরঙ্কুশ প্রয়োগের দ্বারা তিনি রীতিকে কোনো ছকে পর্যবসিত করেননি। দ্বিতীয়ত, পরম্পরা ও প্রকৃতির নিরন্তর সচেতন অধ্যয়ন তাঁর মৌলিক সৃষ্টির ভিত হবার কারণে গ্রহণ ও আত্তীকরণের প্রয়াস তাঁর মধ্যে অব্যাহত ছিল। তৃতীয়ত, . . . দেশিবিদেশি পরম্পরাগত বিচিত্র পদ্ধতির প্রত্যুজ্জীবন ও নবীকরণ ঘটিয়েছিলেন। . . . শেষদিকে তাঁর ছবিতে কি আঁকা হল-র পরিবর্তে কি করে আঁকা হল।দেখা দিতে থাকে। পদ্ধতি ও মাধ্যমগত পরীক্ষানিরীক্ষা তাঁর রীতিবিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত।[১২১]

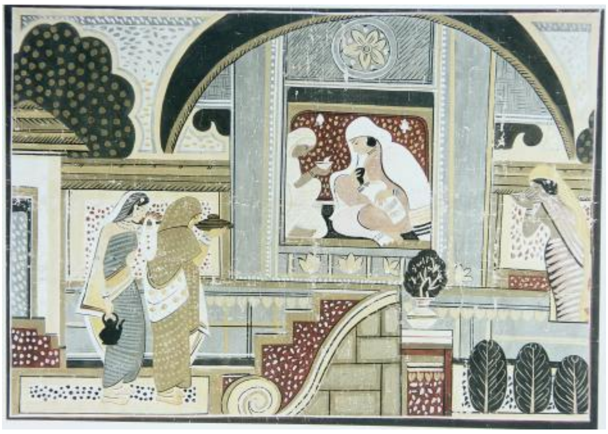

চিত্র ৭০ : শ্রীচৈতন্যের জন্ম, গ্রন্থাগারে জয়পুরী ফ্রেসকো

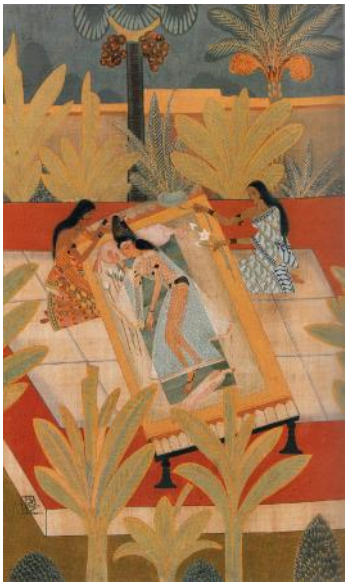

চিত্র ৭১ : রাধার বিরহ, সিল্কের ওপর টেম্পারা
৮২.৬ × ৪৯.৮ সেমি, ১৯৩৬

চিত্র ৭২ : বীণাবাদিনী
কাঠের ওপর টেম্পারা, ১৯২২

সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে :

> তাঁহার রচনার প্রশান্ত গাম্ভীর্য ও মানবীয় স্বরূপের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি এবং রূপ ও রেখার সাহায্যে এই অনুভূতি প্রকাশের সাফল্য ইত্যাদি বিবেচনা করিলে অজন্তা, মহাবলিপুরম্‌, এলোরা, এলিফ্যান্টা হইতে মিশর ও গ্রীসের ফিডিয়াস প্রমুখ অমর শিল্পী ও তাঁহাদের সহিত নন্দলালকে একাসনে স্থান না দিয়া পারি না। শিল্পসাধনার অর্থ বলিতে যদি বুঝি কোন বস্তুবিশেষের ধ্যানে সেই অনন্ত চিরসুন্দরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে ডুবিয়া যাওয়া এবং অন্যকে সেই রসের সন্ধান দেওয়া তবে নন্দলালের সাধনা সার্থক।[১২২]

বিনোদবিহারী তাঁর *চিত্রকথা* বইয়ে চিত্রমূল্যায়নে লিখেছেন, ‘সুদূর প্রাচ্যের শিল্পপরম্পরা থেকে তিনি আহরণ করেন তুলি-চালনার কৌশল। . . . ভারতীয় শিল্পপরম্পরা থেকে তিনি গ্রহণ করেন বর্ণবৈভব। রূপের আদর্শ ও চিত্রনির্মাণ-কৌশলের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ভারতীয় পরম্পরা ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের অপূর্ব সংযোগ।’[১২৩] একই প্রসঙ্গে শোভন সোমের মূল্যায়ন : ‘নন্দলাল ছিলেন সমন্বয়ের শিল্পী। জীবনের সঙ্গে শিল্পের সমন্বয়, প্রাচীনের সঙ্গে অর্থাচীন শিল্পের সমন্বয়, চারুকলার সঙ্গে কারুকলার সমন্বয় ও ব্যষ্টির দৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বদৃষ্টির সমন্বয় তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।’[১২৪] Pramod Chandra & Sonya Rhie Quintanilla তাঁদের æNandalal Bose and the history of Indian art” প্রবন্ধে লিখেছেন :

> There were a number of variations within the Nandalal’s style but in the whatever manner he chose to work, it fell well within the time-honored parameters of Indian astistic output. Although many of his paintings may not have the outward appearance or function of histrical works of Indian art, his methods and motivations were completely Indian. It is this that distinguishes Nandalal from other artists of his time, and it is why he is so important to the development of Indian art in the twentieth century.[১২৪/১]

প্রবাসজীবন চৌধুরীর ব্যাখ্যায় : “শিল্পের নৈতিকতা (Morality in art) বিষয়ক সমস্যার তিনি সহজই সমাধান করেছেন ‘সৎ-চিৎ-আনন্দে’র অপূর্ব সমন্বয়-বোধের দ্বারা। সচ্চিদানন্দে’র সম্যক বোধের আলোকে শিল্পের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁর কাছে হয়েছিল সুস্পষ্ট।”[১২৫]

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ

উপরিউক্ত আলোচনায় নন্দলাল বসুর শিল্পীজীবন, শিল্পকর্ম, শিল্পভাবনা ও বাংলার প্রাচ্যশিল্পে তাঁর অবদান নিয়ে যে আলোচনা ব্যক্ত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের যে বিষয়গুলো নজরে এসেছে তা সিদ্ধান্তাকারে উপস্থাপন করা হলো :

(১) নন্দলালের কাজে ভাস্কর্যসুলভ বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর কাজে কেন ভাস্কর্যসুলভ প্রভাব সে প্রসঙ্গে তিনি চিন্তামণি করের কাছে বলেছেন, 'আমিও গিয়েছিলাম আর্ট স্কুলে ভাস্কর হবার বাসনা নিয়ে। কিন্তু তখন ওখানে ভাস্কর্য শেখাবার মতো উপযুক্ত লোক কোথায়? ভাগ্যক্রমে এমন গুরু পেয়ে গেলাম [অবনীন্দ্রনাথ] যিনি শিখিয়ে দিলেন তুলিকে ছেনি করে ছবিতে ভাস্কর্য রচনার সাধ মেটানো কারিগরি। দেখতে পেয়েছ কি না জানি না।আমার প্রথম পর্বের ছবিতে তুলি রচনা করে গিয়েছে ভাস্কর্য রূপায়ণ।'[১২৬]

(২) সর্বপ্রকার কাজে রেখা ও আকৃতির (Line and form)-এর ওপর দক্ষতা ছিল। পোস্টকার্ডে করেছেন অসংখ্য ছোটো কাজ, আবার এগ টেম্পারায় করেছেন অতি বৃহৎ দেয়াল চিত্র।

(৩) বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী শিল্পীরা ইউরোপীয় রং ব্যবহার করে ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। নন্দলাল ভারতীয় অতীত ঐতিহ্যবাহী শিল্পীর ন্যায় হাতে তৈরি দেশি রঙে টেম্পারা চিত্রের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কাজে গেরিমাটি, এলামাটি, ভূষাকালি ও সবুজ পাথর ব্যবহার করেছেন।

(৪) দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপ্রবাহকে তিনি কাব্যপুরাণ উপাখ্যানের সিদ্ধরসে রূপান্তরিত করেছেন। অর্থাৎ সাধারণ জনজীবনের মানুষের ভঙ্গি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে উপাখ্যানের চরিত্রে চিত্রণ করেছেন।

(৫) চিত্রাঙ্গনে বিচিত্র বিষয় assimilate করেছিলেন। অজন্তা, রাজপুত ও দেশি পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। মোগল মিনিয়েচারের উজ্জ্বল রং, চায়নিজ ইঙ্ক ব্যবহার করে শক্ত লাইন, পার্শিয়ান পদ্ধতিতে তুলি কলমের কাজ, ভারতীয় ভাস্কর্যের আদর্শে অলংকরণ ইত্যাদি।

(৬) বাংলার নিসর্গকেন্দ্রিক অনেক ছবি এঁকেছেন ও অসংখ্য স্কেচ করেছেন।

চিত্র ৭৩ : মায়াবতী আসাম, কালি ও পেপার, ৬৯.৯ × ৪২.২ সেমি, ১৯৪২

(৭) তাঁর কাজে ইমারতি গুণ বিদ্যমান। এজন্য ছোটো কাজগুলোতেও বিরাটত্বের আবেদন আছে।

(৮) দৃশ্যচিত্রে আকর্ষণ কম। কম্পোজিশনের রহস্যে, আলংকারিক কলাকর্মে, কম্পোজিশনের বিন্যাস কৌশলে তাঁর কাজে পরিপ্রেক্ষিত বর্জিত হয়েছে।

(৯) রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় বাস্তবধর্মী দৃশ্যসজ্জার পরিবর্তে তিনি রঙের ছন্দোময় বিন্যাস যোজনা করেছেন এবং শান্তিনিকেতন অনুষ্ঠান সজ্জার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বহিঃপ্রকৃতিকে যুক্ত করেছেন।

(১০) সমসাময়িক শিল্পীরা বীরদের প্রতিকৃতি এবং ভাস্কররা বীরদের মূর্তি করতেন। নন্দলাল তাঁর কাজে সাধারণ মানুষের চিত্র তুলে ধরে শিল্পভাবনাকে সমাজচেতনার সাথে যুক্ত করেছিলেন।

(১১) তিনি জাপানি শিল্পতাত্ত্বিক ওকাকুরার প্রকৃতি, পরম্পরা, স্বকীয়তা নীতি বিশ্বাস করে চিত্রে এই গুণের সমন্বয় করতে প্রয়াসী ছিলেন।

(১২) তিনি জাতীয়তাবোধের কারণে পাশ্চাত্যের ধরন-ধারণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

(১৩) প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্পবৈভব থেকে সচেতনভাবে গ্রহণ-বর্জন করেছেন। প্রয়োজনটুকু গ্রহণ করেছেন প্রাচ্যভাবনায় জারিত করে; অপ্রয়োজনে প্রভাবমুক্ত থেকে বর্জন করেছেন।

(১৪) শিল্পশিক্ষা ছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশে যৌথ জীবন ও কর্মের ভেতর দিয়ে একাত্মবোধের পরিবেশ গড়ে তোলার বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর শিক্ষকতার ধরন।

(১৫) তাঁর চিত্রে স্বকীয়তা এবং ভারতীয়ত্বIএকই সঙ্গে এ দুইয়ের প্রকাশ থাকত।

(১৬) বাংলার বিপ্লবপন্থী দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে মহাত্মাজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ঘটেছিল। এ ছাড়া রাজবিদ্রোহ এবং বিদেশি পণ্যবর্জন বিষয় প্রচারের জন্য বলিষ্ঠ রেখায় পাঁচটি কার্টুন জাতীয় রেখাচিত্র এঁকেছিলেন, যা অন্যরা লিনোতে কেটে ছেপে দিয়েছিলেন। এই চিত্রের প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাতমোহনের ব্যাখ্যা : পৃথিবীর কার্টুন চিত্রের ব্যাখ্যায় এসব চিত্র ছিল প্রথম শ্রেণির কার্টুন।[১২৭]

(১৭) বাংলার প্রাচ্যশিল্পের রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলনের সময়। সেক্ষেত্রে, কারুশিল্পের জাগরণ রেনেসাঁর একটা দিক। নন্দলাল পৌরাণিক ছবিতে মানুষের আদল দিয়েছেন। যা বাংলার রেনেসাঁর একটা লক্ষণ।

(১৮) বহু কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক ছিল। এঁদের মধ্যে আছেন আব্দুল গফ্ফর খাঁ, জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন দত্ত, সকুমার রায়, গুরুদয়াল মল্লিক, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, পার্শিয়ান স্কলার জিয়াউদ্দীন প্রমুখ।

(১৯) প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী হয়েও ভিত্তিচিত্র, মাটির মূর্তিগঠন, কাঠখোদাই, চামড়ার কাজ, বাটিক, আলপনা, বয়নের নকশা, উডকাট, লিথোর কাজ, এচিং; মঞ্চসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা; স্থাপত্য; অলংকরণ প্রভৃতি শিল্পকর্মে দক্ষ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৭৪ : নটী, ব্রোঞ্জ, ২৯.২ × ১৩.৭ সেমি, ১৯৪৩

(২০) নন্দলালের অধিকাংশ ছবির বিষয় অনৈসলামিক।

(২১) সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় ট্রামে ডানা কাটা শঙ্খচিলকে সেবা করার সময় থেকে পশুপাখির প্রেমে পড়ে পরবর্তীকালে মেনী বাঁদর, খরগোশ, বেজি, মুনিয়া, সাদা ঘুঘু; কৈ-মাগুরসহ নানান মাছ পুষেছেন।

(২২) বর্ণ-উজ্জ্বল প্রকৃতির মোহিনীরূপ অপেক্ষা রূপের বৈচিত্র্য, গতি ও স্থাপত্যসুলভ নির্মাণ নন্দলাল-রচিত শিল্পের বৈশিষ্ট্য। এই কারণে তাঁর তুলিতে বর্ণ অপেক্ষা রেখার শক্তি অধিক।[১২৮]

(২৩) বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন রকম বিদেশি শিল্পীদের সান্নিধ্যে পেয়েছেন তিনি। তাঁদের ভিন্নধর্মী কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঋদ্ধ হয়েছেন।[১২৯]

(২৪) ইউরোপীয় পাশ্চত্য শিল্প আন্দোলন ও তার পথের সন্ধান রাখতেন। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পাশ্চত্য শিল্পীদের শিক্ষা-অভিজ্ঞতা, তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছেন।

(২৫) বিভিন্ন মাধ্যমে কাজে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় রেখেছেন। তিনি জমিন ও চিত্রের বিষয় অনুসারে আঁকার রীতির পার্থক্য করেছেন। কখনো জমিনে আঠা লাগিয়ে ধাতুচূর্ণ ছড়িয়েও ছবি এঁকেছেন।

(২৬) হাজার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যের দেশজ শিক্ষারীতি পর্যবেক্ষণ করেছেন, আত্মস্থ করেছেন। তাই তাঁর কাজে বহুমাত্রিক মাধ্যম ও কারিগরি দক্ষতার ছাপ বিদ্যমান।

(২৭) চাল, ডাল, তিল, সর্ষে দিয়ে আলপনা সৃষ্টি করে আলপনা অঙ্কনে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। কখনো ফুল লতা-পাতা, ফুলের পাপড়ি ব্যবহার করেছেন আলপনায়। নাটকের পরিচ্ছেদ সজ্জায় প্রাকৃতিক উপাদান ও অভিনেতার গহনা সাজাতেও প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই রীতি প্রাচ্যরীতির মিথলজিকাল ইতিহাসের সাথে সংগতিপূর্ণ।

(২৮) তাঁর শিক্ষাদানের চমৎকারিত্বে বিভিন্ন দেশ-বিদেশ ও ভাষাভাষীর শিক্ষার্থীরা ধন্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিনয় কৃষ্ণ মাসোজী, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ইন্দ্র দুগার, কে.জি সুব্রহ্মণ্যন, দিনকর কৌশিক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

(২৯) চীন, জাপান, মিশরীয় আসিরীয়, গ্রিক, বাইজানটাইন রীতির অনুশীলন করেছেন। এবং গ্রহণ করেছেন স্বদেশি ঐতিহ্যের ধারাকে অক্ষত রেখে।

(৩০) স্বদেশ চেতনার সত্তা নিহিত ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু এই সত্তা বিশেষ কোনো কালের সীমায় সীমিত হয়নি। অর্থাৎ তাঁর কাজে স্বদেশ চেতনা কালোত্তীর্ণ ছিল।

(৩১) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বসতবাড়িগুলোর স্থাপত্যরীতি ছিল বিচিত্র ও অভিনব। নন্দলালের পরিকল্পিত নতোন্নত ভাস্কর্যে সজ্জিত হয়েছে এই স্থাপত্য।

(৩২) ছাত্রদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। সকল সামাজিক কাজে তিনি থাকতেন সকলের সামনে। ছাত্রদের জন্মদিনে ছবি এঁকে দিতেন। বিভিন্ন উৎসবে তাঁদের সচিত্রিত চিঠি পাঠাতেন, উপদেশ দিতেন, সাহায্য করতেন।

(৩৩) ভারতীয় সংবিধানে মূল প্রতিলিপি অলংকৃত করেছেন। এই অলংকরণে তিনি দেশীয় আঙ্গিকের অনবদ্য ব্যবহার করেছেন। এই অলংকরণে দেশি পদ্ধতির পাথুরে রং ও সোনার তবক ব্যবহার করেছেন।

(৩৪) প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষণ করতেন গভীর নিবিষ্ট মন নিয়ে এবং সেখান থেকে শিল্পের রসদ গ্রহণ করতে পারতেন। তার প্রমাণ আছে ৩–৪–১৯৪৫ সালে ইন্দুলেখাকে লিখিত পত্রে : 'এবার উত্তরায়ণের বাগানে অশোক ফুল এসেছে। যেন রাজার ঘরে রাণী এসেছে। দূর থেকে একবার উঁকি মারি। আর কত নূতন ফুল রথীবাবুর বাগানেIযেন মেম সাহেব মিহি গলায় কথা কয়। সব ভাষা বুঝি না। বেল, যুঁই সব হাত ধরাধরি করে সারি নৃত্য সারা রাত্তির জুড়ে দিয়েছে।'[১৩০]

(৩৫) সব ধরনের চিত্রে সাইন (নিজের স্বাক্ষর) ব্যবহার করতেন চিত্রের অংশ হিসেবে।

(৩৬) নন্দলালের নকশার জ্ঞান এবং তাঁর কাজে বাস্তবধর্মীয় গুণ অবনীন্দ্রনাথের কাজ থেকে ভিন্নতা ও স্বকীয়তা দিয়েছে।[১৩১]

(৩৭) তাঁর চিত্তে তিনি স্বাক্ষর করেছেন উলম্বভাবে (Vertically) এবং চায়নিজ হরফের ধরনে বাংলা অক্ষর লিখেছেন। স্বাক্ষরের সাথে যুক্ত করেছেন লাল রঙের সিল।

(৩৮) তিনি অতি দক্ষতার সাথে জাপানিজ (Haboku) এবং চাইনিজ সুমি-ই (Sumi-e) পদ্ধতিতে কাজ করেছেন।

(৩৯) তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা কম হলেও এর মধ্যে রয়েছে গভীর ও ব্যাপক তত্ত্বজ্ঞান।

(৪০) উদাহরণ দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতেন বেশি। তাঁর শিক্ষাকতার ধরন সমসাময়িক সময়ে যেকোনো শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আলাদা ছিল।

(৪১) স্বল্প সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাজ দেখে মনে হতো করণ-কৌশলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সিল্ক পেইন্টিং, তিব্বতিয়ান থাঙ্কা পেইন্টিং, ইজিপশিয়ান

ম্যানারিজম, কাংড়া, বাসুলি, জাপানি হাবাকু, চায়নিজ সুমি-ই যে পদ্ধতিতেই কাজ করেছেন অনায়াসে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

(৪২) প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার প্রাণ রেখা।তাঁর কাজে মুখ্য ব্যবহার। অজন্তা, বাগ, পার্শিয়ান চঞ্চল, ছন্দোময় রেখার ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে অভিব্যক্তি ও গতি বোঝানোর জন্য বিভিন্ন রকম লাইনের সদর্থক ব্যবহার করেছেন, যাতে বস্তু ও বিষয়ের অনুভূতি সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে।

বিশ

উপরিউক্ত আলোচনায় যে বিষয়গুলো সকলের দৃষ্টি কেড়েছে তার আলোকে বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারায় নন্দলালের অবদান সিদ্ধান্তাকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে :

(১) এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নন্দলাল সর্বপ্রথম শিক্ষা-ভ্রমণ চালু করেছিলেন।

(২) বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতে আলংকরিক শিল্পে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। নন্দলাল সেই লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার করেছেন।

(৩) শিব চিত্র, হরিপুরা পোস্টার চিত্র, পোস্টকার্ড চিত্র, স্কেচ চিত্র, দেয়াল চিত্র (মুরাল), কোলাজ চিত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এসব মাধ্যমকে বাংলার চিত্র চর্চায় স্থায়ী ভিত তৈরি করে দিয়েছেন।

(৪) বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলা বিকাশ ও বিস্তারে প্রচলিত মাধ্যম ছাড়াও ছাপচিত্র ও ভিত্তিচিত্র মাধ্যমকে সমৃদ্ধ করতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

(৫) তেলরং সম্পর্কে আপত্তি ছিল না। শুধু খরচের দিক বিবেচনা করে নিজে এই মাধ্যমে কাজ করেননি। এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।[১৩২]

(৬) দীর্ঘ শিল্পীজীবনে সতীর্থ সহকর্মী ও শিল্পানুরাগীদের প্রশ্নের উত্তরে, চিঠিপত্রে, ঘনিষ্ঠজনদের সাথে আড্ডায়, নিজের লেখায় ও সংগ্রহে শিল্পের নানান সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায় তাঁর স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়, দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তের প্রকাশ ঘটেছে, যা ভারতীয় আধুনিক শিল্পের দর্শন হিসেবে পেয়েছি আমরা।

(৭) কেন্দুলি মেলার জনসেবা থেকে নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের জনসেবায় নিয়োগ করতে শুরু করেন। কেন্দুলি মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার এবং অন্য শিক্ষকদের নিয়ে ছায়াচিত্র সহযোগে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সম্পর্কে সচেতন করতেন।[১৩৩] এ ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেবার হাত বাড়িয়ে তাঁর ছাত্রদের দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক করে তোলার শিক্ষা দিতেন।

(৮) সমকালীন আর্ট স্কুলের শিক্ষায় কৃত্রিম আলোয় প্রাকৃতিক উপাদান সাজিয়ে নকল করার প্রবণতা ছিল। নন্দলাল জীবনকে আয়ত্ত ও স্টাডি করানোর জন্য কৃত্রিম পদ্ধতির পরিবর্তে ছাত্রদের মুক্ত ও স্বাভাবিক পরিবেশ স্টাডি করানো প্রচলন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) শিল্পশিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের প্রাণবেগকে সচল রাখার জন্য শিক্ষাভ্রমণ, চড়ুইভাতি, মেলায় ছবি আঁকা, কৌতুক, সংগীত, চিঠি লেখা প্রচলন করেছেন। এ ছাড়া স্টুডিয়োভিত্তিক কাজ, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, সাহিত্য সভা, বক্তৃতা সভা এবং উৎসবসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে ছাত্রদের প্রাণবেগকে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

(১০) অবনীন্দ্রনাথের বাংলা ঘরানা চিত্রকলাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল। কলাভবন প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৯–১৯৩০ সালের মধ্যে নন্দলাল শান্তিনিকেতন শিল্পশিক্ষায় মূর্তিকলা, ভিত্তিচিত্র, ছাপচিত্র, কারুশিল্প বিষয়গুলো যুক্ত করে বাংলার প্রাচ্যশিল্পকে সমৃদ্ধতায় বিস্তৃত করেছিলেন।

(১১) কলাভবনে শিল্পের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন, যা ভারতের অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছিল না।

(১২) বাংলায় প্রাচ্যরীতির পুনরুজ্জাগরণ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ করেছেন Academisian হিসেবে।

(১৩) এদেশে নন্দলালই প্রথম অনুভব করেছিলেন শিল্পের সঙ্গে সমাজের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।[১৩৪] এজন্য শিল্পকে তিনি সাধারণের উপভোগের সীমার মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছেন।

(১৪) নন্দলালের শিষ্যত্ব, সান্নিধ্য ও ভাব বিনিময়ের প্রেরণায় শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে গড়ে উঠেছিল নতুন ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, দিনকর কৌশিক, কে জি সুব্রহ্মণ্যন অন্যতম।

(১৫) নন্দলালের স্কেচ খচিত পত্র।পত্র-ইতিহাসের নতুন আবিষ্কার।

(১৬) নন্দলালের স্কেচচিত্র বিশ্ব শিল্প ইতিহাসে অনন্য। পোস্ট কার্ডের লেখার পাশে চিত্র কিংবা অপর পাশের চিত্র লোকশিক্ষার লোকসংগীত ও লোকসাহিত্যের মতো ভূমিকা রেখেছে।

(১৭) তিনি গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, বাংলার দেশি চিত্রবিদ্যার শেকড় খুব পুরাতন কালের, যা দীপময় ভারতেও বিস্তৃত ঘটেছিল।[১৩৫]

(১৮) দেশভ্রমণ, ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ প্রদর্শনী, বক্তৃতা, বিনোদন করা ও সমাজসেবাকে তাঁর শিক্ষানীতিতে সংযুক্ত করেছিলেন।

(১৯) নন্দলাল প্রতিটি ছাত্রকে প্রতিটি মাধ্যমে হাতেকলমে শেখার ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা থেকে পরিণতকালে নিজের প্রধান মাধ্যমটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শোভন সোমের মতে, 'এই স্বাধীনতা সারা পৃথিবীতে শিল্পের ছাত্রকে নন্দলালই প্রথম দিয়েছিলেন।'[১৩৬]

(২০) নন্দলাল যেমনটি বলেছেন (১৯৪২–১৯৬৬) তেমন উপস্থাপন করে পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন ৪ খণ্ডে *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। এই গ্রন্থে নন্দলালের শুধু জীবনী নয়, প্রাচ্যরীতির শিল্প, বাংলা ঘরানার শিল্প, বিচিত্রাসভা, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, শান্তিনিকেতন কলাভবনসহ প্রাচ্যশিল্পের ধারার বিভিন্ন ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যা বাংলার প্রচ্যশিল্পের ইতিহাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(২১) নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার শান্তিনিকেতন পর্বে নন্দলাল সাহিত্যনির্ভর চিত্রের সাথে প্রকৃতি ও সাধারণ জীবনের সংযোগ চিত্রে আলংকারিক সজ্জায় আকৃষ্টতার দিকে সংযুক্ত করেছেন। এ ছাড়া দৃশ্যপ্রধান চিত্র, অনুভবের আনন্দলাভের চিত্র প্রভৃতি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন।

(২২) সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অনেকে শিল্পকলা এবং পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী। এই উদ্যোগের পথিকৃৎ নন্দলাল, যা তিনি রবীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জায়, কংগ্রেস সভামণ্ডপ সজ্জায়, ভিত্তিচিত্র এবং শান্তিনিকেতন পরিবেশ ব্যবস্থার কাজের মধ্যে দেখিয়েছেন।

(২৩) শান্তিনিকেতনে ১৯২২-২৪ সালের দিকে নিয়মিত আসর বসিয়ে শিল্পশাস্ত্রের নিয়মিত চর্চা শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত হওয়ারয় ভারতশিল্পের মৌলিক আবেদনে পৌত্তলিকতার আদর্শ, পুরাণ-প্রবচন প্রভৃতি পরম্পরাগত ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যবহারিক পরিচয় ছিল না। এই তত্ত্বগরিষ্ঠ ধারাবাহিক ভারতশিল্পকে এ যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে নন্দলাল ছিলেন অদ্বিতীয়।[১৩৭]

(২৪) গ্রামীণ শিল্পীর ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন কারুশিল্পীগোষ্ঠীর কারিগরদের শান্তিনিকেতনে সমাদর করে ডেকে আনতেন। ফলে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-শিক্ষকরা তাঁদের বংশগত করিগরি বিদ্যার বিভিন্ন দিক নানা কাজে ব্যবহার করতে পারতেন। পক্ষান্তরে পুরাতন আদর্শের সন্ধান পেয়ে এবং শান্তিনিকেতন সংস্কৃতির সম্পর্শ পেয়ে তাঁদের পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে পারতেন।

(২৫) বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের সাজগোজের ধারায় অনাড়ম্বর ও সংযত রুচির প্রকাশে যে সহজ সৌন্দর্য প্রচলিত হয়ে আসছে তার প্রধান রূপকার নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথের নাটক, নৃত্যনাট্যর মঞ্চসজ্জা ও পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় সৌন্দর্য ও রুচির যুগান্তকারী পরিচয় দিয়েছেন।

(২৬) নন্দলালের প্রতিভার বড়ো দিক হচ্ছে অতি সামান্য তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারতেন। কংগ্রেসের কাজে, শান্তিনিকেতনের উৎসবের অনাড়ম্বর সাজসজ্জার দেশবাসীকে সেই শিক্ষাই দেখিয়েছেন যে, সৌন্দর্য সৃষ্টি ব্যয়বহুল কাজ নয়।[১৩৮] এভাবে নন্দলাল দেশবাসীর চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়ে দেশসেবার কাজ করেছেন।

(২৭) নন্দলাল এবং তাঁর আত্মীয় ও সহকর্মী সুরেন্দ্রনাথ কর গ্রামীণ সস্তা মাল-মশলা দিয়ে সভা ও তোরণ সাজাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে প্রমাণ করেছেনI দেশীয় প্রথায় সভাস্থল সাজানো যায়। এই প্রথা ভারতবর্ষের শিল্পের বিশেষ দিক হিসেবে ভারতবর্ষের চারদিকে ছড়িয়েছে।

(২৮) নন্দলাল একই সঙ্গে ধ্রুপদী এবং লোকায়ত শিল্পী। তাঁর অভিজ্ঞতার বড়ো দিক তিনি কারুশিল্পী ও মণ্ডনশিল্পী। তাঁর অবদানে অনেক মণ্ডনশিল্পী ও কারুশিল্পী বিশেষ পারদর্শী হয়ে ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন।

(২৯) তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন নিচের স্তর থেকে নন্দনচর্চার প্রক্রিয়া সচল না থাকলে উচ্চতর শিল্পকর্ষ সাধনার স্বপ্ন নিষ্ফল। এজন্য আজীবন জীবন নির্বাহে শিল্পরুচির প্রতি সচেতন ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মণ্ডনশিল্পে আগ্রহী করার জন্য 'মণ্ডন শিল্প' প্রবন্ধে শিল্পের মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

(৩০) প্রাচ্যচিত্ররীতির নির্দিষ্ট লক্ষণকে চিত্রচর্চার রীতি হিসেবে আঁকতে চেয়েছিলেন। সতত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরম্পরা ও প্রকৃতির সচেতন অধ্যয়ন, দেশি-বিদেশি পরম্পরাগত বিচিত্র পদ্ধতির প্রত্যজ্জীবন ও নবীকরণ ঘটিয়ে বাংলার চিত্রচর্চার আধুনিকতার সমস্যা সমাধান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩১) পরম্পরাগত আলপনা শিল্পের রীতি বজায় রেখে সেখান থেকে ধর্মীয় প্রতীকগুলো বাদ দিয়ে প্রকৃতিনির্ভর প্রতীকের সাহায্যে আলপনাকে এক ঐহিক রূপ দান করেছিলেন তিনি, যা পরবর্তীকালে নানান উৎসবে সারা দেশ গ্রহণ করেছে।

(৩২) তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও নাটকের চমৎকার চিত্ররূপ দিয়ে জীবন্ত করে রেখেছেন।

(৩৩) তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ফলে সমগ্র দেশজুড়ে শিল্পচর্চার এক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

(৩৪) রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, রামকৃষ্ণের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত বিবেকবোধ ও সহজ সুন্দর জীবনবোধের শিক্ষা নিজে যেমন ধারণ করতেন তেমনি তার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন আদর্শে বিলিয়ে দিয়েছেন।

(৩৫) সর্বপ্রকার ভারতীয় চিত্রকলার (ফ্রেসকো, বাংলার পট) ও চীন-জাপান চিত্রকলা (ক্যালিগ্রাফি) হাতে-কলমে রপ্ত করেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে শিখিয়ে বাংলার প্রাচ্যরীতির চলমান ধারাকে সাবলীল করেছেন।

(৩৬) বলিষ্ঠ অথচ ছন্দোময় সাবলীল রেখা অঙ্কনে নন্দলাল বসু আধুনিক চিত্র ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন।

(৩৭) মহাত্মা গান্ধীর সাথে নন্দলালের সম্পর্কের কারণে ভারতীয় রাজনীতি ও শিল্পের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। রাজনীতির কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিল্পরুচির বিস্তার ঘটিয়েছেন।

(৩৮) ভারতের ঐতিহ্যবাহী ভিত্তিচিত্রের পুনঃপ্রচলন করে বাংলার প্রাচ্যচিত্ররীতির নতুন বিপ্লব ঘটিয়েছেন। ভিত্তিচিত্রের কাজে তিনি ভারতীয় পরম্পরার শিল্পকে আধুনিকতায় উদ্ভাসিত করেছেন।

(৩৯) রামকৃষ্ণ মিশনের নানা বইয়ের প্রচ্ছদ একে দিয়েছেন; বেলুড় ও কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির; বাগবাজারে মাতৃমন্দির ও নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও রূপসজ্জায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।[১৪৯]

(৪০) নিবেদিতার Myths and Legends ও অন্যান্য বইয়ের অনেকগুলো ছবি এঁকে দিয়েছেন। এসব বইয়ের মাধ্যমে বাংলার প্রাচ্যরীতির চিত্র বিশ্বের বিভিন্ন মহলে পৌঁছেছে।

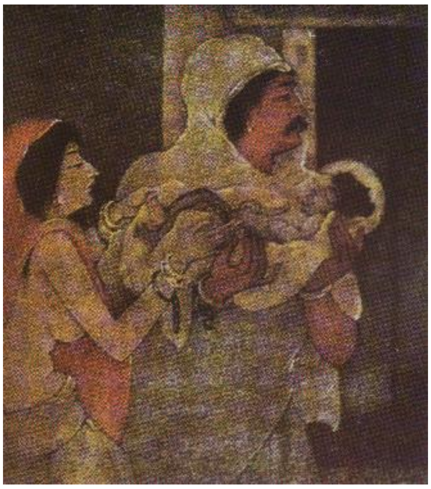

চিত্র ৭৫ : নিবেদিতার 'মিথস' বইয়ের জন্য নন্দলালকৃত 'মথুরার কারাগারে সদ্যোজাত কৃষ্ণ'

Dhaka University Institutional Repository

(৪১) রবীন্দ্রনাথের কাছে নন্দলাল বসু সুন্দরের রসদ গ্রহণ করে এত বিকশিত হয়েছেন যে ঋণী থাকেননি। পক্ষান্তরে নন্দলালের অনেক চিত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা-সংগীত রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। নন্দলালের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে ছবি এঁকেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে নন্দলাল তাঁর মাধ্যম বদলাননি। এই বিচারে একমাত্র নন্দলালই রবীন্দ্রনাথের ওউপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[১৪০]

(৪২) বাংলার অলংকরণ শিল্পাIআলপনা, ছাঁচের কাজ; গ্রহ ও দেহ প্রসাধনের কাজে তাঁর অবদান অসামান্য।

(৪৩) বেদ-পুরাণের মতো ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ চারুকলার (অজন্তা, মোগল, রাজপুত) বিরাটত্বের কথা সারা ভারতবর্ষে প্রচার করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে।

(৪৪) জাপানিদের ফুল সাজাবার পদ্ধতিকে কলাভবনে জনপ্রিয় করেছেন।

(৪৫) নন্দলাল তাঁর ছাত্র-ছাত্রী এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের বোঝাতে পেরেছিলেনIভারতশিল্পের অগ্রগতি চিহ্নিত করা যায় ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের চলমানতা দ্বারা, যেখানে ভারতশিল্প বার বার দেশ-বিদেশের টেকনিক ও মাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ভারতশিল্পীকে বৈদেশিক উপাদান গ্রহণের পূর্বে ভারতশিল্পের বিষয়, টেকনিক, ইতিহাস এবং অধ্যাত্মিক মতবাদ জেনে নেয়া প্রয়োজন।

একুশ

উপসংহার

ভারতের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে নন্দলাল সর্বাধিক ছবি এঁকেছেন। তাঁর খ্যাতি ও বিস্তৃতি তাঁর জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ ও উপমহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট সারা দেশ থেকে সংগ্রহ করে ৬৭৪৪টি ছবি (৯টি ওয়াশ, ১১৮টি টেম্পারা, ১১৯৪টি জলরং, ৪৫৬৮টি ড্রয়িং, ৫২টি লিনোকাট, ৭টি লিথোগ্রাফ, ৪০টি ড্রাইপয়েন্ট)[১৪১] সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহ থেকে নির্বাচিত কাজ নিয়ে ভারতে ও বিদেশে প্রদর্শন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে নন্দলালের খ্যাতি ও বিস্তৃতি এশিয়ার বাইরে ইউরোপে তথা বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্রজীবনে নন্দলাল *প্রবাসী* ও অন্যান্য পত্রিকায় ছাপানো পাশ্চাত্যের চিত্রগুলো কপি করেছেন। অর্থাৎ শিল্পশিক্ষায় শুরুর দিকে ড্রয়িংIপাশ্চাত্যের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রিত ছবি থেকে অনুকরণ করেছেন। পাশ্চাত্য চিত্রকলা বিষয়ক সচেতনতা তাঁর ছিল। বিশ্বভারতীতে বিচিত্র চরিত্রের পাশ্চত্য শিল্পীরা এসেছেন কিংবা বহির্ভারতের অনেক শিল্পীরা শান্তিনিকেতনে পাশ্চাত্য ঘরানায় কাজ করেছেন নন্দলাল সেখান থেকে করণ-কৌশলের গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

নন্দলাল পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির প্রতি সচেতন ছিলেন, যার প্রমাণ আছে ১১৮ পাতার সংকলনে। এই সংকলন তিনি করেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মহান শিল্পীদের জীবনী ও কাজ সম্বন্ধে প্রবন্ধ থেকে। শিল্পের করণ-কৌশল, ধ্যান-ধারণা, গতি-প্রকৃতি বিষয়ক সংগ্রহের মাঝে মাঝে নিজের ভাবনার কথাও লিখেছেন।[১৪২]

Dhaka University Institutional Repository

নন্দলাল ভারত সংস্কৃতির বিবর্তন ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে ছিলেন সুদক্ষ। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারতীয় শিল্পের মূল নীতি আশ্রয় করেই আধুনিক রুচির ছবি করা সম্ভব। এজন্যই তিনি তাঁর কাজে পাশ্চত্যের লোভনীয় সস্তা আধুনিকতাকে বর্জন করে আবহমান দেশীয় শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে আধুনিকতার দিকে এগিয়েছেন। তাঁর কাজ সুস্পষ্ট; জটিল ও দুর্বোধ্য ভাবমুক্ত। নিজস্ব মৌলিকতায় দেশীয় চরিত্রের এই কাজ বাংলায় প্রাচ্যকলারীতিকে নতুন ভাবসম্পদ দান করেছে। তাঁর ছবিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয়ত্ব একই সাথে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর শিল্পকলার ধরন-ধারণ ভারতীয় হলেও এর প্রকাশ আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বজনীন।

তাঁর সৃষ্টিতে পূজারির শুচিতা ও নিষ্ঠা খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক ভারতবাসীকে জেনেছেন, গুপ্তসম্রাটের স্বর্ণযুগের ভারতবর্ষকে চিনেছেন, এশিয়ার ইউরোপের শিল্পসাধনার পদ্ধতি ও ইতিবৃত্তকে অধিগত করেছেন, গ্রামীণ লোকজ শিল্পভাষার পাঠ নিয়েছেন। জীবনের রূপকে দরদ ও শ্রদ্ধাভরে প্রত্যক্ষণ করেছেন। তাঁর কাজ অতি-আধুনিক কাজের মতো নয়, পরিপূর্ণ বিমূর্ত নয়, নতুন পরীক্ষামূলক নয়, কিংবা কোনো মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। চলমান শিল্পীদের সাথে সাজুয্য ছিল না।[১৪২/১] কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। এই ভারতীয়তা তাঁর কাজের সীমিত পরিচয়। বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি যে অনায়স চর্চা করেছেন তা আধুনিক।

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যা জীবন বিকাশের সহায়ক চর্চা হিসেবে প্রবর্তন করেছেন। ১৯১৯ সালে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে যোগদানের পর শান্তি-নিকেতনকে অভিনব শিল্পশিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। এই শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় ভাব ভাষা ও প্রাণসত্তাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা ভারতবর্ষের অন্য কোনো আর্ট স্কুলের শিক্ষাধারায় সম্ভব হয়নি। ফলে বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারায় শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছিল শিল্পশিক্ষার আদর্শ কেন্দ্রস্থল।

প্রাচ্য সংস্কৃতির গভীর অনুসন্ধানের ফরে তাঁর অন্তর্দষ্টি হয়েছিল গভীর। ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন স্বল্পভাষী ও চিন্তাশীল। এজন্যই তাঁর চিত্রকর্মে সংযম ও আতিশয্যহীনতা লক্ষণীয়। বিনয়, আত্মমর্যাদাবোধ, দয়া, ঔদার্য ও সাহসের মেলবন্ধনে তাঁর ব্যক্তি চরিত্র গঠিত ছিল। তিনি যেমন একজন ভালো শিক্ষক তেমন একজন ভালো পিতাও ছিলেন। পুত্র বিশ্বরূপ বসু, মেয়ে গৌরী দেবী ও যমুনা দেবীকে শিল্প পথের পথিক করে গড়ে তুলেছেন, যাঁরা শান্তিনিকেতনে তাঁর সহকর্মী হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন।

নন্দলাল শিল্পীজীবনের যাত্রাপথে বার বার নিজেকে অতিক্রম করেছেন। সৃষ্টির বিচিত্রতায়, গতিময়তায় ও বেগময়তায় সমৃদ্ধ করেছেন বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারাকে। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মহিমা প্রকাশ করে দেশমাতৃকার আত্মার নিগূঢ় সত্য রূপ ও আদর্শ প্রকাশে তিনি অবনীন্দ্রনাথকেও হার মানিয়েছেন।

তিনি ছিলেন সমন্বয়ের শিল্পী। শিল্পকে জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। প্রাচীন অর্বাচীন, দেশি-বিদেশি সকল বিষয় এবং মাধ্যমকে সমন্বিত করেছেন। চারুকলার সাথে কারুকলার সমন্বয় করেছেন। প্রাচ্য শিল্পের ভিত হলো শিল্পীর হৃদয়ে অনুভূত জীবনের প্রাণছন্দ। তাই চাক্ষুষ সত্যের পরিবর্তে বস্তুর অভ্যন্তরীণ সত্যরূপ প্রকাশ করেছেন তাঁর কাজে। শিল্পতীর্থক্ষেত্রে নিত্যপথিকের অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বপ্রকৃতিকে। বাংলার প্রাচ্যশিল্পকে জাগ্রত করার জন্য তাঁর সংকল্প ছিল দৃঢ়। এই খ্যাতি, নিন্দা, বিত্ত-বৈভব কোনো কিছুই তাঁকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে তিনি গ্রামীণ জনজীবন চিত্র বার বার এঁকেছেন।[১৪৩]

সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র সব কিছুর ওপর ছিল তাঁর দখল। প্রাকৃতিক উদার পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও শান্তিনিকেতনের এসব বিষয়ে তাঁর গভীর অধ্যয়ন হয়েছিল। ফলে উপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলের কারিগরি শিক্ষাকে শিক্ষার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে শান্তিনিকেতন শিক্ষাধারায় শিল্পের তত্ত্বগত ও তথ্যগত শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন, যা আধুনিক শিল্পশিক্ষা ধারায় এক মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

অতএব বলা যায়, বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারা বিকাশে নন্দলাল বসু অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করেছেন।তাঁর শিল্পে ও কর্মে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শোভন সোম, "শিল্পের আধুনিকতা ও বাংলার শিল্পস্বাতন্ত্র্য", *দেশ* ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ২২, পৃ. ৪১–৪৯

২. ইন্দ্র দুগার, "ভারতীয় শিল্পে ঐতিহ্য ও অতিআধুনিকতা", দ্র. রঞ্জনকুমার দাস (সম্পা.), *শনিবারের চিঠি : শিল্প ও শিল্পী।সংখ্যা*, কলকাতা, নাথ, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ৬১

৩. নন্দলাল বসু লিখিত "ভূমিকা", দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড

৪. কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বাংলায় রুবাইয়াৎ ওমর খইয়ম অনুবাদ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

৫. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২

৬. প্রাগুক্ত

৭. দিনকর কৌশিক, *নন্দলাল বসু : ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*, বাংলা অনুবাদ : শোভন সোম, ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৫, পৃ. 7 ও পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. 53

৮. পঞ্চানন মণ্ডল, পৃ. ৬০

৯. Jaya Appasamy, *Abanindranath Tagore and the art of his times*, New Delhi, Lalit Kala Academi, 1968, P. 53

১০. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, আগস্ট ১৯৯৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮৯

১১. দিনকর কৌশিক, পৃ. 46

১২. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২

১৩. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নন্দলালকে সংস্কৃত পড়াতেন।

১৪. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, আগস্ট ১৯৯৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯১

১৫. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

১৬. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭–২১৮

১৭. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

১৮. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২২–১২৪

১৯. দিনকর কৌশিক, প্রাগুক্ত, পৃ. 19–20

২০. কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কোলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৮৯

২১. সত্যজিৎ চৌধুরী, *নন্দলাল*, ১ম সং, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮ [প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৮৮], পৃ. ৩৫, ৩৮

২২. প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "দেশপ্রেমিক নন্দলাল", দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, অক্টোবর ১৯৮৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২১

২৩. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮

২৪. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, কলকাতা, বাণীশিল্প, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৫২

২৫. পূর্ণেন্দু পত্রী, *শিল্প সংক্রান্ত*, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ২১

২৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল" দ্র., *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ২০১১, পৃ. ২৮৮

২৭. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, অক্টোবর ১৯৮৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

২৯. সুশোভন অধিকারী, "রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্রণ : একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান", দ্র. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, *পরিকথা* ২৬, ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য, মে ২০১১, পৃ. ২৩

৩০. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, অক্টোবর ১৯৮৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯

৩১. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৩২. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০–৩৮১

৩৩. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

৩৪. শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, দিল্লি, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, প্রকাশন বিভাগ, মে ১৯৯৮, পৃ. ৩১৩

৩৫. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫–৪১৬

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

৩৯. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৪০. 'দিনকর কৌশিক উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠি', দ্র. দিনকর কৌশিক. *নন্দলাল বসু : ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*, বাংলা অনুবার্দI শোভন সোম, ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৫, পৃ. 41–42

৪১. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪–৩২৫

৪২. পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তারিত জানতে দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, মার্চ ১৯৮৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০–১২০ ও ১৬৫–১৬৮

৪৩. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৪, পৃ. ১৮৫

৪৪. শোভন সোম, "শিল্পের আধুনিকতা ও বাংলার শিল্পস্বাতন্ত্র্য", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪৫. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪

৪৬. সুশোভন অধিকারী, "রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্রণ : একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৪৭. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৪৮. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. "নন্দলাল বসুর সম্বর্ধনা" (১৩৩৮ পৌষ), দ্র. শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ বসু (সম্পা.), *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়- এর প্রবাসী : ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১

৫০. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের "রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল" প্রবন্ধে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠির অংশ, দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ২০১১, পৃ. ২৯৯

৫১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল" প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

৫২. দিনকর কৌশিক, প্রাগুক্ত, পৃ. 77

৫৩. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

৫৪. দিনকর কৌশিক, *নন্দলাল বসু : ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*, প্রাগুক্ত, পৃ. 77

৫৫. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬৫

৫৬. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "নন্দলাল", *বিশ্বভারতী-পত্রিকা* নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩, পৃ. ২৪

৫৭. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫–৭৬

৫৮. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬

৫৯. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩

৬০. আবুল মনসুর, "নন্দলাল বসুর হরিপুরা চিত্রগুচ্ছ : একটি পর্যালোচনা", *শিল্পকলা* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৬

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫–৬

৬২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, ১ম সং, আনন্দ, বৈশাখ ১৪০১ [দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩

৬৩. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬

৬৪. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, "সহজ চিত্রশিক্ষা ও প্রথম ভাগ", *সংস্কৃতি ও শিল্পভাবনা*, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৬৫–৬৬

৬৫. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮১

৬৬. দিনকর কৌশিক, *নন্দলাল বসু : ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*, প্রাগুক্ত, পৃ. 101

৬৬/১. See. catalogue : Published on the occasion of the Exhibition of the *Rhythms of India : The Art of Nandalal Bose (1882–1966),* Sonya Rhie Quintanilla (General Editor), Published in the United States by the San Diego Museum of Art, 2008, P. 25

৬৭. দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩০–৩১

৬৭/১. ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, "রূপরসজ্ঞ শিল্পাচার্য নন্দলাল", দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), *বিশ্বভারতী পত্রিকা : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২–২০০৬*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৪৮–১৪৯

৬৮. A. Ramachandran, æReinventing Nandalal : The Master Artist", See. catalogue : Published on the occasion of the Exhibition of the *Rhythms of India : The Art of Nandalal Bose (1882-1966),* Sonya Rhie Quintanilla (General Editor), Published in the United States by the San Diego Museum of Art, 2008, P. 56

৬৯. নন্দলাল বসু কর্তৃক 'ভূমিকা', দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড

৭০. "নন্দলাল বসু", দ্র. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪০৭, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ. ১০৫

৭০/১. John M. Rosefield, æIntroduction" See. catalogue : Published on the occasion of the Exhibition of the *Rhythms of India : The Art of Nandalal Bose (1882–1966),* Sonya Rhie Quintanilla (General Editor), Published in the United States by the San Diego Museum of Art, 2008, P. 25

৭১. পূর্ণেন্দু পত্রী, *শিল্প সংক্রান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৭২. সৈয়দ মুজতবা আলী, *পঞ্চতন্ত্র*, এস. ওয়েজ ২য় সং, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বৈশাখ ১৪১৫ [প্র. প্র. ১৩৫৯], পৃ. ২৭৫

৭৩. মৃণাল ঘোষ, *এই সময়ের ছবি*, ২য় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ডিসেম্বর ১৯৯২ [প্র. প্র. জানুয়ারি ১৯৮৯] পৃ. ৪১

৭৪. নন্দলাল লিখিত "ভূমিকা", দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. দিনকর কৌশিক, "দিনান্তের নন্দলাল", দ্র, সুশোভন অধিকারী (সংকলক), *শান্তিনিকেতনের দিনগুলি*, কলকাতা, পত্রলেখা, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৪৭

৭৬. প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "গুরু-স্মরণ", দ্র. *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩, পৃ. ৬৬

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৭৮. শোভন সোম, শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪–৪০৫

৭৯. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ৪৫২

৮০. "নন্দলালের ভিত্তিচিত্র রচনা-কে.জি, সুব্রহ্মণ্যম", দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, অক্টোবর ১৯৮৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

৮১. মৃণাল ঘোষ, *এই সময়ের ছবি*, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৭–৪৮

৮১/১. Debashish Banerji, ӕHavell, Abanindranath, Nandalal : Towards a Utopic Postmodern culture", See. catalogue : Published on the occasion of the Exhibition of the *Rhythms of India : The Art of Nandalal Bose (1882-1966),* Sonya Rhie Quintanilla (General Editor), Published in the United States by the San Diego Museum of Art, 2008, P. 67

৮২. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৮৪. ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, "রূপরসজ্ঞ শিল্পাচার্য নন্দলাল", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৮৫. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, কলকাতা, অরুণা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ২৭২

৮৬. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ১৯৯৫ [প্র. প্র. ১৯৭৫], পৃ. ১৬৫

৮৭. পূর্ণেন্দু পত্রী, *শিল্প সংক্রান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৮৮. রবি পাল, "পত্রচিত্রণে নন্দলাল", *দেশ* ২৬ নভেম্বর ১৯৮৩, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪, পৃ. ১৫

৮৯. রবি পাল 'উদ্ধৃত' চিঠি, দ্র. রবি পাল, "পত্রচিত্রণে নন্দলাল", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৯০. পূর্ণেন্দু পত্রী, *শিল্প সংক্রান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭–২৮

৯১. শোভন সোম, *তিনি শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৯১/০. ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, "রূপরসজ্ঞ শিল্পাচার্য নন্দলাল", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৯১/১. নন্দলাল বসু, *শিল্প চর্চা*, নন্দলাল-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ [প্র. প্র. বৈশাখ, ১৩৬৩], পৃ. ১৭০

৯২. স্বাতী ঘোষ, *রবীন্দ্রভাবনায় শান্তিনিকেতনে আলপনা*, কলকাতা, আনন্দ, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৭২–৮১

৯৩. গৌরী ভঞ্জ, "আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল", *রবীন্দ্রভাবনা* নভেম্বর ১৯৮৪, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা

৯৪. স্বাতী ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭–৯০

৯৫. কে.জি সুব্রহ্মণ্যন্ লিখিত ভূমিকা, দ্র. নন্দলাল বসু, *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*, অম্লান দত্ত ও কল্পাতি সুব্রহ্মণ্যন, (সম্পা.), কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, পৃ. ১৪

৯৬. নন্দলাল বসু, *শিল্পকথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কার্তিক ১৩৫৭, [প্র. প্র. ১৩৫১], পৃ. ১০

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬–১৭

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫–২৬

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১০২. কে.জি সুব্রহ্মণ্যন্ লিখিত 'ভূমিকা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১০৩. শান্তি নাথ, *বিনোদবিহারীর চিত্রকথা*, কলকাতা, রক্তকবরী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

১০৪. দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, “নন্দদা”, দ্র. প্রশান্ত দাঁ (সম্পা.), *শিল্প প্রবন্ধাবলী : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী*, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০০৬, পৃ. ৪১

১০৫. প্রবীর কুমার দাস, *শিল্প জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদ, ২০০৭, পৃ. ২২৪

১০৬. রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, “নন্দলাল”, দ্র. *চারুকলা* ৩য় সংখ্যা : সন ১৪১১, কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, পৃ. ২

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১০৮. “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ”, দ্র. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২২৯

১০৯. অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, “শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহাশয়ের স্মরণে”, *বিশ্বভারতী পত্রিকা* নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩ শক, পৃ. ১৫

১১০. বুলবন ওসমান, “বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের চারুকলা”, *শিল্পকলা* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা, অষ্টাদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ.৭

১১১. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, “নন্দলাল চিত্রপ্রদর্শনী ও শিবসুন্দরের মুখ” *সংস্কৃতি ও শিল্পভাবনা*, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ২৪

১১২. পুলিনবিহারী সেন, “শান্তিনিকেতন কলাভবন প্রদর্শনী (১৯৩৮)”, দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, আগস্ট ১৯৯৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১৪–৬১৫

১১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “চিঠিপত্র : নন্দলাল বসুর লিখিত”, দ্র. *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩, পৃ. ৪

১১৪. মৃণাল ঘোষ, *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৩৩

১১৫. রবি পাল, “পত্রচিত্রণে নন্দলাল”, *দেশ* ২৬ নভেম্বর ১৯৮৩, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪, পৃ. ১৪

১১৬. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৫ [প্র. প্র. ১৯৭৫], পৃ. ১৬৩

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

১১৮. Debdutta Gupta, æRediscovering an artist : Nandalal Bose”, See. Catalogue, *Post cards by Nandalal Bose*” 5–24 December 2011.

১১৯. আবুল মনসুর, “নন্দলাল বসুর হরিপুরা চিত্রগুচ্ছ : একটি পর্যালোচনা”, *শিল্পকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ৫

১২০. শোভন সোম, “বাংলার বিশ শতকের শিল্পকলা : একটি নিরীক্ষণ”, দ্র. হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পাদিত), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, ২য় সং, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০১০ [প্র. প্র. মার্চ ২০০০], পৃ. ৩১৭

১২১. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১২২. “সুনীতিকুমারের নন্দলাল বিশ্লেষণ”, দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, আগস্ট ১৯৯৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬৬

১২৩. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

১২৪. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

১২৪/১. Pramod Chandra & Sonya Rhie Quintanilla, æNandalal Bose and the History of Indian Art”, See. catalogue : Published on the occasion of the Exhibition of the *Rhythms of India : The Art of Nandalal Bose (1882–1966),* Sonya Rhie Quintanilla (General Editor), Published in the United States by the San Diego Museum of Art, 2008, P. 37

১২৫. প্রবাসজীবন চৌধুরী, “নন্দনতাত্ত্বিক নন্দলাল”, *দেশ* ২৬ নভেম্বর ১৯৮৩, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪, পৃ. ২১

১২৬. চিন্তামণি কর, *শিল্পী ও রূপকলা*, ২য় সং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮ [প্র. প্র ১৯৯৬], পৃ. ১৭–১৮

১২৭. প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি : “দেশপ্রেমিক নন্দলাল”, দ্র পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, অক্টোবর ১৯৮৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৪৩২

১২৮. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১২৯. শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন রকম বিদেশি শিল্পীরা কেউ কেউ নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন, কেউ কেউ কাজ শেখাতেন, এদের মধ্যে সুইডেনের শিল্পী সীডর বুম, হাঙ্গেরীয়ান মা ও মেয়ে-সাস্ ব্রুর্ণার ও এলিজাবেথ ব্রুর্ণার, সিংহলী শিল্পী পিরিস (ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজের শিল্পী), চেকোশ্লোভাকিয়ার নেভ্কডস্কি (বোহেমিয়ান শিল্পী) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৩০. রবি পাল উদ্ধৃত নন্দলাল লিখিত চিঠির অংশবিশেষ, দ্র. রবি পাল, "পত্রচিত্রণে নন্দলাল", *দেশ* ২৬ নভেম্বর ১৯৮৩, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪, পৃ. ১৫

১৩১. Jaya Appasamy, *Abanindranath Tagore and the art of his times*, New Delhi, Lalit KalaAcademi, 1968, P. 54

১৩২. নন্দলালের ছেলে বিশ্বরূপ বসু সত্যজিৎ চৌধুরীর সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানিয়েছেন। দ্র. "পরিশিষ্ট", সত্যজিৎ চৌধুরী, *নন্দলাল*, কলকাতা, ১ম সং, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮ [প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৮৮], পৃ. ১১৮

১৩৩. শোভন সোম, শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৩৬২

১৩৪. শোভন সোম, *তিন শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১৩৫. অজন্তার স্টাডি ও গবেষণা থেকে আবিষ্কার করেন।অজন্তার ছবি ও আমাদের দেশি পটের আঁকা পট ও পুথির পাটার ছবিতে শিল্পছন্দে মিল আছে। ওড়িষ্যার পট ও পাটা ও শিল্পের সঙ্গে বাংলার পট পাটার ছবির বিষয় ও অঙ্কন পদ্ধতির মিল আছে।

১৩৬. শোভন সোম, "নন্দনের কুঞ্জতলে", দ্র. "সুনীতিকুমারের নন্দলাল বিশেষণ", দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৫০

১৩৭. "আচার্য নন্দলালের ভারতশিল্পশাস্ত্র চর্চা", দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬

১৩৮. শান্তিদেব ঘোষ, *বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর*, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, বৈশাখ ১৪১০, পৃ. ১৪–১৫

১৩৯. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, বৈশাখ ১৪০১ [দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৬

১৪০. সৈয়দ মুজতবা আলী, *পঞ্চতন্ত্র*, এস. ওয়েজ ২য় সং, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বৈশাখ ১৪১৫ [প্র. প্র. ১৩৫৯], পৃ. ২৭৭

১৪১. মৃণাল ঘোষ, *শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৯

১৪২. রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, "নন্দলাল", দ্র. *চারুকলা* ৩য় সংখ্যা : সন ১৪১১, কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, পৃ. ৪–৭

১৪২/১. Pramod Chandra & Sonya Rhie Quintanilla, æNandalal Bose and the History of Indian Art", See. catalogue : Published on the occasion of the Exhibition of the *Rhythms of India : The Art of Nandalal Bose (1882–1966),* Sonya Rhie Quintanilla (General Editor), Published in the United States by the San Diego Museum of Art, 2008, P. 39

১৪৩. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, ১ম সং, কলকাতা আনন্দ, বৈশাখ ১৪০১ [২য় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য শিল্পী

বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় অন্যান্য শিল্পী বলতে সেই সকল শিল্পীকে প্রাগ্রসর হিসেবে রাখা হচ্ছে, যাঁরা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা ধারার সূচনাপর্বের আন্দোলনের সাথে একমত পোষণ করে চিত্রচর্চা করেছেন। বিশেষত ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার তথা ভারতীয়, সর্বোপরি প্রাচ্যের শিল্পাদর্শের পুনরাবিষ্কার করতে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বিশ শতকের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য-ঐতিহ্যের বিশেষ লক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের কাজে প্রাচ্যরীতির আদর্শকে সমুজ্জ্বল করেছেন। এই সংজ্ঞার আলোকে বাংলার অধিকাংশ শিল্পীই প্রাচ্যশিল্পী। তবুও যাঁরা করণ-কৌশল, বিষয়চিন্তা এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একাডেমিক স্কুলিংয়ের মধ্য দিয়ে চিত্রচর্চা করেছেন—এই পরিচ্ছেদে তাঁদের কাজের ধরন বিশ্লেষণ করা হবে। এ ছাড়া শুধু স্কুলিং নয়, নিজস্ব চর্চার মধ্য দিয়ে এই ঘরানাকে যাঁরা বজায় রেখেছেন কিংবা নিজস্ব বিভিন্নমুখী চর্চার মধ্যেও শিল্পীজীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে প্রাচ্যচিত্ররীতি ঘরানায় চিত্র এঁকেছেন, অবদান রেখেছেন; প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁদের কাজের ধারাও তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে এই নিবন্ধে।

মৃণাল ঘোষ তাঁর *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন* গ্রন্থে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতিকে স্বদেশ চেতনার সমৃদ্ধ ফসল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১] তাঁর বর্ণানুসারে বলা যায়, নব্য-বঙ্গীয় রীতির প্রবক্তারা ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিক্রিয়ায় এবং ব্রিটিশ শিল্পরীতির আরোপিত প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের পরম্পরায় আত্ম-আবিষ্কারের পথ খুঁজেছিলেন। যে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস বর্তমান অবধি চলমান।[২] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৫ সালে *কৃষ্ণলীলা* সিরিজচিত্র অঙ্কন করেছেন। এই সিরিজচিত্রকেই নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির সূচনা বলা যায়। তারপর ১৯৪০ পর্যন্ত স্বদেশ-চেতনা আশ্রিত চিত্রকলার বিকাশকে মৃণাল ঘোষ সাধারণভাবে নব্য-বঙ্গীয় বা নব্য-ভারতীয় ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩] কয়েক প্রজন্মের হাত ধরে এই ধারায় প্রাচ্যবোধের নানা অনুষঙ্গ আত্তীকৃত হয়েছে বলে এই নিবন্ধে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টায় অবনীন্দ্র উদ্ভাবিত ব্যক্তিগত চিত্রশৈলী বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার প্রথম পদক্ষেপ এবং তাঁর এই চিত্রশৈলী বিশ শতকের প্রথম দশকে 'কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল'-এ প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। এই ধারাবাহিকতায় 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে এবং বিচিত্রা স্টুডিয়োতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই রীতির চর্চা অব্যাহত ছিল। এরপর অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য নন্দলালের শিক্ষকতায় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় প্রাচ্যচিত্র শৈলীর চর্চা বিচিত্র খাতে সমৃদ্ধ হয়েছে।

স্বদেশ-চেতনা আশ্রিত প্রেরণায় প্রাচ্যচিত্ররীতির প্রথম পর্বের শিল্পীদের কাজ—ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণনির্ভর হচ্ছিল। এ ছাড়া স্বদেশ-চেতনায় অতীত ঐতিহ্যের পরম্পরাজাত শিল্পশৈলীর পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এই আন্দোলনের শিল্পীদের কাজে পুনর্জাগরণের নানাবিধ সংকীর্ণতার ছাপ পড়েছিল। তবে প্রথম দিকের

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পীদের পুনর্জাগরণের সংকীর্ণতা বারবার পরিশোধিত হয়ে আসছে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের কাজে। শুধু প্রাচ্য নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে নানা শাখায় পল্লবিত হয়েছে বাংলায় প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা।

কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রাচ্যচিত্ররীতির যে চর্চা হতো তা পার্সি ব্রাউনের অধ্যক্ষতাকালে 'ইন্ডিয়ান পেইন্টিং' বিভাগ হিসেবে নামকরণ হয়।[৪] এবং এই ধারাবাহিকতায় ভারতের অন্যান্য একাডেমিক শিল্পশিক্ষায় 'ইন্ডিয়ান পেইন্টিং' বিভাগ হিসেবেই পরিচালিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের দর্শনে যে বৃহৎ প্রাচ্য-ভাবনার সমন্বয় ছিল তা আরো সুনির্দিষ্টকরণ হয়েছে। অতএব আজকের যে ভারত-শিল্পের পরিচয় আমরা পাই ভারতীয় শিল্পীদের কাজে তা নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতিরই বিবর্তিত রূপ। কালের দাবি মেটাতে শিল্পীরা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনাকে যুগোপযোগী করে আসছেন রীতি-পদ্ধতির স্বাধীন ব্যবহারের মাধ্যমে। বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বিকশিত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের শিষ্যদের হাত ধরে। যাঁদের মধ্যে নন্দলালের অবদান পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিষ্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫–১৯০৯), অসিতকুমার হালদার (১৮৯০–১৯৬৪) ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১–১৯৭৫), সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৭–১৯৬৪), শৈলেন্দ্রনাথ দে (১৮৯১–১৯৭২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর শিল্পশিক্ষায় অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল দে, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্যকে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেছেন চিন্তামণি কর।[৫] বিশ ও ত্রিশ দশকে অবনীন্দ্রনাথের গুরুশিষ্য পরম্পরায় 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর শিল্পশিক্ষায় উপরোক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল দে ছাড়াও ললিতমোহন সেন, চঞ্চল ব্যানার্জী, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী, চিন্তামণি কর ও প্রাণকৃষ্ণ পালের কথা জানিয়েছেন সমীর ঈশা।[৬]

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের অধিকাংশই পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। এই শিষ্যদের কাছে যেসব শিল্পী অবনীন্দ্র পরম্পরার প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা চর্চা করেছেন, অসিতকুমার হালদার "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যবর্গ" প্রবন্ধে তাঁদের নাতি-শিষ্য আখ্যা দিয়ে খ্যাতিমান কয়েকজন শিল্পীর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন—

মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫–১৯৮৯), অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০২–১৯৬৪), রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২–১৯৫৫), হীরাচাঁদ দুগাড় (১৮৯৮–১৯৫১), মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮–১৯৬৮), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা (১৯০৩–১৯৯৫), অন্নদা মজুমদার, বিনায়ক মাসোজী, চিত্রবীর ভদ্ররাও, হরিপদ রায় (১৮৯৫–১৯৭১), রমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।[৭] *ভারতের শিল্প ও আমার কথা* গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দুকুমার (অর্ধেন্দ্রকুমার) গঙ্গোপাধ্যায় পূর্বোল্লিখিত শিল্পীদের ছাড়াও আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র ও প্রাচ্যরীতির চিত্র অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা হলেন—অলীন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (১৮৯৯–১৯৭৫), দুর্গেশচন্দ্র সিংহ (১৮৯২–১৯২৮), প্রমোদকুমার চ্যাটার্জী (১৮৮৫–১৯৭৯), চঞ্চলকুমার ব্যানার্জী, পুলিনবিহারী দত্ত, সারদাচরণ উকিল (১৮৯০–১৯৪০), বীরেশ্বর সেন, অশ্বিনী-কুমার রায়, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারু রায়, সত্যেন দত্ত, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার বাইরের প্রদেশ থেকে যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহীশূরের ভেঙ্কটাপ্পা, মাদ্রাজের নটেশন, লক্ষ্ণৌর সমীউজ্জামান ও হাকিম খাঁ, লাহোরের রূপকৃষ্ণ প্রমুখ।[৯]

অবিভক্ত বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার সময়কাল ১৯৪৭ পর্যন্ত। ফলে এই সময়কালের মধ্যে যেসব শিল্পী তাঁদের কাজের মধ্যে অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের বিরাট অংশ ছিলেন শান্তিনিকেতন শিল্পশিক্ষায়। সেখানে অবনীন্দ্র পরম্পরার শিক্ষার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন নন্দনাল বসু। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারার শিক্ষা লাভ করলেও পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে খ্যাতি অর্জন করেছেন। যাঁদের মধ্যে রামকিঙ্কর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নব্য-বঙ্গীয় রীতি সাম্প্রতিক সময়কাল পর্যন্ত অনেক শিল্পীর কাজে প্রসারিত হয়ে আসছে। যাঁরা পাশ্চাত্য আধুনিকতার ওপর ভিত্তি করে আঙ্গিক গঠন করেছেন তাঁদের কাজেও আত্তীকৃত হয়েছে নব্য-ভারতীয় তথা প্রাচ্যচিত্রকলার সারাৎসার।[১০]

পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় অবিভক্ত বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বাদে অন্য শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকজন শিল্পীর জীবন ও কর্ম আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাচ্যচিত্রকলার বৈশিষ্ট্য, উত্তরণ ও সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গগুলো আলোচনা করা হবে। এ ছাড়া গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনয়নী দেবী, যামিনী রায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজের কাজ নিয়ে আলোচনা করা হবে। কারণ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নব্য-বঙ্গীয় চিত্র আন্দোলনের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁকে প্রাচ্যচিত্রকলার আধুনিক উত্তরণ পর্বের শিল্পী বলা যায়। সুনয়নী দেবী স্বশিক্ষিত থেকে প্রাচ্যচিত্রকলার উত্তরণ ঘটিয়েছেন। যামিনী রায় বাংলার লোকশিল্পের আঙ্গিক প্রাচ্য পরম্পরার চিত্র-ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে আধুনিকতায় রূপান্তর করে সময়ের দাবি মিটিয়েছেন। সর্বোপরি নন্দলালের সুযোগ্য ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজের বিশেষ বিশেষ কাজে প্রাচ্যচিত্রকলার অনুষঙ্গ পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হবে।

এক

অসিতকুমার হালদার (১৮৯০–১৯৬৪)

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মতোই অসিতকুমার হালদার প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার অগ্রণী শিল্পী, শিক্ষক, সাহিত্যিক। তিনি সুপুরুষ ও মজলিশি ছিলেন। তাঁর বাবা সুকুমার হালদার চব্বিশ পরগনার অধিবাসী; পেশায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মা সুপ্রভা দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি। অর্থাৎ অসিতকুমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র এবং একই সম্পর্কসূত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসিতকুমারের মামা। ১৮৯০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্ম নিয়েছেন। পিতার কর্মস্থল কৃষ্ণনগরে পাঠজীবন শুরু করেছিলেন। এখানে সহপাঠী ঝাড়েশ্বর চক্রবর্তীর কাছে ছবি আঁকার হাতেখড়ি নিয়েছেন।

অসিতকুমার হালদার কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রথম পর্বের ছাত্র ছিলেন। অর্থাৎ নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৯০৬–১৯১২ সালে আর্ট স্কুলে ছাত্র থাকাকালে যদুনাথ পাল ও বক্কেশ্বর পালের কাছে মাটির মূর্তি গড়তে শিখেছেন; স্থপতি ও ভাস্কর লিওনার্ড জেনিংসের কাছে ভাস্কর্য

Dhaka University Institutional Repository

শিখেছেন। কিন্তু আর্ট স্কুলে ভর্তির পর অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ পদ্ধতিতে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির চর্চায় অসম্ভব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

অজন্তা গুহাচিত্র নকলের কাজ তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে সি.জে হেরিংহ্যামের নেতৃত্বে ১৯০৯-১৯১১ সাল পর্যন্ত অজন্তার দেয়ালচিত্রের কপি করার কাজ করেছিলেন নন্দলাল ও অন্যদের সাথে। এই কপি-ওয়ার্ক করতে গিয়ে নন্দলাল যেমন ভারতশিল্পের ঐতিহ্যের উৎসবমুখর খোঁজ পেয়েছিলেন, অসিতকুমার হালদারও একইভাবে অজন্তার গুহাচিত্রাবলির সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, প্রভাবিত হয়েছেন। অজন্তার শিল্পকলা বিশুদ্ধ ভারতীয়তা এবং ধ্রুপদীয়তা চরম শিখরে পৌঁছেছিল। অজন্তার রেখা গভীর অন্তর্দৃষ্টির ব্যঞ্জনা দেয়। অসিতকুমার অজন্তার চিত্রাবলি অনুকৃতির সূত্রে ভারত-ঐতিহ্যের এই ধ্রুপদী রীতিকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন এবং সেই রেখা ও রঙের প্রভাব পড়েছে তাঁর কাজে।

চিত্র ০১ : অসিতকুমার হালদার
অজন্তার প্রতিলিপি

চিত্র ০২: অসিতকুমার হালদার
অজন্তার প্রতিলিপি

চিত্র ০৩ : অসিতকুমার হালদার
অজন্তার প্রতিলিপি

১৯১৩ সালে অসিতকুমারের *অজন্তা* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি অজন্তা শিল্পতীর্থ ভ্রমণের ইতিহাস রচনা করেছেন। শিল্পগ্রন্থ হিসেবে এ গ্রন্থের ভূমিকা আজও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১১ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্পশিক্ষা শেষ করে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে অসিতকুমার শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অসিতকুমার স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষার পাশাপাশি ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের রং দিয়ে ছবি আঁকা শেখাতেন। ফলে শান্তিনিকেতনরে ড্রয়িং শিক্ষা চিত্রবিদ্যার চর্চায় মোড় নিয়েছিল। তাঁর ছাত্র হিসেবে প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা পেয়েছেন মুকুলচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রনাথ দেববর্মণ, মনিভূষণ গুপ্ত, অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার প্রমুখ। ১৯১২ সালে গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শে অসিতকুমার আশ্রমে আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত শিশু বিভাগে ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালের কলাভবনের গোড়াপত্তন হয়েছিল বলা যায়।[১১] শুধু চিত্রকলা নয়, এই সময় শান্তিনিকেতনে যত অভিনয় হয়েছে তাতে অভিনয় ও অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে স্টেজ সজ্জা, অভিনেতাদের সাজসজ্জার কাজও করতেন বিশেষ পারদর্শিতায়। এ ছাড়া আশ্রমে অতিথি সংবর্ধনায় আলপনা

ও ফুল সাজিয়ে অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারদর্শী ছিলেন অসিতকুমার। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নন্দলালের সংবর্ধনা, ১৯১৫ সালে ছোটো লাট লর্ড কারমাইকেলের আশ্রম পরিদর্শন ও গান্ধীজির সপরিবারে আশ্রম আগমন উপলক্ষে অসিতকুমার ফুল ও আলপনায় বিশেষ অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন কলা বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে। সহপাঠী নন্দলালের সাথে পত্র যোগাযোগ রাখতেন শান্তিনিকেতনে বসে। এ সময় শান্তিনিকেতনের আশ্রমের পরিবেশ সম্পর্কে সচিত্র কার্ড লিখতেন। এ সকল কার্ড চিত্রে সেকালের শান্তিনিকেতনের অবস্থা ও পরিবেশের বর্ণনা পাওয়া যায়।

চিত্র ০৪ : শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের পাঠ নেয়ার দৃশ্য

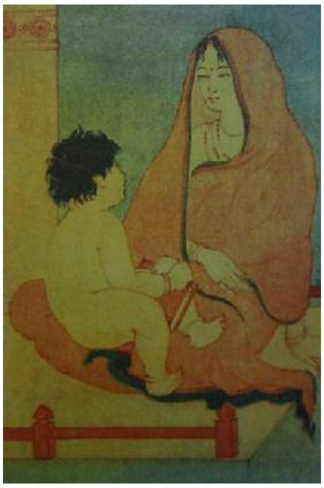

চিত্র ০৫ : The Cresent Moon গ্রন্থচিত্রণ, The Beginning (জন্মকথা)

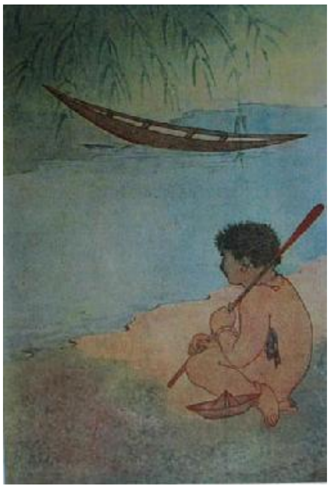

চিত্র ০৬ : The Cresent Moon গ্রন্থচিত্রণ, The Merchant (দুঃখহারী)

১৯১৩ (১৩২০ বঙ্গাব্দ) সালে রবীন্দ্রনাথের The Cresent Moon গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদারের ছবিতে শোভিত হয়েছিল এই গ্রন্থ। এই চারজন বিশিষ্ট শিল্পীর আটটি রঙিন চিত্রের মধ্যে অসিতকুমার এঁকেছেন The Beginnig (জন্মকথা) ও The Merchant (দুঃখহারী)। এই চিত্রে অসিতকুমারের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতির চিত্রচর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই চিত্রের মাধ্যমে অসিতকুমারের নিজস্ব চিত্রশৈলীরও পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৪ সালে অসিতকুমার লাহোর গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ বন্ধুবর সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে সুরগুজা এস্টেটের এলাকায় রামগড় গিয়েছিলেন সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সার্ভে কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব যুগের যোগিমারা গুহার পুরাতন ফ্রেসকোর অনুলিপি করার জন্য।[১২] মধ্য-ভারতে সুরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড়গিরি গুহায় ছাদের নিচের চিত্র—খ্রিস্টপূর্ব তিনশ বছরের পুরনো প্রাচীন চিত্রকলা।

১৯১৬ সালে নন্দলাল কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। আর্ট স্কুলে তখন তাঁর ছাত্র ছিলেন হীরাচাঁদ দুগার, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নটেশন সর্বাধিকারী, মহাবীর প্রসাদ, অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।[১৩] শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করার সময় নাটকে অভিনয় করতেন, কিন্তু তাঁর মূল কাজ ছিল পটচিত্র আঁকা ও মঞ্চসজ্জা করা। ১৯১৬ সালে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে কলকাতার 'ফাল্গুনী' নাটকের পটচিত্র অসিতকুমার এঁকেছিলেন।[১৪] ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে মুকুল দে ও নন্দলাল বসুর সাথে অসিতকুমার *বিচিত্রা*র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। বিচিত্রা সভার মাধ্যমে কলকাতায় 'ডাকঘর', 'বৈকুণ্ঠের

Dhaka University Institutional Repository

খাতা' এবং 'ফাল্গুনী' অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে *ডাকঘর* নাটকে 'দইওয়ালা', *বৈকুণ্ঠের খাতায়* 'পাঁচকড়ি' এবং *ফাল্গুনী* নাটকে 'কোটাল'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাটকে অভিনয় ছাড়াও অসিতকুমার পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জা ও অভিনেতাদের সাজসজ্জার কাজে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* চিত্রভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে অসিতকুমারের একটি ছবি ছাপানো হয়। ছবিটি অসিতকুমার রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। লাইন ড্রয়িংয়ের এই চিত্রে একটি শিশু পদ্মের গোছা নিয়ে চলেছে। পেছনে সূর্য উদয় হচ্ছে। প্রাচ্যরীতির রৈখিক চিত্রগুণসম্পন্ন এ চিত্র তাঁর অজন্তা ও রামগড় গুহা স্টাডির ইঙ্গিত বহন করে।

চিত্র ০৭ : When I go from hence (যাবার দিনে এই কথাটি)

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা থেকে অসিতকুমার শান্তিনিকেতন কলাভবনে যোগ দেন। এই সময় যেসব ছাত্র পর্যায়ক্রমিকভাবে এসেছিলেন এবং অসিতকুমারের কাছে চিত্রশিক্ষা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মণি গুপ্ত, হীরাচাঁদ দুগার, অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদ মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে, ধীরেন দেববর্মণ, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজী, ভি.আর চিত্রা, হাতী সিং, রমেশ বসু মজুমদার, সুকুমারী দেবী, সবিতা দেবী, প্রতিমা দেবী প্রমুখ।[১৫]

১৯১৭ সালে অসিতকুমার কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাকে গোয়ালিয়র রাজ্যের স্টেটের বাগগুহার দেয়ালচিত্রের অবস্থার রিপোর্ট করতে গিয়েছিলেন। বাগগুহার ফ্রেসকো চিত্রের অবস্থার রিপোর্ট পেয়ে কর্তৃপক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

বাগগুহার চিত্রগুলোর নকলের কাজ দিয়েছিলেন। অসিতকুমার সহযোগী শিল্পী হিসেবে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করকে সাথে নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা গুহার ও সেই প্রদেশের বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। শুধু ছবি নকলই নয়, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও বাগগুহার বর্ণনা করেছেন **১৯২১** সালে এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত *বাগগুহা ও রামগড়* গ্রন্থে। এ গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে বিদেশি প্রভাব, পারস্য ও আফগানিস্তানে ভারত-শিল্পের প্রভাব, ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে ইতালীয় প্রাচীন সমসাময়িক চিত্রের তুলনা, চীন ও জাপানে ভরতীয় বৌদ্ধ চিত্রকলার প্রভাব, ভিত্তিচিত্রের জমি তৈরির ভারতীয় রীতি, চিত্রের জমি তৈরির ইউরোপীয় রীতি, ইউরোপীয় ও ভারতের চিত্রে রঙের সঙ্গে ব্যবহৃত আটা, ভারতে ও ভারতের বাইরে ভিত্তিচিত্রের রঙের কথা; বাগচিত্রের মূর্তি বিন্যাস বা কম্পোজিশন, শৈলী, রেখাঙ্কন ও আলোছায়ার সমাবেশ; এবং বাগের ছবির বর্ণনা করেছেন।[১৬] এই গ্রন্থের রামগড় গুহার বর্ণনায় ভ্রমণ কথা, গুহার বর্ণনা এবং চিত্রাবলির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছেন।[১৭]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, অসিতকুমার বাগ ও রামগড় গুহা ভ্রমণ ও নকলের কাজে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটন করে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এই গ্রন্থে। এই গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ্ পরবর্তী শিল্পশিক্ষার্থীদের ভারতীয় তথা প্রাচ্যচিত্ররীতির করণ-কৌশল সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়তা করেছে।

১৯২২ সালে বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে অ্যালফ্রেড থিয়েটারে *শারদোৎসব* নাটক অভিনীত হয়। এ নাটকে অসিতকুমার রাজা সোমপালের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।[১৮] **১৯২৩** সালে পিয়ার্সন-এর সাথে ইংল্যান্ড ভ্রমণে যান। সেখানে তিনি লরেন্স বিনিয়ানকে ভারতীয় চিত্রের ধারাবিন্যাসে সাহায্য করেছিলেন।[১৯] সেখানে বাস দুর্ঘটনায় পা ভেঙে গেলে ছয় মাস পরে ফিরে আসেন। ফিরে এসে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের ছাড়পত্র পান। এরপর **১৯২৪** সালে জয়পুরে রাজকীয় আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। এক বছর পর **১৯২৫** সালে জয়পুর আর্ট স্কুলের চাকরি ছেড়ে লক্ষ্ণৌ সরকারি আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষতা করেছেন **১৯৪৫** সাল পর্যন্ত। তাঁর এই অধ্যক্ষতা কালের বড় অবদানের কথা ধরা আছে অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের *ভারতের শিল্প ও আমার কথা* গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, 'লক্ষ্ণৌতে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অগণিত ছাত্রশিষ্য তৈরী করে বাংলাদেশের নবজাত কলাপদ্ধতিকে স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বভারতীয়রূপে।'[২০]

১৯৩৪ সালে লন্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস' অসিতকুমারকে 'ফেলো' নির্বাচিত করে। ভারত সরকার **১৯৪১** সালে 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করে। **১৯৬৪** সালের **১৩** ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উপরোক্ত আলোচনায় শিল্পী অসিতকুমার হালদারের সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এবার তাঁর চিত্রকর্ম ও অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির শিল্পী অসিতকুমার হালদার ভারত-ইতিহাসের চিত্র, বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কিত চিত্র, ওমর খৈয়ামের চিত্রাবলির মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

চিত্র ০৮ : নিত্যানন্দ ও জগাই মাধাই, ফ্রেসকো

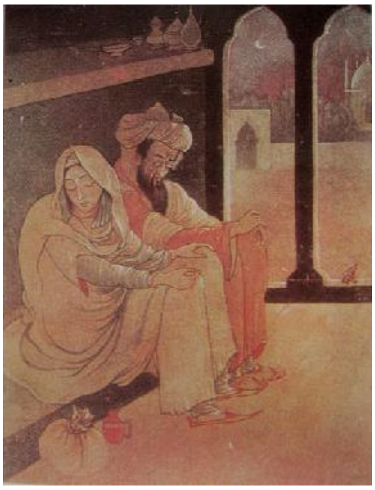

চিত্র ০৯ : সরাইখানা

জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতি, মিউয়াল, তেলরং ও টেম্পারা বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন। ছিলেন সাহিত্যিক। দেশ-বিদেশের নানা পত্রপত্রিকায় গৌরবের সাথে লিখেছেন। শিল্পকলা বিষয়েও লিখেছেন মূল্যবান প্রবন্ধ। এসব গুণের নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও উৎসাহ প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ প্রসঙ্গে পঞ্চানন মণ্ডলকে লিখিত চিঠিতে অসিতকুমার লিখেছেন, 'পূজনীয় রবিদাদা আমাকে ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকা, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখায় উৎসাহিত করতেন। আশ্রমে আমি তাঁরই কাছে থাকতুম এবং তাঁর উপদেশ অহরহ শুনতে পেতুম। নাতি হিসেবে মধুর রসিকতা থেকেও বঞ্চিত হতাম না।'[২১]

রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে চিঠিপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রাখতেন, উৎসাহ দিতেন। অসিতকুমারের বিভিন্ন পর্বের শিল্পকর্ম সম্পর্কে চিঠিতে মন্তব্য করতেন। ওমর খৈয়াম চিত্র প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'ছবিগুলিতে রেখার সুনিপুণ সৌকুমার্য্য ও ভাবের ওমরখৈয়ামী আবহাওয়া মনোরম হয়েছে। বইখানি গুণীসমাজে সমাদর লাভ করবে।'[২২]

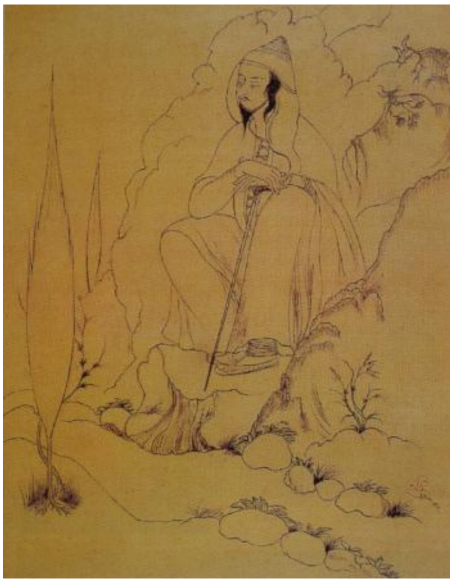

চিত্র ১০ : ওমর খৈয়াম চিত্রমালার একটি ড্রয়িং, ২৬.৫ × ২০.৫ সেমি

Dhaka University Institutional Repository

অসিতকুমার রবীন্দ্রনাথের রৌপ্য ফলক-মূর্তি করেছিলেন।[২৩] এই মূর্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

কল্যাণীয় শ্রীমান অসিতকুমার হালদার
আমার মূর্ত্তি পূর্ণ করি
মুক্তি পেল তোমার শক্তি;
রেখায় রেখায় নিত্য-শিখায়
দীপ্তি পেল তোমার ভক্তি।
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্ত্র,
তাই তো তোমার ধ্যানের দৃষ্টি
তোমার রসে আমার রূপে
রচিল এই নূতন সৃষ্টি।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রশংসাই করেননি, তিনি অসিতকুমারের শিল্পবিষয়ক রচনারও প্রশংসা করেছেন। তিনি *বাগগুহা ও রামগড়* গ্রন্থের ভূমিকায় 'পরিচয়' শিরোনামে লিখেছেন, 'শ্রীমান অসিতকুমারের এই বইখানি পড়ে আমি খুশি হয়েচি। এর রচনা সরস, সরল এবং শিক্ষা ও প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল।'[২৫]

রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারের ছবি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গান লিখেছেন। 'অগ্নীময়ী সরস্বতী' চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'সুরের আগুন' রচিত হয়েছে।[২৬]

চিত্র ১১ : শিরোনামহীন (The Procession), কাগজে জলরঙে ওয়াশ, ১২৯.৫ × ৩২.৭৭ সেমি, ১৯৫০

চিত্র ১২ : শিরোনামহীন, জলরং
(graphit and gold on paper)
৪৫.৭ × ৩১.৭ সেমি, ১৯৫১–১৯৫২

চিত্র ১৩ : শিরোনামহীন (মা ও শিশু জলরং)
(gouache and ink on cardboard)
৫০ × ৩৮.৬ সেমি, ১৯৫৫

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় æAbanindranath and his Tradition” প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘If judged properly, it is seen that lines have been the chief modes of expression in conveying the sensitiveness of Asit Kumar’s mind and his feeling in suggestive indirect manner’.[২৬]

The Art of Bengal গ্রন্থে 'Artist Profiles'-এর মন্তব্য অসিতকুমারের কাজের মূল্যায়নে প্রণিধানযোগ্য :

> Linking metaphors and allegories, he raised illustrative art in india to a level never before achieved for its languid beauty.[২৭]

বিনোদবিহারী তাঁর *চিত্রকথা* গ্রন্থে শিল্পী অসিতকুমারের চিত্রকলা প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শিল্পী অসিতকুমারের শিক্ষা বিচারে এই মন্তব্য ও বিশ্লেষণ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর তথ্যে জানা যায়, অসিতকুমার শান্তিনিকেতনে ধারাবাহিকভাবে গ্রাম্যজীবন অবলম্বনে বহুসংখ্যক ছোটো আকারের রেখাচিত্র এঁকেছেন। এসব চিত্রে গ্রাম্যজীবন, নরনারী-শিশু-পরিবৃত সরল পারিবারিক জীবন অঙ্কনের নেপথ্যে বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি, কল্পনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমন্বয় রেখার ইঙ্গিতে প্রকাশ হয়েছে।[২৮] বিনোদবিহারীর মতে, ‘প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে পার্থিব বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপনের কালে অসিতকুমার রূপান্তর অপেক্ষা রূপাভাস প্রধান বলে ধারণা করেছিলেন। এ কারণে রেখাই তাঁর চিত্রে ছন্দের প্রতীকরূপে দেখা দিয়েছিল।’[২৯]

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় অসিতকুমারের বৈশিষ্ট্য ও অবদান :

(ক) কাহিনি, গল্প, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, দার্শনিক, কাব্যিক ভাবের চিত্র এঁকেছেন। এসব চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান সুদৃঢ় ও উন্নত।

(খ) সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার গতি-প্রকৃতির জ্ঞান তাঁর ছিল এবং নিজেও বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষায় সাহিত্য রচয়িতাদের প্রথম দিককার একজন। শিশু সাহিত্য, নাটক, অনুবাদ করেছেন। এক্ষেত্রে সাহিত্য ও চিত্রকলার অভিজ্ঞতাই তাঁর শিল্পমানস।

(গ) ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার অনুলিপি সূত্রে তিনি ভারতীয় পরম্পরার শিল্প-ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। এজন্য ভারতীয় চিত্রের উন্নত কলানৈপুণ্য ও ভাবধারায় চিত্র এঁকেছেন।

(ঘ) শিল্পবিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলিতে গভীর পাণ্ডিত্য, ইতিহাস অনুরাগ ও শিল্পাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঙ) প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুরাগ ও তাঁর রচনায় এসব তত্ত্বজ্ঞান নিরপেক্ষ মতামত হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

(চ) অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসারীদের মধ্যে নন্দলালের পরেই অসিতকুমারের অবস্থান।[৩০] অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মতো বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বিস্তার করেছেন শিক্ষকতায় অসংখ্য ছাত্রশিষ্য তৈরি করে।

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) বিশেষত অজন্তা, বাগ ও রামগর গুহাচিত্র প্রসঙ্গে যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে প্রাচ্যশিল্পের করণ-কৌশল উপকরণ নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা পাওয়া যায়। যা প্রাচ্যচিত্রকলার করণ-কৌশলের দলিল হিসেবে মূল্যবান।

(জ) শান্তিনিকেতন ঘরানায় অলংকরণধর্মী চিত্রকলার আদর্শ গড়ে তোলার অন্যতম শিল্পী।

(ঝ) 'রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম' চিত্রমালায় পার্শিয়ান ঐতিহ্যের ডিজাইন, লাইন ও কালার ব্যবহার করে নব্য-ভারতীয় চিত্রকলায় প্রাচ্য-ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি লাইনের মাধ্যমে মনের সংবেদনশীলতা এবং অনুভূতির পরোক্ষ প্রকাশ দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

(ঞ) অসিতকুমারের ছবি সংযুক্ত ই.বি হ্যাভেলের *Indian Sculpture and Painting* (১৯৮০), কুমার স্বামীর *Selected Examples of Indian Art* (১৯১০), নিবেদিতার *Myths of the Hindus & Buddhists* (১৯১৬) এবং রবীন্দ্রনাথের *The Crescent Moon* (১৯১৩) গ্রন্থগুলো লন্ডন থেকে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা সারা বিশ্বে প্রচার হয়েছে।

(ট) সাহিত্যগত উপাদান ও রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীত এবং সমসাময়িক সাহিত্যগত ভাবধারা তাঁর প্রথমদিকের চিত্রে ফুটে উঠেছে। কবিজনোচিত ভাব প্রকাশের চেষ্টায় রূপকরীতি প্রবর্তন করেছেন চিত্রধারায়।[৩১] বিনোদবিহারীর মতে, অসিতকুমারের রূপকধর্মী চিত্রের প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলা শিল্পের রূপকধর্মী চিত্র রচনা গড়ে উঠেছিল।[৩২]

(ঠ) ল্যাকসিট চিত্র তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত নতুন শৈলী। জলরঙে কাঠের পাটার ওপর ছবি এঁকে তার ওপর লাক্ষা চড়িয়ে পাকা করার রীতিই Lacsit। এ রীতির চিত্র কাঠের গাঁটের দাগ অবলম্বনে অঙ্কিত।

(ড) সারা জীবনের চিত্রকর্মে রেখাত্মক গুণই চিত্রের সর্বপ্রধান অবলম্বন ছিল। নারীদেহের লাবণ্য, কমনীয়তায় রূপের মাদকতা প্রকাশ তাঁর চিত্রের বৈশিষ্ট্য।

(ঢ) প্রাচ্যচিত্রকলা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য রেখা। এই রেখা তাঁর চিত্রে ছন্দের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫–১৯০৯)

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা আন্দোলনের প্রথম পর্বের ছাত্র ও শিল্পী। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে শিল্পী নন্দলাল বসুর পরেই শিক্ষালাভ করতে আসেন। সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সালে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বাকেরগঞ্জ জেলার শুক্তাগড় গ্রামে। পিতা ভগবতীচরণের স্থায়ী বাড়ি ছিল চেচড়ি গ্রামে। পিতার মাতুলগৃহ শুক্তাগড়ে পিতা-মাতার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈশব কাটে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাল্যশিক্ষা নিয়ে বরিশালের রামচন্দ্র কলেজ স্কুলে, কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলে, বারাণসীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্কুলে পড়ালেখার পর ১৯০৪ সালে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে এনট্রান্স পরীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে অকৃতকার্য হন। এরপর ১৯০৫ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। অধ্যক্ষ হ্যাভেল তাঁকে তাঁতের কাজ শেখানোর জন্য কাশীতে পাঠিয়ে দেন। কাশী থেকে তাঁতের কাজ শিখে ফিরে এসে অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রবিদ্যার তালিম নেন।

দারিদ্র্যের জন্য তাঁর শিল্পকলা চর্চায় অনেক ব্যাঘাত ঘটে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন।[৩৩] ১৯০৮ সালে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীতে সুরেন্দ্রনাথের 'দি যক্ষস ওয়াইফ', 'দি ফ্লাইট অব লক্ষণ সেন' এবং 'স্টাডি অব অ্যান আউল' চিত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। প্রদর্শনীতে তিনি তিন বছর চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তি লাভ করেন।[৩৪]

ভারতশিল্পী নন্দলাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তথ্যানুসারে ১৯০৮ সালের সোসাইটির প্রথম প্রদর্শনীতে সুরেন্দ্রনাথ 'লক্ষণ সেনের পলায়ন' (দি ফ্লাইট অব লক্ষণ সেন) ও 'বত্রিশ সিংহাসন' ছবির ওপর ৫০০ টাকা পুরস্কার পান।[৩৫] লক্ষণ সেনের পলায়ন (দি ফ্লাইট অব লক্ষণ সেন) তাঁর সর্বাধিক আলোচিত চিত্র। এই চিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় সমালোচকদের মধ্যে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই চিত্রের ভুল তুলে ধরেন। গুরু অবনীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে কলম ধরেছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন—সুরেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিত্র রচনার যথার্থতা কিংবা শিল্পগুণ বুঝতে সেই ব্যাখ্যার খণ্ডিতাংশ তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক :

> তোমার বোধহয় বুঝতে বাকি নাই যে ইতিহাসের রাজ্য আর শিল্পের রাজ্য এক নয়। ইস্কুলের পাঠ্য আর দিদিমার রূপকথায়, History আর Story তে যেমন প্রভেদ এই দুই রাজ্যেও তেমনি প্রভেদ।
> ইতিহাসের রাজ্যে প্রমাণ বলবন্ত, শিল্পের রাজ্যে প্রকাশই হচ্ছে সর্বেসর্বা। এখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কাব্য ও শিল্পের পার্থক্য এবং এই পার্থক্য আছে বলিয়াই Historyটা Fact হইয়াও নীরস আর Storyটা Paintingটা Poetryটা Fact না হইয়াও সরস ও মনোহর।[৩৬]

চিত্র ১৪ : লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন

ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার বিষয় আলোচনা করে ঐতিহাসিক প্রবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় *বঙ্গদর্শন*-এ *লক্ষণ* "সেনের পলায়ন কলঙ্ক" নামক যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকলার দৃষ্টিতে তার জবাব লিখেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে অনেক স্নেহ করতেন অবনীন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথেরও ছিল গুরুভক্তি। সেই সাথে

Dhaka University Institutional Repository

ছিল প্রাচ্যচিত্রকলা পুনরুদ্ধারের প্রতি গভীর অনুরাগ। যার প্রমাণ মেলে অধিক বেতনে চাকরি ছেড়ে শিল্পকলা চর্চায় আত্মনিয়োগ করায়। আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে গুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে দেড়শ টাকা বেতনের চাকরি ঠিক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে গুরুর পথে চিত্রকলা রচনায় স্বাধীনতার হানি হবে বিধায় সে চাকরি তিনি করেননি।[৩৭] গুরু অবনীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা ধারায় সুরেন্দ্রনাথের কাজের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রবাসীর ১৩১৬ পৌষ সংখ্যায় 'শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু' শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেখানে অবনীন্দ্রনাথের প্রেরিত চিঠির উদ্ধৃতাংশ দেয়া হয়েছিল। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> সুরেন্দ্রনাথের একান্ত দীন ও দরিদ্র অবস্থা হইলেও সে পয়সা উপায়ের অন্য পন্থা ছাড়িয়া এইকার্যে লাগিয়াছিল। তাহার এমন দুরবস্থা যে আমি কম্বল কিনিয়া দিলে তবে সে শীত কাটাইয়াছে, নচেৎ শীতের দিনে সে একখানি চাদর মাত্র গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত। এত দরিদ্র, তাহার পক্ষে ছবি আঁকা (তাও আবার দেশী ছবি) লইয়া পড়িয়া থাকা কতটা মনের তেজ আবশ্যক। তাছাড়া সুরেন আমাদের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে নিজের যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল আমার আর কোন ছাত্র (নন্দলালও নয়) সেরূপ পারে নাই।[৩৮]

উপরোক্ত আলোচনায় শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের প্রাচ্যচিত্রকলার প্রতি অনুরাগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি ১৯০৯ সালের ২০ নভেম্বর মাত্র ২৪ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মারা যান। ক্ষণস্থায়ী জীবন না হলে এই শিল্পীর হাতে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার বিরাট সম্ভার পাওয়া সম্ভব হতো। তবু তাঁর অবদান কম নয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের *The Cresent Moon* গ্রন্থ প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রত্যেকের দুটি করে ছবি সহযোগে। অবনীন্দ্র প্রবর্তিত তৎকালীন নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারার সুরেন্দ্রনাথের স্বকীয় ভঙ্গিতে এ চিত্র সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

চিত্র ১৫ : The Cresent Moon গ্রন্থের অলংকরণ (কাগজের নৌকা)

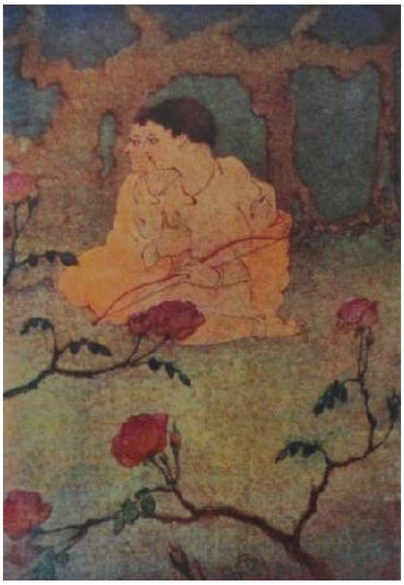

চিত্র ১৬ : The Cresent Moon গ্রন্থের অলংকরণ (আশীর্বাদ)

১৯০৮ সালে *Indian Sculpture and Painting* গ্রন্থে তাঁর চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক সময়ে তাঁর অঙ্কিত চিত্র দ্য স্টুডিয়ো (লন্ডন), ভারতী, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর আঁকা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন', 'শ্রীরামের সাগরশাসন', 'নারদ', 'নহুত', 'কারাগারে শিশুকৃষ্ণ', 'হরপার্বতী সংবাদ', 'মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য', 'বিপন্ন দুর্বাশা', 'কার্তিকেয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য চিত্র।

চিত্র ১৭ : কার্তিকেয়, ২৪.৪ × ২৫.৭ সেমি, উড ব্লক প্রিন্ট, ১৯১০

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত তিব্বতী দেব-দেবতার ছোটো ছোটো ছবির নকল করেছেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি হ্যাটারস্লি তাঁতের কাজ জানতেন। এ কাজ সকলকে বিনা পারিশ্রমিকে শেখাতে প্রস্তুত ছিলেন।

বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় এই শিল্পী অবনীন্দ্র চিত্ররীতি অনুসরণ করে জীবনের শিক্ষাবনিশ পর্বে মূলত ইতিহাস ও পুরাণনির্ভর চিত্র এঁকে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলার প্রাচ্য-ঐতিহ্যের চিত্রকলা পুনরুদ্ধারের প্রতি গভীর অনুরাগের বশবর্তী হয়েই দেব-দেবী ও ইতিহাস-পুরাণনির্ভর চিত্রকলা এঁকেছেন। তিনি সল্পায়ু না হলে তাঁর কাছ থেকে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হতো।

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৭–১৯৬৪)

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছাত্রদের মধ্যে সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন শিল্পী, শিক্ষক এবং প্রাবন্ধিক। প্রাচ্যচিত্রকলার ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধে তিনি তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। লেখালেখির অভ্যাস বলা যায় পৈতৃক সূত্রে। কারণ পিতা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক।

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাতা শরৎকুমারী দেবীর গর্ভে ১৮৮৭ সালের ২৯ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করে ১৯০৩ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। এরপর ১৯০৭ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদারের সহপাঠী হয়ে অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রবিদ্যা শেখেন। লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীমতী সি.জে হেরিংহ্যামের অজন্তা দেয়ালচিত্রের অনুলিপি করার জন্য তিনি ১৯০৯ ও ১৯১০ সালে

Dhaka University Institutional Repository

দুইবার অজন্তায় গিয়েছিলেন। ভারতের প্রাচীন চিত্রবিদ্যার গতি-প্রকৃতির বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এই অনুলিপি চিত্রণের মধ্যে। সমরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবেও ছিলেন প্রাচীন চিত্রকলার নিগূঢ় রহস্যের প্রতি অধিক কৌতূহলী। সুতরাং এ কাজে তিনি ভারতীয় প্রাচীন চিত্ররীতির স্বরূপ সন্ধান করেছেন হাতে-কলমে।

চিত্র ১৮ : সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত প্রতিলিপি

চিত্র ১৯ : রাধারানী ও নরেন্দ্রদেব সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের *কাব্য দীপালি* গ্রন্থের ২য় সংস্করণে (১৯৩১) সমরেন্দ্রনাথ অঙ্কিত 'আবির্ভাব'

ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধানে আগ্রহী ছিলেন জীবনের প্রথম থেকেই। ফলে তৎকালীন *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* সাময়িক পত্রিকায় সচিত্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন। অজন্তা অনুলিপির অভিজ্ঞতার পর অজন্তা গুহার চিত্রাবলি থেকে হাতের মুদ্রা সম্বন্ধে "উইথ দি ফাইভ ফিঙ্গারস" শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন। এ প্রবন্ধটি ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি থেকে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। ১৯১৩ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারতীয় শিল্পীরূপে শিল্প বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথের সময় কলাবিদ্যায় বিষয় বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা করা শুরু হয়। এই বক্তৃতা বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা নামে ১৯২১–১৯২৯ সালের মধ্যে দেয়া হয়েছিল। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে এর পূর্বেই কলাবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল এবং ভারতের সর্বপ্রথম ভারতীয় শিল্পীরূপে সমরেন্দ্রনাথই শিল্প বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে ২ জানুয়ারি লাহোরের 'মেয়ো স্কুল অব আর্টর্স'-এ সহকারী অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। পরে উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন এবং ১৯২৮ সালে চিত্রবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে এক বছরের ছুটি নিয়ে ইউরোপ যান। ইউরোপ থেকে শিক্ষা শেষে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে ফিরে আসেন এবং ২২ নভেম্বর অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। লাহোরের 'মেয়ো স্কুল অব আর্টস'-এ তিনি প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ।[৩৯] শিল্পী আব্দুর রহমান চুঘতাই সমরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছাত্রদের একজন। আব্দুর রহমান চুঘতাই প্রাচ্যরীতির অন্যতম শিল্পী।

ইউরোপ ভ্রমণের সময় সেখানকার চিত্রকলার বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি অনুশীলন করেছিলেন। কিন্তু সেসব রীতি-পদ্ধতিতে প্রভাবিত হয়ে নিজের আদর্শ ও স্বকীয়তাকে ত্যাগ করেননি। তিনি দেশে ফিরে স্বকীয় আঙ্গিক

Dhaka University Institutional Repository

ও পদ্ধতি নিয়ে চেষ্টা করেছেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময় কাশ্মীরের দৃশ্য ও পুষ্প-পত্রালির কয়েকটি চিত্রে।

১৯১৩ সালে 'কোয়েস্ট অব বিলাভেড', ১৯১৭ সালে 'দ্য ফাইনেল', কাজরী চিত্র *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯১৭ সালেই প্রবাসীতে ছাপা হয় 'মধুলুব্ধ' চিত্রের প্রতিলিপি। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যিনি কিনা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারার কঠোর সমালোচনা করতেন, তিনিও চিত্রটির প্রশংসা করেছিলেন।[৪০]

চিত্র ২০ : শিরোনামহীন, এচিং
২৪.১ × ১৪.৫ সেমি, ১৯২০

চিত্র ২১ : বসন্ত (Spring), এচিং
৩৯.৯ × ১৯.৫ সেমি, ১৯২০

তিনি চারুকলার ন্যায় কারুকলাকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। এচিং, ধাতু, দারুশিল্প, ধাতুর ওপর জুয়েলারি, এনামেলের নানা প্রকার নকশার কাজের মাধ্যমে লাহোর স্কুলে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড়ি, কাংড়া চিত্রের সমঝদার ছিলেন। লাহোর মিউজিয়াম ও নিজস্ব সংগ্রহের জন্য পাহাড়ি চিত্র সংগ্রহ করেছেন। নিজের সংগৃহীত চিত্রগুলো দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

১৯৪১ সালে লাহোর 'মেয়ো স্কুল অব আর্টস' থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ওই বছরই তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি নানান দায়িত্ব পালন করেছেন। লাহোরের সরকারি 'আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস ডিপো'র কন্ট্রোলার, লাহোরের সেন্ট্রাল মিউজিয়ামের কিউরেটর ছিলেন। তিনি লাহোরের 'পাঞ্জাব ফাইন আর্ট' সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই শিল্পী দীর্ঘজীবন লাহোরে চাকরি করায় এখানে বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সপরিবারে দিল্লি চলে আসেন। জীবনের শেষভাগে কলকাতায় বাস করেন। ১৯৬৪ সালের ৩০ মার্চ কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সমরেন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত প্রবন্ধকার ছিলেন। শিল্পের নানান বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকায় যা বের হয়েছে তা গবেষণামূলক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো—*ফুলকারী ওয়ার্ক ইন দ্য পাঞ্জাব* (মডার্ন রিভিউ ১৯১২), *ইন্ডিয়ান পোর্ট্রেটস* (মডার্ন রিভিউ ১৯১৮), *দ্য শিখ স্কুল অব পেইন্টিং* (রূপম ১৯২২) প্রভৃতি। ১৯২২ সালে তিনি লাহোরের চিত্রশালা সম্বন্ধে সচিত্র গাইড তৈরি করেছেন—Catalogue of paintings in the Central Museum Lahore নামে।

Dhaka University Institutional Repository

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাজের বৈশিষ্ট্যাবলি ও বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় তাঁর অবদান :

(ক) কারুশিল্পকে উন্নত করেছেন।

(খ) ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

(গ) সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রাচ্যচিত্রকলার নানা বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন।

(ঘ) শিল্পবিষয়ক বক্তৃতা প্রদানে ভারতশিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

(ঙ) তামার ফলকে এচিং এবং এনামেল জুয়েলারির সূক্ষ্ম শিল্প তাঁর নিজস্ব অবদান।

(চ) কাঠ ও ধাতু কারুকলার বিশেষ শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

(ছ) তিনি ছিলেন পাহাড়ি চিত্রের বড়ো সংগ্রাহক।

(জ) প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী অজন্তা চিত্র তিনি স্বচক্ষে দেখে অনুধাবন ও অনুলিপি করেছেন।

(ঝ) নব্য-বঙ্গীয় শিক্ষাধারা বহির্ভারতে বিস্তারে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে বাংলার প্রাচ্যরীতির চিত্রধারার বিস্তার ঘটিয়েছেন।

(ঞ) এচিং-এ বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

(ট) ইউরোপ ভ্রমণের পর নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার আদর্শ থেকে দূরে সরতে থাকেন। তাঁর এই পর্বের কাজকে কমল কুমার সরকার ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকর্মের সমতুল্য মর্যাদা দিয়েছেন।[৪১]

শৈলেন্দ্রনাথ দে (১৮৯১–১৯৭২)

শৈলেন্দ্রনাথ দে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যে পাঁচজনকে পঞ্চপাণ্ডব বলতেন—শৈলেন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। তিনি ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ধ্রুবনাথ এলাহাবাদে চাকরি করতেন। এ কারণে শৈলেন্দ্রনাথের বাল্যকাল ও কৈশোর এলাহাবাদে কেটেছে। এরপর অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হন। তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কে ভেঙ্কটাপ্পার সমসাময়িক ছাত্র।

আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে ১৯১৫ সালে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক নন্দলাল বসুর সহযোগী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি শিক্ষকতা পেশার সাথেই যুক্ত ছিলেন। কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে বেনারসের 'ভারত-কলাভবন'-এ (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) চারুকলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বেনারসে কয়েক বছর শিক্ষকতার পরে জয়পুরের Maharaja School of Arts স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে যোগ দেন ১৯২৫ সালে।[৪২] এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ভাইস-প্রিন্সিপাল পদেও চাকরি করেছেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে মেঘদূতের চিত্রগুলো উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের কাব্য অবলম্বনে তিনি অনেক বিখ্যাত চিত্র এঁকেছেন। এর মধ্যে 'বিরহী যক্ষ' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত ও হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র তিনি এঁকেছেন জলরঙে অবনীন্দ্রসৃষ্ট ওয়াশ পদ্ধতিতে। তাঁর যশোদা এবং বালক কৃষ্ণ চিত্রে রাজপুত এবং মোগল চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ করা যায়।[৪৩] সমসাময়িক পত্রিকাগুলোতে তাঁর কাজগুলো

Dhaka University Institutional Repository

ছাপা হতো। তাঁর বিখ্যাত চিত্রগুলো হলো—অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু, রামের বনগমন, মা যশোদা, জগদ্ধাত্রী, অন্ধমুনি, রাজলক্ষ্মী, মানস সরোবর, গোয়ালিনী, বৃষভবাহন শিব ও জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি। শৈলেন্দ্রনাথ ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি এলাহাবাদে মৃত্যুবরণ করেন।

চিত্র ২২ : শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত নির্বাসিত যক্ষ, ১৯১৮

চিত্র ২৩ : শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত জগদ্ধাত্রী

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১–১৯৭৫)

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের প্রথম পর্বের শিল্পী। তিনি প্রেমভক্তি-পরায়ণ সাধক শিল্পী। তিনি ১৮৯১ সালের ৩০ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবোচিত বিনয়, সরলভাব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে তাঁর চরিত্র মাধুর্য প্রকাশ হতো। ক্ষিতীন্দ্রনাথ কীর্তন গানের সাধনা ও চর্চা করতেন। নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন শিখেছেন। কীর্তন করতেন। কীর্তন গায়ক রূপেও তিনি পরিচিত ছিলেন। গ্রামীণ যাত্রা, কীর্তন, ব্রতপূজার নান্দনিক সৌন্দর্যে মোহিত ছিলেন। ১৯০৭ সালে ১৬ বছর বয়সে ক্ষিতীন্দ্রনাথ কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। পরে অবনীন্দ্রনাথের কাছে 'ইন্ডিয়ান পেইন্টিং' ক্লাসে (১৯০৮–০৯) দীক্ষা নিতে শুরু করেন এবং আর্ট স্কুলে প্রায় ছয় বছর শিক্ষালাভ করেছেন।

ছাত্র অবস্থায় অবনীন্দ্র রীতির অনুসারী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের স্কুলের উদ্দেশ্য অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অর্জনকে উপস্থাপিত করা। ক্ষিতীন্দ্রনাথের শিল্পে তাঁর যথাযথ প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই রেখা রচনায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রেখার সূক্ষ্মতায়, বর্ণের মাধুর্যে, লাবণ্যে অপূর্ব ভাব-সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতেন চিত্রে।

কালিদাসের কাব্য নাটক যুগে যুগে ভাস্কর-চিত্রকরদের প্রলুব্ধ করেছে রূপানুবাদের তাগিদে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার শিল্পীজীবনের সূচনাপর্বে কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* নাটক থেকে 'শকুন্তলা' চিত্রায়ণ করেছিলেন। ১৯১১ সালে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর প্রদর্শনীতে সাতটি ছবি প্রদর্শিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। এর মধ্যে 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' ছবিটি তৎকালীন বাংলার গভর্নর-পত্নী লেডি হার্ডিঞ্জ কিনে নিয়েছিলেন।[৪৪]

ভগিনী নিবেদিতার *মিথস অব দ্য হিন্দুস অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস* বইয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সাতটি চিত্র সংযোজিত হয়েছিল। প্রতিটি চিত্র রেখার সৌকুমার্যে বর্ণিকাভঙ্গে ও ভাবলাবণ্যে নিখুঁত ও সার্থক সৃষ্টি।

চিত্র ২৪ : নিবেদিতার মিথস বইয়ের জন্য অঙ্কিত 'রাধা ও কৃষ্ণ'

লর্ড রোনাল্ডস ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের পুনর্গঠন ও আর্ট জার্নাল প্রকাশের জন্য আর্থিক মঞ্জুরি দেন। আর্থিক মঞ্জুরি ঘোষণার উদ্দেশে রোনাল্ডসের আমন্ত্রণে ১৯১৯ সালে গভর্নমেন্ট হাউসে সোসাইটির প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্র প্রশংসিত হয়।[৪৫]

ক্ষিতীন্দ্রনাথের কর্মজীবন কাটে শিক্ষকতায়। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট শিল্পবিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৯২০-এর জানুয়ারি থেকে। তখন ক্ষিতীন্দ্রনাথ শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন নন্দলাল বসু। সহকর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ দে ও ওড়িশার কৌলিক বৃত্তিজীবী মূর্তিকর গিরিধারী মহাপাত্র। নন্দলাল বসু সোসাইটির চাকরি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতন কলাভবনে যোগ দিলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।[৪৬]

১৯০৯-২২ সালের মধ্যে আঁকা ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছাব্বিশটি চিত্র নিয়ে অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে একটি বই প্রকাশ করেন। বইটি ছিল অর্দ্ধেন্দুকুমারের ভারতীয় আধুনিক শিল্পী সিরিজের প্রথম বই। বইটিতে তিনি শিল্পীর কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন ২৬টি চিত্রের সহযোগে।[৪৭]

১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্রিতা* কাব্য সংকলনে ক্ষিতীন্দ্রনাথের 'পুষ্পচয়িনী' ছাপা হয়। এ চিত্রে ক্ষিতীন্দ্রনাথের নিজস্ব ঢং-এর পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৫ : বিচিত্রিতা গ্রন্থে মুদ্রিত
ক্ষিতীন্দ্রনাথের 'পুষ্পচয়িনী'

চিত্র ২৬ : যবন হরিদাস

গ্রামীণ পরিমণ্ডলের ধর্মীয় উপচার, গ্রামীণ কথকথা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী চেতনা ও বিন্যাস তাঁর চিত্রের বিষয় ও উপকরণ। মানসিকতায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হওয়ায় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিভাব তাঁর চিত্রসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন।

প্রাচ্য চিত্রধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বিমাত্রিকতা। এই দ্বিমাত্রিকতার নান্দনিক উপস্থাপন লক্ষ করা যায় তাঁর চিত্রে। বাংলা ঘরানায় ভক্তিরসাপ্লুত বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর চিত্রে।

চিত্র ২৭ : রাধিকা

চিত্র ২৮ : রাধাকৃষ্ণের মিলন, টেম্পারা

চিত্র ২৯ : রাধার তমাল বৃক্ষ আলিঙ্গন

১৯২০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সোসাইটির শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৩৭ সালে দেবাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস'-এ যোগ দেন। এরপর ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলার প্রধান হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৬৪ সালে বিভাগীয় প্রধান পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৪৮] ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৭৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী চিন্তামণি কর ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন। তিনি নব্য-বেঙ্গল স্কুল ধারার প্রেক্ষাপটে ক্ষিতীন্দ্রনাথের যে মূল্যায়ন করেছেন তা উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর এই মূল্যায়ন শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রাচ্যচিত্রকলার বিশেষ অবদানের সাক্ষ্য দেয়। তিনি লিখেছেন :

> শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচনা, ধর্ম, পুরাণ, মহাকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী বা ঐতিহ্যগত যে কোন বিষয় ভিত্তিক হোক না কেন, সেগুলিতে সহজে প্রতিভাত ও অনুভূত হবে গ্রাম্যজীবনের ছন্দ ও রূপ। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। চিত্র রচনার মাধ্যমেই সম্পাদিত তাঁর ধর্ম আরাধনা। নব্যবঙ্গীয় শিল্পকলাকে অনেকে বেঙ্গল রেনেসাঁস বলে অভিহিত করেছেন। ইতালীয় রেনেসাঁসের খ্যাতনামা সাধক শিল্পীর মত ক্ষিতীন্দ্রনাথকে অনায়াসে বেঙ্গল রেনেসাঁসের ফ্যাঁ অ্যাঞ্জেলিকো বলা যেতে পারে।[৪৯]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতে, ধারণাগত বিশ্ব Conceptual world ছিল ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাজের শৈল্পিক উৎসাহ। তাঁর কাজের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠেছিল অনুভূতির তীব্রতায়। প্রশ্নাতীত ছন্দ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাঁর কাজ।[৫০] কৃষ্ণলাল দাসের মন্তব্যেও ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রের ছন্দ বিষয়টি ব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি *শিল্প ও শিল্পী* গ্রন্থে লিখেছেন :

> ক্ষিতীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বলিষ্ঠ দীর্ঘ রেখাগুলিই চিত্রের প্রাণবস্তু। সমস্ত চিত্রই জলরঙ ও অবনীন্দ্র পদ্ধতিতে চিত্রিত—কিন্তু উহার মধ্যেও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। উহাদের একটা নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা আছে। দীর্ঘ তাল-বিভাগ ও ছান্দিক লালিত্যের উপরই শিল্পী অধিক নির্ভর করেছেন এবং ঐ নির্ভরতা পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক হয়েছে।[৫১]

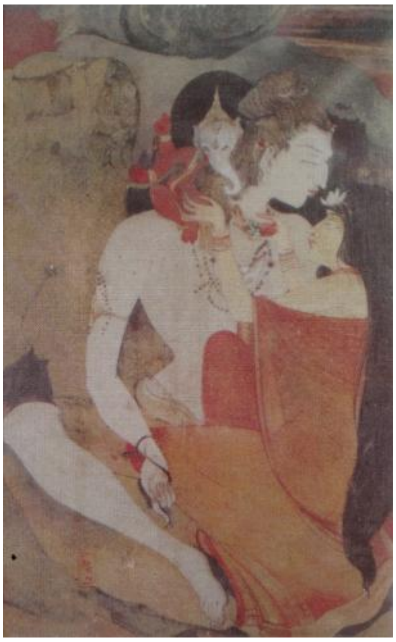

চিত্র ৩০ : গণেশ-জনকজননী
আনুমানিক সময় : ১৯৩৫

চিত্র ৩১ : আকাঙ্ক্ষা, ওয়াশ পদ্ধতির জলরং ও সোনা ব্যবহার, ৩৩.৫ × ১৪.৫ সেমি, ১৯২৫

ক্ষিতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলার চিত্রগুলো এঁকেছেন অতীব প্রেমভক্তিরসে। তাঁর ঈশ্বরচিন্তা ও অধ্যাত্মচেতনাই এসব চিত্রকর্মের ভাব-সৃষ্টিতে স্বকীয়তা দান করেছিল। কমল সরকারের মতে, ‘অকম্পিত সূক্ষ্ম রেখার সাহায্যে ভক্তি ও প্রেমরসে আপ্লুত অভিব্যক্তিই তাঁর চিত্রকলার প্রধান বিষয়।’[৫২] অর্থাৎ অধ্যাত্মসাধনায় বাসনায় তিনি চিত্রকলায় ফুটিয়ে তুলতেন কৃষ্ণপ্রীতি ও চৈতন্যদেবের মোহাবেশ। অধ্যাত্মসাধনা ও শিল্পীসাধনা একীভূত হয়েছিল তাঁর চেতনায়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩২ : সন্ন্যাসী হবার পর শ্রীচৈতন্যের মাতৃদর্শন
মাউন্ড বোর্ডের ওপর জলরং
৩৬.১ × ২৫.৪ সেমি, ১৯৫০

চিত্র ৩৩ : Shri Chaitanoya bidding farewell to mother leaving for Puri, মাউন্ড বোর্ডের ওপর জলরং
৩৯.৩ × ১৯.৬ সেমি, ১৯৫০

গঙ্গা-যমুনা, সরস্বতী, পুরুরবা, ধ্রুব, মনসা, উর্বশী তাঁর প্রশংসিত চিত্র। 'গঙ্গা-যমুনা' চিত্র এঁকেছিলেন ভিন্ন বর্ণিকা অবলম্বন করে। গঙ্গা-যমুনার রূপকল্পনায় নতুনত্ব ও অভিনবত্ব এনেছেন। অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গঙ্গা-যমুনার চিত্রে প্রতীকবাদের এমন সার্থক রূপায়ণ হয়েছে, যা তাঁকে বর্তমান যুগের কলাকারগোষ্ঠীর পুরোভাগে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত।'[৫৩]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে ধর্মীয় ভক্তিরসের চিত্রায়ণ করে সমসাময়িক ভক্তি ধারায় অবদান রেখেছেন। কিন্তু প্রাচ্যরীতির চিন্তাধারার শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মতো শিল্পের আধুনিকতা উত্তরণে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেননি। এ ছাড়া বলা যায়, তাঁর চিত্রকলা আধ্যাত্মিক চাহিদাজাত। বাস্তবতা থেকে প্রতিনিয়ত যে উপলব্ধি, এর বহিঃপ্রকাশ তাঁর কাজে নেই।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাজের বৈশিষ্ট্য ও বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় তাঁর অবদান :

(ক) অবনীন্দ্র উদ্ভাবিত বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন চৈতন্যলীলা অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে 'চৈতন্যসিদ্ধ' শিল্পী বলতেন।

(খ) প্রাচ্যরীতির অকম্পিত ও সূক্ষ্ম রেখার ব্যবহার চরম সার্থকতায় ব্যবহার করেছেন তাঁর অঙ্কিত চিত্রে।

(গ) অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন শৈলীকে আদর্শ মেনে নিয়ে চিত্র এঁকেছেন। বোর্ডের ওপর জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতি তাঁর কাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) উচ্চস্তরের রেখা, বর্ণ, ভাব ও পরিবেশ ব্যবহারে ভারতীয় নবীন চিত্রকলা পদ্ধতিতে বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছেন।

(ঙ) ভারতের ঐতিহ্য সুষ্ঠুভাবে বজায় রেখে তিনি চিত্রপটে দেব-দেবী ও মনুষ্যমূর্তি এবং বেশবাস ও অলংকরণ রচনায় নতুন পথ ও পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন।[৫৪]

(চ) সূক্ষ্ম বলিষ্ঠ দীর্ঘ রেখা তাঁর চিত্রের প্রাণবস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৪ : জয়দেব পদ্মাবতী

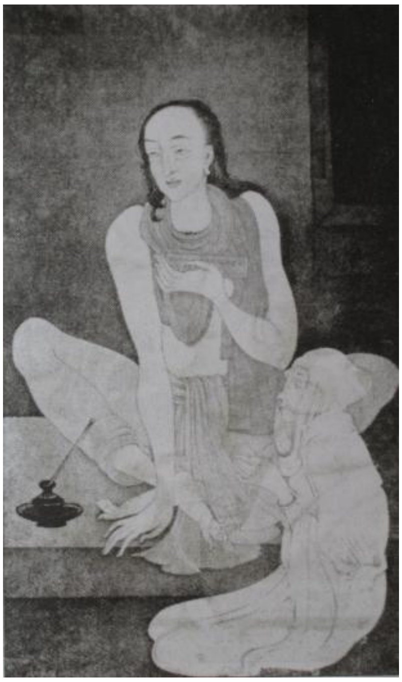

চিত্র ৩৫ : গীত-গোবিন্দ, মাউন্ড বোর্ডে জলরঙে ওয়াশ ৩৩ × ২৩.৪ সেমি, ১৯৫০

(ছ) শিক্ষক হিসেবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে প্রাচ্যচিত্রকলা রীতিকে বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেছেন।

(জ) তাঁর রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য সিরিজচিত্রে বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

চিত্র ৩৬ : গীত-গোবিন্দ, জলরং (ওয়াশ)

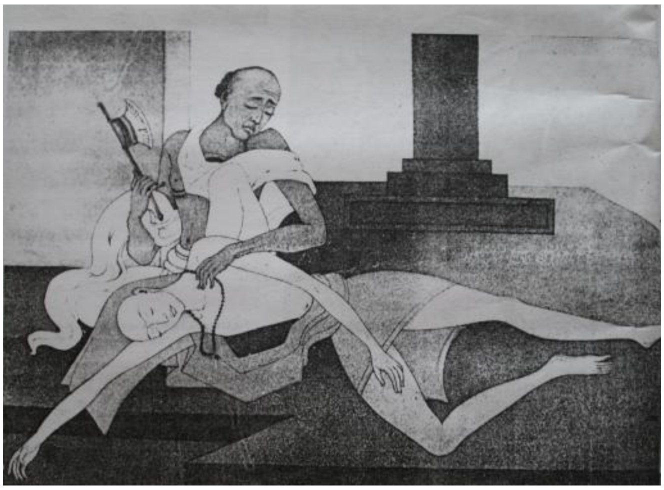

চিত্র ৩৭ : Vasudeva sarvabhouma nursing sri chattanya

সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯২–১৯৭০)

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও বাংলা ঘরানার অন্যতম শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর বহুমাত্রিক শিল্পী। তিনি শান্তিনিকেতন শিল্প ঘরানার প্রথম দিককার শিক্ষক, বাংলার নবজাগরণের সার্থক স্থপতি, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী এবং বিশ্বভারতীর সুদক্ষ সাংগঠিক ও প্রশাসক। সুরেন্দ্রনাথ এত কর্মযজ্ঞের মধ্যেও ছিলেন লাজুক, নম্র, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী। শান্তিনিকেতনের সকল কাজ করতেন অন্তরালে থেকে। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে।

Dhaka University Institutional Repository

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখা যদি আর্ট হয়, তবে সেই অর্থেও সুরেন্দ্রনাথ মস্তবড় আর্টিস্ট।'[৫৫]

সুরেন্দ্রনাথ কর বিহারের মুঙ্গের জেলার হাবেলি খড়গপুরে ১৮৯২ সালে ৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। সম্পর্কে শিল্পী নন্দলাল বসুর পিসতুতো ভাই। নন্দলালও একই গ্রামে জন্মেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতার নাম দীননাথ কর এবং মায়ের নাম মোক্ষদা দেবী। স্কুলে পড়ার সুযোগের অভাবে কিছুদিন জামালপুর রেল স্কুলে পড়া ছাড়া বাড়িতেই পড়াশোনা করেছেন। এরপর ১১ বছর বয়সে কলকাতায় চলে আসেন পড়াশোনা করার জন্য এবং এক বছর পর ১৯০৫ সালে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। থাকতেন মামাবাড়িতে।[৫৬] সেখানে নন্দলালের সান্নিধ্যে চিত্রশিল্পী হবার প্রেরণা পান এবং নন্দলালের কাছে তাঁর ছবি আঁকার হাতেখড়ি হয়।

১৯১১ সালে ম্যাট্রিক পাস করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে চিত্রকলার শিক্ষা নেন। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে ১৯১২–১৩ সালে অজন্তার ছবি থেকে নেয়া অলংকার ও নানা মুদ্রার ড্রয়িং করেছিলেন। এসব ড্রয়িং ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার শুরু থেকে তাঁর আঁকা ছবি সোসাইটির বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ভিত্তিচিত্র আঁকতে শুরু করেন। পূর্বের অজন্তা অনুলিপির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সুরেন্দ্রনাথ অজন্তার অনুরূপ নকশা আঁকেন। এ ছাড়া একটি নিসর্গচিত্র ও কবরীতে পুষ্পবিন্যাসরত নারীর ছবি এঁকেছেন। বসু মন্দিরের নন্দলালের অনেক অসমাপ্ত ছবির কাজ শেষ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের এই কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা সভায় যোগ দেন। বিচিত্রা সভার সঙ্গে যুক্ত শিল্পচর্চার এই কেন্দ্রের নাম ছিল *দ্য বিচিত্রা স্টুডিয়ো ফর দি আর্টিস্টস অব নিউ-বেঙ্গল*। বিচিত্রা স্টুডিয়োর কার্যক্রম থেকেই অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্রকলার ধারা নিউ-বেঙ্গল স্কুল বা বাংলা ঘরানা নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে থাকে।[৫৭] ১৯১১–১৯১৭ সালের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার বাংলা ঘরানায় চিত্র এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন। সমসাময়িক সময়ে প্রবাসী, ভারতী, Modern Review পত্রিকায় তাঁর চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট কর্তৃক আয়োজিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীগুলোতে সুরেন্দ্রনাথের কাজ প্রশংসা লাভ করে। এ ছাড়া লন্ডন থেকে প্রকাশিত নিবেদিতা ও আনন্দকুমার স্বামীর *Hindus and Buddhists, Myths and Legends* গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শিলাইদহ গিয়েছিলেন। সাথে ছিলেন নন্দলাল ও মুকুলচন্দ্র দে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিল্পীরা প্রকৃতি ও জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে আসে, যা তাঁদের চিত্রকলার পটপরিবর্তনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনই শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যেও চিত্র তুলে ধরেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কাজ শেষ হলে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ড্রয়িং শিক্ষকের পদে যোগ দেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

নিছক অনুশীলনে ছাত্রদের নিবদ্ধ না রেখে মৌলিক চিত্রাঙ্কনের তালিম দিয়েছেন। ছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার বর্ণনায় সে প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়। তিনি লিখেছেন :

> এতদিন ধরে সন্তোষচন্দ্র মিত্রের কাছে আমরা ড্রইং ক্লাস করে আসছিলাম। ক্লাসে মাটির কলসি কুঁজো ইত্যাদি আঁকতে হতো। এখন থেকে সুরেন্দ্রনাথ আমাদের ড্রইং ক্লাস নিতে শুরু করেন। . . . ড্রইং ক্লাসে অঙ্কন বিষয় অমাদের বদলে গেল। কলসি, কুঁজোর পরিবর্তে সাঁওতালদের ঘর, তারই পাশে একটি গাছ এবং ঘরের খোড়াচালায় কাক বসে আছে ইত্যাদি। অঙ্কন বিষয় পরিবর্তন হওয়াতে মনে বেশ আনন্দই হল। মনে হল এবার আমরা সত্যিকারের ছবি আঁকছি।[৫৮]

অবসর সময়ে অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করতেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিয়ে প্রথম ভিত্তিচিত্র অঙ্কন শুরু করেন। যার বিষয় ছিল পরম্পরাগত শিক্ষা দর্শন। মাধ্যমের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব এনেছেন। বিলাতি রঙের পরিবর্তে মৃত্তিকাজাত রং ব্যবহার করেছেন।[৫৯] সুতরাং বলা যায়, কলাভবন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সৃজনধর্মী শিক্ষার চর্চা শুরু করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র শান্তিদেব ঘোষের (পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী) বর্ণনায় সুরেন্দ্রনাথ করের শিক্ষকতার অভিনবত্ব প্রকাশ পায়। তিনি "সুরেন্দ্রনাথ কর" প্রবন্ধে লিখেছেন, ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে তিনি এক-একদিন এক-একটি বিষয় এঁকে দিতেন। আমরা খাতায় তার নকল করবার চেষ্টা করতাম। 'কখনো কখনো আমাদের হাতে সাদা খড়ি দিয়ে বলতেন, বারান্দার সিমেন্টের মেঝের উপর বড়ো করে আঁকতে। আমরা তা-ও করেছি।'[৬০]

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের *Gitangali and Fruit-Gathoring* গ্রন্থে প্রকাশিত ছবি দিয়ে গাঁথা এ গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের তিনটি চিত্র ছাপা হয়। এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার, গগনেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর চিত্র ছাপা হয়। এই চিত্রে সুরেন্দ্রনাথের বাংলা ঘরানার চিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্র ৩৮ : Here is they tootstout (যেথায় থাকে সবার অধর্ম)

চিত্র ৩৯ : On the store of the desolote river (অনাবশ্যক)

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখভাল করতে। অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী ও ভ্রমণের ব্যবস্থাপক ছিলেন। ১৯১৯ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠা হয়। সুরেন্দ্রনাথ চারুকলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯34 সাল পর্যন্ত তিনি কলাভবনে অধ্যাপনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষকতার পাশাপাশি বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিভাগে শ্রম ও সাধনায় ব্যয় করতেন। তিনি নন্দলাল বসুর সাথে শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা ও সুন্দর পরিবেশ পরিকল্পনায় সৃষ্টিশীলতার পরিচয় রেখেছেন, যাকে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ চিত্রকলার মতো অবশ্যশিক্ষার বিষয় মনে করতেন। শুধু সাজসজ্জা নয়, স্থাপত্যকলায় সুরেন্দ্রনাথ নতুনত্ব নিয়ে আসেন। তাঁর নকশায় ১৯১৮ সালে 'স্নানের বড়ো কুয়া', 'শমীন্দ্র-কুটির', 'সত্যকুটির', 'সন্তোষালয় বা শিশু বিভাগ'; ১৯১৯ সালে 'দ্বারিক ভবনের দোতালা', 'নেবুকুঞ্জের বাড়ি', 'কোর্ণাক' তৈরি হয়।

১৯২১ সালে গোয়ালিয়র স্টেটের আমন্ত্রণে নন্দলাল ও অসিতকুমারের সাথে বাগগুহাচিত্রের অনুলিপি করতে যান। অজন্তা গুহাচিত্র অঙ্কন পরম্পরাগত শিল্পধারা বুঝতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। এসব কাজের উপকরণ ও করণ-কৌশল তাঁর পরবর্তী কাজে প্রভাব ফেলেছিল। তেমনি বাগগুহা চিত্রণেও যে ফল হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে ফুটে উঠেছে রুচিরা গুপ্তের বর্ণনায়। তাঁর মতে, 'শান্তিনিকেতনের কলাভবনের শিল্প-সংগ্রহে অমলা সংযোজন এই অনুলিপিগুলি নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ বারংবার সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন আশ্রমের নানা উৎসবের অবিরাম সাজসজ্জা ও আলপনায়। ভারতীয় মণ্ডনশিল্পের অব্যর্থ প্রকরণরূপে আজ এগুলি Motif এর মর্যাদালাভ করেছে।'[৬১]

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। প্রথমে তাঁরা ফ্রান্স যান। ফ্রান্সের বিত্তশালী কাহনের প্রাসাদোপম বাসগৃহ, প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার, সারা পৃথিবীর শিল্প সংগ্রহ, মূল্যবান পাণ্ডুলিপি দেখে নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া পারির আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম দেখেছেন। এরপর লন্ডনের Country Council স্কুলে ভর্তি হয়ে লিথোগ্রাফি ও বুক-বাইন্ডিং শিখেছেন।[৬২]

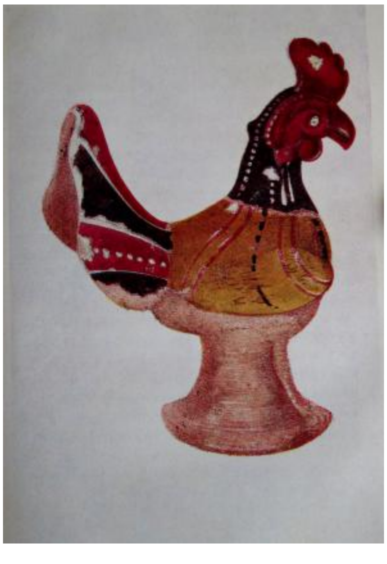

চিত্র ৪০ : ব্রিটিশ মিউজিয়াম স্টাডি থেকে করা প্রথম রঙিন লিথোগ্রাফ

Dhaka University Institutional Repository

দেশে ফিরে এসে কলাভবনে লিথোগ্রাফ শেখানোর কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিথোগ্রাফ ও এচিং-এ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এরপর গিয়েছেন ইতালিতে। মিলানের চার্চে মিখালেঞ্জেলোর বিখ্যাত কাজের নমুনা দেখেছেন। ভ্রমণকালে ব্রিটিশ মিউজিয়মে, ভেনিসে যেসব শিল্পবস্তুর সাথে ভারতশিল্পের মিল দেখেছেন সেসবের রঙিন স্কেচ করেছেন।[৬৩]

সুরেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড থেকে বুক-বাইন্ডিংয়ের যন্ত্রপাতি কিনে এনে শান্তিনিকেতনে শেখাতে শুরু করলেন। তাঁর কাছে বুক-বাইন্ডিং শিখেছিলেন ভি.আর চিত্রা এবং শোকলা সাঁওতাল। পরে শোকলা সাঁওতাল এ বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।[৬৪]

১৯২৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি ভ্রমণ করেছেন। জাভার 'বাটিক' শিল্পে আকর্ষিত হয়ে বাটিক শিখেছেন। তখনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারী-পুরুষের পোশাকে, গৃহসজ্জায়; মঞ্চসজ্জায় বাটিক ব্যবহার করার। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে বাটিকের প্রচলন করেছিলেন।[৬৫]

১৯২৭ সাল শান্তিনিকেতনে গ্রন্থাগার ভবনের দোতলায় ২৬০ বর্গফুটের ভিত্তিচিত্র আঁকতে কারিগরি সহায়তার জন্য জয়পুর আরায়েস পদ্ধতির কারিগর নরসিংলালকে আনেন। এই কাজে সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে আঁকা হয়েছে শালবীথিতে রাতের বৈতালিক, চিনের ড্রাগন, পারসিক ছবির অনুসরণে রিক্ত যৌবনরস ও ইজিপশিয়ান ও বীণাবাদন।

১৯৩৩ সালে *বিচিত্রার* চিত্রশোভিত সংস্করণে সুরেন্দ্রনাথ করের চারটি ছবি ছাপা হয়। সুরেন্দ্রনাথের চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'হার', 'সাজ', 'আরশি', ও 'দ্বারে' কবিতা লিখেছেন। এ কবিতার নামেই চিত্রগুলো পরিচিত।

চিত্র ৪১ : আরশি

চিত্র ৪২ : দ্বারে

চিত্র ৪৩ : সাজ

উপরোক্ত চিত্রগুলো বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার পরিচয় বহন করে। সুরেন্দ্রনাথের ছবির বিষয় ছিল প্রধানত প্রকৃতি, সাঁওতালদের সরল জীবনযাত্রা ও ঋতুবৈচিত্র্য। সাঁওতাল নিয়ে 'সাথী' চিত্রটি বহুল আলোচিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪৪ : সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র

চিত্র ৪৫ : স্কেচ

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সচিব ছিলেন। ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতীর শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ 'বিনয় ভবন'-এর প্রথম অধ্যক্ষ-পরিচালক হন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ অবধি কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েও সুরেন্দ্রনাথ চিত্রকলা জ্ঞানকে বিচিত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারার কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনিকেতন শিল্পধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলার শিল্পকলায় তাঁর স্থাপত্য পরিকল্পনা মৌলিক ও অভিনবত্বে বিস্ময়। বিস্ময় ১৯৩৪ সালে স্থানীয় মাটির সাথে আলকাতরা মিশ্রিত উপাদানে তৈরি 'শ্যামলী' বাড়ি। শুধু শান্তিনিকেতন নয়, ১৯২০ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে তিনি ভারতের নানান প্রদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো করেছেন।[৬৬]

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় সুরেন্দ্রনাথ কর কারুকলায় দুই বছরের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করেন। তাঁর অধ্যক্ষতার কালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অধিগৃহীত হয়। এই মহান শিল্পীকে রবীন্দ্রনাথ অনেক স্নেহ করতেন। *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩১) এবং *আরোগ্য* কাব্যগ্রন্থ (১৯৪১) উৎসর্গ করেছেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭০ সালের ২ আগস্ট সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭১-এ বিশ্বভারতী তাঁকে মরণোত্তর 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের কাজের বৈশিষ্ট্য ও বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় তাঁর যে অবদান নির্দিষ্ট করা যায় তা নিম্নরূপ :

(ক) সুরেন্দ্রনাথ শুধু চিত্রশিল্পী নন, শান্তিনিকেতন শিল্পধারার পরিবেশ, সাজসজ্জা, স্থাপনা, ব্যবস্থাপনা সহযোগে তিনি প্রাচ্যচিত্রকলার পরিবেশ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

(খ) নন্দলাল শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভ্রমণ চালু করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতের ও বিদেশের বিভিন্ন শিল্পতীর্থ স্থান ভ্রমণের সুযোগ করেছেন নিজের ব্যবস্থাপনায়।

(গ) শুধু শান্তিনিকেতন নয়, ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হয়েছে তাঁর পরিকল্পনায়।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর থেকে অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্মীদের বাসোপযোগী ছোটো-বড়ো নানা আকারের বাড়ির পরিকল্পনায় সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব বাড়ির সব কটিই একটি বিশেষ ঢঙে নির্মিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বৈশিষ্ট্যের স্থাপত্যরীতির নামকরণ করেছেন 'সৌরীন্দ্রিক রীতি'।

(ঙ) বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার যুগ থেকে নাটক, মঞ্চসজ্জা উৎসব অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বিত সহযোগে করতেন। অর্থাৎ এসব তাঁরা চিত্রকলার বিষয় হিসেবে বিবেচ্য করতেন।

(চ) সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সুদক্ষ সংগঠক-প্রশাসক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প রূপায়ণে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

(ছ) শিল্পের বহু শাখায় যেমন তাঁর ছিল মেধাবী পদচারণ, তেমনি তাঁর শিল্প ও জীবনের সব বিষয়ে ছিল মাত্রাবোধ।

(জ) শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ রেখে স্থাপত্যকলার পরিকল্পনা করেছেন, কোনো অনুবর্তন না করে।

(ঝ) বাগ বা অজন্তা গুহা নকলের মধ্য দিয়ে ভারতীয় পরম্পরা শিল্পের দীক্ষা নিয়েছেন এবং নব্য-বঙ্গীয় বাংলার চিত্রধারায় সেসব উপকরণের সদর্থক ব্যবহার করেছেন।

(ঞ) তাঁর নিরলস শিল্পীসত্তা খুঁজে নিয়েছে নিত্যনতুন মাধ্যম।

(ট) অজন্তা ও বাগগুহাচিত্রের নানা Motif বারবার সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন শান্তিনিকেতনের সাজসজ্জা ও আলপনায়।

(ঠ) রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে দেশ-বিদেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে জীবনাভিজ্ঞতা এবং শিল্পদর্শন অর্জন করেছেন, পরবর্তী সময়ে বাংলার চিত্রধারায় এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

(ড) লন্ডন থেকে লিথোগ্রাফি, এচিং ও বুক-বাইন্ডিংয়ের কাজ শিখে তা কলাভবনে চালু করেছেন।

(ঢ) রবীন্দ্রনাথের সাথে জাভা, সুমাত্রা ভ্রমণে সেখানকার বাটিকের কাজ শিখে কলাভবনের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(ণ) অবনীন্দ্রনাথের নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারার চিত্রশিল্পী রূপান্তরিত হয়েছেন বহুমাত্রিক শিল্পীতে।

(ত) কলকাতার নাট্যমঞ্চস্থ হতো পশ্চিমি থিয়েটারের আদলে। নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ অনাড়ম্বর মঞ্জসজ্জার ঐতিহ্য তৈরি করে সেই নকলমুখিতা রোধ করেছেন।

(থ) সুরুচি সংযম আর ছন্দবোধ মিশিয়ে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির উপাদান আহরণ করে তাকে সরলীকৃত ও আধুনিক করে নিয়ে তার সাথে বিশেষ স্থানের প্রয়োজন ও স্থানিক পরিবেশকে মিলিয়ে নিজের পরিকল্পনায় স্থাপত্যের জন্ম দিয়েছেন।[৬৭]

(দ) শিল্পজ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় পূর্ত ও স্থাপত্যবিদ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক তালিম ছাড়া বিশেষ পারদর্শী হয়েছেন।

(ধ) শান্তিনিকেতনে ভিত্তিচিত্রের প্রচলন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ন) রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখেছেন।

(প) বাংলার চিত্রকলায় জলরং, গোয়াশ, লিথোগ্রাফ, বাটিক বিভিন্ন পদ্ধতির ফ্রেসকো পদ্ধতিতে কাজ করেছেন।

(ফ) শান্তিনিকেতনে শিল্পীশিক্ষকদের মধ্যে তিনিই প্রথম পারিপার্শ্বিক জনজীবন ও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের ছবি আঁকতে উৎসাহিত করেছেন।[৬৮]

(ব) প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে যেসব দেশকালের শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্প নিদর্শন স্কেচ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে বাংলার শিল্পে তার সদর্থক ব্যবহার করেছেন।

(ভ) অজন্তা বাগ ছাড়াও লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ইতালির ভেনিস মিউজিয়ামে অ্যাবরিজিন্যাল, ইজিপশীয়, ভারতীয়, আফ্রিকান, সুমেরীয় খেলনা ও শিল্পবস্তুর কপি করেছেন এবং এসব করণ-কৌশল ও উপাদান তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করেছেন।

(ম) আধুনিক যুগে তিনিই প্রথম ভারতীয় স্থপতি, যিনি স্থাপত্যকে শিল্পরূপ দিয়েছিলেন।[৬৯]

(য) স্থাপত্যে হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলামিক-চীনা পরম্পরাগত রীতির সমন্বয় করেছেন। তাঁর কাজে আধুনিক মৌলিক বিন্যাসের ছাপ এবং সৌন্দর্য ও উপযোগিতার মেলবন্ধন লক্ষণীয়।

(র) ঔপনিবেশিক প্রযুক্তিবিদ্যার বাইরে ভারতীয় স্থাপত্যচিন্তার প্রবর্তক।

(ল) রবীন্দ্রনাথের বহু নাট্যাভিনয়ের প্রযোজক ছিলেন।

(শ) শান্তিনিকেতনে বুক-বাইন্ডিং করানোর জন্য ইংল্যান্ড থেকে সব যন্ত্রপাতি কিনে এনে এই বিভাগ চালু করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে আর সবচেয়ে বেশি সাথে থেকে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় চারু ও কারুকলার নানা বিদ্যার প্রচলন করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভায় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে।

বীরেশ্বর সেন (১৮৯৭–১৯৭৪)

বীরেশ্বর সেন ১৮৯৭ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ ছিল। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তাঁর আঁকা চিত্র সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পড়াশোনা করেছেন জেনারেল লাইনে। বি.এ (অনার্স) পড়ার সময় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং ১৯১৮ সালে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে চিত্রবিদ্যা শেখেন। ১৯২১ সালে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে বিহার ন্যাশনাল কলেজে (পাটনা) ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন।

১৯২৯ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ সরকারি আর্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে চাকরিতে যোগ দেন।[৭০] এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন অসিতকুমার হালদার। এরপর ১৯৪৫ সালে তিনি 'সুপারিনটেনডিং ক্র্যাফটম্যান' পদে উন্নীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌ সরকারি আর্ট স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হবার পর তিনি উপাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারি আর্ট কলেজের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বীরেশ্বর সেন উত্তর প্রদেশ সরকারের ডিজাইন সেন্টারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। অসিতকুমার হালদারের তথ্য মতে, বীরেশ্বর সেন কিছুদিন Society of Oriental Arts-এর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।[৭১]

বাংলার শিল্প আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক বীরেশ্বর সেন। তিনি সাধারণ শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হয়েও চিত্রবিদ্যায় মনোনিবেশ করেছেন। সাধারণত ওই সময়ে কেউ এম.এ পাস করে শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতেন না। শিল্পের প্রতি ভালো লাগা থেকেই তিনি চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের পর নিজ চরিত্রগুণে সকলের প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। গভীর নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে ছবি আঁকতেন। কাজের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পরিশ্রমী। যার প্রমাণ হলো ১৯১৮ সালে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে তিনি অর্ধশতাধিক চিত্র এঁকে দিয়েছিলেন।[৭২]

প্রথম জীবনের চিত্রাঙ্কনে তিনি ইংল্যান্ডের এডমান্ড ডুলাকের চিত্র রচনার কায়দা-কৌশলের অনুরাগী ছিলেন। ডুরাকের রীতি অনুসরণ করে ওমর খৈয়ামের চিত্র এঁকেছিলেন। এরপর তাঁর কাজে মোগল রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে চিত্রের আঙ্গিক পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তন পাশ্চাত্যের আত্মঘাতী অনুকরণ থেকে প্রাচ্যের বিশুদ্ধ ড্রয়িং ও রেখাবিন্যাসের প্রতি ঝোঁক থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর ওমর খৈয়াম চিত্রগুলোর বর্ণবিন্যাসের মধ্যে একটা শান্ত ও কবিত্ব-মিশ্রিত সুর ধ্বনিত হয়।

চিত্র ৪৬ : শিল্পীর মডেল

চিত্র ৪৭ : সুজাতা

নব্য-বাংলার চিত্রধারার প্রতি অনুরক্ত শিল্পী বীরেশ্বর সেন ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারাকে ভালোবেসে নিজস্ব একটি পথ তৈরি করেছেন। তাঁর চিত্রগুলো অত্যন্ত স্বচ্ছ ও হালকা রঙে চিত্রিত। ভারত শিল্প তথা প্রাচ্যশিল্পের রেখাত্মক গুণ তাঁর চিত্রে লক্ষ্যণীয়। চিত্রের রেখাগুলো সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ, যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কল্পনাপ্রধান ও কবিত্বময় একটি নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়াস। ‘দ্য টয়লেট’, ‘দ্য মিল্ক মেইড’, ‘সুজাতা’ তাঁর বহুল প্রশংসিত শিল্পকর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌ সরকারি স্কুলে যোগদানের পর টেক্সটাইল বিভাগে নানা নতুন ও বিচিত্র সব নকশা ডিজাইনের প্রবর্তন করে ভারতীয় প্রাচীন রীতিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। বীরেশ্বর সেনের আরেকটি বিশেষ উদ্ভাবন, যাতে তাঁর স্বকীয়তায় নতুন মাত্রা পাওয়া যায়, তা হলো তিনি স্বল্প পরিসরে ক্ষুদ্রাকার দৃশ্যচিত্র অঙ্কন করেছেন। এই ক্ষুদ্রাকার দৃশ্যচিত্ররীতি তিনি অবসর গ্রহণের কিছু পূর্বে করেছেন। অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'ঠিক এই রকম ধৈর্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয়মূলক ক্ষুদ্র আকৃতির অথচ বহুল সৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথের আর কোনো শিষ্যের কলমে বড় একটা দেখা যায়নি।'[৭৩]

নব্য-বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা সাধারণত প্রকৃতির ছবি কম এঁকেছেন। বীরেশ্বর সেন প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন। তিনি নাগ্গর ও কাশ্মীর ভ্রমণে প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গ, উন্মুক্ত আকাশ, কুয়াশা, মঠ, মন্দির, নদী, চটি উপত্যকা, বিষয় নিয়ে চিত্র এঁকেছেন। মিনিয়েচার আকৃতির এসব চিত্রে হিমালয়ের সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে। প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির অব্যক্ত রহস্য। গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরেশ্বর সেনের সূক্ষ্ম মিনিয়েচারধর্মী কাজ দেখে বীরেশ্বরের হাত কেটে নিজের হাতে বসিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে প্রশংসা করেছিলেন।[৭৪]

১৯৭৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বীরেশ্বর সেন লক্ষ্ণৌতে পরলোকগমন করেছেন। বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় এই শিল্পীর দক্ষতা ও প্রকৃতিনির্ভর মিনিয়েচারধর্মী চিত্র নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

দুই

উল্লিখিত শিল্পীগণ ছাড়াও প্রাচ্যরীতির শিল্পান্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক শিল্পীই জড়িত ছিলেন। এমন অনেক শিল্পী আছেন, যাঁরা কোনো-না-কোনো পর্বে প্রাচ্যশৈলীর চিত্রাঙ্কন করেছেন। মূলত অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্য চিত্রাঙ্কনের ধারায় শিল্পীদের কাজের বিষয়, মাধ্যমগত বিশিষ্ট্যতাই প্রাচ্যশৈলীকে নির্দিষ্ট করে। এ সময়কার শিল্পীরা পুরাণ ও সাহিত্যনির্ভর ফিগারেটিভ কাজই বেশি করেছেন। মাধ্যমের ক্ষেত্রে জলরং ওয়াশ পদ্ধতি, টেম্পারা, ফ্রেসকো মাধ্যমে কাজ করেছেন বেশি। আর চিত্রের মধ্যে ভারত-চিত্ররীতির ছয়টি গুণ (ভারত ষড়ঙ্গ) প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও শিল্পীরা যত্নবান হয়েছেন। বিষয়, মাধ্যম ও চিত্রে ষড়ঙ্গের গুণাবলি প্রয়োগ বিচারে তাঁদের চিত্রকর্ম প্রাচ্যচিত্রকলার ধারাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। নিচে এমন কয়েকজন শিল্পীর নির্বাচিত শিল্পকর্মের আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হলো :

অবিভক্ত ভারতে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির প্রভূত উৎকর্ষ যাঁর চিত্রকলায় হয়েছিল তিনি হলেন আবদুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৭–১৯৭৫)। তিনি লাহোরের শিল্প-পরিবার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মিয়া করিম বক্সের কাছে চিত্রাঙ্কনের হাতেখড়ি নেন। এরপর ১৯১৪ সালে লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্ট থেকে ফটো লিথোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর লন্ডনে প্রিন্টমেকিং টেকনিকস ও এচিংয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৭৫] এরপর কলকাতায় এসে অবনীন্দ্রনাথের কাছে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির শিক্ষা নিয়েছেন।[৭৬] ফলে তাঁর হাতে নব্য-বঙ্গীয় রীতিতে মুসলিম উত্তরাধিকার মিশেছে। আবদুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকৃতিপ্রধান ফিগারেটিভ চিত্র এঁকেছেন। ওয়াশ পদ্ধতিতে রং ব্যবহারে সূক্ষ্ম লাইন প্রয়োগ তাঁর চিত্রকলায় নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি করেছে। তাঁর শিল্পকর্ম পৃথিবীর চিত্রকলার 'মাস্টার পিস' মর্যাদা পেয়েছে। হিন্দু পৌরাণিক কাব্য, রাধা-কৃষ্ণ, ওমর খৈয়াম বিষয়ে চিত্তাকর্ষক চিত্র এঁকেছেন। এই মহান শিল্পীর কারণেই নব্য-বঙ্গীয় তথা প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা সারা পৃথিবীর বুকে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্র ৪৮ : শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাই

চিত্র ৪৯ : শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাই

চিত্র ৫০ : শিল্পী আবদুর রহমান
চুঘতাই, শিরোনামহীন
কাগজের ওপর জলরং ওয়াশ
৬৫.৩ × ৪৭.৫ সেমি, ১৯৫০

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭–১৯৩৮) ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম দিকপাল। নব্য-বঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভাই। কিন্তু তিনি চারুকলা চর্চা শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের অনেক পরে। জাপানি তিন শিল্পীর ঠাকুরবাড়িতে চিত্রাঙ্কনের সময় ১৯০২–০৩ তিনি চিত্রাঙ্কনে আকৃষ্ট হন এবং সরকারি আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিনারায়ণ বসুর কাছে চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করেন। তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ১৯০৭ সালে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কনের আন্দোলন গতি পেয়েছিল।

চিত্র ৫১ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
শ্রীচৈতন্য সিরিজচিত্র

চিত্র ৫২ : শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজকণ্যা, ১৯২৩

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫৩ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
'ছিপ দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য'

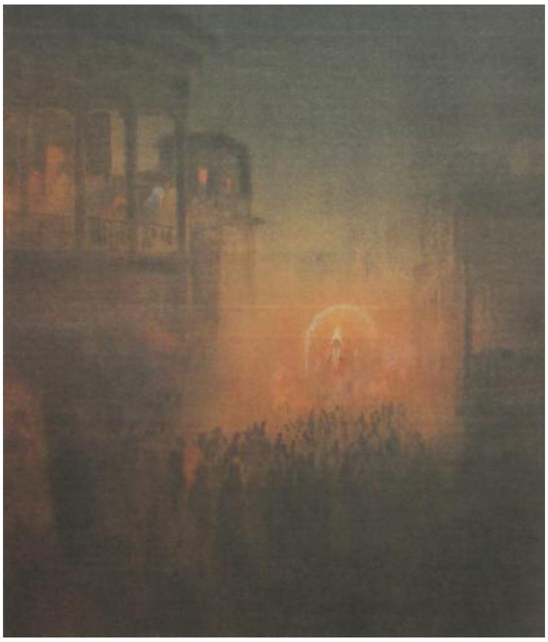

চিত্র ৫৪ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জলরং
'দুর্গাপূজার ভাসানের দৃশ্য'

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটো বোন সুনয়নী দেবী (১৮৭৫–১৯৬২) স্বশিক্ষিত শিল্পী। তাঁর চিত্রকলায় নব্য-বঙ্গীয় তথা প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। 'মুখ্যত জলরঙের মাধ্যমে দেব-দেবীর উপাখ্যান, কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্র অবলম্বনেই তাঁর চিত্রাঙ্কন। বাংলায় গার্হস্থ্য জীবনের রূপ ও রমণীদের মুখচ্ছবি রচনার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। অকৃত্রিম দেশীয় রীতিতে রচিত তাঁর চিত্রকলার ভিত্তি বাংলার পট।'[৭৭]

যামিনী রায় (১৮৮৭–১৯৭২) ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে 'ফাইন আর্ট' বিভাগে পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির চিত্রশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশের সময় ইউরোপের একাডেমিক রীতির অনুরাগী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলার পরম্পরার চিত্রকলার পটশৈলীর প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁর পটভিত্তিক চিত্রকলার আদি পর্বের প্রধান বিষয় ছিল রামায়ণ ও মহাভারতের নারী ও পুরুষ। পরবর্তী পর্যায়ের কৃষ্ণলীলার চিত্র এঁকেছেন মিউরালধর্মী আঙ্গিকে।[৭৮] এভাবে বিভিন্ন বিষয় চিত্রণে প্রাচ্য পরম্পরার পটচিত্রের আঙ্গিককে আধুনিকতায় রূপান্তর করে সময়ের দাবি মিটিয়েছেন। 'সীমিত অথচ লীলায়িত রেখার মাধ্যমে বর্ণাঢ্য রঙে তাঁর পটভিত্তিক চিত্রকলার মুখ্য লক্ষ্য ছিল নয়ননন্দন অঙ্গবিন্যাস এবং অভিব্যক্তির রূপায়ণ।'[৭৯]

সারদাচরণ উকিল (১৮৯০–১৯৪০) অবনীন্দ্রনাথের অধীনে কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কন শিখেছেন। পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে মডার্ন স্কুলে চারুকলায় শিক্ষকতা করার সময় ১৯২৬ সালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নব্য-বঙ্গীয় রীতির চিত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে সেই স্কুল 'সারদা উকিল স্কুল অব আর্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৮০] বলা যায়, বাংলার বাইরে নব্য-বঙ্গীয় তথা প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা বিকাশে এই স্কুলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

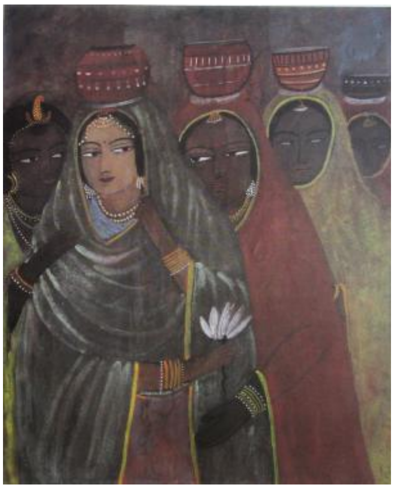

চিত্র ৫৫ : শিল্পী সুনয়নী দেবী, Milkmaid
গোয়াশ এবং জলরং
৩৯.৯ × ৩২.৩ সেমি, ১৯২০

চিত্র ৫৬ : শিল্পী সারদাচরণ উকিল, শিরোনামহীন
জলরং ওয়াশ (কার্ডবোর্ডে পেস্ট করা)
৩৬ × ২৫.৯ সেমি, ১৯৩৯

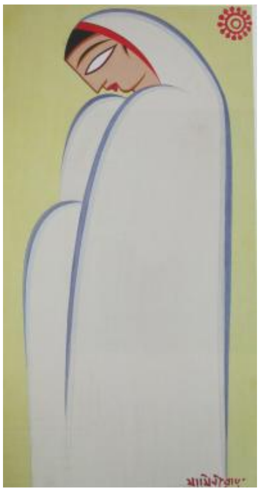

চিত্র ৫৭ : শিল্পী যামিনী রায়
কার্ডবোর্ডের ওপর টেম্পারা
৬৯ × ৩৬.৮ সেমি, ১৯৫০

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৯–১৯৭৫) একাধারে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। প্রথম জীবনে তিনি অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শে কারী ঈ বইস নামের এক ইতালীয় শিল্পী ও ভাস্করের নিকট তিন বছর চারুকলার ওপর শিক্ষা নেন। এরপর 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রবিদ্যা তালিম নিয়েছেন।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২–৫৫) সরকারি আর্ট স্কুলে ১৯১৯ সালে ভর্তি হন এবং ১৯২১ সালে কলাভবনে অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসুর অধীনে চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ শিখেছেন। ১৯২৯ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন।

চিত্র ৫৮ : শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রাসলীলা, জলরং
৫১.৩ × ৬৬ সেমি, ১৯২০

চিত্র ৫৯ : শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মাউন্ড বোর্ডের ওপর ওয়াশ, ৩৮.৮ × ২২.১ সেমি, ১৯৩০

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা (১৯০৩–?) ত্রিপুরার উজির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলাভবনের প্রথম পর্বের ছাত্র। ১৯২১–২৮ সাল পর্যন্ত তিনি নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যরীতির চিত্রবিদ্যা শেখেন।[৮১] তিনি

মিনিয়েচার উপযোগী সূক্ষ্ম কর্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এ ছাড়া বৃহদাকার মুরাল ও ফ্রেসকো চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন।

কালিপদ ঘোষাল (১৯০৬–?) 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯২০ সালে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের কাজ শিখেছেন।[৮২] এরপর ১৯৩০ সালে ইন্ডিয়ান সোসাইটির চারুকলার শিক্ষক হন।[৮৩] তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের টেকনিকে কাজ করতেন। বাংলার প্রাচ্যরীতিতে চর্চিত মিথ যথা বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রাধা-কৃষ্ণ, শকুন্তলা প্রভৃতি বিষয়ে ছবি এঁকেছেন।

চিত্রশিল্পী খগেন রায় (১৯০৭–৮৩) কলকাতা এবং লক্ষ্ণৌ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের পাঠ্যক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় মাদ্রাজ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটস কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন।[৮৪] তৎকালীন সময়ের জাতীয়তাবাদী চিত্রধারা এবং পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার বাইরে তিনি স্বাধীন মাধ্যমে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিত্রাঙ্কন করতেন।[৮৫] এসব চিত্রকলায় প্রাচ্যরীতির নানা অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়।

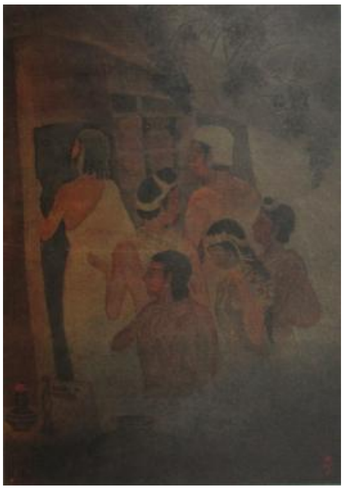

চিত্র ৬০ : শিল্পী ধীরেন্দ্র দেববর্মণ, কুন্তীর দ্বারে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব, টেম্পারা
৩৮.১ × ২৬.৭ সেমি, ১৯৩০

চিত্র ৬১ : শিল্পী কালিপদ ঘোষাল
শিরোনামহীন, টেম্পারা
৩৬ × ২৪.১ সেমি, ১৯৪৩

চিত্র ৬২ : শিল্পী খগেন রায়
হরিণ ও নারী
২৫৪.৫ × ১২১.৯ সেমি, ১৯৪০

রামগোপাল ভিজাইভারগিয়া (১৯০৫–২০০৩) রাজস্থানের শিল্পী। তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্রধারার শিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ দে-র তত্ত্বাবধানে জয়গুরু মহারাজা আর্ট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি জলরং ওয়াশ পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রশৈলীর কাজ শেখেন।[৮৬] তিনি কালিদাসের নাটক রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, ওমর খৈয়ামের কবিতা এবং রাজস্থানী ঐতিহ্যিক ভাবধারায় জীবন-চিত্রণ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[৮৭] অজন্তা গুহা চিত্রের সাবলীল মাধুর্যমণ্ডিত ভঙ্গিমায় ফিগারগুলোতে হাস্যোজ্জ্বল মুখ অর্ধনিমীলিত চোখ, দীর্ঘ কৃশকায় হাত-পা এবং চিকন হাতের আঙুল তাঁর চিত্রে আবেগীয় ভাব আনতে সহায়ক হয়েছে। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য শৈলেন্দ্রনাথের হাত ধরে রামগোপাল ভিজাইভারগিয়া বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় বিশেষ অবদান রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬৩ : শিল্পী রামগোপাল
ভিজাইভারগিয়া, জলরং ওয়াশ
১০১.৬ × ৬৮.৬ সেমি, ১৯৪০

চিত্র ৬৪ : শিল্পী রামগোপাল
ভিজাইভারগিয়া, শিরোনামহীন, জলরং
৯৯.৫ × ৬৬.৫ সেমি, ১৯৪০

চিত্র ৬৫ : শিল্পী রামগোপাল
ভিজাইভারগিয়া, শিরোনামহীন
২২.৯ × ১৭.৮ সেমি, ১৯৪০

রাধাচরণ বাগচী (১৯১০–৭৭) ত্রিশের দশকের কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেন। তিনি ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিভাগে পড়েছেন। তাঁর চিত্রকলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণ ও জাতকের নানা কাহিনিচিত্র উঠে এসেছে। প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বনেও চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর এই চিত্রগুলো মিনিয়েচারধর্মী।[৮৮]

চিন্তামণি কর (১৯১৫–২০০৫) 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিরিধারী মহাপাত্রের কাছে ভাস্কর্য এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে 'ইন্ডিয়ান পেইন্টিং' অনুশীলন করেছেন ১৯৩০–৩১ সাল পর্যন্ত।[৮৯] তাঁর চিত্রকলায় প্রাচ্যরীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

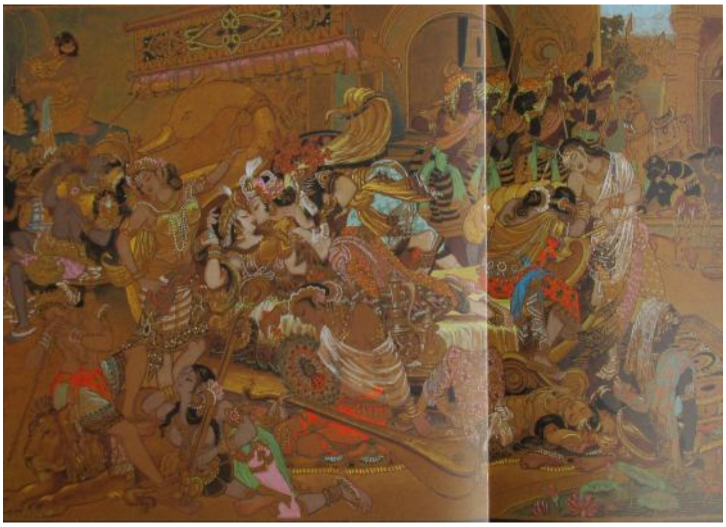

চিত্র ৬৬ : শিল্পী রাধাচরণ বাগচী
শিরোনামহীন, (সোনার কাঠি-রুপার কাঠি)
স্বর্ণালি রঙের কাগজে গোয়াশ, ৩১.৮ × ৪৫ সেমি, ১৯৪০

চিত্র ৬৭ : শিল্পী চিন্তামণি কর
শকুন্তলা, গোয়াশ এবং কালি
৩২.৪ × ১৫.৬ সেমি, ১৯৩৬

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে প্রসার লাভ করেছে শিল্পাচার্য নন্দলালের হাত ধরে। তাঁর প্রথম পর্বের ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪–৮০) বেঙ্গল স্কুলের পরম্পারার চিত্র-ঐতিহ্যকে আধুনিকতায় উন্নীত করেছেন। তিনি ১৯২৯ সালে শান্তিনিকেতনের

Dhaka University Institutional Repository

কলাভবনে শিক্ষাকতায় যোগ দেন। তিনি নন্দলালের ফ্রেসকো চিত্র রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রকৃতির রং রূপ রূপায়ণে তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। নন্দলালের অন্যতম প্রধান ছাত্র হিসেবে বিনোদবিহারীর কাজে প্রাচ্যরীতির মাধ্যম ও টেকনিকের নানা আধুনিকায়ন লক্ষ করা যায়। বিশেষত এগ টেম্পারার বৃহৎ কাজে। তিনি জাপানি শিল্পী ও সমালোচক তাকির অধীনে জাপানি চিত্রকলার কলাকৌশল অনুশীলন করেছেন ১৯৩৬–৩৭ সাল পর্যন্ত।[৯০] ফলে তাঁর কাজে জাপানি কালিতুলির টেকনিকের অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়।

চিত্র ৬৮ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বীরভূম দৃশ্যচিত্র, সিলিং-এ এগ টেম্পারা
কলাভবন কমপ্লেক্স, শান্তিনিকেতন, ২৫৩ × ৬০৬ সেমি, ১৯৪০

চিত্র ৬৯ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বীরভূম দৃশ্যচিত্র, সিলিং-এ এগ টেম্পারা
কলাভবন কমপ্লেক্স, শান্তিনিকেতন, ২৫৩ × ৬০৬ সেমি, ১৯৪০

চিত্র ৭০ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়,
বৃক্ষপ্রেমিক, টেম্পারা ৭৩.৭ × ৪০ সেমি, ১৯৩২

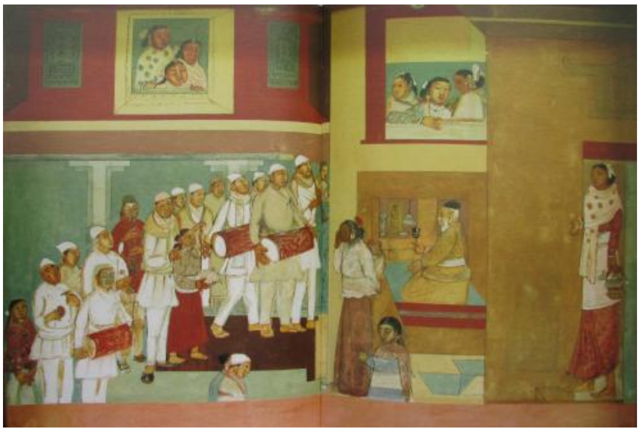

চিত্র ৭১ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নেপাল উৎসবের শোভাযাত্রা
দেয়ালে এগ টেম্পারা, বনস্থালি বিদ্যাপীঠ, ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬–৮০) সনামধন্য চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। তিনি শান্তিনিকেতনে নন্দলালের তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অনুশীলন করেছেন। দিল্লির মডার্ন স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরবর্তী সময় তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতায় যোগ দেন। মূলত ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান পথিকৃতের। তিনি তাঁর কর্মজীবনের ১ম পর্বে প্রাচ্যরীতির নব্য-বেঙ্গল স্কুল ধারার ওয়াশ পদ্ধতিতে ফিগারেটিভ কাজ করেছেন। এ ছাড়া তাঁর জলরং চিত্রে প্রাচ্যরীতির নানা অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে আধুনিক চিত্রকলায় বিশেষ স্বাক্ষর রাখতে সচেষ্ট হয়েছে।

চিত্র ৭২ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ
Hamsadoot, জলরং, ২৯ × ১৯.৪

চিত্র ৭৩ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ
শিরোনামহীন, জলরং, ৩০ × ১৯.৫

চিত্র ৭৪ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ
শিরোনামহীন, জলরং, ২৮.৭৫ × ১৯.৫

চিত্র ৭৫ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ
উপবৃষ্ট রমণী, কাপড়ের ওপর টেম্পারা
১৯ × ৬৪.৫ সেমি, ১৯৩০

চিত্র ৭৬ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ
কলস নিয়ে রমণী, জলরং
২৯ × ২০ সেমি, ১৯৬২

চিত্র ৭৭ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ
শিরোনামহীন, জলরং
৩৪.৫ × ২৫ সেমি

উপসংহার

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় স্বীকৃত নাম 'নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতি। অর্থাৎ জলরঙে ওয়াশ পদ্ধতির চিত্ররীতি। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে এই

Dhaka University Institutional Repository

ধারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছাত্ররা তাঁদের স্বকীয়তা ও নতুনত্ব দ্বারা এই ধারাকে বহুমাত্রিক পরিধিতে বিস্তৃত করেছেন। নবজাগরণের এই সময়কার অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন সুদক্ষ শিল্পী ও শিক্ষক। মূলত উল্লিখিত আলোচনায় যেসব শিল্পীর জীবন-ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাতে লক্ষ্যণীয় যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ঘরানার শিল্পীরাই শিক্ষকতা করেছেন এবং এই ধারার বিস্তার ঘটিয়েছেন। তবে তাঁরা যে কেবল নব্য-বেঙ্গল স্কুল রীতির চর্চা ও শিক্ষা দিয়েছেন তা নয়, স্থান-কাল-পাত্রের দাবি অনুসারে তাঁরা এই আন্দোলনকে বহুমাত্রিক শিল্পচর্চায় রূপ দিয়েছেন। তাই এই সকল শিল্পীর কাজে ওয়াশ পদ্ধতির পরিবর্তে নানা মাধ্যমের চর্চা দেখা যায় এবং গোয়াশ, টেম্পারা, ফ্রেসকো, বিভিন্ন পদ্ধতির বিন্যাস লক্ষ করা যায়। আর এই বিবর্তন ও পরিবর্তন চিত্রকলার কিংবা সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার জীবনীশক্তি। বলা যায়, আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টায় নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতিতে অর্থাৎ বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলায় বৃহৎ প্রাচ্যের চিত্ররীতির বিভিন্ন টেকনিক আত্তীকৃত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথের পর তাঁর ছাত্র নন্দলালের অবদান সর্বাধিগণ্য। এরপর অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীর প্রত্যেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কাজে বেশি মিল বিষয়ের ক্ষেত্রে। তাঁরা প্রায় সকলেই পৌরাণিক ও সাহিত্যবিষয়ক চিত্র অঙ্কন করেছেন। চিত্রে মানুষের ফিগার ব্যবহার হয়েছে। প্রাচ্য পরম্পরার সূক্ষ্ম লাইন, রং, কম্পোজিশন ব্যবহৃত হয়েছে নব নব উপস্থাপনায়। একথা অনস্বীকার্য যে, অবনীন্দ্রনাথের সব ছাত্রই মেধাবী ছিলেন না। এজন্য অনুকরণ দোষে তাঁরা পৌরাণিক ও সাহিত্যনির্ভর কাজের মধ্যেই আটকে ছিলেন। কিন্তু অনেকের মধ্যে পাওয়া গেছে উদ্ভাবনী সৃজনাত্মক শক্তি, যা শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় লক্ষ করা যায়। এই শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর প্রত্যেকেই বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের কাজে, তাঁদের শিক্ষকতায় এবং ছাত্রদের মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠানে ছাপাই ছবি, লিথোগ্রাফ, এচিং, বাটিক, ফ্রেসকো যুক্ত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল সমাজবাস্তবতাসহ বহুমুখী বিষয় নিয়ে চিত্রচর্চা করেছেন। মাধ্যমের ক্ষেত্রেও আছে বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষা। কিন্তু তাঁদের কয়েকজন ছাত্র বাদে প্রায় প্রত্যেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও কৌলীন্য স্থায়ী করেছেন। যে কারণে তাঁদের চিত্র সমসাময়িক সময়ে আবেদনময় হলেও চিরকালীন আবেদনে সেসব চিত্র আজ ম্লান। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্র ধারায় শিল্পীদের প্রদর্শিত পথ থেকেই বাংলার সমগ্র শিল্পীরা তাঁদের পথ খুঁজে নিয়েছেন। নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাকে উতরে নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফলে বর্তমান চিত্রকলা হচ্ছে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার এক বহুমাত্রিক রূপ। যার ভেতর লুকিয়ে আছে দেশজ সংস্কৃতি ও চেতনার মূল সূত্র।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিল্পীদের আরেকটি অবদান গ্রন্থ অলংকরণ। তাঁদের চিত্রকলা দিয়ে সজ্জিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ। ভগিনী, নিবেদিতা ও আনন্দকুমার স্বামীর ও অন্যান্য গ্রন্থ। গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাসে এ ধারায় চিত্র ব্যবহার এক নতুন ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি একথা অনস্বীকার্য যে, অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলায় 'নব্য-বঙ্গীয় ধারা' বলে যে চিত্ররীতি গড়ে উঠেছিল তাকে 'নব্য-ভারতীয় চিত্রধারা'ও বলা যায়। এ ধারার বিস্তারের সময় অর্থাৎ ১৯৪০-এর পূর্ব পর্যন্ত এ ধারার শিল্পীরা প্রাচ্যবোধের নানা উত্তরাধিকার এবং ভারতীয় পরম্পরাগত নানা রীতি-নীতির পরীক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বর্তমান অবধি যেসব শিল্পী প্রাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিকের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের চিত্র ঘরানা তুলে ধরেছেন তাঁদের কাজও বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পীদের কাজ দ্বারা প্রভাবিত।

অতএব বলা যায়, বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার চর্চার শিল্পীদের সমন্বিত প্রয়াসেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলা, যা দেশ, কাল ও ঐতিহ্যের পরিচয়ে স্বমহিমায় বিশ্বচিত্রকলায় স্থান করে নিয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মৃণাল ঘোষ, *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৪৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮–১৪৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৫. চিন্তামণি কর, *শিল্পী ও রূপকলা*, ২য় সং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ. ১২

৬. সমীর ঈশা, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট : এক ঐতিহাসিক অধ্যায়—এক যুগান্তকারী সংগঠন, কলকাতা রাজ্য চারুকলা পর্ষদ পত্রিকা, *চারুকলা*, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, ২০০৯, পৃ. ৩৬

৭. অসিতকুমার হালদার, "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যবর্গ", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬–৫১

৮. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*, কলিকাতা, এ. মুখার্জী, এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩–১৬৪

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১০. মৃণাল ঘোষ, *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৭১

১১. পঞ্চানন মণ্ডল, ভারত শিল্পী নন্দলাল, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩১–৫৩৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

১৪. সমীর সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০০৫, [২য় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮] পৃ. ২৭

১৫. পঞ্চানন মণ্ডল, ভারত শিল্পী নন্দলাল, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭

১৬. অসিতকুমার হালদার, বাগগুহা ও রামগড়, এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, ১৩২৮ (১৯২১ খ্রি.), পৃ. ২৫–৪৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১–৭৭

১৮. সমীর সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০০৫, [২য় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮] পৃ. ২৭

১৯. কৃষ্ণলাল দাস, *শিল্প ও শিল্পী*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নভেম্বর ১৯৮২, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮০

২০. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

২১. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারত শিল্পী নন্দলাল*, বীরভূম, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫১

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫২

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১

২৫. রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, "পরিচয়", অসিতকুমার হালদার, বাগগুহা ও রামগড়, এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, ১৩২৮ (১৯২১ খ্রি.), পৃ. গ

২৬. Benode Behari Mukherjee, "Abanindranath and his Tradition", *Lalitkala Contemporary*-1, NewDelhi-1, Lalitkala Academy, 1962, p. 44

২৭. *The Art of Bengal*, New Delhi, March 2012, p. 433

২৮. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, কলকাতা, অরুণা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ২৮৪–২৮৫

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৩০. Benode Behari Mukherjee, loc. cit., p. 44

৩১. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. অসিতকুমার হালদার, "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যবর্গ", কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ পত্রিকা, *চারুকলা*, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, ২০০৯, পৃ. ৪৪

৩৪. কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ২২৬

৩৫. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩৬. *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ২০১১, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪

৩৭. অসিতকুমার হালদার, 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যবর্গ', কলকাতা রাজ্য চারুকলা পর্ষদ পত্রিকা, *চারুকলা*, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, ২০০৯, পৃ. ৪৪

৩৮. ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ্ত বসু (সম্পা.), *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর 'প্রবাসী' ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮

৩৯. কমল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৪০. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৪১. কমল সরকার, প্রাগুক্ত, ১৯৮৪, পৃ. ২১১

৪২. *The Art of Bengal*, op. cit, p. 428

৪৩. ibid

৪৪. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, "কালিদাস-কাব্যের কলারূপ", *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২, পৃ. ৫১

৪৫. কমল সরকার, *রূপাদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ*, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৭৪

৪৬. শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, দিল্লি, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৮, পৃ. ২৭২–২৭৩

৪৭. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩–২০৪

৪৮. শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

৪৯. চিন্তামণি কর, "জীবনের অপরাহ্নে" *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৯ (১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৩

৫০. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, æKhitindranath Majumdar", *চিত্রকথা*, কলকাতা, অরুণা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৩৮০–৩৮১

৫১. কৃষ্ণলাল দাস, *শিল্প ও শিল্পী*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নভেম্বর ১৯৮২, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১

৫২. কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৫৩. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*, কলিকাতা, এ. মুখার্জী, এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ২০৪

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রপরিকর", দ্র. শোভন সোম (সম্পা.), *রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর [১৮৯২–১৯৭০] : জন্মশতবর্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৩, পৃ. ১৩০

৫৬. সুরেন্দ্রনাথ কর, "স্মৃতিচারণা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৫৭. শোভন সোম, "শতবর্ষের শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর", প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৫৮. ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, "চিত্রশিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ (১৮৯২–১৯৭০)", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪–৪৫

৫৯. শোভন সোম, "শতবর্ষের শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৬০. শান্তিদেব ঘোষ, *বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর*, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, বৈশাখ ১৪১০, পৃ. ৩৫

৬১. রুচিরা গুপ্ত, "বহুমাত্রিক শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ" *রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর* [১৮৯২–১৯৭০] : জন্মশতবর্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৩, পৃ. ১১৮

৬২. সুরেন্দ্রনাথ কর, "স্মৃতিচারণা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭–১৮

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২–৩২৩

৬৫. সুরেন্দ্রনাথ কর, "স্মৃতিচারণা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৬৬. তাঁর পরিকল্পিত নানা স্থাপনা ভারতের বিভিন্ন শহরে তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে মাদ্রাজের স্কুল অব থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, কলকাতার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতিসৌধ (১৯৩৫), মাদ্রাজের কলাক্ষেত্র ভবন (১৯৩০), আহমেদাবাদে আম্বালাল সারভাই ম্যানশন (১৯৪৮), ফাইন আর্টস কলেজের স্থাপত্য (১৯৪৯), দিল্লি রাজঘাটে গান্ধীর সমাধি (১৯৫০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬৭. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রপরিকর", রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর [১৮৯২–১৯৭০] : জন্মশতবর্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৩, পৃ. ১২৯

৬৮. শোভন সোম, "শতবর্ষের শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৭০. কৃষ্ণলাল দাস *শিল্প ও শিল্পী* গ্রন্থে এই পদে যোগদানের তারিখ ১৯২৯ লিখেছেন। [কৃষ্ণলাল দাস, *শিল্প ও শিল্পী*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২]

৭১. অসিতকুমার হালদার, "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যবর্গ", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৭২. অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭–২২৮

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৭৪. অসিতকুমার হালদার, "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যবর্গ", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৭৫. The Art of Bengal, op. cit., p. 424

৭৬. মৃণাল ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৪

৭৭. কমল সরকার, প্রাগুক্ত পৃ. ২২১

৭৮. প্রাগুক্ত পৃ. ১৭২

৭৯. প্রাগুক্ত

৮০. প্রাগুক্ত পৃ. ২১২

৮১. প্রাগুক্ত পৃ. ৮৪

৮২. The Art of Bengal, op. cit., p. 431

৮৩. কমল সরকার, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫

৮৪. The Art of Bengal, op. cit., p. 483

৮৫. ibid

৮৬. op. cit., p. 450

৮৭. ibid

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. কমল সরকার, পৃ. ১৮৭

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা

উনিশ শতকে বাংলার শিল্পচর্চা পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইংরেজ শাসনের প্রভাবে শুরু হয় শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা। বাংলায়, বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলা শিক্ষা শুরু হয়েছিল ১৮৩৯ সালে মেকানিকস ইনস্টিটিউশন বা কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মেকানিকস ইনস্টিটিউশন বন্ধ হয়ে যাবার পর পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেথুন সোসাইটি। সোসাইটির সদস্য ছিলেন প্রাচ্যবিদ ইংরেজ ও বাঙালি বিদ্বজনরা। বেথুন সোসাইটি তাঁদের শিল্প-বিদোৎসাহিনী সভার (সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট) চেষ্টায় কলকাতার তরুণদের শিল্পশিক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। যে প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'দ্য স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। এ প্রতিষ্ঠানই পরবর্তী সময়ে 'কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল'-এ রূপান্তরিত হয়েছিল। এ প্রতিষ্ঠানের পর অবিভক্ত বাংলায় ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল'। ১৯০৪ সালে খুলনায় শশীভূষণ পালের একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট'[১] এবং এর পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা শুরু হয়। তবে কলকাতা গর্ভনমেন্ট আর্ট স্কুলে বিশ শতকের প্রথম দশকে পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চার পাশাপাশি প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা চর্চা শুরু হয় অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত শিল্পশৈলীর প্রেক্ষাপটে। অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রতিভাবান ছাত্র অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং নন্দলাল বসুর শিক্ষকতায় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের কলাভবনে প্রাচ্যরীতির চিত্রচর্চা শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় অব্যাহত থাকে।

অতএব অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বলতে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা হবে এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ, শিল্পীদের কাজের ধরন, উত্থান-পতন, পাঠ্যক্রম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার বিষয়গুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে।

এক

বাংলার প্রথম আর্ট স্কুলের জন্ম ১৮৫৪ সালে। নাম ছিল 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'।[২] ছাত্রদের থেকে গৃহীত বেতন এবং বিদোৎসাহিনী সভার সদস্যদের চাঁদাই ছিল 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর পরিচালনার সম্বল। সরকারি অনুদান ছিল না।[৩]

কোম্পানি শাসনামলে ব্রিটিশদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী ছবি আঁকতে গিয়ে দেশি শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-ঐতিহ্য হারিয়ে রপ্ত করেছিলেন অয়েল পেইন্টিং এবং প্রিন্টমেকিং শিক্ষা পদ্ধতি। ফলে ভারতীয় পরম্পরায়

শিল্পধারায় অয়েল পেইন্টিং ও প্রিন্টমেকিং যুক্ত হয়েছে।[৪] আর এই 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' প্রতিষ্ঠায়ও কারিগরি বিদ্যা শেখানোর উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ ইংরেজদের উন্নয়ন কাজে নিম্নস্তরের কারিগরি কাজে বহুল সংখ্যার দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন মেটানো।[৫]

এই স্কুলে কাস্টিং, মডেলিং, ড্রয়িং লিথো, এনগ্রেভিং-এর জন্য ইংল্যান্ড থেকে শিক্ষক এসেছিলেন। ইংরেজ সরকার বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আর্থিক অনুদান দিতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের জন্য অনুদানের টাকা কমিয়ে দিলেন।[৬] দিনে দিনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল 'আর্থিক অনটনে পড়লে সরকার ১৯৬৪ সালে স্কুলটি অধিগ্রহণ করেন। এই শর্তে রাজি হন যে, ইংল্যান্ড থেকে একজন যোগ্য অধ্যক্ষ এনে তাঁর ওপর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন।[৭]

স্কুলটি সরকার অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ১৯৬২–৬৩ সাল পর্যন্ত যে পাঠ্যক্রম শেখানো হতো তা হলো :

1. Ornamental and Figure drawing;
2. Wood Engraving;
3. Lithography;
4. Painting in oil;
5. Modeling and Plaster casting;
6. Pottery and
7. Photography[৮]

বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' ১৮৬৪ সালে সরকারি অধিগ্রহণের পর নতুন নামকরণ হয় 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট'।[৯] সরকারি পরিচালনাধীন হওয়ার পর ১৮৬৪ সালে প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন ইংল্যান্ড থেকে আগত হেনরি হোভার লক (Mr. H. H Lock)। তিনি পাঠ্যসূচির মধ্যে কিছু বিষয় সংযোজন করেন। বিষয়গুলো হলো :

> Elementary Linear drawing; Higher free hand drawing; Free hand drawing in light and shade; Geometrical drawing by aid of instrument; Technical design প্রভৃতি।[১০]

প্রতিটি স্তরই আবার দুটি বা তিনটি উপস্তরে বিভক্ত ছিল। যেমন দ্বিতীয় স্তরটির (the higher free hand drawing) উপস্তর হলো :

a. Outline from flat, Ornament, flowers, foliage, human figure and animal forms from copies;
b. Outline from the round or solid objects, model drawing, outline of ornament, figure etc. from casts;
c. Outline from nature, flowers, foliage etc.[১১]

এই পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গে অশোক ভট্টাচার্যের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> এই পাঠক্রম থেকে বোঝা যায় আর্ট স্কুলের শিক্ষায় প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথভাবে অনুকরণ করা ও ব্যবহারিক ছবি ও নকশা আঁকায় ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলা। শিক্ষার্থীর চিন্তা বা কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তাকে মননশীল শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা এই পাঠক্রমে ছিল না।। কিন্তু তাঁর যে লক্ষ্য লক তা তাঁর প্রবর্তিত বিস্তৃত পাঠক্রমের মাধ্যমে অচিরেই অর্জন করেছিলেন।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

লকের এই শিক্ষাব্যবস্থায় বাঙালি ছাত্ররা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে লক তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীকে ছাত্রশিক্ষা পদে নিযুক্ত করেছিলেন। লক সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে ১৮৭১ সালে লন্ডনের কিংস্টোন শহরে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ছাত্রদের কাজ বাছাই করে দিয়েছিলেন। 'তা ছাড়া, ১৮৭৩ ও ১৮৭৯ সালে কলকাতায় সর্বভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজনেও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন লক। দুটি প্রদর্শনীতেই কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কাজ বিশেষভাবে আদৃত হয়ে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেছিল।'[১৩] মূলত লকের এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা যথার্থই ইউরোপীয় শিল্পশিক্ষায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন এবং লকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন। কিন্তু 'লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উপমহাদেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই আবৃত্তিমূলক, তা সৃজনমূলক নয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রকে ভাবতে, কল্পনা করতে বা সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় না।'[১৪]

১৮৭৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্রদের জন্য একটি আর্ট গ্যালারি বা শিল্প সংগ্রহশালা খোলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, শিল্প সংগ্রহশালার শিল্পবস্তু দেখে সাধারণ মানুষ শিল্পবস্তুর পরিচয় পাবে এবং ছাত্ররা সংগ্রহভুক্ত শিল্পবস্তু থেকে অনুশীলনের বাড়তি সুযোগ পাবেন। এই সংগ্রহশালায় পাশ্চাত্য শিল্প নিদর্শনই রাখা হয়েছিল, ভারতীয় শিল্প পরম্পরায় কোনো নিদর্শন রাখা হয়নি। ভারতীয় পরম্পরায় শিল্পকে ইংরেজরা হীন চোখে দেখত এবং তারা নিজেদের পাশ্চাত্য শিল্প সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করতে চাইত। কিন্তু ইংল্যান্ডের শিল্পকলা ছিল ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে অর্বাচীন।[১৫] হেনরি হোভার লক এ দেশীয় একাডেমিক শিক্ষার্থীদের মাথায় এটাই গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন যে, ইউরোপই শিল্পকলার অনুকরণযোগ্য আদর্শ। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চায় সে উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়েছিল। ফলে এ দেশের শিক্ষার্থীরা প্রাচ্যরীতির আদর্শজাত শিল্পরীতি ভুলে পাশ্চাত্য একাডেমিক আদর্শকে রপ্ত করেছিলেন কৃতিত্বের সাথে।

হেনরি হোভার লক ছিলেন অন্নদাপ্রসাদের গুণগ্রাহী। তিনি আর্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ স্থান করে অন্নদাপ্রসাদকে হেডমাস্টার পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এরপর লকের মৃত্যুতে শমবার্গ স্থায়ী অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল পদে যুক্ত হয়েছিলেন এবং এই সময় সহকারী অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল পদ সৃষ্টি হয়ে ১৮৮৬ সালে ইতালির চিত্রকর ওলিন্ডো গিলার্ডি ভাইস প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন। নতুন অধ্যক্ষ কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে ১৮৮৫–৮৬ শিক্ষাবর্ষে গিলার্ডি অস্থায়ী অধ্যক্ষ হন।

আর্ট স্কুলের শিক্ষক শ্যামাচরণের সুনাম ছিল স্বাদেশিকতার জন্য। নবগোপাল মিত্র ও অন্যান্য স্বদেশি নেতাদের উদ্যোগে আয়োজিত হিন্দু মেলার প্রদর্শনীর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে শিল্পকলাবিষয়ক শব্দগুলো বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির চেষ্টা দেখা যায়। অশোক ভট্টাচার্য শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> ভারতীয়দের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারত-শিল্পকলা বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা ও নিবন্ধ লিখে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্রতী হন। 'আর্যজাতির শিল্পচাতুরি' নামে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পীদের ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় অন্ধ অনুকরণ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভারতীয় শিল্পাদর্শের প্রতি আকৃষ্ঠ হওয়ার আহ্বান জানান।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু শমবার্গ ও গিলার্ডি ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ছিলেন না—শমবার্গ ছিলেন বেলজিয়ামের ও গিলার্ডি ছিলেন ইতালির মানুষ। ফলে শমবার্গ ও গিলার্ডি নিজেদের পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন। তাই অনুরূপভাবে এই উপমহাদেশের শিল্প পরম্পরাকে শ্রদ্ধা করতেন। শমবার্গ অল্প দিন অধ্যক্ষতা করেছেন। তাই তাঁর দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। গিলার্ডি কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় পদ্ধতিতে শেখানো উচিত। এ উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপে ইউরোপের ধারায় সাদৃশ্য অঙ্কনে অভ্যস্ত ছাত্ররা নতুন বিদ্যার প্রতি আগ্রহ দেখাননি।[১৭] অথচ এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল নকল করার কাজে দক্ষ কারিগর তৈরি করা; প্রতিকৃতি মডেল তৈরি ও সর্বক্ষণ দপ্তরের জন্য নকল করতে ওস্তাদ কারিগর তৈরি করা।[১৮]

ইউরোপের শিল্পশিক্ষা নিতে এ দেশের বাঙালিরা ইতালি যেতে থাকেন। আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম শশীকুমার হেশ, রোহিণীকান্ত নাগ ও ফণীন্দ্রনাথ বসু ইউরোপে গিয়ে উচ্চতর একাডেমিক শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেন। এভাবে কলকাতার বাঙালিদের মধ্যে পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির তেলরং চিত্র, প্রতিকৃতি চিত্র সাধারণ মানুষের রুচির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরবর্তী চার দশক বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা পাশ্চাত্য শিল্পরীতি পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়ায় বিস্মৃতিপ্রায় হচ্ছিল ভারতীয় পরম্পরায় শিল্প-ঐতিহ্যের ধারা।

এমন পরিস্থিতিতে ১৮৯৬ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে এলেন আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল। হ্যাভেলের আগমন প্রসঙ্গে অশোক ভট্টাচার্যের মূল্যায়ন প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন :

> স্বদেশের চিত্রকলার বিকাশ যে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অনুবর্তনের মধ্য দিয়ে হবে—এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস। এমন এক পরিস্থিতি ও পরিবেশে আর্ট স্কুলের কর্ণধার হয়ে হ্যাভেল তাঁর এত দিনের প্রচলিত ও পরীক্ষিত শিক্ষাধারা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন এবং তাঁর মুখ পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুবর্তনের পরিবর্তে ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার দিকে ফেরাতে সচেষ্ট হলেন। হ্যাভেলের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের পিছনে ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পভাবনার ভিত্তিভূমি ও ভারতীয় শিল্পকলার মহৎ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস।[১৯]

কলকাতার শিল্প-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতীয় নবজাগরণের প্রধান উদ্গাতা রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম দ্বারকানাথ ঠাকুর ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ঠাকুর পরিবারের গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০–৫৪), গুণেন্দ্রনাথ (১৮৪৭–৮১), জ্যোতিরিন্দ্র (১৮৪৯–১৯২৫) প্রত্যেকেই চিত্রচর্চা করতেন। গুণেন্দ্রনাথের পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১–১৯৫১) কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল ওলিন্ডো গিলার্ডির কাছে সাপ্তাহিক পাঠের মাধ্যমে পাশ্চাত্য রীতিতে চিত্রাঙ্কন শিখেছিলেন। ইউরোপীয় ধারায় ছবি আঁকতে ভালো না লাগায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ১৮৯৫–৯৭ সালের মধ্যে দেশীয় পদ্ধতিতে কৃষ্ণলীলা সিরিজ অঙ্কন করেন। এই কৃষ্ণলীলা সিরিজচিত্র দেখার মধ্য দিয়ে ১৮৯৭ সালে অবনীন্দ্রনাথের সাথে ই.বি হ্যাভেলের পরিচয় ঘটে। পরে দুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে একাডেমিক ধারায় প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার সূচনা হয়। প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেরে "অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চায় অবনীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গটি সংক্ষিপ্তাসারে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হলো।

হ্যাভেল আর্ট স্কুলের পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় শিল্পশিক্ষার সাথে প্রাচ্যরীতির পরম্পরায় শিল্পশিক্ষা প্রচলন করতে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি আর্ট স্কুলের পাঠ্যক্রমকে নতুনভাবে সাজিয়েছিলেন। তিনি সমস্ত শিক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন। (1) Industrial Art and (2) Fine Art; প্রথম বিভাগ Industrial Art বা কারুশিল্প বিভাগে যে বিষয়গুলো সংযোজন করলেন তা হচ্ছে :

1. The advanced Design class;
2. The Architectural and Mechanical Drawing class;
3. The Lithography class;
4. The Wood Engraving class and
5. Modeling class.[২০]

অর্থাৎ 'প্রথম বিভাগে নকশা বা ডিজাইনের অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হল। আর তার সঙ্গে এ বিভাগেই প্রাচ্যশিল্প বা ওরিয়েন্টাল আর্ট শেখানো ব্যবস্থা করা হলো।'[২১] আসলে এ সময়েই প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার উদ্ভব হয়েছে বলা যায়। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ্চাত্যমুখী শিল্পশিক্ষার মোহ কাটিয়ে প্রাচ্যরীতির চর্চা শুরু করলেন। হ্যাভেল প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্পের ওপর নানাভাবে গুরুত্ব দিলেন। প্রথমত, তিনি কারু ও প্রাচ্যদেশীয় শিল্পশিক্ষার বিভাগে স্বল্প বেতন চালু করলেন। দ্বিতীয়ত আর্ট স্কুলসংলগ্ন সংগ্রহশালার ইউরোপীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রের অনুলিপির নিদর্শনগুলো বেচে দিয়ে তার জায়গায় ভারতীয় পরম্পরাগত কারু ও চারুশিল্পের নিদর্শন স্থাপন করলেন।[২২] হ্যাভেলের এ উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণত মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করল। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে স্কুলের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে, মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের হীরক জয়ন্তী বছরে প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৭), জুবিলি আর্ট একাডেমিতে (Jubilee Art Academy) ভর্তি হলেন। রণদাপ্রসাদ গুপ্তের পরিচালনায় জুবিলি আর্ট একাডেমি পরবর্তী তিন দশক ধরে কলকাতার বুকে পাশ্চাত্যরীতির শিল্পচর্চা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল।[২৩]

এরূপ প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করে হ্যাভেল আর্ট স্কুলে ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে পেলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। হ্যাভেলের ডাকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুলের উপাধ্যক্ষের পদে ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট যোগ দেন। এবার দুজনের দ্বৈত প্রয়াসে চলল আর্ট স্কুলে ভারতীয় পরম্পরা শিল্প-ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের কাজ। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কাজে এমন এক ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন, যা ছিল অজন্তা, মোগল, শিল্প পরম্পরার সাথে দূরপ্রাচ্য চীন-জাপানের ওয়াশ পদ্ধতি মিলেমিশে নতুন এক টেকনিক। তাঁর এই নিজস্ব উদ্ভাবিত শিল্পশৈলী *নব্য-বেঙ্গল স্কুল ঘরানা* নামে তাঁর ছাত্রদের কাজের মাধ্যমে শিল্পান্দোলনে রূপ নিয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। ফলে তাঁর প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

পর্বের ছাত্ররা নব্য-বঙ্গীয় ঘরানাকে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়েছিলেন। তাঁর কৃতী শিষ্য নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং তাঁর ভাবশিষ্য আব্দুর রহমান চুঘতাই—কেউই হুবহু তাঁকে অনুসরণ করে নির্বিশেষ শৈলীতে ছবি আঁকেননি।[২৪]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। এই সময়ভাগের মধ্যে অনেক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা সারা ভারতবর্ষে পরিচিত লাভ করে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। সব ঘটনার নেপথ্যেই অবনীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য।

অশোক ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার চিত্রকলা* গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষকতার দশ বছরের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :

> প্রথমত, এই সময়ের মধ্যেই তাঁর যে নিজস্ব চিত্ররীতি তাকে তিনি এক নির্দিষ্ট চরিত্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই দশ বছরেই তিনি তাঁর প্রথম সারির ছাত্রদের তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তৃতীয়ত, সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে তাঁর নব-প্রবর্তিত শিল্পধারাকে তিনি দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সে সময়ের সব থেকে প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় শৈলীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন।[২৫]

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে প্রাচ্যরীতির চিত্রান্দোলনের স্বর্ণালি সময়ে কতগুলো বিষয় ফলপ্রসূ হয়ে কাজ করেছে। সে বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাসারে আলোচনার দাবি রাখে। তবে গবেষণায় প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর* প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের কাজের ধরন এবং তাঁর শিক্ষকতার বিষয় নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে বিধায় সে অংশগুলো যথাসম্ভব বাদ দিয়ে সে সময়কার প্রেক্ষাপটগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো।

প্রথমত, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে কলকাতা আর্ট স্কুলের ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের আন্দোলন বেগবান হয়েছিল। ১৯০২ সালে প্রাচ্যবিদ ওকাকুরার আগমনে তাঁর 'Asia is One' কনসেপ্ট এবং জাপানি থেকে জাপানি শিল্পীদের আগমন; ঠাকুরবাড়িতে তাঁদের চিত্রাঙ্কন বেঙ্গল স্কুলের কলা পদ্ধতিতে চীন-জাপানের কালি-তুলির ওয়াশ পদ্ধতির সম্মিলন ঘটাতে সহায়ক হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার কল্যাণে আর্ট স্কুলের ছাত্রদের অজন্তা গুহাচিত্রের অনুলিপিচিত্র করলে, ভারতীয় প্রাচ্য-ঐতিহ্যের চিত্রাঙ্কনের কলা-কৌশল ও তত্ত্ব প্রসঙ্গে নন্দলালের মাধ্যমে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলায় এর প্রভাব পড়ে। একাডেমিক চিত্রচর্চায় লালা ঈশ্বরী প্রসাদের শিক্ষক হিসেবে যোগদান; অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথের নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার আন্দোলনের সাথে যোগদান এবং ১৯০৭ সালে সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান আর্ট প্রতিষ্ঠা এবং এই সোসাইটির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে প্রদশর্নী করে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করা ও পরবর্তী সময়ে সোসাইটির শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা।

নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলায় প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর ভূমিকাই মুখ্য ছিল। সোসাইটি আয়োজিত বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রধানত প্রদর্শিত হতো অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের চিত্রাবলি

Dhaka University Institutional Repository

এবং এই প্রদর্শনীর সংবাদ তৎকালীন দৈনিক সংবাদ ও সাময়িক পত্রপত্রিকার গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হতো। এভাবেই এ শৈলীর কথা সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছাত্ররা ভারতের বিভিন্ন আর্ট স্কুলে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মাধ্যমে এই রীতির বিস্তার ঘটতে থাকল। এভাবেই অবিভক্ত বাংলায় প্রাচ্যচিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথের অবসর গ্রহণের পর ১৯১৬ সালে উপাধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সময়ে চারুকলা বা Fine Art বিভাগকে দুই ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। ভাগ দুটি হলো—

(1) Fine Art

(2) Indian Painting

এই বিভাগের ফলে প্রাচীরীতির চিত্রকলার সুনির্দিষ্ট নামকরণ হয় ইন্ডিয়ান পেইন্টিং নামে। অর্থাৎ কলকাতার বুকে বৃহৎ প্রাচ্যের পরিবর্তে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' দেশীয় পরিচয় বহনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যদিও কলকাতা আর্ট স্কুলে এ দুই বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন একজনই। দুটি বিভাগে আলাদা দায়িত্ব আসে যখন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পঞ্চাশের দশকে অধ্যক্ষ হন কলকাতা আর্ট স্কুলের। ইন্ডিয়ান আর্ট বা ভারতীয় ধারায় যাঁরা অধ্যাপনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ ছাড়াও ছিলেন মুকুল দে, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ইন্দু রক্ষিত, ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।[২৬]

উনিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশক অর্থাৎ ১৯২০–১৯৩০ সালের মধ্যবর্তী সময় ছিল বেঙ্গল স্কুলের মুভমেন্টের সফলতম অবস্থা। যে সময়কে প্রদোষ দাশগুপ্ত বেঙ্গল স্কুলের 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দিয়েছেন।[২৭] কারণ এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা বেঙ্গল স্কুলের প্রাচ্যরীতির শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে সারা ভারতবর্ষের আর্ট স্কুলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হয়ে গেলেন এবং তাঁদের প্রভাবে শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরের প্রদেশগুলোতে এ ধারার মাহাত্ম্য প্রচার ও শিল্পশিক্ষা চর্চায় প্রভাব ফেললেন। এই সময় 'সোসাইটি শিক্ষা-বিদ্যালয় থেকেই বিশ আর ত্রিশের দশকে শিল্পী হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন অবনীন্দ্ররীতি দ্বিতীয় পর্বের ছাত্ররা। যেমন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মুকুলচন্দ্র দে, বীরেশ্বর সেন, প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, চিন্তমণি কর ও প্রাণকৃষ্ণ পাল। এঁরা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলাকে আপন আপন প্রবণতা ও দক্ষতায় বিচিত্রমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে।'[২৮] এই সময়ের মধ্যে সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর শিল্প বিদ্যালয়ের অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের তত্ত্বাবধানে চিত্রকলা শিক্ষা দেয়া হতো। নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির প্রচার-প্রসারের জন্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট সংস্থার উদ্যোগে ১৯২০ সালের জানুয়ারি থেকে ত্রৈমাসিক *রূপম* পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং দীর্ঘ ১১ বছর এ পত্রিকা নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির প্রচারকাজ চালিয়েছিল। মূলত নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির প্রচার-প্রসারের প্রেরণার মূল উৎস ছিল স্বদেশি আবেগ।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকের পর থেকে এই রীতির প্রচার-প্রসার দুর্বল হয়ে যায়। কারণ, অবনীন্দ্রনাথের কয়েকজন শিষ্য বাদে সকলের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কম ছিল। তাঁরা শুধু পৌরাণিক, কাব্য-মহাকাব্য ও পুরাণনির্ভর চিত্রকলা অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বাদেশিকতার আত্মগরিমায় অন্ধ অনুকরণ দোষে দুষ্ট হলেন অনেকের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে বারবার সচেতন করেছিলেন এবং তিনি উদ্যোগী হয়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালকে বারবার বিশ্ব-শিল্পের রূপরেখা দেখার জন্য পাশ্চাত্যের দেশ ভ্রমণের কথা বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুকুল দে-কে দিয়ে সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন এবং মুকুল দে ১৯২৮ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপাল হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালনায় শিল্পের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বহুবিধ ধারার প্রবর্তন ঘটতে শুরু হয়।[২৯]

চল্লিশের দশকের কাল চেতনায় আধুনিকতায় নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা থেকে সাধারণ মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এ সময় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারির মধ্যে গড়ে ওঠে ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’। এই গ্রুপের প্রথম দিককার সদস্য ছিলেন রথীন মৈত্র। নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, সুভো ঠাকুর ও প্রদোষ দাশগুপ্ত। ‘ক্যালকাটা গ্রুপের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতায় নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির একাডেমিক চর্চায় ভাটা পড়ল। এ ছাড়া এ সময় ব্যক্তিগত আধুনিকতার শৈলীতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় শিল্প ধারায় আধুনিকতার নতুন নতুন পথ দেখালেন। কিন্তু একথা বলা যায় যে, নব্য-বঙ্গীয় শিল্পধারায় আধুনিক চিত্রকলার পদক্ষেপ থেকে রসদ সংগ্রহ করে এসব মতবাদ ও শিল্প-বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছিল। কিংবা বলা যায়, ভারতীয় শিল্পান্দোলনে নব্য-বঙ্গীয় ধারার উদ্ভব হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে ভারতীয় আধুনিকতার ধারায় এমন বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল।

অতএব বলা যায়, ১৯১৬ সালে একাডেমিক কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থায় ইন্ডিয়ান আর্ট রূপে যে বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা মূলত বৃহৎ প্রাচ্যের প্রাচ্যচিত্ররীতির অনুষঙ্গ দ্বারা পুষ্ট। বর্তমানে ইন্ডিয়ান আর্ট তথা প্রাচ্যচিত্রকলা পৃথিবীর শিল্পকলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

দুই

নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার ধারায় প্রাচ্যচিত্রকলার যে রূপ তা অবনীন্দ্র শিষ্য, বিশেষত নন্দলালের হাত ধরে শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় রূপ পায়। যদিও প্রাচ্যচিত্রকলা বা প্রাচ্যকলা নামকরণ ‘কলকাতা আর্ট স্কুল’ এবং শান্তিনিকেতনের একাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কখনোই ছিল না। ১৯১৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় ‘ইন্ডিয়ান আর্ট’ বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়। যে বিভাগ প্রাচ্যরীতির চিত্রকলারই ভারতীয় রূপ। অর্থাৎ অবিভক্ত বা প্রাচ্যকলা নামে কোনো বিষয় বা বিভাগ না থাকলেও নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার রীতি প্রাচ্যরীতি-আশ্রিত। এ রীতিই নন্দলালের হাত ধরে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় বিস্তার লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

'কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল'-এ অবনীন্দ্রনাথ দেশজ শৈলীর অভিযান শুরু করেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায়। যার মূল বুনিয়াদ ছিল পাহাড়ি এবং মোগল চিত্রকলা। এর সাথে মেশালেন দূরপ্রাচ্যের জাপানি ওয়াশ-টেকনিক। নন্দলালের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতন প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চার রূপান্তর ঘটে। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায়, বিশেষ করে কবির বিশ্বচেতনায় ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিকতার ভিন্ন দিগন্ত উন্মোচন করেন।[৩০]

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শুরু থেকেই চিত্রকলা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ছিল। চিত্রকলার শিক্ষক হিসেবে যথাক্রমে গোপালচন্দ্র কবিকুসুম, নগেন্দ্রনাথ আইচ, পাঁচুগোপাল রায়, সন্তোষকুমার মিত্র শিক্ষকতা করেছেন। এরপর ১৯১৪ সালে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র অসিতকুমার হালদার পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। অসিতকুমারের পরে ১৯১৭ সালে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের চিত্রকলা শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।[৩১]

১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে কলাভবন স্থাপিত হয়। এ সময়ে কলকাতায় অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রনাথ পরিচালিত দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নন্দলাল বসু কলাভবনের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চার মূল দায়িত্বে যোগ দেন। এই যোগদানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন হতে শুরু করে। নন্দলাল পেয়ে যান রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারীর মতো সুযোগ্য দুই ছাত্র। যাঁরা পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতায় যোগদান করে বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনের কলাভবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরুর অবস্থা কেমন ছিল তা তাঁর ওই সময়ের ছাত্র প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণামূলক বর্ণনা থেকে জেনে নেয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> আমাদের সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মাস্টারমশাই,[৩২] অসিতকুমার হালদার এবং সুরেন্দ্রনাথ কর মশাই। জলরঙে ওয়াশের ছবিই বেশি হত, টেম্পারাও কিছু কিছু হত। আঁদ্র কারপ্লে নাম্নী এক ফরাসী মহিলা কেউ তেল রঙের ছবি আঁকতে চাইলে শেখাতেন, আমি এবং সেত্যেনদা তাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলুম। কলাভবনের ছাত্র সংখ্যা তখন খুবই কম, সকলেই মাটিতে মাদুর পেতে বসে ডেস্কের উপরে ছবি রেখে আঁকতেন। এক-একটা জানালার ধারে এক-একজনের আসন ছিল। ডাইনে থাকত জলের গামলা, ঘষাকাচের প্যালেট, রঙের বাক্স এবং তুলি রাখবার ঘটি বা গ্লাস। মাস্টারমশাইয়ের আসন ছিল আমাদের কিছু আগে ঘরের শেষপ্রান্তে। তিনি নিয়মিত সেখানে বসে ছবি আঁকতেন, মাঝে মাঝে উঠে ছাত্র ছাত্রীদের কাজের তদারক করতেন, কখনো-বা তাদের নিয়ে মাঠে গ্রামে স্কেচ করতে যেতেন। সাধারণত সকালে ছাত্রদের মন থেকে ইচ্ছামত ছবি আঁকতে দেওয়া হত, বিকালে পুরাতন ছবি নকল করানো হতো; দুপুরে এবং সন্ধ্যায়—তা ছাড়া ছুটির দিনে, প্রকৃতি থেকে গাছপালা মানুষের পশুপক্ষী ইত্যাদি স্কেচ করানো হত।[৩৩]

প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় প্রথম থেকেই কয়েকটি ব্যবস্থা ছিল। প্রথমত, শিল্প নিদর্শন রাখার জন্য আর্ট গ্যালারি, দ্বিতীয়ত, কলাভবনের শিক্ষকতায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরন্তর সৃষ্টিশীল কাজের তৎপর থাকতে হতো; ভিত্তিচিত্র, ভাস্কর্য-মঞ্চসজ্জা, উৎসবসজ্জা, কারুকলা প্রভৃতি প্রকল্পভিত্তিক কাজে শিক্ষকরা ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতেন। শিক্ষকদের মৌলিক কাজ ছাত্রদের প্রেরণা দিত। তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল শেষে ছাত্রদের গোটা শিক্ষাকালের কাজের প্রদর্শনীর (ডিপ্লোমা প্রেজেনটেশন) ব্যবস্থা। এই প্রদর্শনীর কাজের মূল্যায়ন করে ছাত্রদের প্রশংসাপত্র দেয়া। এ ছাড়া ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।[৩৪] শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র-শিক্ষক যুগ্মভাবে কাজের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন থাকবে, এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। এখানে পাঠ্যসূচি, বিষয় এবং শিক্ষাবর্ষ শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হতো। নন্দলাল জাপানি মনীষী কাকুজো ওকাকুরার শিক্ষানীতির-(স্বভাব, পরম্পরা, মৌলিকতা) ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম না রেখেও একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করতেন।[৩৫] পরবর্তী সময়ে কলাভবনের শিল্পচর্চায় শিক্ষাবর্ষ নির্দিষ্ট হয়েছে। ডিপ্লোমা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫০ সালে নন্দলাল অবসর গ্রহণের পূর্বে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়মানুবর্তিকার সমর্থক হয়ে ওঠেন। ১৯৫০ সালে নন্দলালের অবসর গ্রহণের পরে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অধিগৃহীত হলে পঠন-পাঠন ও পরিচালনায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের চরিত্র গ্রহণ করে।[৩৬]

উল্লিখিত আলোচনায় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের কলাভবনের পঠন-পাঠনের অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। তবে ব্যতিক্রমধর্মী এই পঠন-পাঠন অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চায় যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিক্ষাদানগত বিষয়াবলি চর্চা হয়েছে শান্তিনিকেতনে। এখানে সুরেন্দ্রনাথ কর স্থাপত্য বিদ্যায় প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। নন্দলাল বিনোদবিহারীর চর্চায় প্রাচ্যের তথা ভারতীয় পরম্পরায় ফ্রেসকো চিত্র করা হয়েছে। নন্দলাল ও তাঁর দুই ছাত্র বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর বেইজের হাতে লিথোগ্রাফ, উডকাট, উক্ত-এনগ্রেভিং, লিনোকার্ট এবিং, ড্রাই পয়েন্ট ও অন্যান্য রীতিবহির্ভূত পদ্ধতির ছাপাই ছবি করে উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিয়ে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় অবদান রেখেছেন। কলাভবনে ছাপছবি ও ফ্রেসকোর প্রভূত সাফল্য ছাড়াওI বস্ত্ররঞ্জন, বই বাঁধাই, শেলাই, আলপনা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়গুলোতে নব নব উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কলাভবনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির আদর্শগত দিকটির পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল। এখানে প্রাচীন ভারতশিল্পের অন্ধ অনুকরণ হয়নি। বরং সমগ্র বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পধারার সম্মিলনে ভারতীয় কিন্তু জীবন-সম্পৃক্ত সমকালীন শিল্পরূপ নির্মাণ হয়েছে।[৩৭]

বিনোদবিহারীর কাজে দেশজ শিল্প ছাড়াও, বাইজেন্টাইন শিল্প, পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্প, জাপানি ক্যালিগ্রাফি আরো অনেক কিছু তাঁর শিল্পকলায় মিশে গিয়ে নিতান্তই অনুপম একটি শৈলী তৈরি হয়েছে। ক্যালিগ্রাফি, নিখুঁত ডিজাইন, ভলিউম এবং কর্মের চূড়ান্ত সরলীকরণI এসব উপকরণই ছিল তাঁর শিল্পকলার বুনিয়াদ।[৩৮] বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর বেইজ দৃশ্যচিত্রেও নতুনত্ব আনেন। বিনোদবিহারী কালো কালিতে scroll painting-এ ল্যান্ডস্কেপই মুখ্য বিষয়, যা ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্যে ছিল না। এ ছাড়া রামকিঙ্কর বিশুদ্ধ নিসর্গচিত্র এঁকেছেন যেসব চিত্রে তিনি প্রাচ্যচিত্রকলার ক্যালিগ্রাফি এবং নব্য-বঙ্গীয় ওয়াশ রীতি প্রধানভাবে ব্যবস্থায় করেছেন।[৩৯] এভাবে শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ ধরে বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলায় প্রাতিষ্ঠানিক শান্তিনিকেতন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব একথা বলা যায় যে, অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা প্রাচ্যকলা নামে প্রাতিষ্ঠানিক নাম পায়নি। কিন্তু কলকাতা আর্ট স্কুলে ও শান্তিনিকেতনের কলাভবনে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলারই চর্চা হয়েছে। যেখানে বৃহৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের পরম্পরার ঐতিহ্যবাহী চিত্রধারা যুক্ত হয়েছে এবং নিকট ও দূর প্রাচ্যের

Dhaka University Institutional Repository

যথাক্রমে পারস্য ও চীন-জাপানের শিল্পরীতির নানান অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চায় দেশজ পরিচয় ধরে রাখতে ইন্ডিয়ান আর্ট বা ইন্ডিয়ান পেইন্টিং নামে যে ধারাটি প্রচলিত তা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতিরই দেশজ নাম। এ প্রতিষ্ঠানিকভিত্তিক শিল্পশিক্ষায় সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ধারা প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম যুক্ত হয়েছে শান্তিনিকেতন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩ সালে খুলনা আর্ট কলেজ এবং ২০০৮ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে রূপান্তরিত হয়েছে

২. স্বাতী ভট্টাচার্য, “বাংলার ক্যানভাসেই জন্ম নবীন ভারত চিত্রকলার”, *দেশ* ১০ জানুয়ারি ১৯৯৮, ৬৫ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৃ. ৫১

৩. গৌতম দাস, *বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*, কলকাতা, পুনশ্চ, বইমেলা ২০০০, পৃ. ৫৮

৪. স্বাতী ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

৫. শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, দিল্লি, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ১৯৯৮ পৃ. ৭৩

৬. Jogesh Chandra Bagal, æHistory of the Govt. College of Art & Craft”, *Centenary,* Government College of Art & craft, Calcutta, 1966, P. 4

৭. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, পৃ. ১০৮

৮. Jogesh Chandra Bagal, idid

৯. পল্লব মিত্র, *বাংলার ঐতিহ্য : কলকাতার অহংকার*, ১ম সং, কলকাতা, পারুল, ২০১০, পৃ. ৩৬

১০. Jogesh Chandra Bagal, op. cit., P. 5

১১. ibid

১২. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

১৬. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৭. শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

১৮. শোভন সোম, “শিল্পের আধুনিকতা ও বাংলার শিল্পস্বাতন্ত্র্য”, *দেশ* ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১, ৬৮ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, পৃ. ৪২

১৯. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

২০. Jogesh Chandra Bagal, op. cit., P. 21

২১. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২২. প্রাগুক্ত

২৩. Jogesh Chandra Bagal, op. cit., P. 22

২৪. শোভন সোম, “শিল্পের আধুনিকতা ও বাংলার শিল্পস্বাতন্ত্র্য”, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২৫. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

২৬. গৌতম দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

২৭. প্রদোষ দাশগুপ্ত, *স্মৃতিকথা শিল্পকথা : ক্যালকাটা গ্রুপ*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ৩৩

২৮. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২৯. পল্লব মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩০. পরিতোষ সেন, *রং তুলির বাইরে*, কলকাতা, ভাষাবিন্যাস, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ৮৬

৩১. আবুল মনসুর, "রবীন্দ্রনাথ-চিত্রশিল্প-কলাভবন : পরম্পরার সম্পর্কসূত্র", দ্র.. আবুল হাসানাত (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ : কালি ও কলমে, ঢাকা*, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩০৭

৩২. মাস্টারমশাই হলেনা নন্দলাল বসু।

৩৩. প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, "গুরু-স্মরণ", *বিশ্বভারতী পত্রিকা* নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৯৭৩, পৃ. ৬২

৩৪. শোভন সোম, "শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত" প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১–৩৪২

৩৫. সঞ্জয় মল্লিক, "শিল্পপাঠ ও শিল্পপীঠ", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৩৮. পরিতোষ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮–৮৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার সূচনা হয় ১৯৫৫ সালে 'গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট'-এ প্রাচ্যকলা বা Oriental Art বিভাগ চালু করার মধ্য দিয়ে। বিভাগের নামের সাথে কলা বা Art শব্দটি যুক্ত থাকলেও এই বিভাগের পাঠ্যক্রম শুধু চিত্রকলাকে ঘিরে। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান বর্তমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা মূলত প্রাচ্যচিত্রকলা। এবার প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই বিভাগের নাম প্রাচ্যচিত্রকলা নয় কেন? উত্তরে বলা যায়, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করেনি অর্থাৎ ১৯৭১ সালের পূর্ব এবং ১৯৪৭ সাল-পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত ছিল, তখন ১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে ঢাকায় 'গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় ঢাকার চারুকলা শিক্ষায় ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ, ছাপচিত্র বিভাগ ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ চালু হয়েছিল। যেহেতু জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সাথে উদ্যমী সহকর্মীরা অবিভক্ত ভারতের 'কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট' কলেজ থেকে পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এসেছিলেন সেহেতু বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চার প্রথম সোপান কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের সিলেবাস অনুসারেই সাজিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৮৯৬ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে চারুকলা বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল—(ক) ফাইন আর্ট, (খ) ইন্ডিয়ান পেইন্টিং (ভারতীয় চিত্রকলা)।[১]

যখন চারুকলা ইনস্টিটিউটের কলেবর বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিল তখন জয়নুল আবেদিন আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের ঘরানার চিত্রকলার বিভাগ প্রতিষ্ঠাকে সর্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করলেন। যেহেতু ঐতিহ্যিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতার অংশীদার আমরা সেহেতু দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে সরকারি কলকাতা আর্ট স্কুলের ইন্ডিয়ান পেইন্টিং ঘরানাতে বিভাগ প্রতিষ্ঠাই যুক্তিগ্রাহ্য ছিল। কিন্তু জয়নুল আবেদিন দেশীয় ঐতিহ্যের চিত্রকলার নাম দিলেন 'প্রাচ্যকলা' বা Oriental Art। ভারতীয় চিত্রকলার বদলে কেন প্রাচ্যকলা নামকরণ হলো এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক লালা রুখ সেলিমের বিশ্লেষণ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন :

> The department was not named Indian Art because with partition still so chose behind the term Indian was very sensitive. Although called the Oriental Art Department the curriculum actually did not encompass the entier orient but rather focused on the Indian and Persian traditions. Japanese and Chinese methods were not studied.[২]

এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুরের বিশ্লেষণও প্রণিধাণযোগ্য : কলকাতা আর্ট স্কুলের আদলে তৈরি হলেও ঢাকার প্রতিষ্ঠানটি খানিকটা নিজের মতো করেই গড়ে ওঠে এবং এর সঙ্গে বৃহত্তর ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার যোগসূত্র রাজনৈতিক কারণে খণ্ডিত হয়ে পড়ে।[৩]

বৃহত্তর ভারতীয় বঙালির পরিচয় পাকিস্তানি আদর্শজনিত আবেগী মনোভাবে ১৯৪৭ সালের পর এখানকার বাঙালিরা তাঁদের ভারতীয় পরিচয় মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছেন। [৪]

কিন্তু বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলার ধারায় প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্য বজায় রাখতে প্রাচ্যকলা বা ওরিয়েন্টাল আর্ট নামে যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মূলত বৃহত্তর বাংলার কলকাতা আর্ট স্কুলের ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বা ভারতীয় চিত্রকলার পাঠ্যক্রমের আদলে হয়েছে। সে মর্মে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা মূলত ভারতের ইন্ডিয়ান আর্টের পরিবর্ধিত রূপ। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট খুঁজতে হলে বৃহত্তর ভারতবর্ষ তথা অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করতে হবে। গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে (অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট) সে ইতিহাসই বর্ণনা করা হয়েছে। সেই প্রবন্ধের যে অংশ এ প্রবন্ধে উল্লেখ না করলেই নয় তা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে একাডেমিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই বেশি। কারণ আধুনিক শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠার মাধ্যমেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল।

বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্য লোকশিল্প এবং উচ্চমার্গীয় বা দরবারি শিল্পের দ্বৈত সমন্বয়ে। 'এই দুই জাতীয় শিল্প কর্ম পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। দুটিই কোনো একই বড় অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর অবদান।'[৫] পাল যুগ বাংলার সংস্কৃতি তথা শিল্পীর ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাল-পূর্ব আমলে উত্তর ভারতীয় শিল্পরীতির সাথেই তাল মিলিয়ে চলে বাংলার শিল্পকলা।[৬] আবার পাল পুথিচিত্র শৈলীর সাথে গুপ্ত যুগের অজন্তামার্গীয় চিত্ররীতির সাজুয্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সেই সময়ে বরেন্দ্রবাসী শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল যে শিল্পের ধারা প্রবর্তন করেন, তা পূর্ব ভারতীয় শিল্পরীতি নামে পরিচিত। এই রীতি গুপ্ত যুগের মার্গ চিত্ররীতির দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল।[৭] এই মার্গরীতির পাশাপাশি বাংলার লোকজ চিত্রকলায় অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে পটচিত্রকলা। পটুয়ারা পৌরাণিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতেন। বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারেই এই পটচিত্র বেশি ব্যবহৃত হতো। এই পটচিত্রের ধারা পরবর্তী সময়কালেও সমান গতিতে বাংলায় অব্যাহত ছিল। পাল-পরবর্তী সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজকীয় ও উচ্চবর্গীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারালে ব্রাহ্মণী চিত্রকলার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং এ যুগে বাংলার বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উত্থান ঘটে। [৮] ফলে চৈতন্যদেব-আশ্রিত বৈষ্ণব চিত্রকলার উন্মেষ ঘটে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলাদেশ মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসার পর এ অঞ্চলের চিত্রচর্চার ধারা সংকটের সম্মুখীন হয়। এর মূল কারণ মুসলিমদের ধ্যান-ধারণার সাথে দেশি সংস্কৃতির সংঘাত। [৯]

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ব-ভারতের ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদ চিত্রশৈলীর জন্ম হয়। মুর্শিদাবাদ শহরের শাসক ছিলেন নবাব। মোগল সম্রাটদের অধীনস্ত থাকলেও মুর্শিদাবাদের নবাবরা ছিলেন আধা-স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। দিল্লির মোগল রাজদরবারের শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হতেন। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে দিল্লিত্যাগী শিল্পীগণ মোগল শৈলীর পরম্পরার নতুন

Dhaka University Institutional Repository

এক শৈলীর উদ্ভব করেছিলেন। এই শৈলীর প্রথমদিকের ছবিগুলোতে রেখাভিত্তিক বর্ণপ্রয়োগ ও কন্টুর পদ্ধতিতে আঁকা ছবির পশ্চাৎপটের নিসর্গগুলো অর্থবহতার চেয়ে বর্ণসমৃদ্ধ ছিল। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম মেনে চিত্রিত ছবিগুলোতে গাঢ় নীল রঙের আকাশের পাশাপাশি গাঢ় খয়েরি রঙে আঁকা প্রাসাদগুলো দেখানো হয়েছে জ্যামিতিক মাপের গণ্ডিতে। মোগল যুগের মতো এ সময়ের ছবিতে সৃষ্ট কারুকার্যময় পোশাক ও নকশাচিত্রের প্রবহমানতা দেখা যায়। বিষয়বস্তু হিসেবে রাজদরবার, শিকারচিত্র ছিল প্রধান। তবে পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের জীবযাত্রাসহ রাগমালা চিত্র আঁকা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ শৈলীর পরে আসে কোম্পানি শৈলী। ১৯৭২ সাল নাগাদ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ দখল করে কলকাতায় তাদের প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করে ভারত শাসন করতে শুরু করে। ফলে ১৯৭৩-এর পর পাটনা ও মুর্শিদাবাদ থেকে শিল্পীরা কলকাতায় চলে আসেন ভাগ্যান্বেষণে।[১০] এ সময় কলকাতায় ইংরেজদের বয়ে আনা সংস্কৃতি এবং এর সাথে এ দেশের পরম্পরা সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নতুন এক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়, যা পূর্ব-পশ্চিমের শঙ্কর সংস্কৃতি। চিত্রকলায় এর রূপ হলো কোম্পানি চিত্রকলা।

কলকাতার চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিচারপতি ইম্পের স্ত্রী মেরি। মেরি একটি চিড়িয়াখানা গড়ে তুলেছিলেন। মেরির ফরমায়েশমতো এ দেশীয় শিল্পীরা চিড়িয়াখানার পশুপাখির চিত্রাঙ্কন করেছেন। যাকে ‘ন্যাচারাল হিস্ট্রি পেইন্টিং’ বলা হয়। এরপর আরো অনেক ইংরেজই এ দেশের শিল্পীদের দিয়ে অনুরূপ হিস্ট্রি পেইন্টিং করিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আবু তাহের লিখেছেন :

> আঠারো শতকে সারা ভারতে ন্যাচারাল হিস্ট্রি পেইন্টিং হলেও কলকাতায় হতে থাকে বেশি। ক্যামেরাহীন এই যুগে ইয়োরোপের মানুষদের কাছে এই দেশ সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায় ছিলো হাতে আঁকা ছবি। এই সময়ে ইয়োরোপীয় চিত্রকরেরাও প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষজন, রীতিনীতি, পোশাক-আশাক, পালা-পার্বণ, জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকতেন এবং তা এচিং ও লিথোতে ছাপতেন। [১১]

ভারতীয় চিত্রকররা মোগল, রাজপুত চিত্রকলার ঐতিহ্য, রীতি টেকনিকে টেম্পারা ও জলরঙে ছবি আঁকতেন। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজরা ‘ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক’ ধারার স্বচ্ছ জলরঙে ছবি আঁকার প্রচলন ঘটান। ১৯ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার কোম্পানি চিত্রকলার ধারা বন্ধ হয়ে যায় এবং এই ধারা বন্ধ হওয়ার আগে থেকে কলকাতার উত্তরে বটতলা অঞ্চলে কাঠখোদাই ও দক্ষিণে কালীঘাট অঞ্চলে পটচিত্রকলার দুটি উল্লেখযোগ্য ধারা গড়ে উঠেছিল। যে ধারা দুটি বাংলার লোকচিত্রকলার ধারা থেকে উদ্ভূত। বটতলার শিল্পীরা কাঠের মসৃণ পাটায় রৈখিক ছবি খোদাই করে কালো কালিতে ছাপতেন ও পরে জায়গায় জায়গায় হাতে করে রং লাগাতেন। এই ছবি জনপ্রিয় ছিল। শিল্পীরা আঁকতেন কাগজে জলরঙে এবং কালো কালিতে মোটা রেখায় ‘আউট লাইন’ দিয়ে। কোম্পানি চিত্রকলা, বটতলার কাঠখোদাই ও কালীঘাটের পটচিত্র প্রসঙ্গে আবু তাহেরের বিশ্লেষণ উল্লেখের দাবি রাখে :

> কোম্পানির ছবিতে যেমন দরবারি ছবির স্বাদ পাওয়া যায় তেমনি বটতলার কাঠখোদাই আর কালীঘাটের পটচিত্রে পাওয়া যায় আবহমান বাংলার লোককলা-পোড়ামাটির শিল্প, কাঁথা আলপনা ইত্যাদির মিলিত স্বাদ ও গন্ধ। তাঁদের অঙ্কন ছিলো সহজ সরল এবং ছবির আঙ্গিক ছিলো দ্বিমাত্রিক।[১২]

কালীঘাটের পটশৈলী বাংলার চিত্রকলায় বিশ শতকের প্রথমদিকেও প্রবহমান ছিল।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠী বাংলাকে শাসন করেছে এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের মাধ্যমে। কিন্তু ব্রিটিশরা এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এ দেশের বিশাল সম্পদকে নিজ দেশে স্থানান্তর করার জন্য। ফলে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় স্বার্থপরতার দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য ছিল। যে উদ্দেশ্যের জন্য তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল। ১৮৩৯ সালে ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় প্রথম মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশ বিস্তারের নির্মাণ প্রকল্প সহায়ক দক্ষ কারিগর তৈরি করা। এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৫৪ সালে বেসরকারি উদ্যোগে একই অভিপ্রায়ে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট তৈরি করে। পরবর্তী সময়ে ১৮৬৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানি আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়। এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ফলে উপেক্ষিত হয়েছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের দীর্ঘ ঐতিহ্যিবাহী শিল্পধারা ও পরম্পরায় শিল্প-ঐতিহ্যের সব অনুষঙ্গ। শুধু কলকাতা নয়, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মুম্বাই, মাদ্রাজ, জয়পুর ও লাহোরে একই ধারার আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা চালু করেছেন।[১৪] ফলে উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত হয়ে চলছিল ভারতীয় তথা প্রাচ্য-ঐতিহ্যের শিল্পধারা।

এ সময় ১৮৯৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ই.বি হ্যাভেল। তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের শিক্ষাব্যবস্থা সংযুক্ত করেন। সাথে যুক্ত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ শতকের প্রথম সোপানে কলকাতা আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যরা ভারতীয় পরম্পরায় শিল্পরীতিকে পুনর্জাগরণ করেন স্বদেশি চেতনায়। যার নামকরণ করা হয়েছে নব্য-বেঙ্গল স্কুল বা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা। এভাবেই বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ইউরোপীয় একাডেমিক শিল্পশিক্ষার পাশাপাশি নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতির ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। বাংলাদেশের প্রাচ্যকলা রীতির উৎস কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের নব্য-বঙ্গীয় রীতির পথ ধরেই। একাডেমিক শিল্পশিক্ষায় নব্য-বঙ্গীয় রীতির বিস্তার সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষত অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ছাত্র নন্দনাল বসু শান্তিনিকেতন শিল্পধারায় এই রীতির বিস্তার ঘটিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ায় কলকাতা আর্ট স্কুলে ভারতীয় শিল্পের একধরনের রেনেসাঁ সৃষ্টি হয়। সেই সময় গড়ে ওঠা নব্য-বঙ্গীয় রীতি প্রাচীন মধ্যযুগীয় ভারত-শিল্পের (অজন্তা, মোগল, রাজপুত) আদর্শে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এত সর্বভারতীয় শিল্পের, বিশেষত বাংলাদেশের পাণ্ডুলিপি চিত্র এবং লোকশিল্পের ঐতিহ্য অনুপস্থিত ছিল।[১৫] তবে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির নানান উপাদান সে সময়কার পাশ্চাত্য একাডেমিক চর্চারত শিল্পীদের কাজে নানাভাবে সংযুক্ত হয়ে বর্তমান অবধি 'ইন্ডিয়ান আর্ট' হিসেবে পরিচিত পেয়ে আসছে।

উল্লিখিত আলোচনায় মুর্শিদাবাদ ও কলকাতাকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাননির্ভর প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের, বিশেষত ঢাকার চিত্রচর্চার প্রেক্ষাপট খতিয়ে দেখা প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় রয়েছে গৌরবময় অতীত ঐশ্বর্যমণ্ডিত ঐতিহ্য। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ঢাকার বুকে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়ে স্থাপত্যের বিশেষ ধারা প্রবহমান ছিল। ধারণা করা যায়, এ সময় চিত্রচর্চাও হতো। যার প্রমাণ হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ঈদ ও মহরমের মিছিলের ছবি।

চিত্র ০১ : শিল্পী আলম মুসওয়ায়ের চিত্রকর্মে ঈদ উপলক্ষে বেরোনো ঢাকাবাসীর ঐতিহ্যবাহী মিছিল

মোগল আমলের কিছু মিনিয়েচার এবং প্রতিকৃতি চিত্রে (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং লালবাগ কেল্লার প্রত্ন-তাত্ত্বিক জাদুঘরে সংগ্রহে আছে) পারসিক প্রভাব এবং মোগল দরবারি চিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যা দেখে অনুমান করা যায় তৎকালীন সময়ে ঢাকায় নিজস্ব বিশেষ চিত্ররীতি গড়ে ওঠেনি।[১৬] তবে পটুয়াসংশ্লিষ্ট স্থানের নামকরণ (পাটুয়াটুলি) থেকে অনুমান করা যায় যে, ঢাকার পটুয়া শিল্পীরা লোকায়ত ধারার চিত্রচর্চা করতেন। বিশেষত তাঁরা প্রতিমা গড়তেন, প্রতিমার চালচিত্র আঁকতেন এবং ধনী ব্যক্তিবর্গের জন্য ফরমায়েশি ছবিও আঁকতেন। এই পটুয়া ধারার প্রমাণ পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতকে ঢাকার মঞ্চস্থ বিভিন্ন ফটকের দৃশ্যপট চিত্রে।[১৭] এ ছাড়া বাংলায় আলপনা, হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপকরণ অলংকরণ, যানবাহন পেইন্টিং চিত্রকলার সাক্ষ্য বহন করে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চার প্রথম ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল খুলনায় ১৯০৪ সালে 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শশীভূষণ পাল (১৮৭৮–১৯৪৬) এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কলকাতা ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা শিখে কর্মজীবনে হাই স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তী সময়ে ১৯০৪ সালে মহেশ্বরপাশায় নিজগৃহে চারুকলা অনুশীলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার নামই হলো 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্টস'।[১৮] এই স্কুলের পরিবর্তিত রূপই খুলনা আর্ট কলেজ এবং তৎপরবর্তী বর্তমান সময়ের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট।

উল্লেখ্য, ১৯৯২–৯৩ সালে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস যখন খুলনা আর্ট কলেজ ছিল তখন তিনটি শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রিতে প্রাচ্যকলা বিভাগ চালু ছিল। শিক্ষক ছিলেন বিমানেশ চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি শিল্পী আব্দুস সাত্তারের নিকট প্রাচ্যরীতির চিত্রঙ্কনের তালিম নিয়েছিলেন। প্রায় সমসাময়িক সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা গ্রুপ খোলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে— বাংলাদেশে প্রাচ্যচিত্রকলার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পথ ধরেই প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় প্রাচ্যকলা অর্থাৎ প্রাচ্যচিত্রকলা এগিয়ে চলেছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Lala Rukh Selim, æ50 Years xof the Fine Art Institute", *ART* Vol. 4, No. 3, January–March 1999, P. 4–5

২. ibid, P. 4–5

৩. আবুল মনসুর, "বাঙালি শিল্পীর সৃজন-উদ্যম : রূপ-রূপান্তরের ছয় দশক", কালি ও কলম, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (চিত্রকলা সংখ্যা), এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১০

৪. নজরুল ইসলাম, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ২য় সং, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, [প্র. প্র. জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৬]

৫. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম 'উচ্চ' মার্গীয় শিল্প : প্রাক-গুপ্ত বঙ্গের প্রেক্ষাপটে*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩

৬. "ভূমিকা" লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮, *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. xvi

৭. আবু তহের, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : জয়নুল আবেদিন, এস.এম সুলতান ও রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০০৮, পৃ. ১৫

৮. 'ভূমিকা', দ্র. লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), প্রগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত, xvii

১০. আবু তাহের, পৃ. ১৭

১১. আবু তাহের, পৃ. ১৮

১২. প্রাগুক্ত

১৩. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, মে ১৯৯৪, পৃ. ৯৮

১৪. আবুল মনসুর "ঔপনিবেশিক পট থেকে সাম্প্রতিককাল", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৫. আব্দুল মতিন সরকার, "ঢাকার শিল্পচর্চা", *চারুকলা (ঢাকার শিল্পচর্চা : বিশেষ সংখ্যা)*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ২৩

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা যোগমায়া, ১৯৮৪ পৃ. ১৯৬–৯৭

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সাত্তার

শিল্পী ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার (জন্ম ১৯৪৭) বহুমুখী প্রতিভাধর শিল্পীব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারার প্রধান পুরুষ। বাংলাদেশের প্রিন্টমেকিং ধারায়ও তাঁর অবদান অপরিসীম। শুধু তা-ই নয়, বহু মাধ্যমের কুশলী চিত্রশিল্পীর বাইরেও তাঁর বড় পরিচয় একজন শিল্প-সাহিত্যিক, নন্দনতাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক হিসেবে।

তিনি প্রাচ্যরীতির বিভিন্ন মাধ্যমে চিত্র আঁকার পাশাপাশি প্রিন্ট, বাটিক ও ভাস্কর্যের কাজ করেছেন। বাটিক মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির চিত্র অঙ্কন তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত কীর্তি। এক্ষেত্রে মাধ্যম যা-ই হোক না কেন, প্রাচ্যরীতির নানান অনুষঙ্গ দ্বারাই তাঁর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য বিচার সম্ভব।

সুদর্শন এই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয় তাঁর স্বল্পভাষায়। তিনি কর্মঠ, উদ্যোগী, জ্ঞানপিয়াসী, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমী একজন শিল্পী ও লেখক হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার পুরোধা শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তাঁর শিল্পীসত্তা ও লেখকসত্তা সমান গতিতে প্রবহমান।

একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে এবং একজন লেখক হিসেবে কোন গুণটি প্রধান, তা নির্ণয় করা মুশকিল। তবে শিল্পের এই দুই মাধ্যম একে অন্যের পরিপূরক হয়েই তাঁকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে শিল্পী মতলুব আলীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সদাপ্রসন্ন সুদর্শন পুরুষ, মিষ্টভাষী ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচক হিসেবে আব্দুস সাত্তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্যেও তাঁর এই গুণাবলির প্রভাব-প্রতিফলন প্রত্যক্ষ।[১]

একজন শিল্পীর শিল্পদর্শন তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন—পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আবর্তিত হয়। শিল্পী শৈশব থেকে যা-কিছু দেখেন, ভাবেন ও জ্ঞান লাভ করেন, তা তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি তাঁর চারপাশের জগৎকে আত্মস্থ করে নিজস্ব উপলব্ধির মাধ্যমে শিল্পকর্ম করেন। আব্দুস সাত্তারও তেমনি তাঁর পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক অবস্থার নিরিখে—তাঁর ভেতরে যে ভাবনা ও আবেগের সৃষ্টি হয়, তাই প্রকাশ করেছেন।

প্রাচ্য-ঐতিহ্যের মূল সূত্র ধরে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার পথিকৃৎ আব্দুস সাত্তার। তিনি বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলায় যে অবদান রেখেছেন এর হদিশ করার জন্য প্রথমে তাঁর ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস আলোচনা করা হবে। কারণ এ ইতিহাসের মধ্যেই শিল্পী আব্দুস সাত্তারের শিল্পী হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত, একজন শিল্পসমালোচক, প্রাবন্ধিক, নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে গড়ে ওঠার বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। তারপর আব্দুস সাত্তারের সিরিজচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে। কারণ আব্দুস সাত্তারের বহু মাধ্যমের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাচ্যরীতির চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তারপর একজন শিক্ষক হিসেবে, প্রশাসক হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করা হবে। তারপর আব্দুস সাত্তারের পর্যালোচনা, বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য এবং তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এতে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পী আব্দুস সাত্তারের ভূমিকা স্পষ্ট হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এক

প্রথিতযশা শিল্পী আব্দুস সাত্তার ১৯৪৭ সালে (সার্টিফিকেট অনুসারে জন্ম ১৯৪৮ সাল) নাটোর জেলার চকবড়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোঃ নাজির উদ্দিন সরকার এবং মায়ের নাম মোসাম্মাৎ আনেছা বেগম। নাটোর জেলায় জমিদারদের সুনাম ছিল। আব্দুস সাত্তারের বাড়ির চারপাশ হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকা। উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে গ্রাম্য পরিবেশে। দাদা জসীম উদ্দিন সরকারের চাল-চলন ছিল জমিদারদের মতোই। সারা দিন ঘোড়ায় চড়ে সময় কাটানো ছিল তাঁর শখ। বাবা নাজির উদ্দিন সরকার যৌথ পরিবারকে সামলিয়ে চলেছেন। আব্দুস সাত্তার তাঁর বাড়িতে দেখেছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের ভিড়। ফসল তোলা, মাড়ানোর প্রয়োজনে অনেক লোকের সমাগম, বাবার বন্ধুবান্ধবের আগমন, আড্ডা, প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকজনের সমাগম ও তাদের সাথে সম্প্রীতির বন্ধনের এক অনন্য সংস্কৃতি দেখে বেড়ে উঠেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, তাঁর ছেলেবেলায় সকাল-বিকালের খাবার সময় অন্তত ৫০ জন মানুষের খাবারের ব্যবস্থা থাকত। যার মধ্যে পাড়ার অভাবী মানুষ ভিড় জমাত শুধু খাওয়ার জন্য।[২]

বাড়ির এ রকম জমজমাট লোকসমাগমের বাইরে তাঁর খেলার সাথী যারা ছিল তারা প্রায় সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। হিন্দু কৃষ্টি-কালচার ও পূজা-পার্বণের বিভিন্ন উৎসবে ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। বলা যায়, বাল্যকালে অবাধ-উন্মুক্ত পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর মননের ভিত গড়ে উঠেছে। শিল্প প্রতিভারও ভিত গড়ে উঠেছে প্রতিমা তৈরি দর্শনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ দুর্গাপূজার সময় প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে গভীর মনোযোগে কারিগরদের প্রতিমা নির্মাণ দেখতেন। এভাবেই তিনি শিল্প বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

আব্দুস সাত্তারের বাল্যকালে বেড়ে ওঠার পরিবেশের সাথে শিল্পী নন্দলালের বাল্যকালে বেড়ে ওঠার মিল পাওয়া যায়। কারণ নন্দলাল খড়গপুরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও পারিপার্শ্বিক কারুশিল্পীদের প্রতিভা প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন।

আব্দুস সাত্তারের প্রকৃতিচেতনা, সংস্কৃতিচেতনা, বাঙালি সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকার কারণেই মজবুত হয়েছে। যা তাঁর পরবর্তী শিল্পী জীবনের মূলধন হিসেবে কাজ করেছে। স্কুলে পড়াশোনায় আব্দুস সাত্তার মনযোগী ছিলেন। তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত পাঠ্য বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের চিত্রাবলি। এই ইলাস্ট্রেশন দেখে ছবি আঁকতে উৎসাহী হন। প্রথমে ইলাস্ট্রেশনগুলোর হুবহু অনুকরণ করলেও পরবর্তী সময়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় লতা-পাতা, ফুল, পাখি, ঘর-বাড়ি, নদী-নৌকা, মানুষের চিত্র অঙ্কন করতেন।[৩]

পাড়া-প্রতিবেশীদের আবদার মেটাতে নানা ধরনের টেবিলের কভার ও রুমালে ডিজাইন ও ড্রয়িং করে দিতেন। পূজামণ্ডপে সহপাঠীদের আঁকা আলপনার কাজ দেখে রপ্ত করতেন। এই আলপনা ও অলংকরণসহ তিনি বিয়েবাড়ির সাজসজ্জার কাজ করেছেন। তিনি ড্রয়িং ক্লাসেও ভালো আঁকতেন। ড্রয়িং শিক্ষক বই দেখে ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে দিতেন। ব্ল্যাকবোর্ডের ছবি দেখে ক্লাসের সবাই আঁকত। আব্দুস সাত্তার শিক্ষকের চেয়ে ভালো ড্রয়িং করতেন বিধায় ড্রয়িং শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডের চিত্রগুলো আব্দুস সাত্তারকে দিয়ে আঁকাতেন। আব্দুস

Dhaka University Institutional Repository

সাত্তার ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে দিয়ে নিজের বেঞ্চে বসে খাতায় আঁকতেন।[৪] অর্থাৎ এখানে তিনি শিক্ষক ও ছাত্রের ভূমিকা একসাথে করতেন।

পূজাবাড়ির আলপনা ও স্টেজ ডেকোরেশনই নয়, পূজাবাড়িতে যাত্রা ও নাটকে অভিনয়ও করতেন। এই নানাবিধ গুণের কারণে পাড়া-প্রতিবেশীরা যেমন তাঁকে পছন্দ করত, তেমনি স্কুলের হেডমাস্টার ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন এবং চিত্রাঙ্কনে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি আর্ট পড়লে ভালো করবে।'[৫] কথাটি আব্দুস সাত্তারের মননে গেঁথে যায় এবং চারুকলার পাঠ প্রসঙ্গে এটাই তাঁর জীবনের প্রথম কথা শোনা। শুধু শিক্ষক নন, বাবা নাজির উদ্দিনও আব্দুস সাত্তারের এই শিল্প-প্রতিভাকে পছন্দ করতেন। তিনি নীরবে উৎসাহ দিতেন। বাড়িতে বাবার বন্ধুবান্ধব এলে আব্দুস সাত্তারের অঙ্কিত চিত্রগুলো গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখাতেন এবং দেখিয়ে আনন্দ পেতেন।

আব্দুস সাত্তার নদী পারের মানুষ। নদীর পারে তাঁদের তিন তলা কাঠের ঘর। এই ঘর তাঁর বাবা শখ করে তুলেছিলেন। আব্দুস সাত্তার যখন বড়াইগ্রাম হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন তখন আট বছর ধরে এই ঘরের কাজ চলছিল। তখন তিনি কাঠমিস্ত্রিদের কাঠের ডিজাইনগুলো করে দিয়েছেন। নিচ তলার দেয়ালের প্লাস্টারের ওপর ডিজাইন এঁকে নিজ হাতে সম্পন্ন করেছেন।

চিত্র ০১ : আব্দুস সাত্তারের তিন তলা কাঠের বাড়ি

চিত্র ০২ : আব্দুস সাত্তারের বাড়ির কাঠের ও দেয়ালের নকশা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া আব্দুস সাত্তার কাঠের ঘরে যে নকশা করেছেন, তা প্রশংসনীয় ও সাহসী কাজ। নকশা ও অলংকরণে একাগ্রতা ও দক্ষতা থাকার কারণেই এমন বড়ো পরিসরের ঘরের ডিজাইন/নকশা করা সম্ভব হয়েছে।

দুই

আব্দুস সাত্তার নাটোরের বড়াইগ্রাম হাই স্কুল থেকে ১৯৬৪ সালে এস.এস.সি পাস করেন। এবার উচ্চশিক্ষার পালা। স্কুলের হেডমাস্টার বলেছিলেন, 'তুমি আর্ট পড়লে ভালো করবে'—এ কথাটি ছাড়া তৎকালীন বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকায় ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে শিল্পশিক্ষার কোনো

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা আছে কি-না জানতেন না। তাই হেডমাস্টারের কথার গুরুত্ব না বুঝে এস.এস.সি পাসের পর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে আই.এস.সি ভর্তি হন। আই.এস.সি দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় বিয়ে করেন। আই.এস.সি ফাইনাল পরীক্ষার সময় সব পরীক্ষা শেষ না করে নাটোরের একটি প্রতিষ্ঠানে শর্টহ্যান্ড ও টাইপ শেখেন। সিদ্ধান্ত নেন নাটোরের এন.এস কলেজে ভর্তি হবেন। অধ্যক্ষ প্রথমে ভর্তি করাতে রাজি হয়ে পরবর্তী সময়ে ভর্তি করাতে অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনায় অধ্যক্ষের আচরণে আব্দুস সাত্তার ক্ষুব্ধ হয়ে সাধারণ বিষয়ে পড়াশোনা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মনে মনে সংকল্প করেন, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবেন এবং কোথাও ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরবেন। এই সংকল্প বাস্তবায়ন করতে তিনি ঈশ্বরদী টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফোন করে ভর্তি হওয়ার তথ্য সংগ্রহ করেন।

টেলিফোন গাইডের এক স্থানে ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ফোন নম্বরে ফোন করেন। ফোন রিসিভ করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ শফিকুল আমীন। তিনি বলেন, ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। তবে তৎকালীন অধ্যক্ষ শফিকুল আমীন আশ্বাস দিয়েছিলেন ভালো ছাত্র হলে ভর্তি করা যেতে পারে। এই আশ্বাসের ওপর ভর করে আব্দুস সাত্তার ১৯৬৬ সালে ঢাকায় এসে চারু ও করুকলা মহাবিদ্যালয়ে একা ভর্তি পরীক্ষা দেন। ভর্তি পরীক্ষায় 'এ' গ্রেড পেলে শিক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং ১৯৬৬–৬৭ শিক্ষাবর্ষে প্রি-ডিগ্রিতে ভর্তি হন। তিনি যখন ক্লাস শুরু করেন তখন সহপাঠীরা তিন মাস ক্লাস করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা পাঠের বিষয় সম্পর্কেও অবগত ছিলেন না সাত্তার। এ সময় প্রি-ডিগ্রিতে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন শিল্পী রফিকুননবী ও হাশেম খানকে। তাঁদের সহৃদয় সহযোগিতায় খুব দ্রুত চারুকলার পঠন-পাঠনের বিষয়গুলো জেনে নিতে পেরেছিলেন।

আব্দুস সাত্তারের শৈল্পিক অনুভূতি ছেলেবেলা থেকেই প্রখর ছিল। এবার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় তাঁর উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটতে লাগল। তিনিও এ বিষয়ের টেকনিকাল দিকগুলো পারঙ্গম করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। ক্লাস এবং ক্লাসের বাইরের এতটুকু সময়ও বিফলে যেতে দিতেন না। কাজ আর কাজের মধ্যে ডুবে থেকে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন। প্রি-ডিগ্রিতে পড়ার সময় ডিগ্রির পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো চর্চা করতেন অবসর সময়ে। অর্থাৎ তিনি যখন প্রি-ডিগ্রির দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করেন তখন প্রাচ্যকলা বিভাগের ছাত্র তাজুল ইসলামের প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অঙ্কন দেখে মুগ্ধ হন। যেহেতু এই রীতির কাজ দেখে ভালো লাগত তাই ক্লাসের বাইরের সময়ে প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করতেন। প্রি-ডিগ্রিতে যখন পেনসিল মাধ্যমে কাজ শেখানো হচ্ছিল ঠিক তখন আব্দুস সাত্তার জলরং ওয়াশ পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন। তিনি ছাত্রাবাস থেকে সকালে ক্যাম্পাসে এসে জলরং ওয়াশ পদ্ধতির কাজ শুরু করতেন এবং ক্লাস শুরু হলে ক্লাসের কাজে মনোযোগ দিতেন। ক্লাস শেষ হওয়ার পর আবার প্রাচ্যরীতির অনুশীলন করে সন্ধ্যায় হোস্টেলে ফিরতেন। এভাবে ক্লাসের অতিরিক্ত সময়ে প্রাচ্যরীতির জলরং ওয়াশ পদ্ধতির কাজে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এ সময় তাঁর কাজের বিষয় ছিল গাছের গুঁড়ি, লতা-পাতা এবং চারুকলার ছোটো গোল পন্ডের শাপলা ফুল

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। তাঁর এই কাজ দেখে শিল্পী শফিকুল আমীন উৎসাহ দিতেন। কারো কাছে না শিখে শুধু দেখে দেখে এই ওয়াশ পদ্ধতির কাজে কী রকম দক্ষ হয়েছিলেন, এর প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায়। ঘটনাটি হলো :

আব্দুস সাত্তার চারুকলার ছোট গোল পন্ডের পাশের (পেইন্টিং বিভাগের বারান্দার সামনে) আমগাছের গুঁড়ি এঁকেছিলেন জলরং ওয়াশ পদ্ধতিতে। ছবিটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল। এরপর ছবিটি পাকিস্তানের শিল্পী আব্দুর রহমান চুঘতাইয়ের আঁকা ছবির ফ্রেমের মতো করে ফ্রেম করে শিক্ষকদের গ্যালারিতে (বর্তমান লাইব্রেরি) রেখেছিলেন। এক পর্যায়ে ছবিটি দেখে শিক্ষকদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন ছবিটি শিল্পী চুঘতাইয়ের। এ কারণে ছবিটি অধ্যক্ষের কক্ষে টাঙানো হয়। কিন্তু পরে যখন জানাজানি হয় যে, ওই ছবি চুঘতাইয়ের নয় তখন সেটিকে অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে নামিয়ে ফেলা হয়। গাছের গুঁড়ির এই ছবিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

আব্দুস সাত্তার ১৯৬৮ সালে প্রি-ডিগ্রি পাস করে ১৯৬৮–৬৯ শিক্ষাবর্ষে ওরিয়েন্টাল আর্টস অ্যান্ড মুরাল পেইন্টিং বিভাগে (বর্তমান সময়ের প্রাচ্যকলা বিভাগ) ভর্তি হন। যেহেতু এই বিভাগে কোনো শিক্ষক ছিল না, বিভাগও বন্ধ ছিল; সেহেতু আব্দুস সাত্তারকে এই বিভাগে ভর্তি হতে অধ্যক্ষ আনোয়ারুল হক বারণ করেছিলেন। কিন্তু আব্দুস সাত্তার তাঁর সংকল্পে ছিলেন অবিচল। এ কারণে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তি করেন প্রাচ্যকলায়। শিক্ষকহীন বিভাগে আব্দুস সাত্তার দীর্ঘদিন নিজেই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন অভিনব পন্থায়। তিনি দেশ-বিদেশের ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, বই-পুস্তক থেকে প্রাচ্যচিত্ররীতির করণ-কৌশল জানতে চেষ্টা করেছেন। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের কাজ এবং পাকিস্তানের প্রাচ্যরীতির মাস্টার শিল্পী আব্দুর রহমানের চিত্র দেখে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর ভালো চিত্রাঙ্কনের পুরস্কার হিসেবে ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১ সালের চারুকলার বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। শুধু পুরস্কার নয়, বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত প্রায় সব ছবিই শিল্পরসিকরা সংগ্রহ করতেন। এত বেশি ছবি তাঁরা কিনে নিতেন যে, প্রদর্শনীতে বিক্রীত সর্বমোট ছবির প্রায় অর্ধেকই থাকত শিল্পী আব্দুস সাত্তারের চিত্রকর্ম।

চিত্র ০৩ : ছাত্রজীবনে অঙ্কিত জলরং ওয়াশ পদ্ধতির কাজ

চিত্র ০৪ : ছাত্রজীবনে অঙ্কিত ড্রয়িং (ড্রয়িংটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল)

চিত্র ০৫ : বার্ড, (ছাত্রজীবনে অঙ্কিত)

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সাত্তার যখন প্রাচ্যকলা বিভাগে পড়েন তখন চারুকলা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনে প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের দাবি যুক্ত হয়। ফলে প্রি-ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষক শিল্পী শিক্ষক হাশেম খানকে প্রাচ্যকলা বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি প্রাচ্যকলায় শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ না হওয়ায় আব্দুস সাত্তারকে বিদেশি পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেই শিল্প চর্চা অব্যাহত রাখতে হয়। এভাবে কাজ করতে করতে তিনি ১৯৭১ সালে ওরিয়েন্টাল আর্টস অ্যান্ড মুরাল পেইন্টিং বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৭৩ সালে ওই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ছাত্রজীবনে তিনি জলরং ওয়াশ পদ্ধতিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমন্বয় করে মায়াবী ওয়াশে নারী ফিগার, গাছের গুঁড়ি, লতা-পাতার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

তিন

আব্দুস সাত্তারের ১৯৭১ সালের বি.এফ.এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে যখন রেজাল্ট হতে বাকি সেই সময়ে শিল্পী শফিকুল আমীন স্যারের অনুরোধে মতিঝিলের বিজ্ঞাপন সংস্থা ইন্টারস্প্যানে (বর্তমানে ইন্টারস্পিড) গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে ওরিয়েন্টাল আর্ট অ্যান্ড মুরাল পেইন্টিং বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দিয়েও এই ডিজাইনার পদে কাজ করেছেন খণ্ডকালীন হিসেবে। এরপর ১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের স্কলারশিপে দুই বছরের জন্য (১৯৭৩–৭৫) ভারতের শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলাভবনে) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য শিক্ষক সোমনাথ হোরের অধীন প্রিন্টমেকিং বিষয়ে Post Graduate কোর্সে করেন। ভারতে সোমনাথ হোরের অধীন এই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সব থেকে বেশি উৎসাহিত করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শিল্পী আব্দুস সাত্তারকে খুব পছন্দ করতেন। যেহেতু সোমনাথ হোর ছিলেন জয়নুল আবেদিনের ছাত্র। তাই সাত্তারকে প্রিন্টমেকিং শেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন।[৬] বিশ্বভারতীতে তিনি প্রথম বছর চিত্রকলা এবং দ্বিতীয় বছর ছাপচিত্রের ওপর কাজ করেন।

শান্তিনিকেতনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স করার সময় তিনি ছাপচিত্র মাধ্যমের এচিং, লিথোগ্রাফ, একুয়াটিন্ট, ইন্টাগ্লিও মাধ্যমে প্রচুর কাজ করেছেন। এসব মাধ্যমে তিনি মূলত প্রাচ্যরীতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চিত্রই এঁকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ০৬ : সাঁওতাল মেয়ে, লিথোগ্রাফ
২৮ × ৪১ সেমি, ১৯৭৫

চিত্র ০৭ : মুখ, ১৯৭৪

চিত্র ০৮ : মিউজিশিয়ান, এচিং
১৯৭৪

শান্তিনিকেতনের কাজগুলোর মধ্যে লিথোগ্রাফে করা সাঁওতাল মেয়ে এবং এচিং-এ করা মিউজিশিয়ান চিত্রের মেয়ে ফিগারের উপস্থাপন কৌশল প্রাচ্যরীতির ষড়ং-এর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ সকল চিত্র প্রিন্টমেকিং মাধ্যমে অঙ্কিত হলেও জলরং ওয়াশ পদ্ধতির সকল গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বলা যায়, জলরং ওয়াশ পদ্ধতির টেকনিক তিনি ছাপচিত্রের ইমেজে নিয়ে এসেছেন নিপুণ দক্ষতায়। শান্তিনিকেতনে অঙ্কিত কাজগুলোর মধ্যে মর্নিং বাথ, মুখ, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, একাত্তর স্মরণে, উপজাতীয় রমণী প্রভৃতি চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ০৯ : মর্নিং বাথ, এচিং
১৯৭৪

চিত্র ১০ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, লিথোগ্রাফ
৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৭৪

চিত্র ১১ : যুগল, জলরং ও কালি-কলম
৪৬ × ৭১ সেমি, ১৯৮২

শিল্পী সাত্তার শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করার সময় চিত্রকলা এবং ছাপচিত্র চর্চার পাশাপাশি ভাস্কর্য চর্চাও করেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে ভারতের চুনারে স্টোন কার্ভিং ভাস্কর্য ক্যাম্পে অংশ নেন। ভারতের চুনার পাথরের জন্য বিখ্যাত। চুনারের ক্যাম্পে তিনি পাথর কেটে রিলিফ ভাস্কর্য করেছেন। এই ভাস্কর্যের নারী ফিগার প্রাচ্যরীতির বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তিনি স্টোন কার্ভিং ছাড়াও রড দিয়ে ভাস্কর্য বানিয়ে শিল্প-সমঝদারদের নজড় কাড়তে সমর্থ হয়েছিলেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২ : ভারতের চুনারে স্টোন কার্ভিং, ক্যাম্পে করা ভাস্কর্য
শায়িতা রমণী, ১৯৭৪

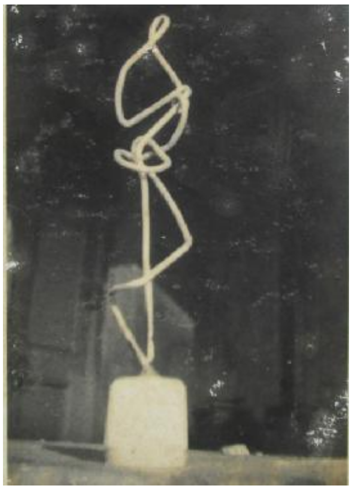

চিত্র ১৩ : লোহার রডের ভাস্কর্য
রমণী, ১৯৭৪

শুধু আর্ট ক্যাম্পেই নয়, শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পরও কিছুদিন ভাস্কর্যের নিয়মিত চর্চা করেছেন। বিশেষত শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক স্যারের নেতৃত্বে তৎকালীন সময় বাংলাদেশে ভাস্কর্যশিল্পীদের একটি কমিটি ছিল। এই কমিটির মাধ্যমে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। শিল্পী আব্দুস সাত্তার এই প্রদর্শনীগুলোতে নিয়মিত ভাস্কর্য দিতেন। এসব ভাস্কর্যের নমুনা দেখলে আব্দুস সাত্তারের প্রতিভা অনুমান করা যায়। তিনি এ সময় কাঠ মাধ্যমে যেসব ভাস্কর্য করেছেন তা তাঁর প্রাচ্যরীতির পেইন্টিংয়ের ফর্ম সদৃশ আবার কখনো পরীক্ষামূলক ভাস্কর্য চিত্রকলাকে সংমিশ্রিত করে রচনা করেছেন দৃষ্টিনন্দন ভিজ্যুয়াল আর্ট।

চিত্র ১৪ : নারী, কাঠ
৩.৮১ × ১৯.৫ × ৮২.৪৫ সেমি

চিত্র ১৫ : পাখি, কাঠ
১৯৯৭

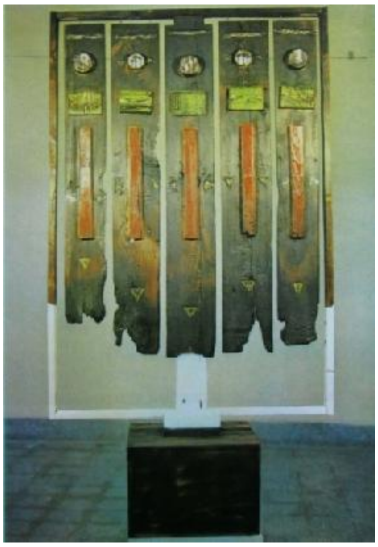

চিত্র ১৬ : ঝুলন্ত কম্পোজিশন
উড, মেটাল, কালার
উচ্চতা : ১৮০ সেমি, ১৯৮৩

আব্দুস সাত্তারের ভাস্কর্য দেখলে তাঁর প্রতিভার দিকটি বোঝা যায়। একটি মাধ্যমে অল্প সময় চর্চা করেও তাঁর শিল্পকর্ম সৃজনশীলতার চরম শিখরে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে তাঁর মেধার দিকটিই প্রধান হিসেবে বিবেচনা

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। তা ছাড়া পৃথিবীর অনেক শিল্পীই ছিলেন, যাঁরা বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁদের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলোর নাম করা যায়।

আব্দুস সাত্তার ভাস্কর্যে খুব কম কাজ করলেও তাঁর প্রতিটি কাজ শিল্প-নৈপুণ্যে ভরপুর। ১৯৭৫ সালে শিল্পী ভারত থেকে ফিরে এসে চারুকলায় পূর্বপদে যোগ দেন। ১৯৭৬ সালে তিনি নিজের প্রচেষ্টায় একটি প্রিন্টের মেশিন তৈরি করেন।[৮] এ প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিচারণায় লিখেছেন : ভারতের শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে ছাপচিত্রের চর্চা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আমি পুরাতন লোহালক্কর জোগাড় করে একটি ছাপ তুলবার মেশিন তৈরি করে কাঠখোদাই মাধ্যমে ছাপচিত্রের কাজ শুরু করি।[৯]

আব্দুস সাত্তার প্রিন্ট মাধ্যমে ভালো কাজের পুরস্কারস্বরূপ ১৯৭৬ সালে লাভ করেন জাতীয় নবীন চারুকলা প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ প্রিন্টমেকিং পুরস্কার। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন প্রিন্ট মাধ্যমে। ১৯৭৭ সালে জাপানের আন্তর্জাতিক টোকিও প্রিন্ট বিয়েনালে আমন্ত্রণ জানাতে উক্ত প্রদর্শনীর প্রতিনিধি বাংলাদেশের খ্যাতিমান প্রিন্টমেকারদের চিত্রকর্ম দেখে একমাত্র আব্দুস সাত্তারের চিত্রকর্মকেই নির্বাচিত করেন।[১০] আব্দুস সাত্তারের এ প্রদর্শনীর মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ শুরু।

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার মেধাবী শিল্পী প্রিন্ট বিষয়ে যেমন মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি একই সাথে চিত্রকলা মাধ্যমে তাঁর অবদান অব্যাহত রেখেছেন। যার প্রমাণ মেলে ১৯৮০ সালের পুরস্কার প্রাপ্তিতে। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত *জলরঙে বর্ষা* শীর্ষক প্রদর্শনীতে গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

চিত্র ১৭ : পোড়া কাঠ, কাঠখোদাই
৫৩ × ৪৩ সেমি, ১৯৮১

চিত্র ১৮ : প্রিন্ট-এ, কাঠখোদাই
৮৬০ × ৪৭৬ সেমি, ১৯৮৩

চিত্র ১৯ : গোলক
৯৯ × ৫০ সেমি, কাঠখোদাই, ১৯৮০

চার

শিল্পী আব্দুস সাত্তার শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে প্রাচ্যরীতির পাঠ্যক্রমভুক্ত মাধ্যম নিয়ে শিল্পচর্চা করে ক্ষান্ত থাকেননি। নতুন নতুন মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অঙ্কন করেছেন। বি.এফ.এ পাঠ্যক্রমের

Dhaka University Institutional Repository

সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে প্রিন্টমেকিংয়ের বিভিন্ন মাধ্যম এবং অন্যান্য বিষয়েও চিত্রচর্চা করেছেন। প্রাচ্যরীতির ছাত্র হিসেবে তিনি তেলরঙে চিত্র আঁকতে পারেন কিনা, এমন মন্তব্যকে উপড়ে দিয়ে তেলরঙে চিত্র এঁকে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে সে সময় বিভিন্ন উৎসব ও ঋতু-বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে চিত্রকলা বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হতো। এসব চিত্র প্রদর্শনীর শিরোনাম ছিল 'নবান্ন', 'কালবৈশাখী' প্রভৃতি। এ ধরনের প্রদর্শনীতে ইকবাল নামের একজন শিল্পী বাটিক মাধ্যমে কাজ দিতেন। তাঁর সুন্দর সুন্দর কাজ দেখে এই মাধ্যমের প্রতি আব্দুস সাত্তার আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শিল্পী ইকবালের কাছে শিখতে চাইলে শেখাতে রাজি হননি। এমতাবস্থায় স্ব-উদ্যোগে এই মাধ্যম কীভাবে শিখেছেন এবং বাটিক মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির ফিগারেটিভ কাজ করে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতি চর্চায় নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন—সে প্রসঙ্গটি উল্লেখের দাবি রাখে।

শিল্পী সাত্তার ইকবালের কাছে বাটিক মাধ্যমের কলা-কৌশল শিখতে না পেরে নিজেই উপায় খুঁজতে থাকেন। তবে তিনি জানতে পারেন যে, সাদা কাপড়ে মোম লাগিয়ে সেই কাপড় রং করে বাটিক করতে হয়। কিন্তু কী রং সে বিষয়ে জানতেন না। সে সময় ঢাকা থেকে তাঁর নাটোরের বাড়িতে যেতে হলে আরিচার নগরবাড়ি ফেরি পার হয়ে পাবনা হয়ে যেতে হতো। পাবনাতে জোলাদের (তাঁতি) বসতি। আব্দুস সাত্তার মনে মনে ঠিক করেন ওখানে গেলে বাটিক রং সংগ্রহ করা যাবে। ভাবনা অনুসারে বাড়ি যাওয়ার পথে পাবনা নেমে যান। তিনি সেখান থেকে রং নিয়ে বাড়িতে বসে বাটিক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। কারণ ওই রং বাটিকের জন্য ছিল না। ওই রং দিয়ে গরম পানিতে সুতা রং করা হয়। অথচ বাটিক করতে হয় ঠাণ্ডা পানিতে রং মিশিয়ে। তবে এই রং ব্যবহার করে কয়েকটি কাজ নষ্ট করার পর এক পর্যায়ে একটি কাজ মোটামুটি স্বার্থক রূপ নেয়। শিল্পী সাত্তারের প্রথম করা সেই বাটিকের বিষয় ছিল একটি মেয়ে। সাত্তার ওই কাজ ফ্রেম করে শিক্ষকদের গ্যালারিতে রাখলে অনেক শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক পর্যায়ে ওই কাজ দেখে শিক্ষক জুনাবুল ইসলাম প্রশংসা করেন এবং সাত্তারকে আরো কাজ করতে বলেন। উল্লেখ্য যে, ওই সময় কারুকলা বিভাগ চালু না হলেও শিক্ষক জুনাবুল ইসলামকে ওই বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কারণে তিনি প্রাচ্যকলা বিভাগসংলগ্ন গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগের একটি ছোটো কক্ষ নিয়ে বসতেন। কিন্তু তখন কোনো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়নি। কাজ করার কোনো সরঞ্জামও ছিল না সেখানে।

শিল্পী সাত্তার যথাযথভাবে মোম ব্যবহার এবং বাটিকের রং সংগ্রহ ও ব্যবহারের কথা ভাবতে থাকেন। এক পর্যায়ে জানতে পারেন পুরাতন ঢাকার ইংলিশ রোডে বাটিকের রং পাওয়া যায়। তিনি সেখান থেকে রং সংগ্রহ করে ওই রং ব্যবসায়ীর নিকট থেকে রং প্রস্তুত ও ব্যবহারের পদ্ধতি জেনে নিয়ে পর্যায়ক্রমে সার্থকভাবে বাটিকের বেশ কিছু কাজ করতে সমর্থ হন। সাত্তারের কাজ দেখে শিক্ষক জুনাবুল ইসলামও আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তাঁর বিভাগের সিলেবাসে বাটিক বিষয় রয়েছে। এ কারণে তিনি শিল্পী সাত্তারের

Dhaka University Institutional Repository

বাটিক চিত্রকর্মের বিষয়ে উৎসাহের সঙ্গে খোঁজখবর রাখতেন। চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিল্পী সাত্তার এভাবেই বাটিক মাধ্যমকে জনপ্রিয় করেন।[১১]

চিত্র ২০ : বংশীবাদক, বাটিক চিত্র

চিত্র ২১ : বংশীবাদক-২, বাটিক চিত্র

আব্দুস সাত্তার বাটিক মাধ্যমে প্রাচ্যকলা ধারায় ফিগারেটিভ কাজ করে চারুকলার বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করেন। পরবর্তী সময়ে বাটিক মাধ্যমে প্রচুর কাজ করেছেন। বাটিক মাধ্যম নিজস্ব প্রচেষ্টায় শিক্ষালাভ করার পর ছাত্র-ছাত্রীদেরও এ মাধ্যমে কাজ শিখিয়েছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কন করার বিষয় সিলেবাসে না থাকলেও শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের এই মাধ্যমে কাজ শেখাতেন ক্লাসের অতিরিক্ত সময়ে। শিল্পী নাসরীন বেগম আব্দুস সাত্তারের উদ্ভাবিত এই মাধ্যমে অনেক চিত্র এঁকেছেন।

আব্দুস সাত্তার প্রথম পর্যায়ে জলরং ওয়াশে ফিগারেটিভ কাজের মতো বাটিকের মাধ্যমে চিত্র আঁকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি ফর্ম ভেঙে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্র ২২ : সিটেট ওমেন, বাটিক চিত্র

চিত্র ২৩ : রমণী, বাটিক চিত্র

চিত্র ২৪ : যুগল, বাটিক চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ

চারুকলা অনুষদে এম.এফ.এ কোর্স চালু হলে শিল্পী আব্দুস সাত্তার প্রাচ্যকলা বিভাগে অধ্যাপনার পাশাপাশি নিজ বিভাগে এম.এফ.এ ভর্তি হন। তিনি ঢাকা চারুকলার প্রথম এম.এফ.এ কোর্সের ছাত্র। এম.এফ.এ পরীক্ষায় ১৯৮০ সালে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এই লেখাপড়ার মাঝে তাঁর শিল্পচর্চা থেমে থাকেনি। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রথম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে 'গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড' (স্বর্ণপদক) লাভ করেন। একই বছর যুগোস্লাভিয়ার লুবিয়ানায় ১৪তম আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনীতে 'পারচেজ অ্যাওয়ার্ড' এবং বাংলাদেশের জাতীয় নবীন চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রিন্ট বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯ সালে তিনি যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনীতে 'পারচেজ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন।

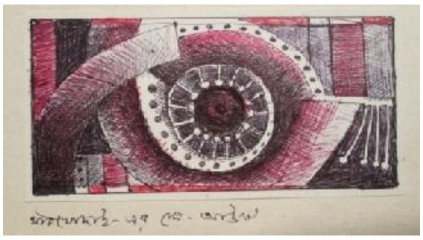

চিত্র ২৫: কাঠখোদাইয়ের লে-আউট

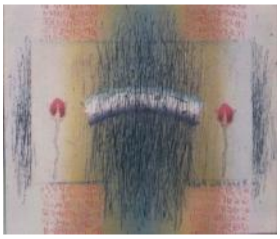

চিত্র ২৬ : কাঠখোদাই

চিত্র ২৭ : কাঠখোদাই

প্রিন্টমেকিং মাধ্যমে আব্দুস সাত্তারের কাজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। ১৯৮১ সালে প্রথম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর বিচারক ইন্দোনেশিয়ার খ্যাতিমান শিল্পী মোখতার আপিন তাঁর প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা উল্লেখের দাবি রাখে :

> বাংলাদেশের চিত্রকলা সত্যিকার অর্থে আমাকে বিস্মিত করেছে। বিশেষ করে পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী আব্দুস সাত্তারের গ্রাফিক্স-এর কাজ এক কথায় অনবদ্য। তাঁর একটি কাঠ খোদাই চিত্র জুরী বোর্ডের সব সদস্যেরই মনোযোগ কাড়ে।[১২]

১৯৮০ সালে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের জীবনে। তিনি হোটেল সোনার গাঁয়ের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার দায়িত্ব লাভ করেন। এ উপলক্ষে তিনি প্রিন্ট ও পেইন্টিং মাধ্যমে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ৩৫০টি চিত্রকর্ম এঁকে হোটেলের কক্ষগুলোতে সাজিয়ে দেন। তাঁর এই চিত্রগুলো বর্তমান অবধি হোটেলের কক্ষগুলোতে সংরক্ষিত আছে।

১৯৮৩ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সালে তিনি আমেরিকায় সানফ্রান্সিসকোতে *ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট ফোর*-এ অংশগ্রহণ করেন এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত ও.আই.সি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা শহর সাজসজ্জার অংশ হিসেবে ফার্মগেট ওভারব্রিজ অলংকরণ করে সুধীমহলে প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৮৩ সালেই তাঁর লেখনী প্রতিভার উন্মেষ ঘটে এবং প্রথম পত্রিকায় স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ তিনি দৈনিক সংবাদের চিঠিপত্র কলামে *গাছ পাথরের মাত্রাজ্ঞান এবং আমজাদ হোসেনের বেগম রোকেয়া* শীর্ষক শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর লেখক হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ সালে আব্দুস সাত্তার যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক ড্রয়িং প্রদর্শনী, নরওয়ে আন্তর্জাতিক প্রিন্ট বিয়েনাল, ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক প্রিন্ট বিয়েনাল, জি.ডি.আর-এ ইন্টার গ্রাফিক '৮৪' মালয়েশিয়াতে ইসলামিক আর্ট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন।

আব্দুস সাত্তারের জ্ঞানার্জন ও একাডেমিক পড়াশোনা চলতে থাকে। তিনি ১৯৮৫ সালে আমেরিকা সরকারের ফুলব্রাইট গ্রান্টে মনোনীত হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যান। ফুলব্রাইট গ্রান্টের প্রথম পর্যায়ে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ লিটারেচার বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এই লিটারেচার-বিষয়ক কোর্সে *গান্ধী* বিষয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে এক্সিলেন্ট মার্ক অর্জন করেন।

জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির শিক্ষাক্রম শেষ করে তিনি নিউ ইয়র্ক শহরের ব্রুকলিনে অবস্থিত প্রাট ইনস্টিটিউটে ছাপচিত্র বিষয়ে এম.এফ.এ কোর্সে অধ্যয়ন করেন। এখানে এক বছরের মেয়াদ শেষ হলেও তাঁর এম.এফ.এ শেষ না হওয়ায় আরো সময়ের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু স্কলারশিপের নিয়মানুযায়ী সময় বৃদ্ধির নিয়ম ছিল না। কিন্তু আব্দুস সাত্তারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এক বছরের অসাধারণ মেধাবী ফলাফলের কারণে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সময় বৃদ্ধি করেছিলেন।[১৩]

শিল্পী সাত্তারের মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ আমেরিকায় শিক্ষারত ফুলব্রাইট স্কলারদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নবিষয়ক কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য মনোনীত হন। তিনি ফুলব্রাইট স্কলারদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করেছেন। প্রাট ইনস্টিটিউটে তিনি এচিং, লিথোগ্রাফ, সিল্কস্ক্রিন মাধ্যমে চিত্র এঁকে প্রশংসা অর্জন করেন। এ সকল মাধ্যমে কখনো ফিগারেটিভ আবার কখনো ফিগার ছাড়া (নির্বস্তুক) কাজও করেছেন। তবে সকল কাজে প্রাচ্য ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করতেন। এ জন্য ফিগারহীন (নির্বস্তুক) কাজকেও প্রাচ্য ধারার কাজ বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করতেন। এমনই ঘটনা ঘটে প্রাট ইনস্টিটিউটেও। সেখানে প্রতি সপ্তাহে করা কাজের ওপর আলোচনা করা হতো। আলোচনার পূর্বে সকলের কাজ প্রদর্শন করা হতো। এরপর শিক্ষক এবং দেশ-বিদেশের স্কলাররা আলোচনায় অংশ নিতেন। কার কাজ কেমন হয়েছে, কোথায় সমস্যা হয়েছে, আরো কী করা উচিত ছিল ইত্যাকার বিষয়ে আলোচনা হতো। শিল্পী সাত্তারের কাজ দেখে তাঁরা বলেছিলেন—এ কাজ নিশ্চয়ই কোনো এশীয় শিল্পীর। এ কাজের ভিত এতই মজবুত যে, এ কাজকে টলানো যাবে না কোনোভাবেই। অর্থাৎ কোনো বিরূপ সমালোচনা করা সম্ভব নয়। এসব মন্তব্য করার পর তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন—কার কাজ এগুলো। তখন শিল্পী সাত্তার বলেছিলেন, ওই কাজগুলো তাঁর।[১৪]

চিত্র ২৮ : সম্পর্ক, কাঠখোদাই
৫২ × ৮২ সেমি, ১৯৮৫

চিত্র ২৯ : শিরোনামহীন 'এ', কাঠখোদাই
ও অফসেট, ৫২ × ৮২ সেমি, ১৯৯৬

চিত্র ৩০ : সম্পর্ক, কাঠখোদাই
১৯৮৫

আব্দুস সাত্তার প্রাট ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র বিষয়ে এম.এফ.এ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে 'এ' গ্রেড অর্জনের মধ্য দিয়ে এম.এফ.এ-তে ডিস্টিংশন লাভ করেন। এখানে তিনি ছাপচিত্রের পাশাপাশি ফটোগ্রাফি কোর্স, শিল্পকলার ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্ব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ১৯৮৭ সালে শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।[১৫]

আব্দুস সাত্তার ১৯৮৭ সালে পাকিস্তান আর্ট বিয়েনালে অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড (স্বর্ণপদক) লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ (World best) গ্রাফিক শিল্পীদের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রাফিক শিল্পীর সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি।

শিল্পী আব্দুস সাত্তার পাখিপ্রেমী মানুষ। পাখি পোষা, বাগান করা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভ্যাস। সেই থেকে বাড়িতে কবুতর ও ঘুঘু পুষে আসছেন তিনি। তাই তাঁর পেইন্টিংয়ে কবুতর, ঘুঘু, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতি পাখি লক্ষ করা যায়। শুধু পাখি নয়, তাঁর ভালোবাসার অন্য আরেকটি ক্ষেত্র দারুশিল্প। ছেলেবেলায় নিজে বাড়ির কাজে কাঠের ওপর মিস্ত্রিদের ডিজাইন করে দিয়েছেন। সেই কাঠের কারুকাজ যখন রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে নষ্টপ্রায় হয়ে যাচ্ছিল তখন তাঁর মনে বিশেষভাবে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন, এমন অনেক কাঠের শিল্পকর্ম সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, যা বাংলার ঐতিহ্যিক সম্পদ।

ব্যক্তিসম্পদকে কেন্দ্র করে দেশের সম্পদের ভাবনা যখন আসে তখন তিনি এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। নব্বইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে তিনি *বাংলাদেশের নতোন্নত দারুশিল্প* শিরোনামে গবেষণা শুরু করেন এবং ২০০০ সালে অর্জন করেন পিএইচ.ডি. ডিগ্রি। তাঁর এই মূল্যবান গবেষণায় বাংলাদেশের দারুশিল্পের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর এ অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থ আকারে পাওয়া যাচ্ছে। এ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লিখিত আলোচনায় আব্দুস সাত্তারের পড়াশোনা ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পুরস্কার ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনি ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মাধ্যমের কাজ দিয়ে মোট ১২টি একক প্রদর্শনী করেছেন। তাঁর ১৩তম একক প্রদর্শনী হয়েছে সাজু আর্ট গ্যালারিতে ১৯৯০ সালে। ১৯৯৪ সালে ১৪তম একক প্রদর্শনী করেছেন ডিভাইন আর্ট গ্যালারিতে। একই গ্যালারিতে ১৫তম একক প্রদর্শনী করেছেন ১৯৯৫।

মিসরের আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক প্রিন্ট প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ শিল্পী আব্দুস সাত্তারের একক প্রদর্শনী করেছে মিসরে। কারণ মিসরের ওই প্রদর্শনীতে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। আব্দুস সাত্তার ২০০২ সালে তাঁর ১৯তম একক প্রদর্শনী করেছেন সাজু আর্ট গ্যালারিতে। ২০১৩ পর্যন্ত তাঁর একক প্রদর্শনীর সংখ্যা একুশ (২১)টি। এসব প্রদর্শনীতে জলরং, তেলরং, অ্যাক্রেলিক, ছাপচিত্রের প্রায় সকল মাধ্যমের কাজসহ ভাস্কর্য ও বাটিক চিত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল।

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের সকল মাধ্যমের কাজেই বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বিষয়ের সাধারণ নাম ব্যবহার করে শিরোনাম দিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রায় সব ছবিই বিষয়ভিত্তিক। বিমূর্ত চিত্রের সংখ্যা খুব কম। সাধারণ বিষয়কে সাধারণ শিরোনামে আখ্যায়িত করে তিনি বিষয়ের গভীর ভাবাবেগকে উন্মোচন করেছেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি কাজ ফর্ম ও বিষয়ের সরলীকরণের মধ্যেও তীব্র ও গভীর ভাবনার আবেগ তৈরি করে দর্শকের মনে। এটা তাঁর চিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ।

বিশ্ব-শিল্পাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আব্দুস সাত্তার দুটি স্বর্ণপদকসহ সাতটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন এবং একটি স্বর্ণপদকসহ দেশে মোট ৯টি পুরস্কার লাভ করেছেন। এ ছাড়া জাপান, তাইওয়ানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সার্টিফিকেট ও সম্মাননা ক্রেস্ট পেয়েছেন।

ছয়

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিল্পী আব্দুস সাত্তার নানা মাধ্যম ও টেকনিকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিত্র এঁকেছেন। তাঁর চিত্রের সহজ-সরল বিষয়ের মতো নামকরণেও সরলীকরণ করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক নামকরণ কিংবা নামকরণের কাব্যিক ব্যঞ্জনা রাখেননি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাঁর চিত্র কাব্যের মতোই বিষয়ের গভীরতাকে নান্দনিক ব্যঞ্জনা দেয়। অনুরণিত হয় সাধারণ দর্শক ও শিল্পবোদ্ধাদের চিত্ত। নামকরণের বিষয় থেকে আরো গভীরতায় ভাবনাকে ডুবিয়ে তোলে। তবে সুন্দর, ভালো লাগা এবং আনন্দই তাঁর শিল্পের প্রধান বক্তব্য।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের বিভিন্ন সিরিজ-প্রধান ও বিষয়-প্রধান চিত্রের নমুনা তুলে ধরে তাঁর চিত্রকর্মের সার্বিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হবে। যাতে এটা বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় শিল্পী আব্দুস সাত্তারের কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান মূল্যায়ন করতে সহায়ক হয়।

শিল্পী আব্দুস সাত্তার পাখি পোষেন। কবুতর, ঘুঘু তাঁর মধ্যে অন্যতম। তিনি পাখিপ্রেমী। পাখির সাথে মানুষের প্রেম-ভালোবাসা প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। কিংবদন্তি গল্পে জানা যায়, পাখি মানুষের চিঠি বহন করে প্রেমিক কিংবা প্রেমিকার কাছে পৌঁছে দিত। শিল্পী নারীর সাথে পাখির প্রেম বিষয়কে কেন্দ্র করে অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাসে *বার্ড লাভার* সিরিজচিত্র এঁকেছেন। উপস্থাপনার ধরনে প্রাচ্যরীতির ষড়ং-এর সবকটি গুণ বিদ্যমান। ভিজ্যুয়াল বিউটি ছাড়াও নারী হৃদয়ের মান-অভিমান-ভালোবাসার অন্তঃকথন বর্ণিত হয়েছে চিত্রে। যেখানে শিল্পী প্রদত্ত শিরোনাম *বার্ড লাভার* বা পাখিপ্রেমী হলেও সমঝদার কিংবা শিল্পরসিক ভেদে রস আহরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়।

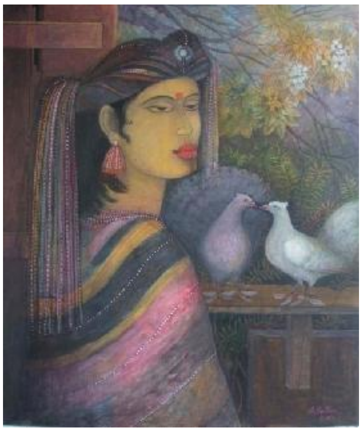

চিত্র ৩১ : বার্ড লাভার-১, অ্যাক্রেলিক
১৫২ × ১২১ সেমি, ২০১২

চিত্র ৩২ : বার্ড লাভার-২, অ্যাক্রেলিক
১৫২ × ১২১ সেমি, ২০১২

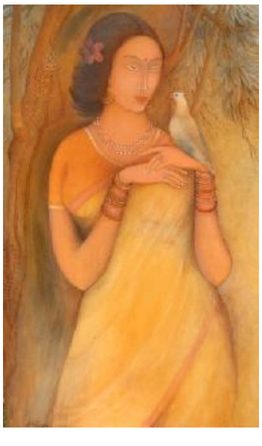

চত্র ৩৩ : বার্ড লাভার-৩
অ্যাক্রেলিক

আব্দুস সাত্তার শান্তিনিকেতনে প্রিন্টমেকিং পড়ার সময় উডকাট অঙ্কন করেননি এবং শেখেনওনি। শান্তি-নিকেতন থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথম প্রিন্টের মেশিন বানিয়ে উডকাট (কাঠখোদাই)-এর কাজ শুরু করেন। এই কাঠখোদাই চিত্রে প্রচলিত বহু প্লেট ব্যবহারের পরিবর্তে এক প্লেটের ছাপ নেয়ার বিষয় চালু করেন। তিনি মূলত কাঠখোদাই মাধ্যমেই অনেক বেশি কাজ করেছেন। তিনি কাঠখোদাই মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কনের ধরন অনুসারে ফিগারেটিভ কাজ করেন। তাঁর এই কাজ বিদেশে প্রদর্শিত হওয়ায় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়েছে। তিনি প্রাচ্যের নারীদের বাহির ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দৃষ্টিনন্দন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। ফুলসহ রমণী, পাখি ও রমণী, উপবিষ্ট মহিলা প্রভৃতি চিত্র সে সাক্ষ্যই বহন করে।

চিত্র ৩৪ : পাখি ও রমণী, কাঠখোদাই
৬৭ × ৪৭ সেমি, ২০০৭

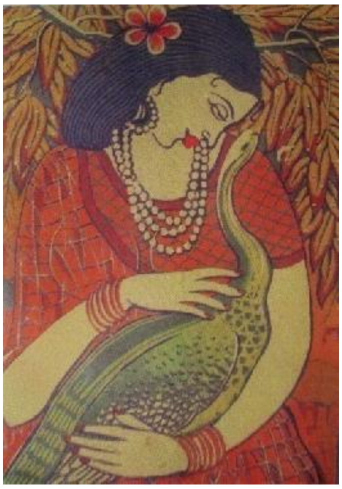

চিত্র ৩৫ : ফুলসহ রমণী, কাঠখোদাই
৫৯ × ৪৪ সেমি, ২০০৭

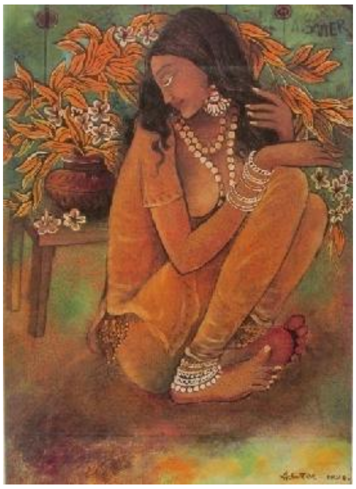

চিত্র ৩৬ : উপবিষ্ট মহিলা, উডকাটে
তেলরং, ৬৭ × ৪৭ সেমি, ১৯৭৬

আব্দুস সাত্তার নারী-প্রধান চিত্রই বেশি এঁকেছেন। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের হাতেই নারী ফিগারের এক ধরনের স্টাইল তৈরি হয়েছে। যে স্টাইলের মধ্যে প্রাচ্যের দ্বিমাত্রিকতা, রেখার প্রয়োগ, টানা টানা চোখ, ঠোঁটের সু-আকৃতি, চুলের নান্দনিক বিন্যাস, অভিব্যক্তি বা মুডের রমণীয়তা, হাতের আঙুলের ছন্দময় সুললিত বিন্যাস, অলংকরণ সজ্জিত দেহাবয়ব—সব মিলে এক উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরের ঐকতান সৃষ্টি হয়। আব্দুস সাত্তার জলরং, তেলরং, অ্যাক্রেলিক রঙে প্রাচ্য ঘরানার চিত্র অঙ্কনের সাথে কাঠখোদাই বা উডকাট মাধ্যমে সে রকম চিত্র এঁকেছেন। অর্থাৎ বাংলার প্রাচ্যরীতিতে মাধ্যম হিসেবে কাঠখোদাই চিত্রে নারী ফিগার চিত্রণের অভিনব পথ সৃষ্টি করেছেন আব্দুস সাত্তার। তাঁর চিত্রকর্ম সম্পর্কে জাহান আরা রউফ লিখেছেন :

> প্রাচ্য ধারায় সৃষ্ট তাঁর ফিগারেটিভ পেইন্টিংগুলো অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বিশেষ করে নারীর অপরূপ সৌন্দর্য তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে, তা দেখে দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায়। পরিমিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ রং-এর প্রয়োগ কৌশল এবং রেখার ছন্দবদ্ধ প্রকাশ ও অভিব্যক্তির ফলেই তাঁর শিল্পকর্ম মাধুর্যময় হয়ে ওঠে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৭ : প্রিপারেশন, উডকাট
৭৫ × ৫০ সেমি, ১৯৮৪

চিত্র ৩৮ : পাখিসহ রমণী, উডকাট
৭৫ × ৪৫ সেমি, ১৯৮৫

চিত্র ৩৯ : পেইন্টার, উডকাট
৭৫ × ৪০ সেমি, ১৯৮৪

আব্দুস সাত্তার অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে ক্যানভাসে বড়ো সাইজের ছবি এঁকেছেন। প্রাচ্যরীতির ফিগারেটিভ কাজগুলো সাধারণত ছোটো আকৃতির হয়ে থাকে। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা জলরং মাধ্যমে ওয়াশ পদ্ধতিতে ফিগারেটিভ কাজ করতেন। ওয়াশ পদ্ধতিতে ফিগারেটিভ কাজ বড়ো মাপে করা সম্ভব নয়। আর সে সময় অ্যাক্রেলিক মাধ্যমও ছিল না। অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে জলরঙের মতোই কাজ করা যায়। যেহেতু এই মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে ক্যানভাসে বড়ো পরিসরে ফিগারেটিভ কাজ করা যায়—শিল্পী আব্দুস সাত্তার সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ক্যানভাসে বৃহৎ পরিসরে প্রাচ্যরীতিতে ফিগারেটিভ কাজ করেছেন। তাঁর এই কাজে নারী ফিগারের উপস্থাপনার ধরনের সাথে পাকিস্তানের শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের ফিগারের আদল ও ভঙ্গির মিল পাওয়া যায়। তবে আব্দুস সাত্তারের নারী ফিগারের মুখের গড়ন, নাকের আদল, ঠোঁটের ধরনে স্বতন্ত্র একটি মোটিভ লক্ষণীয়। বলা যায়, বাংলার প্রাচ্যরীতির ধারায় জলরং মাধ্যমে ফিগারেটিভ কাজের যে প্রচলন ছিল—শিল্পী আব্দুস সাত্তার অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে ক্যানভাসে বৃহৎ পরিসরে ছবি এঁকে সময়োপযোগী দাবি মিটিয়েছেন। এখানেই তাঁর আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আব্দুস সাত্তার শিক্ষিত রুচিসম্মত হাল ফ্যাশনের পোশাকে এবং মার্জিত অলংকরণশোভিত নারী ফিগার এঁকেছেন। কখনো প্রাচ্যরীতির রেখাপ্রধান কাজ করেছেন। বৃহৎ ক্যানভাসে রেখাপ্রধান ফিগারেটিভ কাজের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর নারীদের চোখ-মুখ-নাকের বিশেষ আদল এ দেশের নারীদের গড়নকে স্মরণ করিয়ে দিয়েও দেশ-কালের উর্ধ্বে শুধু চিত্রজ সৌন্দর্যকে মূর্ত করে—এখানেই তাঁর চিত্রকর্মের সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪০ : টেলিগ্রাম, অ্যাক্রেলিক, ২০০৪

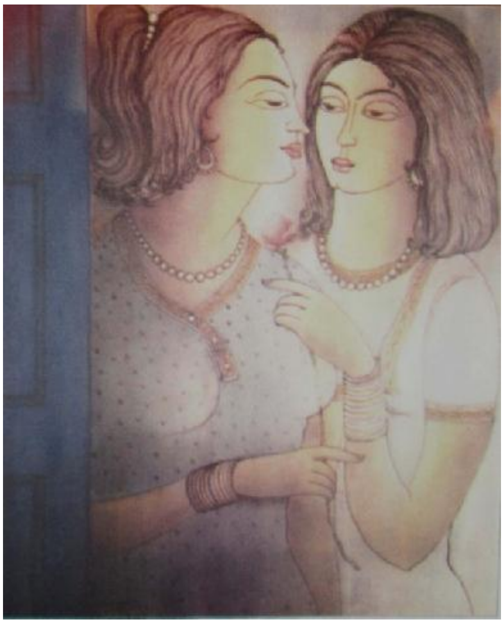

চিত্র ৪১ : ছেঁড়া ফুল, অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৯

টেলিগ্রাফ নামক চিত্রে শিল্পে সাত্তার ক্যানভাসের ওপর ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করেছেন মার্কার পেন দিয়ে। তারপর হালকা রঙের ওয়াশ দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে রং দিয়ে ফিগারগুলোকে আলাদা করেছেন। প্রাচ্যরীতির রেখাপ্রধান বৃহৎ এই কাজের দৃষ্টান্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবি রাখে। ছেঁড়া ফুল চিত্রের ক্ষেত্রে আব্দুস সাত্তার ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক কালারকে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে, জলরং বৈশিষ্ট্যের সকল সত্তাকে অনুভব করা যায়।

চিত্র ৪২ : দুই বান্ধবী, অ্যাক্রেলিক
২১৩.৩৬ × ১২১.৯২ সেমি, ২০১২

চিত্র ৪৩ : তিন কন্যা, অ্যাক্রেলিক
১৫০ × ১২০ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ৪৪: ফুল হাতে রমণী
অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪৫ : পাঠিকা, অ্যাক্রেলিক
৮৫ × ৮৫ সেমি, ২০১১

চিত্র ৪৬ : তিন বোন, অ্যাক্রেলিক
২১০ × ১২৫ সেমি, ২০১২

চিত্র ৪৭ : আঙিনায়, অ্যাক্রেলিক
১৮০ × ১২০ সেমি, ১৯৯৯

সাত

শিল্পী আব্দুস সাত্তার প্রাচ্যরীতির জলরং অনুশীলন শুরু করেছিলেন প্রাক-বি.এফ.এ প্রথম বর্ষে ভর্তির পর পর। অর্থাৎ যখন একাডেমিক কারিকুলামে পেনসিল মাধ্যমে শিল্পের বেসিক বিষয় শেখানো হয় তখন নিজের উদ্যোগে জলরং অনুশীলন করেছেন। তবে তাঁর জলরং প্রয়োগে পাশ্চাত্য করণ-কৌশলের সাথে প্রাচ্য করণ-কৌশল সমন্বিত হয়ে সহাবস্থান করে।

চিত্র ৪৮ : পতিত বৃক্ষ, জলরং
৭৪ × ৯৩ সেমি, ১৯৯৭

চিত্র ৪৯ : প্রবেশ, জলরং
৬৩ × ৯২ সেমি, ১৯৯৭

পতিত বৃক্ষ ও *প্রবেশ* নামক চিত্রে পাশ্চাত্য একাডেমিক পদ্ধতির জলরং প্রয়োগ এবং বেঙ্গল স্কুলের জলরং ওয়াশ পদ্ধতির দ্বৈত প্রয়োগ সহাবস্থানে আছে।

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের কাজে জলরং প্রয়োগের পাশ্চাত্য একাডেমিক ঘরানার ত্রিমাত্রিক ইলিউশন লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য একাডেমিক জলরং প্রয়োগরীতিকে গ্রহণ করেই তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্র এঁকেছেন। অথচ তাঁর সকল কাজে ব্যবহৃত রং প্রাচ্য ধারার ওয়াশ টেকনিকে প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই অনুমিত হয়। অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

যে রঙের মায়াজাল বহু কষ্টে এবং অনেক সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়, শিল্পী সাত্তার তা প্রয়োগ-কৌশল গুণে মুহূর্তেই অর্জন করেছেন। এ কারণেই আব্দুস সাত্তারকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। টেকনিকের দিক থেকে তাঁর এ বৈশিষ্ট্য প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় বহুমাত্রিকতা দিয়েছে।

শিল্পী আব্দুস সাত্তার জলরং প্রয়োগে শুধু একটি শৈলীতে আবদ্ধ থাকেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচ্যরীতির রেখাকে যথাসম্ভব বর্জন করে শুধু রঙের মায়াবী আবেশ তৈরি করে ফিগারেটিভ চিত্র এঁকেছেন। এসব চিত্রে প্রকৃতি ও ফিগারের মধ্যে কোনো পরিরেখা দ্বারা বিভাজন করা হয়নি। জলরং ওয়াশ পদ্ধতির অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তিনি রং নিয়ে খেলেছেন। এ খেলা যেন শরতের মেঘের মতো। নানা রঙের মেঘ ভাবুক দর্শকের কল্পনায় যেমন নানা আকৃতির সৃষ্টি করে, আব্দুস সাত্তারের এ পর্যায়ের কাজও তেমনি অধরার মধ্য থেকেও আকৃতি ও ফর্ম ধরা দেয়।

চিত্র ৫০ : কবুতর হাতে রমণী, জলরং

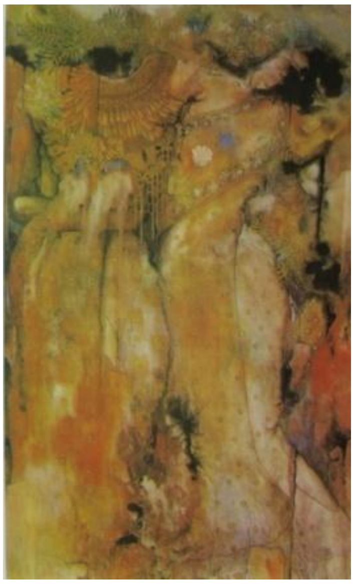

চিত্র ৫১ : যুগল-১, জলরং
১১৫ × ৫৬ সেমি, ১৯৮৩

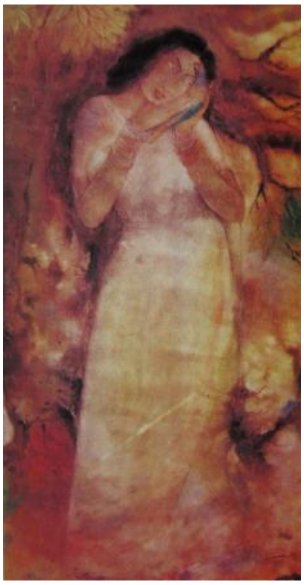

চিত্র ৫২ : লাভ, জলরং
১১১.৫ × ৬১ সেমি, ১৯৮৩

আব্দুস সাত্তার জলরঙে উপজাতীয় রমণীদের নিয়ে *উপজাতীয় সুন্দরী* ও *উপজাতীয় মেয়ে* শিরোনামে সিরিজচিত্র এঁকেছেন। তাঁর এই সিরিজচিত্র বিষয় হিসেবেও ব্যতিক্রমধর্মী। উপজাতীয় নারীদের প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে এমন ছবি বাংলাদেশে আর কেউ আঁকেননি। তিনি অলংকার প্রসঙ্গে পড়াশোনা করতে গিয়ে উপজাতি রমণীদের অলংকার পরিধানের দার্শনিক তত্ত্ব জানতে পারেন। উপজাতীয় নারীরা তাদের দর্শন অনুযায়ী তাদের অর্থ-সম্পদ (ব্যাংকে গচ্ছিত না রেখে) ভোগ করে যেতে চায়। এ জন্য মূল্যবান গহনাগুলো সবসময় পরিধান করে তৃপ্ত থাকে। উপজাতীয় রমণীদের ভাবনা-চিন্তার বিষয় নিয়ে তিনি সিরিজচিত্র অঙ্কন করেছেন। উপজাতীয় রমণীদের মুখের আদল সাধারণত ভিন্ন হয়। তাদের সেই আদলের মধ্যেও শিল্পী সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন।

চিত্র ৫৩ : উপজাতি সুন্দরী, জলরং
৪২ × ২৭ সেমি, ১৯৯৭

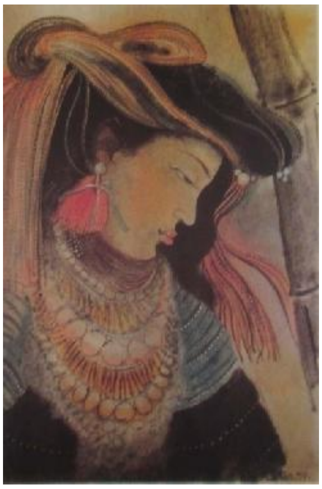

চিত্র ৫৪ : উপজাতীয় মেয়ে, জলরং
৫২ × ৩৭ সেমি, ১৯৯৭

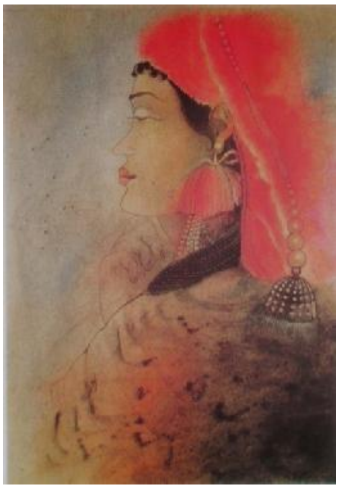

চিত্র ৫৫ : উপজাতীয় মেয়ে, জলরং
৫২ × ৩৭ সেমি, ১৯৯৭

আব্দুস সাত্তারের উপজাতীয় সুন্দরী শীর্ষক চিত্র প্রসঙ্গে আব্দুল মতিন সরকার যা লিখেছেন—প্রাসঙ্গিকভাবে তা উল্লেখের দাবি রাখে :

> আমার মনে হয় আব্দুস সাত্তারের শিল্পাদর্শে অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপজাতীয় 'সুন্দরী' শীর্ষক ছবিতে। এতে অলংকারের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি এত নিখুঁতভাবে শিল্পী এঁকেছেন যা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। এ যেন পৌরাণিক কোন অপ্সরা। বত্তিচেল্লির (ভেনাসের জন্ম ছবির) ভেনাসের ন্যায় তার মুখমণ্ডলে আছে এক অকৃত্রিম সারল্য; মোনালিসার রহস্যময় হাসির ন্যায় উপজাতীয় সুন্দরীর চাহনীতে একমাত্র যে অভিব্যক্তিটি প্রকাশিত হয়েছে তাও মনে হয় একইভাবে দুর্বোধ্য।[১৮]

জলরং নিয়ে তিনি স্বাধীনভাবেই খেলেছেন। কখনো চায়নিজ কালি-তুলির ব্যবহার করেছেন, কখনো পাশ্চাত্য জলরং পদ্ধতির সাথে ওয়াশ, কখনো রেখা ব্যবহার করেছেন হাতের স্বাধীন গতিতে। তাঁর জলরং চিত্রে তুলির নিপুণ সূক্ষ্ম কাজও হয়েছে তাৎক্ষণিক গতিতে। জলরং নিয়ন্ত্রণে দক্ষ হওয়ার কারণেই এ রকম তুলি সঞ্চালন সম্ভব হয়েছে।

চিত্র ৫৬ : মেয়ে, জলরং
৭৯ × ৪১ সেমি, ২০০০

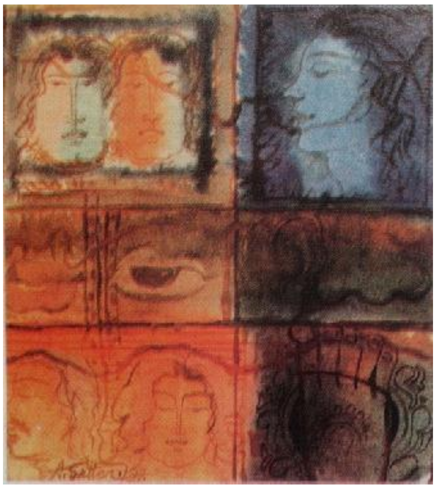

চিত্র ৫৭ : চোখ, জলরং
৪০ × ৩০ সেমি, ১৯৯৮

চিত্র ৫৮ : ফুল-পাখি মেয়ে, জলরং
২১০ × ১২০ সেমি, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

আট

শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাৎক্ষণিক ও দ্রুততার সঙ্গে যখন ছবি আঁকেন তখন তাঁর তুলিতে প্রতিকৃতিবিষয়ক ছবি মূর্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রতিকৃতি তিনি বিভিন্ন মাধ্যম ও টেকনিকে করে থাকেন। ২০০৬ সালে তিনি প্রতিকৃতি বিষয় নিয়েই একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিকৃতিবিষয়ক পুস্তিকায় প্রতিকৃতির অর্থ ও চিত্রাঙ্কনে প্রতিকৃতির ইতিহাস প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি "প্রতিকৃতি" প্রবন্ধে প্রতিকৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

> ডুরার ও লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি, মাইকেল্যাঞ্জেলো, ব্রঞ্জিনোসহ বহু বিশ্বখ্যাত শিল্পী প্রতিকৃতি অংকন করেছেন। শিল্পী ডুরার রেনেসাঁ আন্দেলনে ব্যাপক অবদান রেখেছেন যথার্থ এবং অর্থবহ প্রতিকৃতি অংকনের ক্ষেত্রে। প্রাচীনকালে প্রতিকৃতি অংকনের ক্ষেত্রে যে রীতি, পদ্ধতি এবং নীতি প্রচলিত ছিল সময়ের ব্যবধানে এবং চাহিদার কারণে সেই রীতি, পদ্ধতি এবং নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। ফলে প্রতিকৃতি শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব চেহারা বা আকৃতি প্রকাশের মাধ্যম রইল না, একই সঙ্গে প্রতিকৃতি প্রতীকে রূপান্তরিত হলো। ফলে শিল্পী স্বাধীনভাবে অন্যান্য চিত্রের মতই প্রতিকৃতি অংকনের ক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে একজন শিল্পী কিভাবে দেখেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কর্মকাণ্ড, আচরণ ও তাঁর শরীরি সৌন্দর্যের প্রকাশ শিল্পীর দৃষ্টিতে কীভাবে প্রতিফলিত হয় তাঁর অর্থপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে একজন শিল্পী তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নেন।[১৯]

উল্লিখিত মন্তব্যে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের প্রতিকৃতিবিষয়ক চিত্রের মর্মার্থ অনুমান করা যায়। তিনি জলরং, তেলরং, অ্যাক্রেলিক, উডকাট ও মিশ্র মাধ্যমে অনেক ধরনের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। এসব প্রতিকৃতি পুরুষ ও নারীর। কথায় আছে 'মুখ মনের আয়না' মানুষকে সাধারণভাবে মুখ দেখেই চিহ্নিত করা যায়। মুখাবয়বের অভিব্যক্তিতে ব্যক্তি চরিত্র প্রতীয়মান হয়। সেক্ষেত্রে আব্দুস সাত্তার প্রতিকৃতি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নারীর অন্তঃকথনই মূর্ত করেছেন।

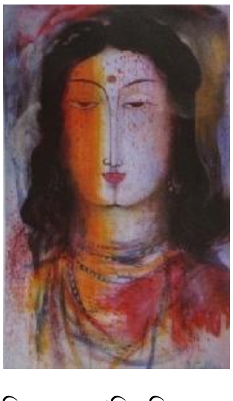

চিত্র ৫৯ : প্রতিকৃতি, জলরং ৭০ × ৫৬ সেমি, ১৯৮৯

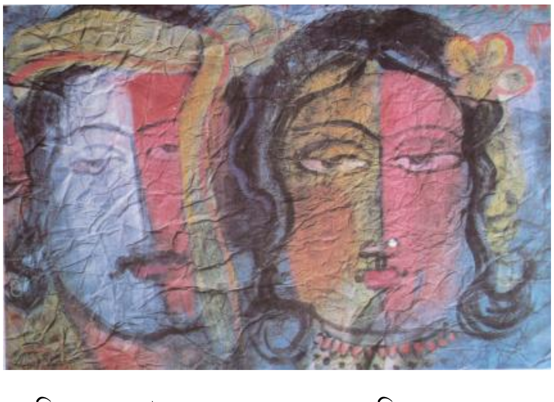

চিত্র ৬০ : যুগল, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০০

চিত্র ৬১ : দুই মুখ ৫৬ × ৬০ সেমি

আব্দুস সাত্তারের প্রতিকৃতিতে নারীর সৌন্দর্য শিল্পিত হয়েছে নিজস্ব অভিধায়। নারীর চোখ, নাক, মুখের গড়ন সৌন্দর্য প্রয়োজনেই বিশেষ ভঙ্গিতে চিত্রিত হয়েছে। যাতে পরাবাস্তববাদী আবেশ তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে **১৯৮১** সালের ২৩ জানুয়ারি বিচিত্রায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য :

> সাত্তারের কাজ পরাবাস্তববাদী ও প্রতীকী প্রধান। প্রথম দিককার কাজের প্রাচ্যধারা অনুযায়ী মানবী অবয়ব ছন্দায়িত এবং সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লতাপাতায় মোটিভ। প্রাচ্যকলা ধারার কাজ করার ফল হিসেবে সাত্তার তাঁর কাজে কোন না কোন উপাদান যোগ করেন যা ছন্দের প্রকাশ হিসেবে আসে।[২০]

চিত্র ৬২ : তিন মুখ, উডকাট

চিত্র ৬৩ : তিন মুখ, মিশ্র (প্রিন্ট ও অ্যাক্রেলিক)
৪৭ × ৭০ সেমি

আব্দুস সাত্তার প্রিন্ট মাধ্যমে প্রতিকৃতি অঙ্কনে নানান কৌশল অবলম্বন করেছেন। কখনো উডকাট প্রিন্ট নেয়ার পর অ্যাক্রেলিক কালার দিয়ে মুখাবয়ব এঁকেছেন। জলরঙের প্রতিকৃতির কখনো পাতলা ওয়াশ দিয়ে সূক্ষ্ম লাইন প্রয়োগ করেছেন, কখনো ওয়াশ ও লাইন একাকার করে দিয়ে প্রতিকৃতি করেছেন। যেভাবেই করেছেন টানা-টানা চোখ, চিকন ভ্রূ ও ছোটো ঠোঁট, লম্বা নাকের আদল ব্যবহার লক্ষণীয়। এ ছাড়া প্রতিকৃতির একাংশ অর্থাৎ নাক বরাবর দুই পাশে দুই ধরনের কালার ওয়াশ দিয়ে একধরনের ডাইমেনশন সৃষ্টি করেছেন।

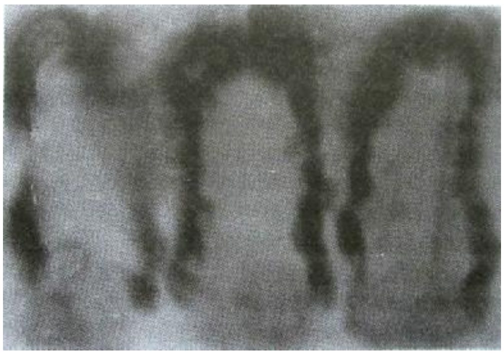

চিত্র ৬৪ : তিন মুখ, (প্যারিসের শাঁতিও শহরে প্রদর্শিত)
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ২০০৩

চিত্র ৬৫ : তিন মুখ, মিশ্র
১২১.৯২ × ৯১.৪৪ সেমি সেমি, ১৯৯৯

তিনি অয়েল কালার কখনো প্রিন্টের কালার রোলার দিয়ে ঘষে প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। তেলরং মাধ্যমে অঙ্কিত হলেও এই চিত্র দেখে জলরং মনে হয়। অর্থাৎ তিনি তেলরং প্রয়োগ করেছেন জলরঙের মতো করে। ‘তিন মুখ’ চিত্রের চুলের বিন্যাস—জলরঙের বিস্তারের আবেদন সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া প্যারিসের শাঁতিও শহরে প্রদর্শিত প্রতিকৃতি চিত্রের অ্যাক্রেলিক রঙে জলরং ওয়াশের ইফেক্ট তৈরি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬৬ : রমণীর প্রতিকৃতি, জলরং
৫৪ × ৩৮ সেমি

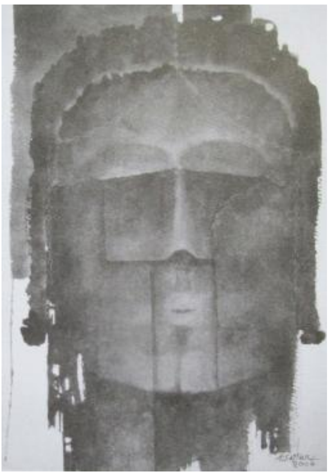

চিত্র ৬৭ : রাজকন্যা
৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৩

চিত্র ৬৮ : মুখ, জলরং
৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৬

এ সকল প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষেত্রে ক্যানভাস ভিজিয়ে অ্যাক্রেলিক কালারের ওয়াশ দিয়েছেন। এই চিত্রে প্রতিকৃতির নাক, চোখ, মুখ স্পষ্ট লাইনে আঁকা হয়নি। কিন্তু বিশেষ এক আবেদন সৃষ্টি হয়েছে। যেন অনেক মানুষের চেহারা আমরা পড়তে পারি না, যাদের মুখাবয়ব অস্পষ্ট হয়ে ভাসে আমাদের চোখে।

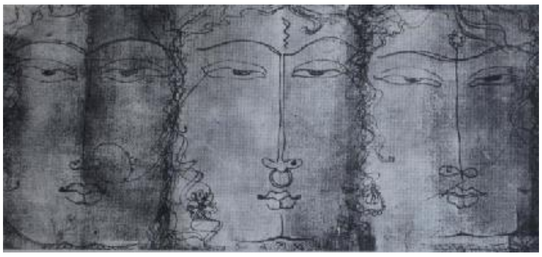

চিত্র ৬৯ : তিন মুখ, তেলরং

চিত্র ৭০ : পাঁচ মুখ, মিশ্র (উডকাট ও অ্যাক্রেলিক)

ওপরের তিন মুখ নামক চিত্র করতে গিয়ে শিল্পী আব্দুস সাত্তার প্রথমে কাগজে ফ্লাট কালো রং করে তার ওপর নানা রঙে প্রিন্ট করেছেন তিন মুখের আদল। এরপর রং কাঁচা থাকতে থাকতেই লম্বা তুলির কাঠের অংশ দিয়ে ড্রয়িং করেছেন। ফলে রেখাগুলোর স্থানে কাগজে করা কালো রং বের হয়ে মুখগুলো স্পষ্ট হয়েছে। এই ছবির পাশের পাঁচ মুখ আবার করেছেন অন্যভাবে। এক্ষেত্রে কাঠখোদাই চিত্রের ওপর মুখ এঁকে সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও কাঠখোদাইয়ের ওপর মুখের আদল সৃষ্টি করে একইভাবে তুলির কাঠের অংশ দিয়ে রেখাঙ্কন করা হয়েছে। এ চিত্রের ক্ষেত্রে শিল্পী সুপার ইম্পোজ পদ্ধতিতে মুখগুলো এঁকেছেন। উভয় চিত্রের ক্ষেত্রেই প্রিন্টিং কালার ব্যবহার করা হয়েছে। যেভাবেই করেন না কেন, প্রতিকৃতিগুলো প্রাচ্যরীতির ভাববৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

শিল্পী আব্দুস সাত্তার ২০০৬ সালে প্রতিকৃতি চিত্র নিয়ে প্রদর্শনী করেছেন। এই প্রদর্শনীতে নানা টেকনিকে প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। জলরং ড্রয়িং ও পেপার পেস্টিং করে প্রতিকৃতি এঁকেছেন। বিভিন্ন দাওয়াত কার্ডের ছবি ও লেখার অংশকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকৃতি এঁকেছেন। কালি-কলম ও অ্যাক্রেলিক কালারে তুলির দ্রুত আঁচড়ে মুখাকৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৭১ : দুই বোন, জলরং
ড্রয়িং ও পেপার পেস্টিং, ২০০৬

চিত্র ৭২ : মুখগুলো, মিশ্র মাধ্যম
৪৫ × ৮৬ সেমি, ১৯৮৩

তিনি মিশ্র মাধ্যমে ফ্লাট কালো কালার প্রয়োগ করে লাইনের মাধ্যমে যেসব প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন, সেসব প্রতিকৃতিতে একধরনের অধ্যাত্মচেতনা, ধ্যানময়তা লক্ষ করা যায়। এক বা একাধিক যে মুখই তিনি এঁকেছেন, একের অভিব্যক্তির সাথে অন্যের অভিব্যক্তি মিলে যায়নি। টেকনিকের ক্ষেত্রেও একটির সাথে একটির সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ফর্মে, লাইনে, ওয়াশে এবং ব্রাশের স্টোকে।

চিত্র ৭৩ : দুই মুখ
ঈদকার্ডে পেন

চিত্র ৭৪ : প্রতিকৃতি, অ্যাক্রেলিক
৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৬

চিত্র ৭৫ : প্রতিকৃতি, অ্যাক্রেলিক
৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৬

নয়

শিল্পী আব্দুস সাত্তার জীবন চলার পথে যে বোধ দ্বারা তাড়িত হয়েছেন সেই বোধের নির্যাস নিয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছেন—কখনো চিত্রে, কখনো লেখনীতে। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তাঁর *পাশ্চাত্য সংস্কৃতি* (Western Culture) সিরিজচিত্রে।

চিত্র ৭৬ : পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-১, অ্যাক্রেলিক, ১৮ × ৬১ সেমি

চিত্র ৭৭ : পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-২
মিশ্র মাধ্যম, ২৭ × ১৯ সেমি

পশ্চিমা দেশের সাদা চামড়ার প্রতাপশালী মানুষেরা এক সময় আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস-দাসী হিসেবে কাজ করিয়েছে। কালো নিগ্রো রমণীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়েছে। তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করেছে। এখন সেইসব নির্যাতিত কালো মানুষের বংশধররা সাদা চামড়ার রমণীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। পশ্চিমা দেশে এখন কালো মানুষদের দাপট বেড়েছে। পশ্চিমা দেশের সাদা চামড়ার রমণীদের কুকুরপ্রীতির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। শিল্পীর *পাশ্চাত্য সংস্কৃতি*-২ নামক চিত্রে উলঙ্গ রমণীর সামনেই একটা শায়িত কুকুর। চিত্রের নিগ্রো পুরুষ এবং কুকুর সমসাময়িক পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা ও বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিল্পী আব্দুস সাত্তার কালি ও কলমে প্রাচ্যরীতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অনেক চিত্র এঁকেছেন। এই সিরিজের চিত্র সম্ভার নিয়ে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের গ্যালারিতে (বর্তমান চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারি) তৃতীয় একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীর কালি-কলমে অঙ্কিত চিত্রগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি কালি-কলম ব্যবহার করে কোলাজও করেছেন। কোলাজ করার ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডারের চিত্র ব্যবহার করেছেন। কখনো ছবির ওপর কলমের আঁচড়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। *টয়লেট* চিত্রে দুটি নারী ফিগারকে প্রকৃতির লতা-পাতা-ফুল ও পাখিবেষ্টিত আরণ্যক পরিবেশ উপস্থাপন করেছেন—যেখানে লতানো ছন্দময় লতা-গুল্ম নারীর পরনের কাপড়ের প্রিন্টও শরীরে গহনা হিসেবে আবৃত হয়ে রয়েছে। প্রকৃতির মাঝে নারীকে কালি-কলমে এমন উপস্থাপন প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনে লক্ষ করা যায়নি। টেকনিক হিসেবে কালি-কলমের এ ব্যবহার ফ্লাট ডাইমেনশনের ওপর ব্যবহার করেছেন। কখনো জলরং ওয়াশ দিয়ে পেনে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য, প্রত্যেক শিল্পীর নিজস্ব কিছু ফর্ম ও অবজেক্ট (বস্তু) থাকে, যা তিনি তাঁর চিত্রে ব্যবহার করেন। এই ফর্ম বা অবজেক্ট তাঁর প্রত্যেক ছবিতেই সিম্বল হিসেবে ব্যবহার হয়। আব্দুস সাত্তারের অনেক কাজেই লতানো আকর্ষণীয় এক ধরনের পাতাগুচ্ছ লক্ষ করা যায়। এই পাতার ফর্ম তিনি চারুকলার সামনের ছোটো পন্ডের পাশের আমগাছে

ঝুলন্ত পরগাছা বা লতানো গাছ থেকে নিয়েছেন। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় ষড়ং মেনে চলা এই চিত্রে রূপভেদ, ভাব, লাবণ্য সংযোজনে এই পাতায় ফর্ম অতুলনীয়। তাঁর এ পদ্ধতির ড্রয়িংগুলো শিল্পনৈপুণ্যে উজ্জ্বল।

চিত্র ৭৮ : ছায়া (Shadew)
কালি, কলম ও কোলাজ
৭১.১২ × ৫৫.৮৮ সেমি, ১৯৭৮

চিত্র ৭৯ : প্রসাধন (Toilet)
কালি ও কলম
৭১.১২ × ৫৫.৮৮ সেমি, ১৯৭৮

চিত্র ৮০ : কৃষক (Farmer)
কালি ও কলম
৭১.১২ × ৫৫.৮৮ সেমি, ১৯৭৮

তাঁর এ সকল কাজে সুরিয়ালিস্টিক আবেশ সৃষ্টি হয়েছে। *স্যাঁতসেঁতে দেয়াল* (Damp Wall) সিরিজচিত্র নিয়ে শিল্পসমালোচক জাহিদ মুস্তাফার বিশ্লেষণ যুক্তিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন :

> শিল্পী আব্দুস সাত্তারের চিত্রমালার বিষয়বস্তুতে নানা রুচির নানা জাতের মানুষের জীবন-যাপনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। যেমন জল রং-এ আঁকা বৃষ্টিসিক্ত স্যাতসেতে জীর্ণ দেয়াল মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে . . .। এতো সামান্য বিষয় তাঁর হাতে এসে যে তাৎপর্য পেয়েছে তা না দেখলে অনুভব করা যায় না।[২১]

চিত্র ৮১ : স্যাঁতসেঁতে দেয়াল (Damp Wall)
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৮৫

চিত্র ৮২ : স্যাঁতসেঁতে দেয়াল (Damp Wall)
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি

চিত্র ৮৩ : ফুল, জলরং
১৬ × ৪ সেমি, ২০০২

স্যাঁতসেঁতে দেয়াল সিরিজচিত্র চরম অ্যাবস্ট্রাক আবার চরম রিয়েলিস্টিক বলা যায়। কারণ আব্দুস সাত্তার বর্ষাকালে শ্যাওলা ধরা স্যাঁতসেঁতে দেয়াল দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই রূপকেই চিত্রে রূপান্তর করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের শ্যাওলার রং ও ফর্ম এঁকেছেন। যেহেতু দর্শক এ ছবির মধ্যে কোনো অবজেক্ট খুঁজে পায় না তাই দর্শকের চোখে অ্যাবস্ট্রাক। যেমন স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জলরঙে আঁকা ডাম্প ওয়াল। এ চিত্রে বিষয় নেই। আবার আছেও। আছে স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের শ্যাওলা ধরা রূপ। আবার শিল্পী যখন এ ছবি এঁকেছেন তখন দেয়ালের রং ফর্মে মিল রেখেই এঁকেছেন। তাই শিল্পীর চোখে রিয়েলিস্টিক। এ ছাড়া এই ছবির কম্পোজিশনে নারী ফিগারের ফর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। সে বিচারেও রিয়েলিস্টিক। রং প্রয়োগের ক্ষেত্রে চীন-জাপান চিত্রকলায় কালি-তুলির ব্যবহারের অনুরূপ। যে বিচারেই হোক অর্থাৎ চায়নিজ ওয়াশ কিংবা ফর্মের মধ্যে নারী ফিগার সব বিচারেই এই চিত্র প্রাচ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যে ভরপুর।

আব্দুস সাত্তার প্রকৃতি ও পোশাকের সমন্বয় করে সিরিজচিত্র এঁকেছেন। শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদের ব্যাখ্যায় :

> শিল্পী আব্দুস সাত্তারের কাজে প্রেমিক মানুষ সম্পূর্ণ শরীর নিয়ে আসে না। মানুষটি থাকে তাঁর প্রিয় পোষাকের অন্তরালে; বৃক্ষ, লতা-পাতার আড়ালে আর তার প্রেম পুষ্প হয়ে ফুটে ওঠে কখনো কখনো বা তার হৃদয়ের সংবাদ আসে যুগলবন্দী পাখি হয়ে। নৈসর্গিক উচ্ছ্বাস আর অলংকারিক পোষাক শিল্পী সাত্তারের প্রিয় প্রসঙ্গ।[২২]

চিত্র ৮৪ : ফিগার কম্পোজশন, তেলরং
১১৬.৮৪ × ১৩২.০৮ সেমি, ১৯৮১

চিত্র ৮৫ : ফিগার কম্পোজশন-২, তেলরং
১০৪.১৪ × ১১১.৭৬ সেমি, ১৯৮১

প্রাচ্যদেশের নকশাদার পাঞ্জাবি ও কামিজ এঁকেছেন এমনভাবে, দেখে যেন প্রশস্ত বুক কিংবা নারীর স্তনযুক্ত শরীরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এই পোশাকের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে লতা-গুল্ম। পোশাক আছে মানুষটি নেই। পোশাকের আদল মানুষের আকৃতিকে স্পষ্ট করে তুলছে। এ যেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট। বিষয় অঙ্কন করে শিল্পী বোঝাতে চেয়েছেন পোশাকই মানুষের প্রতিনিধি।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা চর্চায় ফুল পাখি নারী চিত্রণই বেশি হয়েছে। এ ছাড়া প্রাচ্যদেশের চিত্রচর্চায় বিভিন্ন কালপর্বে ফুল পাখি নারী সম্পৃক্ত প্রকৃতি ও পরিবেশ নানানভাবে উপস্থাপিত হয়েছে শিল্পীদের কাজে। শিল্পী আব্দুস সাত্তার ফুল নিয়ে প্রচুর ছবি এঁকেছেন। তবে গোলাপ ফুলকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন ছবিতে ব্যবহার করেছেন। তাঁর চিত্রের সিম্বলের মধ্যে গোলাপ ফুল অন্যতম। তিনি ফুলের

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে পদ্ম ফুলকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ছাড়া শাপলা, গাঁদাসহ অন্যান্য ফুলের সৌন্দর্যও এঁকেছেন কখনো জলরঙে, কখনো অ্যাক্রেলিক, আবার কখনো কাঠখোদাইয়ে।

চিত্র ৮৬ : পদ্ম, অ্যাক্রেলিক

চিত্র ৮৭ : ফুল, কাঠখোদাই

চিত্র ৮৮ : ফুলদানি, অ্যাক্রেলিক

শিল্পী আব্দুস সাত্তার ফিগারকে কেন্দ্র করে সিংহভাগ প্রাচ্যরীতির চিত্র রচনা করেছেন। তিনি ফিগারের বাইরে শুধু ফর্ম নিয়েও কাজ করেছেন। বিশেষত ছাপচিত্র মাধ্যমের বেশি কাজ হয়েছে ফর্মপ্রধান। তেলরং মাধ্যমে করেছেন, মিশ্র মাধ্যমে করেছেন। যে মাধ্যমই হোক, প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গেই এঁকেছেন। তিনি তাঁর চিত্রে বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, ফর্ম ব্যবহার করেন। ব্যবহার করেন গোলাপ ফুল। ফর্মপ্রধান কম্পোজিশন সিরিজচিত্রে এই ফর্মগুলোকে বিন্যাস করে বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তেলরং মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ মানব হৃদয়ের ফর্মের সাথে একাত্ম করে বেশ কিছু ছবি এঁকেছেন তিনি।

তাঁর চিত্রে ব্যবহৃত ফর্মের সমন্বয় করে শিল্পের জন্য শিল্প মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। তিন ফর্ম চিত্রেও তিনটি ফর্মের সুষম দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস করেছেন তেলরং মাধ্যমে।

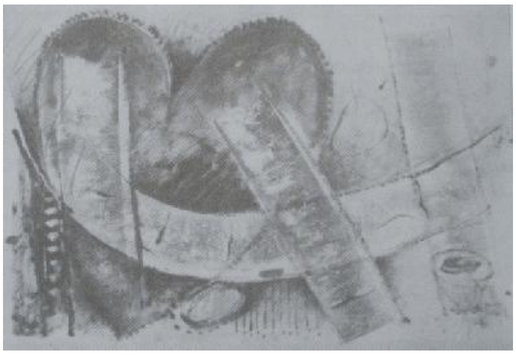

চিত্র ৮৯ : হৃদয়, তেলরং
৫৬ × ৭২ সেমি, ১৯৯৩

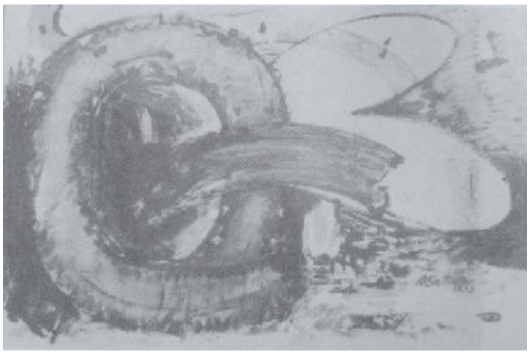

চিত্র ৯০: তিন ফর্ম, তেলরং
৫৬ × ৭২ সেমি, ১৯৯৩

শিল্পী আব্দুস সাত্তার ছাপচিত্র মাধ্যমে অসাধারণ কাজ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে খ্যাতি ও পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি ছাপচিত্রের ওপর বিভিন্ন টেকনিকে প্রাচ্যরীতির রং রেখা ব্যবহার করে মিশ্র

মাধ্যমে চিত্র এঁকেছেন। তাঁর এই মিশ্র মাধ্যমকে ছাপচিত্র ও প্রাচ্যরীতির সমন্বয় বলে অবিহিত করা যায়। এর মধ্যে Colour on woodcut, মনোপ্রিন্ট, অফসেট প্রিন্ট ও কাঠখোদাই এবং অ্যাক্রেলিক কালার প্রভৃতি টেকনিক উল্লেখযোগ্য। যেহেতু দুটি বা তিনটি মাধ্যমকে সমন্বয় করে চিত্র এঁকেছেন তাই এর নামকরণ করেছেন মিশ্র মাধ্যম। মিশ্র মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির ফিগারেটিভ ইমেজ ফুটে উঠেছে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, আব্দুস সাত্তার মাধ্যমের সমন্বয় করে যে চিত্রকর্ম করেছেন তা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ঘরানার ছবি। অর্থাৎ প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অঙ্কনে নির্দিষ্ট মাধ্যম ও টেকনিক দরকার—এ কথাকে তিনি ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন নিজের কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি তেলরং, জলরং, অ্যাক্রেলিক, উডকাট, লিথোগ্রাফ, এচিং, পেন অ্যান্ড ইঙ্ক, কোলাজ, মিশ্র—যে মাধ্যমের ছবি এঁকেছেন, তা প্রাচ্যের ঐতিহ্যিক চিত্রধারার সাথে মিল রেখে আধুনিক হয়েছে।

চিত্র ৯১ : চার মহিলা, মিশ্র, ৬৭ × ১৯০ সেমি, ১৯৯৭

চিত্র ৯২ : বৃক্ষপাশে রমণী

দশ

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার বড়ো একটি বিষয় ক্যালিগ্রাফি। মোগল আমল থেকে চিত্রশিল্পে ক্যালিগ্রাফি হয়ে আসছে। তবে কাঠখোদাই মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন করে আব্দুস সাত্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

চিত্র ৯৩ : গোলাপসহ ছাপচিত্র, কাঠখোদাই
৮৬ × ৫২ সেমি, ১৯৯৮

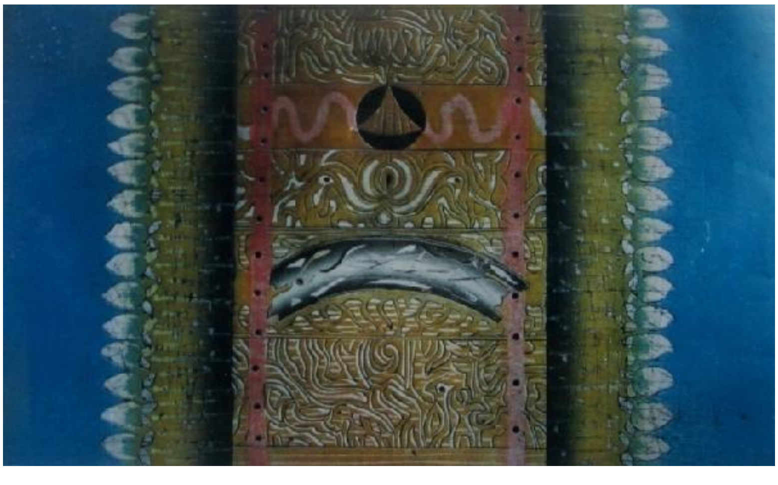

চিত্র ৯৪ : সাদা গোলাপসহ প্রিন্ট, কাঠখোদাই
৫৫ × ৬৫ সেমি, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মূলত আরবি হরফের নান্দনিক বিন্যাসে ক্যালিগ্রাফি চিত্র ভালো হয়। এ ছাড়া বাংলা হরফে ক্যালিগ্রাফি বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চায় আব্দুস সাত্তারই প্রথম করেছেন।

চিত্র ৯৫ : ক্যালিগ্রফি (ক্ষ ও ঙ)

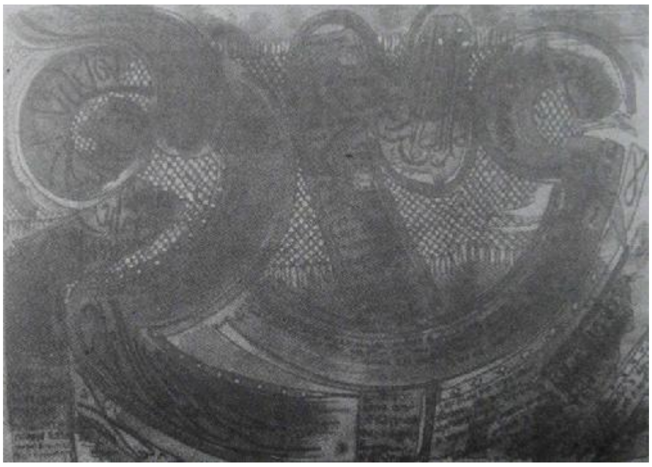

চিত্র ৯৬ : ক্যালিগ্রাফি, ৫৬ × ৭০ সেমি

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের *Burnt wood* বা *পোড়া কাঠ* সিরিজচিত্র ১৯৭১ সালের যুদ্ধের স্মৃতি থেকে অঙ্কিত। তিনি লিখেছেন, পোড়া কাঠ আমার কাছে কঠোর সত্য এবং প্রকাশযোগ্য বিবেচিত।[২৩]

কী সেই সত্য, যা প্রকাশ করতে চান শিল্পী? আসলে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে মারা গিয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে আব্দুস সাত্তারের সহপাঠী বন্ধু এ.কে.এম শাহনেওয়াজ। তাঁকে গুলি করা হয়েছিল হোস্টেলে। হোস্টেলের দেয়ালের গুলির গর্ত শিল্পী আব্দুস সাত্তারের স্মৃতিকে আজও কষ্ট দেয়। বন্ধুর নির্মম মৃত্যু এবং সারা দেশে জ্বালিয়ে দেয়া ঘরবাড়ির পোড়া বিষয়কে আব্দুস সাত্তার চিত্রে স্মরণ করতে চান। তিনি মনে করেন, ছবির মাধ্যমে এই স্মৃতিকে ধরে রাখার মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণ করা এবং শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব। এজন্যই তাঁর চিত্রে পোড়া কাঠ, গুলির ক্ষতচিহ্ন মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক হয়ে উঠে আসে।[২৪]

চিত্র ৯৭ : পোড়া কাঠ, উডকাট
৬১ × ৫২ সেমি, ১৯৮২

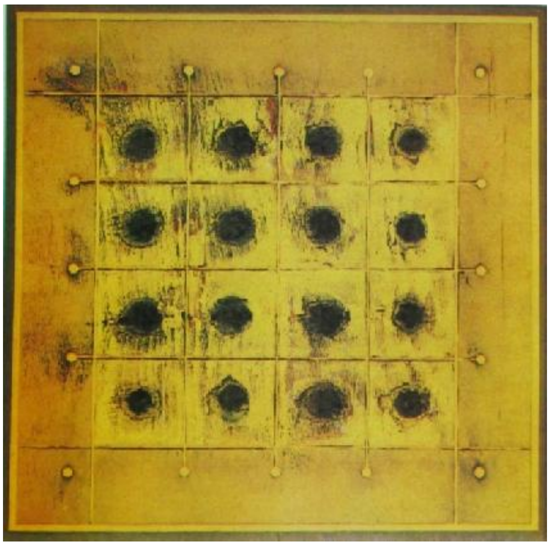

চিত্র ৯৮ : পোড়া কাঠ, উডকাট
৫২ × ৫২ সেমি, ১৯৮২

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত রাখতে তিনি স্বাধীনতার মূল্য শিরোনামে সিরিজচিত্র আঁকেন। এই সিরিজচিত্রে প্রতীক হিসেবে মানুষের মাথার খুলি ব্যবহার করেছেন। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন বোঝাতে চিত্রের জমিন লাল করে রেখেছেন। তবে চিত্রে ব্যবহৃত আর্চ, যা শক্তির প্রতীক, যার মাঝে শহীদদের হাড়হাড্ডি রয়েছে—তাকে ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। চিত্রের একাংশ দগ্ধ হয়ে কালো কয়লা রূপ ধারণ করেছে। অপর অংশ রক্তে রঙিন। এ ছাড়া শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ এঁকেছেন।

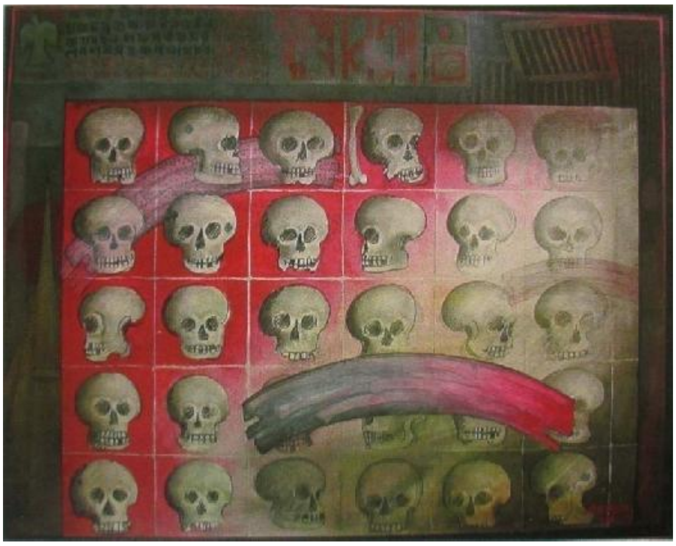

চিত্র ৯৯ : স্বাধীনতার মূল্য, ৭৬ × ৬১ সেমি, ২০০৯

আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় ফটো লিথোগ্রাফ মাধ্যমে *পাতা* নিয়ে কাজ করেছেন। এ সময় Pratt's Leaf শিরোনামে বেশ কিছু লিথোগ্রাফ করেছেন। পরবর্তী সময়ে একই পাতা নিয়ে তেলরং পেইন্টিং করেছেন Untitled শিরোনামে। একটি রঙিন পাতা যেমন তার জীবনকালে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তন হয়, মানুষের জীবনেও আসে পাতার মতো বাহারি সময়। আবার একসময় ঝরা পাতার মতো ঝরে যায়। শিল্পী তাঁর শিরোনামে Pratt's Leaf এবং Untitled শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। শিল্পরসিক বা দর্শক চিত্র দেখে যে ভাবাবেগে আপ্লুত হবেন সেই ভাবাবেগেই রস আস্বাদন করতে পারেন। গল্প তৈরি করতে পারেন এই চিত্র দেখে। আপাতদৃষ্টিতে পাতার বর্ণিল রূপের সাথে জীবনের বর্ণিল সময়কে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

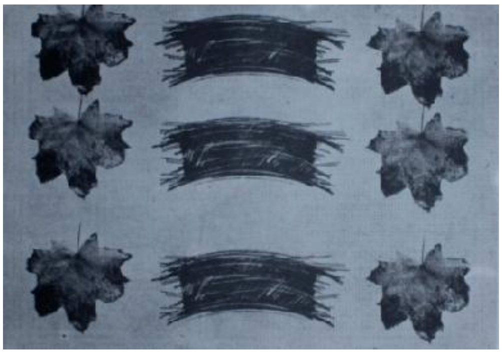

চিত্র ১০০ : শিরোনামহীন (Untitled), তেলরং
১৮২.৮৮ × ৯১.৪৪ সেমি, ১৯৮৮

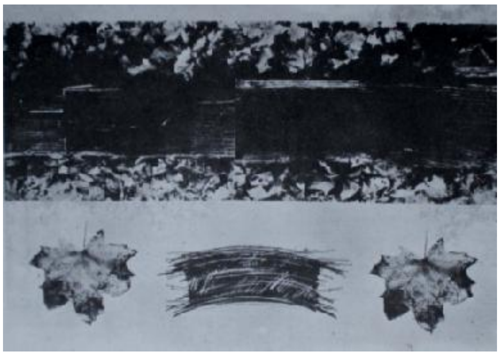

চিত্র ১০১ : Pratt's Leaf, লিথোগ্রাফ
৫৫.৮৮ × ৭৬.২ সেমি, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

এগারো

আব্দুস সাত্তার শিল্প সৃষ্টি, পড়াশোনা ও লেখালেখির শুদ্ধ চর্চা করে আসছেন দীর্ঘদিন যাবত। কমার্শিয়াল বা খ্যাপের কাজ করেননি বললেই চলে। কারণ হাতে গোনা যে কয়টি কাজ করেছেন তা নন্দনতত্ত্বের বিচারে শিল্পগুণেই সমৃদ্ধ হয়েছে। তেমন একটি কাজ হচ্ছে ক্যালেন্ডার। তিনি ২০০৯ সালে United Leasing Company Limited-এর একটি ডেস্ক ক্যালেন্ডারে চিত্র এঁকেছেন। বিষয় ছিল ঢাকার চারশ বছর পূর্তিকে ঘিরে। সচরাচর ক্যালেন্ডারে শিল্পীরা যে চিত্র এঁকে থাকেন আব্দুস সাত্তার তেমনটি আঁকেননি। ক্যালেন্ডারে মুদ্রণের জন্য ১২টি ছবিই শৈল্পিক গুণে গুণান্বিত। ঢাকার ঐতিহাসিক স্থান, ঢাকার জীবনের চালচিত্রবিষয়ক এই চিত্রমালা স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণাঙ্গ শিল্প মর্যাদার দাবি রাখে। চিত্রগুলোতে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ঢাকার চারশ বছরকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনায় তিনি প্রথমেই ঢাকার পুরাতন বানান (Dacca) এবং নতুন বানান (Dhaka) নিয়ে চিত্র সাজিয়েছেন। অর্থাৎ পুরাতন ঢাকা এবং নতুন ঢাকা এখানে বিষয়।

এ ছাড়া বস্তি, বুড়িগঙ্গায় নৌকায় বেদেনি, লোড শেডিং, ফুটপাতে টিয়া পাখির সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষা (হাত দেখানো), তিন নেতার মাজার, ঢাকার বিলাসবহুল বাস, পুরাতন ঢাকা প্রভৃতি বিষয়কে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার স্টাইলে এঁকেছেন। এভাবে ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা সমঝদারদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

চিত্র ১০২ : নতুন ও পুরাতন ঢাকা
জলরং, ৩৮ × ৫৮ সেমি, ২০০৯

চিত্র ১০৩ : Life of Pavement
জলরং, ৩৮ × ৫৮ সেমি, ২০০৯

শিল্পী আব্দুস সাত্তার শিল্পের জন্য পরিশ্রমী একজন মানুষ। সারা জীবন জ্ঞানার্জন আর শিল্পচর্চা করে চলেছেন। কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রত্যয়ী। তাঁর প্রত্যেকটি কাজে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত তাঁর চেতনায় যে ভাবনা আসে সেই ভাবনাকে চিত্রায়ণের জন্য লে-আউট করে থাকেন। পরে লে-আউট চিত্রকে পূর্ণাঙ্গ চিত্রে রূপ দেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো—তাঁর প্রত্যেকটি লে-আউটকে একেকটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১০৪ : কাঠখোদাইয়ের জন্য লে-আউট

চিত্র ১০৫ : কাঠখোদাই ও পেইন্টিংয়ের লে-আউট

চিত্র ১০৬ : প্রিন্ট ও পেইন্টিংয়ের লে-আউট

চিত্র ১০৭ : প্রিন্ট এবং পেইন্টিংয়ের লে-আউট

চিত্র ১০৮ : কাঠখোদাইয়ের লে-আউট

বারো

শিক্ষক, প্রশাসক, ব্যক্তি

শিল্পী আব্দুস সাত্তার ব্যক্তিত্ববান ও রুচিশীল মানুষ। সদা ভাবগম্ভীর। মানানসই পোশাক তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরো ঐশ্বর্যবান করে। তিনি দীর্ঘ কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রশাসনিক দীর্ঘ কর্মজীবনের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় প্রথম ও প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগ। এই বিভাগ ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউট এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ। আব্দুস সাত্তার ৮ জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে শিক্ষকতার পদে যোগ দিয়ে বর্তমান অবধি কর্মরত আছেন। তিনি ৬ মার্চ ১৯৭৩ সালে প্রভাষক, ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২৮ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২ মে ১৯৯৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তাঁর এই দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি প্রাচ্যকলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, চারুকলা অনুষদ হওয়ার পর ২ আগস্ট ২০০৮ থেকে ২ বছরের জন্য প্রাচ্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি চারুকলার ছাত্রাবাসের হোস্টেল সুপার, চারুকলা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শহীদ শাহনেওয়াজ হোস্টেলের ওয়ার্ডেন-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২২ ডিসেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

২০০১ থেকে ১৫ মে ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারবিষয়ক ট্রাইব্যুনালের সদস্য ছিলেন এবং তিনি স্যার এ.এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চাকরি জীবনের দীর্ঘ এই সময় প্রসাশনিক দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত লেখালেখি, ছবি আঁকা এবং শিক্ষকতা করে আসছেন।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় তিনি সার্থক শিক্ষক বা মহৎ গুরুর ভূমিকা নিয়ে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় দীক্ষা দিয়ে আসছেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরাই বর্তমানে প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রাচ্যকলার শিক্ষক অনেকে। তিনি বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছেন বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রকে।

তাঁর পরিশ্রম, সততা এবং গাম্ভীর্যময় ব্যক্তিত্বের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীরা নন্দনতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব ও চিত্র আঁকার নানান টেকনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শিখেছেন। তিনি শুধু প্রাকটিক্যাল ক্লাসই নিতেন না, একসময় নন্দনতত্ত্বও পড়াতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ এবং বই। তিনি এ কারণেই সার্থক এবং মহৎ গুরু। কারণ প্রাকটিক্যাল দিক এবং নন্দনতত্ত্বের দিক সমভাবে জানতেন। দুয়ের সমন্বয় করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্প প্রতিভার উৎসাহ দিয়ে যেতেন প্রদীপে আলো ধরিয়ে দেয়ার মতো। তিনি তাঁর শিক্ষকতায় বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করতেন। কাউকে বকা দিতেন না, ছবি খারাপ হয়েছে মনে করে কেউ মন খারাপ করলে রাগও করতেন না। অন্যের স্বাধীন ছবি আঁকাকে শুধু শুধরে দিতেন।

তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ কোনো ছাত্রকে হতাশ হতে দিতেন না। তিনি বলতেন, 'কোনো ছবিই নষ্ট হয় না। নষ্ট মনে করলে সে ছবির গতি-প্রকৃতি অনুসারে আদল দিতে হয়। ছবির পেছনে লেগে থাকলে এক সময় ছবি সার্থক রূপ পায়।' তাঁর এই মহান উক্তি অমেধাবী ছাত্রের মনোবলকেও বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও ভাবকল্পনা বাড়াবার জন্য তাঁদের নিকট নন্দনতত্ত্বকে সহজ করে ব্যাখ্যা করতেন। অসীম ধৈর্য ও স্নেহের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিতেন। তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাসের মধ্য থেকে অনুশীলন করতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সিলেবাসের বাইরের নানান টেকনিক ও মাধ্যমে ছবি আঁকা শেখাতেন। এ রকম চিত্রের মধ্যে বাটিক ও ছাপচিত্র উল্লেখযোগ্য।

প্রাচ্যকলা বিভাগকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার বিকাশ ও বিস্তার লাভের যে আন্দোলন, এর প্রধান পুরুষ আব্দুস সাত্তার। তাঁর শিক্ষকতায় বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রাচ্যকলার নানান অনুষঙ্গ নিয়ে চিত্র এঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুনাম অর্জন করে আসছেন এবং বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার নিজস্ব একটি আইডেনটিটি তৈরি করতে পেরেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে দেশে-বিদেশে প্রাচ্য ধারার চিত্র চর্চার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রচেষ্টার কারণে দেশে এবং বিদেশে প্রাচ্য শিল্প সম্পর্কে মানুষ অনেক বেশি সচেতন হচ্ছে।

তেরো

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ-আলোচনা

আব্দুস সাত্তার জীবনোপলব্ধ জ্ঞানের সাথে সুন্দরপিয়াসী মন নিয়ে রঙিন তুলিতে প্রাচ্যরীতির চিত্র এঁকেছেন। যে হাতে তুলি নিয়ে এঁকেছেন সুন্দর ছবি, সেই হাতে কলম নিয়ে লিখেছেন শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ। যা দেশ-বিদেশের দৈনিক এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা, ক্যাটালগে, স্যুভেনিয়রে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের *নতোন্নত দারুশিল্প* বিষয়ে গবেষণা করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা **১২**টি। তিনি বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিসহকারে তথ্য-তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধ লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে মতলুব আলীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> তাঁকে [আব্দুস সাত্তার] তাত্ত্বিক পরিচয়ে চিহ্নিত করায় খুবই স্বাভাবিক, যৌক্তিকতার প্রশ্ন উঠতে পারে দুর্বলচিত্ত আত্মবিশ্বাসহীন নিন্দুকের পক্ষ থেকে {যাঁরা ভালোর প্রতি সচরাচর দৃষ্টিপাত করেন না এবং যাঁরা উন্নাসিকতা-রোগগ্রস্ত}; তো, আগেভাগেই তাঁদের উদ্দেশে আমার সপক্ষ-সমর্থনে জবাবটা দিয়ে রাখি ঃ আব্দুস সাত্তার স্বাধীনচেতা সাহসী ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তিত্ত্বাধিকারী মানুষ, 'নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পসমালোচনা' বিষয়ে চারুকলার উচ্চতর ডিগ্রী ক্লাসে পাঠদানের সময় যতোদূর জানি শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে দ্বিধাহীন বক্তব্য উপস্থাপনে অভ্যস্ত তিনি, যে-বক্তব্যে স্বদেশাঞ্চল ও ইতিহাসের স্বীকৃত তাত্ত্বিক-দার্শনিক কিংবা দেশ-বিদেশের প্রখ্যাতনামা শিল্পরসিক-ব্যাখ্যাতা ও তাত্ত্বিক-সমালোচকদের পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীও তিনি প্রকাশ ক'রে থাকেন।[২৫]

মতলুব আলীর মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়—প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, নন্দনতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র, গ্রন্থ সমালোচনা, চিঠি, সংবাদপত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক কলাম, গবেষণা শিল্পবিষয়ক গ্রন্থ, যা-ই লিখেছেন তাঁর মধ্যে সরস ও প্রাঞ্জল প্রকাশরীতি আছে এবং লেখার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যগুণও বিদ্যমান। তিনি তাঁর লেখনীতে অতিসূক্ষ্ম ও সাধারণের জন্য দুর্বোধ্য বিষয়গুলো উপমা, উদাহরণ, যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করে পাঠকের জন্য হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

শিল্পকলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাখ্যা, তত্ত্বকথা, রূপতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের গদ্য বিন্যাসে সাজিয়েছেন। অতএব, শিল্পী আব্দুস সাত্তারকে প্রাচ্যরীতির একজন সার্থক শিল্পীমানস, শিল্পী ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে তাঁর এই লেখনী শিল্পসম্ভারের কিয়দংশ আলোচনা করা দরকার। নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে তাঁর লেখনীর ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

আব্দুস সাত্তার রং-তুলির শিল্পী। রং-তুলিই তাঁর প্রধান মাধ্যম। তবে এই মাধ্যমে তিনি সুন্দরের উপাসনাই করেছেন। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজের অনেক অসংগতি, রাজনৈতিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক অনাচার, শিল্পীদের অধিকার, কখনো কখনো হীনম্মন্যতা প্রসঙ্গ তাঁকে ব্যথিত করত। অনেক সময় প্রতিবাদী করে তুলত। এই প্রতিবাদের বিষয়গুলোকে রং-তুলিতে ফোটানোর চেয়ে কলমের মাধ্যমে ফোটানো বা প্রকাশ করা সহজ মনে করে লেখা শুরু করেন। তিনি বিচিত্র ধরনের লেখালেখি করেন। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও দারুশিল্পবিষয়ক গবেষণা; স্থাপত্য, ল্যান্ডস্কেপবিষয়ক গবেষণা; অলংকারবিষয়ক গবেষণা; নন্দনতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, শিল্প ও শিল্পী, প্রবন্ধ সমালোচনাবিষয়ক লেখালেখি করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে লেখাগুলোর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে লেখনীর মর্মার্থ ও অবদান বুঝে নেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সাত্তারের লেখালেখির যাত্রা শুরু ১৯৮৩ সালে দৈনিক সংবাদপত্রে চিঠিপত্র কলামে লেখার মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, 'দেশের নানান ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছবি এঁকে প্রকাশ করা যায় না। তাই এ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার জন্যই সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু করি।'[২৬]

আব্দুস সাত্তার ১৯৮৩ সালের *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে "গাছ পাথরের মাত্রাজ্ঞান ও আমজাদ হোসেনের বেগম রোকেয়া" নিবন্ধ লেখেন। এরপর থেমে থাকেননি, লিখেছেন দৈনিক ইত্তেফাক, নয়া দিগন্ত, ইনকিলাব, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, মানবজমিন, বাংলার বাণী, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার, দিনকাল, দৈনিক খবর প্রভৃতি পত্রিকায়।[২৭] তিনি ২০১১ সাল পর্যন্ত লিখেছেন ১২টি গ্রন্থ। গ্রন্থগুলো হলো—

১. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (জানুয়ারি ১৯৮৮)
২. শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি (আগস্ট ১৯৮৯)
৩. শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি (সেপ্টেম্বর ২০০১)
৪. প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান (মে ২০০৩)
৫. শিল্পকলা যুগে যুগে (নভেম্বর ২০০৩)
৬. শিল্পপ্রেমী জিয়া (সেপ্টেম্বর ২০০৪)
৭. জয়নুলের এগারজন সহকর্মী (নভেম্বর ২০০৫)
৮. বাংলাদেশের নতোন্নত দারুশিল্প (আগস্ট ২০০৬)
৯. ল্যান্ডস্কেপ (আগস্ট ২০০৬)
১০. অলংকার (আগস্ট ২০০৬)
১১. সোমনাথ হোরের পত্র কলকাতার চিত্র (জুন ২০১১)
১২. বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্প (নভেম্বর ২০১২)

উল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে শিল্প এবং শিল্প-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পী হিসেবে আব্দুস সাত্তারের গ্রন্থাবলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রন্থগুলো শ্রেণিবিন্যাস করে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে আব্দুস সাত্তারের লেখনীর সাহিত্যগুণ যাচাই করে নেয়া যেতে পারে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন* গ্রন্থে লেখকের কথায় লিখেছেন :

> আমি লেখক নই। আমার কাজ রং-তুলিতে। সুতরাং এই চেষ্টা যে অপচেষ্টার সামিল সে বিষয়ে আমি পূর্ণ সচেতন। সুতরাং সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট আমার প্রত্যাশা, তাঁরা যেনো বইটিকে বিশাল সমুদ্রের স্বচ্ছ জলরাশিতে অস্বচ্ছ এক বারিবিন্দু হিসেবেই গণ্য করেন।[২৮]

উল্লিখিত উদ্ধৃতির শেষ লাইনে লেখকের বিনয় সুমধুর সাহিত্যরসে জারিত হয়েছে। *জয়নুলের এগারজন সহকর্মী* গ্রন্থের 'কুমিল্লা বার্ড-এ এক রাত' স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধে ক্যাম্পাসের পরিবেশ বর্ণনায় লিখেছেন :

> রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ে এবং অন্যান্য বৃক্ষের পাতায় পতিত বৃষ্টির ফোটার টুপটাপ আওয়াজ সমগ্র ক্যাম্পাসকে সঙ্গীতমুখর করছে। . . . পাতা এবং পাতাসম পাপড়িওয়ালা পুষ্পবৃক্ষ বৃষ্টির পানিতে ভিজে চুপসে যাবার কারণে বৃক্ষের মাথাটা সামান্য নুইয়ে পড়েছে। পুষ্প পাপড়িগুলোর প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। এ বৃক্ষের

> উপর নিপতিত অস্পষ্ট আলো রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বৃক্ষের চার পাশে পানি। বৃক্ষের পাশে ঘাস পাতার মধ্যে জমে যাওয়া বৃষ্টির পানি আলোতে ঝলমল করছে। আলো ঝলমলে পানির অদূরেই ঝোপঝাড়গুলো অন্ধকারে ডুবে আছে। যেনো আঁধারের কালো রঙের চাঁদর দিয়ে ওগুলোকে কেউ মুড়ে দিয়েছে। আলো আঁধারীর রহস্যময় এ পরিবেশে বৃষ্টি ভেজা শুভ্র পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ দেখে সদ্য বিবাহিতা ঘোমটা টানা গ্রামের লজ্জাবনত নববধূর কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের 'স্নান' নামক পেইন্টিং-এর কথা।[২৯]

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন গ্রন্থে 'জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের হিমবাহ হতে উৎপন্ন, আসাম ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে প্রবহমান নদীর একটি শাখা ময়মনসিংহ জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। এককালে এই নদী—তার প্রবহমান স্রোতের মতই জোয়ার বইয়ে দিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের হৃদয়ে। . . . জয়নুল আজ নেই। আছে ব্রহ্মপুত্র। কিন্তু এই নদীতে আর সেই জোয়ার নেই। যৌবন হয়েছে গত—বার্ধক্যের আগমনে। সর্বত্র বার্ধক্যের ছাপ। এখন শুধু বালিয়াড়ি। ব্রহ্মপুত্রের বুকে বালি আর বাতাসের লুকোচুরি। স্মৃতিবিজড়িত এই নদী, আর নদী পাড়ের মানুষের কাছে জয়নুল চিরঋণী।[৩০]

অতএব উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোর সাহিত্যগুণ বিচারে অনুমান করা যায়—শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাঁর চিত্রের মতো লেখাকে সরস করে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ বলা যায় যে—তিনি মূলত কলমের আঁচড়ে চিত্রই লিখেছেন। 'নদীবক্ষে শিল্পী সাহিত্যিক ও কবিদের মিলনমেলা' প্রবন্ধে মানুষসৃষ্ট পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

> প্রমোদতরী ছুটিতে উঠে মনে হলো বুড়িগঙ্গা বুড়িয়ে গেছে। আগের মত আর যৌবন নেই। ঢাকা শহরের চারদিক থেকে আসা নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিত্যক্ত পানি পাইপ বেয়ে এসে বুড়িগঙ্গার স্বচ্ছ পানিকে দিবানিশি দূষিত করছে। অসংখ্য জাহাজে আসা তেল নির্গত হয়ে বুড়িগঙ্গার বুকের ওপর প্রবল প্রতাপে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে অবাধ গতিতে সর্বত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। সভ্যতার আলো ঝলমলে রাজধানী ঢাকা শহরের ততোধিক সভ্য মানুষের ফেলে দেয়া জঞ্জাল ও পরিত্যক্ত ময়লা আবর্জনা পানিতে মিশে বুড়িগঙ্গাকে—প্রতিনিয়ত কলুষিত করছে। সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ দেখে মনে হলো বুড়িগঙ্গার ওপর রীতিমত বলাৎকার হচ্ছে। সকলের শত অত্যাচারে বুড়িয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা যেনো মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার পচন ধরা দেহের দম বন্ধ করা দুর্গন্ধে কিছুটা সময় কাটাবার পর প্রমোদতরী ছুটি রুগ্ন বুড়িগঙ্গার বুক চিড়ে ষাটনলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা ও যন্ত্রণায় জর্জরিত রুগীর দেহ স্পর্শ করলে যেমন চিৎকার দিয়ে ওঠে তরীর আঘাতে বুড়িগঙ্গাও ঠিক তেমনি চিৎকার দিয়ে উঠেলো। আঘাত পেয়ে তাঁর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকা দুর্গন্ধ চারদিকে বিস্তার লাভ করলো। কেউ কেউ মুখে রুমাল চেপে ধরলেন। আর আমরা ক'জন স্বচ্ছ কাঁচে ঘেরা খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম।[৩১]

উক্ত উদ্ধৃতির প্রতিটি লাইনে উপমা ও উদাহরণ দিয়ে সরস অথচ সহানুভূতির আবেগ সঞ্চারণের এক অভিনব সাহিত্যগুণ প্রয়োগ করেছেন আব্দুস সাত্তার।

অতএব, উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোর সাহিত্যগুণ বিচারে বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায়—শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাঁর চিত্রের মতোই লেখাকে রসালো করে শব্দের মালা গেঁথেছেন। অর্থাৎ বলা যায়—তিনি মূলত কলমের আঁচড়ে চিত্রই লিখেছেন।

চৌদ্দ

আলোচনার সুবিধার্থে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের গ্রন্থগুলোকে লেখার ধরন অনুসারে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যার মধ্যে চারুকলা বা শিল্পকলাবিষয়ক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক,

নন্দনতত্ত্ববিষয়ক এবং শিল্প-সংস্কৃতি রাজনীতিবিষয়ক—যা মূলত কলামিস্ট হিসেবে পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। ভাগকরণ কেবল আলোচনার সুবিধার্থে। কারণ প্রাবন্ধিক আব্দুস সাত্তারের গ্রন্থগুলোতে নানান ধরনের বিষয় একত্র আছে।

শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি (১৯৮৯) গ্রন্থটি প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় মৌলিক বিষয়াবলি, পাঠ্যক্রম এবং চারুকলার সাতটি বিভাগের বিষয় ও মাধ্যমের পরিচিতিমূলক বিষয়গুলো প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর পেশাগত দায়বদ্ধতার কারণে লিখিত। গ্রন্থটি বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষায় পাঠ্য হিসেবে বহুল সমাদৃত। এই গ্রন্থে শিল্পের প্রাথমিক ধারণাসহ উপকরণ ব্যবহারজনিত সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি নিঃশেষ হওয়ায় ২০১২ সালে প্যাপিরাস প্রকাশনী সংস্করণ প্রকাশ করেছে *শিল্প শিক্ষা : শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি* শিরোনামে। আজমাইন পাবলিকেশন থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশের শিল্প ও শিল্পী* গ্রন্থটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের পাঠ্য। আব্দুস সাত্তার দীর্ঘদিন ধরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিল্পকলা বিভাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কোর্সগুলো পড়িয়ে আসছেন। শিক্ষকতার দায়বদ্ধতা থেকে তিনি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের সিলেবাস অনুসারে গ্রন্থটি লিখেছেন। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের ৩০ জন নির্ধারিত শিল্পীর জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করে তাঁদের পরিচিতি দিয়েছেন, যা তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলের বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিল্পকলাসংশ্লিষ্ট স্থাপত্য, শিল্পকলার সমস্যা-সমাধান, সমাজ উন্নয়নে চিত্রশিল্পীর ভূমিকা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।

আব্দুস সাত্তারের গবেষণামূলক গ্রন্থ *বাংলাদেশের নতোন্নত দারুশিল্প* (২০০৬) পিএইচ.ডি. গবেষণার ফসল। এই গবেষণা তিনি করেছিলেন নিজের দায়বদ্ধতা থেকে। দারুশিল্প তিন তলা কাঠের পৈতৃক বাড়িটি যখন অযত্নে নষ্ট হতে যাচ্ছিল তখন তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এই বাড়ির মতোই সারা বাংলাদেশের অনেক দারুশিল্প সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই দায়বদ্ধতা থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের অধীনে এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। এই গবেষণায় দারুশিল্পের প্রাচীন ইতিহাস, দারুশিল্পের উপযোগী কাঠ ও সীজন প্রক্রিয়া এবং দারুশিল্পে নিদর্শন নিয়ে সচিত্র গবেষণা করেছেন, যা বাংলাদেশের দারুশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে মূল্যবান। এই মূল্যবান গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছে।

এ ছাড়া *অলংকার* (২০০৬) ও *ল্যান্ডস্কেপ* (২০০৬) গ্রন্থ দুটিও গবেষণাধর্মী। ল্যান্ডস্কেপ গ্রন্থটি কন্টেম্পোরারি কনসেপ্ট ২০০৬ সালে প্রকাশ করে। গ্রন্থটিতে ল্যান্ডস্কেপ ও স্থাপত্যের শৈল্পিক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক তাঁর গবেষণায় দারুশিল্পীদের সমাজ সচেতনতা ও কল্পনাশক্তির সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণায় দেখিয়েছেন, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় দারুশিল্পীদের কাজে এসেছে। তিনি তাঁর গবেষণায় বাংলার নিজস্ব ধারা এবং বাইরের বিভিন্ন দেশের শিল্পধারার সংমিশ্রণ নির্দিষ্ট করেছেন। বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ রাজ পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব প্রতিফলিত হলেও শিল্পের স্বদেশিয়ানা অক্ষুণ্ন থেকেছে। বাংলাদেশের দারুশিল্পীরা বিভিন্ন রাজা মহারাজা এবং জমিদারদের শক্তি, শৌর্য-বীর্যের প্রতীকরূপে প্রবেশ দ্বারে নকশা খোদাই করেছেন। আব্দুস সাত্তার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন এবং প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন—বাংলাদেশের কাঠখোদাই বা দারুশিল্প শুধু দর্শনীয়ই নয়, শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়েও ভূমিকা পালন করে।

অলংকার (২০০৬) গ্রন্থটি আজমাইন পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে। আব্দুস সাত্তার গ্রন্থটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ের পাঠ্য হিসেবে লিখেছেন। তাই গ্রন্থটি পাঠ্য বই। কিন্তু গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে তিনি রীতিমতো গবেষণা করেছেন এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করেছেন। তিনি বাংলার শিল্পের ইতিহাস, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অলংকার, মুসলিম সম্প্রদায়ের অলংকার, বেদুইন সম্প্রদায়ের অলংকার ভারত ও বাংলাদেশের অলংকার, ইউরোপের অলংকার প্রসঙ্গে লিখেছেন। এ ছাড়া অলংকারের শ্রেণিবিন্যাস এবং অলংকারের উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালী গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য, এ গ্রন্থটিও শিল্পবিষয়ক।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান* গ্রন্থটি নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পসমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন। এ গ্রন্থটিও চারুকলার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পী আব্দুস সাত্তার চিত্রকলার নান্দনিক কাজ করেন। আব্দুস সাত্তার নন্দনতাত্ত্বিক সৈয়দ আলী আহসানের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তখন থেকেই নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে পঠন-পাঠনে আগ্রহী ছিলেন। এরপর ফুলব্রাইট গ্রান্টের অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন আমেরিকায়। এ ছাড়া চারুকলায় এম.এফ.এ ক্লাসে দীর্ঘদিন নন্দনতত্ত্ব পড়িয়েছেন। সুতরাং একজন নন্দনতাত্ত্বিক ও শিল্পসমালোচক হিসেবে তাঁর এই গ্রন্থ শিল্পী সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। নিচে তাঁর নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পসমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তাঁর লেখনীর মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হলো—

"প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান" প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অনুকরণ এবং অনুসরণের দিক থেকে যে শিল্প যতটা মুক্ত সেই শিল্প ততটাই মূল্যবান।'[৩২]

"শিল্পকর্মে ফর্মের ভূমিকা এবং এর গুরুত্ব" প্রবন্ধে শিল্পকর্মে ফর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিকদের মতামতকে তুলে ধরে। নন্দনতত্ত্বের জটিল বিষয়কে কী রকম যত্নে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন তার উদাহরণ :

> শিল্পীর যাদুকরী সোনার তুলির পরশে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলি যদি রাতের তারা হয় তাহলে দিনের আলো হবে শিল্পীমনের প্রকাশ। আর এই প্রকাশেই আত্মগোপন করে থাকবে বস্তু। ফলে তার রূপের ঘটবে পরিবর্তন। অর্থাৎ রূপের (Form) সত্যই হলো শিল্পের প্রাণ। শিল্পে বাস্তবের স্থান নেই। বাস্তব বা প্রকৃতির যে বস্তুকে শিল্পী চোখে দেখেন তিনি তা শিল্পে প্রকাশ করেন না। দৃষ্টবস্তু শিল্পীর কল্পনারাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার কাব্যিক অনুভূতির সমুদ্রে উত্তাল ঢেউয়ের সৃষ্টি করে। ফলে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে নিজেকেই প্রকাশ করে থাকেন। নির্ভেজাল এই প্রকাশটুকুই হচ্ছে শিল্পীর মৌল কৃতিত্ব। আর এই নিখাদ কৃতিত্বই হচ্ছে শিল্পকর্ম।[৩৩]

উল্লিখিত উদ্ধৃতির সংজ্ঞায় তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্র বৈশিষ্ট্যেরই আলেখ্যচিত্র তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের মানবতা এবং অভিব্যক্তির প্রকাশ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। লিখেছেন :

> যা দেখা যায় তা নয়। যা শোনা যায় তাও নয়। এই দেখা এবং শোনার মাঝে যে অনুভূতি, একান্ত আপন অনুভূতি, তাই হচ্ছে প্রকাশবাদ। এ এক নতুন জগৎ। এই জগৎ পৃথিবীর কোথাও নেই, যার সন্ধান পাওয়া যায় বা চোখে দেখা যায়। শিল্পীর একান্ত আপন জগৎ। শিল্পীর হৃদয় উত্থিত ভাব প্রকাশের জগৎ, যে জগতের অধিপতি শিল্পীস্বয়ং।[৩৪]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে শিল্পীর স্বাধীনতার ইঙ্গিত স্পষ্ট করছেন এবং শিল্পীকে বিশ্বস্রষ্টার মতো আপন জগতের দ্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

"শিল্পবোধ ও শিল্পবিকার" প্রবন্ধে শিল্প-অশিল্প নিয়ে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—

> শিল্প-নির্মাণের ক্ষেত্রে, শিল্পে আকারের বিকার ঘটানোর ক্ষেত্রে, শিল্পবোধ, উপভোগ এবং শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে যে শিল্প বিষয়ক জ্ঞানার্জনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে সেটি সুস্পষ্ট।[৩৫]

সপ্তম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা প্রবন্ধে শিল্পী এবং শিল্পসমালোচক এবং বিচারকের বাঞ্ছনীয় গুণের দিকটি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> ইমিটেশন, ফর্ম, স্পেস, মরালিটি, কোমেমোরেটিভ ইন্টারেস্ট প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা এবং এর সার্থক প্রয়োগেই শিল্প সর্বগুণে গুণান্বিত হয়। সার্থক শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে একজন শিল্পীকে যেমন এ সকল বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন হতে হয় তেমনি শিক্ষিত ও সচেতন হতে হয় সমালোচক এবং বিচারককেও।[৩৬]

শিল্পী, সমালোচক, নন্দতাত্ত্বিক আব্দুস সাত্তার যখন যেখানে শিল্পসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেখেছেন—যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে তার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর আলোচনায়, শিল্প-অশিল্প, ভালো শিল্প, মন্দ শিল্প, সুবোধ্য-দুর্বোধ্য শিল্প আলোচিত হয়েছে এবং আমাদের দেশের দর্শক, ক্রেতা, শিল্পসমালোচক, শিল্পবোদ্ধাদের মানসিক চরিত্র সুললিত এবং যুক্তিসংগত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান* গ্রন্থটি নন্দনতত্ত্বের পাঠ্য বই হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পকলা যুগে যুগে (২০০৩), *জয়নুলের এগারজন সহকর্মী* (২০০৫) গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে হাসি প্রকাশনী এবং হিমি বুকস অ্যান্ড বুকস প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থ দুটিও প্রবন্ধ সংকলন। শিল্পকলা যুগে যুগে গ্রন্থের ভূমিকায় আব্দুস সাত্তার লিখেছেন :

> . . . সুন্দর শিল্পকলা বিষয়ে দর্শক এবং পাঠকদেরকে অবহিত কিংবা সচেতন করা লেখক এবং সমালোচকের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বোধের কারণেই রঙ তুলির পাশাপাশি কলমকেও গ্রহণ করতে হয়েছে। রঙ তুলির সাহায্যে যেমন শিল্প চর্চা করেছি, কলমের সাহায্যেও তেমনি শিল্পকলা বিষয়ে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছি।[৩৭]

উল্লিখিত উক্তিতে আব্দুস সাত্তারের শিল্প বিষয়ে সচেতনতার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি দেশ-বিদেশের শিল্প ও শিল্পকর্ম নিয়ে লিখেছেন। 'শিল্পকলা যুগে যুগে' প্রবন্ধে পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য) স্কেচ ধারণা দিয়েছেন। তাঁর লেখার ধরন হলো—তিনি শুরু করেন এক একটা প্রসঙ্গ নিয়ে তবে তার আলোকে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকটি যুক্তি সহকারে তুলে ধরেন। এই

Dhaka University Institutional Repository

নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস কীভাবে সচল আছে এবং প্রাচ্যের শিল্প-ইতিহাসের হদিশ কেন নেই। কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন :

> আমাদের দেশে শিল্প সংগ্রহশালা, প্রকাশনা এবং শিল্প সম্পর্কিত সঠিক তথ্যের অভাবে আমরা আমাদের নিজেদের শিল্পকর্ম সম্পর্কেই সঠিক তথ্য জানতে পারি না।[৩৮]

এ ছাড়া এই গ্রন্থে তিনি মালয়েশিয়ার আধুনিক শিল্পকলা, কোরিয়ার চিত্রকলা, বাংলাদেশের রথ ও রথের অলঙ্করণ (ইতিহাস সংযুক্ত তথ্যবহুল গবেষণা), দারুশিল্পের লোকজীবন (গবেষণা), ইসলামি শিল্পকলাসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিল্পীর জীবন ও শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করেছেন। "যোদ্ধা শিল্পী জয়নুল" প্রবন্ধে জয়নুলের চিত্র নিয়ে জালিয়াতির গবেষণামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন, যা শিল্প বিষয়ে সমাজ সচেতন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান।

জয়নুলের এগারজন সহকর্মী গ্রন্থের "দর্শন চিন্তা" প্রবন্ধে পৃথিবীর আদি গল্পের নায়ক-নায়িকা আদম-হাওয়ার গল্প দিয়ে মানুষের স্বভাবজাত প্রশ্নের এবং প্রশ্নের মীমাংসা দৃষ্টান্ত সহকারে গল্প দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পীই নারীকে প্রেয়সী, স্ত্রী, জননী, মহীয়সী নারী প্রভৃতি স্বভাবে ক্যানভাসে চিত্রিত করেছেন।[৩৯]

তিনি নিজেও নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নারীপ্রধান চিত্র এঁকেছেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত বিভিন্নভাবে নারীর উপস্থাপনা চিত্রসহ তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। এ ছাড়া এ প্রবন্ধে তিনি নারীর সাথে পুরুষের চিরকালীন সম্পর্ক ও বৈরিতা, নারীর অধিকার ও বর্তমান সামাজিক অবস্থায় তাদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার, নারীর সৌন্দর্য আকর্ষণে চিত্রশিল্পে ব্যবহার প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন নারী নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনি।

জয়নুলের এগারজন সহকর্মী নামক গ্রন্থে "বাংলাদেশের ছাপচিত্র" প্রবন্ধে বাংলাদেশের শিল্প-ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি (২০০১) ও *শিল্পপ্রেমী জিয়া* (২০০৪) গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে কন্টেম্পোরারি কনসেপ্ট এবং হিমি বুকস অ্যান্ড বুকস প্রকাশনা প্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থ দুটির প্রবন্ধ মূলত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কলামে লিখিত শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতিবিষয়ক। আব্দুস সাত্তার সমসাময়িক বাস্তবতা এবং রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি।

এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি শিল্পীসামজের অবস্থা, ব্যবস্থা ও মর্যাদার দিকটি ক্যানভাস-তুলিতে ফোটাতে পারবেন না বলে কলম ধরেছেন। এ কলম দিয়েই চিত্রিত করেছেন সেসব অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির কুফল। এমনকি সংবাদপত্রের অসত্য এবং অসৎ দিকগুলো তুলে ধরেছেন।

শিল্প-সাহিত্য নন্দনতত্ত্বের আলোকে নারীর বিভিন্ন কাহিনি, সমাজ সচেতনতা, শিল্পী ক্যানভাসে নারী, নারী-পুরুষের সমস্যা, নারীর নির্যাতন তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বারবার তাঁর লেখায় অসৎ লোভী শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীর নীতিবর্জন রূপ খোলাসা করেছেন এবং তাঁদের সংশোধনের পথ দেখিয়েছেন। একই সাথে তাঁর লেখায় শিল্পীদের বিভিন্ন অধিকারের দিকটিও তুলে ধরেছেন।

শিল্পপ্রেমী জিয়া গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে একটি প্রবন্ধের নামানুসারে। গ্রন্থটির একটি প্রবন্ধে জিয়ার শিল্পপ্রেমকে বর্ণনা দেয়া আছে। *এ ছাড়া শিল্প সংস্কৃতি রাজনীতি* গ্রন্থের অনুরূপ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

উল্লিখিত গ্রন্থে রাজনীতিসংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ স্থান পেলেও এগুলোতে সাহিত্যগুণ বিদ্যমান রয়েছে।

সোমনাথ হোরের পত্র (২০১১) গ্রন্থটি স্মৃতিকথন। এই স্মৃতিকথনের প্রথম পর্বে ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী সোমনাথ হোরের সাথে আব্দুস সাত্তারের পত্রালাপকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে তাঁর অধীনে পড়াশোনা ও সোমনাথ হোরের পত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে কলকাতায় শিল্পী ও চিত্রকলা এবং হোটেল তাজ বেঙ্গলের আর্ট ক্যাম্পের বিবরণ দিয়েছেন।

উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও শিল্পী আব্দুস সাত্তার কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন, যা মুদ্রণের অপেক্ষায়। অতএব, শিল্পী আব্দুস সাত্তারের বিশাল প্রতিভা ও কর্ম দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি যা কিছু লিখেছেন—প্রায়ই শিল্পসংশ্লিষ্ট। সমাজবাস্তবতা, শিক্ষা, রাজনীতি প্রসঙ্গত এসেছে নির্মল সমাজ তৈরি করতে।

পনেরো

মনীষীদের মূল্যায়ন

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের শিল্প ও শিল্পদর্শন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্প-তাত্ত্বিকগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই মন্তব্য বা মতামতের মাধ্যমে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের শিল্প-প্রতিভা ও শিল্প-বৈশিষ্ট্য বুঝে নেয়া সম্ভব। অতএব, এই অনুচ্ছেদ শিল্পী আব্দুস সাত্তারের প্রসঙ্গে বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো—

আব্দুল মতিন সরকার লিখেছেন :

> সাত্তারের কাজ কাল্পনিক চরিত্রের, ডেকোরেটিভ প্রকৃতির এবং প্রাচ্যকলা স্টাইলের। তাঁর কাজের রং উষ্ণ ও মিষ্টি ধরনের এবং অলংকারশোভিত। তাঁর ছবির তলে সূক্ষ্ম ডিটেলের উপর গুরুত্বারোপ, ক্যালিগ্রাফি রেখা ব্যবহার, চোখ অর্ধ উন্মোচিত ধ্যানমগ্ন দীর্ঘ মানের ফিগার, গাছ গাছালির প্রাচুর্য, ক্যানভাস জুড়ে লতা পাতা এবং অলংকার ও ডেকোরেটিভ মোটিফের বিপুল ব্যবহারে প্রাচ্যকলার ধরন এবং চেতনাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।[৪০]

স্পেস প্রসঙ্গে জাহিদ মুস্তাফা লিখেছেন :

> সাত্তারের কাজে স্পেসের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্যপ্রদ। . . . সাত্তারের স্পেস সংকীর্ণ শূন্য ঘোলাটে নয় বরং নিশ্চিত এবং স্পষ্ট।[৪১]

আব্দুস সাত্তারের কাজে মূর্ত-বিমূর্ততা প্রসঙ্গে জাহিদ মুস্তাফার মূল্যায়ন হলো :

> . . . তিনি [আব্দুস সাত্তার] উদ্দেশ্যবিহীন বিমূর্ততায় চলে যাননি বরং বিমূর্ত ভাষাকে তিনি বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ব্যবহার করে কলারসিকদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। তাঁর এই সততা বিষয়বস্তুহীন বিমূর্ততার বিরুদ্ধে ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেলের’ মতো।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

কবি আল মাহ্‌মুদ লিখেছেন :

> শিল্পী আব্দুস সাত্তারের শিল্প কর্মের সাথে পরিচয় যে কোন কবির জন্যই পরিতৃপ্তির ব্যাপার। তাঁর কাজে বিশেষ করে গ্রাফিক প্রিন্ট ও জল রংয়ের কাজে দর্শকের চোখ আনন্দে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। প্রিন্টের মধ্যে বহুবর্ণ রেখার সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি যে ছন্দের সৃষ্টি করেন সাহস করে বলতে পারি তা কবিতারই সগোত্র।[৪৩]

১৯৮৮ সালে আব্দুস সাত্তারের ১২তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তারের রঙিন আঙিনা* গ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> চিত্রকর্মের ক্ষেত্রে ক্যানভাসের দ্বিমাত্রিকতাকে তার নিজস্ব স্বভারের মধ্যে বিদ্যমান রেখে আকৃতিকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা খুবই দুরূহ কর্ম। আব্দুস সাত্তার দক্ষতার সঙ্গে এ দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছেন। এর ফলে শুধুমাত্র রঙের ব্যবহারের সাহায্যে তাঁকে কিছু গঠন কৌশল দেখাতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আব্দুস সাত্তারের সফলতা প্রশংসনীয়।[৪৪]

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মতে, আব্দুস সাত্তার স্পষ্ট দেখেন। তাঁর দেখার মধ্যে সবকিছু স্থির এবং নিশ্চিত; বাহুল্যহীন—এই দেখার মধ্যে স্পেস তৈরি করেন। আমাদের জীবনযাত্রার স্পেসের বোধ কমে এসেছে। সেক্ষেত্রে ছবি দেখাতে মনে স্পেসের বোধ বাড়বে তাই চিত্রে আব্দুস সাত্তার যে স্পেসের বোধ তৈরি করেছেন তা একধরনের শ্রেণিসংগ্রাম।[৪৫]

Contemporary Art Series of Bangladesh-29 গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' তৎকালীন সময়ের শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক আজাদ রহমান শিল্পী আব্দুস সাত্তারের জনপ্রিয়তার কারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> জীবনের সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুসরণের তিনি বিরোধী। তাঁর রুচিবোধ ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ দেশীয় বিষয়বস্তুকেই প্রাধান্য দেয়। সম্ভবত এ কারণেই শিল্পী সাত্তারের শিল্পকর্ম ক্রমাগত জনপ্রিয়তার সীমানাকে স্পর্শ করছে।[৪৬]

একই সুর ধরা পরেছে মইনুদ্দীন খালেদের ব্যাখ্যায়। তিনি লিখেছেন :

> . . . কিন্তু সাত্তারের কাজে যে ভাষা রয় রেখার গড়ন তা প্রাচ্যরীতির শিল্প (ওরিয়েন্টাল আর্ট) থেকে গৃহীত। তার ছবির রঙের উজ্জ্বলতা, দ্বিমাত্রিকতা আলংকারিক প্রবণতা সবই প্রাচ্যরীতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।[৪৭]

আব্দুস সাত্তারের ছাপাই প্রাচ্যচিত্র প্রসঙ্গে মতলুব আলী লিখেছেন :

> সাত্তার একজন নিষ্ঠাবান ও উদ্যোগী শিল্পকর্মী। তাঁর শিল্প-শিক্ষা হয়েছে সার্বিকভাবেই প্রাচ্য-কলার ধারা-আঙ্গিকের ভিত্তিতে; প্রথমত চিত্রকলা panting এবং পরবর্তীকালে ছাপাই চিত্রে printmaking তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। ফলে তাঁর প্রদর্শিত কাজগুলোর মেজাজ বা ঢং চূড়ান্তভাবেই প্রাচ্যধারার শিল্প-আঙ্গিকের প্রতিভূ। প্রাচ্যরীতির অন্যতম প্রধান গুণগত বৈশিষ্ট্য ছান্দিক রেখা আর সাথে অখণ্ডিত রং ক্ষেত্রের উপস্থাপন ও মিষ্টি হালকা বর্ণ-বিন্যাসের প্রবণতা তাঁর কাজে জোরালো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যদিও একথা ঠিক যে অতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পধারার অন্তর্গত কিছু কিছু নিয়ম পদ্ধতি সাত্তারের কাজে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। এতে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি বরং তা সৃজনশীল গুণমান দৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন এবং কখনো বিপরীত মুখী ধারায় সমন্বয় ঘটেছে শিল্পীর কাজে। তবে আঙ্গিকের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য প্রবণতা সাত্তারকে আকৃষ্ট করলেও কম্পোজিশনের ব্যাপারে তিনি প্রাচ্য একাডেমিক রীতি অনেকটা রক্ষণশীল মেজাজেই যেন ধরে রেখেছেন।[৪৮]

আব্দুস সাত্তারের চতুর্থ প্রদর্শনী প্রসঙ্গে আনা ইসলাম লিখেছেন :

> শিল্পী তাঁর সব ক্যানভাসেই বাস্তবের মলিনতাকে দূরে সরিয়ে রূপস্পর্শময় অনুচিত্রের ছাপ রেখেছেন ব্রাশে। বারবার তাঁর ছবির ভাষা কল্পনা আর আশার তর্পণ করে অবচেতনায় ডুবেছে। তাই স্বপ্ন, কল্পনা ও বাস্তব ছবিতে প্রায় পাশাপাশি সহাবস্থান করে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালে ডিভাইন আর্ট গ্যালারিতে ১৫তম একক প্রদর্শনী প্রসঙ্গে *দৈনিক আল মুজাদ্দেদ* পত্রিকায় শিল্পী আব্দুস সাত্তার প্রসঙ্গে যা লেখা হয়েছে তা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়—

> আব্দুস সাত্তারের মধ্যে শিল্পপ্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে ও সত্যের সেই সৃষ্টিশীল মেজাজটি সঙ্গে করেই, যার উৎসমূলে কাজ করেছে নিরেট শিল্পী দরদী মন মানস ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি।[৫০]

আব্দুস সাত্তারের একক চিত্র প্রদর্শনী : ‘রঙিন আঙিনা’ প্রসঙ্গে *দৈনিক দেশ* প্রতিবেদক যে মন্তব্য করেছেন তা তাৎপর্যময়—

> ফেব্রুয়ারি ১৫–২৯ পর্যন্ত শিল্পী আব্দুস সাত্তার যেনো নানা মাধ্যমের কাজ দিয়ে আমাদের গোটা পনোরাটা দিন রঙের রাজ্যে বিমোহিত করে রেখেছিলেন। তিনি যখন ক্যানভাসে রঙ ঢালেন তখন মনে হয় যেনো সে রঙ তিনি হৃদয় উজাড় করে ঢালেন। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা তাঁর কোন ছবিতেই রঙের এই উজাড় করা ব্যবহার কখনো বাহুল্য মনে হয় না।[৫১]

শিল্পসমালোচক আবু তাহের লিখেছেন :

> Satter is not only an artist and one of the best print makers of the sub-continent, he is also a rebel, a lover, a romantic, and a critic of our stagnant social and political situations. Of Late satter, besides his Profession of painting, is growing up as a writer, a critic, a columnist in the news papers. He writes on echological changes, atmospheric pollution, the moral annihilation, and political prostitution. He is protesting wherever something is foul and fishy. Satter are be called puritan a progressive, a democrat and a socialist all at once.[৫২]

তিনি আরো লিখেছেন :

> Undoubtedly, Satter is an optimist, for we must remember his repeated use of flowers, leaves, the crawling creeping, shrubs, the birds, the abundantly breasted amorous women, the couple the young girls in decorative kameez in, his works in fact. He draws his inspiration from life and nature. He depicts the tree of life rooted deep into the heart of nature.[৫৩]

æAbdush Satter : Ideals of his Art” শিরোনামের দীর্ঘ প্রবন্ধে আব্দুল মতিন সরকার আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্মের নানান দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সেসব মন্তব্যের দু-একটি দিক এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন :

> Therefore, Satter’s works of art are imaginative in character, decorative in nature and oriental in style. His colours are warm and sweet and he has a preference for ornamentation. . . . Satter is not a revolutionary as an artist, not even innovator of a new style or the initiator of a new movement but his works sorely represent his self identity as an artist and that of Bangladesh.[৫৪]

ষোলো

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের শিল্পীজীবন, শিল্পকর্ম, শিল্পভাবনা ও বাংলাদেশের প্রাচ্যত্রিকলার ধারায় তাঁর অবদান নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ও অবদান তুলে ধরা যায় :

বৈশিষ্ট্য

(১) ড্রয়িং, পেইন্টিং (তেলরং, জলরং, অ্যাক্রেলিক মাধ্যম), কাঠখোদাই ও ছাপচিত্রের অন্যান্য মাধ্যম, বাটিক, সিল্ক স্ক্রিন, ক্যালিগ্রাফি—যে মাধ্যমেই কাজ করেছেন ফিগারেটিভ চিত্রকর্মই বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ক্যালিগ্রাফি চিত্রে ইসলামিক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিদ্যমান।

(৩) লেখনীতে সামাজিক সচেতনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং লেখাগুলো তুলির টানের মতোই অন্তর্ভেদী ও রসে ভরা।

(৪) লেখনীতে শিল্পীসমাজের অধিকার বিষয়ে যেমন লিখেছেন তেমনি তাঁদের হীনম্মন্যতা প্রসঙ্গে লিখেছেন।

(৫) লেখনীতে নানান গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও লেখনীর উদ্ধৃতি থেকে তাঁর পড়াশোনার গভীরতা লক্ষণীয়।

(৬) শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনীতি, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির কুফল ছাড়াও জাটকা মাছ নিধন, অতিথি পাখি শিকারবিষয়ক প্রত্যক্ষণ বোধের তীব্রতা যেমন লক্ষণীয় তেমনি এসব সমাধানের পথও দেখিয়েছেন।

(৭) শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়-সংক্রান্ত গবেষণামূলক লেখনী লিখেছেন এবং সামাজিক জীবনযাত্রায় এসব বিষয়ের সমাধানের পথও দেখিয়েছেন।

(৮) প্রাচ্যের বিভিন্ন শিল্প ঐতিহ্য যেমন হিন্দু-মুসলিম শিল্পকলা, নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা, অজন্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া চিত্রকলার নানান অনুষঙ্গ আত্তীকৃত করে চিত্র সৃষ্টি করেছেন।

(৯) পদ্ম, গোলাপ ফুল কখনো ভালোবাসার প্রতীক, কখনো আধ্যাত্মিক ভালোবাসার প্রতীক, কখনো যুদ্ধের প্রতিপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত।

(১০) তাঁর কাজে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন লক্ষণীয়।

(১১) রং প্রয়োগ কৌশলে, রেখার সকল ভঙ্গিতে এবং অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তিতে নারীর অপরূপ সৌন্দর্য দর্শকের দৃষ্টিকে শান্তি দেয়, মাধুর্যমণ্ডিত করে।

(১২) প্রাচ্যরীতির রেখার ব্যবহারের মাধ্যমে এক আঁচড়ে এঁকেছেন অবয়ব। সমান্তরাল এবং লম্ব উভয় রেখার আকৃতি-প্রকৃতি গঠনে তিনি সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন।

(১৩) রঙের ব্যবহারের পরিমিতিবোধ বিস্ময়কর।

(১৪) প্রাচ্যরীতির ছন্দোবদ্ধ রেখা এবং হালকা রঙের বিন্যাসে বিষয়ের গভীরতা বুঝিয়েছেন।

(১৫) পাশ্চাত্য রীতির রং প্রয়োগ এবং প্রাচ্যরীতির ওয়াশ—এ দুটি বিপরীতমুখী পদ্ধতিকে সফলতার সাথে সংমিশ্রণ করে ছবি এঁকেছেন।

(১৬) রাজনৈতিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ করে তত্ত্বীয় ধারণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ মতামত প্রদান করা তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য।

(১৭) চিত্রে মেয়ে ফিগারই বেশি এঁকেছেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, মেয়ে ফিগারের শারীরিক গঠন আকর্ষণীয় অলংকারে সজ্জিত হলে আরো বেশি সুন্দর হয়। সুন্দরের প্রয়োজনে মেয়ে ফিগার বেশি এঁকেছেন।[৫৫]

(১৮) কাঠখোদাই চিত্রে ও ক্যালিগ্রাফিতে বিশেষ কয়েকটি মোটিভ ব্যবহার করেন। তার মধ্যে বৃত্ত, গোলাপ ফুল, অর্ধবৃত্ত, হাতের ছাপ, লতানো পাতা উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯) প্রিন্টমেকিংয়ের উডকাট চিত্রে পোড়া কাঠের ইমেজ আনতে কাঠকে বার্ন (পোড়া) করে নতুনত্ব এনেছেন।

(২০) মূর্ত, বিমূর্ত, অর্ধবিমূর্ত কিংবা ফর্ম-প্রধান যেকোনো ছবিই এশিয়ার আইডেনটিটি পাওয়া যায় এবং তা শিল্প-বিচারে আন্তর্জাতিক।

(২১) ছেলেবেলায় পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে আরবি, হিন্দি, উর্দু পড়তেন। আরবি শব্দ বাংলায় লিখে ক্যালিগ্রাফি করেছেন।

(২২) অনেক পেইন্টিংয়ে ধারাপাত সংখ্যা অলংকার ও সম্পর্কের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন।

(২৩) প্রকৃতির রসোপাদানে শিল্পের অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে তাঁর কাজ বাস্তবতার নির্যাসে সমৃদ্ধ।

(২৪) ছাত্রজীবনে প্রচুর মডেল ড্রয়িং করে ফিগারের প্রমাণ-জ্ঞান মজবুত করেছেন। ফলে চিত্রের ফিগার অঙ্কনে বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা লক্ষণীয়।

(২৫) তাঁর চিত্রের নারীরা কল্পনাপ্রসূত, তাই তা গ্রাম কিংবা শহরের স্থান কিংবা কালের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। এমনকি চোখ, ঠোঁট, নাকের ধরন শিল্পীর নিজস্ব কল্পনাজাত।

(২৬) লেখালেখিতে তিনি সমাজের শিক্ষাসংক্রান্ত, সংস্কৃতিসংক্রান্ত এবং রাজনীতিসংক্রান্ত লেখার ওপর জোর দিয়েছেন।

(২৭) অ্যাক্রেলিক মাধ্যমেই বেশি কাজ করেছেন। প্রিন্ট মাধ্যমেও অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করে মিশ্র মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। অ্যাক্রেলিক মাধ্যমের ক্যারেকটারের সাথে মিল রেখে অতি দ্রুততার সাথে কাজ করেছেন। অ্যাক্রেলিকের ব্যবহার করেছেন তেলরং ও জলরংয়ের মতো।

(২৮) প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার বিভিন্ন ঘরানার প্রতিফলন পাওয়া যায় তাঁর কাজে।

(২৯) চিত্রকলা এবং বাটিক চিত্র ফিগারেটিভ এবং বিষয়ভিত্তিক। কিন্তু উডকাট চিত্রকলা আধাবিমূর্ত, ফর্ম, কালার ও ডিজাইনের মূল উপাদান।

(৩০) অর্ধ উন্মিলিত, বন্ধ এবং ধ্যানস্থ চোখের পাতা অজন্তার গুহাচিত্রের নর-নারীর চোখের আদল দ্বারা প্রভাবিত।

(৩১) পদ্ম এবং গোলাপ ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে চিত্রে এসেছে। কখনো শান্তির ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন আবার কখনো যুদ্ধ এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে শান্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

(৩২) তাঁর চিত্রে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ধর্মীয় অনভূতিতে আঁকেননি। আরবি শব্দকে বাংলায় রূপান্তর করে বাংলার পরিচয় দিতে চেয়েছেন এবং কখনো পেইন্টিংয়ের মোটিফ হিসেবে ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেছেন।

(৩৩) চিত্রের বিষয়-সৌন্দর্য ও নন্দনতাত্ত্বিক লেখালেখির বিষয় সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সত্যের বাণী।

Dhaka University Institutional Repository

(৩৪) তাঁর কাজে নারী সৌন্দর্যের বিশেষ দিক হচ্ছে—নারীদের আকর্ষণীয় ঠোঁট, সুন্দর গাল, চিত্তাকর্ষক নাক, স্টাইলিশ চুল, গলা, কানে অলংকারশোভিত পরিপাটি নান্দনিক রূপের প্রকাশ।

(৩৫) ড্রয়িং, পেইন্টিং, কাঠখোদাই, ক্যালিগ্রাফি এবং ছাপচিত্রের অন্যান্য যে মাধ্যমেই কাজ করেছেন, তা ফিগারেটিভ চিত্রকর্ম প্রাধান্য পেয়েছে।

(৩৬) প্রতিটি কাজে শিল্পীর দৃষ্টির বৈভব প্রতীকী উপস্থাপন এবং জীবনবোধের ঐশ্বর্য প্রতীয়মান। অর্থাৎ কল্পনা নয়, উপলব্ধির প্রকাশ হিসেবে প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ, প্রশংসা, উল্লাস, ঘৃণা, দুঃখবোধ বোঝাতে প্রাচ্যশৈলীকে বেছে নিয়েছেন।

(৩৭) প্রাচ্যরীতিতে রেখার ব্যবহার একটা বিশেষ মাত্রা। একটি আঁচড়ে তিনি এঁকেছেন অবয়ব। সমান্তরাল এবং লম্ব উভয় রেখায় আকৃতি-প্রকৃতি গঠনে তাঁর তুলি জাদুকরের মতো খেলেছে।

(৩৮) জলরং, তেলরং, অ্যাক্রেলিক, ছাপচিত্র যে মাধ্যমেই কাজ করেছেন, দ্বিমাত্রিক স্বভাবকে রক্ষা করে অত্যন্ত দক্ষতা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তাঁর আকুতিগুলো উপস্থাপন করেছেন।[৫৬]

(৩৯) চড়া রঙের পরিবর্তে হালকা কমনীয় রং ব্যবহার তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য।

(৪০) কাঠখোদাই চিত্রে কাঠের স্বভাব ও গুণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন অনেক কাজে।

(৪১) রাজনৈতিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বীয় ধারণা, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের কৌশলে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

(৪২) তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

(৪৩) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বর্ণনামূলক লেখনীতে সাহিত্যিক গুণ বিদ্যমান।

(৪৪) তাঁর চিত্রকর্মে বাংলাদেশের চালচিত্র বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

(৪৫) মানুষের মুখাবয়বের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বিভিন্নমুখী ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে পারঙ্গম।[৫৭]

(৪৬) মানুষের ভালোবাসা, প্রেম, স্মৃতিকে ছবিতে এনেছেন প্রতীকায়নে।

(৪৭) আকৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, সমবাহু, ত্রিভুজ, জ্যামিতিক ফর্ম এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, রং ব্যবহারে দ্বিমাত্রিকতার বৈপরীত্য সৃষ্টি না করে।

(৪৮) প্রাথমিক রংগুলো অবিমিশ্ররূপে তাঁর চিত্রকর্মে উজ্জ্বল আভা সৃষ্টি করেছে।[৫৮]

(৪৯) একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পীর প্রায় সব গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।[৫৯]

(৫০) মার্জিত রুচিবোধ ও পোশাক তাঁর ব্যক্তিত্বকে উসকে দেয়।

(৫১) ব্যক্তিজীবনে কবুতর, ঘুঘুসহ অন্যান্য পাখি পোষা এবং বাগান করা তাঁর শখ।

(৫৩) তাঁর ছাপচিত্র মাধ্যমের কাজে রয়েছে রেখার শীতল ছন্দ, যা প্রাচ্যরীতির শৈলী থেকে গৃহীত। এ ছাড়া ছবির রঙের উজ্জ্বলতা, দ্বিমাত্রিকতা, আলংকারিক প্রবণতা প্রাচ্যরীতির শৈলী থেকেই গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

অবদান

(১) 'শিল্পশিক্ষা : শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি' গ্রন্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার মৌলিক বিষয়াবলি, পাঠ্যক্রম এবং চারুকলায় পাঠদানের সাতটি বিভাগের বিষয় ও মাধ্যমের পরিচিতিমূলক বর্ণনা দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় বিরাট অবদান রেখেছেন।

(২) বাটিক মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা এঁকে প্রাচ্যরীতির চিত্রে নতুন মাধ্যমের সংযোজন করেছেন।

(৩) ছাপচিত্র মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির ফিগারেটিভ কাজ করে বিশ্বের কাছে প্রাচ্যরীতির প্রচার করেছেন।

(৪) ছাপচিত্রে একটি আলাদা কাঠামো নির্মাণ করেছেন।

(৫) কাঠখোদাই, অ্যাক্রেলিক, তেলরং যে মাধ্যমেই কাজ করেছেন, প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বজায় রেখেছেন।

(৬) প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে চিত্রকলার বাইরে তত্ত্বীয় জ্ঞানের পড়াশোনার একান্ত দরকার, যা চিন্তা ও মননের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। আব্দুস সাত্তার জ্ঞানপিপাসু ও পড়াশোনার মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি শিল্পতত্ত্ব নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন।

(৭) রাজনৈতিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষত ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি এবং শিল্পীসমাজের অধিকার প্রসঙ্গ তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট করে সমাধানের উপায় দেখান।

(৮) 'বাংলাদেশের দারুশিল্প' শিরোনামে তাঁর পিএইচ.ডি. গবেষণায় বাংলাদেশের দারুশিল্পের (কাঠের কাজ) গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং প্রাচীন ও সমকালের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্মাণ করে দারুশিল্পের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন।

(৯) তিনি তাঁর পিএইচ.ডি. গবেষণায় দারুশিল্পের উপযোগী কাঠ ও কাঠ সীজন প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এ গ্রন্থের মাধ্যমে দারুশিল্পীগণ উপকৃত হচ্ছেন।

(১০) প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায়, কালি-কলম এবং জলরং ওয়াশের সাথে কালি-কলম ব্যবহার করে মাধ্যমগত উৎকর্ষ বাড়িয়েছেন।

(১১) মনের অবচেতন স্তরকে কাজে লাগিয়ে ছবির গঠন নির্মাণে নতুন ভাবনা বাস্তবায়ন করেছেন, যাতে বেঙ্গল স্কুলের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা সত্ত্বেও নতুনত্বের স্বাদ দেয়।

(১২) ২০০৯ সালে *United Leasing Company Limited*-এর ডেস্ক ক্যালেন্ডারের প্রাচ্যরীতির ১২টি চিত্র মুদ্রিত হওয়ায় সারা দেশে শিল্পরসিকদের প্রাচ্যরীতির চিত্ররস গ্রহণে অবদান রেখেছে।

(১৩) বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাঁচ তারকা হোটেল সোনারগাঁওয়ের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় প্রিন্ট ও পেইন্টিং মাধ্যমে ৩৫০টি ছবি এঁকে দিয়েছেন।

(১৪) বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাই অঙ্কন করেননি, ভাস্কর্য মাধ্যমে বিশেষত স্টোন কার্ভিং এবং কাঠের ভাস্কর্য মাধ্যমে প্রাচ্যশৈলীর ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) শিক্ষকতার দায়বদ্ধতায় *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি* গ্রন্থে শিল্পকর্মের উপকরণ ব্যবহারজনিত কারণে ক্ষতিকর দিকগুলো উল্লেখপূর্বক সাবধানতা অবলম্বনের পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে শিল্পীসমাজ উপকৃত হয়েছেন।

(১৬) শিল্পীসমাজের অবস্থা ও মর্যাদার দিকটি তাঁর তুলিতে যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরতে পারবেন না মনে করেই কলমের পথ বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ সংবাদপত্রে কলামিস্টের পথ বেছে নিয়ে চিত্রকলার মতোই সমাজকে সুন্দর করতে, সচেতন করতে লিখেছেন।

(১৭) পদ্ধতি ও প্রকরণে নতুন নতুন উদ্ভাবন করে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

(১৮) বাংলাদেশের চিত্রকলায় সত্তরের দশক থেকে যে কয়জন শিল্পী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা দেখিয়েছেন—আব্দুস সাত্তার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

(১৯) অঙ্কন রীতি, কৌশল, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্য শিল্পীদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র এবং সহজেই তাঁদের কাজ আলাদা করা যায়।

(২০) চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তত্ত্বীয় শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চার অভাব ও অনীহা লক্ষণীয়, কিন্তু আব্দুস সাত্তার তাঁর চিন্তা ও মননের বিকাশে ছবি আঁকার পাশাপাশি পড়াশোনা, শিল্পবিষয়ক লেখালেখি সমান্তরালে করেছেন। ফলে তাঁর চিত্রকর্মের এই জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

(২১) একজন শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান* গ্রন্থটির যথেষ্ট আবেদন রয়েছে।

(২২) শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং সমাজব্যবস্থার সাথে সেই তত্ত্ব একাত্ম করে দেখিয়েছেন।

(২৩) তাঁর প্রবন্ধগুলোতে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার তথ্য ও দিকনির্দেশনা দিয়ে পরবর্তী সময়ের গবেষক ও প্রাচ্যশিল্পীদের কাজে বিরাট অবদান রেখেছেন।

(২৪) *শিল্প ও শিল্পী, জয়নুল আবেদিন, জয়নুলের এগারজন সহকর্মী* প্রভৃতি গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের জীবন-ইতিহাস, আদর্শ ও শিল্পের বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

(২৫) আরবি লিপি চিত্রণের পরীক্ষা করেছেন। অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফির বা লিপি চিত্রণে এই পরীক্ষা আমাদের দেশে প্রথম তাঁর দ্বারা হয়েছে।[৬০]

(২৬) একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পী হয়ে ঐতিহ্য ও জীবনাচারণ বিষয়গুলোকেই চিত্রায়ণ করেছেন।

(২৭) অ্যাক্রেলিক ও প্রিন্ট কালারকে জলরং ওয়াশ পদ্ধতির মতো করে ব্যবহার করেছেন।

(২৮) উডকাট ছাপচিত্র বলতে ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রের যে ধারণা, তা পাল্টে দিয়ে তিনি বড়ো মাপের উডকাট করে দেখিয়েছেন।

(২৯) তিনি বিচিত্র ধরনের লেখা লিখেছেন। তাঁর গবেষণায় এসেছে দারুশিল্প, স্থাপত্য ও ল্যান্ডস্কেপ, অলংকার প্রসঙ্গ। এ ছাড়া রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, নন্দনতত্ত্ব, সমালোচনা, পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করে অবদান রেখেছেন।

সতেরো

উপসংহার

শিল্পী আব্দুস সাত্তার চিত্রকলায়, লেখালেখিতে, নন্দনতত্ত্বে, প্রসাশনিক দায়িত্ব পালনে, শিক্ষকতায় অনন্য ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় তিনি যে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যে অবদান রেখেছেন, তা নজিরবিহীন।

ঐতিহ্যিক প্রাচ্যরীতির ধারা থেকে উপাদান নিয়ে তিনি প্রাচ্যচিত্রকলায় পুনর্বিন্যাস করে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা আধুনিকতায় উন্নীত করেছেন। বহু মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির চিত্রচর্চা করে—মাধ্যমগত উৎকর্ষে সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর চিত্রকলায়, লেখায়, বক্তৃতায় এবং শিক্ষকতায় প্রতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলাকে আধুনিকতার পথ দেখিয়েছেন। তাঁরই কল্যাণে অনেক শিল্পী তাঁদের প্রাচ্যরীতির চিত্রকর্ম দিয়ে দেশ-বিদেশের প্রশংসা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ কোনো ঘরানায় আবদ্ধ করতে চাননি। প্রত্যেকের স্বাধীন ও সৃজনশীল চর্চাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। ফলে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় প্রত্যেক শিল্পীই আলাদা স্টাইল ও বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং বিষয় চিন্তায় কৌশল এবং প্রয়োগ রীতিতে আলাদা। এই স্বাধীনতার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় সৃজনশীল শিল্পকর্ম চর্চা হচ্ছে।

আব্দুস সাত্তার প্রাচ্যের ষড়ং জানেন এবং মানেন। তবে ষড়ং মাথায় রেখে চিত্র আঁকেননি। তিনি খেলাচ্ছলে যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে ষড়ংয়ের গুণ বিদ্যমান। সৃজনশীলতা প্রসঙ্গে মতলুব আলীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> সৃজনশিল্পীদের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা ও নিপুনতা এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন হয়, সাত্তারের মধ্যে এসমস্ত গুণের ঘাটতির প্রশ্নই ওঠে না বরং সূক্ষ্ম-দৃষ্টিপাতে আপাত-বাহুল্যের দিকই চোখে পড়বে।[৬১]

সৃজনশীল চিত্রকলাই নয়, আব্দুস সাত্তার নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পবিষয়ক লেখালেখিতে সৃজনশীলতার পরিচয় রেখেছেন। বলা যায়, একমাত্র আব্দুস সাত্তারই বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে চিত্রকলায় উৎকর্ষ লাভ করে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জনের সাথে লেখালেখিতে সাফল্য অর্জন করেছেন। চিত্রশিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা, ইতিহাসজ্ঞান, সমাজদর্শন, সমসাময়িক বাস্তবতা তাঁর চিত্রকলা ও শিল্পকলাবিষয়ক লেখালেখিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেহেতু আব্দুস সাত্তার একজন বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পী তাই তাঁর করণ-কৌশল, শিল্পীর অভিব্যক্তি ও সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপলব্ধ জ্ঞান অন্য ডিসিপ্লিনের শিল্পসমালোচকদের চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ, সত্য এবং বাস্তব। তাই বলা যায়, পেশাদার শিল্পতাত্ত্বিক কিংবা শিল্পসমালোচকদের লেখনীর চেয়ে আব্দুস সাত্তারের শিল্পবিষয়ক লেখা তাৎপর্যপূর্ণ। একই সাথে তাঁর চিত্রকর্ম দেখলে বোঝা যায়, তিনি শিল্পচর্চাকে নন্দনতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে দুই বিষয়কে সমন্বিত করেছেন। তিনি যেমন বাংলার প্রাচ্যশিল্পের রূপ নির্মাণ করেছেন তেমনি বাংলার আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপ বিনির্মাণ করেছেন প্রবন্ধগুলোতে। আর এসব আলোচনা করেছেন শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সমন্বিত করে।

আব্দুস সাত্তারের বড়ো গুণ তিনি কোনো বিষয় খুঁজে বেড়ান না। আশপাশের সবকিছু থেকেই তাঁর চিত্রকর্মের বিষয় হিসেবে বেছে নিতে পারেন। তিনি বিষয়ের গভীর তাত্ত্বিক নাম ব্যবহার করে দর্শকের চিন্তায় দুর্বোধ্যতা আনেন না। তাঁর চিত্রের শিরোনামগুলো বিষয়ের সামগ্রিকতার ইঙ্গিত করে, যা সাধারণ ও সহজবোধ্য। দর্শক বা শিল্পরসিক এই বিষয়ের আলোকে নিজের স্বাধীন চিন্তামতো রস আহরণ করতে পারেন।

পরিশেষে একথা বলা যায়—বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বিকাশে আব্দুস সাত্তারের ভূমিকা পথিকৃতের।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. মতলুব আলী, "বৈচিত্র্যপিয়াসী কর্মশৃঙ্খলায় অগ্রগামী চারুকর্মী একজন", দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম*, সাজু আর্ট গ্যালারি, অক্টোবর ২০০২, পৃ. 21

২. গবেষকের সাথে আব্দুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৪ মে ২০১৩

৩. "শিল্পী পরিচিতি", দ্র. ১২তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তারের রঙিন আঙিনা*, সাজু আর্ট গ্যালারি, জুন ১৯৮৮

৪. গবেষকের সাথে আব্দুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত, ১৮ মে ২০১৩

৭. "শিল্পী আব্দুস সাত্তার-এর জীবন ও কর্ম", দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. 50

৮. "শিল্পী পরিচিতি", প্রাগুক্ত

৯. আব্দুস সাত্তার, *সোমনাথ হোরের পত্র : কলকাতার চিত্র*, ঢাকা, কন্টেম্পোরারি কনসেপ্ট, জুন ২০১১, পৃ. ৪২

১০. "শিল্পী পরিচিতি", প্রাগুক্ত

১১. গবেষকের সাথে আব্দুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১ জুন ২০১৩

১২. *সচিত্র সন্ধানী*, চতুর্থ বর্ষ, ৩৮তম সংখ্যা, ১১ জানুয়ারি ১৯৮১

১৩. "শিল্পী আব্দুস সাত্তার-এর জীবন ও কর্ম", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১–৫২

১৪. গবেষকের সাথে আব্দুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১ জুন ২০১৩

১৫. তিনি যখন স্কলারশিপে আমেরিকা গিয়েছিলেন তখন ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি পদ এক ধাপ/গ্রেড প্রমোশন করে নেয়া হয়েছিল। সে হিসেবে আব্দুস সাত্তার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন।

১৬. "শিল্পী পরিচিতি", প্রাগুক্ত

১৭. জাহান আরা রউফ, "আপন ভুবনে শিল্পী আব্দুস সাত্তার", দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তার-এর শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. 32

১৮. আব্দুস মতিন সরকার, "আব্দুস সাত্তার : তাঁর শিল্প আদর্শ" *আব্দুস সাত্তার-এর চিত্রকলা ও ছাপচিত্র*, চারুকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, [তারিখ নেই]

১৯. আব্দুস সাত্তার, *প্রতিকৃতি*, প্রদর্শনী উপলক্ষে ২০০৬ সালে প্রকাশিত

২০. *বিচিত্রা*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৮১

২১. জাহিদ মুস্তাফা, দ্র. ১২তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তার-এর রঙিন আঙিনা*, সাজু আর্ট গ্যালারি, জুন ১৯৮৮

২২. মইনুদ্দীন খালেদ, "শিল্পী সাত্তারের ছবি : নিসর্গ ও মানুষের বিরোধভাস" দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৬৫

২৩. আব্দুস সাত্তার "শিল্পী আব্দুস সাত্তার-এর 'শিল্পে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং মূর্ত-বিমূর্ত বিতর্ক', বিষয়ক অভিমত", দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. 44

২৪. গবেষকের সাথে আব্দুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

২৫. মতলুব আলী, "বৈচিত্র্যপিয়াসী কর্মশৃঙ্খলায় অগ্রগামী চারুকর্মী একজন", দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তার-এর শিল্পকর্ম*, পৃ. 18

২৬. গবেষকের সাথে আব্দুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৫ মে ২০১৩

২৭. "শিল্পী আব্দুস সাত্তার-এর জীবন ও কর্ম", প্রাগুক্ত, পৃ. 49

২৮. আব্দুস সাত্তার "আমার কথা", *শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন*, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৮৮

২৯. আব্দুস সাত্তার, "কুমিল্লা বার্ড-এ এক রাত", জয়নুলের এগারজন সহকর্মী, ঢাকা, হিমি বুকস এন্ড বুকস, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৬৩

৩০. আব্দুস সাত্তার, "জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা", *শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন*, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ৮৮

৩১. আব্দুস সাত্তার, "নদীবক্ষে শিল্পী সাহিত্যিক ও কবিদের মিলনমেলা", *জয়নুলের এগারজন সহকর্মী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩–১৩৪

৩২. আব্দুস সাত্তার, "প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান", *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মে ২০০৩, পৃ. ২৩

৩৩. আব্দুস সাত্তার, "শিল্পকর্মে ফর্মের ভূমিকা এবং এর গুরুত্ব", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৩৪. আব্দুস সাত্তার, "শিল্পে মানবতা এবং অভিব্যক্তির প্রকাশ", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৫. আব্দুস সাত্তার, "শিল্পবোধ ও শিল্পবিচার", প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৩৬. আব্দুস সাত্তার, "সপ্তম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩৭. আব্দুস সাত্তার, "ভূমিকা" দ্র. *শিল্পকলা যুগে যুগে*, ঢাকা, হাসি প্রকাশনী, মে ২০১১

৩৮. আব্দুস সাত্তার, "শিল্পকলা যুগে যুগে" প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩৯. আব্দুস সাত্তার, "নারী", জয়নুলের এগারজন সহকর্মী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯

৪০. আব্দুল মতিন সরকার, প্রাগুক্ত

৪১. জাহিদ মুস্তাফা, প্রাগুক্ত

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. আল মাহমুদ, দ্র. ১২তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে *আব্দুস সাত্তার-এর রঙিন আঙিনা*, প্রাগুক্ত

৪৪. সৈয়দ আলী আহসান, দ্র. *আব্দুস সাত্তারের রঙিন আঙিনা*, প্রাগুক্ত

৪৫. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "আব্দুস সাত্তারের কাজের প্রধান গুণ : সততা। তাঁর স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট কাজে সততা সোচ্চার হয়ে উঠে", প্রাগুক্ত

৪৬. আজাদ রহমান, "মুখবন্ধ", *Contemporary Art series of Bangladesh-29*, Bangladesh Shilpakala Academy, February 1984

৪৭. মইনুদ্দীন খালেদ, *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, পৃ. ১৬৫

৪৮. আব্দুস সাত্তারের ছাপাই প্রাচ্যচিত্র প্রসঙ্গে মতলুব আলী লিখিত [পত্রিকার নাম ও তারিখ অজ্ঞাত]

৪৯. আনা ইসলাম, *দৈনিক বাংলা*, ডিসেম্বর১৯৭৯, পৃ. ৭

৫০. "আব্দুস সাত্তারের চিত্র প্রদর্শনী", *দৈনিক আল মুজাদ্দেদ* ৩০ জুন ১৯৯৫

৫১. *দৈনিক দেশ* ৩ মার্চ ১৯৮৪

৫২. Abu Taher, "Sattar : A Stalwart Printmaker", *Observer* 30 June 1995

৫৩. ibid

৫৪. Abdul Matin Sarker, "Abdush Satter : Ideals of his Art", দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তার-এর শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. 14-16

৫৫. গবেষকের সাথে আব্দুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার, ঢাকা ১ জুন ২০১৩

৫৬. "শিল্পী আব্দুস সাত্তার-এর জীবন ও কর্ম" দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তার-এর শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. 58

৫৭. খুরশীদ আলম, "আব্দুস সাত্তারের সাম্প্রতিক চিত্রকর্ম" *বাংলার বাণী* ৩০ জুন ১৯৯৫

৫৮. সৈয়দ আলী আহসান, দ্র. ১৯তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তারের রঙিন আঙিনা*, প্রাগুক্ত

৫৯. জাহিদ মুস্তাফা, প্রাগুক্ত

৬০. সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত

৬১. মতলুব আলী, "বৈচিত্র্যপিয়াসী কর্মশৃঙ্খলায় অগ্রগামী চারুকর্মী একজন", প্রাগুক্ত, পৃ. 19

Dhaka University Institutional Repository

রফিক আহমেদ

শিল্পী রফিক আহমেদ নিভৃতচারী ও প্রচারবিমুখ মানুষ। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পধারর শিক্ষা নিয়ে যেসব শিল্পী শিল্পের ভুবনে অবদান রেখেছেন, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁর অধিকাংশই শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার সাথে জড়িত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিল্পচর্চার সাথে সরাসরি জড়িত থাকেন বলেই নিজেদের শিল্পচর্চা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে কর্মজীবন হলে শিল্পচর্চা যেমন কঠিন হয়ে পড়ে তেমনি প্রকৃত শিল্পচর্চা ও শিল্পসত্তাও হ্রাস পেতে শুরু করে। তবে দু-একজন শিল্পী তাঁদের অদম্য শিল্পপিপাসার কারণে এই প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারেন। শিল্পী রফিক আহমেদ সে কাতারের একজন। এই প্রবন্ধে তাঁর ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রাচ্যশিল্পের ধারায় তাঁর অবদান মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে। বিশেষত মুরাল পেইন্টিংয়ে তাঁর বিশেষত্ব এবং ডিজাইন ব্যবহৃত অলংকরণধর্মী জলরঙের চিত্রে সুতার ব্যবহার, ক্যানভাসে জলরঙের বিশেষ ব্যবহার অর্থাৎ টেকনিকের দিক থেকে স্ব-উদ্ভাবিত বিশেষ শৈলীর নান্দনিক বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

এক

প্রচারবিমুখ এই শিল্পীর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর স্মৃতিনির্ভর বক্তব্যকেই সম্বল করতে হয়েছে।[১] কারণ তাঁর বেশিরভাগ চিত্রেরই ফটোগ্রাফ সংরক্ষিত হয়নি। যা হয়েছিল তা সংরক্ষণের অভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাক্ষাৎকারে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে তাঁর চিত্র সংগ্রহের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে শিল্পী রফিক আহমদকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

তৎকালীন খুলনা জেলার, বর্তমানের সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার কাটাখালী গ্রামে ১৯৪৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী রফিক আহমেদ। তাঁর বাবার নাম হাজি মুজিবর রহমান সানা এবং মায়ের নাম জহুরান বিবি। বাড়িতে দাদার আমল থেকেই লাইব্রেরি ছিল। শিল্পশিক্ষা ও সুকুমার চিন্তার বিকাশে এই লাইব্রেরির অবদানই সবচেয়ে বেশি। সাধারণ গ্রাম্য পরিবেশে এমন সমৃদ্ধ লাইব্রেরি নিঃসন্দেহে রফিক আহমেদের পূর্বসূরিদের রুচি, জ্ঞান ও চেতনার সমৃদ্ধতার পরিচয় বহন করে। পরিবার হিসেবেও গ্রামের সম্ভ্রান্ত। কারণ গ্রামের প্রশাসক ও সম্মানিত ব্যক্তি হলেন চেয়ারম্যান। তাঁর চাচা ছিলেন চেয়ারম্যান এবং বাবা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার।

রফিক আহমেদের পারিবারিক লাইব্রেরির নাম ছিল ‘দ্য কায়দি আজম পাবলিক লাইব্রেরি’। ১৯৭২ সালে এই লাইব্রেরির নাম হয় ‘বঙ্গবন্ধু সাধারণ পাঠাগার’। বর্তমান অবধি এই লাইব্রেরি বিদ্যমান আছে। রফিক আহমেদের স্মৃতিচারণা[২] থেকে জানা যায়, ছেলেবেলা থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অন্যান্য সাহিত্যের বই পাঠ করতেন। আনন্দের খোরাক মিটত লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত জয়নুলের ‘দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা’ ও ‘ইলাস্ট্রেশন’ দেখে ছবি আঁকায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ওমর খৈয়াম, মেঘদূতের ইলাস্ট্রেশন

Dhaka University Institutional Repository

দেখে মুগ্ধ হতেন। সমৃদ্ধ এই লাইব্রেরিতে ছিল ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। ইয়োরোপ ও ইন্ডিয়ার অসংখ্য পত্রপত্রিকা। রফিক আহমেদ প্রাইমারি স্কুলে পড়া অবস্থায় এসব পত্রপত্রিকা, বইপুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করে ছবি দেখতেন। অর্থাৎ ছবি দেখার একটা চোখ তৈরি হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। এই লাইব্রেরি সূত্রে আধুনিক শহরের গ্যালারিনির্ভর প্রদর্শনী না দেখেও শিল্পকর্মের আদল সম্পর্কে পরিতৃপ্ত হয়েছেন পাঠাগারের সহায়তায়।

শিল্পী রফিক আহমেদ কাটাখালী প্রাইমারি স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন এবং 'গোবরদাড়ী হাইস্কুল'-এ ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর চলতে থাকে তাঁর স্কুল পরিবর্তনের পালা। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পড়েছেন 'চাম্পাফুল হাইস্কুল'-এ। এই স্কুলে পড়তেন হোস্টেলে থেকে। হোস্টেলের পরিবেশ ও খাওয়া-দাওয়ায় খাপ খাওয়াতে না পারায় আবার স্কুল পরিবর্তন করে নবম শ্রেণিতে পাঠ নেন 'আশাশুনি হামিদ আলী হাইস্কুল'-এ। এখানেও মন বসেনি। তিনি 'প্রতাবনগর হাইস্কুল'-এ পড়েছেন তিন-চার মাস। উল্লিখিত স্কুলগুলো আশাশুনি থানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এবার তিনি তালা থানার 'আর.কে.বি.কে হরিশ্চন্দ্র ইনস্টিটিউশন' (R.K.B.K.H.C Institution)-এ ভর্তি হন। প্রথমে বোনের বাড়িতে, পরে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন। এই স্কুল থেকে ১৯৬৮ সালে এস.এস.সি পাস করেছেন। বারবার স্কুল পরিবর্তনের অভিজ্ঞতায় তিনি নানান পরিবেশ ও বিভিন্ন রকম বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যা তাঁর জীবনাভিজ্ঞতায়, মানুষের চরিত্র চিত্রণে ও বন্ধুত্বের বৈচিত্র্য রসাস্বাদনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। তিনি স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন :

> গ্রাম্য প্রকৃতি ও পরিবেশ আমার ভালো লাগতো। বাড়ির সাথে নদী, নদীতে মাছ ধরা, জেলে-জেলেনির অভিব্যক্তি, গাছপালা, রাখাল, গরুর পাল সবকিছু দেখে বড়ো হয়েছি। বেশি মাত্রায় নাড়া দেয় নৌকা। ধান কাটার সময় হলে এবং ফসল তোলার যাবতীয় কাজে দূরদেশ (ফরিদপুর অঞ্চল) থেকে কৃষকরা আসতো কিষাণ দিতে। তারা যেসব নৌকায় আসতো তা ছিল খুবই সুন্দর নক্সাখচিত। পিতলের অলংকরণে নৌকার গলুই সাজানো থাকতো। ধান কিনতে আসা ছই দেয়া নৌকায়ও থাকতো নানান রূপ।[৩]

শিল্পী রফিক আহমেদ এই নৌকার অলংকরণ দেখে বিমোহিত হতেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিতে গ্রামবাংলার নদী, নৌকা, মাছ, জেলে, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঘরবাড়ি উঠে এসেছে।

অতএব একথা স্পষ্ট যে, প্রাইমারি স্কুল ও হাইস্কুলে পড়ার সময়ে লাইব্রেরির জ্ঞানার্জন ও প্রকৃতির নিবিড় পাঠে রফিক আহমেদের মনন গড়ে উঠেছিল। প্রাইমারি ও হাইস্কুলে পড়ার সময় তিনি প্রকৃতির রূপ-মহিমা দেখে নীরব থাকেননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকতেন। তিনি বলেন, 'আইয়ুব খান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লিয়াকত আলী এরূপ অনেক ব্যক্তির পোর্ট্রেট করতাম, এসব পোর্ট্রেট বাঁধাই করে বৈঠক ঘরে ঝুলিয়ে রাখতাম।'[৪] পোর্ট্রেট ছাড়াও তিনি নদী-নৌকা, গ্রামের বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকার অঙ্কন-কৌশল কেউ কখনো শেখায়নি। রঙের দোকানে গিয়ে নিজে রং সংগ্রহ করতেন। দোকানে ছবি আঁকার একমাত্র রং ছিল জলরং। তাও আবার কেক কালার। তা দিয়েই নিজের নিয়মে আঁকতেন। তিনি বলেন, 'স্কুলের হোমওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকতাম দেখে দেখে। এরপর না দেখেই মানচিত্র আঁকতে পারতাম। এভাবে মানচিত্র আঁকতে আঁকতেই ছবি আঁকার হাতেখড়ি।'[৫]

Dhaka University Institutional Repository

অদম্য ইচ্ছা থাকলে নিজেই কৌশল সৃষ্টি করা যায়, তার প্রমাণ হলো তিনি ছবি আঁকার ট্রেসিং পেপার তৈরি করেছেন অভিনব পন্থায়। সে সময় গ্রামে প্রত্যেকেই অধিক পরিমাণে সরিষার তেল মাথায় নিত। রফিক আহমেদ সাদা কাগজ তৈলাক্ত মাথায় ঘষে স্বচ্ছ রঙের ট্রেসিং তৈরি করতেন। একই ট্রেসিং ব্যবহার করে ছবি আঁকতেন। পরে না দেখে মন থেকে আঁকতেন। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় ১৯৬৬ সালে R.K.B.K.H.C Institution থেকে বার্ষিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ জলরং পুরস্কার অর্জন করেন এবং ১৯৬৭ সালে অর্জন করেন শ্রেষ্ঠ ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং পুরস্কার।

দুই

ছবি আঁকায় ঝোঁক থাকলেও এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তা তিনি জানতেন না। ১৯৬৮ সালে R.K.B.K.H.C Institution থেকে এস.এস.সি পাস করার পর জুট টেকনোলজি বিষয়ে পড়ার উদ্দেশে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় আসাও অন্য এক অভিজ্ঞতা। গ্রাম্য পরিবেশের যে ছেলেটি এত দিন নদী-নৌকা, গাছপালা ও মাছ ধরার রাজ্যে বাস করতেন, যিনি এখনো গাড়িতেও চড়েননি, তিনি হঠাৎ করে বড়ো ভাই কে.এম আব্দুল লতিফের ব্যবস্থাপনায় প্লেনে করে ঢাকায় আসেন। তেজগাঁওয়ের জুট টেকনোলজিতে ভর্তি হবার জন্য রিটেন পরীক্ষায় অঙ্ক বিষয় খারাপ হওয়ায় রেজাল্ট জানারও প্রয়োজনবোধ করেননি। যে উদ্দেশে ঢাকা এসেছেন তা সফল না হওয়ায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে জয়নুল আবেদিনের শিল্পতীর্থে অর্থাৎ তৎকালীন ‘ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট্’-এ (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) এসে ঘোরাঘুরি করেন। চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা পরিবেশে ছঁবি আঁকতে দেখে চারুকলায় পড়ার বিষয়ে ভাবেন। ১৯৬৮ সালের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রি-ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন বর্তমান সময়ের বিখ্যাত শিল্পী শাহাবুদ্দীন, অলক রায়, মমিনুল ইসলাম রেজা, এ.কে.এম কাইয়ুমসহ আরো অনেকে। প্রি-ডিগ্রি কোর্সে তিনি স্কেচ, ডিজাইন, সিরামিক মডেলিং, কাঠের কাজ, পেনের কাজ ও জলরং শিখেছেন। তবে জলরঙে কাজ করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন রফিক আহমেদ। প্রি-ডিগ্রি সমাপ্ত হলে তিনি ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগে এক বছর ক্লাস করেন। এরপর ওরিয়েন্টাল বিভাগে চলে যান। ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ ছেড়ে কেন ওরিয়েন্টাল বিভাগে চলে গেলেন—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন :

> প্রথমত, ওরিয়েন্টালের জলরঙে কাজ করতে পছন্দ করতাম। দ্বিতীয়ত উপরের ক্লাসের ছাত্র আব্দুস সাত্তার (বর্তমানে অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার) চারুকলায় পড়েও পরিপাটি হয়ে চলতেন, হাতে-গা-এ কোন রং লাগতো না। তাকে দেখে তার বিভাগে (ওরিয়েন্টাল আর্ট) পড়তে ইচ্ছা হলো। তৃতীয়ত, শিল্পী-শিক্ষক আমিনুল ইসলাম স্যার ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ ছেড়ে প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক হওয়ায় আমি তার টানে তার সাথে সাথে প্রাচ্যকলা বিভাগে পড়তে গেলাম।[৬]

১৯৭২ সালে প্রাচ্যকলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের একমাত্র মেধাবী ছাত্র আব্দুস সাত্তার। শিক্ষক হচ্ছেন হাশেম খান ও আমিনুল ইসলাম। শিক্ষক দুজনই ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগে পাশ্চাত্য একাডেমিক ঘরানার শিক্ষা নিয়েছেন। সুতরাং প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা যথার্থ দিকনির্দেশনা পাননি। মেধাবী ছাত্র আব্দুস সাত্তার বই-পুস্তক পড়ে এবং পত্রপত্রিকার প্রাচ্যরীতির চিত্ররচনা দেখে ওয়াশ টেকনিক রপ্ত করে

Dhaka University Institutional Repository

চারুকলায় প্রাচ্যরীতির চিত্র অঙ্কনে ব্যাপক সাড়া জাগালেন। আব্দুস সাত্তারের কাজ দেখেই রফিক আহমেদ প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া *Art in Pakistan* গ্রন্থে পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পী আব্দুর রহমান চুঘতাইয়ের ছবিগুলো দেখে ওয়াশ পদ্ধতির টেকনিক রপ্ত করেছেন। প্রাচ্যকলা বিভাগে পড়াশোনার সময় সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষক-শিল্পী আব্দুর রাজ্জাকের অধীনে ভাস্কর্য শিখেছেন।

রফিক আহমেদ প্রাচ্যরীতিতে ছবি এঁকে সকলের মন জয় করেছিলেন। এ সময়ে তার ছবি আঁকার বিষয় ছিল গ্রামের মেয়েদের দৈনন্দিন কর্মগুলো। একটি গ্রাম্য মেয়ে বসে আছে। গ্রামের মহিলারা ঘরের বারান্দায় বসে গল্প করছে, চুল বাঁধছে, প্রকৃতি অঙ্কনে উঠে এসেছে লাউ বা শিম গাছের মাচা, পাখি, খাঁচা অর্থাৎ বাল্য-স্মৃতিবিজড়িত গ্রামভিত্তিক বিষয়গুলোকে তিনি নান্দনিক অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি তাঁর মায়ের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের পাখি পুষতেন। ফলে শালিক, বক, কবুতর এবং পাখির খাঁচা তাঁর চিত্রে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু গ্রামের ছবিই নয়, নিজের দক্ষতাকে মজবুত করতে প্রচুর ল্যান্ডস্কেপ করেছেন ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে। সদরঘাট, জিঞ্জিরা, রায়ের বাজার, কমলাপুর রেলস্টেশন প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে অসংখ্য ল্যান্ডস্কেপ করেছেন। ফলে গ্রাম ও শহরের দৃশ্য সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্তমান অবধি আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ভালো ছবি আঁকার স্বীকৃতিও পেয়েছেন ছাত্রাবস্থায়। ১৯৭২–৭৩ সালের বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা বিভাগের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী। দৈনিক বাংলা, পূর্বাণী, চিত্রালী, ইত্তেফাক প্রভৃতি পত্রিকায় রফিক আহমেদের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয় এবং তাঁর ছবির ফটোগ্রাফ ছাপা হয়।

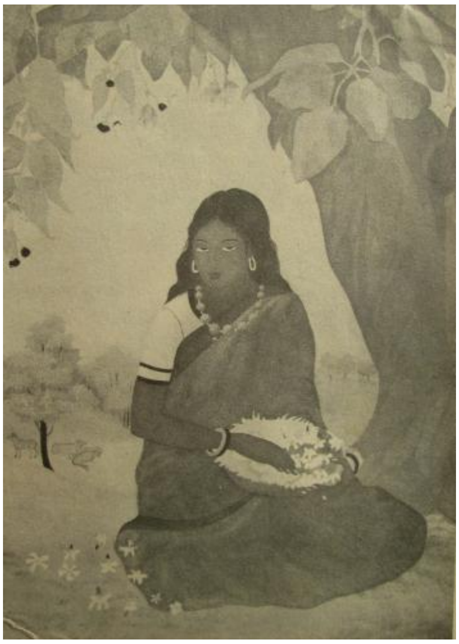

চিত্র ০১ : শেফালী ঝরা ফুল (পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি)
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৩

চিত্র ০২ : লেডি উইথ ফ্লাওয়ার
তেলরং, ১২১ × ৯১ সেমি, ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

রফিক আহমেদ ১৯৭৩ সালে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে বি.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ সময় পর্যন্ত শিল্পীর কাজে চুঘতাইয়ের কাজের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। ফিগারেটিভ প্রায় সকল কাজেই ড্রয়িং, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাত-পা, মুখ, চোখের আদল চুঘতাইয়ের কাজ দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

চিত্র ০৩ : ওয়েটিং-১
জলরং, ৫৫ × ৩৪ সেমি, ১৯৭৯

চিত্র ০৪ : ওয়েটিং-২
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৯

চিত্র ০৫ : খোঁপায় ফুল তোলা
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৮

তিন

বি.এফ.এ পাস করার পর অ্যাড ফার্মে ডিজাইনার পদে চাকরি নিলেন রফিক আহমেদ। একদিন চারুকলায় আমিনুল ইসলামের সাথে দেখা হয়। তিনি রফিক আহমেদকে বললেন, 'ঐ চাকরি ছেড়ে দাও। চারুকলায় যদি চাকরি করতে চাও তাহলে আগামীকাল এসে যোগদান করবে।'[৭] রফিক আহমেদ আমিনুল ইসলাম স্যারের কথামতো চাকরি ছেড়ে দিয়ে চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগে মৌখিক আদেশে যোগদান করেন। এ সময় তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রয়িং শেখাতেন। আমিনুল ইসলাম ১২টি পারটেক্স বোর্ড কিনে দেন মুরাল পেইন্টিং করার জন্য। রফিক আহমেদ কাজ করতে থাকেন। স্কলারশিপ পাওয়ায় শিল্পী আমিনুল ইসলাম ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং পড়ার পরামর্শ দেন এবং বলেন, ফিরে এসে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করবে। প্রস্তুতি চালাতে থাকেন উচ্চশিক্ষার। যেহেতু বাংলাদেশের চারুকলা চর্চার সর্বশেষ ডিগ্রি বি.এফ.এ সেহেতু এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জনের জন্য তাঁকে বিদেশে পড়তে যেতে হবে। ১৯৭৪ সালে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হলো। তিনি ইন্ডিয়ান স্কলারশিপ পেলেন। ইন্ডিয়ান স্কলারশিপে ভারতে পড়তে যাওয়ার পূর্বে জাপান সরকারের স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু বিলম্ব হওয়ায় যেতে পারেননি। এই সময় প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষক ছিলেন আমিনুল ইসলাম, হাশেম খান এবং সদ্য পাস করে যোগদান করা আব্দুস সাত্তার।

ইন্ডিয়ান স্কলারশিপ প্রাপ্তির পর উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি ভারতের বিখ্যাত 'M.S University of Baroda'তে এম.এফ.এ পড়ার জন্য মনোনীত হলেন। এখানে তিনি চারুকলা অনুষদের পেইন্টিং বিভাগে 'MURAL DESIGN' বিষয়ে শিক্ষা নেন। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক কে.জি সুব্রহ্মণ্যন। শিল্পী কে.জি সুব্রহ্মণ্যনের অধীনে তিনি মুরাল পেইন্টিংয়ের কাজ শিখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যচিত্ররীতির ধারার মুরাল চিত্র ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা। অজন্তা-ইলোরার পরম্পরার ধারাকে অবনীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ করের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মুরাল চিত্র বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুব্রহ্মণ্যন নন্দলালের ছাত্র। ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ঘরানার মুরাল চিত্রণে পারদর্শী সৎ গুরুর কাছে রফিক আহমেদ জয়পুরী ফ্রেসকো, ইতালিয়ান ফ্রেসকো ও হার্ডবোর্ডে এগ টেম্পারা, সিল্ক পেইন্টিংসহ বিভিন্ন মাধ্যমে চিত্র অঙ্কন করে তাঁর প্রিয়ভাজন হন। অনেক সুনাম অর্জন করেন। মুরালের জন্য জমিন তৈরি, প্রাকৃতিক রং ব্যবহারসহ টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। রফিক আহমেদের কাছে জানা যায়— কে.জি সুব্রহ্মণ্যন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মুরাল পেইন্টিংয়ের ওপর অধ্যাপনা করতে যেতেন। এই সময় বরোদার ফাইন আর্টস বিভাগের অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোর ভার তিনি নিতেন।[৮] সমসাময়িক সময়ে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগে বাংলাদেশ থেকে শিল্পশিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন হামিদুজ্জামান খান, মমিনুল ইসলাম রেজা, ফরিদা জামান, অলক আয়, আব্দুস শাকুর শাহ প্রমুখ। রফিক আহমেদ প্রাচ্যরীতির পরম্পরার বহু রীতি-পদ্ধতি রপ্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, 'অনেক পদ্ধতিতে কাজ করেছি। কিন্তু বাংলাদেশে এসে এসব পদ্ধতিতে চর্চা না করার ফলে এখন অনেক কিছুই ভুলে গেছি। যদি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যুক্ত থেকে চর্চাকে অব্যাহত রাখতে পারতাম তবে বাংলাদেশেও এসব পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করা সম্ভব হতো।'[৯]

রফিক আহমেদ কে.জি সুব্রহ্মণ্যনের তত্ত্বাবধানে *Mural Painting in India* শিরোনামে Dissertation করেছেন। তাঁর গবেষণায় ভারতের মুরাল পেইন্টিংয়ের ইতিহাস ও করণ-কৌশলের ধারাবাহিক বিবরণ সূত্রবদ্ধ হয়েছে। Dissertation-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> The mural painting is very old tradition of Indian art. It is prevalent both in rural and urban civilization of man as professional and non-professional practice. It has different technical and formal development in different societies and different region of the country. I have tried to introduce the various method and materials of different mural paintings and analysed their formal and stylistic elements. I have tried to bring into light all the old and new method and materials and old and new coming elements of mural work are analysed along with the illustrations.[১০]

উল্লিখিত ভূমিকায় তাঁর অভিসন্দর্ভের পরিধি ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তিনি তাঁর গবেষণায় যেসব টেকনিক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন সেসব টেকনিকে তাঁর ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল। তাই তাঁর এই গবেষণা নিঃসন্দেহে জাতীয় সম্পদ। ভবিষ্যতে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ হলে প্রাচ্যচিত্রকলার করণ-কৌশলে শিল্পীরা উপকৃত হবেন।

তিনি ভারতে বসে যে সমস্ত ছবি এঁকেছিলেন তার বিষয় ছিল 'বুদ্ধ লাইফ', 'শকুন্তলার গল্প'। কাজগুলো তিনি ওরিয়েন্টাল স্টাইলে করতেন। যেহেতু তাঁর চিত্র আঁকার বিষয় ছিল মুরাল ডিজাইন, সেহেতু কাজগুলোর মধ্যে ডিজাইনের প্রাধান্য থাকত। পেইন্টিংয়ের মধ্যে যেসব ফিগার ব্যবহার করতেন তা-ও করতেন ডেকরেটিভ মোটিভে। শিল্পীর পরবর্তীকালে জলরঙের যেসব কাজে ডেকরেটিভ বা ডিজাইনিক বিন্যাস লক্ষ করা যায় তার প্রেরণা মূলত মুরাল ডিজাইনে পড়াশোনারই ফল। সেই টেকনিককে তিনি জলরঙে ছবি আঁকায় নিজের মতো ব্যবহার করেছেন।

অধ্যাপক কে.জি সুব্রহ্মণ্যন বরোদা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। তবে রফিক আহমেদ যত দিন ছিলেন তিনিও তত দিন ছিলেন। রফিক আহমেদকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর কাজের প্রতিও খুশি ছিলেন। এমনকি তিনি চাইতেন রফিক আহমেদ ভারতেই থেকে যান। রফিক আহমেদ বলেন, 'কোর্স শেষ হলে আমাকে আসতে দিতে চাননি। বলেছিলেন এখানেই থেকে যাও। শিক্ষকতা কর। আর যেতে পার এক শর্তে যদি বাংলাদেশে গিয়ে কোন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা কর।'[১১] কে.জি সুব্রহ্মণ্যন বিদেশে দুই-তিন মাসের জন্য অধ্যাপনার কাজে গেলে, মুরাল পেইন্টিং বিভাগে যাঁরা মুরাল শিখতেন রফিক তাঁদের শেখাতেন।

রফিক আহমেদ M.S University of Baroda-তে পড়াশোনা করার সময় ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে 'ভারতের জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনী হয়েছিল মুম্বাইয়ের। ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে 'গুজরাট ললিতকলা একাডেমি'র বার্ষিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৭৫ সালের চারুকলা অনুষদের মুরাল পেইন্টিং অ্যান্ড ডিজাইন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেছেন।

চিত্র ০৬ : শকুন্তলার গল্প
সিল্কের ওপর ওয়াটার কালার
টেম্পারা, ৯১ × ৯১ সেমি, ১৯৭৫

চিত্র ০৭ : স্টোরি অব শকুন্তলা, মুরাল পেইন্টিং
সিল্ক, ৬০ × ১৫০ সেমি, ১৯৭৫

চিত্র ০৮ : রিং বদল
হার্ডবোর্ডে টেম্পারা
১২১ × ১২১ সেমি, ১৯৭৭

তিনি হার্ডবোর্ড অক্সাইড টেম্পারা ওয়াটার কালার টেম্পারা, সিল্কের ওপর এগ টেম্পারা প্রভৃতি মাধ্যমে এসব কাজ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল দেয়ালে মুরাল পেইন্টিংয়ের জন্য লে-আউট তৈরি করা। এসব কাজে তিনি মোগল মিনিয়েচার, কাংড়া পেইন্টিং, বাসুলি পেইন্টিংয়ের অনুরূপ কম্পোজিশন করেছেন। কখনো কখনো এসব ঘরানাকে মিশ্রিত করে নিজের মতো উপস্থাপন করলেও বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বকীয়তা আসেনি। তিনি শকুন্তলা সিরিজে অনেক কাজ করেছেন। ডেকরেটিভ এসব চিত্র অঙ্কন করলেও তিনি প্রকৃতি স্টাডি করেছেন এবং প্রকৃতির বিষয় নিয়ে জয়পুরী ফ্রেসকো, এগ টেম্পারা, খাগ কলমের স্কেচ করেছেন প্রচুর।

চিত্র ০৯ : ল্যান্ডস্কেপ, এগ টেম্পারা, ৯১ × ১৫২ সেমি, ১৯৭৫

চিত্র ১০ : ল্যান্ডস্কেপ, জয়পুরী ফ্রেসকো
৩০ × ৯১ সেমি, ১৯৭৪

চিত্র ১১ : স্কেচ, খাগ কলম ও কালি

তিনি খাগ কলমে যেসব স্কেচ করেছেন সেসব স্কেচ থেকে বিভিন্ন টেক্সচার ব্যবহার করে মুরাল চিত্রে ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়ে মুরালের বিভিন্ন মাধ্যম ও টেকনিকে চর্চা করেছেন। সেই চর্চা তাঁর পরবর্তী চিত্রকলার রং, ফর্ম, টেক্সচার গঠনে সহায়ক হয়েছে।

পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় শিল্পী রফিক আহমেদের কাজ প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তার সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে ২১ জুন, ১৯৭৭ সালে লিখিত সুব্রক্ষণ্যন লিখিত প্রশংসাপত্রে। তিনি লিখেছেন :

> Rafique has worked under my personal guidance and I have always found him a hard working, painstaking, dedicated young-man who takes his work seriously. He has a special decorative talent, and is capable of intricate craftsmanship; his graphic competence, as his drawings will show, is also considerable. If he continues his work with a proper sense of judgment he has bright future.[১২]

চার

১৯৭৮ সালে অ্যাডভারটাইজিং কম্পানিতে ডিজাইনার পদে চাকরি নেন। এ সময় ভারতে পিএইচ.ডি. করার জন্যও মনোনীত ছিলেন। কিন্তু স্কলারশিপে এম.এফ.এ শেষ করে তিন বছর পার না হলে নতুনভাবে স্কলারশিপ পাওয়া যায় না বিধায় তাঁর আর যাওয়া হয়নি। এ সময় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে এসে নিজে কাজ করতেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করতেন। প্রাচ্যকলা বিভাগে মুরাল পেইন্টিং বিষয় খোলার জন্য শিক্ষক হাশেম খান রফিক আহমদকে বাজেটসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব তৈরি করে জমা দিতে বলেন। রফিক আহমেদ তাঁর কথামতো প্রস্তাবনা তৈরি করেন। এ প্রস্তাবনায় মুরালের উপকরণ চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী সময়ে এটা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই তাঁর শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন, ভারত থেকে নতুন মাধ্যমে যা শিখেছিলেন তা শেখানোর স্বপ্ন মাটি হয়ে যায়। তবে শিক্ষক হতে না পারলেও শিল্পী হবার বাসনা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, 'শিক্ষক হবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় আমার জেদ বেড়ে গিয়েছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি এমন ছবি আঁকব যা কেউ আঁকেননি এবং পৃথিবীর লোক আমার কাজ দেখে আমাকে চিনবে।'[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২ : ইয়াং লালন
জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি, ১৯৮৬

চিত্র ১৩ : Story of Cowboy, জলরং
৩৭ × ২৮ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ১৪ : Dream of Fisherman
টেম্পারা, ৫৬ × ৩৭ সেমি, ২০০১

রফিক আহমেদ নিজের শিল্পভুবনে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছেন জীবন নির্বাহের দৈনন্দিন চাকরির ফাঁকে। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কেয়ার বাংলাদেশে কাজ করেছেন Chief Artist come office Assistant হিসেবে। অফিশিয়াল কাজ, ডিজাইন, পোস্টার ডিজাইন ও নানান ডিজাইনের কাজের ফাঁকে তাঁর ছবি আঁকা চালিয়েছেন। একটা জীবিকা নির্বাহের কাজ অন্যটা একান্ত শিল্পপিপাসায় মনের আনন্দে ছবি আঁকা। এরপর ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ডিজাইনার পদে যোগদান করেন এবং ২০০৭ সালে সিনিয়র ডিজাইনার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি জীবনে তিনি নিয়মিত ছবি এঁকেছেন, প্রদর্শনী করেছেন। যুক্ত আছেন 'সেঁজুতি' ও 'সমকাল' শিল্পগোষ্ঠীর সাথে। এসব গোষ্ঠীর নিয়মিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ছাড়াও 'সাজু আর্ট গ্যালারি', 'শিল্পাঙ্গন', 'চিত্রক', 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর', 'হক আর্ট গ্যালারি', 'গ্যালারি টোন', 'বেঙ্গল গ্যালারি' প্রভৃতি গ্যালারির বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া ২০০৫ সালে 'ডিভাইন' গ্যালারিতে *My Country* শিরোনামে একক প্রদর্শনী করে সুনাম অর্জন করেন। ২০০৬ সালে কোরিয়াতে Asia International Salon প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

রফিক আহমেদ ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তৎপরবর্তী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এশীয় চারুকলার বহু প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ প্রশংসা পেয়েছে।

সরকারি কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেও তিনি ইতি টানেননি তাঁর কর্মজীবনের। তিনি শান্ত-মরিয়ম ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Fundamental in Art and Design' বিভাগে প্রভাষক পদে ২০০৯ সাল থেকে কর্মরত আছেন। যে শিক্ষকতা তিনি শিল্পী জীবনের প্রথম পর্যায়ে করতে চেয়েছিলেন তা এবার সরকারি চাকরির অবসর-পরবর্তী জীবনে করছেন। বর্তমানে আরো যুক্ত আছেন 'বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এ ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হয়ে। তিনি 'জহুরান আর্ট ইনস্টিটিউট'-এর

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। এ ছাড়া Bangladesh Society of Oriental Art-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

পাঁচ

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনায় শিল্পী রফিক আহমেদের ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এতে শিল্পীজীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তাঁর মননশৈলীর দিকনির্দেশনা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে শিল্পী রফিক আহমেদের শিল্পকর্মের গুণাগুণ ও প্রাচ্যরীতির ধারায় তাঁর অবদান মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করা হবে। রফিক আহমেদের কাজের বিষয় প্রসঙ্গে শিল্পী আমিনুল ইসলাম লিখেছেন :

> রফিক প্রাচ্য ঘরানার আঁকিয়ে হলেও, সে ওই অঙ্কন কৌশলের বৃত্ত থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে। ময়মনসিংহ গীতিকার মতো লোক চরিত্র যেমন মহুয়া, মলুয়া তার চিত্রকলার অন্যতম চরিত্র। আবার আবহমান বাংলার শাশ্বত জীবনের গল্পের দেখাও পাওয়া যায় তার কাজে। জেলে, জেলেনি, জাল, মাছ, কৃষক, শ্রমিক, রোম্যান্টিক মানব মানবী, পত্রপল্লবময় প্রকৃতির মধ্যে লোকায়ত বাংলার রূপরস অনুভব করা যায়। এমন সমৃদ্ধ বাংলার স্বপ্নই তো অবিরাম বুনে চলেছি আমরা।[14]

চিত্র ১৫ : King and Queen
জলরং, ২৮ × ১৫ সেমি, ২০০৩

চিত্র ১৬ : Summer Land
জলরং, ৩৭ × ২৮ সেমি, ২০০২

চিত্র ১৭ : Life of Bengal
জলরং, ৩৭ × ২৮ সেমি, ১৯৯৮

শিল্পী আমিনুল ইসলাম রফিক আহমেদের শিল্পের বিষয়চিন্তা প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন। কারণ রফিক আহমেদের শৈশব কেটেছে সাতক্ষীরার নদী উপকূলে। মাছ ধরা তাঁর শখ ছিল। গ্রামের শ্যামলঘন পরিবেশে অবাধ বিচরণ করেছেন। সেসব স্মৃতিবিজড়িত গ্রামবাংলার দৃশ্যকেই তিনি তাঁর ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন। বিষয় হিসেবে নদী, নৌকা, বক, মানব-মানবী, বিভিন্ন ঋতুর নৈসর্গিক শোভা—ডিজাইনিক বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। তবে জলরঙের যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তা প্রাচ্যরীতির ঘরানার ওয়াশ পদ্ধতির নিজস্ব ব্যাপার। অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের জ্যামিতিক ফর্মের মধ্যে হালকা থেকে গাঢ় কিংবা গাঢ় থেকে হালকা রঙের গ্রেডেশনে তা উপস্থাপন করেছেন। ফ্লাটধর্মী প্রাচ্যরীতির রং ব্যবহারের মধ্যে তিনি বিভিন্ন টেক্সচার ব্যবহার করেছেন সাদা অংশ রেখে দিয়ে। রং ব্যবহারের কৌশলে ফর্ম ও ফিগারগুলোর মধ্যে ত্রিমাত্রিক অনুভূতিও লক্ষণীয়। গতানুগতিক প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির সাথে ডিজাইন ও কিউবিক ফর্ম ব্যবহার করে

Dhaka University Institutional Repository

রফিক আহমেদ পাশ্চাত্যের কিউবিজমকে প্রাচ্যের ওয়াশ পদ্ধতির সাথে সমন্বয় করেছেন। এই সমন্বয় আমরা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজে প্রথম ব্যবহার করতে দেখেছি। তবে রফিক আহমেদের উপস্থাপন সম্পূর্ণ নিজস্ব আবিষ্কার, নিজস্ব ঢঙে। এজন্যই আমিনুল ইসলামের মূল্যায়নে সে প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়েছে। তিনি তাঁর কাজে প্রাচ্য ঘরানার কৌশলে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ লিখেছেন :

> রফিকের ছবিতে প্রধানত দুজন নায়িকার উপস্থিতি দর্শকের কল্পনার চোখে স্পষ্টতর হতে থাকে। এ দুজনই উপমহাদেশের ধ্রুপদী সাহিত্যের অঙ্গনের চরিত্র। তাদের একজন শকুন্তলা, অন্যজন রাধা। শকুন্তলা বৃক্ষের শুশ্রূষা করতেন। তার মধ্যে ছিল বৃক্ষের কল্যাণী স্বভাব। তাই এক পর্যায়ে বৃক্ষ ও নারী অভিন্ন সত্তায় রূপ নেয়। নারী ও প্রকৃতিকে এই অভিন্ন সূত্রে চিত্রিত করার মধ্যে এ শিল্পীর বিশেষ শৈল্পিক পারমিতা লক্ষ্য করা যায়। নিসর্গের অনাবিল রূপ নারীর মুখে পর্যবেক্ষণ করেছেন রফিক। অপরপক্ষে, তার ছবিতে প্রেমানুভূতির প্রতিনিধি রাধাও আছেন। নারী যেখানে প্রেমের প্রতিনিধি সেখানে স্বভাবতই পরিবেশটা অপেক্ষাকৃত বেশি রঙিন। এ শিল্পীর স্পেস সব সময়ই রঙিন ও অলংকারবহুল। শিল্পী হয়তো নিজের মনের ভেতরে যে রূপতৃষ্ণা আছে তা নায়িকার নার্সিসিস্ট উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নার্সিসিজম বা আত্মরূপমুগ্ধতা রফিকের বিষয়ের একটা প্রধান মাত্রা। এ কারণে দেখতে পাই নারী আয়নায় মুখ রেখে স্থির হয়ে আছে। শকুন্তলা ও রাধা ছাড়া আরও এক অভিব্যক্তির নারীরূপ চিত্রিত করেছেন শিল্পী। এই নারী সুবিখ্যাত মৈমনসিংহ গীতিকার রোমান্টিক নায়িকাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকশিল্পে নারীর যে আর্কিটাইপ আছে তার সঙ্গে স্পষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় শিল্পীর কাজে।[১৫]

ছয়

রফিক আহমেদ বলেন, তিনি তাঁর ছবিতে গ্রামবাংলার দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কাহিনি এবং বাংলার নিসর্গের রূপকে মূর্ত করেছেন। যেখানে শকুন্তলা, রাধা কিংবা মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাদের অভিব্যক্তি কল্পনা করে চিত্র রূপায়ণ করেননি। গ্রামবাংলার নারীদের তিনি যেভাব দেখেছেন সেভাবেই তুলে ধরেছেন তাঁর ছবিতে।[১৬] রঙের ব্যবহারে অতিরঞ্জনতাও অস্বীকার করেন। তিনি কখনো ডিজাইনের প্রয়োজনে, কখনো কম্পোজিশনের প্রয়োজনে রং ব্যবহার করেছেন।[১৭]

তাঁর ছবির জেলে-জেলেনি, রাখাল, প্রণয়রত নারী-পুরুষ, শ্রমিক, কৃষক, গৃহবধূ, গায়ক-গায়িকা, বাউল-কন্যা সবার পোশাকে গ্রামের শাড়ি, লুঙ্গি, পাগড়ি ব্যবহার করেছেন। গ্রামের কারুশিল্পের নানান উপকরণ লক্ষ করা যায়। কলসি, পাখা, জানালা, আসবাবপত্র, বাঁশি, একতারা, তা-ও এঁকেছেন ডিজাইন করে। ছবিতে ব্যবহৃত ফিগারগুলোর গায়ের রং কল্পনায় যখন যেভাবে মনে হয়েছে সেভাবেই রং দিয়েছেন।

চিত্র ১৮ : বাংলার বাউল, ক্যানভাসে জলরং ৮১ × ৮১ সেমি, ২০১৩

চিত্র ১৯ : লাভার, ক্যানভাসে জলরং ৮১ × ৮১ সেমি, ২০১৩

চিত্র ২০ : লেডি উইথ বার্ড ক্যানভাসে জলরং ৮১ × ৮১ সেমি, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী রফিক আহমেদ করণ-কৌশলে এনেছেন ভিন্নমাত্রা। প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির রং কাগজের পাশাপাশি ক্যানভাসে দেখা যায়। ক্যানভাসে জলরঙের এই ব্যবহার তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন। ভারতে মুরাল পেইন্টিং ও টেম্পারা করতে গিয়ে যেসব করণ-কৌশল শিখেছিলেন তা নিজের গবেষণায় নতুন রূপে প্রয়োগ করেছেন ক্যানভাসে। এ বিষয়ে তিনি সার্থক। বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় তাঁর এই উদ্ভাবন প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। নব্য-বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা অবনীন্দ্র উদ্ভাবিত ওয়াশ পদ্ধতিতে চিত্র রচনা করেছেন কাগজের ওপর। ক্যানভাসের ওপর জলরঙের প্রয়োগ সম্পর্কে রফিক বলেন, 'তেলরঙের অনেক দাম, খরচ বাঁচাতে জলরং ব্যবহার করে ছবি এঁকেছি। রং বাঁচাতে ছবির জমিনে সাদা অংশ ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস করেছি। তাই আমার সব ছবিতে সাদা স্পেসের ব্যবহার বেশি। জলরং দিয়ে তেলরঙের ইফেক্ট তৈরি করাও আমার উদ্দেশ্য ছিল।'[১৮]

ক্যানভাসে জলরং করার জন্য তিনি ক্যানভাসকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করে নেন। মুরাল পেইন্টিংয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জমিন তৈরি করেন। প্রথমে তিনি শিরীষ গাম সূর্যের আলোতে গলিয়ে নেন। এরপর জিংক অক্সাইড, শিরীষ গাম, লিনসেট তেল, তুঁতে সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে শক্ত দলা করে তৈরি করেন। এরপর মেশানো অক্সাইড একটু একটু পানি দিয়ে ধীরে ধীরে তরল করে নিয়ে ফ্লাট ব্রাশ দিয়ে ব্যবহার করেন। প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিকবার ব্যবহার করেন। ক্যানভাসে রাফ স্পেস থাকলে শিরীষ পেপার দিয়ে ঘষে নেন। ঘষার পর পুনরায় জিংক অক্সাইডের প্রলেপ দেন। এরপর সরাসরি ড্রয়িং করে ধীরে ধীরে ক্যানভাসে জলরং লেপন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে ছবির রং নষ্ট হয় না এবং কোনোরূপ ফাঙ্গাস ধরে না। তাঁর ছবিতে লাল রঙের আধিক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রঙের টিউবে এই রং বেশি থাকত তাই ছবি আঁকতে লাল রংকে বেশি ব্যবহার করতে করতে এই রঙের প্রতি দুর্বলতা এসে গেছে। এজন্যই ছবিতে এই রঙের আধিক্য বেশি।'[১৯]

চিত্র ২১ : Fisherman with Lover
জলরং ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০০৪

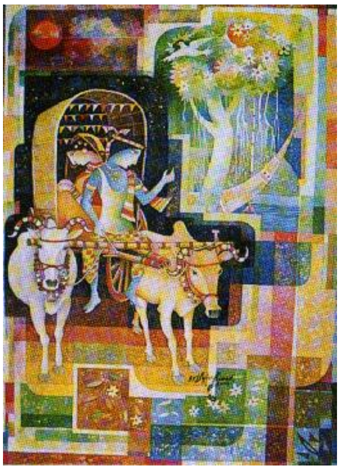
চিত্র ২২ : নতুন জীবন, জলরং
৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০০৪

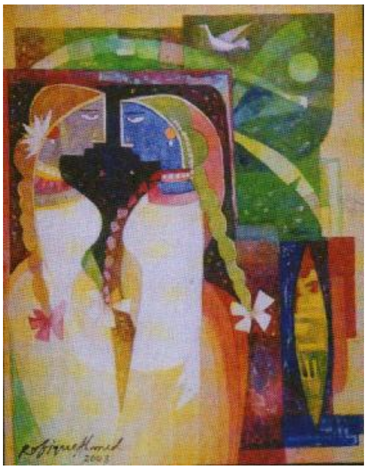
চিত্র ২৩ : দুই বন্ধু, কাগজে জলরং
৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০০৩

রফিক আহমেদের কাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য মিনিয়েচার-শৈলী। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় মিনিয়েচার-শৈলীতে তাঁর বেশির ভাগ কাজ সাজিয়েছেন। মুরাল সাধারণত বৃহৎ পরিসরে হয়। মুরাল করতে গিয়ে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

যে লে-আউট চিত্রণ করেন তাও একেকটি চিত্র। এসব কাজ করতে গিয়েই মিনিয়েচার কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। তিনি মিনিয়েচার শিল্পশৈলীর মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রিত করেছেন। বলা যায়, মোগল আমলে যে মিনিয়েচার চিত্রের উদ্ভব সেই চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন তাঁর কাজে। ছোটো পরিসরে গ্রামবাংলার গল্প চিত্রিত হয়েছে তাঁর ক্যানভাসে।

জ্যামিতিক ফর্মের নানান বিন্যাসে স্পেস তৈরি করেছেন। গ্রামবাংলার নিসর্গবেষ্টিত প্রকৃতির মাঝে কর্মময় মানুষের আনন্দমুখর অভিব্যক্তি প্রকাশ হয়েছে তাঁর চিত্রে। শিল্পীর রঙিন চোখ আবহমান বাংলার রূপ সৃজন করেছে মায়াবী রঙের সুষম রসায়নে।

চিত্র ২৪ : শিরোনামহীন, জলরং
২৩ × ২৩ সেমি, ২০০৩

চিত্র ২৫ : জ্যোৎস্না রাত, ক্যানভাসে জলরং
২৩ × ২৩ সেমি, ২০০০

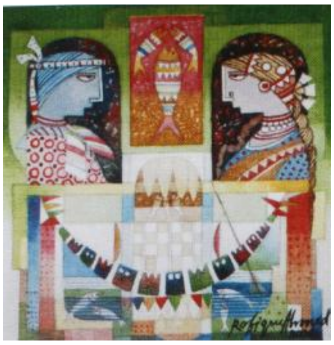

চিত্র ২৬ : শিরোনামহীন
২৩ × ২৩ সেমি

জ্যামিতিক ফর্ম এবং আর্কিটেক্সচারাল ফর্ম ব্যবহার রফিক আহমেদের প্রতিটি কাজের বৈশিষ্ট্য। জ্যামিতিক ফর্ম ব্যবহারের নেপথ্যে প্রেরণা হচ্ছে দীর্ঘদিন বিটিভিতে সেট ডিজাইনের কাজের অভিজ্ঞতা। কর্মজীবনে যে শিল্প করেছেন তার প্রভাবে কাজে এসেছে ডিজাইনিক ব্যবহার। কর্মজীবনে সিন পেইন্টিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছেন। অক্সাইড অ্যাক্রেলিক ব্যবহার করে বিশ-ত্রিশ ফুট দৈর্ঘের দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন। তাঁর সাক্ষ্য মতে, পাঁচ-ছয় হাজার কাজ আছে বিটিভিতে। এ ক্ষেত্রে ভিজ্যুয়াল মিডিয়াকে নান্দনিক রূপ দানে তাঁর অবদান অপরিসীম।

রফিক আহমেদের উদ্ভাবনী শক্তির অন্য আরেকটি পরিচয় হলো—ক্যানভাসে সুতার কাজ। বিভিন্ন রঙের সুতা ক্যানভাসে সেলাই করে ভরাট করে দেন। জ্যামিতিক ফর্মের পরিকল্পিত অংশগুলো রঙের পরিবর্তে সুতা ব্যবহার করেন। এরপর বাকি অংশগুলো জলরং দিয়ে ছবির কাজ শেষ করেন।

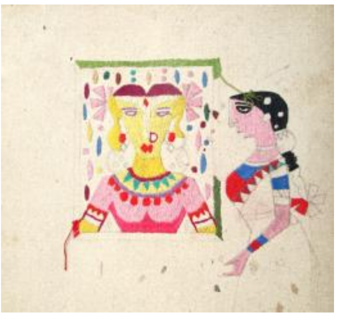

চিত্র ২৭ : ক্যানভাসে সুতার কাজ (অসমাপ্ত), মিশ্র মাধ্যমের জন্য প্রস্তুত
২৩ × ২৩ সেমি

চিত্র ২৮ : লেডি উইথ জার, ক্যানভাসে মিশ্র মাধ্যম (সুতার কাজ)
২৩ × ২৩ সেমি

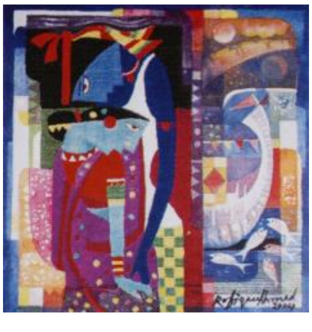

চিত্র ২৯ : রিভারসাইড, ক্যানভাসে মিশ্র মাধ্যম (সুতার কাজ)
২৩ × ২৩ সেমি

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী রশিদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রি দেখে তিনি ক্যানভাসে সুতার কাজ করতে উৎসাহী হয়েছেন। রফিক আহমেদের এই কাজে তাঁর ধৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামবাংলার নকশিকাঁথা কিংবা সেলাইয়ের কাজকে তিনি শিল্প মর্যাদার পেইন্টিংয়ের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। চারু ও কারুশিল্পের সমন্বয় করে তিনি বাংলার চিত্রকলায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তাঁর টেকনিকে যে শ্রমের সাধনা পরিলক্ষিত হয়েছে তা শিল্পীর অভূতপূর্ব ধৈর্যশক্তির পরিচয় বহন করে। যাকে চিত্রে কারিগরি বিন্যাসের নান্দনিক উপস্থাপনার দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বলা যায়, গ্রামবাংলার হস্তশিল্প অর্থাৎ বাংলার ঐতিহ্য, গ্রাম্য নারীদের অবসরকালীন সেলাই শিল্পকে চিত্রকলায় সংযুক্ত করে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রফিক আহমেদের ক্যানভাসে জলরং চিত্র ও সুতার ব্যবহার নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার অন্যতম মাধ্যম মুরাল। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চেষ্টায় বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনে এই মুরাল চিত্র বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। শিল্পী রফিক আহমেদ বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরাল বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন। এ মাধ্যমে অসংখ্য কাজও করেছেন। তবে ফ্রেসকো মাধ্যমের মুরাল না করে করেছেন টাইলস দিয়ে; যাকে মোজাইক পেইন্টিং বলা যায়।

১৯৭৯ সালে জয়দেবপুরে কেয়ার সংস্থায় B.A.D.C ভবনে মুরাল পেইন্টিং করেছেন। এই পেইন্টিংয়ের মধ্যেও তাঁর চিত্রকলার রীতি অনুসৃত হয়েছে।

চিত্র ৩০ : মুরাল (মোজাইক পেইন্টিং), ১৫২ × ৩৩৫ সেমি, ১৯৭৯

রফিক আহমেদ ১৯৮৭ সালে সায়েদাবাদ 'দরবার শরিফ'-এ মুরাল চিত্র করেছেন। এ ছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে মুরাল করেছেন। পরিশ্রমী ও সদা যত্নশীল শিল্পী প্রাইভেট বাসভবনে যেসব মুরাল করেছেন তার লে-আউটকে একেকটি চিত্রের মর্যাদা দেয়া যায়। এসব চিত্রে বাংলার প্রাচ্য-ঐতিহ্যের মোগল মিনিয়েচার চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মুরাল পেইন্টিং, মোজাইক পেইন্টিং ছাড়াও উড মেটাল, টেরাকোটা, ট্যাপেস্ট্রি অ্যান্ড মোজাইক সমন্বয়ে পেইন্টিং করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩১ : ১৯৮৫ সালে অঙ্কিত মোজাইক পেইন্টিংয়ের লে-আউট

শিল্পী রফিক আহমেদ মুরাল করার জন্য লে-আউট করতেন। এসব লে-আউট একেকটি সার্থক মিনিয়েচার চিত্র। জলরঙে অঙ্কিত এসব লে-আউট পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসেবেই মূল্যায়ন করা সম্ভব।

চিত্র ৩২ : বিজয় উল্লাস (মুরাল পেইন্টিংয়ের জন্য লে-আউট), ৩০ × ১২০ সেমি, ১৯৮৫, চিত্রটি শিল্পকলা একাডেমিতে *বিজয় দিবস চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৮৭*-তে প্রদর্শিত হয়

চিত্র ৩৩ : বাংলাদেশের জীবনকাহিনি, জলরং (মিশ্র মাধ্যমে মুরাল করার জন্য), ২০ × ৫০ সেমি

সাত

শিল্পী রফিক আহমেদের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

(১) ক্যানভাসে জলরঙে ছবি আঁকা বাংলার চিত্রকলায় নতুন সংযোজন।

(২) ক্যানভাসে সুতা ও জলরং ব্যবহার করে গ্রামবাংলার নারীদের সেলাইয়ের কাজের নতুন মাত্রা দিয়েছেন।

(৩) বাংলার মিনিয়েচার চিত্রকলাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

(৪) গ্রামবাংলায় খেটে খাওয়া মানুষের জ্যামিতিক অলংকরণে উপস্থাপন করেছেন।

(৫) রিপ্রেজেনটেশনাল শিল্পভাষা অনুসরণ না করে নকশার ব্যকরণ মেনে শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

(৬) চারু ও কারুশিল্পকে সমন্বয় করে নতুন মাত্রা এনেছেন।

(৭) সার্থক ডিজাইনার। গ্রামবাংলার বিভিন্ন মোটিভ প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলায় ডিজাইনে ব্যবহার করেছেন।

(৮) খাগ কলমে স্কেচ, ইতালীয় ফ্রেসকো, জয়পুরী ফ্রেসকো অঙ্কনে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

(৯) বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা শেখাচ্ছেন।

(১০) যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুক্ত আছেন, সব জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতির শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিল্পী রফিক আহমেদ নানান মাধ্যমে মুরাল এঁকেছেন। এ ছাড়া সিল্ক পেইন্টিং, টেম্পারা, তেলরং, জলরং, মোজাইক পেইন্টিং ও টেরাকোটা করেছেন। যে মাধ্যমেই কাজ করেছেন, প্রাচ্যশৈলীর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে তাঁর কাজে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা চর্চায় তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. গবেষকের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৭ মে ২০১৩

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত, ঢাকা, ৭ জুন ২০১৩

৮. প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৭ মে ২০১৩

৯. প্রাগুক্ত

১০. Dissertation : *Mural Painting Techniques In India*, A Dissertation for M.A (Fine) mural painting 1977, Faculty of Fine Arts, M.S University of Baroda, P. i-ii

১১. প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৭ মে ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

১২. Maharaya Sayajirao University of Baroda-এর Faculty of Fine Arts-এর পেইন্টিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সুব্রহ্মণ্যন লিখিত প্রশংসাপত্র।

১৩. প্রাগুক্ত, ৭ জুন ২০১৩

১৪. আমিনুল ইসলাম লিখিত "আশীর্বাণী", First Solo Painting Exhibition, *My Country* Divine Art Gallery, Dhaka, 2005

১৫. মইনুদ্দীন খালেদ লিখিত "ভূমিকা", প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত, ১৭ জুন ২০১৩

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. প্রাগুক্ত

২০. মইনুদ্দীন খালেদ লিখিত "ভূমিকা", প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শওকাতুজ্জামান

অকালপ্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শওকাতুজ্জামান (১৯৫৩–২০০৫) নানা গুণে গুণান্বিত শিল্পীব্যক্তিত্ব। মুক্তিযোদ্ধা এই চিত্রশিল্পী বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা শিক্ষার খ্যাতিমান শিক্ষক। তিনি শিশুসাহিত্যিক, শিশুগ্রন্থ আলংকারিক, প্রাবন্ধিক এবং চিত্রসমালোক হিসেবেও পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষকতা করার পূর্বে তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন শিশুর মতো সরল ও হাস্যরসে দীপ্ত।

"আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুকে যাঁরা 'শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।'[১]—এ কথাটি শিল্পী শওকাতুজ্জামানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নন্দলালের যেসব গুণাবলির কারণে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষাগুরু ও মাস্টারমশাই হিসেবে খ্যাত ছিলেন, শিল্পী শওকাতুজ্জামানকে একই গুণাবলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রাচ্যকলা বিভাগের শিল্পশিক্ষা গুরু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি হাতে-কলমে শিল্পশিক্ষা দেয়ার চেয়ে ছাত্রদের চেতনায় ও মননে শিল্পী হওয়ার মন্ত্র পড়িয়ে দিতেন। তাঁর স্নেহভরা মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে—প্রদীপের মতো জ্বলে উঠেছেন চারুকলা অঙ্গনের অনেক শিক্ষার্থী। এখানেই শিল্পী শওকাতুজ্জামানের শিক্ষকতার সার্থকতা। শুধু প্রাচ্যকলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, চারুকলার সমস্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীই কোনো-না-কোনোভাবে তাঁর স্নেহভরা উৎসাহ ও পথনির্দেশনা পেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর মধ্যে ছিল মানুষের সাথে মিলবার মহৎ গুণ। যে গুণের কারণে পথের ফকির থেকে শুরু করে চারুকলা অঙ্গনের এবং এর চারপাশের পরিবেশের প্রায় সমস্ত মানুষের সাথেই ছিল তাঁর সখ্য। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, পিয়ন, দারোয়ান তাঁর বন্ধুত্ব থেকে বাদ পড়েননি। এক অদম্য সম্মোহনী শক্তিতে, ভাষার লালিত্যে, হৃদয়ের বন্ধনে সকলকে বাঁধতে পারতেন। ফলে একথা বলা যায়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পর ঢাকা চারুকলা অঙ্গনে এমন আর অন্য কোনো শিক্ষক ছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।

বর্তমান গবেষণার গবেষক মলয় বালার সৌভাগ্য হয়েছে শিল্পী শওকাতুজ্জামানের ছাত্র হবার। সেই সূত্রে একান্ত কাছে থেকে স্নেহ পেয়েছেন। বলা যায়, তাঁর (শওকাতুজ্জামানের) শিল্পশিক্ষার উদাত্ত আহ্বানে তিনি (মলয় বালা) শিল্পপথের পথিক হয়েছেন। শুধু শিল্প নয়—তিনি ব্যক্তিজীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করেই শিল্পের সিংহদরজা খুলে দিতেন আলোর পথে। ফলে বর্তমান গবেষক মনে করতেন, তিনিই শওকাতুজ্জামানের একমাত্র প্রিয় ছাত্র এবং তিনি সর্বাধিক স্নেহ পেতেন। কিন্তু গবেষকের ভুল ভেঙেছে শওকাতুজ্জামানের অন্য ছাত্রদের সাথে কথা বলে। শওকাতুজ্জামানের অন্য ছাত্রদের সাথে সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য থেকে প্রমাণ পেয়েছেন—প্রত্যেক ছাত্রই নিজেকে শওকাতুজ্জামানের সর্বাধিক স্নেহের পাত্রটি বলে দাবি করেন। অর্থাৎ এখানেই শওকাতুজ্জামানের বড়ো সার্থকতা। অর্থাৎ তিনি শিক্ষক হয়েও পিতার মতো, বন্ধুর মতো ছাত্র-ছাত্রীদের মনোজগতে প্রবেশ করে এমন চেতনা জাগ্রত করতেন যে, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

শওকাতুজ্জামানের প্রিয় ছাত্র মনে করতেন। অতএব, এ নিবন্ধে শিল্পী শওকাতুজ্জামানকে শিল্পী হিসেবে দেখার চেয়ে শিল্পী গড়ে তোলার নেপথ্যে শিক্ষক হিসেবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হবে।

শিল্পী শওকাতুজ্জামান বিলম্বে শিক্ষকতায় যোগদান করেছিলেন কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই স্বল্প সময়ে তিনি শিক্ষকতার যে আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, তা উল্লেখের দাবি রাখে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন শিক্ষাগুরুর দরকার। তা ছাড়া শিল্পকলার প্রত্যেক শাখাই প্রায় গুরুমুখী। ফলে শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও কৌশলটুকুই মুখ্য। সে বিচারে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিক্ষায় শিল্পী শওকাতুজ্জামানের অবদান অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

শিল্পী শওকাতুজ্জামানের অকালমৃত্যুতে তাঁর কাজ সম্পর্কে তথ্য-উপত্ত সংগ্রহ করতে বর্তমান গবেষকের নির্ভর করতে হয়েছে তাঁর (শওকাতুজ্জামান) পরিবারের সদস্যদের ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ওপর। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে কাজের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এই নিবন্ধের বেশির ভাগ তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা দিয়েছেন শওকাতুজ্জামানের ভাই শিল্পী শহীদুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রী শিল্পী ড. ফরিদা জামান। লিখিত বক্তব্য দিয়ে তথ্য দিয়েছেন শওকাতুজ্জামানের ভাই আসাদুজ্জামান অশ্রু। এ ছাড়া একক প্রদর্শনীর সুভ্যেনিয়রে ও ক্যাটালগে শিল্পীর নিজের কাজ প্রসঙ্গে লিখিত মন্তব্য থেকে কাজের বিষয় প্রসঙ্গে নির্দেশনা পাওয়া যায়। ফলে এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শিল্পী শওকাতুজ্জামানের জীবন ও কর্মের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হলো।

এক

শিল্পী শওকাতুজ্জামান ১৯৫৩ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভাষাসৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবক ও চিত্রশিল্পী আব্দুস শুকুর মিয়া (শুকপাক) তাঁর পিতা। শওকাতুজ্জামানের দাদা অর্থাৎ আব্দুস শুকুর মিয়ার বাবা মোঃ খায়রুজ্জামান মিয়া ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের একজন নকশাবিদ (ড্রাফট্‌ম্যান)। যাঁর কর্মজীবন কলকাতা ও রেঙ্গুনে কেটেছে। শওকাতুজ্জামানের পিতা আব্দুস শুকুর ১৯৫২ সালে ফরিদপুর শহরে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনী ও সাইনবোর্ড পেইন্টিং-এর 'স্টুডিয়ো শুকপাক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। অতএব বলা যায়, শওকাতুজ্জামান জন্মসূত্রেই চিত্রশিল্পী পরিবারের আবহে বেড়ে উঠেছিলেন।

বাড়ির পাশে ঢোল নদীর তীরে নানাবাড়িতে শওকাতুজ্জামানের জন্ম হয়েছে। জন্মের পর বেশির ভাগ সময় নানাবাড়ির নৈসর্গিক পরিবেশে কেটেছে। শওকাতুজ্জামানের বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর তখন নানাবাড়ির কাছে হালিমা স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার সময় স্কুলটি শুধু মেয়েদের পড়ালেখার জন্য নির্ধারিত হয়। ফলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার জন্য অন্য স্কুলে যেতে হয়। অগ্রজ আসাদুজ্জামান অশ্রুও তখন ওই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে সখ্য ছিল প্রচুর। ফলে শওকাতুজ্জামানের পিতা-মাতা ১৯৬২ সালে দুই ছেলেকে ফরিদপুর পুলিশ লাইন ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে যথাক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। এরপর ওই স্কুল থেকে সাফল্যের সাথে পঞ্চম শ্রেণি পাস করে শওকাতুজ্জামান ফয়েজউদ্দিন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন।

স্কুলজীবন থেকেই শওকাতুজ্জামান খেলাধুলা ও শারীরচর্চায় যত্নবান ছিলেন। তিনি স্কুলে পড়ার সময়ে কাঁচা ছোলা রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিতেন এবং সকালে খেতেন। ভোরবেলা উঠে প্যান্ট-গেঞ্জি পরে, কেডস পায়ে দিয়ে অগ্রজ আসাদুজ্জামান অশ্রুকে নিয়ে দৌড়াতেন এবং শরীরচর্চা করতেন। তখনকার দিনে বিনোদনের জন্য ঘরে ঘরে টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ছিল না। ফলে মফস্বলের ছেলেমেয়েরা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ব্যাডমিনটন এবং দেশীয় খেলা হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, চোখ পলান্টি প্রভৃতি খেলাধুলা করে আনন্দে কাটাত। ফলে অবারিত সবুজ মাঠে সহপাঠী প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব গড়ে উঠেছিল শওকাতুজ্জামানকে ঘিরে। শওকাতুজ্জামানও সকলের মধ্যমণি ছিলেন। মূলত শিল্পী শওকাতুজ্জামানের আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে বাল্য-কৈশোরের এই পরিবেশ ভবিষ্যতে সহনশীল মনন গঠনে সহায়ক হয়েছিল এবং বন্ধুসুলভ আচরণ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এজন্যই এই গবেষণায় শিল্পী শওকাতুজ্জামানের ধারাবাহিক বেড়ে ওঠার পরিবেশ ও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হবে। এতে তাঁর ব্যক্তি-চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে এবং যে চরিত্রগুণ তাঁর শিল্পীজীবন ও শিক্ষকজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে, তার হদিশ পাওয়া সম্ভব হবে।

শওকাতুজ্জামান খেলাধুলায় বেশি উৎসাহী ছিলেন। স্কুলের অভ্যন্তরীণ খেলা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও স্কাউটিংয়ে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। শুধু স্কুল নয়, বাড়ির পরিবেশে কেমন কাটাতেন এ প্রসঙ্গে শওকাতুজ্জামানের খেলার অন্যতম সাথী অগ্রজ আসাদুজ্জামান অশ্রু গত ৯ অক্টোবর ২০১৩ সালে লিখিত বর্ণনায় যা উল্লেখ করেছেন তা প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরা হলো :

> বৃষ্টি হলে উঠানে বাতাবী লেবু দ্বারা খেলা শুরু হয়ে যেত। যার ফলে সর্দিজ্বর হয়ে যেত। বর্ষা এলে সবচেয়ে বেশি মজা হত। নৌকা বা কলাগাছের ভেলায় চড়া, মাছ ধরা, সাঁকোর উপর বসে পায়খানা করা, কাগজ দিয়ে ছোট ছোট নৌকা বানিয়ে তা স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া ছিল খুবই আনন্দের বিষয়।[২]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে সে সময়কার পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন ধারণা লাভ করা যায় তেমনি অনুমান করা যায় যে, মাটি ও প্রকৃতির মাঝে শওকাতুজ্জামান কীভাবে বেড়ে উঠেছিলেন। হয়তো এমনভাবে বেড়ে উঠেছিলেন বলেই তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক চেতনায় দেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেমের নানান অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে।

চিত্র ০১ : Child Hood Memory, Acrylic on Canvas

চিত্র ০২ : Child Hood Memory, Acrylic on Canvas

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী শওকাতুজ্জামানের পরনে থাকত সাদা পায়জমা ও খদ্দর কাপড়ের পাঞ্জাবি। এই পোশাক তিনি পরতে শুরু করেছিলেন স্কুলজীবন থেকে। স্কুলে লেখাপড়া করার সময় ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেন। সারা দেশব্যাপী এর পক্ষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরের আম্বিকা ময়দানে জনসভা করতে আসেন। সেই জনসভায় যোগদান করে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়ে বাঙালি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পাঞ্জাবি পরা শুরু করেন। এর পর থেকে তিনি রাজনীতি সচেতনও ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে দেশ গড়ার কাজে সিনিয়র নেতাদের সাথে মিটিং-মিছিলে যোগদান করতেন।[৩]

শুধু তা-ই নয়, স্কুলে লেখাপড়া করার সময় এলাকায় যুবক বয়সীদের নিয়ে রাস্তার দুই পাশের জঙ্গল পরিষ্কার, গ্রাম থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে গোরস্তান ঘেরা, মসজিদ পরিষ্কার করা, হিন্দু বন্ধুদের সাথে প্রতিমা রং করা এবং পাল বাড়ি গিয়ে পুতুল, পাখি, হাঁড়ি-পাতিল বানানোর কাজে যোগদান করতেন। এই সামাজিক জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই তাঁর শিল্পচর্চাও চলত।

দুই

শিল্পী শওকাতুজ্জামান শিল্পচর্চা হাতে-কলমে শিখেছেন বাবার কাছ থেকে। ফরিদপুরে তখন প্রতিবছর শীতকালে কৃষি, শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি মেলা হতো। সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করত। এ সময় তাঁর পিতা আব্দুস শুকুর বিভিন্ন অফিসে স্টল তৈরি করতেন। তখন পিতার সাথে তিনিও কাজ করতেন। পিতা চক দিয়ে বিভিন্ন লেখা ও ছবি এঁকে দিতেন, শওকাতুজ্জামান সে অনুযায়ী রং দিয়ে ভরাট করতেন। এই কাজগুলো হতো হার্ডবোর্ড, চট ও কাপড়ের ওপর। এ ছাড়া তাঁর পিতা বিভিন্ন নাটকের জন্য বড়ো কাপড়ের ওপর বিভিন্ন সিনারির দৃশ্য নাটকের সেট তৈরি করার জন্য আঁকতেন। শওকাতুজ্জামান সেগুলো দেখে নিজে নিজে ছবি আঁকতেন। বলা যায়, এভাবেই শওকাতুজ্জামানের ছবি আঁকার হাতেখড়ি।

শওকাতুজ্জামানের পিতা ভালো ছবি আঁকতেন। মানুষ হিসেবেও ছিলেন সংস্কৃতিমনা। ফলে পিতার স্নেহধন্য সাহচর্যে তাঁর শিল্পকলার ভিত গড়ে উঠেছে। শিল্পী শওকাতুজ্জামানের পিতা কোন মাপের শিল্পী ছিলেন সে প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, শওকাতুজ্জামানের দাদা ড্রাফটম্যান ছিলেন। দাদা মারা যাবার পর শওকাতুজ্জামানের পিতা আব্দুস শুকুর নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় কলকাতা গিয়ে কমার্শিয়াল আর্ট শেখেন। সেখানে তিনি নাট্যাঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়ে অভিনয় করতেন এবং নাটকের সেট ডিজাইন করতেন। জীবিকার জন্য ট্রামে চাকরি করেও ছবি আঁকতেন। এ সময় কলকাতায় কামরুল হাসানের সাথে দেখা হয়। তিনি ব্রতচারী আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ফরিদপুর এসে ফরিদপুরে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ‘স্টুডিয়ো শুকপাক’ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ফরিদপুর ‘টাউন থিয়েটারে’ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৯৯৬) অভিনয় ও সেট ডিজাইন করেছেন। সংস্কৃতি অনুরাগী এই ব্যক্তি কর্মজীবনে ব্যানার, সাইনবোর্ড, নাটকের সেট ডিজাইন ছাড়াও পোর্ট্রেট ফিগারেটিভ কাজ এবং ল্যান্ডস্কেপ করে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছেন।[৪] অতএব, শিল্পী শওকাতুজ্জামান পারিবারিক পরিবেশে চিত্র অঙ্কনের শিক্ষা পেয়েছেন।

শিল্পী শওকাতুজ্জামান এস.এস.সি পরীক্ষা দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হতে থাকে। আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে ১৯৬৯ সালে 'মার্শাল ল' জারি করেন। বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা দেন। ফলে দেশে তখন গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই অবস্থার মধ্যে এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে সাফল্যের সাথে পাস করেন।

শওকাতুজ্জামানের বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে পলিটেকনিক্যাল কলেজে পড়াবেন। কিন্তু শওকাতুজ্জামান মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি আর্ট কলেজে পড়বেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছার কারণে বাবা রাজি হন। এ সময় আর্ট কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি হিসেবে তখনকার ঢাকার সরকারি চারু ও কারুকলা আর্ট কলেজের ছাত্র মুন্সী মহিউদ্দিন কিছু বিষয় শিখিয়ে দেন। মুন্সী মহিউদ্দিন তখন আর্ট কলেজ থেকে ফরিদপুর এলে 'শুকপাক' স্টুডিয়োতে আসতেন। আব্দুস শুকুরের সাথে মুন্সী মহিউদ্দিনের সখ্য থাকায় শওকাতুজ্জামানকে চারুকলায় ভর্তিবিষয়ক ফ্রি-হ্যান্ড ড্রয়িং, ডিজাইন বুঝিয়ে দেন। আর্ট বিষয়ে যেহেতু শওকাতুজ্জামানের পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল সেহেতু বিষয়গুলো রপ্ত করতে সময় লাগেনি।

চারুকলায় ভর্তির সময় হয়ে এলে পিতা আব্দুস শুকুর শওকাতুজ্জামানকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। শওকাতুজ্জামান ১৯৬৯–৭০ শিক্ষাবর্ষে ইস্ট পাকিস্তান সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে (বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাক-ডিগ্রিতে ভর্তি হন।

তিন

চারুকলার সদ্য ভর্তি হওয়া ছাত্র শওকাতুজ্জামান শিল্পচর্চার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৯ সালের ছয় দফা দাবির সম্পূরক হিসেবে উত্থাপিত হয়েছিল ছাত্রদের ১১ দফা। শওকাতুজ্জামান ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর ১৯৭০ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে ফরিদপুরে এসে নৌকার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালান। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। শওকাতুজ্জামানের নেতৃত্বে আর্ট কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রী রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাক-বাহিনী আক্রমণ চালালে অনেক মানুষ নিহত হন। পরদিন চারুকলার ছাত্র হোস্টেলে (বর্তমানে শহীদ শাহনেওয়াজ হোস্টেল) বসবাসরত শাহনেওয়াজ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। শওকাতুজ্জামান ওই হোস্টেলেই থাকতেন। এরপর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ফরিদপুরে নিজের এলাকায় চলে যান।[৫]

চারুকলার ছাত্র শওকাতুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধের সময় তুলির বদলে অস্ত্র ধরেন হাতে। হয়ে ওঠেন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। আসাদুজ্জামান অশ্রু লিখিত সাক্ষাৎকারে শওকাতুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনায় জানা যায়, শওকাতুজ্জামান ঢাকা ছেড়ে ফরিদপুরে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেন। সেনাবাহিনীর বাঙালি সিপাহি ফারুক ও নয়ন খানের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ নেন। শুধু শওকাতুজ্জামান নন, তাঁর বাবাও ছিলেন থানা কমান্ডার। শওকাতুজ্জামান এ সময় ফরিদপুরে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে পাক-বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে এবং বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে শওকাতুজ্জামান ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিয়ে আর্ট কলেজে ফিরে যান।[৬]

শওকাতুজ্জামান আর্ট কলেজের খেলাধুলা এবং ছাত্ররাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি চারুকলার ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

চার

শিল্পী শওকাতুজ্জামান ১৯৬৯–৭০ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-বি.এফ.এ ভর্তি হয়ে দুই বৎসরের কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষে প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ ভর্তি হন। প্রাক-বি.এফ.এ পড়ার সময় তিনি জলরং বেশি পছন্দ করতেন এবং জলরং মাধ্যমে অনেক ছবি এঁকেছিলেন। চলনে-বলনে ও পোশাক-আশাকে দেশীয় ঘরানাকেই প্রাধ্যান্য দিতেন। ফলে প্রাচ্যকলা বিভাগকেই বেছে নিয়েছিলেন।[৭]

তিনি ফরিদপুরে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সংস্কৃতির মধ্যে বড়ো হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধের আদর্শ ও নীতিকে ধারণ করতেন। এজন্য পড়ার টেবিলে এই মনীষীদের ছবি টাঙিয়ে রাখতেন।[৮]

দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে বেশি ছিল। তাই তাঁর কথাবার্তার মধ্যে সবসময় দেশপ্রেম অনুভব করা যেত। তিনি প্রকৃতিকে বেশি ভালোবাসতেন, প্রকৃতির জীবজন্তু, পোকামাকড় পর্যবেক্ষণ করতেন এবং এসব স্টাডি করতেন।

তিনি ১৯৭৪ সালে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে বি.এফ.এ পাস করেন। এই সময়ের মধ্যে ১৯৭৩, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালের বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে বিভাগীয় পুরস্কার লাভ করেন। বিশেষত ১৯৭৪ সালে ঢাকা আর্ট কলেজের ২৫ বছর পূর্তিতে রজতজয়ন্তী প্রদর্শনীতে ‘শিল্পকলা পুরস্কার’ (নবীন) লাভ করেন।

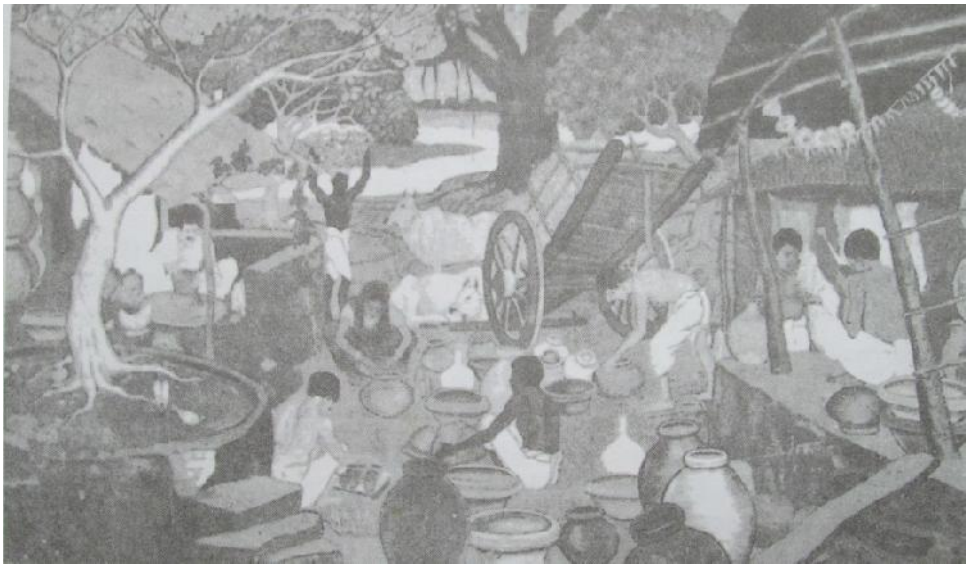

চিত্র ০৩ : ছাত্রজীবনে অঙ্কিত মুরাল চিত্র

১৯৭৪ সালে তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পন্ন করেন। দুই বছরের এই কোর্স সমাপ্ত হয় ১৯৭৬ সালে। প্রথম বছরে পি.এফ.সি কোর্স করে শেষ বছরে তিনি মুরাল ডিজাইনের ওপর কাজ করেছেন এবং ভারতশিল্পে ডিসটিংশন লাভ করেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি নন্দলাল বসুর পরম্পরার শিষ্য কে.জি সুব্রহ্মমণ্যন, সুখময় দত্তের অধীনে কাজ করেছেন। তিনি এ সময় শান্তিনিকেতনের নন্দন মেলায় কাজ করেছেন, শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে মোজাইক মুরাল করেছেন, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবনে দুটি ফ্রেসকো সংস্কার (Repaired) কাজ করেছেন।[৯] এ ছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনে একক প্রদর্শনী করেছেন।

পাঁচ

শওকাতুজ্জামান শান্তিনিকেতন থেকে দেশে ফিরে এসে চট্টগ্রাম আর্ট কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে প্রোগ্রাম অফিসার পদে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালে তিনি আলিয়ঁস ফ্রঁসেস গ্যালারিতে একক প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীর ক্যাটালগের বর্ণনায় ৩৮টি শিল্পকর্ম দেখা যায়। যার শিরোনাম ও মাধ্যম দেখে অনুমান করা যায় তিনি এ প্রদর্শনী করেছিলেন তাঁর ছাত্রজীবনের কাজ দিয়ে। জলরং, জলরং ওয়াশ, টেম্পারা (সিল্কের ওপর টেম্পারা, পেপারের ওপর টেম্পারা, সুতি কাপড়ের ওপর টেম্পারা) মাধ্যমের কাজ ছিল। কাজের বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণ, ওমর খৈয়াম, বিভিন্ন খাতিমান ব্যক্তির প্রতিকৃতি, হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবী, বীরভূমের ভূ-দৃশ্য, গঙ্গা নদী, দার্জেলিংয়ের পাহাড়, গাছ প্রভৃতি। এর সাথে মিউজিয়াম স্টাডি ও কপি চিত্রণও ছিল।[১০]

চিত্র ০৪ : মিউজিশিয়ান, সিল্কের ওপর টেম্পারা

চিত্র ০৫ : বীরভূমের ভূ-দৃশ্য, টেম্পারা

শওকাতুজ্জামান বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে চাকরিরত অবস্থায় শিল্পকলাবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ও ছড়া-কবিতা লিখেছেন এবং শিশুগ্রন্থ অলংকরণ করেছেন।

তিনি ১৯৮৪ সালে এ.সি.সি.ইউ আয়োজিত অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মধ্যে কানিশিবাই প্রতিযোগিতায় জাপানের কানিশিবাই পুরস্কার (Kanishibai Award) অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি তাঁর কাজের সম্ভার নিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্যালারিতে (জয়নুল গ্যালারি) প্রদর্শনী করেছেন। এই প্রদর্শনীর সুভ্যেনিয়রে

Dhaka University Institutional Repository

৩১টি ছবির তালিকা দেয়া আছে। ছবিগুলো তিনি ওয়াশ ও টেম্পারায় করেছেন। স্বাধীনতা, ভালোবাসা, অভিসার, স্বপ্ন, প্রসাধন, শান্তির প্রতীক, সিরিজচিত্র ছাড়াও কৈফিয়ত, বিরহী, মানভঞ্জন, অপেক্ষা, প্রতীক, রাধা-কৃষ্ণ, দুর্গা, ভূ-চিত্র (বীরভূম), বাদক প্রভৃতি বিষয়ের ছবি দিয়ে সাজিয়েছিলেন।

চিত্র ০৬ : ভালোবাসা-১, ওয়াশ টেম্পারা

চিত্র ০৭ : প্রসাধন-১, ওয়াশ টেম্পারা

ছবির বিষয়, উপকরণ, টেকনিক প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সুভ্যেনিয়রে লিখেছিলেন :

> আমার কাজের পটভূমিতে আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, লোক-জীবন, প্রেম-কথা থেকে শুরু করে সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিন্যাস। তাই উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছি, মাধ্যমটি জলরং, কালি, টেম্পারা ঠিক রেখে করণ-কৌশল বদলে দিয়েছি। এতে পেয়েছি ছবি আঁকার স্বচ্ছন্দ গতি। আর তাতেই প্রতিটি ছবিতে এসেছে রঙের পুনরাবৃত্তি, গড়নের প্রতিভাস। . . . ওয়াশ এবং টেম্পারা পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কিছু ছবি করার পরিকল্পনা করলাম এবং সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। . . .
> বর্তমান অশান্ত বিশ্বের কুটিল আবহাওয়ার বিপরীতে আমার ছবি আঁকা। আমার বেশিরভাগ ছবির বিষয়গুলো রোমান্টিক চেতনা থেকে উৎসারিত। পাশাপাশি সমসাময়িক ঘটনাবলী যা আমার চিন্তা-চেতনায় নাড়া দিয়েছে তারও ছবি এঁকেছি রোমান্টিকতায় যে মাঝে-মধ্যে ছেদ পড়ে সেখানেও যে বিরহ বেদনা, সুখ-দুঃখের আনাগোনা হয় তারও বহিঃপ্রকাশ আছে আমার ছবিতে।[১১]

এ প্রদর্শনীর ছবিগুলোতে তিনি প্রাচ্যরীতির গতানুগতিক অঙ্কন রীতি ছেড়ে ওয়াশ ও টেম্পারা সহযোগে ওয়াশ-টেম্পারা করেছেন এবং অবজেক্টের ফর্ম, ডাইমেনশন পুনর্বিন্যাস করে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ ষাটের দশকের বিমূর্ত চিত্রকলার প্রভাব তাঁর বিষয় বিন্যাসে, ফিগার ও প্রকৃতির উপস্থাপনে লক্ষণীয়। ফলে তাঁর কাজের মধ্যে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা সমসাময়িক সময়ে অন্যান্য প্রাচ্যচিত্রকলার চর্চারত শিল্পীদের কাজে দেখা যায়নি।

প্রদর্শনী প্রসঙ্গে 'ছুটি' ম্যাগাজিনে 'শিল্পী শওকাতুজ্জামানের রোমান্টিকতার ভিন্ন ভাষা' শিরোনামে যে চিত্রসমালোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

> ছিন্নভিন্ন হৃদয় কুটি কুটি জীবনের স্বপ্ন-প্রেম-বিরহ-রহস্যের অনাস্বাদিত অন্তর্দাহ শওকাতুজ্জামানের চিত্রকর্মের ভাষা। যে ভাষা প্রকাশের নয়, উপলব্ধির। আর উপলব্ধির ভাষা সব সময়ই বিমূর্ত। যেহেতু আমাদের শিল্পের সনাতন ধারাই বিমূর্ত। তাই স্বাভাবিকভাবে বিমূর্ত উপস্থাপনার মাধ্যমেই শিল্পীরা চিন্তার সূত্র খোঁজেন। তবে এই

Dhaka University Institutional Repository

এবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর একঘেয়েমিতায় শিল্পীর স্বকীয়তা সাধারণ দর্শকদের চোখে দৃষ্ট হয় না। এদিক থেকে শওকাত অনেকটা নিরাপদ। শওকাতুজ্জামান বিমূর্ত তবে তা উপলব্ধিময়। তাঁর ছবির ভাষা খুঁজতে অনুসন্ধিৎসু দর্শককে কষ্ট পেতে হয় না। এখানেই এই শিল্পী বিশেষত্ব। . . .
. . . শওকাতুজ্জামানের চিত্রকর্মে বোধ্য ও দুর্বোধ্যতার মাঝামাঝি অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। ফলে তা শুধু হৃদয়গ্রাহীই নয়, বোধগ্রাহীও বটে।[১২]

ছয়

১৯৮৮ সালেই শওকাতুজ্জামান পুনরায় ভারতের শান্তিনিকেতনের কলাভবনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে ভর্তি হন এবং ১৯৯০ সালে মুরাল পেইন্টিংয়ের ওপর অর্জন করেন এম.এফ.এ ডিগ্রি। শিক্ষকদের সাথে তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কমিশন ওয়ার্কও করেছেন মুরালের ওপর। কলাভবনে তিনি জয়পুরী ফ্রেসকো, Sand Cement Cast, গ্লাস মুরাল পেইন্টিং, মোজাইক মুরাল শিখেছেন। তিনি শিল্পী-শিক্ষক কে.জি সুব্রহ্মণ্যনের তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনের পাঠ-ভবনে (Patha Bahavan) গ্লাস মুরাল পেইন্টিং করেছেন এবং অধ্যাপক সুহাস রায়ের তত্ত্বাবধানে Presidents House of India-য় মুরাল করেছেন।[১৩]

১৯৯১ সালের একক প্রদর্শনীর কাজে শওকাতুজ্জামানের কাজগুলোতে ভিন্ন মাত্রা লক্ষ করা যায়। আলিয়ঁস ফ্রাঁসেস গ্যালারিতে এ প্রদর্শনী চলেছিল সেপ্টেম্বরের ১৩–২৭ তারিখ পর্যন্ত।

চিত্র ০৮ : Expecting
১৯৯৯ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে

চিত্র ০৯ : শিরনামহীন
১৯৯৯ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে

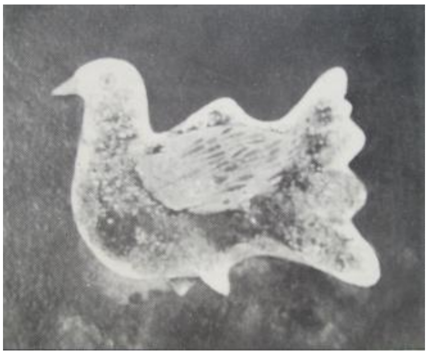

চিত্র ১০ : শিরনামহীন
১৯৯৯ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে

এ পর্বের কাজে ছবির ফর্ম রিয়েলিস্টিক ছিল না। এ ধরনের কাজে নিজস্ব আঙ্গিক পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা লক্ষণীয়। প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক কাজের করণ-কৌশলে প্রাচ্যরীতির একাডেমিক ঘরানার বাইরে নিজস্ব ধারা তৈরির প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা সমসাময়িক মডার্ন ইন্ডিয়ান পেইন্টিংয়ের ঘরানার সাথে সদৃশ্য।[১৪]

শিল্পী শওকাতুজ্জামান প্রদর্শনীর সুভ্যেনিয়রে তাঁর কাজ প্রসঙ্গে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। যা শওকাতুজ্জামানের এই পর্বের কাজ বুঝতে প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখের দাবি রাখে :

> The beautiful world in which I live is the major part of myself. The harmonious distribution of the sky. Water and greenery regulates the Psychological and Ecological balance of man and nature resulting in a peaceful co-existence between the two. This is the rule of true life and peace, which is now being endangered. I believe that every living thing like man expresses sorrow, joy, pain and anger. My works depict these moods of mature symbolically. According to tao and zen philosophy

Dhaka University Institutional Repository

> we are part of nature and not its master. If we believe in this than we art sure to respect our mutual co-existence thus preserving the very meaning of the existence of this beautiful word. So I would like to dovote this exhibition for greater humanity as an environmental artist.[১৫]

উল্লিখিত উক্তিতে শিল্পী শওকাতুজ্জামানের ছবি আঁকার বিষয় প্রসঙ্গে স্পষ্ট মতবাদ পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর ২৭টি চিত্রকর্মে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন বোর্ডে অ্যাক্রেলিক, বোর্ডে জলরং, কাগজে জলরং ও কাগজে অ্যাক্রেলিক।[১৬] এ প্রদর্শনীর মূল কাজ কিংবা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ প্রদর্শনীর কাজ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বর্ণনা ও চিত্রসমালোচনার ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে বর্তমান গবেষকের। সুতরাং সে সময়ে এ প্রদর্শনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘বাংলার বাণী’ পত্রিকার সাময়িকীতে কী রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা উল্লেখ করা হলো :

> পরিবেশ-প্রকৃতি সচেতন এই শিল্পী প্রকৃতির আশ্চর্য সুন্দর রূপ যেমন এঁকেছেন তেমনি মানুষের বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের ফলে সুষ্ঠু আতংকজনক সংকটের স্বরূপও চিত্রকর্মে উপস্থাপন করেছেন। . . .
> শওকাতুজ্জামান ইমপ্রেশনিস্ট ধারার শিল্পী। স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল রঙই ব্যবহার করেছেন তিনি নিসর্গবন্দনায়। তাঁর ছবিতে আকাশ আকাশের বিশালতা নিয়েই উপস্থিত, সবুজ উপস্থিত চোখ-জুড়োনো সতেজ-সবুজ হিসেবেই, আর পুষ্প উপস্থিত তাঁর রক্তিমাভা নিয়েই। . . . অপরদিকে বিপন্ন বিষণ্ণ পাখিরও দেখা মেলে প্রদর্শনীতে—যে পাখি প্রাণ-হারানোর ভয়ে আতংকিত এ দগ্ধ আত্মা নিয়ে নিঃসঙ্গ। জলের মাছও বিপন্ন—বাতাস যেমন দূষিত হয়ে পড়েছে তেমনি জলও বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বৃক্ষ ও পাখির মতো মাছও মরণোম্মুখ।[১৭]

তৎকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক কাজী আব্দুল বাসেত শিল্পী শওকাতুজ্জামানের প্রদর্শনী সম্পর্কে এবং প্রদর্শনীর শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে যে মূল্যায়ন করেছেন তা নিম্নরূপ :

> Showkatuzzaman, working in oriental style is holding this exhibition with an exception . . . he has been most responsible, hardworking and deeply creative. for the fulfilment of his urge for aesthetic creative innovation he worked ceaselessly acquiring mastery in various technical skills in the field of visual arts. Though he practices both painting and mural design he has established himself as a mural designer and painter. The artist showkat is very simple in feature and in character, So are the subjects of his paintings which are simple but symbolic. His works are loud in colour but interesting and pleasant and some very cool expressing a totally different mood. His use of wash is not traditional rather experimental. His wash may resemble to that of Abanindranath but in originality it is showkat's. Showkatuzzaman is one of the few painters who experiment and work in this style.[১৮]

সাত

শওকাতুজ্জামান তাঁর কাজের ক্ষেত্রে টেম্পারাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে নিজের নান্দনিক অনুভূতিতে ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতিই তাঁর শিল্পের বিষয়। ছবি আঁকার জন্য উপকরণ নিয়ে বিশেষ ভাবতেন না। হাতের কাছে যখন যে উপকরণ পেতেন তাই দিয়ে ছবি আঁকতেন। শিক্ষকতার সময় ছাত্রদের ক্লাসরুমের টেবিলে বসতেন। চারুকলার জীবজন্তু, ফুল, পাখি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। আর এসব বিষয় ছবির বিষয় হয়ে উঠত। প্লাইউড-বোর্ডে সাদা রং লেপন করে টেম্পারা করতেন। এসব বোর্ডে কখনো অ্যাক্রেলিক, কখনো জলরং ব্যবহার করতেন। ১৯৯৭ সালেই তিনি বেশি কাজ করেছেন—অন্তত স্বাক্ষরিত ছবি থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। কুকুর, কবুতর, বিভিন্ন প্রকার পাখি, নগ্ন নারীর পূর্ণাবয়ব, বিভিন্ন প্রকার ফড়িং নিয়ে যেসব কাজ করেছেন তার সম্ভার নিয়ে জীবদ্দশায় শেষ এবং সপ্তম একক

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শনী করেছিলেন ২০০০ সালে ঢাকায় গ্যালারি ২১-এ। এ প্রদর্শনীতেও তাঁর কাজ সম্পর্কে তিনি 'MY WORDS' শিরোনামে লিখেছেন :

> The harmonious distribution of nature, sky, rives, green field which are sometimes dry. angry by wind and flood, sometime become heaven like beautiful in seasons. The man and nature live here in a peaceful co-existance. This is the rule of true life and peace. I believe that every liveing thing like man expresses sorrow, joy. Pain and anger. My works (Painting) dipicts these moods of man, nature and elements. I put these sorts of emotion through symbolically and suggeslively.[১৯]

চিত্র ১১ : Afinity, ক্যানভাসে টেম্পারা
৬১ × ৬১ সেমি

চিত্র ১২ : Attack, অ্যাক্রেলিক
৬১ × ৬১ সেমি, ২০০১

শওকাতুজ্জামানের Woman সিরিজচিত্রের নারী বিভিন্ন অভিব্যক্তিময়। প্রদর্শনীর *ওম্যান* সিরিজচিত্র প্রসঙ্গে ওয়াজেদ আহসান খোকন দৈনিক ইনকিলাবে লিখেছেন :

> কিছু কিছু ছবির জন্য শিল্পী মডেল ব্যবহার করেছেন। তবে সে ক্ষেত্রে শিল্পী কল্পনা মানস মডেলের দেহ সৌষ্ঠবের সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে নান্দনিক অবয়ব হয়ে ধরা দিয়েছে ছবির ক্যানভাসে।[২০]

চিত্র ১৩ : Woman-2, অ্যাক্রেলিক

চিত্র ১৪ : Woman-3, অ্যাক্রেলিক

চিত্র ১৫ : Woman-1, অ্যাক্রেলিক

পাখি ও ফড়িংবিষয়ক অনেক চিত্র ছিল এ প্রদর্শনীতে। এসব চিত্রের রং ফভবাদী। রং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদীর সাথে যুক্ত হয়েছে পরবর্তী মডার্নিস্ট চিত্র লক্ষণ।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

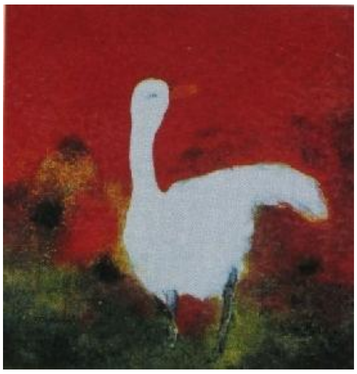

চিত্র ১৬ : Waiting
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

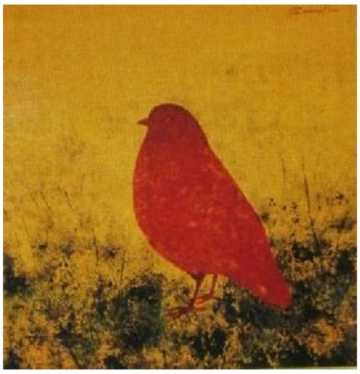

চিত্র ১৭ : The Red Bird
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

চিত্র ১৮ : Convergent
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

চিত্র ১৯ : শিরোনামহীন (ফড়িং)

চিত্র ২০ : শিরোনামহীন (ফড়িং)

চিত্র ২১ : শিরোনামহীন (ফড়িং)

এ প্রদর্শনীর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ছবি হলো Birth of a Nation. প্লাইবোর্ডের ওপর অ্যাক্রেলিকে অঙ্কিত এ চিত্র সম্পর্কে শওকাতুজ্জামান লিখেছেন :

> 'Birth of a Nation' Title painting based on our liberation war. Lot of men and woman of this nation fought nine months to get freedom. Women had the great Contribution to make the nation get freedom. And these women have the creativeness to creats something. I believe without woman the freedom was impossible.[২২]

চিত্র ২২ : Birth of a Nation, বোর্ডের ওপর অ্যাক্রেলিক

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আলোচনায় শিল্পী শওকাতুজ্জামানের প্রদর্শনী ও প্রদর্শনী প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচকের মতামতের উদ্ধৃতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে শওকাতুজ্জামানের চিত্ররীতি ও চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নানা মতামত তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর অন্যান্য কাজের বর্ণনা করতে চেষ্টা করা হবে।

আট

শিল্পী শওকাতুজ্জামান পাখি নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। চারুকলার আশপাশে যেখানে বসতেন, পাখিদের স্বভাব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করতেন। ওয়াশ টেম্পারা, টেম্পারা, বোর্ডের ওপর টেম্পারা মাধ্যমে পাখির বিভিন্ন মুহূর্ত দিয়ে কম্পোজিশন করতেন। এসব কাজে ওয়াশের একটা ভাব পাওয়া যায়।

চিত্র ২৩ : শিরোনামহীন
অ্যাক্রেলিক
৫৫ × ৩৮ সেমি

চিত্র ২৪ : শিরোনামহীন
অ্যাক্রেলিক
৫৫ × ৩৮ সেমি

চিত্র ২৫ : শিরোনামহীন
অ্যাক্রেলিক
৫৫ × ৩৮ সেমি

পাখির মতো কুকুরও তাঁর চিত্রের প্রিয় বিষয়। অ্যাক্রেলিক টেম্পারা কিংবা কালি-তুলিতে ড্রয়িং করে কুকুরের বিভিন্ন কম্পোজিশন করেছেন।

চিত্র ২৬ : বিশ্রাম, অ্যাক্রেলিক

চিত্র ২৭ : বিশ্রাম, অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৮ : শিরোনামহীন

চিত্র ২৯ : শিরোনামহীন

অশুভ এবং হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা বোঝাতে কুকুর, শিয়াল কিংবা কুকুর বা শিয়াল আকৃতির পশুকে তুলির টানে গতি সহকারে আঁকতেন। তাঁর এই চিত্রগুলো স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চেতনায় উদ্দীপ্ত।

চিত্র ৩০ : শিরোনামহীন

চিত্র ৩১ : শিরোনামহীন

চিত্র ৩২ : শিরোনামহীন
অ্যাক্রেলিক, ৭৬ × ৭৬ সেমি

শিল্পী শওকাতুজ্জামান বিভিন্ন মাধ্যমে ও টেকনিকে কাজ করতেন। পেন, প্যাস্টেল, গ্লাস পেইন্টিং, এগ টেম্পারা প্রভৃতি মাধ্যমে ফুল, পাখি, মাছ এঁকেছেন। ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী সুহাস রায় গ্লাস পেইন্টিং করতেন। তাঁর কাছ থেকে গ্লাস পেইন্টিং শিখেছেন।

চিত্র ৩৩ : শিরোনামহীন, পেন ও প্যাস্টেল

চিত্র ৩৪ : শিরোনামহীন

Dhaka University Institutional Repository

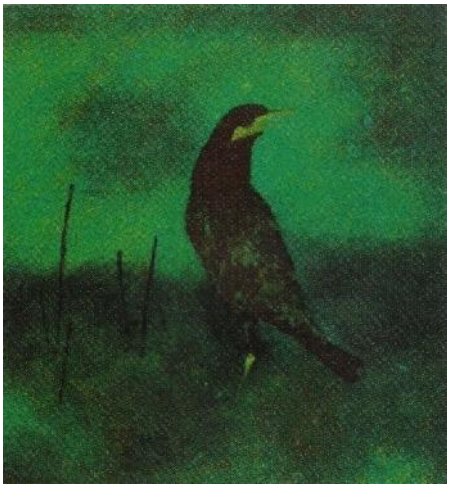

চিত্র ৩৫ : শিরোনামহীন, গ্লাস পেইন্টিং

চিত্র ৩৬ : শিরোনামহীন, গ্লাস পেইন্টিং

জলরং ওয়াশ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাচ্যরীতিতে ল্যান্ডস্কেপ করেছেন।

চিত্র ৩৭ : শিরোনামহীন

চিত্র ৩৮ : শিরোনামহীন

চিত্র ৩৯ : শিরোনামহীন

পদ্ম নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। করেছেন গ্লাস পেইন্টিং। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় পদ্মের তিন অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। এই চিত্রে আলোর সাথে পদ্মের সৌন্দর্যের তিন রকম অবস্থা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সময় অনুসারে তিন রকম লাবণ্যকে তিনি ধরেছেন এই তিনটি চিত্রে।

চিত্র ৪০ : সকাল, ১৯৯৭

চিত্র ৪১ : দুপুর, ১৯৯৭

চিত্র ৪২ : বিকেল, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

নিসর্গ অঙ্কনের ক্ষেত্রে তাঁর তুলির স্ট্রোক অপূর্ব আবেদন সৃষ্টি করে। নিসর্গের মধ্যে পাখি এবং জলাশয়যুক্ত নৈসর্গিক পরিবেশ তিনি প্রায়ই আঁকতেন।

চিত্র ৪৩ : শিরোনামহীন (নিসর্গ)

চিত্র ৪৪ : শিরোনামহীন (নিসর্গ)

টব ও ফুল এবং ছোটো ছোটো পোকামাকড় নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করতে শওকাতুজ্জামানের জুড়ি ছিল না। তিনি বোর্ডের ওপর টেম্পারা পদ্ধতিতে, কখনো ওয়াশ টেম্পারায় এসব চিত্র সম্পন্ন করতেন।

চিত্র ৪৫ : জড় জীবন, টেম্পারা, ২০০৩

চিত্র ৪৬ : Carb, টেম্পারা, ২০০৩

সত্যিকার অর্থে শিল্পী শওকাতুজ্জামান নিজের ধারা তৈরির জন্য ছবি আঁকেননি। যখন যে বিষয় মনকে দোলা দিয়েছে, সে বিষয়েই ছবি এঁকেছেন। পদ্ধতিগতভাবে তা সম্পূর্ণ প্রাচ্য-ঐতিহ্যের মধ্যেও পড়ে না। তিনি ছবি এঁকেছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেদাভেদকে ঝেড়ে ফেলে। সিরিজচিত্রও তাঁর নেই। টেকনিকের ক্ষেত্রেও বহুমুখিতা—তবে তাঁর প্রায় কাজের মধ্যেই প্রাচীয় ভাব-দর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

চিত্র ৪৭ : ফুলসহ রমণী, মিশ্র মাধ্যম
৬০ × ৬০ সেমি, ১৯৯৭

চিত্র ৪৮ : শান্তির প্রতীক, তেলরং
২৯ × ২৩ সেমি, ১৯৮৫

চিত্র ৪৯ : বাউল

Dhaka University Institutional Repository

চায়নিজ পদ্ধতিতে কালি-তুলির কাজেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের কাজে এ পদ্ধতির কাজ শেখাতেন।

চিত্র ৫০ : শিরোনামহীন (পদ্ম)

চিত্র ৫১ : শিরোনামহীন (ফড়িং)

চিত্র ৫২ : শিরোনামহীন (মোরগ)

নয়

শিল্পী শওকাতুজ্জামান দীর্ঘদিন যাবত অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পর থেকেই অসুস্থ ছিলেন। মস্তিষ্কের নার্ভ-সংক্রান্ত জটিলতায় মাঝেমধ্যেই সেন্সলেস হতেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি নিয়মিত ছবি আঁকতে পেরেছেন। এরপর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে ২০০৫ সালের ১৪ অক্টোবর তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সবার প্রিয় মানুষ ছিলেন। সবার সাথে প্রাণখুলে কাথা বলতেন। একুশে ফেব্রুয়ারি আলপনা তৈরির কাজে, চারুকলার পহেলা বৈশাখ উৎসবে তিনি থাকতেন সবার মধ্যমণি। চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ছাত্র উপদেষ্টা ছিলেন। পরিচালনা করেছেন সব রকম খেলাধুলা। লেখালেখি, শিশুগ্রন্থ অলংকরণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লিখেছেন শিশুসাহিত্য। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধও লিখেছেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন পত্রপত্রিকায়। চিত্রসমালোচনাও করেছেন কম-বেশি। তবে তাঁর সাহিত্যকর্ম ও গবেষণাধর্মী কাজের মধ্যে শিল্প-প্রসঙ্গই বেশি আসত। ২০০৩ সালে আজকের কাগজ পত্রিকায় *বাংলার শিল্প বাঙালির শিল্প* শিরোনামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যের নানান শাখায় তাঁর পদচারণ ছিল। সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর শিক্ষকতার আদর্শই সবাইকে মুগ্ধ করেছে। 'জয়নুলের মানবিক গুণাবলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মধুর ব্যবহার ও প্রজ্ঞার কারণে প্রায় সবসময়ই তাঁকে ঘিরে জমে উঠত জমজমাট আসর।'[২৩] শওকাতুজ্জামান যেখানেই থাকতেন সেখানে গল্প, আড্ডা, হাস্যরসে ভরে উঠত। জীবনকে তিনি সহাস্য মধুময় করতে পারতেন। নিজের বাসা, আবাসিক কোয়ার্টারের দারোয়ান, পিয়ন, আশপাশের প্রতিবেশী, বাজার-ঘাটে, দোকানদার থেকে শুরু করে চারুকলা অঙ্গনের দারোয়ান, পিয়ন, কর্মচারী, কর্মকর্তা, শিক্ষক, ছাত্র সবার সাথে সদালাপী ছিলেন। চারুকলায় তিনি একসময় টিনশেডে (বর্তমান লেকচার থিয়েটার) বসতেন। সেই ঘরে শুধু প্রাচ্যকলার ছাত্র-শিক্ষকই নন, অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকরা এসে তাঁর সাথে গল্প করতেন। চলত চা-পানের আড্ডা। যার মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে কথা বলতেন। খুব মনোযোগী না হলে সে কথা বোঝা যেত না। কেন এমন ছোটো স্বরে কথা বলেন—এ প্রশ্ন গবেষক একদিন করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষকে কাছে নিয়ে আসার জন্যই ছোটো স্বরে কথা বলি, যাতে শোনার জন্য কাছে আসে।' উত্তরে হয়তো ঠাট্টা মেশানো ছিল। তবে সত্যিই তিনি কাছে টানতে পারতেন। ছাত্ররা শিক্ষকদের সামনে সাধারণত চেয়ারে বসে না। শওকাতুজ্জামান ছাত্রদের চেয়ারে বসাতেন, চা খাওয়াতেন, পান খাওয়াতেন, অনেক ছাত্র-ছাত্রী শখে পড়ে তাঁর মতো পান খেতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সাহিত্যের স্বরূপ* প্রবন্ধে লিখেছেন, 'যিনি ছাত্র-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদর্শ ছেলেটা আপনি ছুটে আসে, মোটা গলার ভিতর থেকে উদ্ভাসিত হয় প্রাণে ভরা কাঁচা হাসি।'[২৪]—এই হাসি শওকাতুজ্জামানের মুখে দেখা যেত। তিনি ছাত্রদের শিল্পশিক্ষার ক্লাসে, খেলার মাঠে যখন যেভাবে থাকতেন এই তারুণ্যভরা হাসিই হাসতেন।

প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রথম যাঁরা ভর্তি হয়ে আসতেন তাঁদের তিনি প্রাচ্যকলা বিভাগ সম্পর্কে বোঝাতেন, গল্প করতেন। প্রাচ্যকলা ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের মধ্যবর্তী স্থানে যত দিন কলাগাছ ছিল তত দিন তিনি প্রথমে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের কলাগাছ আঁকাতেন প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে। ওয়াশ পদ্ধতি নানা রকম টেকনিকে করা যায়। শওকাতুজ্জামানের পদ্ধতি ছিল আব্দুস সাত্তার এবং নাসরীন বেগমের পদ্ধতি থেকে আলাদা। তিনি ছাত্রদের ছবির যেখানে যে রং প্রথমে সে রং দিয়ে দিতে বলতেন, তারপর ছবিকে ভিজিয়ে অপ্রয়োজনীয় রং তুলে ফেলতে বলতেন। এভাবে রং লাগানো এবং প্রয়োজন অনুসারে রং ওঠানো এবং ছবির ওপরে একরঙা ওয়াশ দিয়ে ছবি আঁকতেন। কখনো নীল, কখনো বাদামি, কখনো বা ছবির প্রয়োজন অনুসারে রং বানিয়ে নিয়ে পাতলা করে বারবার ওয়াশ দিয়ে পরে ছবির ফিনিশিং টাচ দিতেন। এতে ছবির মধ্যে একাধিক গ্রেইন তৈরি হয়ে রঙের মায়াবী আবেশ তৈরি হতো। তিনি ছাত্রদের পদ্ধতিগত দিকটা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতেন। প্রাচ্যরীতির কাজগুলো কয়েকটি ধাপে শেষ করতে হয়। সেই ধাপ অনুসারে ছাত্ররা যখন যেখানে ঠেকে যেতেন তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। ছবিতে কীভাবে প্রাচ্যরীতির ষড়ংয়ের গুণাবলি আনতে হয়, তা বুঝিয়ে দিতেন।

চিত্র ৫৩ : শিরোনামহীন (স্কেচ)

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মূলত শান্তিনিকেতনের নন্দলাল ঘরানার শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। ছাত্রদের সাথে নিজেও ছবি আঁকতেন। এতে ছাত্ররা বিভিন্ন করণ-কৌশল সম্পর্কে ধারণা পেতেন।

তাঁর নিজের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি ধরাবাঁধা বিষয় নির্বাচন করতেন না। প্রথমে ওয়াশে রং চাপানোর পর চিত্র জমিনের আকৃতি ও ফর্ম অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে ছবির অবজেক্টের রূপ দিতেন। ছাত্রদের ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। ছবির রূপ-রস, প্রাণ এবং অবনীন্দ্রনাথের ভারত-ষড়ঙ্গ বিভিন্ন রকম জীবনাভিজ্ঞতার গল্প দিয়ে ক্লাসের ছাত্রদের বোঝাতেন। শিল্পী আব্দুস সাত্তার ছাত্রদের কোনো কাজকে নষ্ট বলতেন না। তেমনি শওকাতুজ্জামান ছাত্রদের কোনো কাজ নষ্ট প্রায় হলে নিজ হাতে তুলির ছোঁয়া দিয়ে ম্যানেজ করতেন। ফেলে দেয়া কাজও তাঁর তুলির ছোঁয়ায় মূল্যবান ছবি হয়ে উঠত।

তাঁর শিক্ষকতার বিশেষ কৌশলে তিনি ছাত্রদের চেতনাকে জাগ্রত করতে পারতেন। তাঁর স্নেহের পরশ, বোঝানোর ভঙ্গি, উপদেশ, উৎসাহ, সান্নিধ্য একজন আদর্শ শিক্ষকের সকল গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত। জগৎসংসারের জ্ঞান-আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্রদের শিল্পজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করাতে পারতেন। তিনি জানতেন ছাত্রদের সাথে কেমন করে ভাব জমাতে হয়। কেমন করে মায়ার বাঁধনে আটকে নিয়ে তাঁদের ভেতরের শিল্পসত্তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। তিনি লেকচার না দিয়ে ছোটো ছোটো উপমা ও উদাহরণে গভীর বিষয়কে সহজ করে বোঝাতেন।

দশ

শিল্পী শওকাতুজ্জামানের শিল্পীজীবন, শিল্পকর্ম, শিল্পভাবনা ও বাংলার প্রাচ্যশিল্পে তাঁর অবদান নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায় তা নিম্নরূপ :

(১) বিভিন্ন মাধ্যমে টেম্পারা করেছেন। কাগজ, বোর্ড, ক্যানভাসে—জলরং, অ্যাক্রেলিক ও মিশ্র মাধ্যমে কাজ করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

(২) রঙের ব্যঞ্জনাই তাঁর কাজের মূল শক্তি।

(৩) তাঁর চিত্রে ফর্ম ও রঙের সলিডিটি লক্ষ করা যায়। এই সলিডিটি ঘনত্ব ও ওজন নির্দেশক নয়, বরং এর বায়বীয়তা তৈরি করে।

(৪) প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেদাভেদ মুছে দিয়ে তাঁর কাজে অভিব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(৫) ছাত্র উপদেষ্টা ও খেলাধুলা পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

(৬) একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখের কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল।

(৭) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা, মানসিক যন্ত্রণা বিষয়ে বন্ধুর মতো জানতেন এবং সমাধান দিতেন।

(৮) শিশু চিত্রাঙ্কন শিক্ষার বই লিখেছেন।

(৯) শিশু-কিশোর উপযোগী প্রবন্ধ, গল্প লিখেছেন, যার মধ্যে শিল্পকলাবিষয়ক কথা ধৃত আছে।

(১০) পত্রপত্রিকায় চিত্রসমালোচনা এবং শিল্পবিষয়ক গবেষণাধর্মী লেখা লিখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী শওকাতুজ্জামান বিভিন্ন মাধ্যম, টেকনিকে বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তাই নির্দিষ্ট কোনো ধারা তাঁর কাজের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর কাজের চেয়ে শিক্ষক হিসেবেই বেশি অবদান রেখেছেন। এমন একজন শিক্ষক প্রাচ্যকলা বিভাগে ছিলেন বলেই প্রাচ্যরীতির ধারা প্রতিষ্ঠায় অনেক অনুরাগী হয়েছেন। পরিশেষে একথা বলা যায়, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা বিভাগে শওকাতুজ্জামানের ভূমিকা অপরিসীম।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ", দ্র. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২২৯

২. শওকাতুজ্জামানের ভাই আসাদুজ্জামান অশ্রু লিখিত শওকাতুজ্জামান সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ৯ অক্টোবর, ২০১৩

৩. প্রাগুক্ত

৪. শিল্পী শওকাতুজ্জামানের ছোটো ভাই শহীদুজ্জামান শিল্পীর সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৪ জুলাই ২০১৩

৫. প্রাগুক্ত

৬. শওকাতুজ্জামানের ভাই আসাদুজ্জামান অশ্রু লিখিত শওকাতুজ্জামান সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ৯ অক্টোবর ২০১৩

৭. অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান (শওকাতুজ্জামানের স্ত্রী)-এর সাথে শওকাতুজ্জামান প্রসঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৮ অক্টোবর ২০১৩

৮. প্রাগুক্ত

৯. See. Catalogue, Showkatuzzaman, æShawkatuzzaman : Exhibition his Oriental Painting and drawings", alliance Francaise, 3rd November to 2nd December.

১০. ibid

১১. শওকাতুজ্জামান, দ্র. সুভেনিয়র, "শওকাতুজ্জামানের চিত্র প্রদর্শনী-১৯৮৮", চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্যালারী, শাহবাগ, ঢাকা ১৯৮৮

১২. "শিল্পী শওকাতুজ্জামান : রোমান্টিকতার ভিন্ন ভাষা", *ছুটি*, পৃ. ৬২ (পত্রিকাটির তারিখ সংগৃহীত হয়নি)

১৩. See. Catalogue, 7th Showkatuzzaman Painting Exhibition, Dhaka, Gallery 21, 2000

১৪. ফরিদা জামানের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

১৫. Showkatuzzaman, See, Catalogue, A Painting Exhibition of Showkatuzzaman, Dhaka, Alliance Francaise, Gallery, 1991

১৬. "শওকাতুজ্জামানের চিত্র প্রদর্শনী : সৌন্দর্য ও সংকট", দ্র. বাংলার বাণী সাময়িকী, *দৈনিক বাংলার বাণী* ১১ আশ্বিন ১৩৯৮ (১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১১

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. Kazi Abul Baset, See Catalogue, ibid

১৯. Showkatuzzaman, æMy words", see, 7th Showkatuzzaman Painting Exhibition, Dhaka, Gallery 21, 2000

২০. ওয়াজেদ আহসান খোকন, "শওকাত-উজ্জামানের চিত্র প্রদর্শনী চলছে", *দৈনিক ইনকিলাব* ২২ মে ২০০০, পৃ. ১৬

২১. রনি আহমেদ, "শওকাতুজ্জামানের প্রকৃতিচিত্র", *প্রথম আলো* ২৬ মে ২০০০

২২. Showkatuzzaman, æMy words", ibid

২৩. আব্দুস সাত্তার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ঢাকা, চারুকলা ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ৪৪

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাহিত্যের স্বরূপ", রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, ঢাকা, জয় বুক ইন্টারন্যাশনাল, ফাল্গুন ১৪০৬, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

নাসরীন বেগম

শিল্পী নাসরীন বেগম বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার মর্ম প্রতিস্থাপনের প্রথম নারী শিল্পী ও পথদ্রষ্টা। বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার ইতিহাসে প্রথিতযশা শিল্পী, শিক্ষক ও নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সাধক হিসেবে তাঁর অবদান অপরিসীম।

জলরং মাধ্যমকে প্রধান আশ্রয় করে তিনি বাংলাদেশের সমকালীন প্রাচ্যচিত্ররীতির স্বনামধন্য চিত্রকর। সৃজনশীল ও স্বকীয়তা গুণে গুণান্বিত শিল্পীব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতিটি চিত্রকর্ম তত্ত্ব ও অনুভবের মায়াজালে জারিত হয়ে প্রকাশিত। নন্দনতত্ত্বের আলোকে আধুনিক। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলাকে বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলায় স্থান দিয়েছেন—বর্ণাঢ্য রূপের মাধ্যমে। রং, ফর্ম, রেখার জাদুকরী বিন্যাসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রতিটি কাজের মধ্যে ধৈর্য, অভ্যাস, নিয়মানুবর্তিতা এবং শিল্পীর স্বাধীন লীলাখেলার চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান জলরঙে। তাঁর রং স্নান করায় কাগজকে। এ যেন কাগজের সাথে রঙের প্রেম। কাগজ ও রং জলের ধারায় স্নানসিক্ত হয়ে বস্তুর ভলিউম, ওজন, দূরত্বকে নির্দিষ্ট করে। বস্তু হয় বাস্তব, কখনো অধিবাস্তব। বস্তু বা অবজেক্ট পায় চৈতন্য—ফুটে ওঠে বিষয়বস্তু ও আত্মার স্বরূপ।

নাসরীন বেগম প্রকৃতির শিল্পী, প্রকৃতির পূজারি, সুন্দরের উপাসক। মস্তিষ্ক ও হৃদয় দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করেন। সারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তাঁর চোখে চিত্র হয়ে ধরা দেয়। এই চিত্র কখনো বাস্তব, কখনো পরাবাস্তব, কখনো কাল্পনিক। জীবনানন্দ দাশ—কবিতায় এঁকেছেন নিসর্গ আর নাসরীন বেগম নিসর্গের কবিতা লিখেছেন রঙে ও ফর্মে। যেহেতু শৈশব ও কৈশোর থেকেই বেড়ে উঠেছেন নগর জীবনে সেহেতু তাঁর চিত্র হয়েছে নগর-প্রকৃতির ভাষ্য। প্রকৃতির মধ্যেই নিজের সত্তাকে খোঁজেন শিল্পী। তাঁর চিত্র ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বিত রূপ।

অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার সূচনা হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। সেই রীতির বিকাশ বিস্তারের সূত্র ধরেই ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চায় প্রাচ্যকলা অর্থাৎ প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার গোড়াপত্তন হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার প্রথম ব্যক্তি ও বর্তমানে প্রাচ্যরীতির অন্যতম প্রধান শিল্পী আব্দুস সাত্তার। মূলত আব্দুস সাত্তারের শিক্ষকতায় বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। শিল্পী নাসরীন বেগম আব্দুস সাত্তারের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। অবিভক্ত ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও শিষ্য নন্দলাল বসুর সাথে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার গুরু আব্দুস সাত্তার ও শিষ্য নাসরীন বেগমকে একই অভিধায় ব্যাখ্যা করা যায়। পরবর্তী সময়ে এ দুই সুযোগ্য শিল্পী শিক্ষকের পরিচর্যায় বাংলাদেশের চারুকলা চর্চায় প্রাচ্যচিত্রকলা নিজস্ব অবস্থান তৈরি ও বিশ্বশিল্পকলায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান সময়ে প্রাচ্যরীতির চিত্রচর্চায় যাঁরা অবদান রাখছেন তাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে শিল্পী নাসরীন বেগমের শিল্পরীতি দ্বারা প্রভাবিত। শুধু তা-ই নয়, প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে রং ব্যবহারের দ্বিমাত্রিকতা

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক পাশ্চাত্য একাডেমিক চর্চারত শিল্পীদেরও আকর্ষিত করছে। সেক্ষেত্রে তাঁরাও কোনো-না-কোনোভাবে নাসরীন বেগমের কাজের টেকনিক দ্বারা উৎসাহিত কিংবা প্রভাবিত।

উল্লিখিত ভূমিকায় শিল্পী নাসরীন বেগমের শিল্পী প্রতিভার যে বর্ণনা দেয়া হলো সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য চলমান নিবন্ধে তাঁর ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস তুলে ধরা হবে। তাঁর জীবন-ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে শিল্পী হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত, শিল্পচর্চা, জীবন-উপলব্ধি, নন্দনভাবনা, শিল্পচর্চার টেকনিক, শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা, শিল্প-সমালোচকদের মতামত ও মূল্যায়ন, বিশ্বশিল্পকলা তথা বাংলাদেশের চিত্রকলায় তাঁর অবদান পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।

এক

নাসরীন বেগম ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট চুয়াডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। চুয়াডাঙ্গা তখন মফস্বল শহর। নানাবাড়িও ছিল বাবার বাড়ির পাশে। নানা-নানি চাকরিসূত্রে কলকাতা শহরে থাকতেন। তাই নানির পরিবারে দেখেছেন শিক্ষা-সংস্কৃতির মার্জিত চর্চা। সংগীত, শিল্পে এই পরিবারের প্রত্যেক সদস্য সম্ভ্রান্ত ও রুচিশীল। মা উম্মে কুলসুমের বাল্য-কৈশোর কেটেছে কলকাতায়। মায়ের আচার-আচরণ ও রুচিবোধে এক ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদের ছাপ ছিল স্পষ্ট। তাই নাসরীন বেগম বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন কৃষ্টির স্বাদ উপভোগ করেছেন শৈশবে।

কিন্তু চুয়াডাঙ্গাতে বেশি দিন থাকা হয়নি। বাবার বি.জি প্রেসে সরকারি চাকরিসূত্রে মাত্র তিন-চার বছর বয়সেই সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন। ঢাকাতে থাকতেন মতিঝিল কলোনিতে। এখানে মতিঝিল ওয়েলফেয়ার প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েন তখন তাঁর বড়ো বোনের কাছে ছবি আঁকার প্রেরণা পান। মতিঝিল ওয়েলফেয়ার প্রাইমারি স্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণি পাস করার পর তিনি মতিঝিল টি.অ্যান্ড.টি হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলে পড়ার সময় বইয়ের সাদা অংশে মানুষের মাথা আঁকতেন মন থেকে কল্পনায়। পরবর্তী সময়ে সুচিত্রা সেন, উত্তম কুমার, কবরী, রাজ্জাক প্রমুখ নায়ক-নায়িকার প্রতিকৃতি আঁকতেন।[১]

১৯৬৪ সালে বড়ো বোনের বিবাহ হয়। ঢাকা নিউমার্কেটে বড়ো বোনের বরের অর্থাৎ নাসরীন বেগমের দুলাভাইয়ের ‘সাগরিকা’ নামে একটি দোকান ছিল। বোন জামাইয়ের উৎসাহে নাসরীন বেগম ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় সাগরিকা দোকানের বিভিন্ন শো-পিসের ওপর এনামেল পেইন্ট করা শুরু করেন। উল্লেখ্য, ওই সময় তিনি কাজ করে প্রথম দুইশ টাকা হাতে পান। মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় এ উপার্জন তাঁর কাজে আরো উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। এ সময় তিনি বাঁশের তৈরি টেবিল-ম্যাট, অ্যাশট্রে, কলমদানি, টেবিল-ল্যাম্প প্রভৃতি দ্রব্যে ছবি এঁকে দিতেন। এসব চিত্র তিনি ছবি দেখেই আঁকতেন। এসব ছবিতে ছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য

(ল্যান্ডস্কেপ), বাঁশঝাড়, গ্রামের দৃশ্য, কলসি কাঁখে মেয়ে ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি ঝিনুকের সামগ্রীতে ছবি আঁকতেন। ঝিনুকের খোলসের উপরিতলের এই পেইন্টিং মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের সমরূপ।

চিত্র ০১ : ক্র্যাফটস পেইন্টিং (ঝিনুকের ওপর এনামেল কালার) আনুমানিক সময় : ১৯৭৩–৭৭

চিত্র ০২ : ক্র্যাফটস পেইন্টিং (ঝিনুকের ওপর এনামেল কালার) আনুমানিক সময় : ১৯৭৩–৭৭

চিত্র ০৩ : ক্র্যাফটস পেইন্টিং (ঝিনুকের ওপর এনামেল কালার) আনুমানিক সময় : ১৯৭৩–৭৭

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া এনামেল রং ব্যবহার করে সূক্ষ্ম রেখার মাধ্যমে এসব চিত্র অঙ্কন নাসরীন বেগমের প্রতিভাকে উন্মোচিত করে। তা ছাড়া নিছক শখে নয়, এত অল্প বয়স থেকে ছবি এঁকে উপার্জন করতেন লেখাপড়ার ব্যাঘাত না করে। এজন্য সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্কুলের সময়ের পর বাসায় নিজের কাজগুলো গুছিয়ে নিতেন। এরপর বিকেলে খেলাধুলা না করে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ছবি আঁকতেন। সন্ধ্যার পর করতেন স্কুলের পড়াশোনা। ছবি আঁকার বিনিময়ে নিয়মিত টাকা হাতে পেতেন। এই টাকা তিনি মায়ের হাতে দিতেন। তিনি এই কমার্শিয়াল কাজগুলো অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করতেন। ফলে প্রতিটি কাজে থাকত শৈল্পিক অনুভূতি। কাজের প্রতি তাঁর গভীর টানেই কমার্শিয়াল কাজগুলো শৈল্পিক মাত্রা পেত। তিনি স্বাধীনভাবে ছবি আঁকতেন। কারণ কোনো বিষয় তাঁকে বেঁধে দেয়া হতো না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো ক্র্যাফট সামগ্রীর ওপর ছবি আঁকতেন।

খেলার সময় বাদ দিয়ে ছবি আঁকলেও তাঁর মানসিক বিনোদনের কমতি ঘটেনি। কারণ রেডিও শুনতেন। আকাশবাণী কলকাতার পরিবেশিত নাটক শুনতেন নিয়মিত। বাবা বি.বি.সি সংবাদ শুনতেন—নাসরীনও তাই দেখে সংবাদ শুনতেন। এ ছাড়া বাবা বিভিন্ন দেশের পত্রিকা রাখতেন। এসব পত্রিকায় মুদ্রিত ছবিগুলো দেখে নাসরীন বেগম শিল্প সম্পর্কে জানতে পারতেন।

সাধারণত ক্যালেন্ডারে ও সাময়িকীতে প্রকাশিত পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের ফিগারেটিভ চিত্রগুলো প্রকাশিত হতো। এই চিত্র দেখে তিনি বিমোহিত হতেন। এ ছাড়া পাশ্চাত্যের মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, সালভাদর ডালি, বতিচেল্লির চিত্র দেখে বিমোহিত হতেন। বিমোহিত হতেন মায়ের সূচিশিল্পের কাজ দেখে। এভাবে নাসরীন বেগমের স্কুলজীবনে শৈল্পিক ভিত গড়ে উঠেছিল। নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

পড়ালেখা, হ্যান্ডিক্র্যাফটস পেইন্টিং করার মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালে কৃতিত্বের সাথে অঙ্কে লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিশনে এস.এস.সি পাস করেন। ড্রয়িং ডিজাইনে সৃজনশীল প্রতিভা থাকার কারণে স্কুলের বিভিন্ন রকম মানপত্র তাঁকে দিয়ে করানো হতো। ছবি আঁকার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে প্রবল উৎসাহের সাথে এসব কাজ করতেন। ফলে চিত্রকলার করণ-কৌশলে দক্ষতা এবং হ্যান্ডিক্র্যাফটস পেইন্টিংয়ে অপ্রতুল দক্ষতাই নাসরীন বেগমের শৈল্পিক দৃষ্টির ম্যাচিউরিটি হয়েছিল। স্বাধীনতাযুদ্ধের ভয়াবহতা ও অনিশ্চয়তা সামাজিক ও রাজনৈতিক বোধ তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন স্বপ্ন তাঁর জীবন-স্বপ্নকে সুদৃঢ় করেছিল। তবে এই স্বপ্ন দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছিল ১৯৭২ সাল। এ সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান একমাত্র ভাই। চার বোনের একমাত্র ভাইয়ের অকালমৃত্যুতে পুরো পরিবারে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় নেমে আসে বিপর্যয়। মানসিক অস্থিরতা, মায়ের দুঃখ, নতুন বাংলাদেশ, নিজের শিল্পচর্চা—সব মিলে প্রতিকূল সময় অতিক্রম করেছেন নাসরীন বেগম।

দুই

১৯৭২ সালের এস.এস.সি পাসের পরবর্তী সময়ে নাসরীন বেগম ঢাকায় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। চারুকলায় পড়াশোনার ব্যাপারে মায়ের কুলের আত্মীয়স্বজনই বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন। নিজে একজন সুদক্ষ হ্যান্ডিক্র্যাফটস পেইন্টার হলেও চারুকলার পড়াশোনার ধরন-ধারণ প্রসঙ্গে তেমন কোনো জ্ঞান ছিল না। তবুও বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে গিয়ে তিন দিনব্যাপী ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে বি.এফ.এ প্রি-ডিগ্রিতে ভর্তি হলেন ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষে। সহপাঠী ছিলেন জামাল আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। প্রি-ডিগ্রি কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন বর্তমান সময়ের স্বনামধন্য শিল্পী মাহমুদুল হক, শহীদ কবির, মাহবুবুল আমীন ও কাজী গিয়াসউদ্দিনকে। প্রথম বর্ষে পেনসিল স্কেচ ও স্টিল লাইফ করেছেন। প্রথম দিকে স্টিল লাইফ ভালো হলেও স্কেচ ভালো পারতেন না। না পারা বিষয়কে জয় করার অদম্য ইচ্ছা নাসরীন বেগমের ছেলেবেলা থেকেই। নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার অদম্য বাসনায় দলবেঁধে স্কেচ করতে যেতেন ঢাকা শহরের আনাচকানাচে। কখনো নদীর ওপার, কখনো রায়ের বাজারের কুমোর বাড়ি, আবার কখনো মতিঝিল কলোনি প্রভৃতি জায়গায় অসংখ্য স্কেচ করার মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২]

নাসরীন বেগম ছোটোবেলা থেকেই চটপটে, স্পষ্টভাষী ও প্রতিবাদী। ক্লাসের শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজের জানা ও বোঝার বিষয়গুলো আদায় করে নিতেন। যা বুঝতেন না—প্রশ্ন করে শিক্ষকদের কাছ থেকে বুঝে নিতেন। প্রি-ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষে কাজী গিয়াসউদ্দিন স্যার জলরং শেখাতেন। এই কাজী গিয়াসউদ্দিনের জলরঙের বিশেষ ব্যবহার কৌশল নাসরীন বেগমের সারা জীবনের পাথেয় হয়ে আছে। যা তিনি এখনো পর্যন্ত নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। ১৯৭৫ সালে প্রি-ডিগ্রি শেষ হলে প্রাচ্যকলা বিভাগে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হন। নাসরীন বেগম আজীবন জলরংকেই ভালোবাসেন। প্রাচ্যকলা বিভাগের জলরং-প্রধান চিত্র অঙ্কন, মোগল

Dhaka University Institutional Repository

মিনিয়েচারধর্মী চিত্রকর্মের সূক্ষ্ম লাইন ও ডিটেইল কাজে তিনি পূর্বেই পারদর্শী ছিলেন। এজন্য প্রাচ্যকলা বিভাগে গিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সময় লাগেনি। বিভাগের শিক্ষক শিল্পী আব্দুস সাত্তার তখন তরুণ শিক্ষক। প্রাচ্যকলা থেকে পাস করা মেধাবী ছাত্র। তাঁর চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষের ব্যাচে সবচেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হন। নাসরীন বেগম, প্রমীলা মিনা, ফৌজিয়া ইয়াসমিন, শাম্মী ইয়াসমিন, রেবেকা সুলতানা, শওকত আলীসহ মোট আটজন ছাত্র-ছাত্রী ছিল এই ব্যাচে। এর পূর্বে ১৯৫৫ সাল থেকে এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতো অনিয়মিত। হাতেগোনা অল্প কয়েকজন ছাত্রই বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে পাস করেছিল। যেহেতু ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি, সবাই কাজ করতে আগ্রহী সেহেতু প্রাচ্যকলা বিভাগে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছিল। প্রত্যেকে শুধু সিলেবাস ও রুটিন অনুযায়ী ছবি আঁকতেন না। সিলেবাসের বাইরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন অনুশীলন করতেন তেমনি ক্লাসের অতিরিক্ত সময়েও কাজ করতেন। নাসরীন বেগম ছিলেন সবার মধ্যমণি। তিনি সকলের ড্রয়িংয়ের ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। অর্থাৎ শিক্ষকের অভাব তিনি পূরণ করে দিতেন।

উল্লিখিত ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাসের ক্রম অনুসারে নাসরীন বেগম প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা অর্থাৎ প্রাচ্যরীতির চিত্রচর্চায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্তমান সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক, বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রাচ্যরীতির শিল্পী।

নাসরীন বেগম প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতি চিত্রকলা চর্চায় ছাত্রী হিসেবে যোগদান করে বর্তমান অবধি প্রায় ৪০ বছর (১৯৪৫–২০১৩) নিরলস চর্চা করে আসছেন। প্রথম পর্যায়ে চারুকলায় বি.এফ.এ ডিগ্রি লাভ, তারপর বিদেশে প্রিন্টমেকিংয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন, সংসার জীবন, শিক্ষকতা, সংগঠন পরিচালনা বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যচিত্রকলার টেকনিক ও বিষয়-নির্ভর চিত্র অঙ্কন করে নিয়মিত প্রদর্শনী করে আসছেন। বহুবিধ মাধ্যম, টেকনিকে ছবি এঁকে রসিকজনের শিল্পপিপাসা মিটিয়ে চলেছেন। তবে তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের পথচলা ও শিল্পচর্চায় উত্থান-পতন হয়েছে। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও নিজের শিল্পী সত্তাকে সঠিক পথে চালনা করেছেন। তাঁর জীবন চলার প্রতিটি পর্বে পর্বোত্তরে চিত্রকর্মের ধারা ও টেকনিকে পরিবর্তন এসেছে। চিন্তা-চেতনা, পরিবেশ-পরিস্থিতির ঘূর্ণিপাকে ছবি আঁকার সময়কালকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। শিল্পীর মতে, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রাচ্যকলার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চার ও বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনের চিত্রাঙ্কন। ১৯৮০ থেকে ৮৩ সাল পর্যন্ত আই.সি.সি.আর (ICCR) স্কলারশিপে ভারতের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্টমেকিং বিষয়ে এম.এফ.এ পর্যায়ের শিক্ষা লাভ, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অন্ধকার কাল। কারণ এ সময় ছবি না এঁকে সংসারের বেড়াজালেই সময় কাটিয়েছেন, চাকরি করেছেন। ১৯৯০–৯২ সালে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতিকাল। এরপর ১৯৯২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ধারাবহিকভাবে বিভিন্ন সিরিজচিত্রের নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং ২০০০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধারায় চারটি বড়ো প্রদর্শনী।[৩]

২০০০ সালে সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য সিরিজচিত্র নিয়ে ডিভাইন আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী, ২০০৪ সালে বেঙ্গল গ্যালারিতে প্রদর্শনী, ২০০৬ সালে পাকিস্তানে প্রদর্শনী এবং ২০১৩ সালে এথেনা গ্যালারিতে প্রদর্শনী। প্রতিটি প্রদর্শনীর কাজে নতুন নতুন সৃজনশীল কাজ দেখিয়েছেন। প্রদর্শনীগুলো নাসরীন বেগমের সামগ্রিক

Dhaka University Institutional Repository

কাজের অর্থাৎ বিভিন্ন সিরিজ বা বিষয়চিত্রের নানাবিধ উত্তরণের কাজ দ্বারা সজ্জিত ছিল। অতএব, নাসরীন বেগমের সামগ্রিক জীবন-ইতিহাস ও তাঁর কাজ অভিন্নভাবে আলোচনার মধ্যেই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে চেনা যাবে। এজন্য উল্লিখিত জীবন-ইতিহাসে বিভিন্ন পর্বের চিন্তা-চেতনা, প্রতিকূলতা, সম্ভাবনা, বিভিন্ন সিরিজচিত্রের অনুপ্রেরণা, প্রেক্ষাপট ও কাজের মূল্যায়ন তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

তিন

নাসরীন বেগম ১৯৭৫ সালে প্রি-ডিগ্রি অর্জন করলে শিক্ষক মাহমুদুল হক প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ নাসরীনের কাজের সূক্ষ্মতা, কাজের প্রতি যত্ন ও ধৈর্য দেখে তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন নাসরীন প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী হবেন। এ ছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ালেখার সময় থেকে তিনি যে হ্যান্ডিক্র্যাফট পেইন্টিংয়ে সূক্ষ্ম মিনিয়েচারধর্মী এনামেল রং করতেন, তা চারুকলার শিক্ষা চলাকালীন সময়ে সমানন্তরালে চালিয়েছেন। একাধারে উপার্জন ছাড়াও তাঁর এ দক্ষতা চারুকলায় একাডেমিক কাজে যেমন সম্পূরক হয়েছে আবার চারুকলার জ্ঞান—শোলা, ঝিনুক, বাঁশ, বেত, দিয়ে তৈরি ফুলদানিতে টেবিল-ল্যাম্পে, ওয়ালম্যাটের ওপর এনামেল পেইন্টের উৎকর্ষে সহায়ক হয়েছে। ফলে কারুকলার এই মাধ্যমে তিনি চারুকলার সৃজনমাত্রা দিয়েছেন। তবে থেমে থাকেনি চারুকলার সৃজনশীল চর্চা। যার প্রমাণ মেলে তাঁর সেই সময়ের কাজে। তিনি প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষা দেয়ার পর রেজাল্ট পাওয়া ও ভর্তি হওয়ায় পূর্ববর্তী ছয় মাস সময়ে প্রাচ্যকলা বিভাগে গিয়ে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অনুশীলন করেছেন। এরপর তিনি ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে চারুকলার বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন।

চিত্র ০৪ : প্রাতঃকালের ঝাড়ুদার
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৭

চিত্র ০৫ : চারুকলার ছোটো পন্ড
জলরং, ৩০ × ৪১ সেমি, ১৯৭৭

চিত্র ০৬ : জলকে চলে
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৬

নাসরীন বেগম ফিগারেটিভ কাজ করতে বেশি পছন্দ করতেন। সরকারি চাকরিজীবী বাবা দেশ-বিদেশের পত্রিকা রাখতেন। বিশেষত পাকিস্তানে প্রাচ্যরীতির শিল্পী আব্দুর রহমান চুঘতাইয়ের ছবি-সংবলিত ক্যালেন্ডার আর পত্রিকায় বতিচেলির ছবি-সংবলিত পত্রিকা দেখে সুললিত ফিগার অঙ্কনে উৎসাহী হয়েছেন। তাঁর চিত্রের নারীরা উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত, পরিপাটি সাজগোজে সজ্জিত। ব্যক্তিজীবনের পরিপাটি আর গোছানো অভিব্যক্তিই তাঁর চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। নারীদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের বিশেষ মুহূর্ত, যার মধ্যে

বিষণ্ন, হতাশা, আনন্দের গল্পগাথা থাকে—নাসরীন বেগম তারই গল্প চিত্রিত করেছেন। গ্রামের নারীদের চিত্রণেও পরিপাটি পোশাক, গোছানো চুল বাঁধা রেখেছেন। বাউলের প্রেম-ভক্তিরত সংগীত পরিবেশন মুহূর্ত এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, অধ্যাত্মচেতনার সাথে তাঁদের দেহ-সৌন্দর্য ভাবরসে আপ্লুত হয়েছে। শিল্পীর এই কৌশল প্রশংসনীয়।

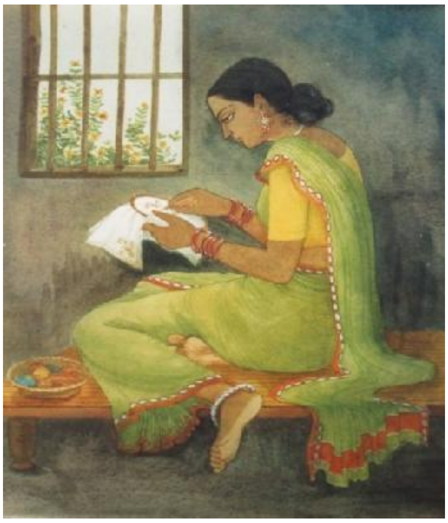

চিত্র ০৭ : সূচিকর্ম, জলরং
৪০ × ৩০ সেমি, ১৯৭৬

চিত্র ০৮ : সুকুমারী, জলরং, ১৯৭৮
১৯৭৯ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত

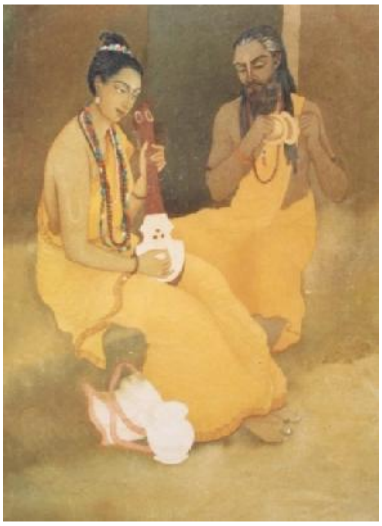

চিত্র ০৯ : বাউল, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৮

নাসরীন বেগম শুধু ক্লাসের কাজই করতেন না, সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত শ্রেণি নির্ধারিত ক্লাস করার পরবর্তী সময়ও বিভাগে বসে কাজ করতেন। এই সময় শিক্ষক আব্দুস সাত্তার বিভাগের একটি ছোটো রুমে বসে বাটিক করতেন। শিল্পী আব্দুস সাত্তারের কাছে বাটিক শিখেছেন। বি.এফ.এ সাবসিডিয়ারিতে প্রিন্টমেকিং, মৃৎশিল্প ও কারুশিল্পের কাজ শিখেছেন। শিক্ষক আব্দুস সাত্তার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনপ্রাণ দিয়ে কাজ শেখাতেন। নাসরীন বেগম আব্দুস সাত্তারের ওয়াশ পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন ভালো করে রপ্ত করেছেন। এ ছাড়া এগ টেম্পারা শিখেছেন। শিল্পী হাশেম খান যেহেতু ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের ছাত্র ছিলেন সেহেতু তিনি শেখাতেন অয়েল পেইন্টিং, ক্যালিগ্রাফি ও ডিজাইন এবং মুরাল পেইন্টিং। এভাবে নাসরীন বেগম তার বি.এফ.এ শিক্ষা জীবনে বহুমুখী মাধ্যমে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। বিভাগীয় সিলেবাসে ল্যান্ডস্কেপ ছিল না কিন্তু দলবেঁধে ল্যান্ডস্কেপ করেছেন ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। এ ছাড়া প্রিন্টমেকিং তাঁর পছন্দের হওয়ায় নিজের ইচ্ছামতো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রিন্টমেকিংয়ে কাজ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১০ : প্রসাধনরত, বাটিক
৯২ × ৬১ সেমি, ১৯৭৮

চিত্র ১১ : মা ও শিশু, বাটিক
৯২ × ৭৬ সেমি, ১৯৭৮

চিত্র ১২ : জলকে চলে, বাটিক
১০০ × ৭৬ সেমি, ১৯৭৮

রঙিন এই বাটিক চিত্র প্রাচ্যচিত্রকলায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বাটিক মাধ্যমে ওয়াশরীতির মতো ফিগারের লাবণ্য ও ভঙ্গি যুক্ত করে চিত্র মাধ্যমে নতুন দিগন্ত নিয়ে এসেছেন। তাঁর এই বাটিক চিত্রে হলুদ, লাল, সবুজ, কালো ও খয়েরি রং ব্যবহার করতেন। প্রিন্টমেকিংয়ের কাজে প্রাচ্যরীতির রেখা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছেন।

তিনি ল্যান্ডস্কেপ করতেন প্রাচ্যের ওয়াশ পদ্ধতির রং প্রয়োগ করে। তাঁর প্রতিটি কাজে গভীর দৃষ্টির ছাপ আছে। কারণ প্রতিটি অবজেক্ট-এর ফর্ম কালার লাইন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে চিত্রতলে চিত্রিত করেছেন। এই গভীরভাবে দেখা—প্রাচ্য-ঐতিহ্যের মোগল, কাংড়া, বাসুলি চিত্রশৈলীর বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। আর এই শৈলী বিচারেই নাসরীন বেগম প্রাচ্যশিল্পী।

নাসরীন বেগম ১৯৭৮ সালের বি.এফ.এ পরীক্ষা দিয়েছেন ১৯৭৯ সালে। ১৯৭৯ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে তিনি অর্জন করেন জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক। এই পুরস্কার প্রাচ্যকলা বিভাগে এখন অবধি আর কেউ পাননি। ১৯৭৮–৭৯ শিক্ষাবর্ষের এম.এফ.এ তিনি পড়েছেন ১৯৮০ সালে। এ সময় তিনি এম.এফ.এ ডিগ্রির অনুকূলে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে নিরীক্ষামূলক কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। এরপর তাঁর প্রাচ্যকলায় আর পড়া হয়নি। কারণ এম.এফ.এ ডিগ্রিতে পড়াশোনা করেছেন ভারতের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চার

নাসরীন বেগম ১৯৭৮ সালের বি.এফ.এ ডিগ্রি অর্জনের পর এম.এফ.এ ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করেন এবং ১৯৮০ সালে চারুকলার বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে নিরীক্ষামূলক কাজের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর জন্য এই ১৯৮০ সাল গুরুত্বপূর্ণ বছর। কারণ এ বছর তিনি সহপাঠীদের ঘটকালিতে সহপাঠী শওকত আলীকে বিয়ে করেন এবং একই বছর ভারতের আই.সি.সি.আর স্কলারশিপ পান। প্রিন্টমেকিংয়ে এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জনের জন্য চলে যান গুজরাটের মহারাজা সারাজিওয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৯৮০–৮৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন। প্রথমত, নতুন মাধ্যমের কাজ নিয়ে ভাবনা, দ্বিতীয়ত, পরিবার-পরিজন ছেড়ে নতুন পরিবেশে একাকী জীবন-যাপন, তৃতীয়ত, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হওয়ায় তাঁর এ পর্বের শিক্ষাপর্ব দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নাসরীন বেগম সবসময় অদম্য মানসিকতার অধিকারী। দুর্লভকে জয় করার জন্য চেষ্টা আর মনোবল সব প্রতিকূলতাকে হার মানায়। সেজন্যই তিনি প্রতিকূলতায় হাল ছেড়ে দেননি। জয় করতে চেষ্টা করেছেন, সফল হয়েছেন। তবে এই প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর মধ্যে যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল—তা ফুটে উঠেছে এ সময়কার প্রিন্টমেকিং চিত্রে। একাডেমিক রীতি অনুযায়ী তিনি এখানে প্রিন্টমেকিংয়ের চারটি মাধ্যমে কাজ করেছেন। মাধ্যমগুলো হলো লিথোগ্রাফ, উডকাট, স্ক্রিন প্রিন্ট ও এচিং।

চিত্র ১৩ : উডকাট

চিত্র ১৪ : দ্য ফেইস, লিথোগ্রাফ
৪০.৬৪ × ৩১.৭৫ সেমি, ১৯৮৩

চিত্র ১৫ : স্লিপিং লেডিস, ড্রাই পয়েন্ট
২৪.১৩ × ৩০.৪৮ সেমি, ১৯৮২

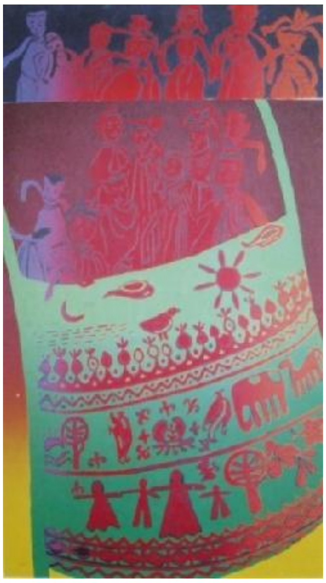

চিত্র ১৬ : দ্য ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড
৬৩ × ৩৬ সেমি, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

নাসরীন বেগম ছবি আঁকার বিষয় হিসেবে মানুষ, বিশেষত নারী ফিগারকে বেশি এঁকেছেন। তাঁর ফিগার অঙ্কনের মধ্যে বিশেষ দক্ষতা লক্ষ করা যায়। প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে অঙ্কিত নারীদের রূপ তিনি উডকাট মাধ্যমে এঁকেছেন, ড্রাইপয়েন্টে কিংবা লিথোগ্রাফের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। ছাপচিত্র মাধ্যমে তাঁর চিত্রগুলোতে প্রাচ্যরীতির রেখার নান্দনিক ব্যবহার লক্ষণীয়। শিল্পীর চিত্রে রেখা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনেছে। রেখার সুললিত ব্যবহারের মাধ্যমেই তাঁর চিত্রে বিষয়-চৈতন্য অনুভব করা যায়। তিনি বলেন :

> আমার ছবি প্রধানত রেখার কারুকাজ। রেখার মধ্য দিয়ে আমি আমার কথা বলি। সম্ভবত এক বাক্য যা বোঝাতে পারে না, আমার ছবির রেখায় তা মূর্ত হয়ে ওঠে। আমার তো মনে হয় রেখাই আমার আত্মার বাণীর বাহক। রেখার অপরিসীম ক্ষমতায় আমি প্রতিনিয়ত আলোড়িত হচ্ছি। আমার রেখা সম্ভবত আমার শিল্প দর্শনের গন্তব্য অভিমুখে প্রবাহিত হতে চায়। অসংখ্য রেখার কারুকাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বারবার খুঁজি। এভাবেই রূপ পায় অনেক ধরনের ফর্ম বা আকার, রেখার মাধ্যমে যখন বিভিন্ন ফর্ম তৈরি হয়ে যায় তখনই একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি হয় এবং এ আকার গুলোই দৃষ্টিকে নন্দিত করে।[৪]

উল্লিখিত মন্তব্যে শিল্পীর রেখা ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়েছে। বিষয় হিসেবে সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতিসৃষ্ট মানসিক অবস্থার অনুভূতিগুলো চিত্রে এসেছে। বাঙালি, নারী এবং মুসলিম—এ বিষয়কে সহপাঠী এবং তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক স্বাভাবিক চোখে দেখতেন না। ফলে নাসরীন বেগম অনেক ধরনের প্রতিকূল আচরণের শিকার হয়ে হতাশায় ভুগতেন। এই হতাশার অভিব্যক্তিই তাঁর চিত্রে উঠে এসেছে। তবে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—তাতে সমাজ, মানুষ এবং নারী হিসেবে নারীর প্রতিকূলতা বিষয়ে বাস্তবসম্মত উপলব্ধি অনুভব করতে পেরেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা অনেকটাই অসহায়। ইচ্ছা করলেই একজন নারী সবকিছু করতে পারে না; সমাজ তা করতে দেয় না। আবার সমাজের পুরুষের লোলুপদৃষ্টি থেকে বাঁচতে হলেও নারীর মধ্যে বিষধর সাপের ফনা সজাগ করে রাখতে হয়। এই ভাবনা থেকে তাঁর নারীর প্রতিকৃতিতে কখনো কখনো সাপের উপস্থিতি প্রতীকী হিসেবে এসেছে। Fantasy world নামের স্ক্রিন প্রিন্ট চিত্রে মানুষের জীবন-দর্শনকে প্রতীকীভাবে চিত্রায়ণ করেছেন। Fantasy world নামের এই চিত্রে আপাতদৃষ্টিতে একটি ব্যাগের ডিজাইন দেখানো হয়েছে। এই ব্যাগের মধ্যের মানুষজন সুখী এবং এর বাইরে অতৃপ্ত মানুষ। ব্যাগের বাইরের মানুষ ভেতরের মানুষদের সুখী মনে করছে আর ব্যাগের ভেতরের মানুষ বাইরের মানুষদের সুখী মনে করছে। অর্থাৎ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের নিগূঢ় তত্ত্বটি রূপায়ণ করেছেন একটি রঙিন ব্যাগের ডিজাইনে।

নাসরীন বেগম বরোদাতে দুই বছরের এম.এফ.এ কোর্স শেষ করেছেন তিন বছরে। অর্থাৎ তিনি ১৯৮৩ সালে অর্জন করেছেন এম.এফ.এ ডিগ্রি। এই সময়ের মধ্যে তিনি ছাপচিত্র মাধ্যমে যেসব কাজ করেছেন তার সম্ভার নিয়ে প্রায় ২০ বছর পরে ২০০১ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের জয়নুল গ্যালারিতে ৪২টি ছবি দিয়ে পঞ্চম একক প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীতে ছবি দেখে গাজী রফিক যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে :

> চারুকলার জয়নুল গ্যালারিতে প্রদর্শিত নাসরিন বেগমের ৪২টি ছাপচিত্র দেখে তাতে এমন এক সংবেদনকে খুঁজে পাওয়া গেল যা কবিতার ঠিক কাছাকাছি যেন। খোলাসা করে বললে অনেকগুলো ছবিতে কবিতার মত তীব্র দ্রোহকে অনুভব করা যায়। তাঁর প্রায় ছবিতেই একপ্রকার নিঝুম নিস্তব্ধতা তাঁর বক্তব্যের অতিরিক্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ

১৯৮৩ সালে ভারত থেকে ফিরে এসে নাসরীন বেগম সংসারের দৈনন্দিন কর্মজালে নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখেন। সংসারের কর্মের বাইরে সময় নিয়ে ছবি আঁকা দুরূহ হয়ে পড়ছিল। এমন সময় কর্মজীবী শ্রেষ্ঠ সহপাঠী বন্ধুরা বাসায় বেড়াতে এসে নাসরীন বেগমের এ অবস্থা দেখে বিস্মিত হন—যে ছিল সবার চেয়ে ভালো ছাত্রী—সে সংসারের কর্মজালে ছবি আঁকা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে! এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তাঁরা তাঁকে চাকরি করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং একটি সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করতে বলেন। পরামর্শ অনুযায়ী নাসরীন বেগম আবেদন করেন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের মে মাসে Rural Development Center of Mothers Club-এর Social Service Department-এ ডিজাইনার পদে যোগ দেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের এই সরকারি চাকরির কাজ ছিল সারা বাংলাদেশে জেলাগুলোতে পোশাক শিল্পের এমব্রয়ডারির ডিজাইন সরবরাহ করা। চাকরি এবং সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ছবি আঁকা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এ সময় ভেতরে ভেতরে ছবি না আঁকতে পারার যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। এই প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি সংসারে থেকে শিল্পী হাশেম খানের সহায়তায় প্রথম একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ১৯৮৬ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আমন্ত্রণে কানাডার Toronto Conversation Center and Del Bello গ্যালারিতে The Third Annual International Exhibition of Miniature Art-এ অংশগ্রহণ করেন। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে তিনি ছয়টি মিনিয়েচার চিত্র অঙ্কন করেন। ফিগারেটিভ এই চিত্রে নারী ফিগারের ভঙ্গি, পরিহিত শাড়ি, আশপাশের আসবাবপত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো লাইনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন—জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে।

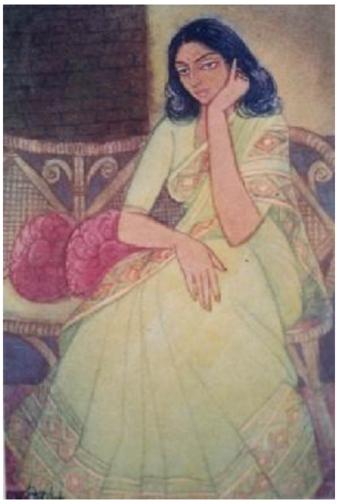

চিত্র ১৭ : ভাবনারত, জলরং
১০.১৬ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯৮৮

চিত্র ১৮ : চিন্তারত, জলরং
১০.১৬ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯৮৮

চিত্র ১৯ : প্রসাধনরত, জলরং
১০.১৬ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯৮৮

সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে চাকরি করেছেন ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই চাকরিকালীন সময়ে নাসরীন বেগম ১৯৮৭–৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রাচ্যকলা বিভাগে

Dhaka University Institutional Repository

খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন। এরপর ১৯৮৯ সালের ১০ জানুয়ারি একই বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। চারুকলায় শিক্ষকতায় যোগদানের পর চিত্রচর্চার সাথে আবার সরাসরি যুক্ত হন এবং ১৯৯১ সালে লা গ্যালারিতে রোকেয়া সুলতানার সাথে Two Women's Show শিরোনামে প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীর চিত্রগুলো নারী ফিগারের বিভিন্ন ইমোশন জলরং, প্যাস্টেল ও মিশ্র মাধ্যমে এঁকেছেন।

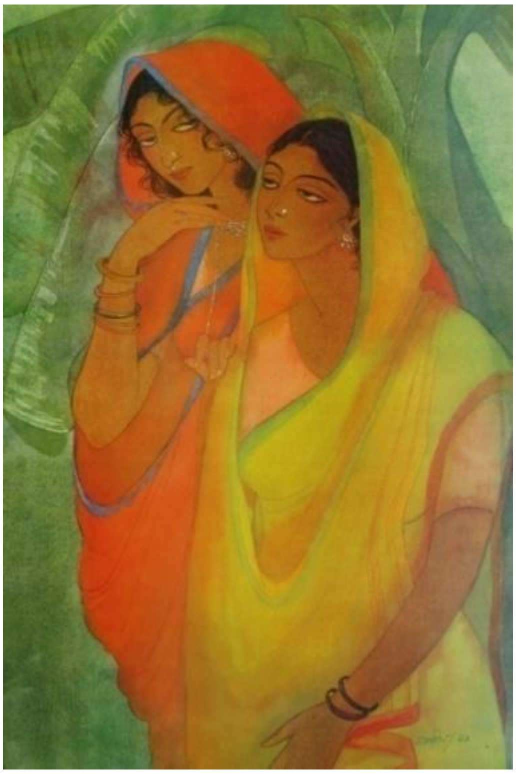

চিত্র ২০ : কলাবৌ, জলরং, ৬০ × ৩৮ সেমি, ১৯৮৯

চিত্র ২১ : Lovely, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি, ১৯৯১

এই প্রদর্শনীর নির্বাচিত চিত্রগুলো দিয়ে পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কম্পানি লিমিটেডের ১৯৯২ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়। ক্যালেন্ডারের ব্যবহৃত চিত্রগুলোতে নাসরীন বেগম মোগল চিত্রকলা থেকে বেঙ্গল স্কুল পর্যন্ত চিত্রধারায় রসদ সংগ্রহ করে রমণী চরিত্র এঁকেছেন। রমণীদের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, ভালোবাসা, আনন্দ-বেদনা-বিরহ, স্বপ্ন, অপেক্ষার বিভিন্ন অনুভূতির অভিব্যক্তি চিত্রিত করেছেন।[৬]
বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতির ধারার চিত্রকর্ম দিয়ে এমন একটি ক্যালেন্ডার বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়ায় প্রাচ্যচিত্ররীতির চিত্রকলা সকলের দৃষ্টিকে নন্দিত করেছিল, যা একাধারে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার প্রসারেও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ছয়

নাসরীন বেগম ১৯৯২ সাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করেন শিল্পচর্চা। এবার ছবির সাথে প্রেম, প্রকৃতির সাথে প্রেম। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে নানা রকম অনুভূতি চিত্রায়িত করতে থাকেন। ১৯৯২ সালে অঙ্কিত ‘উৎসবের পরে’ (After Ceremony) চিত্রটি একটি বিখ্যাত চিত্র। এই চিত্রে উৎসব-পরবর্তী একটি বাড়ির

দৃশ্য দেখানো হয়েছে। বাড়ির সাজসজ্জা এবং আল্পনা বাঙালি বিয়েবাড়িকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানে সাজানো আল্পনা, রঙিন কাগজে নকশা কাটা ঝালর, ফুলের টব—সব বিষণ্নতায় পড়ে থাকে উৎসব-পরবর্তী সাক্ষী হয়ে। নিস্প্রাণ, নিশ্চুপ বাড়িঘর গভীর বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মূলত নিজের জীবনের বিবাহ-বিচ্ছেদের গভীর বেদনা চিরন্তন সত্যের রূপ নিয়েছে এই চিত্রের গভীরে। এই সত্য শুধু বিবাহ-বন্ধন ও বিবাহ-ভাঙন পরিস্থিতি নয়, জীবনের রঙিন সময় ও সময়-পরবর্তী বেদনাঘন অবস্থার ইঙ্গিত দেয় দর্শক মনে। উৎসব বাড়ির প্রাঙ্গণে যে ফুলের টব এঁকেছেন, সেই টবের ফুলে সবুজ কোনো পাতা নেই। এই সময়কার চিত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। প্রাচ্যরীতির ফিগারেটিভ প্রধান ছবি ছেড়ে তাঁর চিত্রের বিষয় হয়ে ওঠে পরিবেশ, ভোরের সকাল, চাঁদনি রাত প্রভৃতি।

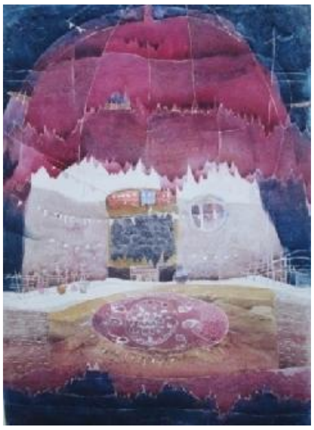

চিত্র ২২ : উৎসবের পরে
(After Ceremony)
জলরং, ৭১ × ৫৬ সেমি, ১৯৯২

চিত্র ২৩ : নতুন জীবনের দরজা
(The Door of a New Life)
জলরং, ১৯৯৩

চিত্র ২৪ : মর্নিং (Morning)
জলরং, ৩০ × ২৭ সেমি, ১৯৯২

দ্য ডোর অব এ নিউ লাইফ সিরিজচিত্রে নাসরীন বেগম রঙিন দরজা দেখিয়েছেন। মানুষের জীবনের নতুন নতুন দরজা উন্মোচিত হয় জীবন চলার পথে। দরজা খুললেই নতুন দিগন্ত। তাই দিগন্ত কখনো জীবনের বিভীষিকা নিয়ে আসে। কখনো জীবনকে নিয়ে আসে আলোর পথে। শিল্পী নাসরীন বেগম আলোর পথের সন্ধানী। তিনি তাঁর শিল্পী জীবনের দ্বারোদ্ঘাটন করতে স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন সমাজ-সংসারের বাইরেও তাঁর শিল্পপিপাসার স্বপ্ন, শিল্পপথে নতুন দরজার দ্বারোদ্ঘাটনের অভিলাষ। ১৯৯২ সালে বিবাহ বিচ্ছেদে *উৎসবের পরে* যে সিরিজচিত্র এঁকেছেন—নবজীবনের দরজা সিরিজচিত্রে নিজের শিল্পপথে আশার আলোয় নতুন দরজার স্বপ্ন দেখেছেন। শিল্পী আব্দুস সাত্তার লিখেছেন :

> *নবজীবনের দরজা* বাহুল্য বর্জিত পরিশীলিত ও মার্জিত রুচিবোধের চিত্র। অতি সাধারণ, নগণ্য অলংকরণ অথচ জমজমাট পরিবেশের অনুভূতি সমৃদ্ধ দরজা যেন কোন সম্মানিত অতিথির জন্য আধখোলা অবস্থায় অপেক্ষমাণ। দরজা পেরিয়ে রহস্যময় অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নবজীবনের হবে শুরু। এ এক কাব্যিক অনুভূতির রঙিন স্বপ্ন যেন। প্রজাপতি, লাল, সবুজ নানা রঙের কাগজের ঝালর ও পতাকায় সজ্জিত দরজা হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসায় কাব্যরসে সিক্ত এক অনন্য দৃষ্টান্ত।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৫ : চাঁদনি রাতে (Moonly Light)
জলরং, ১৯৯২

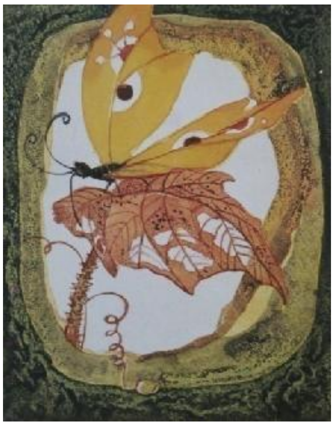

চিত্র ২৬ : প্রজাপতি (Batter Fly)
জলরং, ৪০.৬৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৩

চিত্র ২৭ : ফুল (Flower), জলরং
২৩.৭ × ১৪.৫ সেমি, ১৯৯৩

শিল্পী নাসরীন বেগম ১৯৯২ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু মননে-মস্তিষ্কে নতুন—প্রতিনিয়ত কাজের উত্তরণের বা উদ্ভাবনের জন্য তাড়িত হতেন। এ সময় প্রকৃতির নানা বিষয় তাঁর চিত্রে উঠে এসেছে। পথপ্রান্তে তিনি ফুটন্ত ফুলকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে অসীম মমতায় রূপায়ণ করেছেন। আবার ফড়িং কিংবা প্রজাপতির রঙিন ডানাকে বিস্তারিত করেছেন। চাঁদের মিষ্টি আলো এঁকেছেন নিসর্গের সাথে প্রেমময় রূপে।

১৯৯২ সালে ঘটে অন্য আরেকটি ঘটনা, যা নাসরীন বেগমের চিত্রের বিষয় আঙ্গিকে পরিবর্তন আনে। তিনি চট্টগ্রামের জার্মান কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে ১৫ দিনব্যাপী 'শিল্পী ও পরিবেশ' শিরোনামের আর্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। সারা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত শিক্ষকদের এই ওয়ার্কশপে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়ি সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেন। শিক্ষানবিশ সময়ে তিনি যে প্রাচ্যরীতির বিষয় নিয়ে চিত্র আঁকতেন তার সাথে পাহাড়ি পরিবেশ এবং চায়নিজ ইঙ্ক ও জিংক অক্সাইড ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন টেকনিকে নতুন ধরনের ফিগারেটিভ কাজ করতে শুরু করেন।

চিত্র ২৮ : চাঁদের আলোয়, কোলাজ ও জলরং
২৫.২৪ × ১৬.৫১ সেমি, ১৯৯৩

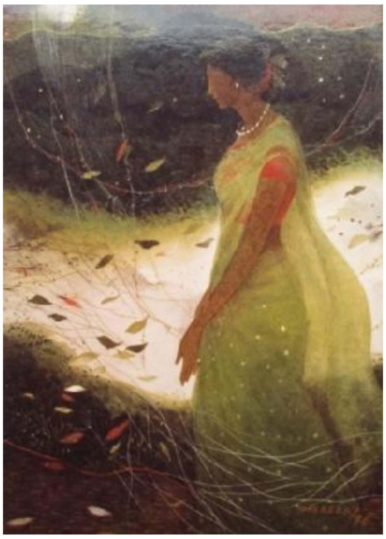

চিত্র ২৯ : চাঁদনি রাতে, জলরং
৫৪ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

নাসরীন বেগম এই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ দিয়ে ১৯৯৩ সালে একক প্রদর্শনী করেন গ্যালারি টোনে। যার শিরোনাম ছিল *Oriental Painting Exhibition*। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার ফর্মের ব্যবহারে যে নতুনত্ব সেই পথ তিনি দেখিয়েছেন এই পর্বের কাজগুলোতে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের করণ-কৌশলের সমন্বয় ও ফর্ম বিভাজন ও রেখার ব্যবহারে তাঁর চিত্রে স্বকীয় ধারা ও বক্তব্যকে এবং বিষয়ের গভীরতাকে অনুধাবন করতে সহায়ক হয়েছে। প্রদর্শনীর ক্যাটালগ শিল্পসমালোচক ও প্রাচ্যরীতির অন্যতম প্রধান শিল্পী আব্দুস সাত্তারের বিশেষণে ধরা আছে সেই প্রসঙ্গ। তিনি লিখেছেন :

> প্রাচ্যশিল্প ধারায় শিক্ষিত নাসরীনের সন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি ঘুরে ফিরছে নতুন ফর্মের অন্বেষণে। লতা, পাতা, ফুল, দরজা প্রভৃতির ফর্ম নাসরীনের কাজে জন্ম নিয়েছে নতুন আঙ্গিকে। রঙ, ফর্ম, স্পেস ও অলংকরণ প্রভৃতির নমনীয় স্বভাব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা তার চিত্রকে দিয়েছে গণতান্ত্রিক আবহ। দিয়েছে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন। ফলে চিত্রের বিষয়ত্ব তথা অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্নরূপে অনুভব করবার সুযোগ নেই। ছোট বড় নানা বিষয়ের অসংখ্য ফর্ম মিলে তার চিত্র 'ফর্ম-ইন ফর্ম'-এ রূপ লাভ করেছে।[৮]

সাত

১৯৯৫ সালে নাসরীন বেগম ডিভাইন আর্ট গ্যালারিতে তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীতে *ক্যাকটাস* সিরিজচিত্র, *অসংবদ্ধ জীবন* সিরিজচিত্র, *ফড়িং* সিরিজচিত্র ছাড়াও লাইট ইন দ্য ডার্কনেস, গার্ডেন, মুনলাইট নাইট, ঝরাপাতা প্রভৃতি প্রকৃতিনির্ভর চিত্র এঁকেছেন।

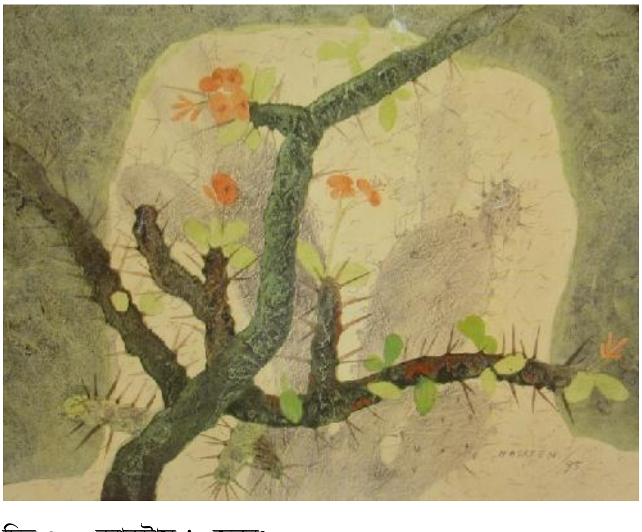

চিত্র ৩০ : ক্যাকটাস-১, জলরং
২৪.১৩ × ২৭.৯৪ সেমি, ১৯৯৫

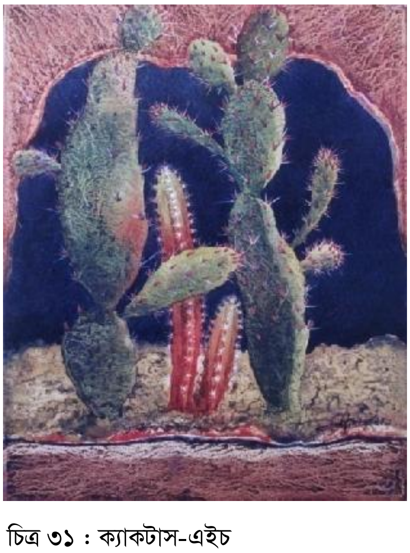

চিত্র ৩১ : ক্যাকটাস-এইচ
জলরং ২৪.১৩ × ২৭.৯৪ সেমি, ১৯৯৫

এ সময় তিনি ক্যাকটাসের প্রচুর ড্রয়িং করেছেন। যেখানেই ক্যাকটাসের সন্ধান মিলত সেখানে ছুটে যেতেন অনুশীলন করতে। ক্যাকটাস ভীষণ ভালো লাগত—এই ভালো লাগা থেকেই ছবি আঁকতেন। ক্যাকটাসের গায়ে খচিত কাঁটা এবং এই কাঁটার মধ্য দিয়েও সুন্দর ফুল শিল্পীর বিষয়-ভাবনায় স্থায়ী জায়গা করে নেয়। তাই পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন রূপক হয়ে তাঁর ক্যানভাসে ক্যাকটাস বিভিন্ন রূপে উঠে এসেছে।

ক্যাকটাস সিরিজের কাজের ফটোগ্রাফ দিয়ে Shawash Corporation Limited তাদের ১৯৯৬ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে। ফলে *ক্যাকটাস* সিরিজচিত্র সারা দেশের সাধারণ দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জলরঙের এই ক্যাকটাস চিত্র কম্পোজিশনে শিল্পী বিভিন্ন ধরনের আর্চের ফর্ম ব্যবহার করেছেন। কাগজের ধরন ও টেক্সারকে ব্যবহার করে জলরঙের সাথে পেনসিলের টোনাল গ্রেড ব্যবহার করে করণ-কৌশলে নতুনত্ব এনেছেন। ক্যাকটাস রিয়েলিস্টিক করে অঙ্কিত হলেও ফর্মগুলোর আদল দিয়েছেন নিজের মতো। ক্যাকটাসের 'রঙের' ক্ষেত্রেও এনেছেন পরিবর্তন। অর্থাৎ ক্যাকটাসের শুধু বহিঃরূপই নয়, শিল্পীর কল্পিত রূপটিও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কল্পনায় ক্যাকটাসের চেহারায় চোখ, মুখ, নাকও মূর্ত হয়েছে।

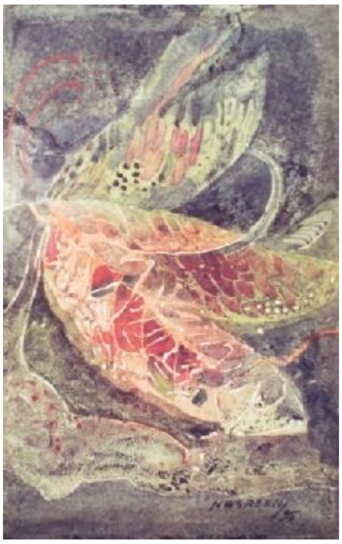

চিত্র ৩২ : ফড়িং সিরিজচিত্র, জলরং
২৫ × ১৩ সেমি, ১৯৯২

চিত্র ৩৩ : ফড়িং সিরিজচিত্র, জলরং
২৩.৭ × ১৪.৫ সেমি, ১৯৯৩

চিত্র ৩৪ : ফড়িং সিরিজচিত্র

ফড়িং সিরিজচিত্রে ফড়িংয়ের পাখায় নানান কারুকাজ—রং ও রেখার অপূর্ব সম্মিলনে এঁকেছেন। এই চিত্রে ফড়িংয়ের দেহ-সৌন্দর্য যেমন শিল্পিত উপস্থাপনা পেয়েছে তেমনি এর গভীরে শিল্পীর দৃষ্টিসীমার দিকটিও স্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণের দৃষ্টির আগোচরে একটি ঘাসফড়িং চিত্রের বিষয় হয়েছে—যার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৌন্দর্যের জ্যোতি ধরা আছে। শিল্পীর দৃষ্টি সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পেরেছে এবং দর্শকদের উপভোগ করাতে পেরেছে।

চিত্র ৩৫ : স্মৃতি থেকে 'ডি' (from Memory 'D')
জলরং, ২৮ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৩

চিত্র ৩৬ : অন্ধকার থেকে উৎসারিত আলো 'এ'
(Light in the Darkness 'A')
জলরং, ২৩.৭ × ১৪.৫ সেমি, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী নাসরীন বেগম *অসংবদ্ধ জীবন* (Unco-Ordinate Life) সিরিজচিত্রে লোকজ পুতুলের হুবহু ফর্ম ব্যবহার করেছেন। নেপথ্যের গল্প হলো—তিনি চট্টগ্রামের এক গ্রামীণ মেলা থেকে প্রাথমিক রং করা কুমোরদের তৈরি মাটির পুতুলধর্মী হাতি, ঘোড়া, পাখি কিনে নিয়ে আসেন। তাদের জীবনের সাথে মানুষের জীবনের নিঃসঙ্গতত্ত্ব একাত্ম ভাবনায় এঁকেছেন অসংবদ্ধ জীবন। এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাটির পুতুলকে।

স্মৃতি থেকে (From Memory) সিরিজচিত্র স্মৃতি রোমন্থনরত অবস্থায় ফেলে আসা অতীতের সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে দেখিয়েছেন। এ ছাড়া সাজানো বাগান, অন্ধকার হতে উৎসারিত আলো (Light in the Darkness) সিরিজচিত্রে আলোর উৎস দেখিয়েছেন।

সত্যিকার অর্থে নাসরীন বেগম নিত্যনতুন বিষয় ও চিন্তা নিয়ে ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতির মাঝে চলতে গিয়ে প্রকৃতির নানা বিষয় থেকে নিজের দর্শনকে রূপান্তর করেছেন। তাই এক একটি বিষয় বা সিরিজচিত্রের একাধিক ছবি আঁকেননি। বরং চলমান প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন বিষয় ভাবনা নিয়ে ছবি এঁকেছেন। ফলে একই সিরিজচিত্রে একাধিক রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

আট

নাসরীন বেগম ১৯৯৫ সালের পর ২০০০ সালে তাঁর চতুর্থ একক প্রদর্শনী করেন ডিভাইন আর্ট গ্যালারিতে। এই পাঁচ বছর (১৯৯৫–২০০০) পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সিরিজচিত্র অঙ্কন করেছেন। ১৯৯৬–৯৮ সালের মধ্যে করেছেন *বৃষ্টির পরে* (After Rain) সিরিজচিত্র। বৃষ্টি-পরবর্তী সবুজ মাঠ-ঘাটের যে রূপ হয় তাই দিয়ে কম্পোজিশন করেছেন জলরঙে। *রিফ্লেকশন* (Reflaction) সিরিজচিত্র এঁকেছেন ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক রঙে। আলোর এই প্রতিফলন শিল্পী অনুভব করেছেন প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর ওপর সূর্যের আলোর প্রতিফলন দেখে। এই প্রতিফলন যেমন আলোর গতিতে বস্তু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে হয় তেমনি তার সাথে সাযুজ্য দেখতে পান একই মানুষের বহুরূপ দেখে। এই *রিফ্লেকশন* সিরিজচিত্র মানুষের ভেতরের ও বাহিরের আলাদা রূপ দেখে ভাবতে শেখায়।

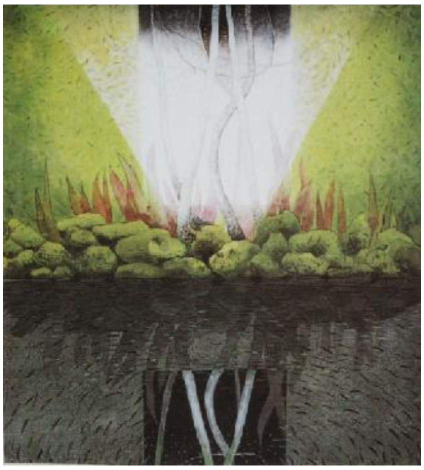

চিত্র ৩৭ : প্রতিফলন (Reflaction)
জলরং, ১৪ × ১৪ সেমি, ১৯৯২

চিত্র ৩৮ : বৃষ্টির পরে (After Rain)
১৯৯৭

'আননোন বার্ড' বা অচিন পাখি চিত্র মূলত লালনের অচিন পাখির দর্শনেরই রূপায়ণ। মানুষের দেহের ভেতর যে প্রাণপাখি বা আত্মা, তার ইঙ্গিত করেছেন প্রতীকী পাখি এবং ঝরাপাতার প্রতীকায়নে। স্বল্প সময়ের জন্য মানুষ এই পৃথিবীতে আসে। তার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ঝরাপাতার সিম্বল দিয়ে বুঝিয়েছেন। এই পাতায় সবুজের আভাস নেই। যেন জীবনের শেষ প্রহরে এসে নিজেকে চিনে নিতে ব্যস্ত। বুকের মধ্যে যে জীবন পাখি—সেই অচিন পাখি খাঁচা ছেড়ে চলে যাবে, সেই দর্শনকে জলরঙে কম্পোজিশনে এঁকেছেন। তাঁর এ কাজের টেকনিকে জলরঙের সাথে চায়নিজ ইঙ্কের ব্যবহার করেছেন এবং সাদা লাইন, যা কাগজের সাদা, সূক্ষ্ম অংশ রেখে রেখে কাজ করেছেন।

২০০০ সালের প্রদর্শনীতে ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিরূপ (An Image of Historical Place) চিত্র তিনি ঐতিহ্যবাহী অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রের অনুভবে এঁকেছেন। অর্থাৎ অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্র পরিদর্শন করার পর শিল্পী নাসরীনের মনে ওই স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা মনে আসে। অ্যাক্রেলিক কালারকে জলরঙের ওয়াশের মতো ব্যবহার করে এবং ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূরকে প্রতীকী ব্যবহার করে ঐতিহাসিক স্থানের দৃশ্য এঁকেছেন। এই সিরিজচিত্রে ল্যান্ডস্কেপ ভিউয়ের নতুন উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।

চিত্র ৩৯ : ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিরূপ
জলরং, অ্যাক্রেলিক
২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০

চিত্র ৪০ : ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিরূপ
জলরং, অ্যাক্রেলিক
২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০

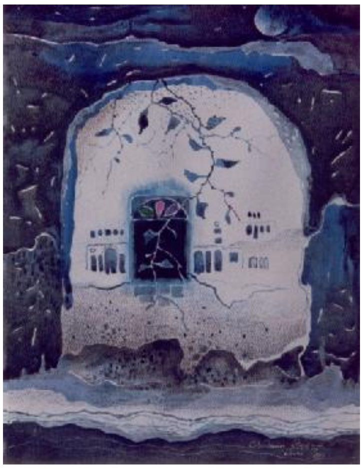

চিত্র ৪১ : ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিরূপ
জলরং, অ্যাক্রেলিক
২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০

নাসরীন বেগমের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজচিত্র হলো An Image of Sea Shores। জলরং ও চায়নিজ ইঙ্কে অঙ্কিত এ চিত্রের নেপথ্য রয়েছে সমুদ্রের জলে অবগাহনের ইতিহাস। নাসরীন বেগমের ছাত্র সুশান্ত কুমার অধিকারী (বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের শিক্ষক) তাঁকে বলেছিলেন, 'যদি সমুদ্রের জলে অবগাহন করেন তাহলে আপনার জলরঙের ছবি আরো ভালো হবে।' সুশান্তর এই কথা মনে লেগেছিল তাঁর। সুযোগ হয়েছিল ২০০০ সালে। সেন্ট মার্টিন দীপের সমুদ্রসৈকতে নেমে সমুদ্রের জলে অবগাহন করছিলেন নাসরীন। সে সময়ের অনুভূতি প্রসঙ্গে বলেন :

> হাওরের মতো স্রোত কম পানিতে নেমে চুপ করে বসে ছিলাম। আমার শরীরের চারপাশ ঘিরে ছোট মাছ। শামুক-ঝিনুক খেলা করছিল। আমার মনে হয়েছিল আমিই শামুক, আমিই ঝিনুক। সমুদ্রের এই জলজ প্রাণীদের সাথে আমি লীন হয়ে মিশে গেছিলাম।[৯]

চিত্র ৪২ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-১
(An Image of Sea Shoves-1)
জলরং ও কালি, ২৭ × ৩৭ সেমি
২০০০

চিত্র ৪৩ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-২
(An Image of Sea Shoves-2)
জলরং ও কালি, ২৮ × ২১ সেমি
২০০০

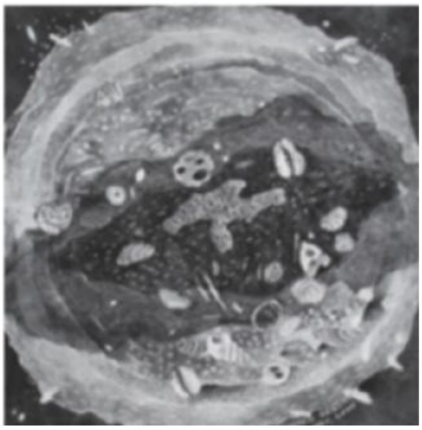

চিত্র ৪৪ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-৩
(An Image of Sea Shoves-3)
জলরং ও কালি, ২৭ × ২৭ সেমি
২০০০

সমুদ্র সিরিজচিত্রে জলরঙের কৌশলী প্রয়োগ-পদ্ধতিতে রঙের কোমল স্বভাব অক্ষুণ্ণ থেকেছে। রঙের সাথে কাগজের যে প্রেম, তা সার্থকভাবে সমন্বিত হয়েছে এ চিত্রে। প্রকৃতির শামুক-ঝিনুকের প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সমুদ্রের ঘূর্ণি জলে তাদের ধেয়ে চলা। রৌদ্রজ্জ্বল আলোর রশ্মিতে হিরা-জহরতের মতো দীপ্তি ও আভাযুক্ত ঝিনুকগুলো রমণীর শরীর বেয়ে কখনো নিজের অস্তিত্বে শোভা ছড়াচ্ছে। নাসরীন বেগম সেই অপার সৌন্দর্যকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এরপর ২০০১ সালে হয়েছিল পঞ্চম একক প্রদর্শনী। ছাপচিত্র-বিষয়ক এই চিত্রাবলির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২০০৪ সালে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে নাসরীন বেগমের ষষ্ঠ একক প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে তাঁর পুরাতন ও নতুন সিরিজের কাজ স্থান পায়। এ প্রদর্শনী করার মতো যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। শুধু অনুরোধে যে কাজগুলো ২০০০ সাল-পরবর্তী ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে করেছেন, তার সম্ভার দিয়ে প্রদর্শনী করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে স্থির থাকেন না। নানান বিষয় তাঁর চিত্রে বক্তব্য হয়ে ওঠে। পথে-প্রান্তরে পড়ে থাকা ফুলের পাপড়ি, ঝরাপাতা, বিভিন্ন ফুলের অংশ, বিশেষত ক্যাকটাস কিংবা শহরের বন্যার দৃশ্য—এসব বিষয় নিজস্ব ভঙ্গি ও উপস্থাপনায় বক্তব্যের গভীরে নিয়ে যায়।

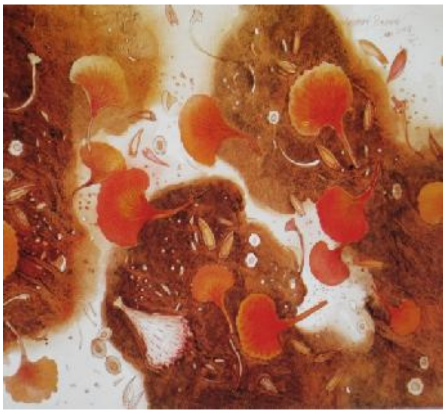

চিত্র ৪৫ : কৃষ্ণচূড়া, জলরং
৪১ × ৫৬ সেমি, ২০০৪

চিত্র ৪৬ : বসন্তে (ইন দ্য স্প্রিং),
জলরং, ৫০ × ৩৭ সেমি, ২০০৩

চিত্র ৪৭ : লাল জবা, জলরং
৪০ × ২৮ সেমি, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণচূড়া ফুল যখন গাছতলায় পড়ে থাকে, সেই ঝরে পড়া ফুলের পাপড়ি, রেণু, বৃত্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অপরূপ শোভার সৃষ্টি করে। শিল্পী নাসরীন বেগমের দৃষ্টি এ দৃশ্য এড়ায় না। তাঁর ছবির বিষয় হয়ে ওঠে সেই দৃশ্য। রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং, রং, রেখার বুননে 'বার্ডস আই ভিউয়ের' দৃশ্যকে ধারণ করেছেন। রঙের ব্যবহার অবজেক্টের বিন্যাস মাধুর্যে অধিবাস্তব অনুভূতির জন্ম দেয়। বসন্তে পাতা ঝরার দৃশ্য এঁকেছেন নতুনের আগমন বার্তায় পুরাতনের বিদায় বোঝাতে। শিল্পী তাঁর ছবিকে মানবজীবনের সাথে তুলনা করতে চান। পাতা ঝরা যেমন বসন্তের আগমন কিংবা পুরাতন পাতার বিদায়, তেমনি জীবনের ইঙ্গিতও। অর্থাৎ রঙিন জীবনের এক পর্যায়ে সকলকে চলে যেতে হবে—প্রকৃতি থাকবে নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায়। তাঁর এই সিরিজচিত্র রবীন্দ্রসংগীতের প্রেম ও পূজা পর্বের গানের মতো। যে গানের শাব্দিক অর্থ জাগতিক প্রেম আবার বৃহৎ অর্থ আত্মিক বা ঈশ্বরের সাথে প্রেম। নাসরীন বেগমের অবজেক্টের যে লঘু অর্থ, তার গভীরে জীবনদর্শনের বৃহৎ অর্থকে ইঙ্গিত দেয়। সত্যিকার অর্থে বৃহৎ সৃষ্টির এটাই গুণ। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি তাঁর কাজে প্রাচ্যরীতির প্রথাগত টেকনিক ও বিষয় থেকে বের করে এনে আধা-বিমূর্তায়ন করেছেন রিয়েলিস্টিক ফর্মের ব্যবহারে। সমসাময়িক পাশ্চাত্যধর্মী চিত্রকলায় যে বিভিন্ন ইজমনির্ভর চিত্রকলা, তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক চিত্রকলার অভিধায় অভিহিত করা হয়। নাসরীন বেগম প্রাচ্যরীতির করণ-কৌশল ও দর্শন ঠিক রেখে চিত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপন করেছেন। লাল জবা স্টিল লাইফ চিত্রে কাগজের ক্ষেত্র বিভাজন, দ্বিমাত্রিকতা, জলরঙের স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণধর্মী ব্যবহার নবরসের সৃষ্টি করেছে, যা প্রাচ্য ঐতিহ্যের চুঘতাইয়ের টেকনিক, আধুনিক বিমূর্ত চিত্রকলার টেক্সার ও ফর্মের ব্যবহার, সর্বোপরি জবা ফুলের সৃজনশীল উপস্থাপন মিলেমিশে বিষয়াতিরিক্ত আবেদন সৃষ্টি করেছে।

চিত্র ৪৮ : অপেক্ষা, জলরং
২৪ × ৪১ সেমি, ২০০৪

চিত্র ৪৯ : শহরের বন্যা (Flood in the City)
জলরং, ৩০ × ৪২ সেমি, ২০০৪

অপেক্ষা চিত্রে ল্যান্ডস্কেপ চিত্রের আবহ এবং একটি ঘর, অপেক্ষারত নারী, ঘরের ও আঙিনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঘর-গৃহস্থালির উপাদানগুলো নিজের মতো ফর্মে সাজিয়েছেন। বন্যা চিত্রেও তলিয়ে যাওয়া একটি ইমারতের দৃশ্য এঁকেছেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ানুভূতির ইমপ্রেশনকে ধরে রাখতেই শিল্পীর এরূপ অভিপ্রায়।

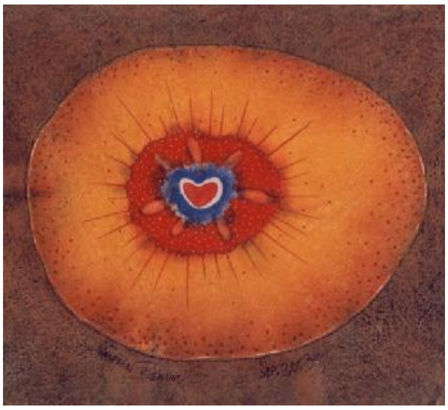

চিত্র ৫০ : ক্রিয়েশন-২, জলরং
৫০ × ৩৭ সেমি, ২০০৪

চিত্র ৫১ : ক্রিয়েশন-৩, জলরং
৩৭ × ৩৭ সেমি, ২০০৪

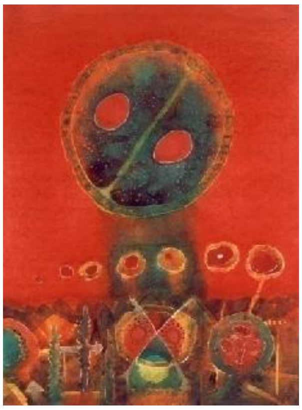

চিত্র ৫২ : ক্রিয়েশন-৪, জলরং
৫০ × ৩৭ সেমি, ২০০৪

ক্রিয়েশন সিরিজচিত্রের ফর্ম ও জমিন বিভাজনে প্রথাগত ফর্মের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে বিমূর্ত আঙ্গিকের এই চিত্রে শিল্পীর ভাবনার বিষয়টি হদিশ করে জানা যায়—সৃষ্টির সেরা এই মানবজীব পৃথিবীতে জন্মলাভের অঙ্কুরেই প্রতিযোগিতায় লড়ে জয়ী হয়ে আসে। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর সাথে দৌড়ে পাল্লা দিয়ে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি করে। এই প্রতিযোগিতায় লাখো লাখো শুক্রাণুকে হার মানিয়ে নিজের জীবনে জয় নেয়। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার মানুষের প্রতিযোগিতায় ইতিহাস আছে। ঠিক জীবন ধারণের প্রতি পর্বেই এ প্রতিযোগিতায় জিততে হয়। সৃষ্টিতত্ত্বেও এ পর্যায়টি বিন্যাস করেছেন নাসরীন বেগম।

নয়

নাসরীন বেগম পাকিস্তানের শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের পরম ভক্ত। তাঁর কাজ দেখে ছেলেবেলা থেকেই ফিগার আঁকতে উৎসাহী হয়েছেন। কয়েকবার পাকিস্তান গিয়েছেন—চুঘতাইয়ের মূল কাজ দেখার জন্য। ২০০৬ সালে নিজের কাজের সম্ভার নিয়ে পাকিস্তানের Hamail Art Galleries-এ প্রদর্শনী করেন। এ প্রদর্শনীতে বিভিন্ন পর্বের কাজ ছাড়াও Beauliful Bangladesh-কে উপস্থাপন করেছেন।

চিত্র ৫৩ : বাংলাদেশ-৮
জলরং, ৪০ × ২৮ সেমি, ২০০৫

চিত্র ৫৪ : বাংলাদেশ-৩
জলরং, ৪৬ × ২৮ সেমি, ২০০৫

চিত্র ৫৫ : বাংলাদেশ-৮
জলরং, ৫৮ × ৪৩ সেমি, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের শিল্পসমালোচক Shamim Akhter-এর মন্তব্যে নাসরীন বেগমের ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং বুঝতে সহায়ক হবে। তিনি লিখেছেন :

> Nasreen Begum stands art as a Figurative Painter in the style of the Bengal school in Bangladesh. She excels equally in Landscape painting. Artists in Bangladesh cannot resist painting Landscape as the Country is beautiful scenic. Nasreen also paints Landscapes with a prevalent Feeling of Loneliness and Seventy. Her excessive use of blue in Landscape distinguishes her work from other artists.[১০]

নাসরীন বেগম ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে দূরত্ব বোঝাতে ক্যানভাসের ওপর ও নিচে ফ্লাট রঙের ওয়াশ দেন এবং মাঝখানে দৃশ্যটি রং ও ফর্মে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা বাস্তব দৃশ্যের সাথে মিল না থেকেও বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। চাঁদনি রাতে মতিঝিল বাণিজ্যিক দূর-দূরান্ত শহরকে এমনভাবে এঁকেছেন যে, দর্শক অধিবাস্তব রসানুভূতি দ্বারা অভিসিক্ত হয়।

চিত্র ৫৬ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-২
(Image from sea shore-II)
জলরং, ৩২ × ২৪ সেমি

চিত্র ৫৭ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-৫
(Image from sea shore-V)
জলরং, ৫৯ × ৪৬ সেমি, ২০০৫

চিত্র ৫৮ : ঐতিহ্যের দৃশ্য-২
(Image from Heritage-II)
জলরং, ৪১ × ৩২ সেমি, ২০০৫

সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য (Image from sea shore) এবং ঐতিহ্যের দৃশ্য (Image from Heritage) সিরিজচিত্রে নাসরীন বেগম জলরঙের বিশেষ ওয়াশের মাধ্যমেই টেক্সচার সৃষ্টি করে কাঙ্ক্ষিত ইমেজ সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নির্বস্তুক। কিন্তু এর সাথেই সমুদ্র উপকূলের শামুক-ঝিনুকের ছবি এঁকেছেন রিয়েলিস্টিক করে। বিমূর্ত ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মূর্ত অবজেক্ট মিলে বিষয়ের চৈতন্য অতিবাস্তবভাবেই এসেছে। ঐতিহ্যের দৃশ্য চিত্রণেও ঐতিহ্যবাহী স্থানের চিত্রকে মোগল মিনিয়েচারের মাল্টি-পারস্পেকটিভ বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। এ উপস্থাপন আধুনিক কনসেপচ্যুয়াল শিল্প উপস্থাপনের উদাহরণ।

শিল্পসমালোচক আশফাকুর রহমান ক্রিয়েশন সিরিজ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> ভ্রূণ থেকে সন্তান জন্মের অদৃশ্য অথচ অনিবার্য প্রক্রিয়াকে তিনি আঁকেন লাল আর কমলা রংকে সঙ্গী করে। সাদা শুক্রাণুর তীর্যক ধ্যানে বিদ্ধ করেন ডিম্বাণুর লাল শরীর।[১১]

২০১৩ সালে নাসরীন বেগম তাঁর অষ্টম একক প্রদর্শনী করেন Athena Gallery of Fine Arts-এ। দীর্ঘ আট বছর পরের এই একক প্রদর্শনীতে তাঁর কাজে ছিল মাধ্যমগত পরিবর্তন। জলরঙের এই শিল্পী সব কাজই করেছেন অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে। বিষয়ের তেমন কোনা পরিবর্তন হয়নি। মাধ্যমগত ও টেকনিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতি সমসাময়িক আধুনিক চিত্রকলার সাথে তাল মিলিয়ে রূপ পেয়েছে। প্রাচ্যরীতির সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেই দ্বিমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক ইস্যুয়েশন তৈরির জন্য রেখার বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষণীয়।

Yellow Castus in Bloom, Feeling Blue Cecfas and Red Cacfus in Bloom সিরিজচিত্রে এর প্রমাণ মেলে।

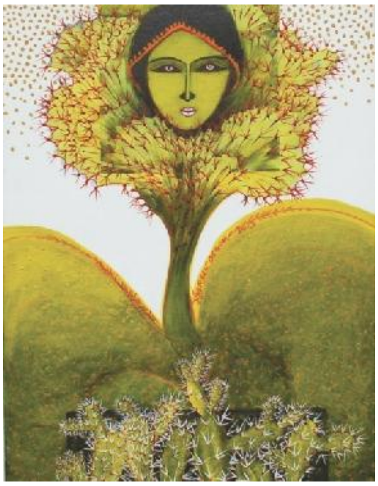

চিত্র ৫৯ : Yellow Cactus in Bloom-I
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৬১ × ৪৬ সেমি ২০১৩

চিত্র ৬০ : Feeling Blue Cactus-II
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
১১২ × ৭৬ সেমি, ২০১৩

চিত্র ৬১ : Red Cactus in Bloom-III
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৭৬ সেমি, ২০১৩

নাসরীন বেগমের চিত্রে ক্যাকটাস বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে প্রসেছে। নারীর মাথায় ক্যাকটাস জুড়ে দিয়ে তার ওপর ফুল। ক্যাকটাসের কাঁটা নারীর সৌন্দর্যের নিরাপত্তা বেষ্টনী, কখনো নিঃসঙ্গতা, কখনো সৌন্দর্য, কখনো প্রতিকূলতার সিম্বল হয়ে ব্যবহৃত। কণ্টকময়তাকে সঙ্গী করেই জীবনকে কণ্টকমুক্ত করার অবিচল প্রয়াস।

হেরিটেজ, আনরেভেল, ইম্প্রেশন সিরিজচিত্র নতুন স্বাদে উপস্থাপন করেছেন। হেরিটেজ সিরিজচিত্রে ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্যের জমিদারবাড়ির ক্ষয়ে পড়া ঘর-বাড়ির দেয়ালে লতাগুল্মের ইতিহাস এঁকেছেন। আনরেভেল সিরিজচিত্রে বার্ডস আই ভিউ থেকে দেখা ল্যান্ডস্কেপ আর ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা। এই রেখা সমসাময়িক রাজনৈতিক জটিলতার প্রতীকী রূপায়ণ। ইম্প্রেশন সিরিজচিত্রে পাতার কাজ। পাতাগুলো প্রাচ্যরীতির আধুনিক রূপায়ণ বলা যেতে পারে। এখানে শিল্পী অ্যাক্রেলিক কালার লেয়ারের পর লেয়ার দিয়ে পাতার নানান ইমেজ তৈরি করেছেন। বর্ণিল পাতার রূপ দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের আনন্দের অনুরণন তৈরি করে।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬২ : হেরিটেজ-১
অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস
১০৭ × ৬১ সেমি, ২০১২

চিত্র ৬৩ : আনরেভেল
অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস
৬১ × ৬১ সেমি, ২০১২

চিত্র ৬৪ : ইম্প্রেশন
অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস
১০৭ × ৬১ সেমি, ২০১২

এগারো

নাসরীন বেগম একক প্রদর্শনীর বাইরে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, আর্ট ক্যাম্প, ওয়ার্কশপে নানা ধরনের চিত্র এঁকেছেন। জলরং তাঁর প্রধান মাধ্যম হলেও অ্যাক্রেলিক, তেলরং, প্যাস্টেল, বিভিন্ন কালি-কলমে ড্রয়িংনির্ভর চিত্র এঁকেছেন। চলমান জীবনাভিজ্ঞতায় বিষয় ও টেকনিক বারবার পরিবর্তন হয়েছে। কোনো বিষয়কে সিরিজ হিসেবে অঙ্কন করেননি। তাই এক সিরিজের বহুমাত্রিক কাজ পাওয়া যায় না। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন কিছু বিষয় বারবার তাঁর চিত্রের অবজেক্ট হিসেবে এসেছে। এর মধ্যে নারী, ক্যাকটাস, নারী ও ক্যাকটাস, সমুদ্রসৈকতের দৃশ্য—যার মধ্যে শামুক-ঝিনুক, ঝরাপাতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তাঁর চিত্রে নারী এসেছে কখনো মডেল হয়ে, কখনো প্রতিদিনকার জীবন-যাপনের কর্মময় পরিস্থিতিতে, কখনো নারীরা সাগরের জলে একাকার হয়ে যেন সাগরের অভিন্ন সত্তা হয়ে নীলরূপ ধারণ করে, কখনো ক্যাকটাস সুশোভিত হয়ে। যে রূপেই হোক না কেন, নারীর নিঃসঙ্গতার ভেতরমুখী সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্রে।

চিত্র ৬৫ : বসন্তে, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৬

চিত্র ৬৬ : মডেল, জলরং
৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০৫

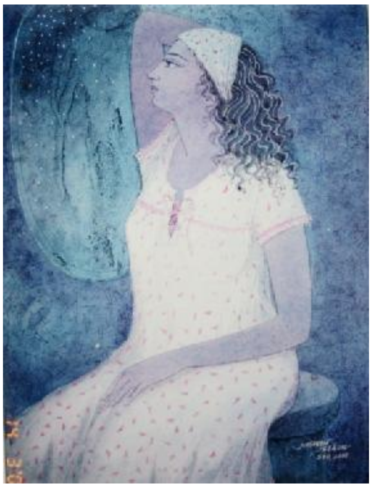

চিত্র ৬৭ : মডেল, জলরং
৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

নাসরীন বেগম অসংখ্য মডেল ড্রয়িং করেছেন। আবার তাঁর সংগ্রহের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মডেল থেকেও চিত্রের মডেল হিসেবে নিয়েছেন। পত্রিকায় নারী মডেলদের আদলকে প্রাচ্যরীতির রং, রেখা, ভাবে জারিত করে তিনি যে রূপ দিয়েছেন, তা প্রকৃত মডেলের অনুরূপ নয়। এ প্রসঙ্গে নন্দলাল বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> সাজিয়ে—বসানো মডেল দেখে বা ডামির সাহায্যে কল্পনা করা ভালো নয়। কারণ ফরমাশ—মত ঢঙ (Pose) দিতে গেলে তা সাচ্চা হয় না; অনেকক্ষণ এক ভঙ্গিতে থাকা আয়াসসাধ্য ও ক্লেশকর। তাতে মডেলের মনের সঙ্গে দেহের ভঙ্গির সামঞ্জস্য থাকে না। ডামি তো একেবারেই প্রাণহীন। ফলে এদের সাহায্য নিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করলে মূর্তিতে, ছবিতে, আড়ষ্ট প্রাণহীন ভাব প্রকাশ পায়। অবশ্য, যে শিল্পীর প্রাণছন্দের ঠিক ধারণা হয়েছে তিনি ঐরূপ কৃত্রিম আদর্শে সাহায্য নিলেও কোনো ক্ষতি হয় না।[১৩]

মডেল-সংক্রান্ত উল্লিখিত বর্ণনায় যে মন্তব্য দেয়া আছে আর নাসরীন বেগম পত্রিকার মডেল দেখে যে চিত্র এঁকেছেন, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ নন্দলাল বসুর নির্দেশ মতো নাসরীন বেগম মডেলের প্রাণছন্দ জানেন বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। নাসরীন বেগমের নারীদের পোশাক, সাজসজ্জা আধুনিক।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হকের মূল্যায়ন প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে :

> নাসরীন বেগম নারীর সুশৃঙ্খল পরিপাটি রূপ আঁকেন সংস্কৃত সাহিত্য, ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্য ও দর্শন, মোগল চিত্রকলার রূপ সৌন্দর্যের সাথে নাগরিক জীবনের ফ্যাশন-সচেতন রূপসজ্জা সংমিশ্রণ করে। ফলে তাঁর চিত্র হয়ে ওঠে প্রাচ্যরীতির আধুনিক রূপ পায়।[১৪]

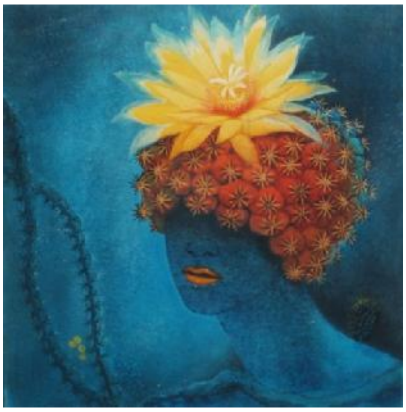

চিত্র ৬৮ : রিয়ালিটি-১, ক্যানভাসে তেলরং
৬১ × ৬১ সেমি, ২০০১

চিত্র ৬৯ : রিয়ালিটি-২, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৪৫.৭২ × ৩৫.৫৬ সেমি, ২০০১

চিত্র ৭০ : রিয়ালিটি-৩, জলরং
৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০১

ক্যাকটাসের প্রতীকী ব্যঞ্জনার মতোই নাসরীন বেগমের জীবন-যাপন। বাইরে থেকে অলঙ্ঘনীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী—ক্যাকটাসের কাঁটা দিয়ে ঘেরা। কাঁটাকে অতিক্রম করে সুন্দর ফুল। সৈয়দ আজিজুল হকের ব্যাখ্যায় : 'কাঁটারূপ যন্ত্রণার আবেষ্টনীর মধ্যেই সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান। যন্ত্রণার আগুন যেমন দগ্ধ করে তেমনি তা পরিশুদ্ধও করে। সৌন্দর্য এখানে শুদ্ধতার অপর নাম।'[১৫]

জাহিদ মুস্তাফা কাঁটাযুক্ত নারীর অবয়বকে দেখেছেন রোমান্টিক ভাবনায়। তিনি লিখেছেন, তিনি ক্যাকটাস আঁকতে আঁকতে ক্যাকটাসের ফুলে ও কাঁটায় নারীর কুসুমাস্তীর্ণ করেছেন। বনফুলের সৌন্দর্য যে রমণীর অবয়বে, খোঁপায় এমন সৌন্দর্যের আগুনে পুরুষ পতঙ্গ অনিবার্য যাতনাশঙ্কা সত্ত্বেও এগিয়ে যাবে। ক্যাকটাস রমণী শীর্ষক কাজে শিল্পী এমনই এক মুগ্ধ সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৭১ : বান্দরবান, জলরং
৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০২

চিত্র ৭২ : বান্দরবান (শঙ্খ নদ), জলরং
৫৫.৭২ × ৩৮ সেমি, ২০০২

চিত্র ৭৩ : ল্যান্ডস্কেপ, জলরং
২৮ × ২৮ সেমি, ২০০৪

নাসরীন বেগম বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ডস্কেপ করেছেন। জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে তাঁর ল্যান্ডস্কেপ বেঙ্গল স্কুলের অবনীন্দ্রনাথের ল্যান্ডস্কেপ সিরিজচিত্রের করণ-কৌশলের সাথে মিল আছে। বাংলার নিসর্গ প্রাচ্যরীতির জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির কৌশলে এবং কোনো কোনো চিত্র কম্পোজিশনের বিশেষত্বে অতুলনীয়।

চিত্র ৭৪ : গ্রিন ওয়াটার, জলরং
৫৫ × ৩৮ সেমি

চিত্র ৭৫ : গ্রিন ওয়াটার, জলরং
৫৫ × ৩৮ সেমি

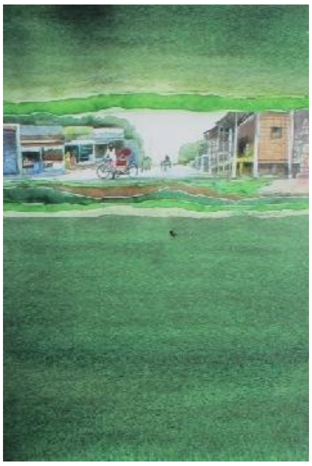

চিত্র ৭৬ : সিটিস্কেপ (মফস্বল), জলরং
৫৫ × ৩৮ সেমি

সিটিস্কেপ, বস্তি, জলাশয়, নদীঘাটের দৃশ্য, ঐতিহ্যবাহী স্থানের দৃশ্য এমনভাবে এঁকেছেন—ফর্ম ও রেখা প্রয়োগে প্রচলিত ল্যান্ডস্কেপ-শিল্পীদের মতো নয়। নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র স্টাইল আছে তাঁর ল্যান্ডস্কেপ সিটিস্কেপ চিত্রে।

চিত্র ৭৭ : সমুদ্রের তলদেশ-১
জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি

চিত্র ৭৮ : সমুদ্রের তলদেশ-২
জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি

চিত্র ৭৯ : সমুদ্রের তলদেশ-৩
জলরং , ৫৫ × ৩৮ সেমি

Dhaka University Institutional Repository

নাসরীন বেগম সমুদ্রের তলদেশের রহস্য নিয়ে ছবি আঁকেন। মিডিয়ার কল্যাণে বিশ্বজগত হাতের মুঠোয়। মহাবিশ্বের মহাকাশ এবং সমুদ্রের তলদেশের রহস্য, সমুদ্রের তলদেশের প্রাণিজগতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন এবং সেই রহস্য উন্মোচন করতে তলদেশের সিরিজচিত্র অঙ্কন করেছেন। মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়গুলো নিয়েও স্টাডি করেন। স্পেস সৌন্দর্য নিয়ে কাজ করার অভিপ্রায় আছে।

উল্লিখিত আলোচনায় শিল্পী নাসরীন বেগমের বিরাট কর্মসম্ভারের কিয়দংশের ইঙ্গিত দেয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ, নানান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে নানান আঙ্গিকের কাজ করে প্রশংসিত হয়েছেন। পরিচালনা ও অংশগ্রহণ করেছেন অনেক ওয়ার্কশপে। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় নাসরীন-শৈলীর কাজকে বিস্তার করছে।

তিনি শিক্ষকের চেয়ে শিল্পী হিসেবেই নিজেকে পরিচিত করতে চান। ১৯৮৯ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছিলেন। এরপর ১৯৯৫ সালে ২৩ জুন সহকারী অধ্যাপক পদে এবং ২০০৪ সালের ৫ এপ্রিল সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২০১২ সালে ২২ নভেম্বর অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগে কর্মরত আছেন।

হাউস টিউটর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল প্রসাশনের দায়িত্ব পালন করেছেন। শামসুন নাহার হলে ১ জুন ২০০৩ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত। এ ছাড়া সামাজিক সংগঠন সাকোর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। মহিলাদের এ সংগঠন থেকে নিয়মিত প্রদর্শনী ও দুস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে প্রদর্শনী করা হয়। এমনকি বন্যা ও সুনামির মতো প্রতিকূল পরিবেশের দুঃখী মানুষদের সাহায্যার্থে তহবিল গঠন করে। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি আর্থিক সহযোগিতা করেন।

ব্যক্তি জীবন-যাপনেও নাসরীন বেগম রঙিন। কঠিন সাধনা, খাদ্যাভ্যাস, নিয়মানুবর্তিতা, সংগীত শোনা, বই পড়া, ছবি আঁকা তাঁর নিয়মিত কাজ। এখন তিনি সংগীত চর্চাও করেন। তাঁর মতে, তিনি যা-ই করেন, ভালো ছবি আঁকার জন্য করেন। কারণ সংগীত চর্চার মধ্যে যে মন ও শরীরের ধ্যান চলে, সেই ধ্যান আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে চিন্তাশক্তিকে, কল্পনার জগতকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

বারো

জীবন-দর্শন ও শিল্প-দর্শন

একজন শিল্পীকে যথার্থভাবে চেনা বা বোঝা যায় তাঁর জীবন-দর্শনের আলোকে। শিল্পী চিন্তাভাবনা মননে যে জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী হন, সেই জীবন-দর্শনই তাঁর কাজে প্রতিবিম্ব হয়ে ধরা দেয়। অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর জীবন-দর্শন, শিল্পচিন্তা শিল্প-দর্শন হিসেবে ধরা আছে তাঁদের লেখা বইপুস্তকে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার পুরোধা আব্দুস সাত্তারের নন্দন-চিন্তা, নন্দন-ভাবনা, শিল্প-দর্শন, জীবন-দর্শন ধরা আছে তাঁর অসংখ্য লেখায়। কিন্তু শিল্পী নাসরীন বেগম লেখক নন। সবাই লেখেনও না। প্রদর্শনী উপলক্ষে নিজের ও অন্যের ক্যাটালগে শিল্প প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

কিছু সংখ্যক লেখা লিখেছেন। এর আলোকে তাঁর জীবন-দর্শন ও শিল্প-দর্শন স্পষ্ট করা যায় না। তবে তাঁর জীবন-দর্শন ও শিল্প-দর্শন ব্যক্ত হয়েছে তাঁর চিত্রকর্মে।

শিল্পতত্ত্ব ও শিল্প-দর্শন নিয়ে না লিখলেও নাসরীন বেগম শিল্পতত্ত্ব ও শিল্প-দর্শন, জীবন-দর্শন নিয়ে নানা রকম পড়াশোনা করেন। আত্মশুদ্ধির জন্যই এই চর্চা। সৃষ্টি, সৃষ্টির রহস্য, জীবনের উদ্দেশ্য, প্রকৃত শিল্পের গভীর অর্থ অনুধাবনের জন্য বিজ্ঞান, ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাহিত্য পাঠ করেন। এমনকি সংগীত অনুশীলন করছেন চিত্রশিল্পীকে ঋদ্ধ করার জন্য। এজন্য তাঁর সমৃদ্ধ জীবন ও শিল্প-দর্শন বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়ে আসছে দীর্ঘজীবনের শিক্ষকতায়। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপচারিতায়, বন্ধুবান্ধব ও অন্যদের সাথে ঘরোয়া কথাবার্তায়। অতএব যাঁরা নাসরীন বেগমের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁদের স্মৃতিধৃত আলোচনা এবং গবেষকের সাথে আলাপচারিতার পরিপ্রেক্ষিতে নাসরীন বেগমের জীবন-দর্শন ও শিল্প-দর্শন নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায় :

নাসরীন বেগম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্যে বিস্মিত হন। তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ান এবং সৌন্দর্য খুঁজে পান। সত্যের সন্ধান এবং আলোর সন্ধানে তাঁর পথযাত্রা। দেহ, আত্মা ও মনের তত্ত্ব নিয়ে জীবনোপলব্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জীবনকে চিনেছেন ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে। তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা আছে তা মানুষের শরীরের মধ্যে আছে। মানুষের যা দরকার তা বিশ্বব্রহ্মার থেকে গ্রহণ করে। তাঁর মতে, বিশ্বের সকল জড়-অজড়র মধ্যে শক্তি আছে। পৃথিবীর সবকিছুর সাথে যোগসূত্র আছে। যে যোগসূত্রের সন্ধান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা করেন।[১৬]

নাসরীন বেগম পৃথিবীর সবকিছুকে প্রয়োজন মনে করেন। তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুই মূল্যবান। তিনি কখনো কখনো ধর্ম ও সমাজ স্বীকৃত দর্শন থেকে প্রকৃতির চিত্র আঁকেন। যে প্রকৃতিতে মূর্ত হয় ঘাস, ফুলের রেণু, জলকণা, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আসে না। তাঁর ভাষায়, ‘পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সমান মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা ছোটো বড়ো করে সৃষ্টি করেছেন ব্যালান্স (ভারসাম্য) রাখার জন্য।[১৭]

প্রকৃতি প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অনুভূতি-দর্শন ব্যক্ত করতে লিখেছেন :

> প্রকৃতির প্রেমে আপ্লুত থাকি। তাই প্রকৃতিই আমার ছবি আঁকার প্রেরণা। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অতি সামান্য কিছু বিষয় আমার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। প্রকৃতিতে এত ভাল (ভালো) লাগার বিষয় আছে যে কোনটা ছেড়ে কোন বিষয় আকবো (আঁকব)। আমার তো মনে হয় প্রকৃতি এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে, প্রতি মুহূর্তের ছবি এঁকে রাখি। এভাবেই প্রকৃতির রহস্য মগ্ন করে রাখে আমার বিস্ময়বোধের জগতকে। রহস্যময় প্রকৃতি ও মানুষ ছবি আঁকার মূল বিষয় হয়ে উঠল। দেখা গেল এ বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়াবলী (বিষয়াবলি) ও মানুষের আচরণ, স্বভাব, অভ্যাস, অন্তর-বাহির সবকিছুর সঙ্গে অদ্ভূত (অদ্ভুত) সম্পর্ক অদৃশ্য জালের মতো জড়িয়ে আছে। শুরু হলো আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণ। অতি ক্ষুদ্র ফুলের রেণু, পানির ফোঁটা, ক্ষুদ্র পাতা, ঘাস, শামুক-ঝিনুক, পিঁপড়া ইত্যাদি। আসলে ক্ষুদ্র বিষয়গুলোই বৃহৎ জগতের রহস্য উন্মোচিত করে।[১৮]

২০০০ সালের একক প্রদর্শনীতে তিনি চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে লিখেছেন :

> যা হয়েছে তা নয়, যা হতে পারতো তারই সন্ধানে রং এর কারিকুরি। পরম সত্য-সুন্দরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য রঙ রূপ ও রেখার ভাঙ্গাগড়া (ভাঙাগড়া)। সুন্দরের ক্ষণ-মাধুর্য্যকে চিরদিনের জন্য ধরে রাখায় এই দূরন্ত প্রয়াস . . .

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাতা, ঘাস-ফুল, লতা, স্নিগ্ধ জলের ফোঁটা, উড়ন্ত ফুলের রেণু, ফড়িং, প্রজাপতির পাখার থির থির কম্পন, একটু সবুজ প্রশান্তি, আভাময় নীল দ্যুতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ব্যঞ্জনা থেকে বৃহৎ তাবৎ বিষয়ের ভেতর দিয়ে এক অপর (অপার) আলোর সন্ধানে আমার এ যাত্রা। এক অজানা আলোর সন্ধানে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পুঙ্খানুপঙ্খ অতৃপ্ত অনুসন্ধান। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে ঘটে মনের পরিবর্তন। সময় এবং মনের পরিবর্তনের মাঝে চলে সন্ধানের এক তীব্র ইচ্ছা।

রঙ-এর খেলায়, রঙ মিশ্রনে সচেষ্ট হই সরল গতিময়তায়। রঙ মিশ্রণে যেন তার স্বকীয়তা, উজ্জ্বলতা না হারায়। চিত্রে স্ব-মনন-দর্শন মিশিয়ে অপূর্ণকে পূর্ণ করতে—অধরাকে ধরতে বিরামহীন আমার এ ছুটে চলা।

ছবির রঙ, গতি, আলো-ছায়া, বিভিন্ন ধরনের ফর্ম—এ সবের মধ্য দিয়ে সিগমন্ড ফ্রয়েড-এর ‘অচেতন’ ও লালনের ‘অচিন দেশ’-এর সন্ধানে আমার এ যাত্রা। জীবনের শেষ লগ্নেও এ পথের সন্ধান পাবো কিনা তাও জানি না। আমি ছবির প্রতিটি টান। রঙ-এর সাবলীল গতির মাঝেই খুঁজি ‘অচেতন’ ও ‘অচিন দেশ’।[১৯]

শিল্পীর স্বভাব, দৃষ্টি, মন প্রসঙ্গে ধারণা ব্যক্ত করেছেন নিজের অনুভূতির বিচারে। সে বিচারে একজন শিল্পীর নিসর্গ অনুভব ও শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের গূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

নিমগ্ন নিসর্গ-তে লীন হয়ে নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে সৃষ্টি করা শিল্পীর ধর্ম। মগ্ন হলেই নিসর্গের ভাষা অনুভব করা যায়। নিস্তব্ধ-নির্জনে প্রকৃতির রূপের রহস্য কোলাহল ধূলীময় নাগরিক জীবনে অনুভব করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিল্পী দৃষ্টি ও মন সাধারণের থেকে অনেক স্বচ্ছ ও গভীর ও উন্নত। সেজন্য শিল্পী অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও বিশাল সৃষ্টিকে খুঁজে পান। তাই শিল্পী যেকোনো অবস্থায় ও পরিবেশে তার মেধাকে সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে পারেন।[২০]

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার মূলনীতি ‘ষড়ঙ্গ’। বিশেষত ভারত ষড়ঙ্গ প্রসঙ্গে নাসরীন বেগম সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি ষড়ঙ্গের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে বর্ণিকাভঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর নিজের চিত্রকর্মেও বর্ণিকাভঙ্গ প্রয়োগ লক্ষণীয়। ষড়ঙ্গ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন :

যদি বর্ণজ্ঞান না থাকে, যদি নানা বর্ণের সংমিশ্রণ, ভাব ভঙ্গি শিল্পীর মধ্যে না জন্মে তবে ষড়ঙ্গ-এর আর পাঁচটি সাধনাই বৃথা। অর্থাৎ ষড়ঙ্গ-এর রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি রীতির মধ্যে প্রথম পাঁচটি আমাদের মোটামুটি জানা থাকতে পারে। কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গ ছাড়া উপরোক্ত পাঁচটি ষড়ঙ্গ কোনো অবস্থায় বোঝানো সম্ভব নয়। ষড়ঙ্গ-এর ছয় নম্বর রীতি বর্ণিকাভঙ্গ অর্থাৎ শিল্পরীতি অনুযায়ী রং ও তুলির ব্যবহারের সাধনাতেই একজন চিত্রকর শিল্পী হয়ে ওঠেন।[২১]

নাসরীন বেগম কেন ছবি আঁকেন সেই প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছে করেন। নিজেই অন্তরে খুঁজে পান সদুত্তর। এই উত্তরের মধ্যে তাঁর শিল্প-দর্শন লুকিয়ে আছে। আবার এই দর্শন সর্বজনীন সত্যকেই মূর্ত করে। তিনি লিখেছেন :

কেন ছবি আঁকি—বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি। এদেশে ছবি আঁকার চর্চাকে বিলাসিতা মনে হয়েছে। কেননা বাংলাদেশে বেঁচে থাকার বাস্তবতা এতই জটিল যে নিজের দু'পায়ে ভয় দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শক্ত অবস্থান তৈরির সংগ্রাম করতেই জীবনের সুকুমার অনুভূতি নিঃশেষ হয়, গ্রাস করে মেধা ও মনন। সেখানে শিল্পচর্চা-সৃজনশীলতা সত্যিই বিস্ময়কর।

এই বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা পেয়েছি এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এ-প্রকৃতির কাছ থেকে। নানা ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রকৃতি নিজস্ব শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। যাবতীয় সৌন্দর্যের বিস্ময়কর রং, রূপ, সুষমায় অকৃপণভাবে নিজেকে সাজায়, বিকশিত করে।
প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। গতকাল যেমন দেখেছি, আগামীকাল তেমন নেই। প্রতি মুহূর্তের বদলে যাওয়া প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী রূপ ধরে রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন এক দুর্দমনীয় নেশার ঘোরের মতো। এ-ঘোর ইন্দ্রিয়জ-আনন্দ এমন আচ্ছন্ন করে যে কঠিন বাস্তবতাও তুচ্ছ মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু–এ প্রকৃতি সুন্দর-সহজ-সরল মনে হলেও এর বহমান প্রক্রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল, জটিল ও রহস্যময়। এখানেই মনে হয় বিশ্ব-প্রকৃতি-মানুষ একসূত্রে গাঁথা। এ চেতনায় উন্মেষের জন্যই মনে হয় আজও ছবি এঁকে চলেছি। ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে নিজেকে চেনা-জানার প্রক্রিয়া চলে। মনে হয় আমি, আমার বেঁচে থাকা ও আমার ছবি আঁকা একই অস্তিত্বে গাঁথা।[২২]

নাসরীন বেগম জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-মৃত্যু, যন্ত্রণা প্রসঙ্গে নিজে ভাবেন যোগ সাধনায় ও বাস্তব জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে। এ ভাবনার মধ্য দিয়ে যে তত্ত্ব খুঁজে পান সেই তত্ত্বই তাঁর জীবন-দর্শন। তিনি যন্ত্রণা ও সৃজনশীলতা প্রসঙ্গে বলেন, 'জীবনের সবকিছুর মধ্যেই যন্ত্রণা। তবু তার মধ্যে থেকে ক্রিয়েশন।'[২৩]

জীবনের যন্ত্রণার কারণ হিসেবে *মায়া*কে দায়ী করেন। আর মায়া হলো পৃথিবীর জন্য পাপ। এই মায়ার অন্যতম ক্ষেত্র সংসার, যা শিল্পীর কল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করে। সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে সংসারের কাজ আর শিল্প কাজে বিরোধ ঘটায়। সার্থক শিল্পী কীভাবে দুয়ের সমন্বয় ঘটান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সৃজনশীলতা শিল্পীর নিজস্ব। সংসারের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রকৃত সময় খুঁজে নিতে হবে নিজের জন্য।'[২৪]

তাঁর এ দর্শন মূলত গৌতম বুদ্ধের দর্শনের প্রতিরূপ। অর্থাৎ জীবন মানে যন্ত্রণা। যন্ত্রণার কারণ হলো আকাঙ্ক্ষা আর আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করার মধ্যেই মোক্ষ লাভ হয়। নাসরীন বেগমও সংসারে মধ্যে মায়া-মোহ ত্যাগ করে নিজের শিল্পকে বড়ো করে দেখেন। তাঁর মতে, 'সৃজনশীলতা জীবনের পরম পাওনা। পরিবার ও সমাজ তা অনবরত রোধ করে।'[২৫]

তিনি আত্মা এবং মনকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, মন সুখ চায়, যে সুখ অগভীর। কিন্তু আত্মা চায় আনন্দ। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়গম্য সকল কিছুর ঊর্ধ্বে।[২৬]

যথার্থ শিল্পী আত্মিক আনন্দে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন। নাসরীন বেগম 'জন্ম ও মৃত্যু'কে সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত নিয়ম বলেই মানেন। তাঁর মতে, জন্মের আনন্দের মতো মৃত্যুও আনন্দের কারণ—জন্ম যদি আনন্দের হয়। মৃত্যু কেন দুঃখের হবে? কেননা জাগতিক মোহমায়া-বন্ধন, সম্পদই মানুষের আবেগকে ভুল পথে চালিত করে।[২৭]

তিনি জীবন-মৃত্যুর অভিন্নতার মতো সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য ও ধ্বংস বা প্রলয়ের মধ্যেও সৌন্দর্য দেখতে পান। তিনি সমুদ্রের তলদেশের সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যে যেমন মোহিত হন, তেমনি সৃষ্টিকর্তার প্রলয়লীলা অর্থাৎ টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্পের ঘটমান সময়ের বিপর্যয়ে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে শিল্প-সৌন্দর্য খুঁজে পান। তাঁর দৃষ্টি নির্মোহ। তিনি মহাকাশ অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র-বায়ুমণ্ডলের স্পেস সৌন্দর্য মিডিয়ার কল্যাণে দেখে মুগ্ধ হন, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য জানতে পেরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মানুবর্তিতার সাথে তিনি তার কাজে শৃঙ্খলাকে তুলনা করেন।[২৮]

প্রাচ্যরীতির কাজ, বিমূর্ত কাজ এবং একজন নারী হিসেবে কাজের মূল্যায়ন করতে শিল্পী নাসরীন বেগমের দর্শন প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, একজন শিল্পী যে দেশ ও কালে জন্মে এবং বসবাস করে সেই দেশ কালের অনুভূতি তার কাজে চলে আসে। একজন প্রাচ্যের শিল্পীর কাজই প্রাচ্যচিত্রকলা।[২৯]

বিমূর্ত শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যা বোধের বাইরে তাই অ্যাবস্ট্রাক। কিন্তু শিল্পী একধরনের বোধ দ্বারা তাড়িত হয়েই শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন, যা শিল্পীর কাছে মূর্ত, অন্য কারো কাছে মূর্ত নয়।'[৩০]

তিনি তাঁর নিজের কাজে কখনোই বিমূর্ত ভাবনা নিয়ে ছবি আঁকেন না। তিনি যে বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকেন, যে বস্তু বা অবজেক্ট ব্যবহার করেন তার পেছনে সুনির্দিষ্ট বোধ কাজ করে। অবজেক্ট-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্ত ও বহিঃরূপ চিত্রে এমনভাবে তুলে ধরেন যে, দর্শকের চোখ তত গভীরে যায় না বলে বিমূর্ত মনে হয়।

চৌদ্দ

অন্যদের মতামত

শিল্পী নাসরীন বেগমের শিল্পকর্ম ও শিল্পদর্শন প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিক, শিল্পরসিক সাংবাদিক, সাধারণ দর্শক তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। এই অনুচ্ছেদে সেসব উদ্ধৃতি ও মতামতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে। এতে বিভিন্ন মনীষীর মতামত ও মন্তব্যের মধ্যে নাসরীন বেগমের স্বরূপ যেমন স্পষ্ট হবে, তেমনি বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় নাসরীন বেগমের শিল্পীজীবন, কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

একজন শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি তাঁর লীলার অংশ। এই লীলায় শিল্পী নিজে যে আনন্দ লাভ করেন কিংবা যে রসানুভূতির বশবর্তী হয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন দর্শক সেই শিল্পকর্ম দেখে একই অনুভূতির আবর্তে মোহিত না-ও হতে পারে। এখানেই সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টির রস গ্রহণের বহুবিধ দিক উন্মুক্ত থাকে। তাতে ক্ষতি নেই। নাসরীন বেগমের এমন অনেক কাজ আছে, যা দর্শক ও শিল্পরসিকদের ব্যাখ্যায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। শিল্পী হয়তো তেমন ভাবনার বশবর্তী হয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেননি। এমন অনেক সিরিজচিত্র আছে, যা নাসরীন বেগম শিল্পসমালোচকদের মন্তব্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই মন্তব্যকারদের উপলব্ধ রসানুভূতিতে তাড়িত হয়ে তেমনটি এঁকেছেন। অর্থাৎ দর্শকের মতামত ও উপলব্ধি শিল্পীর শিল্পমানকে ঋদ্ধ ও পুনর্বিবেচনা করতে সহায়তা করেছে।

শিল্পসমালোচক ও নন্দনতাত্ত্বিক আব্দুস সাত্তার লিখেছেন :

> প্রাচ্য শিল্প ধারায় শিক্ষিত নাসরীনের সন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি ঘুরে ফিরেছে নতুন ফর্মের অন্বেষণে। লতা, পাতা, ফুল দরজা প্রভৃতির ফর্ম নাসরীনের কাজে জন্ম নিয়েছে নতুন আঙ্গিকে। রঙ, ফর্ম, স্পেস ও অলংকরণ প্রভৃতির নমনীয় স্বভাব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা তাঁর চিত্রকে দিয়েছে গণতান্ত্রিক আবহ। দিয়েছে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন। ফলে চিত্রের বিষয়বস্তু তথা বিভিন্ন ফর্ম, রঙ, ফিগার, স্পেস প্রভৃতির অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্নরূপে চিহ্নিত করবার উপায় থাকে না। ছোট-বড় নানা বিষয়ের অসংখ্য ফর্ম মিলে তাঁর চিত্রে ফর্ম-ইন-ফর্ম এর রূপ লাভ করেছে। এখানেই নাসরীনের প্রধান কৃতিত্ব।[৩১]

সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন :

> নাসরীন বেগম তার নান্দনিক বোধ দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন জীবনবোধের একটা যোগসূত্র রচনা করতে চান। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা আত্মসন্ধানপ্রিয়। তিনি আপন সত্তার গভীরে ডুব দিয়ে আত্মপরিচয়ের সন্ধান করেন। জীবনকে তিনি তার সূক্ষ্মতা ও গভীরতা নিয়েই উপলব্ধি করতে চান তেমনি প্রকৃতির ভেতরকার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যকেও অনুধাবন করেন পরম মমতায়। এ কারণেই তার চিত্রের দিকে তাকালে মনে হয়, তাতে এক ধরনের নিমগ্নতা আছে, আছে স্থিরতা ও স্নিগ্ধতা। এসব দর্শক মনে একপ্রকার প্রশান্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে।[৩২]

উপরোক্ত বিষয়টি আরো প্রাঞ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে শাশ্বতী মজুমদারের লেখায় :

> শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের সংঘাতময় পরিস্থিতি তাঁর অবচেতনে যে স্থায়ী ছাপ ফেলে, তাই প্রতিফলিত হয় তাঁর চিত্রে। এর পরও তাঁর চিত্রের ভাষা আশ্চর্য রকম শান্ত, কোনো উগ্রতা বা কারও বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কোনো আক্রোশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে না। যেন নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া আর নিজেকে জানার আপ্রাণ চেষ্টাই ফুটে ওঠে তাঁর শিল্পকর্মে।[৩৩]

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মন্তব্যে নাসরীন বেগমের কাজের বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন :

> Nasreen begam her career as an Orientalist, Practising a form in which colours are subded, figures are highly stylized, and the background often two dimensional, She has since moved a long way towards another--more varied and more experimental--mode of expression in which a new awareness of form and figure, colour and line inform, her canvas. There is a new energy and grace that define her relationship with nature and reality. She still retains her love of water based colours, but now mixes her colours with, say, Chinese ink, and applies a lead pencil to fill up a space or mark out a form. She is still meticulous about her design, but allows form, to selt-create a world of their own.[৩৪]

ব্যক্তি ও তাঁর শিল্প প্রসঙ্গে সিলভিয়া নাজনীনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> তিনি অন্য শিল্পীদের থেকে নানা কারণেই আলাদা। বাইরে একটা অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে রাখলেও ভেতরে সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। তাঁর *ক্যাকটাস* সিরিজের মতোই কণ্টকাকীর্ণ বহিরাবরণ শুধু পারিপার্শ্বিকতাকে বিভ্রান্ত করে। দৃঢ় মনোবল, সত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং নিজের উপর অবিচল আস্থা শিল্পী নাসরীন বেগমকে আলাদা করে দিয়েছে অন্য সবার থেকে। তাঁর শিল্পকর্ম নিজস্ব ব্যক্তিত্বেরই আলাদা গড়ন।[৩৫]

রফিক ইসলাম লিখেছেন :

> As the poetically romantic title suggests, whole nature—the background of the intimate figure—evokes them to inundate everything intrinsically.
> It we go through the structure of the painting by this inventive artist, it must be found that Nasreen explores the Labyrinth of dight shade, space, form and colour with fearless abandon, anchored in technical excellence, acquired through unrelenting diligence.[৩৬]

Contemporary Paintings of Bangladesh শিরোনামে প্রদর্শনী হয়েছিল নরওয়ের (Norway) ওসলো (OSLO)-তে ২০০২ সালে ডিসেম্বর মাসে। এই প্রদর্শনীর ক্যাটালগের introduction এ নাসরীন বেগম সম্পর্কে যে মন্তব্য লেখা হয়েছিল, তা উন্মেষের দাবি রাখে। কারণ এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যেই নাসরীন বেগমের সঠিক মূল্যায়ন ধরা আছে :

> The oriental style of Painting has become Nasreen Begum's own style. She works mostly in watercolour and objects of nature find a new life through her brush. Her works are not big in size but big in content. She seems to magnify the beauty of the objects which we may have overlooked or could not appreciate.[৩৭]

The Daily Star পত্রিকায় জাহাঙ্গীর আলম নাসরীন বেগমের চিত্রকর্মের শিল্পভাষা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখ করা হলো :

> Celestial colour use and composition maturity decorative motif, soothing texture coupled with exquisite tonal gradation appear very strong in Nasreen Begume's work. The artist with her innovative themes and neo-Bengal wash techniques, has portrayed women figures of multitude expressions and lively styles; enriched oriental figurative paintings and formed lines with keeping blank white space on paper. Her works seem to have the texture of paints and etching. The language of Nasreen Begume's art is sharp and intense like poetry and is prominent with regard to both subjects and techniques. So, both the general viewers and the art connoisseurs can draw the Rasa form her painting.[৩৮]

পনেরো

কাজের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ এবং অবদান

উল্লিখিত আলোচনায় শিল্পী নাসরীন বেগমের শিল্পীজীবন, শিল্পকর্ম, শিল্পভাবনা, নন্দনভাবনার ও শিল্পসমালোচকদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিত্রকর্মের যে বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ চিহ্নিত করা যায় এবং বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় যেসব অবদান মূল্যায়ন করা যায়, তা সিদ্ধান্ত আকারে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায় :

(১) শিক্ষক কাজী গিয়াসউদ্দিন ও আব্দুস সাত্তারের জলরং প্রয়োগের টেকনিক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাশ্চাত্যরীতির রং মিশ্রণের বহুরূপিতা ও প্রাচ্যরীতির প্রাণময় ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়ে নতুন এক চিত্রঘরানার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন।

(২) তাঁর শিল্পকর্মে সচেতন ও অবচেতনভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিল্পীর নানান অনুষঙ্গ সংগৃহীত হয়েছে—আত্তীকরণের মাধ্যমে।

(৩) তাঁর প্রতিটি কাজ তত্ত্বের পর্যবেক্ষণে ও অনুভবের মায়াজালে জারিত হয়ে সৃষ্ট।

(৪) ক্যাকটাস ও প্রকৃতি সিরিজের অনেক কাজে তিনি ওয়াশের সাথে পেনসিলের ইফেক্ট ব্যবহার করে চিত্রে নতুন মাত্রা এনেছেন।

(৫) বিভিন্ন রকম পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়া মডেলদের অনুকৃতি—তাঁর চিত্রের অবজেক্ট হিসেবে নিয়েছেন বিষয়কে সদর্থক করার প্রয়োজনে। এই অনুকৃতি কখনোই অনুকরণ হয়নি, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সৃজনশীল হয়েছে।

(৬) তাঁর কাজের বহিরাঙ্গের শান্তময়-অনুভূতি, দৃষ্টিনন্দন রং ব্যবহার সাধারণ দর্শককে তৃপ্তি দেয় ও শান্তি দেয়। বোদ্ধা দর্শক ডুব দিতে পারেন ক্যানভাসে—সেখানে রং, ফর্ম, টেক্সচারের মধ্যে গল্প খুঁজে পান। অর্থাৎ উভয় শ্রেণির দর্শক তাঁর চিত্রকলা থেকে রস আহরণ করতে পারেন।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট বিষয় এবং করণ-কৌশলে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তাই নির্দিষ্ট স্টাইলে তাঁর কাজকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। নিত্যনতুন বিষয় ও করণ-কৌশলে তাঁর চিত্রে নব নব রস ও ভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায়।

(৮) প্রকৃতিকে দেখেছেন কবিদের মতো করে কবিহৃদয়ে। প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষণ করেছেন জীবন-দর্শনের সাথে মিলিয়ে। তাই প্রকৃতির ফর্মগুলো নৃত্যরত ফর্ম হিসেবে জীবন্ত রূপ পেয়েছে।

(৯) পাশ্চাত্য একাডেমিক পদ্ধতির জলরং মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যের অর্থাৎ চায়নিজ ইঙ্ক মিশিয়ে নতুন মাত্রা এনেছেন।

(১০) নানা অভিব্যক্তির প্রতিকৃতি ও নারীচিত্র এঁকেছেন এমনভাবে যে, চিত্রগুলোর একদিকে নারী চরিত্রের বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে চিত্রিত ছবিগুলোতে নারীর শারীরিক গঠন রক্ত-মাংসের অনুভূতি দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

(১১) তাঁর চিত্রে জলরং ও কাগজের প্রেমে নবজন্ম লাভ করে চিত্রিত বস্তুর ভলিউম, ডাইমেনশন, ওজন। যেন জলরং কাগজকে স্নানসিক্ত করে অবজেক্ট-এর চৈতন্য দেয়, আত্মার উন্মোচন ঘটায়।

(১২) জীবনানন্দ দাশের মতো নাসরীন নিসর্গের কবিতা লিখেছেন রঙে, ফর্মে, যে রং ও ফর্ম রূপক হয়ে প্রকৃতির সত্য উদ্‌ঘাটন করে।

(১৩) সারা জীবন প্রকৃতিকে স্টাডি করেছেন, তাই প্রকৃতির অনুপুঙ্খ রূপের গড়ন ধরা আছে প্রতিটি কাজে। অর্থাৎ বস্তুর চরম রিয়েলিস্টিক রূপকে উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন মাত্রায়।

(১৪) বাটিক মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির চিত্র এঁকে বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলাকে ঋদ্ধ করেছেন।

(১৫) তাঁর চিত্রের নারীরা আধুনিক মার্জিত এবং হাল ফ্যাশনের সাজসজ্জায় সজ্জিত। গ্রামের নারী কিংবা শ্রমজীবী ঝাড়ুদার নারীকেও পরিপাটি সজ্জায় চিত্রিত করে তাঁর চিন্তা ও মননের আধুনিকতাকে প্রকাশ করেছেন।

(১৬) প্রাচ্যরীতির রেখাপ্রধান চিত্র যেমন এঁকেছেন তেমনি রেখার ব্যবহার ছাড়া এবং কাগজের সাদা অংশ রেখে রেখে রেখা তৈরি করেছেন।

(১৭) অসংখ্য স্কেচ খাতায় পরিপূর্ণ করে ড্রয়িং এঁকেছেন। জীবন-দর্শনের ভাবনাগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

(১৮) কর্মব্যস্ত মানুষেরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন না। নাসরীন বেগম তাঁর চিত্রের মাধ্যমে চাঁদ কী? বৃষ্টি কী? অনুভব করতে শিখিয়েছেন। প্রকৃতির গভীর সৌন্দর্য ও ভাষা বুঝতে শিখিয়েছেন।

(১৯) শিল্পীদের কাজে কখনো বিষয়ের গুরুত্ব, কখনো করণ-কৌশলের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। নাসরীন বেগমের কাজে করণ-কৌশল ও চিত্রের বিষয়ের গুরুত্ব একাত্ম হয়ে প্রকাশ পায়।

(২০) তাঁর জীবন-দর্শন তাঁর ছবির মূল বিষয়।

(২১) চিত্রে রঙের উৎসব। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ রঙিন, খাবারের মেনুগুলোও রঙিন। অর্থাৎ তাঁর রঙিন জীবনভাবনার সাথে জীবন ও কর্মকে রঙিন করে সাজাতে পারেন।

(২২) ধর্ম, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা সমন্বিত করে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

(২৩) ডায়েরি লেখেন। যার মধ্যে আত্মদর্শন, আত্মচর্চা ও আত্মকথন পরিস্ফুটিত হয়েছে।

(২৪) মহিলা শিল্পী সংগঠন সাকোর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

(২৫) কবিতার মতো তাঁর ছবির ভাষা তীব্র এবং তীক্ষ্ম। একাডেমিক উপস্থাপনের মধ্যেও প্রাণবন্ত থাকে তাঁর স্বকীয় মৌলিকত্ব।[৩৯]

(২৬) দর্শক তাঁর ছবিকে নিজের সম্পদ বলে মনে করতে পারেন। কারণ তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে প্রাচ্যের বিষয়-উপাদান আছে।

(২৭) ক্যানভাসে নানা স্পেস রেখে চিত্রকলার নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।

(২৮) ছাপচিত্রের এচিংয়ের টেক্সচারের প্রভাব আছে তাঁর কাজে।[৪০]

(২৯) নিজের দেশ ও ঐতিহ্যের প্রতি অসীম টান ও ভালোবাসার ছাপ আছে তাঁর কাজে।

(৩০) কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নয়, আত্ম-অনুসন্ধানরত যাত্রার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য আনেন।

(৩১) তাঁর কাজে ব্যবহৃত প্রতীক নানান প্রশ্ন তৈরি করে। যে প্রশ্ন থেকে দর্শক নিজের মতো উত্তর খুঁজে পেতে পারেন এবং এই উত্তর শিল্পীর সাথে কখনো একাত্ম, কখনো বিসদৃশ হতে পারে।

(৩২) জলরং-নির্ভর কাজ করে তিনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশের মানুষের জলরং দেখার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করে আসছেন।[৪১]

(৩৩) তাঁর রেখায় থাকে গতি, আলো এবং প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীকী প্রকাশ।

(৩৪) ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করেছেন জলরঙের মতো। আবার জলরং এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, দেখে অ্যাক্রেলিক এবং তেলরঙের মতো মনে হয়।

ষোলো

উপসংহার

নাসরীন বেগম বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার উল্লেখযোগ্য শিল্পী। প্রাচ্যরীতির চিত্রশৈলীতে নির্দিষ্ট কিছু গ্রামার মানতে হয়। সেই গ্রামারের পথ ধরেই সময় উপযোগী করে নিজের স্টাইল পরিবর্তন করে চলেছেন। নতুন নতুন গবেষণায় তাঁর কাজে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন হলো সময়ের দাবি অনুসারে নিজেকে বদলে নেয়া। তিনি প্রকৃতির মাঝে সৌন্দর্য খোঁজেন, সত্য খোঁজেন, আলোর সন্ধান করেন এবং সৌন্দর্য সত্য ও আলোর মাঝে নিজের অতিস্ত খুঁজে বেড়ান।

টেকনিকের ক্ষেত্রে জলরঙকে নিয়ন্ত্রণ ও লীলায় বেঁধেছেন। শিহরিত রেখা, আবেগীয় রং এবং বস্তুর অভ্যন্তরীণ অনুভূতি সৃষ্টিতে তাঁর শিল্পবোধ ঈর্ষণীয়। বিশ্বপ্রকৃতি রহস্যের ইন্দ্রজালে ঢাকা। নাসরীন বেগম তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে সেই ইন্দ্রজাল উন্মোচন করতে চান। অধরাকে ধরতে চান। বক্তব্যকে বশীকরণ করেন আঙ্গিকের সুনিপুণ চাল। স্বপ্নজাল নয়, জীবন-অভিজ্ঞতা। জীবন চলার পথে যে অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হয়েছেন, তারই গীতিকাব্য রচনা করেছেন চরম সাধনায়।

নাসরীন বেগম প্রাচ্যচিত্রকলার মূল নীতি আশ্রয় করেই আধুনিক চিত্রকলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, যা বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলাকে সমৃদ্ধ ও সম্মানে উন্নীত করেছে। জটিল ও দুর্বোধ্য ভাবাবেশ বর্জন করে নিজস্ব মৌলিকতায় প্রাচ্যচিত্রকলাকে সকলের কাছে রসগ্রাহী করে তুলেছেন। দীর্ঘ জীবনের শিক্ষকতায় তাঁর অনুসারীরা বাংলাদেশের চিত্রকলায় প্রাচ্যরীতির চিত্র-আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অতএব, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলাচর্চায় নাসরীন বেগম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে আসছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. গবেষকের সাথে নাসরীন বেগমের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৫ জুলাই ২০১৩

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, ১৫ আগস্ট ২০১৩

৪. সুব্রত পাল, *নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা*, এম.এফ.এ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ, শিক্ষাবর্ষ : ১৯৯৫–৯৬, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২

৫. গাজী রফিক "নৈঃশব্দের শিল্পী", *দৈনিক সংবাদ* ২৭ এপ্রিল ২০০১

৬. ক্যালেন্ডারে ব্যবহৃত চিত্রশিল্পের বর্ণনার মোগল চিত্রকলা থেকে বেঙ্গল স্কুল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব চিত্ররচনা ধারা এসেছে সেসব থেকে কিছু কিছু রসদ সংগ্রহ করে গত দেড় দশক ধরে চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস চলছে। বর্তমান চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু মূলত রমণী, যার সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া নিয়েই ছবির গল্প। রমণীর ভালবাসা অতি সূক্ষ্ম। আবার দুঃখ অতীব গভীর। কিন্তু তা অব্যক্তই থেকে যায়। দুঃখী রমণীর চাওয়া-পাওয়াও মনের গোপনেই থাকে। বঞ্চিত রমণী অল্পেই সন্তুষ্ট। আবার অতি দুঃখে কখনও রমণী হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। তবুও রমণী ভালবাসে, স্বপ্ন দেখে, অপেক্ষা করে সুন্দর মুহূর্তের জন্য। রমণীর এই ভাবের বহিঃপ্রকাশ খুব সামান্যই চোখে পড়ে। রমণী জীবনের এই সব অনুভূতি সামান্য হলেও তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন শিল্পী নাসরীন বেগম। (পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড থেকে প্রকাশিত ১৯৯২ সালের ক্যালেন্ডার, ২৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ১ম পৃষ্ঠা)

৭. আব্দুস সাত্তার, *জয়নুলের এগারজন সহকর্মী*, ঢাকা, হিমি বুকস এন্ড বুকস, নভেম্বর ২০০৫

৮. আব্দুস সাত্তার, দ্র. 2nd Solo Oriental Painting Exhibition by Nasreen Begum, Galery Tone, 8th-17th Oct. 1993

৯. গবেষকের সাথে নাসরীন বেগমের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৬ জুন ২০১৩

১০. Shamim akhter, æPassing Beauty" *The weekly MAG*, 1-7April 2006, Pakistan Lahoure, 2006, p. 51

১১. আশফাকুর রহমান, "নাসরীন বেগমের প্রদর্শনী : রঙ রূপের যুগলবন্দি", *আজকের কাগজ* ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪

১২. অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস, "নাসরীন বেগমের চিত্রপ্রদর্শনী : ঝরাপাতার কাব্য", ইত্তেফাক সাময়িকী, *দৈনিক ইত্তেফাক* ৭ জুন ২০১৩

১৩. নন্দলাল বসু, *শিল্পকথা*, প্রথম সং, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭, [পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০৫], পৃ. ২৭

১৪. সৈয়দ আজিজুল হক, "নাসরীন বেগমের চিত্রগুচ্ছ : সত্তার প্রতিবিম্ব", *Beyond Human Nature* by Nasreen Begum, Athena Gallery of Fine Arts, 25th May thru 11th June 2013

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. গবেষকের সাথে নাসরীন বেগমের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৭ জুলাই ২০১৩

১৭. প্রাগুক্ত, ২১ জুলাই ২০১৩

১৮. নাসরীন বেগম, "শিল্পীর কথা" দ্র. *Beyond Human Nature* by Nasreen Begum, Athena Gallery of Fine Arts, May 25th thru June 11th 2013 [উদ্ধৃতির অশুদ্ধ বানান শুদ্ধ করা হয়েছে]

১৯. নাসরীন বেগম, "আমি ও ছবি", দ্র. Solo Exhibition : Nasreen Begum 2000, Divine Art Gallery, August 11-18, 2000

২০. নাসরীন বেগম, "শুভেচ্ছা বাণী", দ্র. 3rd solo Exhibition *Absorbed Nature* by Nazmul Haque Bappy, Alliance Francaise de Dhaka Galler, 2012)

২১. নাসরীন বেগম, "শুভেচ্ছা বাণী", দ্র. জলরং চিত্র প্রদর্শনী বর্ণিকাভঙ্গ, গ্যালারী চিত্রক, ২২-৩১ আগস্ট ২০০৩

২২. নাসরীন বেগম, "বারবার প্রশ্ন করি, নিজেকেই . . .", দ্র. Bengal Gallery of Fine Arts Present Nasreen Begum : the Path within September 2004.)

২৩. গবেষকের সাথে নাসরীন বেগমের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৬ জুন ২০১৩

২৪. প্রাগুক্ত, ১৭ জুলাই ২০১৩

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২৮. গবেষকের সাথে নাসরীন বেগমের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৭ জুলাই ২০১৩

২৯. প্রাগুক্ত, ২০ আগস্ট ২০১৩

৩০. প্রাগুক্ত, ৪ জুলাই ২০১৩

৩১. আব্দুস সাত্তার, *জয়নুলের এগারজন সহকর্মী*, ঢাকা, হিমি বুকস এন্ড বুকস, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ২২৪

৩২. সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত

৩৩. শাশ্বতী মজুমদার, "চেতনার শিল্প" *প্রথম আলো* ২২ জুলাই ২০১১, কলাম ৫-৭, পৃ. ৫

৩৪. Manzoorul Islam, see 3rd Solo Painting Exhibition by Nasreen Begum, 29th September thru 6th October, 1993.

৩৫. সিলভিয়া নাজনীন, "প্রাচ্যের ক্যাকটাস", *প্রথম আলো* ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫

৩৬. Rafique Islam, æAn Oriental Dimension", *The Financial Express* 28th April, P. 11

৩৭. æIntroduction", *Contemporary Paintings of Bangladesh*, OSLO, Norway, 2nd December 2002

৩৮. Jahangir Alam, æAn artist par excellence : Nasreen Begum's Love affair with Oriental Art and beyond", Arts & Entertainment, *The Daily Star* 9th November 2013, p. 10 [1st Part of the article was published on 8th November 2013]

৩৯. গাজী রফিক, প্রাগুক্ত

৪০. শাশ্বতী মজুমদার, প্রাগুক্ত

৪১. জাহিদ মুস্তাফা, "অপরূপ রূপকথা", *প্রথম আলো* ৬ এপ্রিল ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য শিল্পী

অবিভক্ত বাংলায় নব্য-বেঙ্গল চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রাচ্যচিত্রকলার যে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চা শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই প্রাচ্যকলা বিভাগের ধারাবাহিকতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা গ্রুপ এবং খুলনা আর্ট কলেজে (বর্তমান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট) প্রাচ্যকলা বিভাগ চালু হয়।[১]

উল্লিখিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যেসব শিল্পী প্রাচ্যকলা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদেরকেই এই নিবন্ধে অন্যান্য শিল্পী হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। যেহেতু শিল্পী আব্দুস সাত্তার, শিল্পী রফিক আহমেদ, শিল্পী শওকাতুজ্জামান ও শিল্পী নাসরীন বেগমের জীবন, শিল্পকর্ম ও অবদান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু এঁদের বাদে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চারত শিল্পীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত শিল্পীদের শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় তাঁদের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে এই নিবন্ধে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রাচ্যকলার পঠন-পাঠনের সূচনালগ্নে যেসব শিক্ষক শিক্ষকতা করেছেন এবং বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চায় যেসব শিল্পীর কাজ প্রাচ্যরীতির প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত সেসব শিল্পীরও উল্লেখ করা হবে এই নিবন্ধে।

অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে নব্য-বেঙ্গল স্কুল বা বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার যে প্রাতিষ্ঠানিক ধারা গড়ে উঠেছিল, তখন পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) কোনো শিল্পী এ ধারায় চিত্রচর্চার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ব বাংলা থেকে যেসব শিল্পী পশ্চিম বাংলার অর্থাৎ কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। দেশবিভাগের পর এসব শিল্পী যখন তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব বাংলায় চলে এসে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন—তখন পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার শিল্পশিক্ষাই চালু করেছেন। শিল্পশিক্ষার বিস্তৃতি ও বহুমুখিতার জন্য ১৯৫৫ সালে ইস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটসে প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রাচ্যকলা বিভাগ। প্রতিষ্ঠালগ্নে শিক্ষক ছিলেন শিল্পী শফিকুল আমীন, ১৯৫৬ সালে যোগ দেন শিল্পী রশিদ চৌধুরী, ১৯৬৮ সালে যোগ দেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং পরবর্তী সময়ে যোগ দেন শিল্পী হাশেম খান। প্রাচ্যকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠালগ্নের এই শিল্পীরা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতিতে চিত্রচর্চারত ছিলেন। প্রত্যেকেই বাংলাদেশের শিল্পভুবনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পী রশিদ চৌধুরী ও শিল্পী হাশেম খান একুশে পদকপ্রাপ্ত। যেহেতু এই গুণী শিল্পীগণ প্রাচ্যচিত্ররীতিতে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেননি,

Dhaka University Institutional Repository

সেহেতু প্রাচ্যরীতির টেকনিক অনুযায়ী তাঁরা কখনোই চিত্রচর্চা করেননি। তবু তাঁদের প্রাচ্যরীতির শিক্ষকতার সূত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়ার সূত্রে তাঁদের কাজে প্রাচ্যরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া অবিভক্ত বাংলার অপ্রাতিষ্ঠানিক বাঙালি শিল্পী আবুল কাশেমের কাজেও প্রাচ্যরীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চায় অন্যান্য বিভাগের শিল্পীদের কোনো কোনো কাজে বেঙ্গল স্কুল রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায় কিংবা প্রাচ্যরীতির টেকনিক ও বিষয়চিন্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সে বিচারে শিল্পী জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, আব্দুস সাত্তার, মুর্তজা বশীর, নাজলী লায়লা মনসুরসহ প্রমুখ শিল্পীর কাজে প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়।

অতএব বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় অন্যান্য শিল্পী বলতে তাঁদের তিনটি বিভাগে ভাগ করে নেয়া যায়। এক. প্রতিষ্ঠালগ্নে যেসব শিল্পী শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন, দুই. প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিক্ষিত শিল্পীগণ, তিন. প্রাচ্যরীতির টেকনিক দ্বারা প্রভাবিত শিল্পীগণ। এবার ধারাবাহিকভাবে এই তিন স্তরের শিল্পীদের জীবন ও তাঁদের কাজের সচিত্র বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে তাঁদের কাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করা হবে।

এক

প্রতিষ্ঠালগ্নে যেসব শিল্পী দায়িত্ব পালন করেছেন

প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্নে যেসব শিল্পী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কেউই প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না। ১৯৪৮ সালে ‘সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠালগ্নে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং এবং কমার্শিয়াল আর্ট—এই তিন বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশীয় শিল্পের সাথে সংগতি রাখার জন্য ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল প্রাচ্যকলা বিভাগ। এই বিভাগের প্রথম শিক্ষক শফিকুল আমীন। শফিকুল আমীন আসামের রাজধানী শিলঙ শহরে ১৯১২ সালের ১৬ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি ১৯৩০ সালে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তী সময়ে ১৯৩২ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের কোর্স শেষ করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ড্রয়িং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এ ছাড়া ১৯৪৫ সালে কলকাতার ডেভিড হেয়ার কলেজে ড্রয়িং বিষয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে সহকারী নকশাবিদ হিসেবে যোগ দেন। এরপর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে আসেন। এখানে ১৯৪৯ সালে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যোগ দেন। এরপর কেন শফিকুল আমীন ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষক হলেন এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক লালা রুখ সেলিমের বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে :

Dhaka University Institutional Repository

When the opportunity to introduce yet another department arose, naturally, the choice fell on Oriental Art. Though a graduate of fine Art Shafiqul Ameen was skilled at doing detailed work and also worked in the Indian or more popularly known oriental style.[২]

চিত্র ০১ : শফিকুল আমীন, জলকে চলে, জলরং, ১৯৬১

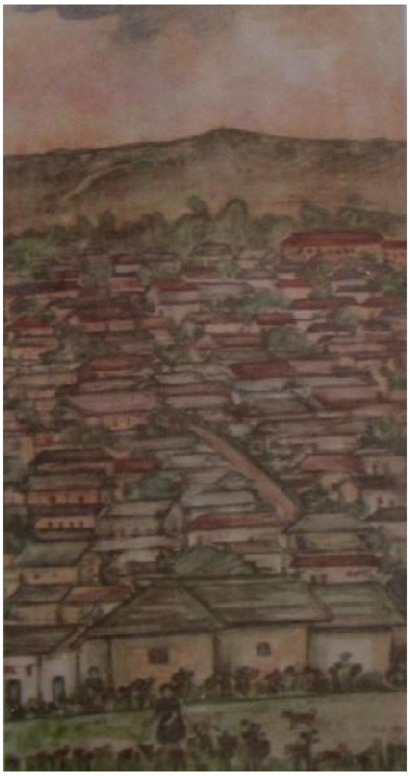

চিত্র ০২ : শফিকুল আমীন, যাইয়াও হতে শিলঙ শহর, ১৯৩৭

লালা রুখ সেলিমের উল্লিখিত বিশ্লেষণে অনুমান করা যাচ্ছে যে, জয়নুল আবেদিন প্রাচ্যরীতির শিক্ষক হিসেবে শফিকুল আমীনকেই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শফিকুল আমীনের কাজে প্রাচ্যরীতির নানান অনুষঙ্গ থাকলেও প্রকৃত অর্থে প্রাচ্যরীতির চর্চা তিনি করেননি। বিভাগ খোলার প্রয়োজনে তিনি দায়িত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৫৫ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ১৯৬৮ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রাচ্যকলা বিভাগের ক্লাস ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেছেন অবসরের পূর্ব পর্যন্ত।[৩]

১৯৫৬ সালে এক বছরের জন্য প্রাচ্যকলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী রশিদ চৌধুরী। রশিদ চৌধুরী ১৯৩২ সালের ১ এপ্রিল রাজবাড়ী (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম বিভাগে শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৫৬–৫৭ সালে স্পেন সরকারের স্নাতকোত্তর বৃত্তি লাভ করে মাদ্রিদের সেন্ট্রাল এস্কুলা দেস বেলিয়াস আর্টেস দ্য সান ফার্নান্দো থেকে ভাস্কর্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৬০–৬৪ সালে ফরাসি সরকারের প্যারিসের একাডেমি অব জুলিয়ান অ্যান্ড বোজ আর্ট থেকে ফ্রেসকো ভাস্কর্য ও ট্যাপেস্ট্রি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন।[৪] তিনি মূলত ট্যাপেস্ট্রির জন্যই বিখ্যাত। যেহেতু তাঁর পড়াশোনা প্রাচ্যকলাভিত্তিক নয় তাই তাঁর

কাজে প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ কম পাওয়া যায়। তবে তিনি গোয়াশ পদ্ধতিতে অনেক কাজ করেছেন, যেগুলো আমাদের দেশীয় চিত্ররীতির অনুষঙ্গ বলা চলে। এ ছাড়া তিনি তাঁর ট্যাপেস্ট্রি তৈরিতে লে-আউট করতেন গোয়াশ পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিগত দিক ছাড়া তাঁর কাজকে প্রাচ্যরীতি বলা সমীচীন হবে না। তবে তাঁর চিত্রের বিষয় এ দেশীয় পৌরাণিক কাহিনিসমৃদ্ধ।

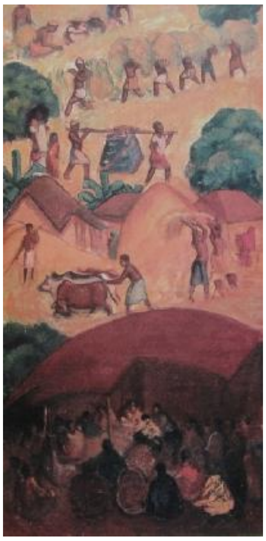

চিত্র ০৩ : শিল্পী রশিদ চৌধুরী
নবান্ন-২, তেলরং
৯০ × ৪৫ সেমি, ১৯৮৮

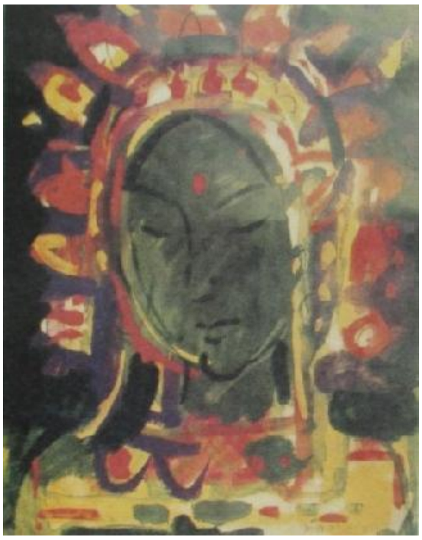

চিত্র ০৪ : শিল্পী রশিদ চৌধুরী
শ্যামাঙ্গিনী, গোয়াশ

চিত্র ০৫ : শিল্পী রশিদ চৌধুরী
ক্যালিগ্রাফি-৩ গোয়াশ
৭৫ × ৫০ সেমি, ১৯৮৫

আমিনুল ইসলাম ১৯৫৭ সালে সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ইনস্টিটিউটটি ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটস কলেজে রূপান্তর হয়। আমিনুল ইসলাম ১৯৬৮ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে প্রমোশন নিয়ে ১৯৬৮ সালে প্রাচ্যকলা বিভাগে যোগ দেন। প্রাচ্যকলা বিভাগ হওয়ার পর এই বিভাগে মুরাল পেইন্টিং সংযুক্ত করা হয়। কারণ তিনি এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছিলেন।

আমিনুল ইসলাম ১৯৩১ সালের ৭ নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৩ সালে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৫৩–৫৬ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের অ্যাকাদেমি-দ্য-বেল্ আর্তিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদানের পর ১৯৭৮ সালে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৩ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।[৫]

আমিনুল ইসলাম এ দেশের স্বনামধন্য পেইন্টার। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার চর্চা তিনি কখনো কখনো করেছেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় জলরঙের কয়েকটি কাজে এবং এচিং-এ। লাইনের ব্যবহার এবং জলরং ওয়াশ পদ্ধতির অনুষঙ্গই এর প্রমাণ। তবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যকলা বিভাগে মুরাল বা ফ্রেসকো চিত্রাঙ্কনের সূচনা তিনিই করেছিলেন। সে বিচারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

চিত্র ০৬ : ড্রয়িং, ১৯.০৫ × ১১.৪৩ সেমি

চিত্র ০৭ : রাতে গানের আসর, জলরং, ৪৭ × ৬৬ সেমি, ১৯৫১

একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী আবুল হাশেম খান প্রাচ্যকলা বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে। এর পূর্বে তিনি ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে যোগ দিয়েছিলেন। হাশেম খান ১৯৪২ সালের ১৬ এপ্রিল চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে চারুকলার ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।[৬]

আব্দুস সাত্তার যখন প্রাচ্যকলা বিভাগে ১৯৭৮ সালে ভর্তি হয়েছিলেন তখন ওই বিভাগে কোনো শিক্ষক ছিলেন না। তাই তাঁর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হাশেম খান প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

হাশেম খান প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কন করেননি। তাঁর বড়ো পরিচয় শিশু পুস্তক চিত্রাঙ্কনে। এ ছাড়া প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ অলংকরণে তিনি বাংলাদেশে স্বনামধন্য। প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তিনি ক্যালিগ্রাফি বিষয়কে এবং পাণ্ডুলিপি চিত্রণ বিষয়ে ভালো নির্দেশনা দিতেন। তিনি নিজেও প্রচুর ক্যালিগ্রাফি করেছেন, তবে প্রাচ্যরীতির টেকনিকে নয়। যেহেতু ক্যালিগ্রাফি ও পাণ্ডুলিপি চিত্রণ প্রাচ্যচিত্রীতির অন্যতম বিষয়, সেহেতু হাশেম খানের শিক্ষকতায় প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ০৮ : ফুল ও পাখি, জলরং
৯০ × ৫৪ সেমি, ১৯৮০

চিত্র ০৯ : ভানু, জলরং
৬৫ × ৫৬ সেমি, ১৯৭০

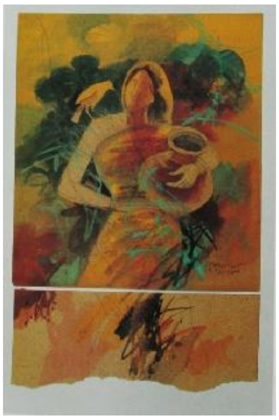

চিত্র ১০ : কন্যা, জলরং
৮৫ × ৬০ সেমি, ১৯৯৮

হাশেম খান তেলরং পেইন্টার হিসেবেও স্বনামধন্য। তাঁর কাজে প্রাচ্যরীতির কিছু অনুষঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লিখিত আলোচনায় প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষা গ্রহণ করেননি এমন চারজন শিক্ষকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাঁরা মূলত প্রত্যেকেই ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের ছাত্র এবং শিল্পী হিসেবে পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় চিত্র এঁকেছেন। ফলে তাঁদের কাজে প্রাচ্যরীতির বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকের তেমন কোনো ছোঁয়া নেই। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কাজে প্রাচ্যরীতির নানা অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে মাত্র। তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, তাঁদের অদম্য চেষ্টায় প্রাচ্যকলা বিভাগে পরবর্তী সময়ে সুযোগ্য ছাত্র তৈরি হয়েছেন। তৈরি হয়েছেন আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের মতো প্রাচ্যরীতির একনিষ্ঠ শিল্পী। যাঁরা পরবর্তী সময়ে প্রাচ্যরীতির প্রাতিষ্ঠানিক ধারাকে সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তাঁদের কাজে এবং তাঁদের ছাত্রদের কাজে।

দুই

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিক্ষিত শিল্পীগোষ্ঠী

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিক্ষিত শিল্পীদের মধ্যে নির্বাচিত ২০ জন শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। এর ফলে তাঁদের শিল্পকর্মের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্যচিত্রকলার সাথে তাঁদের চিত্রের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় তাঁদের অবদান নির্ণয় করা সহজ হবে। বাংলাদেশে বলতে ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশকেই ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালে ঢাকার চারুকলা প্রতিষ্ঠান শুরু এবং তৎপরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার দীর্ঘদিন পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা বিভাগ খোলা হয় ১৯৯৪ সালে। এ ছাড়া খুলনা আর্ট কলেজেও কিছুদিনের জন্য প্রাচ্যকলা বিভাগ খোলা ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে যেসব শিল্পী প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা অনুশীলন করে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন—তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ২০ জন নির্বাচিত শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

তাজুল ইসলাম (জন্ম ১৯৪৬)

মিজানুর রহমান ফকির (জন্ম ১৯৭০)

গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী (জন্ম ১৯৭১)

Dhaka University Institutional Repository

সুশান্ত কুমার অধিকারী (জন্ম ১৯৭২)

মোঃ আব্দুল আযীয (জন্ম ১৯৭৪)

মাসুদা খাতুন জুঁই (জন্ম ১৯৭৬)

শংকর মজুমদার (জন্ম ১৯৭৬)

আব্দুল বাতেন খান (জন্ম ১৯৭৭)

ফাহমিদা খাতুন (জন্ম ১৯৭৭)

মলয় বালা (জন্ম ১৯৭৮)

ওমর শাহজাহান (জন্ম ১৯৭৯)

গৌতম কুমার বিশ্বাস (জন্ম ১৯৮০)

কান্তিদেব অধিকারী (জন্ম ১৯৮০)

মোছাঃ নাজনীন আকতার (জন্ম ১৯৮১)

সোহাগ পারভেজ (জন্ম ১৯৮১)

গোপাল চন্দ্র সাহা (জন্ম ১৯৮৪)

নাজমুল হক বাপ্পী (জন্ম ১৯৮৪)

সিনথিয়া আরেফিন (জন্ম ১৯৮৫)

সুমন কুমার বৈদ্য (জন্ম ১৯৮৫)

মমতাজ পারভীন মাধবী (জন্ম ১৯৮৭)

উল্লিখিত শিল্পীগণ বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যেকেই উদ্ভাবনী ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে আসছেন। তাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রচর্চায়ও বিশেষ অবদান রেখে আসছেন। এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁদের জীবন ও শিল্পকর্মের বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

তাজুল ইসলাম (জন্ম ১৯৪৬)

ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এই বিভাগে যেসব ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন শিল্পী তাজুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথম ১৯৫৫–৫৬ শিক্ষাবর্ষে কিশোয়ার জাহান নামে একজন ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষে তাজুল ইসলাম ভর্তি হন। প্রাতিষ্ঠানিক এই প্রাচ্যচিত্রকলার শুরুতে যেসব শিক্ষক দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁরা প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের ছাত্র। ফলে প্রথম দিকের ছাত্র-ছাত্রীরা সিলেবাস অনুযায়ী প্রাচ্যরীতির চিত্র অঙ্কনের যথাযথ তত্ত্বাবধান পাননি। ফলে শিক্ষকদের বিশেষ বিশেষ পারদর্শিতা বা শিল্পচর্চা থেকে প্রভাবিত হয়ে কাজ করেছেন। তাজুল ইসলাম শিল্পী শিক্ষক রশিদ চৌধুরীর

Dhaka University Institutional Repository

ট্যাপেস্ট্রি দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাঁর কাজে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির ওয়াশ, টেম্পারা কিংবা মুরাল-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। তিনি চর্চা করেছেন ট্যাপেস্ট্রি। আর এ মাধ্যমেই প্রাচ্যরীতির দ্বিমাত্রিক রং ব্যবহারে ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন করেছেন। তাঁর এ কাজের মধ্যে বিমূর্ততা লক্ষণীয়, যা ওই সময়ের বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের বিমূর্ত প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় ট্যাপেস্ট্রি প্রাচ্যকলা মাধ্যম না হলেও বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্যকলার শিক্ষক রশিদ চৌধুরী এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র তাজুল ইসলাম এই মাধ্যমকে জনপ্রিয় করেছেন। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলার মাধ্যম হিসেবে কারুশিল্প বিভাগে ট্যাপেস্ট্রি চর্চা করা হয়। বয়ন শিল্পের ঐতিহ্য আমাদের বাংলার অতীত ঐতিহ্যে ছিল। বিশ শতকে ইয়োরোপে চিত্রকলায় এ মাধ্যমের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। রশিদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার কল্যাণে সেই উন্নয়নের জোয়ার বাংলাদেশেও লাগে।

তাজুল ইসলাম শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট থানার দাতরা গ্রামে ১৯৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় খেলাধুলায় পটু ছিলেন। পদ্মার পাড়ের মানুষ বাবাকে ইলিশ মাছ ধরার জাল বুনতে দেখেছেন। মা শৌখিন সুতার কাজ করতেন। বলা যায় বয়ন শিল্পের কারিগরি ও নান্দনিক পাঠ ছেলেবেলায় পারিবারিক পরিবেশেই পেয়েছেন। হাতপাখা, বটুয়া, মায়ের পানদানি, টাকা রাখার থলে বানাতে দেখেছেন মাকে। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় My Fables নামক ইংরেজি গল্পের পাঠ্য বইয়ের সাদাকালো ইলাস্ট্রেশনের ছবিগুলো রং দিয়ে রঙিন করতেন। রং কোথায় পাবেন? ফুলের রং এবং রঙিন কাগজ পানিতে গুলিয়ে যে রং পেতেন তা দিয়ে তৈরি করতেন রং। এ ছাড়া শ্লেটে চক দিয়ে ড্রয়িং করতেন, পাক-ভারত ইতিহাস বইয়ের মোগল যুগের ছবি। এভাবেই চারুকলার চর্চা করেছেন। এরপর ১৯৬৩ সালে এস.এস.সি পাস করে ঢাকার আর্ট কলেজে ভর্তি হতে আসেন। চারুকলায় ভর্তির বাসনা আগে থেকেই ছিল। কারণ শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন বাড়ির কাছের লোক। তাঁর ছবি আঁকার কাহিনি জেনেই চারুকলায় পড়ার স্বপ্ন দেখেছেন তাজুল ইসলাম।

১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষে বি.এফ.এ প্রাক ডিগ্রিতে ভর্তি হলেন ইস্ট পাকিস্তান সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। এখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য সহপাঠী ছিলেন বর্তমানের স্বনামধন্য শিল্পী মাহমুদুল হক, আবুল বারক আলভী, মিজানুর রহিম, রেজাউল করিম প্রমুখ। প্রি-ডিগ্রিতে হাশেম খান ছিলেন শ্রেণিশিক্ষক। ১৯৬৫ সালে প্রি-ডিগ্রি পাস করে প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ ডিগ্রিতে ভর্তি হলেন। শিল্পী শফিকুল আমীন ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। রশিদ চৌধুরী ছিলেন সদ্য শিক্ষক। প্রাচ্যকলা বিভাগে রশিদ চৌধুরীর কাজের টানেই ভর্তি হয়েছেন। কারণ ১৯৬৫ সালে রশিদ চৌধুরী বাংলা একাডেমিতে ট্যাপেস্ট্রি, চিত্রকলা ও ড্রয়িং বিষয়ে প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীর কাজ দেখে তাজুল ইসলাম মুগ্ধ হয়ে যান এবং মনে মনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তির পর রশিদ চৌধুরীর সান্নিধ্য পান। এই বিভাগের একাডেমিক সিলেবাস অনুযায়ী ওয়াশ পদ্ধতি, কপি ওয়ার্ক, ফ্রেসকো ইত্যাদি মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন করেন। সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল মৃৎশিল্প ও দৃশ্যচিত্র। মৃৎশিল্প বিভাগের রিলিফ স্কাল্পচার করেছেন।

রশিদ চৌধুরী বিদেশি স্ত্রী গ্রহণ করায় সরকারের নিয়মানুযায়ী সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের চাকরি হারান। রশিদ চৌধুরী চাকরিচ্যুত হলে তাজুল ইসলাম আশাহত হন। কারণ এই শিক্ষকের টানেই প্রাচ্যকলায় ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাজুল ইসলাম আশা ছাড়েননি। তিনি রশিদ চৌধুরীর বাসায় যেতেন এবং তাঁর ট্যাপেস্ট্রির ড্রয়িংয়ের কাজে সাহায্য করতেন। অর্থাৎ শিল্পী রশিদ চৌধুরী ট্যাপেস্ট্রির মূল লে-আউট করে দিতেন আর তাজুল ইসলাম মূল ড্রয়িং দেখে ছবির সাইজ বড়ো করে ড্রয়িং করে দিতেন। এভাবেই প্রাচ্যকলায় পড়াশোনার পাশাপাশি রশিদ চৌধুরীর কাজে ট্যাপেস্ট্রি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন তাজুল ইসলাম। ১৯৬৮ সালে তাজুল ইসলাম বি.এফ.এ পাস করেন। এ বছরই বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চারুকলা শিক্ষা প্রদানের প্রথম প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে প্রথম শিক্ষক হিসেবে রশিদ চৌধুরী যোগদান করে বিভাগ উন্নয়নের কাজে ভূমিকা রাখেন।[৮]

তাজুল ইসলাম ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনে চাকরি নিয়ে চিটাগাং চলে যান। সেখানে তিনি ম্যানেজার (ডিজাইন) পদে চাকরি করেন এবং ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে ১৯৭৪ সালে এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। দীর্ঘ চাকরি জীবনে তিনি ট্যাপেস্ট্রি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। অর্জন করেছেন পুরস্কার। অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রেনিং ও শিল্পমেলায়। এ ছাড়া এক বছরের (২০০৯–১০) জন্য ট্যাপেস্ট্রি উইভিং এবং হাতে তৈরি কার্পেট তৈরিতে ওমানে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন। তিনি ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট ৯টি একক প্রদর্শনী করে বাংলাদেশের ট্যাপেস্ট্রি চিত্রকলায় খ্যাতি অর্জন করে আসছেন।

প্রাচ্যরীতির ছাত্র হিসেবে তিনি ট্যাপেস্ট্রি ছাড়াও তেলরং ও গোয়াশ পদ্ধতির কাজ করতেন। তৈলচিত্রের বিষয় ছিল প্রকৃতি, সমুদ্র দিগন্ত, রূপসী আকাশ, নকশিকাঁথা, অভিসার প্রভৃতি। গোয়াশ পদ্ধতিতে প্রকৃতি নিয়ে ছবি এঁকেছেন। মানুষের ফিগার ব্যবহার করেছেন। সেসব ছবির নামকরণ করেছেন নৃত্যের তালে, চড়ু ইভাতি, প্রতিকৃতি প্রভৃতি। ট্যাপেস্ট্রির বিষয় হিসেবে বাউল, নৃত্যের প্রারম্ভে, অনুসন্ধিৎসা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। তাঁর পরিচয় তেলরং গোয়াশ মাধ্যমে নয়, তাঁর পরিচয় ট্যাপেস্ট্রি চিত্রকর হিসেবে। সেক্ষেত্রে মূর্তধর্মী কাজের সংখ্যা কম। মূর্তধর্মী কাজের মধ্যে Flaying Bird, Part of Orchid, Calligraphy উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১১ : Flaying Bird, ট্যাপেস্ট্রি, ২০১০

চিত্র ১২ : গাংচিল, ট্যাপেস্ট্রি, ৪৫.৭২ × ১২১.৯২ সেমি, ১৯৮৮

Part of Orchid নামক ফুলের চিত্রে ফুলের বিশেষ অংশকে ডিজাইনিক ফর্মে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর কাজে ফর্ম ও রং দেখানোই মুখ্য হয়ে ধরা দেয়।

চিত্র ১৩ : Part of Orchidg, ট্যাপেস্ট্রি
৭৫ × ৭৫ সেমি, ২০০৯

চিত্র ১৪ : Untitled-5, ট্যাপেস্ট্রি, ২০০৭

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় ক্যালিগ্রাফি চিত্র চর্চা হয়ে আসছে। আরবি ক্যালিগ্রাফির পাশাপাশি জলরং ও টেম্পারায় ড্রয়িং ডিজাইনযুক্ত বাংলা ক্যালিগ্রাফির শিক্ষা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে শিল্পী হাশেম

Dhaka University Institutional Repository

খানের অবদান স্মরণীয়। তিনি শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে ক্যালিগ্রাফি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আমাদের প্রাচ্য শিল্প-ঐতিহ্যেরই বিরাট অংশ। তাজুল ইসলাম ক্যালিগ্রাফি বিষয়কে ট্যাপেস্ট্রি মাধ্যমে কাজ করে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় বিশেষ অবদান রেখেছেন, যা মাধ্যমগত দিক থেকে নতুনত্ব এনেছে।

চিত্র ১৫ : ক্যালিগ্রাফি (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম), ৭৬.২ × ১৫২.৪ সেমি, ২০০৯

ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে সুন্দর হাতের লেখা। তাজুল ইসলাম আরবি অক্ষরেই কোরআনের আয়াত লিখেছেন। ক্যালিগ্রাফি চিত্রণে আরবি অক্ষরের ছন্দময় ভঙ্গি ও অক্ষর স্থাপনের ডিজাইনিক ভঙ্গিতে তাজুল ইসলামের কাজে নান্দনিকতার ছাপ বিদ্যমান। দ্বিমাত্রিক সারফেস ব্যবহার করেছেন। এসব রং উজ্জ্বল।

চিত্র ১৬ : ক্যালিগ্রাফি, ট্যাপেস্ট্রি, ৬৫ × ৭৫ সেমি, ২০০৫

চিত্র ১৭ : ক্যালিগ্রাফি, ট্যাপেস্ট্রি, ৭৫ × ৫৭ সেমি, ২০০৭

তাজুল ইসলাম Composition, Composition of forms colour, Untitled সিরিজচিত্র এঁকেছেন। Composition of Forms colour সিরিজচিত্র নিয়েই বেশি কাজ করেছেন।

চিত্র ১৮ : Composition of forms colour ট্যাপেস্ট্রি, ১৫০ × ৯০ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৯ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি ৯০ × ৭৫ সেমি, ২০০৯

চিত্র ২০ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি ৭৫ × ৬০ সেমি, ২০০৪

তাজুল ইসলাম তাঁর এই সিরিজের ট্যাপেস্ট্রি চিত্রকলায় রং ফর্ম ও ডিজাইন নিয়ে চলমান খেলা করেছেন।[৯] অবচেতন মনে যে রকম রূপটি ভালো লাগে সে রকম রং লাগিয়ে নান্দনিক মনের খেলা খেলেন। যখন ভালো লাগে থেমে যান এবং এই লে-আউট থেকে কারিগর দ্বারা বুননের কাজটি করান। এ প্রসঙ্গে Dhaka Courier ম্যাগাজিনে লিখিত Courier Correspondent-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> Tajul has been inspired by his teacher Chowdhury, and has proved his distinctiveness particularly in terms of design and colour composition. The thickness of colours, various geometric compositions and searching for aestheticism are frequently featured in his works. He concentrates on design rather than other angles. He continuously experiments of novel forms and mind-boggling shapes.[১০]

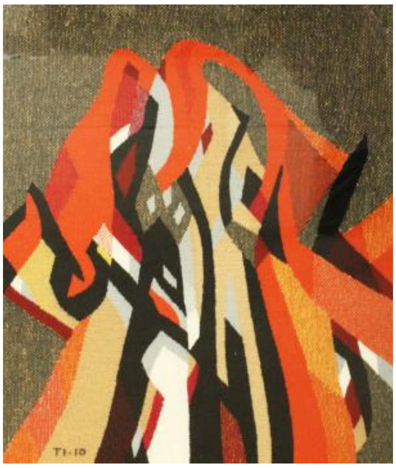

চিত্র ২১ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি ৯০ × ১৮০ সেমি, ২০০৮

চিত্র ২২ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি ২৭৯.৪ × ৭৬.২ সেমি

চিত্র ২৩ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি ১৫০ × ১০০ সেমি, ১৯৮৮

তাজুল ইসলাম শিরোনামহীন (Unntitled) শিরোনামে অনেক চিত্র এঁকেছেন। উজ্জ্বল রং, ফর্ম ও ডিজাইনে সজ্জিত তাঁর চিত্র দর্শককে ভাবনার সাগরে ডুবিয়ে দেয়। উজ্জ্বল রং ফর্ম এক ধরনের আনন্দ সৃষ্টি করে। তিনি যথার্থই বলেছেন, 'আমার কাজ দেখে হাসি আসবে না, কান্না আসবে না, ভাবনা আসবে।'[১১] এই

Dhaka University Institutional Repository

ভাবনা—রূপসাগরে ডুব দেয়ার ভাবনা। শিল্পের অনর্থক আনন্দ উপভোগের ভাবনা। এই ভাবনা বিশেষ কোনো বিষয় কিংবা রূপকে মূর্ত করে না। ফর্মগুলো নিজেই আবেদন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তাঁর চিত্র এখানে বিমূর্ত আবেদন দেয়। বিশেষ কোনো মানে ও বিষয়কে রিপ্রেজেন্ট করে না। আনন্দদান আর শোভাবর্ধন তাজুল ইসলামের ট্যাপেস্ট্রির মূল বৈশিষ্ট্য। রশিদ চৌধুরীর কাজ থেকে স্বতন্ত্র। রশিদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রি বিষয়ভিত্তিক। তাজুল ইসলাম বিষয়ভিত্তিক ট্যাপেস্ট্রি আঁকেননি। রশিদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রিতে আনুভূমিক তলে স্কাল্পচারের মতো একটা শব্দ বেইজ স্থাপনের প্রবণতা আছে। তাজুল ইসলামের কাজে বর্তমানে সেই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। এ প্রসঙ্গে শিল্পী মনিরুল ইসলামের মূল্যায়ন উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন :

> আগে আমাদের দেশে মেঝেতে ব্যবহারের জন্য শতরঞ্জী তৈরী হত, এখনও হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৫ সন থেকে ১৯৮৬ অবধি বাংলাদেশের শিল্পী রশিদ চৌধুরী প্রথম এ মাধ্যমে তার শিল্পকর্মের দক্ষতা প্রদর্শিত করেন। সে সময় থেকে তাজুল তার সহকর্মী হিসেবে কাজের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়। "কথায় বলে গুরু ছাড়া শিষ্য হয় না; শিষ্য ছাড়া গুরু হয় না।" এর পর থেকে তাজুল একান্ত নিজস্বভাবে নিজের চিন্তায় একাগ্রচিত্তে অনেক কাজ করেছেন। বর্তমানে তাঁর কাজে নিজস্ব ধারা ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। তাজুল এ মাধ্যমেই তাঁর গভীর চিন্তাধারা একাত্ম করেছেন।[১২]

রশিদ চৌধুরীর উজ্জ্বল রং দ্বারা তাজুল ইসলাম প্রভাবিত। আর ফর্ম নিয়েছেন বাংলার নিসর্গ ও ফুল থেকে। তাঁর কাজ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্যও প্রাসঙ্গিক :

> As a nature lover, Tajul tries to present synchroni sation of colour in his works with great warmth and affection. He has used colours with vivid splendor to give a distinct message through his works, which for many years have been impressing colour aficiondos both at home and abroad. Tajul's tapestries are lavish with various abstract images, But this abstraction does not hamper the viewers perception of the artist's feelings and thoughts.[১৩]

উল্লিখিত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী তাজুল ইসলামের শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে নিমোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

(ক) বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ক্যালিগ্রাফিতে ট্যাপেস্ট্রি মাধ্যমকে রূপদান দিয়ে মাধ্যম বৈচিত্র্যে নতুনত্ব সংযোজন করেছেন।

(খ) ট্যাপেস্ট্রি মাধ্যমে বহু বর্ণিল বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাচ্যের দ্বিমাত্রিকতাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন।

(গ) ফর্ম, কালার ও ডিজাইনভিত্তিক বিমূর্ত ট্যাপেস্ট্রি চিত্রকলা হলেও তাঁর এই শিল্পকর্ম জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার মতোই সাধারণ দর্শক ও রসিক বোদ্ধা দর্শকের চিত্তকে আন্দোলিত করতে পারে।

মিজানুর রহমান ফকির (জন্ম ১৯৭০)

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী মিজানুর রহমান ফকির বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার সুদক্ষ শিল্পী এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহের বর্তমান নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানার আইমা গ্রামে ১৯৭০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় সহজাত শৈল্পিক সংবেদনে তিনি মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি গড়তেন। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় গ্রামের নানা অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা এবং নির্বাচনের পোস্টার লিখতে ও প্রতীক অঙ্কনে তাঁর ডাক পড়ত। এই সহজাত কারিগরি দক্ষতার সাথে শিল্প বিষয়ে মনন গঠনে সহায়ক হয়েছে তাঁর বড়ো ভাইয়ের প্রেরণা। বড়ো ভাই মোঃ ফয়েজ আলী ছিলেন তখনকার বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি যখন বাড়িতে এসে ক্যানভাসে তৈলচিত্র করতেন, স্কেচ করতেন ও জলরঙে ছবি আঁকতেন তখন মিজানুর রহমান নিবিষ্ট চিত্তে তা দেখতেন। ১৯৮৭ সালে এস.এস.সি পাস করার পর নেত্রকোনা সরকারি কলেজে ভর্তি হন এবং দুই বছর পড়াশোনা করেন। এই সময় বড়ো ভাইয়ের কাছে কয়েকবার বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় (বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বেড়াতে যাওয়ার সূত্রে চারুকলায় পড়াশোনার প্রতি একটা মন তৈরি হয়। বড়ো ভাইয়ের বিবাহসূত্রে পরিচিত মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শামসুল ইসলাম নিজামী এবং সদ্যবিবাহিত ভাইয়ের চার শ্যালক, যাঁরা চারুকলার ছাত্র ছিলেন। মূলত এই শিল্পী আত্মীয়দের সাহচর্যে এসে এইচ.এস.সি পড়া সমাপ্ত না করে চারুকলায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হন। প্রথমে ইচ্ছা ছিল মৃৎশিল্পী হবার। এ উদ্দেশ্যে রাজশাহীর চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ১৯৮৯–১৯৯০ শিক্ষাবর্ষে বি.এফ.এ (প্রাক) ডিগ্রিতে ভর্তি হন। বি.এফ.এ (প্রাক) ডিগ্রিতে পড়াশোনার সময় তিনি চারুকলার বেসিক কোর্স ছাড়াও মৃৎশিল্প, কারুশিল্প সম্পর্কে পাঠ নেন। যেহেতু বি.এফ.এ ডিগ্রিতে মৃৎশিল্পে পড়তে আগ্রহী সেহেতু মৃৎশিল্প তৈরিতে আগ্রহটা বেশি ছিল। এই আগ্রহের ফল পেয়েছিলেন ১৯৯১ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে। মৃৎশিল্প বিষয় পটারী রিলিভ কাজের জন্য পেয়েছিলেন 'শিল্পী কামরুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার'। ১৯৯১ সালে বি.এফ.এ (প্রাক) ডিগ্রি শেষ করে তিনি ঢাকার 'চারুকলা ইনস্টিটিউটে' বি.এফ.এ ভর্তি পরীক্ষা দেন ১৯৯৪ সালে। ১৯৯৪ সালের এই ভর্তি পরীক্ষা ছিল ১৯৯১–১৯৯২ শিক্ষাবর্ষের। কাঙ্ক্ষিত বিভাগ মৃৎশিল্পে আসন শূন্য না থাকায় শিল্পী মিজানুর রহমান প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। এই বিভাগের ১১ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকেই রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ থেকে বি.এফ.এ (প্রাক) ডিগ্রি করে আসা। উল্লেখ্য, এটাকে এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভালো ব্যাচ বলে ধরা যায়। এই ব্যাচ থেকে পাস করা তিনজন বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন আর্ট কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন কয়েকজন। যেহেতু এই ব্যাচের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী চিত্রচর্চায় মনোযোগী ছিলেন, সেহেতু ভালো ছবি আঁকার একটা প্রতিযোগিতা ছিল। মিজানুর রহমান তাঁর অনুশীলন পর্বে শুধু ক্লাসের কাজই নয়, একই সাথে নিজের শিল্পপিপাসা মেটানোর জন্য নানাবিধ অনুশীলন করতেন ক্লাসের পরবর্তী সময়ে। প্রকৃতি ও মানুষের বিভিন্ন বিষয় তাঁর শিল্পকর্মে মূর্ত হতো। মিজানুর রহমানের প্রথম একক

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শনী উপলক্ষে 'প্রাচ্যশিল্পের প্রদর্শনী : মিজান ফকির' শিরোনামে প্রয়াত শিল্পী ও শিক্ষক শওকাতুজ্জামান লিখেছেন :

> প্রকৃতি আর মানুষ এইতো আমাদের জীবন। জীবনের এই মহা সত্যকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা এক কঠিন কাজ। শিল্পী তাঁর ছবিতে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে এর দুটোকেই তুলে এনেছেন। মানব জীবনে এক ধরনের জৈবিক চাহিদা থাকে যা বয়ঃসন্ধিক্ষণে আবার তা রূপান্তরিত হয় সন্তানসন্ততিতে। প্রকৃতিতে তা আসে ঋতু পরিবর্তনে। নানা রঙের বাহার আসে ফুল, ফল, পাখি যা দেখে মানুষের মনে দোলা দেয়, বলে উঠে আপন মনে বাহ কি সুন্দর! এসবই শিল্পীর কাগজে ক্যানভাসে ভেসে উঠে বাঙ্ময় হয়ে।[১৪]

চিত্র ২৪ : গাছের গুঁড়ি, জলরং
৫৫ × ৩৫ সেমি
১৯৯৪ সালে বার্ষিক শিল্পকর্ম
প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত

চিত্র ২৫ : ফুল, জলরং, ১৯৯৫ সালে বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির একাডেমিক ঘরানার কাজগুলোর স্বীকৃতিস্বরূপ মিজানুর রহমান ১৯৯৪ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে 'শহীদ শাহনেওয়াজ স্মৃতি পুরস্কার' এবং ১৯৯৫ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে 'শিল্পী রশিদ চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' অর্জন করেছেন। প্রাচ্যরীতির শিল্পীদের কাজে নারী ও প্রকৃতির সৌন্দর্যই বিধৃত হয়ে এসেছে। খুব কম সংখ্যক শিল্পীর কাজে দৈনন্দিন কর্মজীবন ও ঘরগৃহস্থালির কাজ ফুটে উঠেছে। এর একটি কারণ, যেহেতু প্রাচ্যরীতির ধারা অনুসারে আবেগ প্রধান চিত্র অঙ্কনে বিষয়বস্তু নারীর কোমল রূপ ফোটানো সহজ কিন্তু একাধিক ফিগার ও আশপাশের পরিবেশ সহকারে ওয়াশ মাধ্যমে ছবি আঁকা ও ভাব প্রকাশ করা কঠিন। সেক্ষেত্রে মিজানুর রহমানের বিষয় নির্বাচন সত্যিই ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে প্রাচ্যচিত্রকলায়। কারণ তাঁর চিত্রের বিষয় হিসেবে এসেছে দৈনন্দিন খেটে খাওয়া মানুষের কর্মজীবন এবং বাংলার লোকজ শিল্পের শিল্পীদের কর্মজীবন। শিল্পী হাশেম খান যথার্থই লিখেছেন, 'মিজানুর রহমান ফকির সহজ সরল ও শান্ত জীবনের ছবি আঁকেন। সে জীবনের মানুষেরা স্বভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ—জীবনের জটিলতা যারা পরিহার করে চলেন।'[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

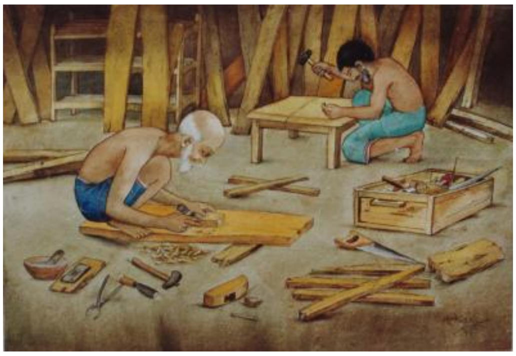

চিত্র ২৬ : কাঠের কাজ, জলরং
৫৫ × ৩৫ সেমি, ১৯৯৫

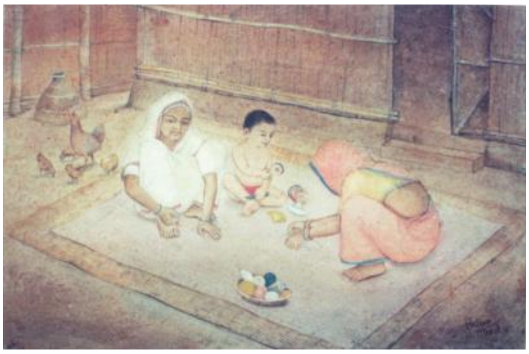

চিত্র ২৭ : কাঁথা সেলাই, জলরং
৫৫ × ৩৫ সেমি, ১৯৯৫

মিজানুর রহমান ১৯৯৪ সালে বি.এফ.এ (১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত) ডিগ্রি অর্জন করেন। বি.এফ.এ পড়াশোনার সময় তাঁর সৃষ্টিশীল মন জানার এবং শেখার আগ্রহে উন্মুখ থাকত। চারুকলায় চিত্রচর্চার পাশাপাশি তিনি Dhaka University Photography Society-এর অধীন Basic Course on Photography করেন। ১৯৯৫–১৯৯৭ সাল পর্যন্ত গাজীপুরের Project Five-O-এর অধীনে গ্রামের দুস্থ মহিলাদের মৃৎশিল্পের বিভিন্ন ব্যবহারিক জিনিসপত্র তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৯৪ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে ‘গ্রন্থ রূপায়ণ ও চিত্রায়ণ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ নেন এবং একই বছর বিখ্যাত পাপেট শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের অধীনে ‘Pupet and Figure’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুশিক্ষায় Pupet ব্যবহারের কৌশলাদি শেখেন শিল্পকলাবিষয়ক নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও কৌশলগত শিক্ষা অর্জনের আগ্রহ থেকে । একথা স্পষ্ট হয় যে, শিল্পী মিজানুর রহমানের শিল্পের বিভিন্ন রস আস্বাদনের প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। এসব বহুমুখী শিল্পজ্ঞান তাঁর চিত্রকর্মের নান্দনিক রস সৃষ্টিতে নিশ্চয় সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে।

মিজানুর রহমান মোগল মিনিয়েচারের বিখ্যাত ছবিগুলো কপি করতেন। একাধিক ফিগার, পরিবেশ এবং মানুষ ও পরিবেশ সহকারে তাঁর চিত্রগুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্কন লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে মোগল, কাংড়া, বাসুলি মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের চিত্ররীতি দ্বারাই তিনি প্রভাবিত। তাঁর অনুশীলন পর্বের কিছু কাজে মোগল মিনিয়েচারের ক্ষেত্র বিভাজন, অলংকরণ ও পরিবেশ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে বিশেষত্ব হচ্ছে, এসব চিত্রে তিনি যেসব ফিগার ও পরিবেশ ব্যবহার করেছেন, তা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের। অতএব বলা যায়, মোগল মিনিয়েচারের আদলে তিনি বাংলার মানুষ ও নিসর্গচিত্র চিত্রিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৮ : মোগল মিনিয়েচারের আদলে চিত্র

দীর্ঘ সেশনজটের কারণে ১৯৯৬ সালের এম.এফ.এ শেষ করেছেন ২০০০ সালে। এই শিল্পপর্বে তাঁর কাজের টেকনিক ও বিষয় চিন্তায় পরিবর্তন আসে। বি.এফ.এ পর্যায়ে তাঁর ছবি বাস্তব হয়ে ওঠার ঝোঁক ছিল। এম.এফ.এ পর্যায়ে অবজেক্টকে বিষয়-কেন্দ্রিক উপস্থাপনার দিকে মনোযোগ দেন। এ পর্যায়ের ছবিতে মূল অবজেক্টই পুরো ক্ষেত্র জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে। সেখানে পরিপ্রেক্ষিত এবং পরিবেশ লোপ পেতে থাকে। এম.এফ.এ পর্যায়ের কাজ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন, 'বি.এফ.এ শেষ বর্ষে পড়ার সময় আমার কাজগুলো নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হচ্ছিল। যার পূর্ণতা এসেছে এম.এফ.এ প্রথম পর্বের কাজে।'[১৬] এম.এফ.এ. পাঠ নেয়ার সময় তাঁর কাজে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও টেকনিক প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বিষয় এবং টেকনিকের ক্ষেত্রে তাঁর কাজে তিনটি ধারা নির্বাচন করা যায়। প্রথমত. নারী-পুরুষের সম্পর্ক, রোমান্টিকতা, স্নেহ-ভালোবাসা নারীর রূপ হালকা রঙের ওয়াশে এঁকেছেন। রং প্রয়োগের বাহুল্য এবং উজ্জ্বলতা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে উপস্থিত হয় তাঁর চিত্রে। মৃদু আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয় শিল্পীর বক্তব্য। তাঁর নারী-পুরুষেরা বক্ষ খোলা কিন্তু নগ্নতার অশ্লীলতা মনে আসে না। জাহিদ মুস্তাফার মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি 'দম্পতি' চিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'দম্পতি শীর্ষক চিত্রটিতে নারী ও পুরুষের দেহ কাঠামোয় স্বচ্ছ ওয়াশের অনুভব, তাতে রেখাভার

Dhaka University Institutional Repository

না থাকায় ডিটেইলিং নেই। এই ছেড়ে দেয়ার পাত্র-পাত্রীর নগ্নতা উচ্চকিত হয়নি, ফলে এই নরম পেলব সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে।'[১০]

চিত্র ২৯ : দম্পতি
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ৩০ : মা ও শিশু
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ৩১ : নারী
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯

বি.এফ.এ পর্যায়ে আঁকা মানুষের কর্মজীবনের চিত্র থেকে মিজানুর রহমান প্রেম-ভালোবাসার নিবিড় অনুভূতি, অনুরাগ প্রভৃতি মনের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত. প্রকৃতি সিরিজের কাজগুলোতে মিজানুর রহমানের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এসব চিত্রে জলরং এবং চায়নিজ ইঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। *প্রকৃতি* শিরোনামের এসব চিত্রে দ্বিমাত্রিক রং প্রয়োগ না হয়ে ত্রিমাত্রিক ইলিউশন তৈরি হয়েছে। তবে রং ব্যবহারে ওয়াশ পদ্ধতির পাতলা প্রলেপযুক্ত রং-ই ব্যবহৃত হয়েছে। জলরং এবং চায়নিজ ইঙ্কের সমন্বিত প্রয়োগে এক ধরনের টেক্সচার সৃষ্টি হয়েছে—যা জলরঙের স্বকীয় চরিত্রের বাইরেরও একটি আলাদা চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

চিত্র ৩২ : প্রকৃতি-৬
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ৩৩ : প্রকৃতি
জলরং

এ ধরনের কাজে টেক্সচার দেখে পাশ্চাত্য রীতির জলরং মনে হয়। শিল্পী স্ট্রোক ব্যবহার না করেই সে ধরনের স্ট্রোকের ইমেজ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতি সিরিজচিত্রের বিষয় নির্বাচনে শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয়। তিনি বন-জঙ্গলের অখ্যাত ফুলের উপাখ্যান রচনা করেছেন। সাধারণের দৃষ্টিগোচরহীন এসব ফুলের সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। এই সিরিজচিত্রের ছবিতে তিনি ১৯৯৮ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে অর্জন করেছেন বিভাগীয় নিরীক্ষামূলক পুরস্কার।

তৃতীয়ত. গ্রামবাংলার লোকজ শিল্পীদের শিল্প-নৈপুণ্যের সিরিজচিত্র এঁকেছেন ১৯৯৯ সালে জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে। তাঁর কাজে তাঁতি, কাঠমিস্ত্রি, কামার, স্বর্ণকার ও পটুয়াশিল্পীদের কর্মরত জীবন উঠে এসেছে। এ ছাড়া নকশিকাঁথা সেলাই, পাটজাত শিল্প তৈরি, চামড়ার কাজ, কাঁসা-পিতলের কাজ, পাখাশিল্পী, শোলার শিল্পী, শঙ্খশিল্পীর কর্মদক্ষতা নিয়ে সিরিজচিত্র এঁকেছেন। Quasem Group ১৯৯৯ সালের ক্যালেন্ডারে মিজানুর রহমানের এই সিরিজচিত্রের ১২টি চিত্র নিয়ে ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে।

চিত্র ৩৪ : কাঁথা

চিত্র ৩৫ : পটুয়া

চিত্র ৩৬ : শঙ্খচিল

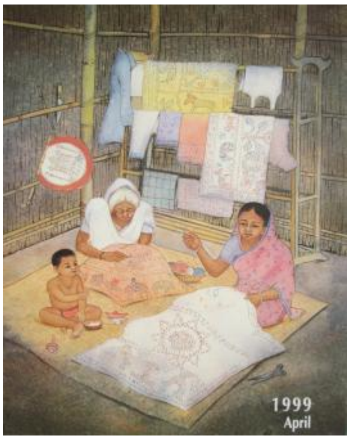

চিত্র ৩৭ : কাঁথা সেলাই
ক্যালেন্ডারের চিত্র

চিত্র ৩৮ : সোলার কাজ
ক্যালেন্ডারের চিত্র

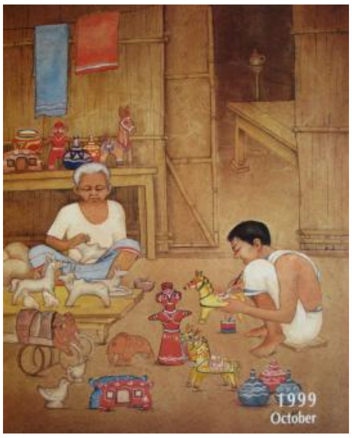

চিত্র ৩৯ : পটুয়া
ক্যালেন্ডারের চিত্র

এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ টেম্পারা। জলরং টেম্পারায় এঁকেছেন আবহমান বাংলার গ্রাম-প্রকৃতি, নারীর অভিব্যক্তি। প্রাচ্যচিত্ররীতির দ্বিমাত্রিক রং ব্যবহারে, সরল লাইন ব্যবহার করে লোকজ শিল্পের কলাকৌশলকে নিজের মতো উপস্থাপন করেছেন এই সিরিজচিত্রে। এই সিরিজচিত্রের অঙ্কন-কৌশল প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, 'চিত্র জমিনে যেসব কাঙ্ক্ষিত রং ব্যবহার করব বলে ভাবনা করি, তা পূর্বেই বানিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাট কালারে ভরাট করি। এই কাজে কন্ট্যুর লাইন হিসেবে সাদাকে ব্যবহার করেছি।'[১৮]

শিল্পী মিজানুর রহমান ফকির নিজে শিল্পকর্ম তৈরি করে সুখে থাকেননি। চারুকলা শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে ছাত্রজীবনে কয়েকটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন। এই স্কুলে শিশুদের চিত্রাঙ্কন শেখাতেন। ২০০১ সালে আহাম্মদ বাওয়ালী স্কুল অ্যান্ড কলেজে চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষকতা শুরু করে চারুকলা ইনস্টিটিউটে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত এখানে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ২০০৮ সালের ১২ জুলাই ওই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২ সাল থেকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শেখার আগ্রহ তাঁর চিরকালের। ২০০৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ শঙ্কর তালুকদারের তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের পাঁচ বরেণ্য শিল্পী ও তাঁদের চিত্রকলা : জয়নুল আবেদিন, শফিকুল আমীন, কামরুল হাসান, এস.এম সুলতান ও মোঃ কিবরিয়া' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে এম.ফিল গবেষণার কাজ শুরু করেন। বর্তমানে এ বিষয়ে পিএইচ.ডি.-এর অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত করেছেন।

উপরোল্লিখিত ধারাবাহিক জীবন বিন্যাস ও কাজের বর্ণনার মাধ্যমে শিল্পী মিজানুর রহমান ফকির বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় যে অবদান রেখেছেন তা বলা যায় এভাবে :

(ক) প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

(খ) দৈনন্দিন কর্মজীবনের এবং ঘর-গৃহস্থালির কাজের বিষয় তাঁর কাজে প্রাধান্য পেয়েছে, যা পূর্বের প্রাচ্যরীতির শিল্পীদের কাজে কম দেখা গেছে।

(গ) বাংলার অবহেলিত লোকজ শিল্পীদের জীবনচিত্র চিত্রায়িত করেছেন ক্যালেন্ডারের জন্য। ফলে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা সারা বাংলাদেশের মানুষ যেমন দেখতে পেরেছে, তেমনি বাংলার লোকজ শিল্পীদেরও পরিচয় ঘটিয়েছেন।

(ঘ) মোগল মিনিয়েচারের আদলে বাংলার মানুষ ও নিসর্গচিত্র এঁকেছেন।

(ঙ) প্রকৃতি সিরিজের কাজগুলোতে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। জলরং ও চায়নিজ ইঙ্ক মিশ্রিত প্রকৃতি শিরোনামের চিত্রে দ্বিমাত্রিক রং প্রয়োগ না করেও ত্রিমাত্রিক ইলিউশন তৈরি করেছেন।

(চ) জলরং টেম্পারায় আবহমান বাংলার গ্রাম-প্রকৃতি-নারীর অভিব্যক্তি এঁকেছেন দ্বিমাত্রিক রং প্রয়োগ ও সরল লাইন ব্যবহার করে। অর্থাৎ তিনি লোকশিল্পের কলাকৌশলকে নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী (জন্ম ১৯৭১)

শিল্পী জি.সি ত্রিবেদী অতি সংবেদনশীল সাংস্কৃতিক মনস্কের অধিকারী। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নাট্যকলার রস আস্বাদনে তাঁর সমান পদচারণ। সাহিত্য পাঠ, সংগীতচর্চা, রংতুলির খেলা এবং সামাজিক আড্ডায় একাত্ম তাঁর জীবনপ্রবাহ। নানান শ্রেণি-পেশা ও শিল্প-সংস্কৃতির সাধক ব্যক্তিত্বের সাথে পদচারণই ত্রিবেদীর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্প শাখার যে আসরই হোক, তিনি সেই আসরকে জমিয়ে তোলেন। তবে বিচিত্র ভুবনে তাঁর বিষয় হচ্ছে চিত্রকলা। চিত্রকলায় তাঁর বেশি আকর্ষণ লোকজ চিত্রশিল্পের আঙ্গিক। কামরুল হাসান, যামিনী রায়, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র ঘরানার উত্তরসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ত্রিবেদীকে।

গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী ১৯৭১ সালে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার তালমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চিত্তরঞ্জন ত্রিবেদী ছিলেন ডাক্তার। বড়ো ভাই রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিশিষ্ট গবেষক। কর্মজীবনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। পারিবারিক সূত্রেই সংস্কৃতির নানান শিক্ষায় বেড়ে উঠেছেন। এ ছাড়া স্থানীয় সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলায় লক্ষ্মীর সরা, মনসার ঘট দেখে চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হন। বাড়ির সামনে পিচ-ঢালা রাস্তা আর স্কুলের রাস্তাকে ক্যানভাস হিসেবে বেছে নেন তিনি। রংতুলি বলতে স্কুল থেকে চুরি করা সাদা চক। এই চক দিয়ে রাস্তায় ছবি আঁকার মাধ্যমেই তাঁর চিত্রকলার জগতে প্রবেশ। দুর্গাপূজা উৎসবে পালদের তৈরি পেঁচা ও ইঁদুরের অনুকরণ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই পারিবারিক সমৃদ্ধ লাইব্রেরির বিভিন্ন বই নিয়মিত পড়তেন।

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিজ্ঞান পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের উত্তর ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'তুই আর্ট কলেজে ভর্তি হবি, ভালো করবি।'[১৯] এই আশীর্বাদবাণী শোনার পর আর্ট কলেজ নামক শব্দটি তাঁর স্বপ্নের মধ্যে গেঁথে যায়।

ছেলে বয়সে তাঁর ছবি আঁকা মানে নির্বাচনের সময় দেয়ালে নির্বাচনী মার্কা আঁকা এবং দেয়াল লিখন করা। নিজের বই-খাতা, বাড়ির দেয়াল ও নিজের হাত-পায়ের খোলা অংশ ছিল ত্রিবেদীর ক্যানভাস। যখন যেভাবে সুযোগ পেয়েছেন ড্রয়িং করেছেন। ত্রিবেদী ১৯৮৭ সালে তালমা নাজিমউদ্দিন হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি পাস করেন। এইচ.এস.সি পড়ার জন্য বাড়ি ছাড়লেন। ভর্তি হলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। কলেজে পড়ার সময় সংগীতচর্চায় মনোনিবেশ করেন। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে গান গেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর কলেজের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ডাক পড়ত গান গাওয়ার জন্য। গাইতেন জসীমউদ্‌দীনের পল্লীগীতি ও ভারতীয় আধুনিক গান। ভূপেন হাজারিকার 'আমি এক যাযাবর' গানটি প্রথম শুনে বিস্মিত হয়ে যান। চর্চা করতে থাকেন ভূপেন হাজারিকার গান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভূপেন হাজারিকার গান গাইতে পারেন অবিকল সেই সুরে।

Dhaka University Institutional Repository

এক পর্যায়ে ফরিদপুর কলেজে আর ভালো লাগেনি। ঢাকাতে পড়ার ইচ্ছা হলো। ঢাকা এসে এইচ.এস.সিতে ভর্তি হলেন কবি নজরুল কলেজে। নতুন পরিবেশে বন্ধুবান্ধব তৈরি হতে সময় লাগল। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, 'তিন মাস ক্লাস করার পর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের বন্ধুদের কথা, ভালোবাসা প্রচণ্ড রকম পীড়া দিতে লাগল। একজন বন্ধুও তৈরি হলো না। আমার গানও শুনতে চায় না কেউ। আমি যে গান জানি, ভালো ছবি আঁকতে পারি, এই গভীর আত্মবিশ্বাসের কথাও কেউ জানল না।'[২০] ত্রিবেদীর এই মানসিকতার কারণেই মনে পড়ল আর্ট কলেজের কথা। ভর্তি হবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হলেন চারুকলা ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ)। সেখানে পূর্বপরিচিত শিক্ষক শিল্পী শওকাতুজ্জামানের সাথে দেখা হলো। শওকাতুজ্জামান পারিবারিক সূত্রে পূর্বপরিচিত। তাঁর পরামর্শমতো চারুকলায় ভর্তি পরীক্ষা দিলেন ত্রিবেদী। ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। ওই সময় স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ঢাকাসহ সারা দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সময়মতো ঢাকা আসতে পারেননি। ভর্তি হওয়া হলো না চারুকলায়। নিয়তিকে মেনে নিয়ে শিল্পী শওকাতুজ্জামানের পরামর্শে ঢাকা ছেড়ে চিটাগাং আর্ট কলেজে বি.এফ.এ প্রাক ডিগ্রিতে ভর্তি হলেন। ১৯৯০ সালে প্রি-ডিগ্রি পাস করেন। এরই মধ্যে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েও পাস করেন। বি.এফ.এ (প্রাক) ডিগ্রি (এইচ.এস.সি সমমান) পাস করার পর ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ১৯৮৯–১৯৯০ শিক্ষাবর্ষে বি.এফ.এ প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে প্রাচ্যকলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন।

শিল্পী শওকাতুজ্জামানের উৎসাহ ও স্নেহে ত্রিবেদী শুধু চিত্রকলাই শেখেননি, সমাজ-সংসারের বিভিন্ন জাগতিক শিক্ষার পাঠ পেয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রাচ্যশিল্পীর গল্প ও শিল্পশিক্ষার বিভিন্ন বই পড়া ও আলোচনা করা চলত শওকাতুজ্জামানের সাথে। শুধু চারুকলার বিষয় নয়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায়ও পদচারণ ছিল ত্রিবেদীর। তিনি আবৃত্তি করতেন, নাটক করতেন, গান গাইতেন। যুক্ত ছিলেন *স্বরকল্পন* আবৃত্তি সংগঠন এবং *মহাকাল* নাট্য সম্প্রদায়ের সাথে। বি.এফ.এ পড়ার সময় তাঁর চিত্রকলা ছিল ড্রয়িং-বেইজ। নিসর্গের ছবি ও মানুষ ও প্রকৃতির নানান অভিব্যক্তি অঙ্কন করতেন প্রাচ্যধর্মী চিত্রকলার ঐতিহ্যবাহী সুললিত ও গতিশীল রেখায়। এসব ছবি যামিনী রায়, কামরুল হাসান, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙ্গিকের সাথে মিল থাকত। অর্থাৎ তিনি কালীঘাট পট এবং গ্রামবাংলার লোকজ চিত্রকলার রেখা-প্রধান চিত্রকলা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

ত্রিবেদী বি.এফ.এ পাস করে এম.এফ.এ প্রথম পর্ব পড়ার সময় ১৯৯৯–২০০১ শিক্ষাবর্ষে ইন্ডিয়ান স্কলারশিপে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে এম.এফ.এ পড়তে যান। ভারতে তিনি পড়াশোনা করেছেন ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিভাগে। ভারতের বিখ্যাত শিল্পী প্রণাম সিং-এর তত্ত্বাবধানে শিখেছেন প্রাচ্যরীতির কাজ।

চিত্র ৪০ : মীরা বাঈ, তুলি ও কালি
৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ৪১ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড
তুলি ও কালি, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০০

চিত্র ৪২ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড
টেম্পারা, ৬০ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৯

২০০১ সালে ভিজ্যুয়াল আর্টস ফ্যাকাল্টির ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এম.এফ.এ ছাত্রাবস্থায় ফোক বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। কাজের আঙ্গিক ধরন নিয়েছেন বাংলার পটচিত্র, কালীঘাট পটচিত্র, বটতলার ছবি, গ্রামবাংলার সরাচিত্র। লোকজ এই চিত্রের লাইন, মোটিভ ব্যবহার অকপটে ব্যবহার করেছেন নিজের কাজে। ফোক বিষয় নিয়ে বাংলার চিত্রকলায় যাঁরা আধুনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁদের কাজের প্রচণ্ড রকম ভক্ত ছিলেন। এজন্য কামরুল হাসান, যামিনী রায়, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজগুলোকে নিজের মনে করতেন। টেকনিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে হুবহু সেই রকম করার প্রবণতাও ছিল ছাত্রাবস্থায়।[২১]

চিত্র ৪৩ : শিরোনামহীন
(মা ও ছেলে)

চিত্র ৪৪ : ফেসেস
টেম্পারা, ৪৩ × ৫৫ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ৪৫ : ফোক মোটিভ অব বেঙ্গল
টেম্পারা, ৭৬ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৯

ত্রিবেদী তাঁর স্বভাবসুলভ মিশুক মানসিকতার জন্য বেনারসে সকলের প্রিয়ভাজন হন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভূপেন হাজারিকার গান পরিবেশন করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। একাডেমিক পড়ালেখায় ভালো ফল করেছেন। এম.এফ.এ ডিগ্রিতে তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। এরপর বাংলাদেশে ফিরে এসে ছবি এঁকে ছবি বিক্রি

Dhaka University Institutional Repository

করে জীবন নির্বাহের পথ বেছে নিয়েছিলেন। 'ইত্যাদি' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পরিচালক ত্রিবেদীকে দিয়ে পঞ্চাশটির অধিক চিত্র আঁকিয়ে নেন তাঁর বাসা ও স্টুডিয়ো সজ্জিত করার জন্য। ছবি আঁকা, গান গাওয়ার পাশাপাশি যুক্ত হয়ে পড়েন সাংবাদিকতা পেশায়। গ্রাফিক্স ভালো জানার কারণে বিভিন্ন পত্রিকায় চাকরি করেছেন কখনো ডিজাইনার, কখনো ইলাস্ট্রেটর, কখনো শিল্প নির্দেশক হিসেবে। হানিফ সংকেতের অনেক কাজের সেট ডিজাইন করেছেন। বাংলাবাজার প্রকাশনাগুলোতে করেছেন অসংখ্য প্রচ্ছদচিত্র।

প্রাচ্যশিল্পের অসংখ্য নান্দনিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর পত্রিকার কর্মজীবন নিঃসন্দেহে বর্ণাঢ্য। তিনি মুক্তকণ্ঠ, যুগান্তর, সমকাল, আজকের কাগজ, মাতৃভূমি, ডেইলি স্টার, সকালের খবর, সাপ্তাহিক ২০০০ প্রভৃতি সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। এই পত্রিকাগুলোয় তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইল ও ধারার অলংকরণের কাজ করেছেন। সেসব স্টাইলে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটের লোকজ ঘরানার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, পত্রিকার জগতে একাডেমিক প্রাচ্যশৈলীর একটি ধারা তৈরিতে ত্রিবেদীর অবদান পথিকৃতের।

ত্রিবেদী ১৯১০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। চারুকলায় শিক্ষকতার সূত্রে ছবি আঁকার নেশা বেড়ে যায়। কাজের ধারায় এসেছে অনেক স্বকীয়তা। বিভিন্ন সিরিজচিত্র নিয়ে কাজ করেছেন। যার প্রধান দিক ড্রয়িং। তিনি বলেন, 'আমার ছবির প্রধান দিক ইলিউশন অব লাইন।'[২২]

২০০৩ সালে গ্যালারি চিত্রক তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী আয়োজন করে। এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে শিল্পী শওকাতুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে। মন্তব্যের মর্মার্থ হলো :

> তুলির দক্ষতা আর রঙের প্রাচুর্যতা যদি কারও মধ্যে থাকে তবে তাঁর পক্ষে ছবি আঁকা কোনো ব্যাপার নয়। ত্রিবেদীর ছবি দেখে তাই মনে হয়; তাঁর কাজে রেখার সাথে সাথে রঙের মাধুর্য প্রমাণ করে ত্রিবেদী একজন পাকা আঁকিয়ে। চীনা দর্শনে বলা হয়ে থাকে কালি ও তুলির কথা। যদি কারও এর উপর দক্ষতা থাকে তাঁর জন্য ছবি আঁকা অত্যন্ত সহজ।
>
> আমাদের দেশে এমন কয়েকজন শিল্পী আছেন বা ছিলেন তাঁরা তুলির সাহায্যে রঙ দিয়ে ছবি আঁকতেন। ত্রিবেদী তাঁদের মধ্যে একজন। সাবলীলভাবে তুলিকে তলোয়ারের মতো টেনে কাজ করেন ত্রিবেদী। মুহূর্তে হয়ে ওঠে ছবি। যেমন করতেন আমাদের দেশের পটশিল্পীরা। চোখ জুড়িয়ে যায় তাঁদের হাতের গড়া প্রতিমা দেখে, কী সুন্দর চোখের টান, ভ্রূ, ঠোঁট, নাক–সর্বোপরি অবয়ক–সবকিছুর কোথাও কোনো কমতি নেই। পটশিল্পীদের কাজের উত্তর-আধুনিক বৈশিষ্ট্যকে বিষয়বস্তু করে যামিনী রায়, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান অনেক কালজয়ী শিল্পকর্ম করেছেন। ত্রিবেদীর কাজে বাংলার লোক-ঐতিহ্যসহ পাওয়া যায় আবহমান বাংলার অন্তঃকথন। ছবির সাবলীলতা যা ছবির প্রাণ।[২৩]

শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ ত্রিবেদীর প্রদর্শনী সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকায় 'গুপুর ছবি : মনপবনের রং' শিরোনামে লিখেছেন :

> গুপুর প্রদর্শনীতে অনেক রকম ছবি আছে। যদি একক কোন কথায় তার ছবির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে হয় তাহলে বলতে হবে গুপু সদর্থক রোমান্টিক। তবে তার রোমান্টিক বেদনা নেই, আছে শুধু রোমাঞ্চকর স্বপ্নিল সুখ। . . . তাঁর ছবির জমিনে মানব-মানবী, পাখি, গাছপালা সব বড় বেশি বর্ণিল। অবয়ব পশ্চিমের একাডেমীর রিয়ালিজম বা দেশীয় লোককলা, কোনটারই অনুসারী নয়। শিল্পী চান না যা দেখছি তাই আঁকছি এমন কোন মতবাদে আচ্ছন্ন থাকতে। তিনি নিজের মনের প্রতিক্রিয়া আঁকেন। প্রকৃতি তাকে যখন আন্দোলিত করে তখন তা তিনি বর্ণিল হিল্লোলে প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদের বিশ্লেষণে ত্রিবেদীর ছদ্মনাম গুপু ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিবেদী বিভিন্ন জায়গায় এ ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। তাঁর এই প্রথম প্রদর্শনীতে কাজগুলোর মধ্যে অনেক তেলরং, পেইন্টিং এবং টেম্পারায় ভরাট ও উজ্জ্বল রঙের চিত্র ছিল। পাখি ও নিসর্গ চিত্রণে তীব্র লাল, তীব্র নীল রঙের ব্যবহার এবং চিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় রোমান্টিক হিসেবে মূল্যায়ন যথার্থই সঠিক হয়েছে। এই পর্বে ত্রিবেদী নানা মাধ্যম ও টেকনিকে কাজ করেছেন। যে মাধ্যমেই কাজ করেছেন, বিষয়চিন্তায় পার্থক্য আসেনি। তিনি প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতি ব্যবহার করে নারী ও প্রকৃতির অভিব্যক্তি রচনা করেছেন।

চিত্র ৪৬ : দুই সখী, জলরং (ওয়াশ)
৫০ × ৭৬ সেমি, ২০০০

চিত্র ৪৭ : ময়ূরী, মিশ্র মাধ্যম
৬০ × ৬০ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ৪৮ : সুজাতা, মিশ্র মাধ্যম
৫৫ × ৪৩ সেমি, ১৯৯৯

টেম্পারা, গোয়াশ, তেলরং, মিশ্র মাধ্যমে কাজ করেছেন। বৈচিত্র্য ও গতি তাঁর কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্যরীতির টেকনিক প্রধান কাজ সাধারণত ধীর গতিতে সম্পন্ন করতে হয়। বিশেষত ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করতে হলে আরো সময়সাপেক্ষ। ত্রিবেদী ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করেছেন দ্রুততার সাথে। ব্রাশ চালানোর নিজস্ব পদ্ধতিতে বিষয় প্রকাশিত হয়েছে সাবলীলভাবে। পশুপাখি, নারী, গাছপালা, ফুল, নদী, জল, মাছ প্রভৃতি নানান বিষয় নিয়ে চিত্র এঁকেছেন। ড্রয়িংনির্ভর চিত্রকে তাঁর কাজের প্রধান মাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন আঙ্গিকে ড্রয়িং করেছেন। কখনো তুলি-কালি, কখনো প্যাস্টেল, কখনো চারকোল, কখনো পেনসিল মাধ্যমে। তিনি হাতের কাছে যখন যে মাধ্যম পেয়েছেন তা দিয়ে অবলীলায় ছবি এঁকে চলেছেন। তাঁর কাজগুলোকে নির্দিষ্ট সিরিজচিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। তবে ড্রয়িং তাঁর কাজের প্রধান দিক। শিক্ষানবিশ-পরবর্তী সময়ে তাঁর ড্রয়িংয়ে সরলীকরণ এবং স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দিকের কাজে কালীঘাট পট, যামিনী রায়, কামরুল হাসান ও পাশ্চাত্যের পিকাসোর ড্রয়িংয়ের ভঙ্গির সাথে সাদৃশ্য থাকলেও বর্তমানে তাঁর কাজে নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া যায়। ড্রয়িংনির্ভর চিত্রকলায় করেছেন অনেক সরলীকরণ।

চিত্র ৪৯ : ড্রয়িং-১৫০

চিত্র ৫০ : ড্রয়িং-২৫৩

ড্রয়িংনির্ভর চিত্রকলায় রং কলম ব্যবহার করে পরিণত করেছেন চিত্র। এসব চিত্র সুরিয়ালিস্টিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে সম্পূর্ণ প্রাচ্য ঘরানায়। যার সাথে পশ্চিম বাংলার শিল্পীদের কাজের সাথে মিল পাওয়া যায়। এম.এফ.এ পর্যায়ে 'ইন্ডিয়ান পেইন্টিং' পড়ায় সেই দর্শন হয়তো তাঁর হৃদয়পটে সাড়া দিয়ে যায়। বিভিন্ন রঙের কাগজ ও ব্রাউন বোর্ডে চারকোল ব্যবহার করে ড্রয়িং করেছেন। কখনো কাপড় দিয়ে ঘষে লাইনগুলোকে শেড দিয়েছেন, কখনো ডট দিয়ে টেক্সচার তৈরি করেছেন। আবার কোনো কোনো ড্রয়িং করেছেন তুলির সাবলীল ছোঁয়ায়। যার মধ্যে রঙের ছিটা কিংবা কালার স্প্রে করে ক্ষেত্রের সাথে লাইনের সম্পর্ক তৈরি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫১ : রেখার মায়া ৪৩, মিশ্র মাধ্যম চিত্র ৫২ : রেখার মায়া ৪৪, মিশ্র মাধ্যম চিত্র ৫৩ : রেখার মায়া ৪৫, মিশ্র মাধ্যম

চিত্র ৫৪ : রেখার মায়া-৬৩, চারকোল
৯১ × ৯১ সেমি, ২০১৩

চিত্র ৫৫ : নারী, জলরং
৫০ × ৩৮ সেমি, ২০১২

সাবলীলতা ত্রিবেদীর ছবির প্রাণ। হাতের কাছে যখন যে মাধ্যম পেয়েছেন তাই দিয়ে চিত্র এঁকেছেন। কম্পিউটারে মাউসের সাহায্যে প্রাচ্যরীতির অসংখ্য ড্রয়িং করেছেন জীবনে, যা প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যবহার করেছেন। চীন-জাপান ওয়াশ পদ্ধতিতে নিসর্গ চিত্র ফুল-ফল এঁকেছেন। যার মধ্যে ক্যালিগ্রাফিক প্রভাব বিদ্যমান। সাইন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চীন-জাপান পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। বিশেষত লাল রঙের সিল ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ছবিতে লাল রঙের টিপসহি দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন।

বাংলাদেশের ফ্যাশন জগতে ত্রিবেদীর অবদান অতুলনীয়। ফ্যাশনে, বিশেষত পুরুষদের টি-শার্ট ও পাঞ্জাবিতে প্রাচ্যরীতির পেইন্টিং ব্যবহার ও জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর ডিজাইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রাচ্যরীতির ড্রয়িং, লাইন, কালার সাধারণ মানুষের রুচি তৈরিতে এই প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। ত্রিবেদীর আরো একটা বড়ো পরিচয়, তিনি অনেক বই পড়েন, বই সংগ্রহ করেন, গান সংগ্রহ করেন, গান শোনেন। এখনো তাঁর আড্ডার নির্দিষ্ট সময় কাটে বইয়ের দোকানে কিংবা সিডির দোকানে। এটা তাঁর গভীর নেশা। মজার ব্যাপার হলো, তাঁর সংগৃহীত প্রতিটি বইয়ের সাদা পাতাগুলো তাঁর ছবি আঁকার ক্যানভাস। অনেক বইয়ের ওপর মূল লেখা ও প্রচ্ছদের সাথে সাদৃশ্য রেখে ছবি এঁকেছেন। দেখে মনে হওয়ার উপায় নেই ছবিটি কিংবা ডিজাইনটি নতুন করে আঁকা। তাঁর সংগৃহীত প্রায় চার হাজার বইয়ের বিভিন্ন অংশের চিত্রগুলো নিঃসন্দেহে শিল্প জগতে নতুন মাত্রা আনছে। শুধু তা-ই নয়, ত্রিবেদী যখন যেখানে থাকেন, হাতের কাছে যা পান তাতেই ছবি আঁকেন। বিয়ের কার্ড, খাম, অব্যবহৃত কাগজপত্র, নিজের ব্যবহৃত আসবাব, ছাতাসহ যেকোনো দ্রব্যেই তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চিত্র অঙ্কন করেন বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে।

Dhaka University Institutional Repository

জি.সি ত্রিবেদী গবেষক। জীবনানন্দ দাশ ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। ২০১০ সালে *রবীন্দ্র-প্রবন্ধ : অংশ আহরণ* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিশেষ অংশগুলো তুলে ধরেছেন। পাঠক মহলে বইটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী জি.সি ত্রিবেদীর কাজের বৈশিষ্ট্য ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় যে অবদান লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় লোকশিল্পের আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে।

(খ) কামরুল হাসান, যামিনী রায়, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাচ্য চিত্রশিল্পীর উত্তরসূরি।

(গ) পত্রিকাশিল্পে প্রাচ্যরীতির ইলাস্ট্রেশন করে সাধারণ মানুষের কাছে প্রাচ্যরীতির চিত্রকে জনপ্রিয় করেছেন।

(ঘ) ফ্যাশন জগতে নতুন ধারার রুচি তৈরিতে তাঁর পেইন্টিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেখানেও তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্র জনপ্রিয় করেছেন।

(ঙ) প্রাচ্যরীতির কাজের ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে অসম্ভব গতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

(চ) বিভিন্ন মাধ্যম ও ঢঙে চিত্র এঁকে প্রাচ্যধারার চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অতএব শিল্পী জি.সি ত্রিবেদী বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। স্বকীয়তা, সাবলীলতা ও গতি মিলেমিশে তাঁর চিত্রকর্ম রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

সুশান্ত কুমার অধিকারী (জন্ম ১৯৭২)

শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী ১৯৭২ সালের ২৩ জানুয়ারি নড়াইল জেলার কাঁঠালবাড়ীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন মৃদঙ্গ শিল্পী। তিনি কীর্তনের দলে যুক্ত ছিলেন। তাৎক্ষণিক গান লিখে সুর করে কীর্তনের আসরে গাইতে পারতেন। বড়ো ভাই বলদেব অধিকারী অ্যামেচার চিত্রশিল্পী। শিল্পী সুলতান তাঁদের বাড়িতে গিয়ে বাঁশি বাজাতেন, আড্ডা দিতেন; গানের শিল্পীদের নিয়ে মহড়া দিতেন। এ কারণে সুশান্ত কুমার অধিকারী। শিল্প-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে শিল্পসুধা গ্রহণের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। ছেলেবেলার সেই পরিবেশই তাঁকে শিল্পকলার নির্দিষ্ট পথে চালিত করেছে।

ছেলেবেলা থেকেই শান্ত প্রকৃতির অধিকারী সুশান্ত যেকোনো কাজ সাফল্যের সাথে করতে পারতেন। খেলাধুলার প্রতিও ছিল অত্যধিক আকর্ষণ। আর চিত্রকলায় হাতেখড়ি বড়ো ভাই বলদেবের হাত ধরে। তাঁর উৎসাহেই ছেলেবেলায় অসংখ্য ড্রয়িং করেছেন। আবার সেইসব ছবি এস.এম সুলতানকে দেখাতেন। বিভিন্ন গানের বাণী অনুসারে ইলাস্ট্রেশনধর্মী ছবি এঁকেছেন। বড়ো ভাই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর স্কুলের পরীক্ষার খাতার অতিরিক্ত সাদা অংশে করতেন সুন্দর হাতের লেখার প্র্যাকটিস। বড়ো ভাই

Dhaka University Institutional Repository

পিটিআইয়ের 'সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন' কোর্সে যেসব ছবি আঁকতেন, সুশান্ত তাঁর সাথে সেইসব ছবি আঁকতেন। সুলতানের সান্নিধ্য, দাদা বলদেবের চিত্রচর্চা, মৃদঙ্গ বাদক বাবার সংগীত আসর, গ্রামের অবারিত সবুজ মাঠে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সুশান্ত কুমার অধিকারীর সুকুমার বোধ, শিল্পরস সংক্রান্ত নন্দনবোধের ভিত শক্ত হয়েছিল। বলা যায়, এই চালিকাশক্তিই তাঁকে বর্তমানের অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময়ই বাড়ির গণ্ডি পেরিয়ে নড়াইলের শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এই প্রতিযোগিতায় পেনসিল মাধ্যম ও জলরং মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্থির করেন আর্ট কলেজে পড়তে হবে। বড়ো ভাই বলদেব এস.এম সুলতানের কাছ থেকে দেশ-বিদেশের চিত্রকলার ওপর নানা ধরনের বই নিয়ে আসতেন। সুশান্ত সেইসব চিত্রকলা দেখতেন। নিজে ছবি এঁকে এস.এম সুলতানকে দেখাতেন। ভুলত্রুটি শুধরে নিতেন। এমনি করে মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা ও ছবি আঁকা চালিয়েছেন এবং ১৯৮৭ সালে এস.এস.সি পাস করেন।

এস.এস.সি পাস করার পর সুশান্ত আর্ট কলেজে পড়ার জন্য খুলনা যান। বড়ো ভাই গভীর উৎসাহ নিয়ে খুলনা আর্ট কলেজে ভর্তি করান। আর্ট কলেজ পড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বলদেব অর্থাভাবে সে সময় পড়তে পারেননি। ছোটো ভাইকে আর্ট কলেজে ভর্তি করাতে পেরে সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছেন।

সুশান্ত কুমার অধিকারী ক্লাস রুটিনের বাইরে বেশি কাজ করতেন। কাজ করার জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ল্যান্ডস্কেপ করতেন। যেহেতু ছবি আঁকার বিষয়ে পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল তাই করণ-কৌশল বিষয়ে অন্যদের চেয়ে যথেষ্ট অ্যাডভান্স ছিলেন।

চিত্র ৫৬ : ল্যান্ডস্কেপ-খুলনা
জলরং, ৩৮ × ৫৫ সেমি, ১৯৮৮
১৮ ভাদ্র ১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.)

চিত্র ৫৭ : নড়াইল-শীতের সকাল
জলরং, ৩৮ × ৫৫ সেমি, ১৯৯০
১৭ মাঘ ১৩৯৮ (১৯৯১ খ্রি.)

এ সময়ে তিনি প্রচুর ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কন করেছেন। গ্রামবাংলার প্রতি ভালোবাসা এবং জলরং প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর অসংখ্য ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে। শুধু ল্যান্ডস্কেপ চিত্র নয়, ফিগারেটিভ চিত্র আঁকায়ও জুড়ি ছিল না। রেললাইনের পাশে, রেলস্টেশন ও সংলগ্ন বস্তি, চায়ের দোকান—এমন বিভিন্ন জনসমাগমের স্থানে নানা মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন।

চিত্র ৫৮ : ছিন্নমূল মানুষ-১
(খুলনা রেলস্টেশন)
জলরঙের সাথে পেনসিল
৩৮ × ২৮ সেমি
আনুমানিক সময় ১৯৮৭–৯০

চিত্র ৫৯ : ছিন্নমূল মানুষ-২
জলরঙের সাথে পেন
২৮ × ৩৮ সেমি, ২২ আশ্বিন ১৩৯৭

চিত্র ৬০ : ছিন্নমূল মানুষ-৩
জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি
আনুমানিক সময় ১৯৮৭–৯০

আলোছায়ার নান্দনিক ব্যবহারে এসব চিত্রের বক্তব্য অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় ফিগার চিত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ স্টাইল অর্থাৎ দ্বিমাত্রিকতা ব্যবহার করা হয়। সুশান্ত কুমার প্রি-ডিগ্রিতে বাস্তবধর্মী ফিগার স্টাডির মাধ্যমে আলোছায়া, পারস্পেকটিভ, অনুপাত জ্ঞানে দক্ষ হয়েছেন, যা পরবর্তী সময়ে প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

চিত্র ৬১ : খুলনার রেলস্টেশনের দৈনন্দিন জীবন
কালি ও তুলি, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯০

চিত্র ৬২ :
এস.এম সুলতানের প্রতিকৃতি

চিত্র ৬৩ : স্কেচ খাতার ড্রয়িং

শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী জলরঙের ল্যান্ডস্কেপ, ফিগার পেইন্টিংয়ের পাশাপাশি কালি, তুলি ও কালি-কলমে প্রচুর স্টাডি করেছেন। এই স্টাডিমূলক চিত্রগুলোর মাধ্যমগত মুনশিয়ানায়, ছবির বক্তব্য প্রকাশে এবং যথার্থ অভিব্যক্তি সংযোজনে শিল্পীর প্রতিভা প্রশংসনীয়।

প্রি-ডিগ্রি এবং বি.এফ.এ পড়াশোনার সময়ে তাঁর কাজে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তিনি বিষয় অনুসারে কাগজের সাইজ ঠিক করে নিয়ে ছবি আঁকতেন। জলরঙের দৃশ্যচিত্র অঙ্কনে রঙের পারস্পেকটিভ যেমন বহাল রাখতেন, তেমনি ওয়াশ ব্যবহার করে চিত্রে লাবণ্য এনেছেন। রেলস্টেশনে ভিক্ষুক ও ভাসমান

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের চিত্র এঁকেছেন, যার মধ্যে রেমব্রান্ডের আলোছায়া প্রায়োগের আদল লক্ষণীয়। স্কেচ খাতায় পেন-স্কেচের মধ্যে মুক্ত আঙ্গিকে পেন চালানোর খেলা, লাইন ব্যবহারে ছন্দ, ব্যক্তির ক্যারেকটার (চরিত্র) নির্মাণে টোনাল গ্রেডেশনের দক্ষ ব্যবহার প্রশংসনীয়।

একজন শিল্পীর জন্য শিল্পের বিভিন্ন শাখায় পদচারণ করে নিজেকে ঋদ্ধ করা জরুরি, যা তাঁর শিল্পমাধ্যমকে উৎকর্ষ করতে সাহায্য করে। সুশান্ত কুমার অধিকারী পড়াশোনা-পাগল ছিলেন। বিভিন্ন বইয়ের দোকানে গিয়ে বই ও দেশ-বিদেশের চিত্রকলাবিষয়ক পত্রিকা সংগ্রহ করতেন। গানের চর্চা করতেন। সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সব শাখায় তাঁর চর্চা ছিল খুলনা আর্ট কলেজে পড়ার সময়। ভালো ছবি আঁকার জন্য বার্ষিক প্রদর্শনীতে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯০ সালে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি (জলরং) পুরস্কার এবং ১৯৯২ সালে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি (জলরং) পুরস্কার অর্জন করেন।

খুলনা আর্ট কলেজে দুই বছরের প্রি-ডিগ্রি কোর্স করতে সেশনজটে চার বছর লেগেছিল। অর্থাৎ ১৯৯১ সালে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এরপর চারুকলায় পড়ার জন্য নিজের উদ্যোগে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমান। দেশ পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনের কলাভবনের চারুকলা শিক্ষায় খবর জানতেন। শান্তিনিকেতনে ভর্তির যোগ্যতায় উত্তীর্ণ (মনোনীত) পত্র আসতে বিলম্ব হওয়ায় সেখানে ভর্তি হওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে বি.এফ.এ পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষা দেন। ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে তখন বি.এফ.এ ডিগ্রির জন্য বাংলাদেশের আর্ট কলেজগুলো থেকে প্রি-ডিগ্রি করা ছাত্রদের কোটা ছিল। এই কোটা অনুযায়ী সুশান্ত কুমার অধিকারী প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হন। যদিও ইচ্ছা ছিল ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং কিংবা প্রিন্টমেকিং বিভাগে ভর্তি হওয়ার। আসন খালি না থাকায় বাধ্য হয়ে ভর্তি হলেন প্রাচ্যকলা বিভাগে।

সুশান্ত কুমার অধিকারী ১৯৯০–৯১ শিক্ষাবর্ষে বি.এফ.এ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৯২ সালে এবং নিয়মানুযায়ী তিন বছরের বি.এফ.এ কোর্সের ১৯৯৩ সালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। সুশান্ত সকলের মধ্যে ভালো ছবি আঁকতেন। প্রি-ডিগ্রিতে তিনি যে বাস্তবধর্মী জলরং পেন-এ লাইন-ড্রয়িং চর্চা করেছিলেন, প্রাচ্যকলা বিভাগে জলরংপ্রধান চিত্র নির্মাণে এবং রেখাপ্রধান চিত্র অঙ্কনে সেই বাস্তবধর্মী অনুশীলন কাজে লেগেছিল। প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন হাশেম খান, আব্দুস সাত্তার, শওকাতুজ্জামান এবং নাসরীন বেগমকে। শিল্পী শওকাতুজ্জামান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। লাইনের পার্থক্য, ডাইমেনশনের পার্থক্য বোঝাতেন। তখন প্রাচ্যরীতিতে মেয়েমানুষের চিত্রই বেশি আঁকতেন শিক্ষার্থীরা। জলরঙে ছড়ানো ফ্লাট ডাইমেনশনে রেখাটানা মেয়ে মানুষ। সুশান্ত কুমার অন্য সবার মতো রোমান্টিক ভাবালুতায় নারী চিত্র অঙ্কন করেননি। খুলনা আর্ট কলেজে পড়ার সময় বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকা শহরের শ্রমজীবী ও কর্মজীবী মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র স্টাডি করেছেন এবং প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির নিয়মানুসারে ইনডোরে বসে রং করেছেন। স্বচ্ছ জলরং ও সূক্ষ্ম লাইন সহযোগে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।

চিত্র ৬৪ : শ্রমজীবী মানুষ–১
জলরং (ওয়াশ)
৩৮ × ৩০ সেমি, ১৯৯৪

চিত্র ৬৫ : শ্রমজীবী মানুষ-২
ওয়াশ টেম্পারা
৩৮ × ৩০ সেমি, ১৯৯৪

চিত্র ৬৬ : শ্রমজীবী মানুষ-৩
জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯৩

শ্রমজীবী মানুষের বিষয় নির্বাচনে আধুনিকতা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ খুলনা আর্ট কলেজে ছিলেন সেখানকার প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্য, রেলস্টেশনের দৃশ্য এঁকেছেন। ঢাকাতে এসে ঢাকার দৃশ্য, রিকশাওয়ালা, রিকশার গ্যারেজে কর্মরত মানুষ, চায়ের দোকান, ফুটপাতের আখের রসের দোকান উল্লেখযোগ্য। এসব দৃশ্যের পরিবেশ এবং সমকালীন সময়ের হাল ফ্যাশন-সমৃদ্ধ মানুষজন তুলে ধরেছেন। আখের দোকানে আখের রসপানের জন্য দাঁড়ানো ক্রেতার পরনে সেই সময়কার জিন্স প্যান্টের হাল ফ্যাশন শিল্পীর তুলিতে ধরা আছে। অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীবনভিত্তিক বাস্তবধর্মী বিষয় নিয়েই প্রাচ্যরীতিতে ছবি এঁকেছেন। যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় নতুন পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

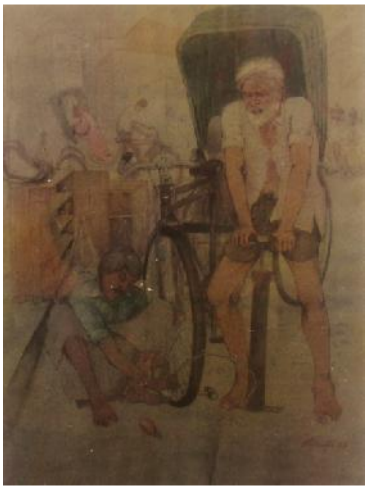

চিত্র ৬৭ : শ্রমজীবী মানুষ-২
জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯৩

চিত্র ৬৮ : ফুটপাতের দোকান
জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সুশান্ত কুমার শিল্পী শওকাতুজ্জামানের স্নেহধন্য ছিলেন। শওকাতুজ্জামান মুরাল চিত্রণে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মুরাল চিত্র অঙ্কন শিখেছেন। এ ছাড়া টেম্পারা মাধ্যমের বিভিন্ন টেকনিক শিখেছেন। যেমন—মোগল মিনিয়েচার প্রভাবিত টেকনিক অর্থাৎ জলরঙের সাথে সাদা মিশিয়ে ওপেক রং করা। অক্সাইড কালারের সাথে শিরীষ গাম মিশিয়ে কিংবা ডিমের কুসুম মিশিয়ে টেম্পারা আঁকতেন।

একাডেমিক প্রাচ্যরীতির চিত্র অঙ্কনে সিলেবাস অনুযায়ী ফিগার পেইন্টিং কিংবা ফিগার কম্পোজিশনের যেসব চিত্র এঁকেছেন তাঁর করণ-কৌশল, স্টাইল শিক্ষক নাসরীন বেগমের কাছ থেকে শিখেছেন। নাসরীন বেগম প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির চিত্র রচনায় নারী ফিগার চিত্রণে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, সুশান্ত তাঁর সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে সেই পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। সুশান্ত কুমারের ওয়াশে পাশ্চাত্য জলরং ব্যবহারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমন্বয় করেছেন। চিত্রে ভাব-লাবণ্য যোজনার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। কারণ তাঁর চিত্রে বাঙালি নারীর রূপ-লাবণ্য যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি বাঙালি নারী চরিত্রের অভ্যন্তরীণ স্বভাব-সৌন্দর্য ছাড়াও আবহমান বাঙালি নারীর মমতাময়ী, লাস্যময়ী রূপ, যেমন : অবসর সময়ের গল্প বলা, উপন্যাস পাঠরতা, পাখা হাতে রমণী, একাকিনী—এরূপ ঘটনাবলি দক্ষতার সাথে এঁকেছেন।

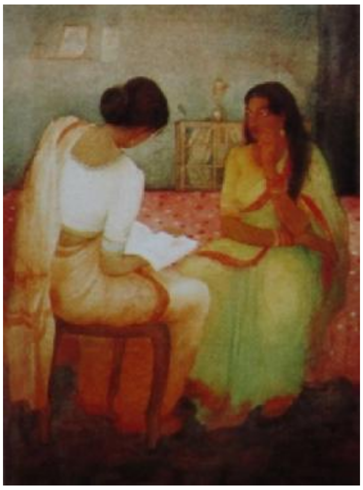

চিত্র ৬৯ : ইনডোর, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯০

চিত্র ৭০ : একাকিনী, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৫

চিত্র ৭১ : স্নেহ, জলরং
৫৪ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৪

সুশান্ত কুমার অধিকারী ঢাকা চারুকলায় পড়াশোনার সময়ে দুটি পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৫ সালের বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার এবং ১৯৯৬ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে শিল্পী কামরুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার অর্জন করেন।

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে, শিল্পী মনসুর-উল-করিমের তত্ত্বাবধানে 'অয়েল পেইন্টিং' ওয়ার্কশপ করেন। এই ওয়ার্কশপে সুশান্ত কুমার প্রচলিত পদ্ধতিতে তেলরংকে ব্যবহার করেননি,

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ক্যানভাসের ওপর জলরং ওয়াশের মতো ব্যবহার করেছেন। তবে সমসাময়িক আধুনিক চিত্রকলার কনসেপচুয়াল উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ বিষয়-চিন্তার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপন লক্ষণীয়। উল্লেখ্য যে, তাঁর চিত্রে শ্রমজীবী মানুষ এবং বাঙালি নারীর শহুরে জীবন ফুটে উঠেছে। রিকশাচালক দ্রুত যাত্রীকে নিয়ে চলেছে। যাত্রী নারীটি হয়তো তাকে দ্রুত যাওয়ার জন্য বলেছে।

চিত্র ৭২ : সে এখন ঢাকায়-১, ক্যানভাসে তেলরং
১০১.৬ × ১২১.৯২ সেমি, ১৯৯৫

চিত্র ৭৩ : সে এখন ঢাকায়-১, ক্যানভাসে তেলরং
১০১.৬৮ × ১০৬.৬৮ সেমি, ১৯৯৫

সুশান্ত কুমার অধিকারী ১৯৯৭–৯৮ সালের আই.সি.সি.আর স্কলারশিপের অধীনে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এম.এফ.এ পড়াশোনা করেন। এখানে তিনি পেইন্টিং বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। এম.এফ.এ পর্যায়ের লেখাপড়ায় প্রাচ্যরীতির বিশেষ রীতিবদ্ধ সিলেবাস অনুসরণ করেননি। তবে নিজের ইচ্ছামতো বিষয় ও টেকনিকে কাজ করার স্বাধীনতা ছিল শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতন তাঁর স্বপ্নের জায়গা। রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া এই স্বপ্নের জায়গায় পড়ার জন্য প্রি-ডিগ্রি পাসের পরে ছুটে গিয়েছিলেন। তখন পড়া না হলেও সেই ইচ্ছা পরে পূরণ হয়েছে। সংগীত ভবনের সংগীত ও নৈসর্গিক পরিবেশে সুশান্ত কুমারের দেহ-মন-আত্মা স্বর্গীয় সুখে আবিষ্ট হয়ে থাকত। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন নন্দনালের শিষ্য কে.জি সুব্রহ্মণ্যনকে। এ ছাড়া যোগেন চৌধুরী ও যোশী মুন্সীর তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সুশান্ত অধিকারীর কাজে আবারো পরিবর্তন এলো। এবার তিনি জলরঙের পাশাপাশি অ্যাক্রেলিক কালারে ছবি আঁকতে শুরু করেন। ছবির বিষয় হিসেবে এনেছেন রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও শান্তিনিকেতনের নৈসর্গিক পরিবেশ। তিনি বলেন, ‘শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় গভীর অনুভূতির জগতে ছিলাম। কলাভবন থেকে সংগীতের সুর ভেসে আসত। গাছপালা ঘেরা পরিবেশ। ভীষণ এক সংগীত অনুভূতিতে তাড়িত হয়ে ছবি আঁকতাম। বৃষ্টি ভেজা কাক যেমন বসে থাকে দেখতাম। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে তার শব্দ, গান হচ্ছে তার শব্দ কান পেতে শুনতাম।’[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রসংগীত উচ্চাঙ্গসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের অনুভূতিতাড়িত প্রকৃতির সুরকে বিষয় করে জলরং, অ্যাক্রেলিক ও হার্ডবোর্ডে অ্যাক্রেলিক কালারে যে ছবি এঁকেছেন তা অর্ধ-বিমূর্ত।

চিত্র ৭৪ : প্রকৃতি-১
অ্যাক্রেলিক
আঃ সময়, ১৯৯৭

চিত্র ৭৫ : প্রকৃতি-২
অ্যাক্রেলিক
১৬৭.৬৪ × ৭৬.২ সেমি
আঃ সময়, ১৯৯৬–৯৮

চিত্র ৭৬ : প্রকৃতি-৩
অ্যাক্রেলিক
৭৪ × ৫৪ সেমি
আঃ সময়, ১৯৯৬–৯৮

এসব চিত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আঙ্গিকের বিশেষ পার্থক্য নির্ধারণ করা যায় না। প্রকৃতির লতানো ডগার ফর্ম বার বার ব্যবহার করেছেন। হ্যান্ডমেইড কাগজকে জোড়া লাগিয়ে বৃহৎ পরিসরের ক্যানভাস তৈরি করে ছবি এঁকেছেন। এ ছাড়া চিত্রের মধ্যে রবীন্দ্র সংগীতের বিশেষ পঙ্‌ক্তি লিখে দিয়েছেন, হ্যান্ডমেইড কাগজকে ঘষে ঘষে উঠিয়ে সাদা অংশ রেখে এক ধরনের টেক্সচার তৈরি করেছেন।

শান্তিনিকেতন থেকে এম.এফ.এ পরীক্ষা শেষ করে রেজাল্ট হওয়ার পূর্বে যোগদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ পর্যন্ত খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন। এরপর ৪ জানুয়ারি ২০০১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা গ্রুপ খোলার পরে তিনিই প্রথম বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক হয়ে যোগ দেন। রাজশাহীর প্রাচ্যকলা গ্রুপের প্রথম ব্যাচের ছাত্র এবং বর্তমানে অন্য তিনজন শিক্ষক তাঁরই ছাত্র-ছাত্রী। রাজশাহী চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় সুশান্ত কুমার অধিকারীর অবদান স্মরণীয়। তিনিই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অঙ্গনের পথপ্রদর্শক। তাই তাঁর কাজের ধরন দ্বারাই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রভাবিত। সুশান্ত কুমার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। এরপর ২০০৫–২০১০ সালে আই.সি.সি.আর বৃত্তির মাধ্যমে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. পর্যায়ের গবেষণা করেন। তাঁর পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম : Elements from traditional mythic narratives in modern painting continuity re-interpretation and transformation : selected artists from West Bengal and Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন সময়ে মিথনির্ভর কাজ করেছেন। গবেষণার প্রয়োজনে ভারতীয় মিথ প্রসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। তারই প্রভাব পড়েছে কাজে। পুরাণ কাব্য সাহিত্যের রোমান্টিক জায়গা—দুর্গা, শিব, তন্ত্র আর্টের সিম্বল, তিব্বতিয়ান থাঙ্কা পেইন্টিংয়ের বিন্যাস গ্রহণ করে বৃহৎ প্রাচ্যের অনুষঙ্গ যুক্ত করেছেন।

চিত্র ৭৭ :
মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-১
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৯২ সেমি, ২০০৮

চিত্র ৭৮ :
মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-২
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৯২ সেমি, ২০০৮

চিত্র ৭৯ :
মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-৩
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৯২ সেমি, ২০০৮

সুশান্ত কুমার অধিকারী এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জনের সময় যখন ভারতে থেকেছেন তখনো বাংলাদেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মৌলবাদের উত্থানের সংবাদ রাখতেন। বিবিসি শুনতেন। তারপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর মৌলবাদীদের আচরণ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিষয়ে ভাবতেন। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু চেয়ারকে সিম্বলিক উপস্থাপনে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর চিত্রের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। এ সময় তিনি আয়রন প্লেটে মেটাল এনামেল পেইন্টিং করেন। ছবির বিষয় ছিল Story of the Chair (Series). চেয়ার সিরিজচিত্রের অনেক স্কেচ করেছেন কালি-কলমে। তার মধ্যে ক্যালিগ্রাফি, মোগল মিনিয়েচারের মাল্টি পারস্পেকটিভ ব্যবহার করেছেন। চিত্রগুলো বেঙ্গল স্কুলের ওয়াশ পদ্ধতির অনুরূপ না হলেও অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প মাধ্যম নিয়ে বিভিন্ন রকম আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। শুধু তা-ই নয়, এ চিত্রগুলোকে বাংলার লক্ষ্মীসরার আধুনিক ভার্সন হিসেবেও তুলনা করা যায়। শুধু বিষয় পরিবর্তন অর্থাৎ একটায় দেব-দেবীর কাহিনি অন্যটি সমসাময়িক রাজনৈতিক দর্শনের প্রতীকী বর্ণনা।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৮০ : চেয়ার কাহিনি
Metal Enamel on Iron plate, ২০০৬

চিত্র ৮১ : চেয়ার কাহিনি
Metal Enamel on Iron plate

চিত্র ৮২ : ড্রয়িং–চেয়ার কাহিনি
কালি ও কলম, ২০০৬

সুশান্ত অধিকারীর ভারতীয় মিথ নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বুদ্ধের জীবন দর্শন পড়েন। তাঁর কাছে মনে হয় ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে বুদ্ধ একটা ফ্যাক্টর। তখন তিনি বুদ্ধ দর্শনকে বিষয় করে চিত্র আঁকেন। মাধ্যম হিসেবে ক্যানভাস ও অ্যাক্রেলিক বেছে নেন। বেঙ্গল স্কুলের রঙের ফ্লাট ওয়াশ রীতির কৌশল ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে প্রয়োগ করেছেন। তন্ত্র আর্টের জ্যামিতিক সিম্বল ও চিহ্ন সংখ্যা (৭৮৬), জাপানিজ ওয়াশ টেকনিক সমন্বিত করে বুদ্ধিবৃত্তিক সিম্বলিক চিত্রকলা অঙ্কন করেন। যার নামকরণ করেছেন মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন।

চিত্র ৮৩ : মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-৪
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৭৬.২ × ৭৬.২ সেমি
২০০৯

চিত্র ৮৪ : মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-৫
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
১২১.৯২ × ১০৬.৬৮ সেমি
২০১৩

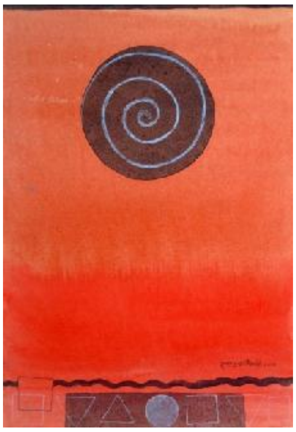

চিত্র ৮৫ : স্নেহ
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
১২১.৯২ × ১০৬.৬৮ সেমি
২০১৩

সুশান্ত কুমার অধিকারীর মতে, সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের দ্বিমুখী চরিত্র, হেফাজতে ইসলাম ও মৌলবাদী সংগঠনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম আমাদের প্রাচ্য-ঐতিহ্যের ধারাবাহিক রূপান্তর মাত্র। কারণ আমাদের পুরাণনির্ভর ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যে এই চরিত্রগুলো দেখা যায়। যার নতুন ভার্সন হিসেবে আমাদের সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থা চলমান। ধর্ষণ, নির্যাতন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, চক্রান্ত আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে আছে। অর্থাৎ চলমান সমাজ ব্যবস্থার যে রূপ, তা ঐতিহ্যের নবায়ন। এক সময় ভারতের কৃষি দেবতা ছিলেন শিব, তাঁর আদর্শ উদ্দেশ্য দর্শন এক ধরনের। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁরও আদর্শ উদ্দেশ্য দর্শনে রয়েছে ভিন্নতা। বুদ্ধ যখন আসেন তখন দেখা গেল তাঁর দর্শনও ভিন্ন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুগে যুগে চেতনা ও মতবাদের পরিবর্তন হচ্ছে।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৮৬ : প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-১৮
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ২০১৩

চিত্র ৮৭ : প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-১
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

চিত্র ৮৮ : প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-২
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

তাঁর প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সিরিজচিত্রে মানুষের চরিত্র, মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতা, সবই তিনি ছবির বিষয় হিসেবে নিয়ে এসেছেন। টেকনিকের ক্ষেত্রে ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, টেম্পারা, কখনো ওয়াশ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। সেখানে তীব্র আলো কিংবা তীব্র ছায়ার ব্যবহার নেই। মানুষের মুখাকৃতির দিমাত্রিকতা; ক্ষেত্র বিভাজনে মোগল মিনিয়েচারে মাল্টি পারস্পেকটিভ লক্ষণীয়। তাঁর মতে, 'আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যেমন পরিবর্তনের ধারা চলমান তেমনি চিত্রকলায়ও নতুন নতুন টেকনিক ও মাধ্যম উদ্ভাবন হওয়ায় পরিবর্তন এসেছে, যা যুগোপযোগী। ভারতীয় কিংবা প্রাচ্য দর্শন ও টেকনিকের আদল আছে কি না সেটাই বিবেচ্য।'[২৭]

সুশান্ত কুমার জুন ২০১১ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পুনরায় রাজশাহীতে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তিনি ২০১২ সালের ৩০ জুন সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির ধারায় অবদান রেখে চলেছেন। যেহেতু তিনি সমসাময়িক বাস্তবতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে চিত্র আঁকেন সেহেতু সেই প্রভাব তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লক্ষ করা যায়। মাধ্যমের ক্ষেত্রে অ্যাক্রেলিক, ক্যানভাস, জলরং, টেম্পারা ব্যবহার হয়ে থাকে রাজশাহী চারুকলার প্রাচ্যকলা গ্রুপে।

উল্লেখিত ধারাবহিক জীবন-ইতিহাস ও কর্মের আলোকে শিল্পী-শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীর কাজের বৈশিষ্ট্য ও প্রাচ্যচিত্রকলায় তাঁর অবদান নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায় :

(ক) সারা জীবন যখন যে স্থানে ছিলেন সেই স্থান ও পরিবেশের পারিপার্শ্বিকতার চিত্র এঁকেছেন।

(খ) প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় টেম্পারা এ অ্যাক্রেলিক কালারকে জনপ্রিয় করেছেন।

(গ) তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের টেম্পারা মাধ্যমে ছবি আঁকতে উৎসাহী করেছেন।

(ঘ) বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা চিত্রণে পথিকৃতের ভূমিকায় আছেন।

(ঙ) প্রাচ্যকলার ধরনের সঙ্গে আধুনিক আঙ্গিক মেশানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর ছবিতে বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ আব্দুল আযীয (জন্ম ১৯৭৪)

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের বর্তমান সময়ের চেয়ারম্যান শিল্পী মোঃ আব্দুল আযীয। প্রাচ্যরীতির স্বচ্ছ জলরং ওয়াশ পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম রেখা ও অলংকরণ প্রয়োগ করে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় নিজস্ব পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন শিল্পী আব্দুল আযীয। প্রাচ্যরীতির টেকনিককে পাথেয় করে যাঁরা বাংলাদেশের চিত্রকলায় প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাকে দর্শক ও সমঝদারদের মাঝে নিজের শিল্প-সম্ভারকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন, আব্দুল আযীয তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাকে সাধনায় রেখে অন্য মাধ্যমের আকর্ষণে নিজের সাধনাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেননি। বাংলাদেশের শিল্পীদের যখন বিমূর্তায়নের প্রতি ঝোঁক তখন শিল্পী আযীয প্রাচ্যরীতির সরল উপস্থাপনায় মানুষ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য চিত্রে তুলে ধরেন।

আব্দুল আযীয ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের সামন্তা গ্রামে ১৯৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চারুকলা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে প্রতিবেশীদের কাছে চারুকলায় পড়ার ক্ষেত্রে বাধা পেয়েছেন। শুধু উৎসাহ পেয়েছেন তৎকালীন সময়ে গ্রামের ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজের কাছে।[২৮]

তিনি ১৯৮৯ সালে দাখিল পরীক্ষায় পাস করে রাজশাহী আর্ট কলেজে প্রি-ডিগ্রিতে ভর্তি হন। আর্ট কলেজে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বভাবসুলভ নিয়মে ছবি দেখে ছবি এঁকেছেন ক্লাসের খাতায়। গ্রামে ইউপি নির্বাচনের বিভিন্ন মার্কা অঙ্কন, দেয়াল লিখন করতেন। রাজশাহী আর্ট কলেজে প্রি-ডিগ্রি পড়ার সময় চিত্রকলার বেসিক পাঠগুলো সম্পন্ন করেছেন। ক্লাসের বাইরে বিভিন্ন বিষয় অনুশীলন করেছেন।

আব্দুল আযীয ১৯৯১ সালের বি.এফ.এ প্রি-ডিগ্রি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ) প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ ভর্তি হন। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। ১৯৯৩ সালেই প্রথম একক চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ঝিনাইদহের পাবলিক লাইব্রেরিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এফ.এ পড়াশোনার সময়ে ১৯৯৪ সালে একই স্থানে তাঁর দ্বিতীয় একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৮৯ : গাছের গুঁড়ি
জলরং ও পেনসিল
১৯৯৩

চিত্র ৯০ : তাঁতিবাড়ি
জলরং, ৫৪ × ৭৪ সেমি
১৯৯৩

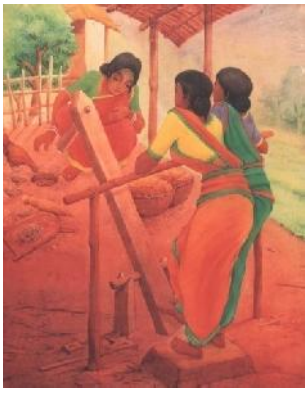

চিত্র ৯১ : ঢেঁকিঘর
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি
২০০২

আব্দুল আযীয বি.এফ.এ অনুশীলন পর্বে গ্রামবাংলার শাশ্বত নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, অবকাশ, অনুরাগ, ভালোবাসার চিত্র এঁকেছেন। পদ্ধতি হিসেবে প্রাচ্যরীতির জলরঙের ওয়াশকে বেছে নিয়েছেন। তিনি ১৯৯৪ সালে বি.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯৯৪–৯৫ শিক্ষাবর্ষে এম.এফ.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই এম.এফ.এ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর চিত্রচর্চায় স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তাঁর কাজের বিষয় হয়ে ওঠে ফুল, পাখি, নারী ও ক্যাকটাস ফুলের সাথে পাখির সম্পর্ক, নারীর সাথে পাখির সম্পর্ক এবং ফুল-পাখি ও নারীর সমন্বয়ে বিভিন্ন ঋতুবৈচিত্র্যের সৌন্দর্যবিষয়ক চিত্র।

চিত্র ৯২ : ধ্যানে
তেলরং, ৯১ × ৭৬ সেমি, ২০০০

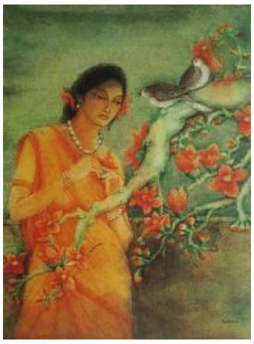

চিত্র ৯৩ : বসন্ত-২
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি

চিত্র ৯৪ : প্রকৃতি ও নারী
জলরং, ৩৮ × ৫৬ সেমি

ধ্যানে এবং *অপেক্ষা* সিরিজচিত্রের অনেক কাজ করেছেন ক্যানভাসে তেলরঙে। প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির ইলিউশন এনেছেন ক্যানভাস ও তেলরঙের ব্যবহারে। এম.এফ.এ পড়াশোনার সময়ে তিনি যেসব বিষয় চর্চা করেছেন তাঁর সম্ভার দিয়ে ২০০২ সালে জয়নুল গ্যালারিতে হয়েছিল তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমেই আযীয শিল্পরসিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন শিল্পসমালোচকরা। তাঁর নারী সিরিজের চিত্র প্রসঙ্গে শিল্পী শওকাতুজ্জামান লিখেছেন :

> শিল্পী আযীযের গ্যালারিতে ঢুকে মনে হলো অসংখ্য ছবির মাঝে আমি নির্বাক এক পুরুষ। আমার চারদিকে শুধু নারী আর নারী। বৈচিত্র্য শুধু দু'একটি ছবি। আলাদা করে দেখলে প্রতিটি রমণীই অতি রমণীয়। সলজ্জ, মার্জিত

Dhaka University Institutional Repository

রুচিবোধসম্পন্ন রমণীরা বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গিতে ব্যস্ত। অতি সাধারণ রমণী থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত রমণীর আচরণ পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর কাজে।[২৯]

সাপ্তাহিক *রোববার* পত্রিকায় গোলাম আম্বিয়া লিখেছেন :

'শিল্পী আযীয তার নারীদের উপস্থাপন করেছেন অনুপম লোচনা অপরূপা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী করে, একই সাথে প্রকৃতির ফুল, পাখি, লতা-পাতায় ঘটিয়েছেন এক অপূর্ব মেলবন্ধন। আযীযের রং-তুলিতে নারীচিত্র হয়ে উঠেছে চিরায়ত প্রেম-ভালোবাসা, দুঃখ-যন্ত্রণা এবং আত্মোপলব্ধির ঐতিহ্যগত প্রতীক। নারীচিত্রের সাথে সংযুক্ত প্রকৃতিও যেনো একইভাবে বেদনাহত এবং আত্মনিমগ্ন। তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলো দেখলে বেদনাহত নারী ও প্রকৃতির এক বিষণ্ন ঐকতান হৃদয়ের নিভৃত কোণে অজানা মূর্ছনা সৃষ্টি করে।'[৩০]

আব্দুস সাত্তার প্রদর্শনীর শুভেচ্ছা বাণীতে লিখেছেন, 'তাঁর সৃষ্ট নারীরা শাশ্বত বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ। শালীন এবং সুশীল। এ সকল মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন রমণীরা কোমল হৃদয় বাঙালি বধূর প্রকৃত স্বরূপকেই প্রকাশ করেছে।'[৩১]

শুভেচ্ছা বাণীতে নাসরীন বেগম লিখেছেন, 'প্রাচ্যরীতির যে বৈশিষ্ট্য, দ্বিমাত্রিক বা প্রায় একমাত্রিক চিত্রের ত্রিমাত্রিক অনুভূতি তৈরি করা বেশ দুরূহ আযীয সে দুরূহ কাজটি বেশ সফলভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছে।'[৩২]

দৈনিক ইত্তেফাকে অনি আলমগীর লিখেছেন :

ছবিগুলোতে তিনি ভ্রূ, অর্ধনির্লিপ্ত চোখ, মুখের ভঙ্গিমা সবকিছুকে অদ্ভুত এক রহস্যের গ্রন্থিতে সুচিবদ্ধ করেছেন। দীর্ঘ চুল সে রহস্যময় চোখকে রাতের আকাশে চাঁদের মতো করে আলোকিত করে তুলেছে। প্রত্যেকটি নারী চিত্রের ভেতর পিলপিল করে বয়ে চলেছে এক ধরনের স্বপ্নাবেশ। মূলত এখানেই আযীযের সার্থকতা। রূপক ছবিগুলোতে তিনি রঙের দক্ষতায় নারীর ভেতরগত শারীরিক সৌন্দর্যের পরিচর্যার পাশাপাশি অন্তর্লোকের উৎসারিত ভাষা আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন।[৩৩]

উল্লিখিত সমালোচনায় শিল্পী আযীযের পাখি ও নারীবিষয়ক চিত্রমালার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। এ ছাড়া এম.এফ.এ অনুশীলন পর্বে তিনি ফুল ও পাখি নিয়ে প্রকৃতি সিরিজচিত্র, ক্যাকটাস সিরিজচিত্র এবং গাছের শিকড়-বাকড় ও নারী ফিগার সহযোগে ঐতিহ্য সিরিজচিত্র এঁকেছেন।

চিত্র ৯৫ : প্রকৃতি

চিত্র ৯৬ : ক্যাকটাস

চিত্র ৯৭ : ঐতিহ্য-১

Dhaka University Institutional Repository

জলরং ও পেনসিল, ৫৪ × ৩৪ সেমি ১৯৯৬	জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি ১৯৯২	জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি ২০০২

তিনি শিল্পী শিক্ষক নাসরীন বেগমের ক্যাকটাস সিরিজচিত্র দেখে প্রভাবিত হয়ে ছবি এঁকেছেন।[৩৪] তিনি তাঁর ক্যাকটাস সিরিজচিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বিমূর্ত এবং মূর্ততার সম্মিলনে গড়া অনুভবের ক্ষেত্রে আমি বৈষয়িক উপকরণ হিসেবে ক্যাকটাসকে বেছে নিয়েছি। . . . এই ক্যাকটাস সিরিজগুলোতে গতানুগতিক ওয়াশ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে এসে টেক্সচার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। এখানে রঙের গড়িয়ে আসার গুণটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। গড়িয়ে আসা রং থেকে কীভাবে টেক্সচার তৈরি হতে পারে সেই পন্থা অবলম্বন করেছি . . .।'[৩৫]

আযীযের ক্যাকটাস সিরিজের কাজ প্রসঙ্গে অনি আলমগীরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'ক্যাকটাস সিরিজের রূপক ছবিগুলোতে সৌন্দর্যের পাশাপাশি প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার ভেতর অস্ফুট আকর্ষণ উন্মোচনে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। এ ছবিগুলোতে তিনি রঙ ও উপলব্ধির সমন্বিত উপস্থাপনার ভেতর দিয়ে বাস্তবিক ও পরাবাস্তবিক জগৎ আবিষ্কার করেছেন।'[৩৬]

ঐতিহ্য সিরিজচিত্রে আব্দুল আযীয প্রাচীন সভ্যতার টেরাকোটার নানা নারীমূর্তিকে নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছেন। এই সিরিজচিত্রে নারীর শারীরিক সৌন্দর্য, অন্তর্লোকের উৎসাহিত ভাষা, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য, নারীকে বৃক্ষের সাথে তুলনা প্রভৃতি বিষয়চিন্তাকে সমন্বিত করেছেন।[৩৭]

আব্দুল আযীয ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষাবর্ষে এম.এফ.এ পরীক্ষায় প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এরপর ২০০৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। ছাত্রজীবন ও শিক্ষকতার প্রথম পর্যায়ে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলার বাণী, বেতার বাংলা পত্রিকা, সাপ্তাহিক রোববার প্রভৃতি পত্রিকায় ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন। এঁকেছেন কার্টুন। শিক্ষক হবার পর তাঁর কাজের বিষয় পাখি ও রমণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। তাঁর বেশির ভাগ কাজে ব্লু রঙের প্রাধান্য এবং প্রকৃতির গাছপালা ডিজাইনিক ফর্মে রূপ পেতে থাকে।

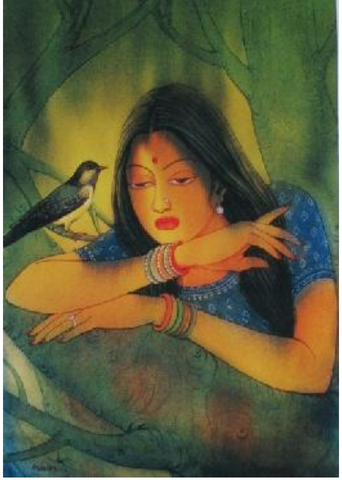

চিত্র ৯৮ : পাখি ও রমণী-১

চিত্র ৯৯ : রমণী ও পাখি-২

চিত্র ১০০ : পাখি ও রমণী

Dhaka University Institutional Repository

জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩ জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৭ জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩

২০০৮ সালে আযীয তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনী করেন আলিয়ঁস ফ্রসেঁস গ্যালারিতে এবং পঞ্চম প্রদর্শনী করেন জয়নুল গ্যালারিতে। আব্দুল আযীযের কাজে একাডেমিক কলাকৌশল, বর্ণ-প্রয়োগের কুশলতা, নাটকীয় আলোকসম্পাত প্রসঙ্গে নাহিদ মুস্তাফা গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> আজিজের (আযীয) অঙ্কনও দৃঢ় সাবলীল। বর্ণ প্রয়োগেও তার কুশলতা আছে। ছবিতে এক ধরনের নাটকীয় আলোকসম্পাত করেছেন, যা তার ছবির নারীর বিষণ্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে ছবিকে আরও বেশি আবেগময়তা সৃষ্টি করে। তার ললনার সাজসজ্জায় পরিপাটি, কিন্তু বিমর্ষতায় এতটাই ম্রিয়মাণ যে, মনে হয় তারা প্রিয়জন থেকে দূরে বিরহী রমণীকুল।[৩৮]

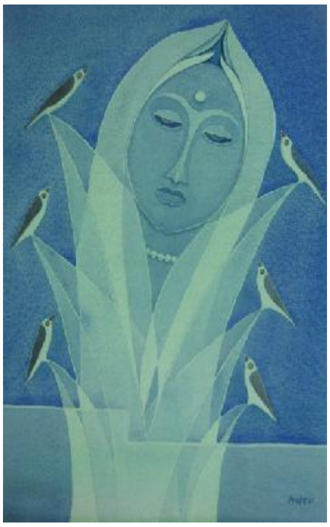

চিত্র ১০১ : পাখি ও রমণী
জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০১১

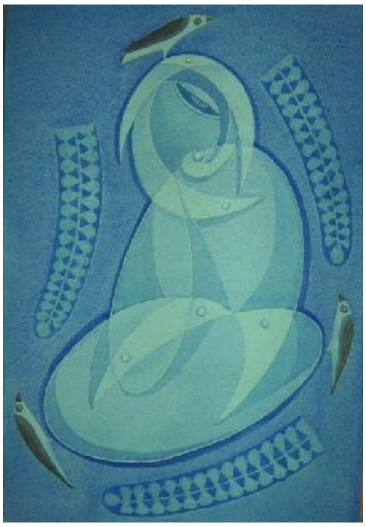

চিত্র ১০২ : পাখি ও রমণী-২
জলরং

চিত্র ১০৩ : পাখি ও রমণী-১
জলরং, ২০১১

নীল রঙের প্রতি শিল্পী আযীযের পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। তিনি ফুল, পাখি, রমণীর রঙিন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এক বর্ণে আসক্ত হয়েছেন। টেকনিকের ক্ষেত্রে এনেছেন সরলীকরণ। প্রাচ্যরীতির ডিজাইনিক ব্যবহার আরো জোরালো হয়েছে। নীল রঙের বিশেষ টেক্সচার আর সাদা লাইন ও কাগজের রং মিলিয়ে ফ্লাট সারফেস তৈরি করে আব্দুল আযীয যে টেকনিক প্রয়োগ করেছেন, তা স্ব-উদ্ভাবিত। মনিরুজ্জামান পলাশের ব্যাখ্যায় ধরা পড়েছে এই টেকনিকের গুণগান :

> ওয়াশের মধ্যে রঙের যে টেকচার নির্মিত হয়েছে তা শিল্পীর দক্ষতার আর একটি সোপান। আযীযের ছবিতে গুপ্ত রহস্য অবশ্য নেই; কিন্তু রহস্যের বাতায়ন স্বচ্ছ রঙের প্রলেপে খোলা। সে বাতায়ন দিয়ে প্রবেশ করে কখনো আলো কখনো হাওয়া। আর সে আলো-হাওয়ার মূর্ত ফর্মে দুলে দুলে ওঠে নারীর রহস্যঘেরা ছন্দায়িত শরীর-মন। সে শরীর-মনজুড়ে আযীয ছড়িয়ে দেয় লাবণ্যময় রঙের প্রভা। আর সে রঙে রঙিন হয়ে আযীযের আঁকা নারীরা জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

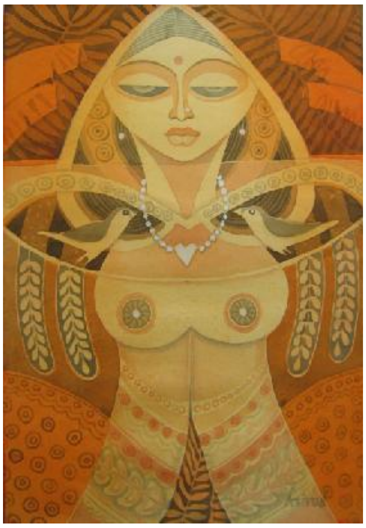

চিত্র ১০৪ : পাখি ও রমণী
জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০৮

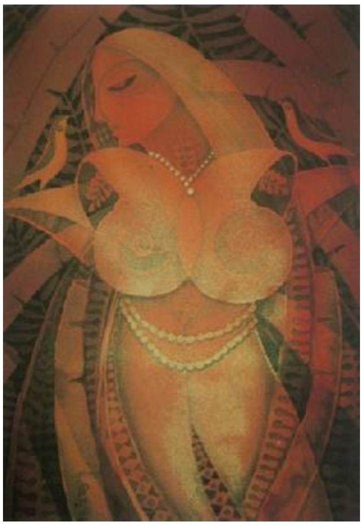

চিত্র ১০৫ : নারী ও প্রকৃতি
জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি

চিত্র ১০৬ : নারী ও প্রকৃতি
জলরং, ৩৮ × ২০ সেমি, ২০০৮

আব্দুল আযীযের নারী ও প্রকৃতি সিরিজের অনেক চিত্রে বাংলার পুতুলের ফর্ম পাওয়া যায়। মুহম্মদ আবদুল বাতেনের মতে, 'শিল্প (শিল্পী) আবদুল আজিজের (আযীযের) প্রশান্ত-কোমল ভাবময় নারী প্রাচ্যের দার্শনিক সংবেদনশীলতাকেই জাগিয়ে তুলেছে।'[৪০]

শিল্পী আব্দুল আযীয ২২ এপ্রিল ২০০৪ সালে প্রাচ্যকলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১ আগস্ট ২০১১ থেকে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলাকে জাতীয় চিত্রকলার বিশেষ দিক হিসেবে তুলে ধরার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছেন। একাধিক একক প্রদর্শনী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে প্রাচ্যধারার চিত্রকলাকে শিল্পরসিকদের মাঝে জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আরো একটি বিশেষ দক্ষতা হচ্ছে মোজাইক পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রে। যাকে টাইলস পেইন্টিংও বলা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য টাইলস পেইন্টিং হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু সংগ্রহশালার দেয়ালের 'চেতনায় একুশ'। কাজটি তিনি ২০০৬ সালে করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১০৭ : টাইলস পেইন্টিং, চেতনায় একুশ, ২০০৬, ডাকসু সংগ্রহশালা

আযীয ছাত্রজীবন থেকেই ডাকসু সংগ্রহশালার জন্য অঙ্কনবিষয়ক কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বৈরাচার দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বায়ান্নর মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য পোস্টার, ফেস্টুন, আলপনা ও ভাষাশহীদদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতেন।[৪১]

চেতনায় একুশ এরই ধারাবাহিকতার পরিপূর্ণ একটি কাজ। এ ছাড়া তাঁর ডাকসু সংগ্রহশালার জন্য ২০০৭ সালে করা মুরাল পেইন্টিং 'রওশানয়ারা'র প্রতিকৃতি, ২০১০ সালে যশোরে করা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি', ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের জন্য করা 'ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব'-এর প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত বর্ণনায় শিল্পী আব্দুল আযীযের জীবন ও শিল্পকর্মের গতিপথ চিত্রায়ণ করা হয়েছে। এই গতিপথের সূত্র ধরে শিল্পী আব্দুল আযীযের প্রাচ্যচিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও অবদান নিম্নোক্তভাবে তুলে ধারা যায় :

(ক) প্রাচ্যকলা ঐতিহ্যের প্রকাশ হয়েছে তাঁর চিত্রে।

(খ) বাঙালি নারী ও প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চিত্রে।

(গ) জলরং ওয়াশ টেকনিকে নতুনত্ব এনেছেন।

(ঘ) সমকালীন মধ্যবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত নারী চরিত্রের আখ্যান চিত্রিত করেছেন পৌরাণিক আবহের সমন্বয়ে।

(ঙ) প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে নারীর সৌন্দর্যকে একীভূত করে ফ্লাট সারফেসকে নান্দনিকতায় তুলে ধরেছেন।

(চ) প্রাচ্যের অলংকারশোভিত রমণীর চিরচেনা রূপ নান্দনিক তত্ত্বে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) ওয়াশ পদ্ধতির গৌণ রং, রেখাপ্রধান চিত্র।

(জ) তাঁর কাজে সমসাময়িক পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে আধুনিক ও সমকালীন চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

(ঝ) তিনি মোজাইক চিত্র (টাইলস পেইন্টিং) নির্মাণে পারদর্শী।

(ঞ) প্রাচ্যের চিরচেনা জীবনকে বাস্তবানুগ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মাসুদা খাতুন জুঁই (জন্ম ১৯৭৬)

শিল্পী মাসুদা খাতুন জুঁই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগে পড়াশোনা করার সময় সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিলেন। এর প্রধান কারণ ওয়াশ পদ্ধতিতে ফিগারেটিভ চিত্র অঙ্কনে বিশেষ ধরনের পারদর্শিতা। তিনি ১৯৭৬ সালের ৬ মার্চ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মসূত্রে ঢাকাইয়া হলেও তাঁর পৈতৃক বাড়ি পাবনা জেলার গ্রামাঞ্চলে। বাবার চাকরিসূত্রে বসবাস ঢাকায় হলেও গ্রামের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। চার বছর বয়সে যখন তিনি নার্সারি স্কুলেও যান না তখন থেকেই সহজাত প্রক্রিয়ায় ছবি আঁকতেন। এ সময় তাঁর ছবি আঁকার মূল খাতা ছিল ঘরের দেয়াল ও মেঝে। চক ও রঙিন পেনসিল সহযোগে মনের আনন্দে রঙিন করতেন ঘরের মেঝে ও দেয়াল। যখন তিনি এলিফ্যান্ট রোডের টিউলিপ কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হলেন ওই সময় চারুকলার শিশুদের আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সাথে তাঁর বড়ো বোনও ভর্তি হয়েছিলেন। আর্ট স্কুলে ছবি আঁকাটা তাঁর এক ধরনের খেলা ছিল। কাগজে তুলি দিয়ে জলরং করতেন আবার রঙিন ছবিখানা চারুকলার ছোট পন্ডে ধুয়ে ফেলে রোদে শুকাতেন।[৪২] এভাবে জলরং ও জলের সাথে খেলতে খেলতে ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছেন।

এরপর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময় পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা চালিয়েছেন। অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অর্জন করেছেন স্বর্ণপদক ও পুরস্কার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত প্রদর্শনীর পুরস্কার। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে Grindlege Bank-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডারে তাঁর একটি ছবি ছাপা হয়।

মাসুদা খাতুন ১৯৯১ সালে এস.এস.সি পাস করেন এবং ১৯৯১–৯২ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা ইনস্টিটিউটে (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) প্রাক বি.এফ.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। প্রাক বি.এফ.এ শ্রেণিতে পড়ার সময় পারিবারিক পরিচয়সূত্রে প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক শিল্পী শওকাতুজ্জামানের উৎসাহ পান। শওকাতুজ্জামান তাঁকে প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ শ্রেণিতে ভর্তি হতে উৎসাহিত করেন। মাসুদা খাতুন ১৯৯৩ সালের (পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ১৯৯৪) প্রাক বি.এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৯৩–৯৪ শিক্ষাবর্ষে প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। প্রাচ্যকলা বিভাগে মূলত জলরং মাধ্যমে চিত্র আঁকা হয়। মাসুদা খাতুন জলরংকেই বেশি ভালোবাসতেন এবং এই মাধ্যমে ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন। সুতরাং এই

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগে ভর্তির পর ছবি আঁকার দক্ষতায় শিক্ষকদের নজর কাড়তে সমর্থ হন। এ ছাড়া প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার দর্শন ও তাঁর মানসিকতা এক হওয়ায় তাঁর চিত্রকলা প্রাচ্যরীতির বৈশিষ্ট্যে হয়েছে সমুজ্জ্বল।

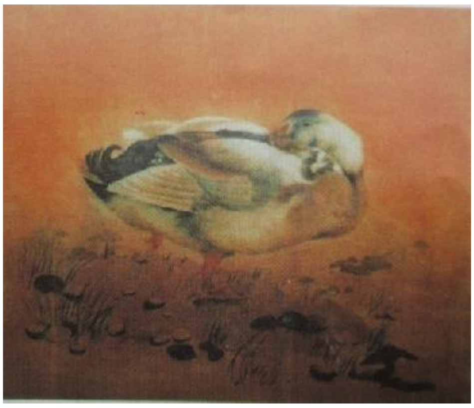

চিত্র ১০৮ : অনুশীলন-১, জলরং
৫৫ × ৫৫ সেমি, ১৯৯৪
(১৯৯৫ সালের বার্ষিক প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

চিত্র ১০৯ : অনুশীলন-২, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ১৯৯৪

মাসুদা খাতুন জুঁই জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে ফিগারেটিভ চিত্র আঁকতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। বি.এফ.এ পড়ার সময় শিল্পী শওকাতুজ্জামানের ওয়াশ পদ্ধতি ও শিল্পী নাসরীন বেগমের মডেল ড্রয়িং টেকনিক সমন্বয় করে কেন্ট পেপারে ওয়াশ রীতিতে মডেল ফাতেমাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে অঙ্কন করেছেন। মডেল ফাতেমাকে ড্রয়িং করে নিয়ে কেন্ট পেপারে পাতলা ওয়াশে বারবার রং প্রয়োগ করে মায়াবী আবেশ তৈরি করেছেন। তাঁর এই চিত্রে ফাতেমাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। সাধারণত মডেল দেখে ড্রয়িং করার পর তাতে প্রাচ্যরীতির চরিত্র আরোপ করতে গেলে মূল মডেলের আদল হারিয়ে যায় কিন্তু মাসুদা খাতুন জুঁইয়ের কাজে মডেলের বাস্তবধর্মী আদল অক্ষুণ্ন থেকেছে প্রাচ্যরীতির সকল গুণের সাথে। অর্থাৎ বাস্তবধর্মী মডেলের আদলে প্রাচ্যরীতির রং প্রয়োগের টেকনিক—এই দ্বৈত সত্তা তাঁর কাজে বর্তমান।

একাডেমিক রীতিতে এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালেও প্রাচ্যকলা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জলরং পুরস্কার অর্জন করেন।

চিত্র ১১০ : ফাতেমা-১, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৬
(১৯৯৭ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

চিত্র ১১১ : ফাতেমা-২, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮

চিত্র ১১২ : ফাতেমা-৩, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮

মাসুদা খাতুন *ফাতেমা* সিরিজচিত্রে প্রথমে ফাতেমাকে পেনসিলে ড্রয়িং করে নিতেন। এরপর ট্রেসিং করে ড্রয়িংটি হ্যান্ডমেইড পেপারে ট্রান্সফার করতেন। এরপর হ্যান্ডমেইড পেপারটি ভিজিয়ে নিয়ে একের পর এক রঙের পাতলা ওয়াশ দিতেন। এভাবে রং প্রয়োগের ফলে জমিনে রঙের যে বুনট তৈরি হতো তা মায়াবী আবেশ তৈরি করত। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে হালকা লাইন অর্থাৎ ফিনিশিং টাচ দিয়ে ছবি শেষ করতেন। তিনি ফিনিশিং টাচ দেয়ার কৌশল শিখেছেন নাসরীন বেগমের কাছ থেকে।[৪৩]

চিত্র ১১৩ : ফাতেমা-৫, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮

চিত্র ১১৪ : ফাতেমা-৩, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮

চিত্র ১১৫ : ফাতেমা-৬, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮

মাসুদা খাতুন জুঁই ১৯৯৬ সালে বি.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেন প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে। ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষাবর্ষের এম.এফ.এ প্রথম পর্বের ক্লাস শুরু করেন ১৯৯৮ সালে। এ সময় তাঁর কাজে পবিবর্তন আসে। কারণ শিল্পী আব্দুস সাত্তারের জলরং প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত তিনি হন। এই পদ্ধতিতে তিনি বারবার ওয়াশ না দিয়ে এক ওয়াশেই ছবির কাজ শেষ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

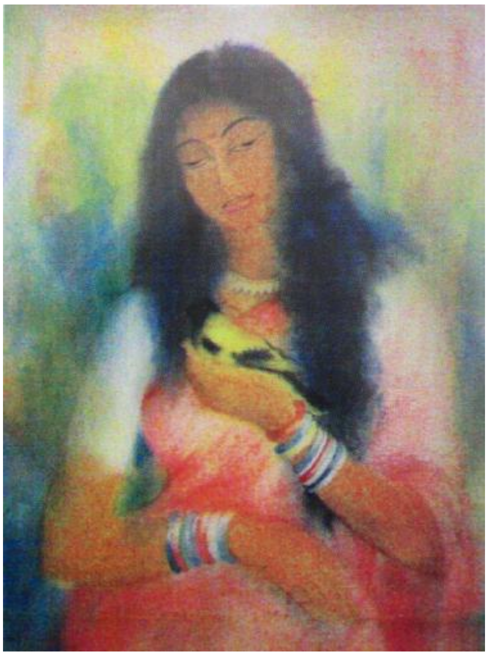

চিত্র ১১৬ : পাখিসহ রমণী, জলরং, ৮৫ × ৭০ সেমি, ১৯৯৯

এই ঘরানার কাজে লাইনের ব্যবহার নেই, আছে ওয়াশের লাবণ্য। বিভিন্ন রং মিলেমিশে ফিগারের অবয়ব তৈরি হয়। মাসুদা খাতুন জুঁই চারুকলার ১৯৯৯ সালে বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রাচ্যকলা বিভাগে এম.এফ.এ পড়ালেখার সময়েই ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষে আই.সি.সি.আর স্কলারশিপে ভারতের মহারাজা সারাজীওরাও ইউনিভার্সিটিতে (এম.এস ইউনিভার্সিটি) শিল্পকলার ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্ব বিভাগে শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এম.এফ.এ ডিগ্রি শেষ করেছেন ২০০৩ সালে।

পড়াশোনা শেষ করে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ) শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগে ২০০৪ সালে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ২০০৮ সাল পর্যন্ত ওই পদে শিক্ষকতা করেন। এরপর ২০০৯ সালের জুন মাসে প্রাচ্যকলা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক পদে যোগ দেন। এ ছাড়া ২০১২ সালের ১ নভেম্বর থেকে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দিয়ে কর্মরত আছেন।

মাসুদা খাতুন শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনার কারণে ছবি আঁকায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবে তাঁর চিত্র আঁকার বিষয় ও চিন্তার পরিবর্তন এসেছে শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে পড়তে গিয়ে। বিশেষত বুদ্ধ ও বুদ্ধবিষয়ক শিল্পকলা পড়তে তিনি বুদ্ধের জীবন-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। বুদ্ধের জাতক কাহিনির দর্শনের সাথে মিল রেখে এঁকেছেন বাংলাদেশের জন্ম (Birth of Nation) রহস্য এবং বুদ্ধ সিরিজচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১১৭ : জাতির জন্ম
অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস
৮৫ × ৭০ সেমি, ২০০৯

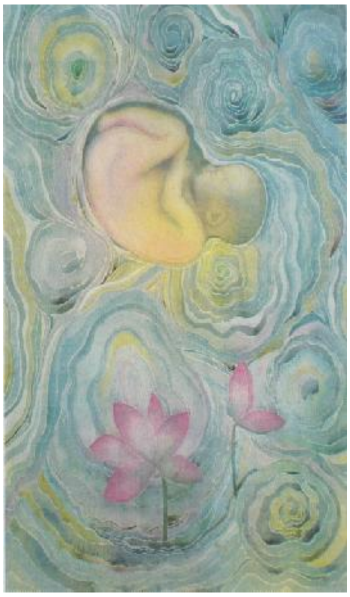

চিত্র ১১৮ : জন্ম রহস্য, জলরং
৮৫ × ৭০ সেমি, ২০১০

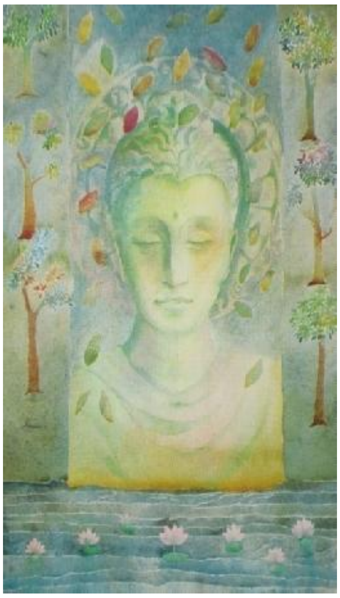

চিত্র ১১৯ : বুদ্ধ, জলরং
৮৫ × ৭০ সেমি, ২০১০

বুদ্ধ-কেন্দ্রিক এই সিরিজচিত্র তাঁর পূর্বের ওয়াশ পদ্ধতির কাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা *বার্থ অব নেশন* সিরিজচিত্রে বাংলাদেশের জন্মকে বুঝিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাক-হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞের চিহ্ন এঁকেছেন। বুদ্ধের জ্ঞানের প্রতীকী হিসেবে পদ্মফুল এঁকেছেন। এই চিত্রে তিনি কনসেপচুয়াল চেতনাকে মূর্ত করে বিশেষ বিষয়কে আবেদনে এনেছেন প্রাচ্যরীতির চিত্ররীতিকে বজায় রেখে।

জন্ম রহস্য সিরিজচিত্রে মানুষের জন্ম রহস্যকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই জন্ম রহস্য শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, প্রকৃতির প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রেই ঘটে। শিল্পী সেই রহস্যময় সৃষ্টিশীলতার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বুদ্ধ সিরিজচিত্রে বুদ্ধকে এঁকেছেন জলরঙের ব্যঞ্জনায়। জ্ঞানের আলোর প্রতীকী করে। বুদ্ধের সাথে প্রকৃতিকে সংযোজন করেছেন মোগল মিনিয়েচার স্টাইলে। পদ্মফুল জ্ঞানের প্রতীক। এই সিরিজচিত্র আঁকার নেপথ্য উৎসাহ হচ্ছে ভারতীয় স্কাল্পচার। বুদ্ধবিষয়ক ভারতীয় স্কাল্পচার দেখে শিল্পী বুদ্ধের বিষয়চিন্তা নিয়ে সিরিজচিত্র আঁকতে আগ্রহী হন।

এই সিরিজের কাজে শিল্পী মোগল মিনিয়েচারের দৃশ্য অঙ্কনের কৌশলকে ব্যবহার করে প্রাচ্য ঐতিহ্যের চিত্ররীতিকে আধুনিক ভাবব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। এই সিরিজচিত্র প্রসঙ্গে সিলভিয়া নাজনীনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> মাসুদা খাতুন তুলে আনেন প্রাচ্যদেশীয় অপরূপ ভাবগম্ভীর শিল্পকর্ম। তাঁর 'বুদ্ধ সিরিজ'-এ বর্ণ প্রয়োগে পরিশীলতা ও পরিমিতির ছাপ প্রশংসনীয়। জীবনবোধের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পরীতির কোমল বহিরাবরণে আবৃত তাঁর চিত্রকর্ম।[৪৪]

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিল্পী মাসুদা খাতুন জুঁইয়ের অবদানকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায় :

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ফাতেমা শীর্ষক সিরিজচিত্রে বাস্তবধর্মী ড্রয়িং ব্যবহার করে প্রাচ্যের জলরং প্রয়োগ করে তাঁর চিত্রকর্মের মাধ্যমে নতুন দিক উন্মোচন করেছেন।

(খ) বার্থ অফ নেশন সিরিজচিত্রে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার গুণ-বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চিত্রকে আধুনিকীকরণ করেছেন।

শংকর মজুমদার (জন্ম ১৯৭৬)

শিল্পী শংকর মজুমদার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা গ্রুপের প্রথম ছাত্র। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চা শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৫ সালে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রাচ্যচিত্রকলাকে সার্থক রূপায়ণ করেছেন প্রথম দিকের ছাত্র শিল্পী আব্দুস সাত্তার। আব্দুস সাত্তার প্রাচ্যচিত্ররীতির স্বশিক্ষা নিয়েছিলেন। কারণ এই রীতির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক তখন প্রাচ্যকলা বিভাগে ছিলেন না। শিল্পী শংকর মজুমদারও একই কারণে স্মরণীয়। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক তখন ছিলেন না, যখন শংকর রাজশাহীতে প্রথম প্রাচ্যকলা গ্রুপে ভর্তি হন।

শংকর মজুমদার ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বৈকুণ্ঠপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সূত্রে তিনি শিল্পী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই লোকজ শিল্প-সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিলেন। বাবা ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র খুলনার মহেশ্বরপাশা আর্ট কলেজের ছাত্র। শুধু চিত্রকলাই নয়, কবিত্ব, সংগীত ও যন্ত্রসংগীতেও তাঁর সহজাত বিচরণ। গান লেখেন, গান করেন, সরোদ বাজান, বাঁশি বাজান। মহেশ্বরপাশা আর্ট কলেজ থেকে বি.এফ.এ করে তিনি কোথাও ভালো করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। শেষে গ্রামের সংসার, গ্রাম্য সংস্কৃতিতে গান-বাজনা আর প্রতিকৃতি এঁকে জীবন নির্বাহ করছেন। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে না পেরে ছেলেকে বড়ো চিত্রশিল্পী করার স্বপ্ন দেখেন। বাবার ছবি আঁকা দেখে শংকরও ছবি আঁকতেন ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু শংকরের স্বপ্ন চিত্রশিল্পী হওয়াতে নয়। সংগীত তাঁর প্রাণ। সংগীতে লেখাপড়া করবেন, এই তাঁর স্বপ্ন। এর একটা কারণও ছিল। শংকর চোখে কম দেখেন। তাই ছবি আঁকতে অসুবিধা হতো। ১৯৯২ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৯৫ সালে এইচ.এস.সি পাস করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে মতানৈক্য চলতে থাকে। পিতা সাধন মজুমদার সংগীতশিল্পী, বরিশাল বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী। নিজে গান লেখেন, সুর করেন এবং গান করেন। তবু ছেলেকে চিত্রশিল্পী করতে চান। ছেলে চিত্রকলার চেয়ে সংগীতে পড়াশোনা করতে আগ্রহী। পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বে এইচ.এস.সি পাস করার পরও এক বছর বিফলে গেল। অবশেষে জয় হলো পিতার ইচ্ছার। এবার চারুকলায় ভর্তি হবার জন্য শংকর ভারতের শান্তিনিকেতন,

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা চারুকলা এবং খুলনায় ভর্তি পরীক্ষা দিলেন। অবশেষে ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। নিয়ম অনুযায়ী এক বছর সমন্বিত কোর্স করার পরে শংকর বেছে নিলেন 'প্রাচ্যকলা গ্রুপ'। তাঁকে দিয়েই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চা শুরু। কিন্তু শিক্ষক নেই। প্রাচ্যকলা গ্রপে শিক্ষক নেই, তবু কেন এই গ্রুপে ভর্তি হলেন প্রশ্ন করাতে শংকর বলেন : আমার চান্স হয়েছিল ভাস্কর্য গ্রুপে। ভাস্কর্য করতে অনেক খরচ। আমাদের আর্থিক অবস্থাও দুর্বল। প্রাচ্যকলা যেহেতু জলরং বেইজ, সেহেতু খরচ অনেক কম। তাই খরচের কথা চিন্তা করে প্রাচ্যকলা গ্রুপে ভর্তি হলাম।[৪৫]

ভাগ্য শংকরের সহায় হয়নি। শিক্ষকহীন ক্লাস। অন্য গ্রুপের শিক্ষকরা পরস্পরবিরোধী নিয়ম-কানুনে চিত্রকলায় ক্লাস নিতেন। এ ছাড়া প্রাচ্যচিত্রকলার শৌখিন রেখাপ্রধান কাজ করতেও অসুবিধার সম্মুখীন হন তিনি। কারণ চোখের চশমার পাওয়ার ৬+ থেকে ৭+ পর্যন্ত। এরপর তৃতীয় বর্ষে পড়াশোনার সময়ে সুশান্ত কুমার অধিকারী (বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক ড. সুশান্ত অধিকারী) শিক্ষক হয়ে প্রাচ্যকলা গ্রুপে যোগ দেন। এবার শংকর সঠিক দিকনির্দেশনা পেলেন। সুশান্ত কুমারের কাছে তিনি প্রাচ্যচিত্ররীতির বিশেষ মাধ্যমগুলোর পাঠ নিতে শুরু করেন। ওয়াশ, টেম্পারা ও ফ্রেসকো মাধ্যমে ছবি আঁকেন।

এই প্রতিকূলতার পরও ১৯৯৯ সালের বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা গ্রুপে শ্রেণি পুরস্কার অর্জন করেন। এরপর এম.এফ.এ প্রথম পর্বেও ক্লাস হতে না হতেই একমাত্র শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারী ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য স্কলারশিপ নিয়ে ভারতে চলে যান। শংকর আবারও শিক্ষক-শূন্য হয়ে যান। শিক্ষক নেই, দীর্ঘ সেশনজট এবং আর্থিক অভাব মিলেমিশে শংকরের জীবন ও শিল্পচর্চা ভালো কাটেনি। তদুপরি দৃষ্টিক্ষীণতা তাঁর শিল্পচর্চার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে চলতে থাকায় তিনি ভাস্কর্য চর্চায়ও মন দেন। ভাস্কর্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যতিক্রমধর্মী মাধ্যম বাবুই পাখির বাসা। 'স্বাধীনতার সময়' নামে এই সিরিজের একটি ভাস্কর্য ত্রয়োদশ নবীন চারুকলা প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। প্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভূমিকায় রবিউল হুসাইন লিখেছেন :

> প্রকৃতির স্থপতি-প্রকৌশলী বাবুই পাখির বাসার নির্মাণশৈলী দিয়ে অন্যমাত্রার অস্থায়ী রূপবন্ধনে শায়িত মানব-মানবী-শিশু সমৃদ্ধ মনুষ্য সংসারের ভাস্কর্য-প্রতিচ্ছবি এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষণ, যা প্রদর্শনীতে অন্যতম একটি অভিনবত্ব আনয়ন করেছে।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২০ : স্বাধীনতার সময়, বাবুই পাখির বাসা, ১৯৯৯

শংকর শুধু ভাস্কর্যই নয়, সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে চারুকলা চত্বরে ইনস্টলেশন করে প্রশংসা পেয়েছেন। মূলত প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় শংকর বিশেষ কোনো আঙ্গিক বা ধারা তৈরি করতে পারেননি। ২০০২ সালের এম.এফ.এ পরীক্ষা তিনি দিয়েছেন ২০০৭ সালে। এরপর রাজশাহী থেকে ঢাকা চলে আসেন জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজতে। প্রথমে তিনি 'উত্তরা সৃষ্টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ'-এ এক বছর শিক্ষকতা করান। সেখান থেকে যোগ দেন 'কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (কোডা)'-এ। এখান থেকে নতুন স্বপ্ন দেখেন। কলেজ পর্যায়ে চারুকলা শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপ্ন। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিজের গ্রামে চলে যান ১৯১০ সালে। বাড়ির পাশে 'কদমবাড়ি ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয়ে' ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চারু ও কারুকলা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানে বিনা পারিশ্রমিকে ক্লাস নিতে শুরু করেন। তাঁর এই উদ্যমে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন ওই কলেজের সভাপতি রসময় কীর্তনীয়া। তিনি ঢাকা বোর্ডের ডেপুটি কন্ট্রোলার হওয়ায় নতুন এ বিষয়টি অনুমোদন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। ২০১১ সালের পরীক্ষায় ১৯ জন ছাত্র প্রথম পরীক্ষা দেয়। এটাই বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষার কলেজ পর্যায়ের প্রথম। বাংলাদেশে শহরকেন্দ্রিক অনেক কলেজ থাকলেও শিল্প-সংস্কৃতির বিষয়গুলোর পাঠদান এখনো হয়ে ওঠেনি। শংকর নিজ উদ্যোগে এই পথ চালু করে দিয়েছেন। এরপর ২০১২ সালে ৩৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন এ বিষয়ে।

দুর্ভাগ্য হলো, ২০১২ সালে যখন ওই কলেজে চারু ও কারুকলার প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হয় তখন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায়, ক্ষমতার ব্যবহারে অন্য একজনকে চাকরি দেয় প্রশাসন। শংকরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। কিন্তু তিনি থেমে নেই। সারা বাংলাদেশে চারুকলার সুকুমার বোধ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি ব্যক্তিগত

উদ্যোগে মাদারীপুর ও ঢাকায় দুটি কলেজে চারু ও কারুকলা বিষয় পাঠদানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কলেজ পর্যায়ে 'চারু ও কারুকলা' বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

জীবনযুদ্ধে কিছুটা হতাশ শংকর ছবি আঁকা ছাড়েননি কখনো। ২০১০ সালের একুশে বইমেলায় মুক্তচিন্তা প্রকাশনা থেকে প্রকাশ হয়েছে ছড়ার বই 'ভূতের কানামাছি'। বইটিতে শুধু শিশুতোষ ছড়াই নয়, তাঁর চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায় অলংকরণে।

গ্রন্থচিত্রণ ও অলংকরণে তাঁর পারদর্শিতা দীর্ঘদিনের। রাজশাহী চারুকলার পাঠ শেষ করে ঢাকায় আসার পরে দীর্ঘদিন বাংলাবাজারের প্রকাশনাগুলোর গ্রন্থ অলংকরণ করেছেন। সেশনজটের কারণে এম.এফ.এ পাস করার পর তাঁর বয়স দাঁড়ায় ৩১ বছর। সরকারি চাকরির বয়স তখন নেই। ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজেকে যুক্ত করতে পারেননি। সর্বশেষ গন্তব্য এখন গ্রামের বাড়ি। লেখালেখি (শিশুসাহিত্য), গান গাওয়া এবং বাঁশি বাজানোর মধ্য দিয়ে কাটে তাঁর সময়। চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে ২০১১–২০১৩ সময়কালের মধ্যে। তিনি উদ্ভাবন করেন কম খরচে এবং জলরং ইফেক্টের এক নতুন আঙ্গিক। মূলত চিত্র অঙ্কনের ব্যয় সংকোচন করার জন্যই তাঁর এ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে তিনি সস্তা দামের কাগজ ব্যবহার করেন। এ কাগজে অক্সাইড কালার হাতের আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে চিত্রের জমিনে রং করেন। তাঁর এই চিত্র অঙ্কনে কোনো তুলির ব্যবহার নেই। প্রাচ্যরীতির লাইন-প্রধান গুণ তাঁর চিত্রে বিদ্যমান। এসব লাইনে ব্যবহার করেছেন চারকোল। জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্রে যে বলিষ্ঠ তুলির লাইন সে রকম নয়। তাঁর বিষয় চিত্রণে তাঁর কাজের সাথে মিল আছে।

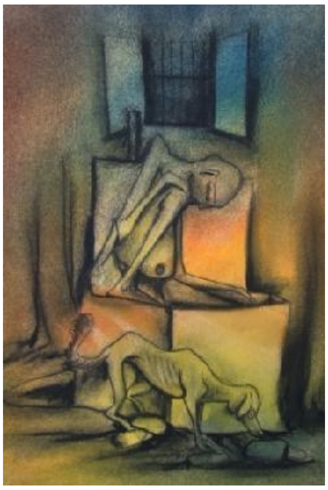

চিত্র ১২১ : ক্ষুধা, অক্সাইড রং
৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি

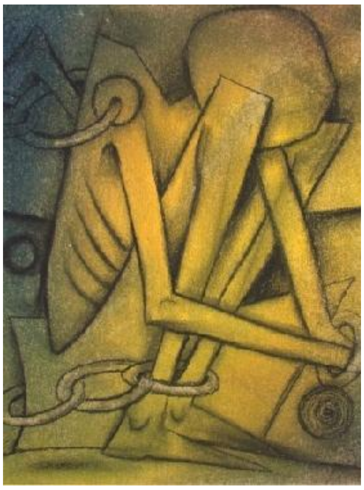

চিত্র ১২২ : বার্ধক্য, অক্সাইড রং
৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি

চিত্র ১২৩ : আমার ছেলেবেলা
অক্সাইড রং, ৫৮.৮ × ৫০ সেমি

নিজের স্বপ্নকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেননি শংকর। এজন্য হয়তো তাঁর কাজের বিষয় হয়ে এসেছে কৈশোরের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বিষয়। কাজের মধ্যে ব্ল্যাকহোল এসেছে প্রতীকী অশনি সংকেত হিসেবে। কখনো পাথর এঁকেছেন বাধার ভারিত্ব বোঝাতে। স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এবং হতাশার গল্পই তাঁর চিত্রে উঠে এসেছে। এ ছাড়া মা ও শিশু নিয়ে যেসব চিত্র এঁকেছেন, তা দেখলে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের

চিত্রের কথা মনে পড়ে। শংকরের কাজে শিশু চরিত্র ফুটে উঠেছে। শিশুসাহিত্যে শিশুদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন সুকুমার রায়ের মতো ছড়ায়। চিত্রকলায় সেসব শিশুর অভাবগ্রস্ততার কথা এঁকেছেন। এটা তাঁর একান্ত অনুভূতির ফসল।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনায় অভাবী মানুষের সংখ্যা অনেক। শহরের বস্তি এবং গ্রামের ভূমিহীন কৃষকের শিশুরা পুষ্টিহীনতায় কঙ্কালসার দেহ নিয়ে বেড়ে ওঠে। যে সময় তার খেলার কথা সেই সময় ক্ষুধার জ্বালায় খেলনার রিং দুর্বল হয়ে যায়। তার রিংগুলো সুগোল নয়। নেতিয়ে যাওয়া আবার এই প্রতিবন্ধকতার প্রতীক হয়ে শিকল এসেছে ছবির অবজেক্ট হিসেবে, ফর্ম হিসেবে। কখনো পাথর এঁকেছেন স্থির অবস্থার প্রতীকায়নে। এ ছাড়া অশুভ ব্ল্যাকহোল এসেছে হতাশার ভয়াবহতা বোঝাতে।

চিত্র ১২৪ : মাতৃত্ব-১, অক্সাইড রং
৫৮.৮ × ৫০ সেমি

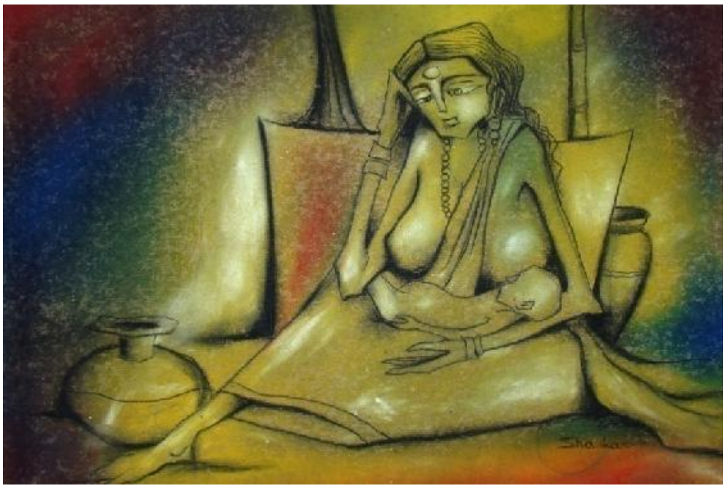

চিত্র ১২৫ : মাতৃত্ব-২, অক্সাইড রং
৫৮.৮ × ৫০ সেমি

এই হতাশার মধ্যেও শিল্পী স্বপ্ন দেখেন—অপুষ্টিতে ভুক্ত মা শিশুকে পর্যাপ্ত বুকের দুধ দিতে পারেন। শংকর মায়ের স্তন বড়ো করে এঁকে সেই স্বপ্ন পূরণের সাধ মেটান। যেন শিল্পী এস.এম সুলতানের বীর্যবান শরীরের মতো। এটা শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিপ্রায়। তাঁর স্বপ্নে গ্রামের সাধারণ কর্মময় জীবন উঠে এসেছে। তিনি পাট তোলা, কারুশিল্পরত সুতা বোনা, মাছ ধরা, রাখালের গরু চরানোর ছবি এঁকেছেন। এসব ছবিতে আশা, স্বপ্ন ও সম্ভবনার কথা উঠে এসেছে। ফুটে উঠেছে গ্রামবাংলার সংস্কৃতির সুখ-দুঃখের, কর্মময় জীবনের বাস্তব চিত্র। এসব চিত্র তিনি প্রাচ্য ঘরানায় এঁকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২৬ : পাট তোলা, অক্সাইড রং
৫৮.৮ × ৫৩.৯ সেমি

চিত্র ১২৭ : রাখাল, অক্সাইড রং
৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি

চিত্র ১২৮ : কৃষক, অক্সাইড রং
৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি

উপরোল্লিখিত আলোচনায় ও চিত্র দেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে প্রাচ্যচিত্রকলার প্রথম ছাত্র শংকর মজুমদারের কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান নিচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) উপকরণে স্বকীয়তা ও নতুনত্ব এনেছেন।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা নারীই বেশি এঁকেছেন। শংকরের কাজে শিশু চরিত্র ও তাদের বাস্তব অবস্থা দর্শকের হৃদয়কে বাস্তবতা অনুধাবন করতে সহায়তা করেছে।

(গ) অক্সাইড কালার দিয়ে তিনি ওয়াটার কালার ওয়াশ পদ্ধতির ইলিউশন সৃষ্টি করেছেন।

(ঘ) ব্যক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় চারু ও কারুকলা বিষয় চালু করেছেন।

(ঙ) শিল্পচর্চা শহরকেন্দ্রিক। অথচ তিনি গ্রামে বসেই তাঁর সাধনা চালাতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব আমরা বলতে পারি, শিল্পী শংকর বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতির একজন সার্থক রূপকার। মাধ্যমের ক্ষেত্রে নতুনত্ব সংযোজন করেছেন। প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়ে নারী ও প্রকৃতি সৌন্দর্য চিত্রণ করেছেন বেশি। সেক্ষেত্রে শংকর প্রাচ্যরীতিকে বজায় রেখে সমসাময়িক সময়ের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন।

আব্দুল বাতেন খান (জন্ম ১৯৭৭)

শিল্পী আব্দুল বাতেন খান সর্বমহলে তারিক ফেরদৌস নামে পরিচিত। বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে কর্মরত। তিনি ১৯৭৭ সালের ১ মে টাঙ্গাইল জেলার হুগড়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত খানবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত হলেও ধর্মানুভূতির কারণে ছবি আঁকার বিষয়ে পরিবার থেকে তেমন কোনো উৎসাহ পাননি। প্রাইমারি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে পড়াশোনা করেছেন সেখানেও শিশু চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল না।

ছোটোবেলা থেকেই তাঁর ভেতর ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ছোটোবেলা থেকে চারুকলায় ভর্তি অবধি তিনি কারো কাছ থেকে চিত্রকলা বিষয়ে পাঠ না নিয়েই চারুকলায় ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেন। এমনটি সাধারণত ঘটতে দেখা যায় না। কিন্তু ফেরদৌস নিজের ভেতরে ছবি আঁকার তাগিদ অনুভব করতেন। পেনসিল দিয়ে পাঠ্য বইয়ের ছবি আঁকতেন। তাঁর এই স্বভাবসুলভ অঙ্কন দক্ষতা দেখে পাড়া-প্রতিবেশী উৎসাহ দিতেন। নিজেদের কিছু শৌখিন কাজ ফেরদৌসকে দিয়ে করিয়ে নিতেন। এর মধ্যে রয়েছে সুতায় সেলাই করার জন্য ওয়ালক্লথ, ওয়ালম্যাট, জায়নামাজ কিংবা কলেজপড়ুয়া ছাত্রদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকটিক্যাল খাতার চিত্র। এইচ.এস.সি পড়ার সময় বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সজ্জায় চিত্র আঁকতেন, বিশেষত বিয়েবাড়ির গেট ও অন্যান্য সাজসজ্জায়।

ফেরদৌস খান ছেলেবেলা থেকেই পরিবারের অন্যান্য সদস্য থেকে চিন্তাচেতনায় আলাদা ছিলেন। বই পড়া, বাগান করা, নিবিষ্ট মনে একা একা সময় কাটানো, প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন উপভোগ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। ১৯৯৭ সালে এইচ.এস.সি পাস করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা চালান। যখন পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলেন চারুকলায় ভর্তি হওয়া যায় তখন মনে মনে চারুকলায় ভর্তি হতে মনস্থির করলেন। যথারীতি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকার প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি হন।

বি.এফ.এ (সম্মান) একাডেমিক ঘরানায় চিত্রচর্চায় ফেরদৌস দক্ষতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। পাখি, ফুল-লতা-পাতা, নারী ফিগারের বিভিন্ন ইমোশন করেছেন ওয়াশ পদ্ধতিতে। ওয়াশ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ। কার্টিজ পেপার, সুইচ বোর্ড ব্যবহার করেছেন ওয়াশ পদ্ধতির পেপার হিসেবে। হ্যান্ডমেইড কাগজ ভিন্ন এসব কাগজ ওয়াশের জন্য উপযোগী নয়। ব্যবহৃত হয় কম। সেক্ষেত্রে ফেরদৌসের ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা তাঁর চিত্রকলায় স্বকীয় মাত্রা যুক্ত করেছে। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার অন্যতম প্রধান গুণ লাবণ্য। ফেরদৌসের চিত্রকলায় সেই লাবণ্য-যোজনা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্র ১২৯ : যুগল-১, জলরং, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ২০০৩

চিত্র ১৩০ : অবসরে
কর্টিজ পেপারে জলরঙের ওয়াশ
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৩১ : মেঠোপথে-৬
ফ্রেসকো (ভেজা পদ্ধতি)
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

বি.এফ.এ সম্মান শ্রেণির কাজে আব্দুর রহমান চুঘতাইের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি কিছু কাজ করেছেন আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ওয়াশ টেকনিকের ধরনে। টেম্পারা, অ্যাক্রেলিক, সিল্ক পেইন্টিং প্রভৃতি মাধ্যমেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবে যে মাধ্যমেই কাজ করেছেন নারীর বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গি তাঁর চিত্রের বিষয় হয়ে বারবার এসছে।

ফেরদৌস ২০০০ সালে বি.এফ.এ সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। সেশনজটের কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৪ সালে। এরপর ২০০৪ সালে ২০০০–২০০১ শিক্ষাবর্ষে এম.এফ.এ প্রথম পর্বে ভর্তি হন এবং ২০০২ সালের এম.এফ.এ পরীক্ষা দেন ২০০৬ সালে। অর্জন করেন এম.এফ.এ ডিগ্রি। এই

এম.এফ.এ অনুশীলন পর্বের কাজে বি.এফ.এ সম্মান অনুশীলন পর্বের কাজের ধারার সাথে সংগতি রেখে কাজ করেছেন। এই পর্বের কাজে তিনি নানান বিষয় ছাড়াও কয়েকটি সিরিজচিত্র এঁকেছেন। যার মধ্যে রূপা সিরিজ ও প্রতিচ্ছায়া সিরিজচিত্র অন্যতম।

চিত্র ১৩২ : রূপা-১
কার্টিজ পেপারে জলরঙে ওয়াশ
৭৬ × ৪৫ সেমি, ২০০২

চিত্র ১৩৩ : রূপা-২
কার্টিজ পেপারে জলরঙে ওয়াশ
৭৬ × ৪৫ সেমি, ২০০২

চিত্র ১৩৪ : রূপা-৩
কার্টিজ পেপারে জলরঙে ওয়াশ
৭৬ × ৪৫ সেমি, ২০০৩

ফেরদৌস রূপা সিরিজচিত্রে এক স্বপ্নের নারীর চিত্র এঁকেছেন। শিল্পীর একান্ত মনের ভালো লাগা, ভালোবাসা ও কামনার আদর্শ রূপ-লাবণ্য নিয়ে মূর্ত হয়েছে রূপা। এই সিরিজচিত্রে রূপা প্রধান চরিত্র। তার ভরা যৌবন, লাবণ্যভরা মুখমণ্ডল, নির্দিষ্ট বয়সের ছাপ প্রতিটি চিত্রে উঠে এসেছে। রূপার বিভিন্ন অভিব্যক্তি, চিন্তা, অনুরাগ, অপেক্ষা, বেদনা, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে এই সিরিজের কাজে। প্রধান চরিত্র রূপার অবয়ব অপরিবর্তিত রেখেছেন শিল্পী। এই সিরিজের ছবি দেখে রূপাকে খুঁজে নেয়া যায়। শিল্পী মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর স্বপ্নের নায়িকাকে চিত্রিত করেছেন। তবে যে কারণে তাঁর এই সিরিজচিত্র প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় বিশেষ অবদান রেখেছে তা হলো, টেকনিকের ব্যবহার। হালকা গ্রেইন যুক্ত কার্টিজ পেপারে জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। এই কাগজ এত পাতলা যে, পানিতে ভেজানোর পর কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে, সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। ফেরদৌস কাগজের গতি-প্রকৃতি বজায় রেখে নিজস্ব ওয়াশের ধরন তৈরি করেছেন। সেই পদ্ধতিতে হালকা রঙের ব্যবহার। উজ্জ্বল অংশগুলোতে পেপারের রং (অর্থাৎ সাদা) রেখে যাওয়া। তিনি এ পদ্ধতিতে প্রথমে পাতলা রঙের ওয়াশ দিয়ে পরবর্তী ওয়াশ দেয়ার সময় পর্যায়ক্রমে রঙের আলোছায়া প্রয়োগ করেছেন। অতীব দক্ষতার সাথে তুলি চালাতে না জানলে এই পদ্ধতিতে কাজ করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫ সালের চারুকলার বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে ফেরদৌসের প্রতিচ্ছায়া সিরিজচিত্রের প্রতিচ্ছায়া-১ চিত্রটি শিল্পী শওকাতুজ্জামান স্মৃতি পুরস্কার অর্জন করে। প্রতিচ্ছায়া সিরিজচিত্র তাঁর নিরীক্ষাধর্মী কাজ। প্রতিচ্ছায়া সিরিজ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন :

> বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা আমাদের একটি রূপকে দৃশ্যমান দেখি। কিন্তু আমরা মূলত অবচেতনে আমাদের ভেতরের বহু আমির প্রতিনিধিত্ব করি। করে থাকি। আমার প্রতিচ্ছায়া সিরিজচিত্রে এই বহু আমির প্রকাশ ঘটেছে নানা মাত্রিকতায়। এখানে কখনো নারীর ম্লান মূক (বধির) অবস্থান, কখনো তার সকচিত চাহনি, কখনো আবার নীরবতা—এ সবই সমাজের অসংগতি আর বাস্তাবতার প্রতিরূপ।
> প্রকৃতির মাঝে নারীর অবস্থান তুলে ধরেছি চিরন্তর সত্যের দৃষ্টিতে। মানুষের শেষ আশ্রয় প্রকৃতি মাঝে। সকল যাতনার মাঝে আমরা পরিশেষে প্রকৃতির মাঝে আশ্রয় খুঁজে ফিরি।[৪৮]

চিত্র ১৩৫ : প্রতিচ্ছায়া-১, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৫

চিত্র ১৩৬ : প্রতিচ্ছায়া-২, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৫

চিত্র ১৩৭ : রূপা-৩, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৫

ফেরদৌস প্রতিচ্ছায়া সিরিজচিত্রের নারী ফিগার এঁকেছেন প্রকৃতির ফুল-লতা-পাতার সাথে একাত্ম করে। চায়নিজ ইঙ্ক-এর মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সচার তৈরি করেছেন। তাঁর মতে, সামাজিকভাবে মানুষ নিগৃহীত হলে প্রকৃতির কাছে আশ্রয় পায়। মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির নীরব প্রতিচ্ছায়া।

ফেরদৌসের ফিগারেটিভ কাজে নানান মেসেজ থাকে। বিশেষত রূপা সিরিজের রূপাকে তিনি দেখেছেন গ্রামের এক আদর্শ নারীর মতো করে। এ ছাড়া অন্যান্য সিরিজচিত্রে গ্রামবাংলার নারীদের নান্দনিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন চিত্রে। এসব চিত্রে একটি বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে তাঁর চিত্রের মডেলরা সবই নারী। কেন তিনি নারী উপাখ্যান অঙ্কন করেন এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'নারী মাতৃত্বের আশ্রয়। প্রকৃতির মধ্যে মানুষ যেমন আশ্রয় পায়, নারীর মধ্যেও পুরুষ মা, সহধর্মিণী, বোন বিভিন্ন চরিত্রে আশ্রয় খুঁজে পায়। ছেলেবেলায় মাতৃবিয়োগ হওয়ার কারণে আমি নারীর মধ্যে মাতৃত্ব খুঁজে পাই। নারীর কোমনীয়তার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পাই।'[৪৯]

উপরোল্লিখিত আলোচনায় শিল্পী আব্দুল ফেরদৌসের কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান হলো :

(ক) তিনি তাঁর কাজে গ্রামবাংলার নারীদের নান্দনিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন বক্তব্যপ্রধান ভঙ্গিতে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) তিনি তাঁর ওয়াশ পদ্ধতিতে হালকা থেকে গাড় রঙের প্রয়োগ নীতি অনুসরণ করেছেন।

(গ) তাঁর কাজের ড্রয়িং ও রং ব্যবহার লাবণ্যযুক্ত।

(ঘ) কার্টিজ, সুইজ বোর্ড পেপারে ওয়াশ পদ্ধতিতে জলরং ব্যবহার করে নতুনত্ব এনেছেন।

(ঙ) ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে যেসব কাজ করেছেন তা দৃশ্যত জলরঙের অনুরূপ।

(চ) চীন, জাপান পদ্ধতির অনুসারে পাখি ও ফুল এঁকেছেন। যার মধ্যে স্পেস ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

(ছ) নারীর মাতৃত্ব, মমত্ব, প্রেম, শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক অনুভূতি, নিষ্পাপ কোমল অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

(জ) নারীসুলভ কোমনীয়তার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

ফাহমিদা খাতুন (জন্ম ১৯৭৭)

শিল্পী ফাহমিদা খাতুন প্রাচ্যচিত্রকলা ধারার অন্যতম শিল্পী। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী নাসরীন বেগমের পরে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের সমাজ-সংসারে বাড়তি অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়, বিশেষত নারী মা হয়ে থাকেন। এ কারণে শিল্পচর্চা হয়ে ওঠে না। এ ছাড়া প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে চিত্র অঙ্কন সম্ভব হয় না। যাঁরা চিত্রচর্চা অব্যাহত রাখেন, তাঁরা পাশ্চাত্য চিত্ররীতির বিভিন্ন মাধ্যমকেই বেছে নেন। এই বাস্তব সত্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চা করা নারীশিল্পীদের মধ্যে খুব কম শিল্পীই এ ধারায় চিত্রচর্চা অব্যাবহত রাখেন। সে বিচারে শিল্পী ফাহমিদা খাতুনের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

চাঁদপুর জেলার ডা. এ.টি.এম লুৎফুল কবীরের মেয়ে ফাহমিদা খাতুন। পিতার চাকরিসূত্রে ১৯৭৭ সালের ৯ জুলাই লিবিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ফাহমিদা। এরপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে চলে আসেন। ঢাকায় নগর জীবন-যাপনে কেটেছে ফাহমিদার বাল্য-শৈশব। ১৯৯২ সালে তিনি ধানমণ্ডি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাস করেন। স্কুলে পড়ার সময়ে চিত্রকলা বিষয়ে পারিবারিক কোনো উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এই সুকুমার কলার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। স্কুলের হ্যান্ডিক্র্যাফট ও ড্রয়িং ক্লাসের বাড়ির কাজ সবসময় রেডি রাখতেন। স্কুলের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'নবম শ্রেণিতে বায়োলজি পরীক্ষার দিন ভুল করে অন্য সাবজেক্ট পড়ে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক কোশ্চেনের উত্তর শুধু ছবি এঁকে দিয়েছি। শিক্ষক আমাকে পাস মার্ক দিয়েছেন।'[৫০]

চারুকলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ভেতরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুদের জন্য হাতে তৈরি নানা রকম গিফট বানাতেন। জলরং ও পোস্টার কালারে নিজের মতো করে ছবি আঁকতেন। যখন দশম শ্রেণিতে পড়েছেন তখন প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষা শুরু করেন। তিনি ভর্তি হন Y.W.C.A-এর চার বছর

মেয়াদি চারুকলার ওপর ডিপ্লোমা কোর্সে। পড়াশোনার পাশাপাশি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত এই কোর্সে পড়াশোনা করেছেন। এই সময়ে তিনি পেনসিল স্কেচ, ড্রয়িং, ওয়াটার কালার, উড প্রিন্টিং, অয়েল পেইন্টিং মাধ্যমে ছবি আঁকা শিখেছেন। এঁকেছেন স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ এবং বিমূর্ত ধাঁচের ছবি। নিয়মিত পড়াশোনা অর্থাৎ এস.এস.সি ১৯৯২ সালে এবং এইচ.এস.সি ১৯৯৪ সালে পাস করার পর এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর্ব। পরিবারের আগ্রহ না থাকলেও ফাহমিদা চারুকলায় পড়ার প্রতি অটল ছিলেন ফলে ১৯৯৪–৯৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ) প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হন। যেহেতু চারুকলায় ভর্তির পূর্বেই Y.W.C.A থেকে চারুকলার ওপর চার বছরের Diploma করা ছিল তাই চিত্রাঙ্কনে ছিলেন সহপাঠীদের চেয়ে এগিয়ে। যার ফল হিসেবে ১৯৯৬ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে ‘মিডিয়া বেস্ট’ পুরস্কার অর্জন করেন।

চিত্র ১৩৮ : পেঁপে গাছ, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, টেম্পারা

বি.এফ.এ. (সম্মান) পাঠরত সময়ে ফাহমিদা বিভিন্ন টেকনিকে চিত্র এঁকেছেন। বিশেষত শিল্পী শিক্ষক শওকাতুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে টেম্পারা, সিল্ক পেইন্টিং শিখেছেন। নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে হ্যান্ডমেইড কাগজ তৈরি করে তাঁর ওপর অক্সাই-রং ব্যবহার করে টেম্পারা করেছেন।

চিত্র ১৩৯ : বুদ্ধ, সিল্কের ওপর লাইন ড্রয়িং
৫৪ × ৩৪ সেমি, ২০০০

চিত্র ১৪০ : হাঁস, টেম্পারা, ৫৫ × ৭৭ সেমি, ২০০৮

চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময় তাঁর নিরীক্ষাধর্মী কাজের অবজেক্ট হিসেবে ফুলের রূপ ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে ফুলই সুন্দর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ফুলের আছে নিজস্ব রূপ ও সৌরভ। মাহাত্ম্য হিসেবেও এর ব্যাপ্তি অনেক। কারণ ফুলের পরিণত রূপ ফলে। সৃষ্টির, অর্থাৎ নবজন্মের রঙিন আভাস ফুলে। এই ফুলের সৌন্দর্য তাঁর চিত্রে ফুটে উঠেছে মানুষের জীবনের অনুভূতির সাথে সম্পর্ক রেখে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার নানা ভাবনা-চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতীকী উপস্থাপনে। ১৯৯৮ সালে বি.এফ.এ পাস করার পরে (পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ২০০০ সাল), এম.এফ.এ করেছেন ২০০০ সালে। দীর্ঘ এই শিক্ষাজীবনে তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে ফুল এঁকেছেন। ২০০২ সালে বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে তিনি নিরীক্ষামূলক পুরস্কার পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৪১ : ইমেজ-২ (পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি), জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০২

বলা যায়, ফাহমিদা খাতুন ফুল আঁকার মাধ্যমে শিল্পী সমাজের কাছে পরিচিত। আমাদের পরিচিত নানান ধাঁচের ফুলের চিত্র তাঁর চিত্রে রূপ পেয়েছে। এর মধ্যে নয়নতারা, কলাবতী, গোলাপ, সূর্যমুখী, কৃষ্ণচূড়া, কাঠগোলাপ, অপরাজিতা, জারুল, স্বর্ণচাঁপা, জবা উল্লেখযোগ্য।

তাঁর চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রঙের ব্যবহারে। প্রকৃতিতে যে রঙে ফুলগুলো ফোটে, ফাহমিদা সেই রং ব্যবহার না করে মনের রং ব্যবহার করেন। ফুলের কাঠামোগত উপস্থাপন লক্ষ করলে ফুলকে চিহ্নিত করা সম্ভব। কিন্তু রং ফুলের সঠিক আদল ও প্রজাতি বোঝাতে দর্শককে বিভ্রান্তিতে ফেলে। ২০০২ সালে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীতে রং প্রসঙ্গে আবেদ বহমানের কাছে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা অনেকেই কৃত্রিমতাকে পছন্দ করি—আর তাই আমাদের এ পৃথিবী কৃত্রিমতায় ভরে গেছে। এসব দিক ভেবে আমি আমার চিত্রকর্মে বিভিন্ন ফুলের আসল রঙ না রেখে পছন্দনীয় রঙে রাঙিয়েছি।'[৫১]

চিত্র ১৪২ : Life Reflection-23
৫১ × ৭৭.৫ সেমি, ২০০৭

চিত্র ১৪৩ : Dot from Life-5
জলরং, ৮.৪ × ৫ সেমি, ২০০৬

চিত্র ১৪৪ : Reflection, জলরং
৭৬.২ × ৫০.৮ সেমি, ২০০২

ফাহমিদা তাঁর Life Reflection-23 চিত্রে জারুল ফুলের বেগুনি রঙের বদলে লাল করেছেন। Dot from life-5 চিত্রে কচু ফুলের সাদা রংকে নীল রঙে এঁকেছেন। Reflection চিত্রে স্বর্ণচাঁপা (কাঁঠালিচাঁপা) ফুলকে নীল রঙে এঁকেছেন। কাঁঠালিচাঁপার হলুদ রং দ্বারা রূপ পরিবর্তন করে তিনি মানুষের চরিত্রের রূপায়ণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, "আমার ছবির রং দেখে দর্শক মনে প্রশ্ন জাগে—'কেন এই বিপরীত রং' আমাদের সমাজে নানান ঘটনা ঘটে—যা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এই অস্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে মানুষের প্রশ্ন জাগানো আমার অভিপ্রায়। মানুষের মধ্যে প্রশ্ন করার সাহস এবং সত্যবোধ জাগানো আমার উদ্দেশ্য।" [৫২]

শিল্পী তাঁর ছবিতে ফুলের আকৃতিকে বড়ো এবং ক্লোজআপ করে এঁকেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : ছোট বিষয়কে বড় করে দেখাতে চেয়েছি। আমাদের সমাজের অনেক ঘটনা আমরা দেখি না, আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

অনুভূতির অনেক ছোট ছোট দিক চেতনায় আনি না। এসব ছোট ছোট অনুভূতিকে বড় করে দেখানোই আমার উদ্দেশ্য।[৫৩]

শিল্পী ফাহমিদা খাতুন কয়েকটি সিরিজচিত্রের মাধ্যমে বাস্তব জীবনকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন ফুলের চিত্র এঁকে। উপস্থাপনের বিশেষত্বে রঙের ব্যবহারের বিশেষত্বে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এসব সিরিজচিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, Blue image, Flew up, Image, Dot from life, Life Reflection, Speed of Life, Read Image।

বাগানে আমরা ফুলকে যেভাবে দেখি কিংবা ফুলদানিতে সাজানো ফুল দেখতে যেমন হয়, ফাহমিদার 'ফুল' তাঁর আঁকার মুনশিয়ানায় দৃশ্যমান ফুল থেকে আরো গভীরে নিয়ে যায়। এই ফুল কখনো কবিতা, কখনো গল্প বা গান নিয়ে ক্যানভাসে হাজির। প্রতীকী হয়ে ওঠে মানুষের সুখ-দুঃখ ও প্রেমের *নানামুখীন* উদ্ভাস। 'ফাহমিদা খাতুন শিল্পদৃষ্টিতে যথাযথ কলা-কৌশল ও নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে সমন্বয় করে নিজস্ব আঙ্গিক তৈরি করে চলেছেন।'[৫৪]

ফাহমিদা চিত্রে একটি দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি বলেন, মানুষের জীবন ফুল ও প্রকৃতির মতো সুন্দর। কিন্তু বাস্তবে জীবন এত সুন্দরভাবে কাটে না। তবে আমি বিশ্বাস করি, মানুষ চেষ্টার মাধ্যমে ফুলের মতো জীবন অর্জন করতে পারে।[৫৫]

তাঁর কাজে নীল রঙের প্রাধান্য। তাঁর কাছে নীল হচ্ছে স্বপ্ন। গাঢ় নীল ব্যবহার করেন বেদনা বোঝাতে, কালো রং ব্যবহার করেন শোক বোঝাতে। মানুষের মধ্যে স্বপ্ন, বেদনা, শোক, বিদ্রোহ, ভালোবাসা বোঝাতে বিভিন্ন রঙের ইমেজ ব্যবহার করে আবেদন এনেছেন। ব্লু ইমেজ সিরিজচিত্র প্রসঙ্গে বলেন, 'ব্লু হচ্ছে স্বপ্নের রং। মানুষের মধ্যে স্বপ্নের চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে এই রং বেশি ব্যবহার করেছি।'[৫৬]

চিত্র ১৪৫ : Blue Image-2
জলরং, ৭১.১২ × ৫৮.৪২ সেমি, ২০০১

চিত্র ১৪৬ : A way of thinking
জলরং, ৭৬.২ × ৫০.৮ সেমি, ২০০১

চিত্র ১৪৭ : Keep on eye on
জলরং, ৭৬.২ × ৫০.৮ সেমি, ২০০২

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতি চর্চার ক্ষেত্রে ফাহমিদা খাতুনের নানান বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নির্ণয় করা যায়। তিনি প্রাচ্যশিল্পীদের সাহিত্যনির্ভর বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেননি। বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষের বোধ ও চেতনাকে

রাঙাতে চেয়েছেন প্রতীকী উপস্থাপনায়। প্রাচ্য শিল্পীদের নির্বাচিত বিষয় হচ্ছে প্রকৃতি-প্রেমনির্ভর। যেমন—ফুল, পাখি, রমণী, অপেক্ষা, প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি। ফাহমিদা বিষয় এরূপ সহজ না করে নির্দিষ্ট বিষয়কে হাইলাইট করতে চেয়েছেন। আবার বাস্তবধর্মী ফুলের গঠন অবিকল রেখেও উপস্থাপন ও কম্পোজিশনের বিশেষত্ব ও রঙের বিবরণে আধা-বিমূর্ত ইমেজ তৈরি করেছেন। বাস্তব যেন অধিবাস্তব রহস্যে মায়াবী আবেশ তৈরি করে। ফাহমিদার ছবির রং বিষয়বস্তুর ভাষা তৈরি করে। জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে তিনি বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডমেইড কাগজ ব্যবহার করেছেন। ওয়াশ পদ্ধতির টেকনিকে ফ্লাটধর্মী রঙে ওয়াশ না দিয়ে বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করেছেন কিছু কাজে। অর্থাৎ যে কালার তিনি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যবহার করতেন সেই রঙের কাগজে মূল ড্রয়িংয়ের আলোছায়া দিয়েছেন অন্য রঙে। টেকনিকের ক্ষেত্রে এই সরলীকরণে ওয়াশ পদ্ধতিতে নতুন মাত্রা যোজিত হয়েছে।

চিত্র ১৪৮ : Dot from life-4
কালার পেপারে জলরং
৮৪ × ৬১ সেমি, ২০০৬

চিত্র ১৪৯ : Life Reflection
রঙিন পেপারে জলরং
৭৭.৫ × ৫১ সেমি, ২০০৭

চিত্র ১৫০ : Harmony-6
রঙিন পেপারে জলরং
১৫ × ১০ সেমি, ২০০৭

ফাহমিদা বিশেষ টেক্সচারযুক্ত হ্যান্ডমেইড কাগজে জলরঙের ওয়াশ ব্যবহার করায় রঙের উজ্জ্বলতা এবং ত্রিমাত্রিক ইলিউশন সৃষ্টি হয়। আলাদা করে লাইন না দেয়ায় জলরঙের ধোয়া অস্পষ্টতার মধ্যে বলিষ্ঠ আঁচড় প্রতীয়মান হয়।[৫৭]

শিল্পী ফাহমিদা খাতুনের বিশ্বাস, মানুষের জীবন ফুলের মতো সুন্দর করা সম্ভব। প্রতিকূলতাকে জয় করে মানুষ নিজের জীবন ফুলের মতো তৈরি করতে পারে। তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তা-ই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। প্রাচ্যচিত্রকলার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ। নারী হওয়ার কারণে সংসারের চার দেয়ালে আটকে রাখেননি নিজেকে। প্রতিনিয়ত ছবি আঁকা, শিক্ষকতা করা, ঘর-সংসার দেখা সবই করেছেন আনন্দের সাথে। তিনি ১৯৯৬–২০০১ পর্যন্ত Y.W.C.A প্রতিষ্ঠানে শিশুদের চিত্রকলার শিক্ষক ছিলেন। ২০০৩–২০০৬ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন Sir John Wilson School-এ। শিক্ষকতা করছেন International School Dhaka-তে।

শুধু শিক্ষকতা নয়, অ্যামেচার শিল্পীদের সংগঠন 'পূর্বিতা'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এই সংগঠন মহিলা শিল্পীদের শৌখিন কাজে উৎসাহী করা, বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করত। ইতোমধ্যে এই সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে জাদুঘর ও শিল্পকলা একাডেমিতে প্রদর্শনী করেছেন। ফাহমিদা নেপাল ও ভারতে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। মৃৎশিল্পের প্রতি রয়েছে তাঁর দুর্বলতা। এ মাধ্যমেও কাজ করেন। এ ছাড়া ডিমের খোসার ওপর ডিজাইন (Estar Egg) সেলাই, জুয়েলারি মেকিং প্রভৃতি শৌখিন কাজ করেন অবসরে। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, শিল্পী ফাহমিদা খাতুন মননে ও কর্মে নিজেকে শিল্প-বলয়ে সংশ্লিষ্ট রাখেন সারাক্ষণ।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় ফাহমিদা খাতুনের কাজের বৈশিষ্ট্য ও অবদান প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় :

(ক) বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতির ধারায় তাঁর কাজের বিষয়ে স্বকীয়তা লক্ষণীয়।

(খ) নারীশিল্পীদের মধ্যে যাঁরা প্রাচ্যরীতির কাজকে চর্চা করেন, ফাহমিদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

(গ) তাঁর কাজে জলরঙের বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়।

(ঘ) রঙিন পেপারে আঁকা আঁচড়ে ফুলের আদল তৈরি করা।

(ঙ) চিত্রের রঙের প্রতীকী ব্যবহারে মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে রূপদান করা।

(চ) বুদ্ধিবৃত্তিক চিত্র অঙ্কন, যা প্রাচ্যরীতির শিল্পীদের কাজে কম এসেছে।

মলয় বালা (জন্ম ১৯৭৮)

শিল্পী মলয় বালা (চলমান অভিসন্দর্ভের গবেষক) প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার একনিষ্ঠ অনুরাগী। তিনি ১৯৭৫ সালের ১ জুন (সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর) গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কেটেছে। গ্রামের শ্যামল ঘেরা পরিবেশে প্রকৃতির রৌদ্র-ছায়ার খেলা, ঋতুবৈচিত্র্যের লীলার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। গান শোনা, ফুল-বাগান করা আর খেলাধুলা করা ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। ছেলেবেলায় চারুকলা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা মণ্ডপে তাঁর বাবা রঙিন কাগজ কেটে রকমারি ফুল তৈরি করে সাজাতেন। এক আত্মীয়, যিনি বিয়ের অনুষ্ঠান, পূজামণ্ডপ ও অন্যান্য উৎসবে কাগজের ফুল ও বিভিন্ন নকশা করে সাজাতেন। মলয় সেসব কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হতেন। নিজেকে এমন কুশলী হিসেবে দেখতে স্বপ্ন সাজাতেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সালে এস.এস.সি পাস করার পূর্ব পর্যন্ত এসব কাগজ কাটার কাজ রপ্ত করেন। এরই মধ্যে জানতে পারেন ঢাকাতে ছবি আঁকার জন্য আর্ট কলেজ আছে। স্বপ্ন দেখতে থাকেন আর্ট কলেজে পড়ে শিল্পী হবার। এস.এস.সি পাস করার পর একটি লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই গ্রন্থাগারই ছিল তাঁর থাকার ঘর। সুতরাং সাহিত্যের নানান বই পড়ে আনন্দিত হয়েছেন এই সময়।

১৯৯৫ সালে এইচ.এস.সি পাস করে ঢাকায় আসেন আর্ট কলেজে ভর্তি হবার জন্য। চারুকলায় পড়াশোনার একাডেমিক রীতি আর তাঁর কাগজ কেটে শিল্পী হবার স্বপ্নের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ করলেন। ১৯৯৫–৯৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক শওকাতুজ্জামানের কাছে পেতে থাকেন স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রাচ্যরীতির চিত্রপাঠ। তিনি শওকাতুজ্জামানকে ‘গুরু’ হিসেবে মেনে নেন। প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির জলরং, টেম্পারা, মুরাল টেকনিকে নানা বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তবে গাছের শিকড়-বাকড়ের বিশেষ অংশ প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে এঁকেছেন। ফুলের চিত্র এঁকেছেন পরকীয়া শিরোনামের সিরিজচিত্রে। এ ছাড়া বট-বৃক্ষের ঝুরির মধ্যে মানুষের অবয়ব দিয়ে চিত্র এঁকেছেন।

চিত্র ১৫১ : আলিঙ্গন-১, জলরং, ৩৬ × ৭৪ সেমি, ২০০১

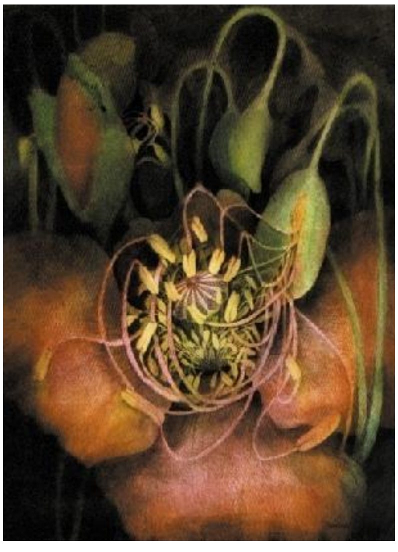

চিত্র ১৫২ : পরকীয়া-২, জলরং

চিত্র ১৫৩ : শকুন্তলা ও প্রিয়ংবদা, জলরং

Dhaka University Institutional Repository

৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০২ ৭০ × ৪৫ সেমি, ২০০২

মলয় বালার গাছের গুঁড়ি প্রকৃতি-শোভার আনন্দরূপ প্রকাশ করে। এর প্রকাশভঙ্গি বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে শিল্পীর অনুভূতিজাত রূপের প্রকাশ।[৫৮] ফুল নিয়ে তিনি যেসব কাজ করেছেন, ফুলের সৌন্দর্যের গভীরে বক্তব্যটাও প্রচ্ছন্ন হয়েছে। পরকীয়া সিরিজচিত্রে ফুলের পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের মিলনরূপ সৌন্দর্য ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। শুধু ফুল নয়, প্রতীকীরূপ হিসেবে ভালোবাসা ও মিলনের শাশ্বত সত্যরূপটি ফুটে উঠেছে। পরকীয়া সিরিজচিত্র প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'পরকীয়া শিরোনামে ফুলের পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের মিলনরূপ সৌন্দর্য নিয়ে কিছু কাজ করেছি। . . . পুংকেশরগুলো অতি লম্বিত ভঙ্গি দিয়ে মিলনের তীব্রতা প্রকাশ করেছি।'[৫৯]

একাডেমিক রীতিতে গাছের গুঁড়ি অঙ্কন করেছেন অনুশীলন পর্বে। এই টেকনিককে কাজে লাগিয়ে স্বকীয় স্টাইল তৈরি করেছেন শকুন্তলা সিরিজচিত্রে। পণ্ডিত কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' কাহিনি তাঁর মনে বিশেষ দাগ কাটে। বটের ঝুরির সৌন্দর্যও তাঁকে দোলা দেয়। বটের ঝুরি ও শকুন্তলার নিরাভরণ রূপ প্রকাশ করেছেন শকুন্তলা সিরিজচিত্রে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> শকুন্তলা কাহিনিতে দৈব ও মানবীয় ঘটনাবলির সংমিশ্রণে যে চিত্ররূপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তির স্বাদ পাওয়া যায়। তাই আমার কাজের সমস্ত নারীকে আমি আমার চিত্রে এক একজন 'শকুন্তলা' করে সাজাই। সে শকুন্তলা কখনো গৃহিণী, কখনো গায়ক-বাদক কিংবা নর্তকী। শিল্পকর্মে শকুন্তলারই আদর্শ ও ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।[৬০]

শকুন্তলা সিরিজচিত্র প্রসঙ্গে জাহিদ মুস্তাফার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি মলয় বালার প্রথম একক প্রদর্শনী প্রাচ্যগৃহ : আমার শিল্পজগৎ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন :

> শকুন্তলার রূপ, তার ভাব লাবণ্য নিয়ে শিল্পী বটবৃক্ষের কাণ্ডে তার অবয়বকে হাজির করেছেন। বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের তুলনা আছে কাব্যে। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বৃক্ষের ভেতর মানুষের শরীরী উপস্থিতির কিছু দৃষ্টান্তও আমরা দেখেছি কারো চিত্রকর্মে। যেগুলো অনেকটা বৃক্ষের মানবিক রূপারোপের মতো। মলয়ের কাজে বৃক্ষের শরীরে, বৃক্ষের কোটরে শকুন্তলা ও প্রিয়ংবদার রূপকাঠামো। সেই রবীন্দ্র চিত্রকলার শুরুর দিককার কবিতা কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে অবয়ব রচনার ঝোঁক যেন তাতে। কিংবা সাম্প্রতিককালের প্রকৃতি নির্ভর ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর তৈরি গাছের শেকড়-বাকড়ের মানবীয় রূপের প্রতিভাস যেন তাতে।[৬১]

শিল্পী মলয় বালা ১৯৯৯ সালে (পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ২০০৩) বি.এফ.এ সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর এম.এফ.এ (১৯৯৯–২০০১) দুই বছরের শিক্ষাবর্ষে সংগীত, নৃত্য এবং শকুন্তলার গল্পের বিষয় নিয়ে চিত্র এঁকেছেন। টেকনিকের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব এঁনেছেন। তিনি লিখেছেন, 'নাচ, গান ও মিউজিক আমার ভীষণ ভালো লাগে। নাচ, গান ও ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের অনুষ্ঠান উপভোগের মধ্যে মানসিক শান্তি পাই। এই অনুষ্ঠান উপভোগের সময়ে যে আনন্দ পাই, তারই প্রকাশ করতে আমার শিল্পকর্মে নাচ, মিউজিকের বিভিন্ন ভঙ্গি থাকে।'[৬২]

নাচ, গানের বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক চিত্রে তিনি অভিন্ন টেকনিক ব্যবহার করেছেন। যে টেকনিকে তিনি উজ্জ্বল ফ্লাট রং ব্যবহার করেছেন, রেখার পরিবর্তে রঙের বিভাজনের সাহায্যেই চিত্রের বিষয়গুলোকে আলাদা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। এসব চিত্র অঙ্কনে তিনি রশিদ চৌধুরীর রং প্রয়োগ ও বিষয় উপস্থাপনাগত দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছেন।

চিত্র ১৫৪ : উচ্চাঙ্গ নৃত্য-১
অ্যাক্রেলিক, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ২০০৬

চিত্র ১৫৫ : মিউজিক-২১, অ্যাক্রেলিক
৫৪ × ৭৪ সেমি, ২০০৬

চিত্র ১৫৬ : উচ্চাঙ্গ নৃত্য-৫
অ্যাক্রেলিক, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৬

উল্লেখ্য, রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন প্রকার রঙিন হ্যান্ডমেইড কাগজের মূল রং রেখে চিত্রের রং বিভাজন করেছেন।

মলয় বালাকে যে কাজের জন্য চেনা যায় তা হচ্ছে তাঁর *শকুন্তলা ও সখীরা* সিরিজচিত্র। এই সিরিজচিত্রের বেশির ভাগ ছবিই বড়ো পরিমাপে আঁকা। সাধারণত জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির চিত্র বড়ো পরিসরে করা সম্ভব নয়। মলয় বালা তাঁর চিত্রের জমিনকে ভাগ ভাগ করে এঁকে নিয়ে পরে জোড়া লাগিয়ে বড়ো করেছেন। এসব ছবিতে বটের ঝুরির বিভিন্ন শিকড়-বাকড়ের ছন্দময় ভঙ্গি ও গতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যায়, বটের ঝুরির মধ্যে একাধিক মানুষের ফিগার নৃত্য-গীত-সংগীতরত অবস্থায় কখনো বা বিভিন্ন অভিব্যক্তিময়। এসব চিত্রে একটা গল্প পাওয়া যায়। যে গল্প শকুন্তলার দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-অভিমান ও সুন্দর দেহভঙ্গিমার কল্পিত রূপ।

চিত্র ১৫৭ : শকুন্তলা ও সখীরা-০১, জলরং, ৭৪ × ১৭৬ সেমি, ২০০৩

মলয় শকুন্তলা গল্পের বনের পরিবেশ ও শকুন্তলার নিরাভরণ সৌন্দর্য বোঝাতে গাছের গুঁড়ির সাথে ফিগারগুলোকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে এঁকেছেন। প্রকৃতি ও মানুষের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বোঝাতেও তাঁর এ

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন দর্শক মনে ভাবনার ছাপ রাখে। শকুন্তলা, শকুন্তলা ও সখীরা, শকুন্তলা ও প্রিয়ংবদা প্রভৃতি সিরিজচিত্র তিনি জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিই শুধু নয়, ফ্রেসকো, টেম্পারা মাধ্যমেও করেছেন। কাগজের ওপর জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির মতোই অ্যাক্রেলিক রঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। দেখে জলরং মনে হয়।

চিত্র ১৫৮ : শকুন্তলা ও সখীরা-০৭, অ্যাক্রেলিক (কাগজে ওয়াশ)
৫৪ × ১৫০ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৫৯ : সংগীত, ফ্রেসকো
৭৬ × ৬০ সেমি, ২০০৬

এম.এফ.এ পড়ার সময়েই মলয়ের কর্মজীবন শুরু হয়। ২০০৬ সালে তিনি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে চারু ও কারুকলা বিষয়ের ইনস্ট্রাক্টর পদে যোগ দেন। ২০০১ সালে এম.এফ.এ পাস করেন (পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ২০০৬ সালে)। এরপর ২০০৮ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে প্রভাষক পদে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সহকারী অধ্যাপক।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিক্ষাকে জাতীয় চিত্রকলার একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁরই চেষ্টায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে Oriental Painting Study Group গড়ে তোলেন এবং ২০০৯ সালে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা দিয়ে জয়নুল গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ২০১০ সালে Oriental Painting Exhibition 2010 আয়োজন করেন এবং ২০১১ সালে Calligrphy Exhibition 2011 আয়োজন করেন।

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা দর্শকদের স্বাদে তুলে ধরতে, জাতীয় চিত্রকলায় প্রাচ্যচিত্রকলার ভূমিকা রাখতে, আমাদের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বহনকারী দেশজ ধারাকে দর্শক সম্প্রদায় ও শিল্পরসিকদের অনুরাগ ও আগ্রহ সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন প্রদর্শনীর কাজ দেখে শিল্পসমালোচকরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ক্যাটালগে মলয় বালার কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। মলয় বালার কাজের মূল্যায়নে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরা হলো :

ড. আব্দুস সাত্তার লিখেছেন :

> বৃক্ষ, বৃক্ষের আকর্ষণীয় কাণ্ড কিংবা কাণ্ডের অংশ, কাণ্ডে লতানো শিকড়ের জাল, বট বৃক্ষের লতানো শিকড় প্রভৃতি মলয় বালার প্রিয় বিষয়। তিনি তার এসব চিত্রকে রঙের মায়াজাল সৃষ্টির মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলেন। বৃক্ষের সাধারণ অংশগুলোকে অসাধারণ করে তোলেন। তার সৃষ্ট শিকড়ের মাঝে নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্যেরও সন্ধান মেলে যা দর্শক হৃদয়ে বিশেষ অনুভূতির জন্ম দেয়। দর্শককে করে তোলে অনুসন্ধানী। বৃক্ষের এই বিশেষ বিষয় ছাড়াও মলয় বালা আর সবার মত নানা বিষয় নিয়ে চিত্রাঙ্কন করে দর্শক দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন।[৬৩]

জাহিদ মুস্তাফা লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

মলয় বালার চিত্র-রচনার আবহে এক ধরনের দৃশ্যসজ্জা দেখি, যা তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় বহন করে। প্রাকৃতিক আবহের সাধারণ দৃশ্যাবলী নয়, তিনি মঞ্চের মতো আবহ তৈরি করেন। ফলে শরীরকাঠামো, আলোছায়া ও দৃশ্যসজ্জা মিলিয়ে এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়।[৬৪]

Ershad Kamol লিখেছেন :

Speciality of Mala's works remains in his power of imagination, use of vibrant colours and use of new mediums. Usually oriental artists use water colour in wash mediums, however, Malay has created a few washes in acrylic. His works are certainly in sition is dealing with sub-continental classics . . . like many oriental artists, Malay also has featured the blissful beauty of female forms in his classical music and classical dance series. Here too Malay is exceptional in his use of colours and bold lines.[৬৫]

সঞ্জয় দে রিপন লিখেছেন :

শিল্পী মলয় বালা প্রকৃতির মাঝে যে সুন্দরকে উপলব্ধি করেছেন, যে সুন্দরকে ধরতে চেয়েছেন, যে সুন্দরকে যত্ন করে সৃষ্টির ছন্দে সুর তৈরি করেছেন, সেই সুরের অনুসরণে তাঁর চিত্রমালাগুলো হয়ে উঠেছে বাঙালিপনার সম্পদ। শিল্পী মলয় বালা বাঙালি শিল্প ধারার রূপকে অবগাহন করেছেন। কোথাও নিঃস্তব্ধ স্বপ্ন, কোথাও একটু হতাশার মাঝে শান্তি খুঁজে বেড়ানো, কোথাও একটু স্বস্তি খুঁজে পাওয়া যায় রং-এর ওয়াশে। গাছের গুঁড়ির সাথে, লতাপাতার সাথে, মূলের সাথে নারী ফিগারকে যতটা আবেদনময় করে তুলেছেন সেখানে প্রত্যেকটি ফিগারে আনুপাতিক বিশ্লেষণের তেমন কোন ঘাটতি নেই। এক প্রকার আচ্ছন্নতা থাকলেও মানবীর সাথে বৃক্ষের সম্পর্কটা, তুলনাটা সর্বোপরি সাদৃশ্য স্থাপন করেছেন শিল্পী মলয় বালা।[৬৬]

শিল্পী মলয় বালা তাঁর চিত্রে কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটান। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তথ্যের চেয়ে সত্যকেই বেশি খোঁজে।[৬৭] নিজের শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

মানুষ প্রকৃতি জগৎ থেকে যা গ্রহণ করে, তাই নিজের মতো করে প্রকাশ করে তার সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে। সুতরাং আমার প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে আমার শিল্পকর্মে। . . . আমার মনে হয় এই প্রকাশ আমার সামগ্রিক জীবনের অনুভূতির যোগফল। যে অনুভূতি আমার জন্ম থেকে এ পর্যন্ত বেড়ে ওঠার মধ্যকার সঞ্চয় থেকে সঞ্চিত হয়েছে। প্রকৃতির সীমাহীন বৈভবের কাছে আমি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র হলেও জীবন চলার পথে যে অভিজ্ঞতা ও সুন্দরের অনুভূতি কিংবা নস্টালজিক স্মৃতি সবই প্রকৃতি থেকে। বিষয় প্রকাশে, চিন্তা প্রকাশে সেই স্মৃতি, অপেক্ষাকৃত আবেগময় স্মৃতির পরিমার্জিত কিংবা পরিবর্ধিত রূপই আমার শিল্পকর্মে প্রকাশ পাচ্ছে।[৬৮]

উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী মলয় বালার চিত্রকলায় নিম্নলিখিত গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারি :

(ক) তিনি তাঁর অধিকাংশ কাজে আলাদা করে লাইন ব্যবহার করেননি। রঙের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও বিন্যাসে প্রাচ্যচিত্ররীতির রৈখিক গুণ ধরা পড়েছে।

(খ) তাঁর চিত্রকলা বাস্তবতাকে অনুসরণ করেও বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অধিবাস্তব অনুভূতির দিকে নিয়ে যায়।

(গ) অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করেছেন ওয়াশ পদ্ধতিতে।

(ঘ) ওয়াশ পদ্ধতিতে বৃহৎ আয়তনের কাজ করেছেন।

(ঙ) দেশজ রীতির ঐতিহ্য অনুসারে মিথনির্ভর চিত্রকলা এঁকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) তিনি চিত্রে নির্মল আনন্দটুকু ধরতে চেষ্টা করেছেন।

(ছ) বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার চর্চায় Oriental Painting Study Group সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

ওমর শাহজাহান (জন্ম ১৯৭৯)

শিল্পী মোঃ ওমর শাহজাহান বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারার শিল্পী। তিনি ১৯৭৯ সালের ১২ জুলাই দিনাজপুরের বীরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বীরগঞ্জের জগদল মফস্বলে কেটেছে তাঁর শৈশব। তিনি ১৯৯৫ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৯৮ সালে এইচ.এস.সি পাস করার পর ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে বি.এফ.এ সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। এখানে তিনি দ্বিতীয় বর্ষে প্রাচ্যকলা গ্রুপে ভর্তি হন।

শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন প্রাচ্যচিত্রকলার তরুণ মেধাবী শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারীকে। বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুশান্ত কুমার অধিকারী ওয়াশ পদ্ধতির ঘরানায় রাজশাহীর প্রাচ্যকলা গ্রুপে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম পুরুষ। তাঁর ছাত্ররাই রাজশাহীতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্র চর্চা করে বাংলাদেশের চিত্রকলার অঙ্গনে অবদান রেখে আসছেন।

ওমর শাহজাহান ২০০৩ সালের বি.এফ.এ সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন ২০০৪ সালে। এই সময়কালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যধারায় চিত্রচর্চা করে সুনাম অর্জন করেছেন। রাজশাহীর চারুকলার প্রাচ্যকলা বিভাগে যেসব ছাত্র চিত্রচর্চায় নিজস্বতা বজায় রেখে চিত্রচর্চা করেছেন, ওমর শাহজাহান তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই যে পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠেন সেই পরিবেশের বিষয়াবলি তাঁর নান্দনিক সৃষ্টিতে প্রভাব রাখে। ওমর শাহজাহানের চিত্রকর্মের বিষয় হয়ে বারবার উঠে এসেছে গ্রামবাংলার প্রকৃতি, মানুষ, সামাজিক উৎসব ও জীবজন্তু। এসব বিষয়কে রূপায়ণ করতে বেছে নিয়েছেন প্রাচ্যরীতির জলরঙের ওয়াশ টেকনিক, টেম্পারা, ফ্রেসকো। এ ছাড়া মিশ্র মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সচার তৈরি করে নিজের অনুভূতিতে রঙের মায়াবী মাধুর্যে সাজিয়েছেন। তাঁর জলরঙে ওয়াশ পদ্ধতির চিত্রে শিল্পী শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। হালকা রঙের ওয়াশে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতি শিরোনামের চিত্রটি ২০০৬ সালে অঙ্কিত। তাঁর কোনো ছবিতেই স্বাক্ষর নেই। কেন স্বাক্ষর নেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি আমি যেসব ছবি আঁকছি তা নিজের স্বাক্ষর করার মতো উঁচু মানের হয়নি। তাই স্বাক্ষর করি না।'[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা তাঁর অন্য একটি ছবি 'পলাশ চত্বর'। রাজশাহী চারুকলা বিভাগের পলাশ চত্বর নিয়ে তাঁর কাজ। পাশ্চাত্য ধারার জলরঙে সাধারণত ল্যান্ডস্কেপের দৃশ্যগুলোকে বাস্তব করে আঁকা হয়। শিল্পী ওমর শাহজাহান বেঙ্গল স্কুলের রীতি মেনে নিয়ে ল্যান্ডস্কেপের এই দৃশ্যকে অন্তরে ধারণ করেছেন এবং নিজের ধ্যানস্ত অনুভূতি সহযোগে ইনডোর স্টুডিয়োতে জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে চিত্রটি এঁকেছেন। শিল্পী পলাশ চত্বরকে যেভাবে অনুভব করেছেন সেভাবেই রূপায়ণ করেছেন। চিত্রের জমিনে ডিম্বাকার ক্ষেত্র আলাদা করে পলাশ গাছ। এতে বাইরের নিসর্গকে ওয়াশের আলতো তুলি বুলিয়ে পাতার গ্রুপ এঁকেছেন, যা প্রাচ্যচিত্ররীতির পরিচয় বহন করে। তিনি নিসর্গচিত্রের আরো অনেক চিত্র এঁকেছেন মোগল মিনিয়েচার রীতির টেম্পারা পদ্ধতিতে। মোগল মিনিয়েচার রীতির নিসর্গ চিত্রণের ধরনে তিনি এঁকেছেন 'নিরীক্ষাধর্মী প্রকৃতি' চিত্রটি। এ চিত্রটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৭ সালের বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা গ্রুপে নিরীক্ষামূলক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে।

চিত্র ১৬০ : প্রকৃতি, জলরঙে ওয়াশ
৪০ × ৫৫ সেমি, ২০০৬

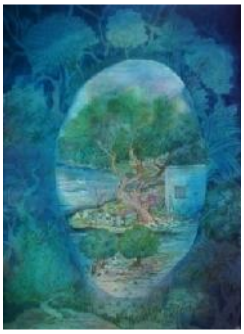

চিত্র ১৬১ : পলাশ চত্বর
জলরঙে ওয়াশ, ৪০ × ৪৫ সেমি, ২০০৬

চিত্র ১৬২ : নিরীক্ষাধর্মী প্রকৃতি, টেম্পারা
৪০ × ৪৫ সেমি, ২০০৭

এ ছাড়া ফ্রেসকো পদ্ধতির চিত্রেও প্রকৃতি এঁকেছেন। টেম্পারায় এঁকেছেন শৈশব স্মৃতির স্কুলজীবন এবং বাংলার সংস্কৃতির নানা বিষয়। এর মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান তাঁর তুলিতে রূপায়িত হয়েছে গাজীর পটের দৃশ্য বিভাজনের আদলে। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় তাঁর এসব কাজ অনুশীলনধর্মী। বিষয় এবং টেকনিকে একান্ত নিজস্ব উদ্ভাবনী গড়ে ওঠেনি। তবে মিশ্র মাধ্যমে তাঁর কাজগুলো ইতিমধ্যে জাতীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। মিশ্র মাধ্যমের টেকনিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা গ্রুপে তিনি শেখেননি। শিখেছেন শিল্পী তরুণ ঘোষের নিকট একটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে।

মিশ্র মাধ্যম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মিশ্র মাধ্যম আমার প্রিয় মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম। মিশ্র মাধ্যমে রং নিয়ে সচেতন অবচেতনে খেলা করা যায়।'[৭০] ওমর শাহজাহানের মিশ্র মাধ্যমের কাজগুলোর রং প্রয়োগে ওয়াশ টেকনিকের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। আধা বিমূর্ত সিরিজের এসব চিত্র তিনি তেলরং, জলরং, অ্যাক্রেলিক মিশিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ তৈরি করে এঁকেছেন। এসব চিত্রের বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতির ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে। এই মিশ্র মাধ্যমের চিত্রে শিল্পীর নিজস্ব বিষয় ও আঙ্গিক আলাদা করা যায় না।

নিজের অতৃপ্ততার জন্য তিনি তাঁর ছবিতে স্বাক্ষর না করলেও শিক্ষানবিশ সময়ে তাঁর ওয়াশ পদ্ধতির মোগল শৈলীর নিসর্গচিত্রগুলো টেকনিক ও বিষয়ের দিক থেকে সম্ভাবনাময়। কিন্তু প্রকরণের সহজীকরণের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে মিশ্র মাধ্যমের চর্চায় যেসব চিত্র তিনি করছেন, তা পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি থেকে আলাদা করা কঠিন। মূলত প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে টেকনিক ও উপস্থাপনার ওপর। প্রাচ্যের পরম্পরার টেকনিককে বজায় রেখেই আধুনিকতার দাবি মেটাতে হবে নব নব উদ্ভাবনায়। সেক্ষেত্রে শিল্পী ওমর শাহজাহানের ওয়াশ মাধ্যমে প্রকৃতি অঙ্কন এবং মোগল মিনিয়েচার শৈলীর টেম্পারার প্রকৃতি অঙ্কন নিঃসন্দেহে শিল্পের রস সৃষ্টিতে নবমাত্রা যুক্ত হয়েছে। তবে জাতীয় পর্যায়ের মিশ্র মাধ্যমের সহজ প্রয়োগ এবং প্রতিযোগিতার পাল্লায় নিজের ঐতিহ্য ছেড়ে সবার মাঝে ডুবে গেলে প্রাচ্যশৈলীর স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে।

উপরোল্লখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী ওমর শাজাহানের চিত্রকলায় নিম্নলিখিত গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারি :

(ক) গ্রামবাংলার নিসর্গ চিত্রণ করেছেন জলরং ওয়াশ পদ্ধতিতে।

(খ) মিশ্র মাধ্যমে টেক্সচার ব্যবহার করেছেন।

(গ) মোগল মিনিয়েচার দৃশ্যচিত্রের আদলে নিরীক্ষাধর্মী প্রকৃতিচিত্র এঁকেছেন।

গৌতম কুমার বিশ্বাস (জন্ম ১৯৮০)

শিল্পী গৌতম কুমার বিশ্বাস রাজশাহী চারুকলার প্রাচ্যকলা গ্রুপের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র। তিনি মাগুরা জেলার শালিখা থানার বৌপাবাইশা গ্রামে ১৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় বিভিন্ন পাতা, ফুল এবং রান্নার হলুদ দিয়ে মনের আনন্দে ছবি আঁকতেন। এই ছবিগুলো এঁকে এঁকে ঘরের দেয়াল ও দরোজায় সেঁটে রাখতেন। স্কুলশিক্ষক পিতা এই চিত্র দেখে খুশি হতেন। বলতেন, ‘তোকে আর্ট কলেজে ভর্তি করাব।’

১৯৯৫ সালে গৌতম এস.এস.সি পাস করে কলেজে পড়ার সময় ঝিনাইদহের কালিগঞ্জে একটি সাইনবোর্ডের দোকানে কাজ শেখেন। এখানে তিনি সুন্দর হাতের লেখা এবং প্রতিকৃতি অঙ্কন, ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কনের পাঠ নেন অ্যামেচার আর্টিস্টের কাছে। উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে ছবি আঁকতে পারা। ১৯৯৭ সালে এইচ.এস.সি পাস করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৯৮–৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাচ্যকলা গ্রুপে শিক্ষা নিতে শুরু করেন। তখন রাজশাহীতে প্রাচ্যকলার একমাত্র শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারী। গৌতম প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে ফিগারেটিভ চিত্র এঁকে অর্জন করেন চারটি পুরস্কার। এই পুরস্কারগুলো পেয়েছেন রাজশাহী চারুকলা বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে। গৌতমের প্রাচ্যরীতিতে

Dhaka University Institutional Repository

জলরঙে অঙ্কিত সিরিজচিত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ বিদ্যমান। এসব চিত্রের বিষয় হিসেবে এসেছে সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজের অশুভ দিকগুলো। অর্থাৎ এই সিরিজচিত্র মেসেজধর্মী। প্রাচ্যরীতির বিষয়চিন্তায় সমসাময়িক মেসেজধর্মী চিত্র অঙ্কন কম হয়েছে। সাধারণত একাডেমিক রীতিতে নারী ও প্রকৃতির কোমল রূপ ও মাধুরীপূর্ণ আবেশ তৈরি করেছেন শিল্পীরা। কিন্তু গৌতম তাঁর কাজে নারীর রূপ বর্জিত হয়ে কিছুটা বিকৃত ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। 'কেন তিনি এমন ফিগার এঁকেছেন' এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমার আঁকা ফিগরেটিভ চিত্রগুলোর নাক-চোখ সুললিত ঢং-এ হতো না। সুশান্ত স্যার আমার এই অঙ্কন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আঁকতে পরামর্শ দেন। তিনি এ-ও বলেন, তোমার উপস্থাপন শিশু চিত্রকলার অনুরূপ হলে ভালো হয়।'[৭১]

বি.এফ.এ পড়ার সময় তিনি *টেরর* সিরিজ নিয়ে কাজ করেছেন। এ সিরিজচিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করেছেন। চিত্রগুলো জলরঙের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগে সম্পন্ন করেছেন। এই সিরিজচিত্রের ব্যবহৃত ফিগারগুলোতে শিশুসুলভ অঙ্কন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

চিত্র ১৬৩ : টেরর-১
গোয়াশ, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৬৪ : টেরর-২
গোয়াশ, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৬৫ : টেরর-২
গোয়াশ, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

শিল্পী *টেরর* সিরিজ প্রসঙ্গে বলেন, 'এই সিরিজচিত্রে আমি সমসাময়িক রাজনীতি ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছি। সমাজের এক শ্রেণির মানুষের হিংস্র ব্যবহার এবং শোষিত মানুষদের ভয়, ক্ষোভজনিত চেহারার অভিব্যক্তি কাল্পনিক ফিগারের উপস্থিতিতে তুলে ধরতে চেয়েছি। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন তার চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেই পরিবর্তিত অভিব্যক্তির প্রকাশ করেছি।'[৭২]

বি.এফ.এ (সম্মান) শিক্ষানবিশ সময়ে তিনি 'স্বপ্ন এবং উপভোগ' শিরোনামের সিরিজচিত্র অঙ্কন করেন, যা জাতীয় নবীন চারুকলা প্রদর্শনীতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই সিরিজচিত্রে তিনি নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইভ টিজিং বিষয়কে তুলে ধরেছেন ফিগারের উল্লম্ব ও আনুভূমিক উপস্থাপনে। এই চিত্রে চোখ বিশেষ কোনো স্থানে আটকে না থেকে সারা জমিনে ঘুরে ঘুরে আসে আর গৌতমের প্রকাশিত গল্পকাহিনি অনুধাবন করে।

এই চিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে আকারের বিশালত্ব। ৩০" × ২২" সেমি সাইজের চারটি হ্যান্ডমেইড কাগজকে যুক্ত করে মূল ক্যানভাস তৈরি করেছেন। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় এমন বিশাল ক্যানভাসে চিত্র অঙ্কন খুব কম লক্ষ করা যায়।

গৌতমের এম.এফ.এ পড়াশোনার সময়ে তাঁর টেকনিকে আরো কিছু নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। জলরঙের ওয়াশে চিত্র অঙ্কনের পর কাগজ ঘষে ঘষে সাদা টেক্সচার বের করে হাইলাইট বের করে আনতেন। চিত্রের মধ্যে কোথাও ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেছেন। চিত্রতলে এমন টেক্সচার ও ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীর কাজের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত।

২০০৫ সালে যশোরে শিল্পী তরুণ ঘোষের ওয়ার্কশপ করে তাঁর কাজের টেকনিকে পরিবর্তন আনেন। শিল্পী তরুণ ঘোষ বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে জমিনে টেক্সচার ও রঙের আবহ তৈরি করতে শেখান। এরপর জমিনে রঙের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রং দিয়ে, টোন দিয়ে ড্রয়িং করতে শেখান। গৌতম তাঁর বিষয় ও ফিগারগুলোকে মিশ্র মাধ্যমে উপস্থাপন করে সমসাময়িক বাস্তবতায় অনেক সিরিজচিত্র অঙ্কন করেন। যার মধ্যে ষড়যন্ত্র, হিংস্রতা, সমসাময়িক বাংলাদেশের পরিস্থিতি সিরিজচিত্র উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১৬৬ : স্বপ্ন এবং উপভোগ
জলরং, ২০০৪

চিত্র ১৬৭ : সমসাময়িক রাজনীতি
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি

চিত্র ১৬৮ : সমসাময়িক বাংলাদেশের পরিস্থিতি-১
মিশ্র মাধ্যম, ৯১ × ৮১ সেমি, ২০০৬

এম.এফ.এ পড়ার সময় তিনি ফ্রেসকো চিত্র এঁকেছেন। এই ফ্রেসকো চিত্রের বিষয়চিন্তা ও ফিগারের উপস্থাপনা একই রকম। কিন্তু তাতে টোনাল গ্রেড ব্যবহৃত হবার কারণে থ্রি-ডাইমেনশনাল ইলিউশন তৈরি হয়েছে। ফ্রেসকো চিত্র এবং শিল্পী তরুণ ঘোষের টেকনিকে মিশ্র মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রে প্রাচ্যরীতির দ্বিমাত্রিকতার পরিবর্তে ত্রিমাত্রিক ইলিউশনের প্রাধান্য এসেছে। ফলে এই কাজগুলো জাতীয় ও এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে পাশ্চাত্যরীতির পেইন্টিংয়ের বিচারে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের করণ-কৌশল নিজের মতো ব্যবহার করতে গিয়ে ওই মাধ্যমকে আত্মস্থ করে প্রাচ্যরীতির ভাব বজায় রাখতে পারেননি।

শিক্ষানবিশ সময়ে গৌতম জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে আরো কিছু কাজ করেছেন। যার মধ্যে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ, দ্বিমাত্রিকতা, উপস্থাপন কৌশলের বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৬৯ : পথশিশু, জলরং
৩৮ × ৫৪ সেমি, ২০০২

চিত্র ১৭০ : রাতের বেদেনি, জলরং
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

গৌতমের কাজে অতিবাস্তববাদ (সুরিয়ালিজম) লক্ষ করা যায়। তাঁর কাজে উড়ন্ত মানুষ, পাখাযুক্ত মানুষ, প্রজাপতি, সাপ, ফুল, মাছ সিম্বল হিসেবে আসে। ফ্রয়ডের পরবাস্তববাদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানুসারে এসব কাজে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের অনভূতির আখ্যান রচিত হয়েছে। প্রাচ্যরীতির জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতি ও স্বপ্নীল নীল রঙের ব্যবহারে তাঁর কাজ শিল্পরসে ভরপুর।

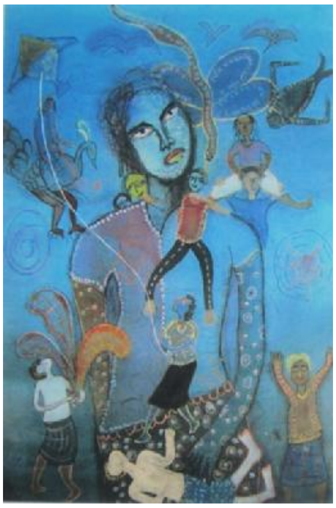

চিত্র ১৭১ : পঙ্খীরাজ
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৭২ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা-১
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৭৩ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা-২
৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪

একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করে গৌতম জীবনযুদ্ধে গতি ঠিক রাখতে স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। ফলে স্বাভাবিক শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারছেন না দীর্ঘসময় ধরে। বাস্তবতার এই কশাঘাতে সম্ভাবনাময় অনেক শিল্পীই হারিয়ে যাচ্ছেন শিল্পচর্চার ভুবন থেকে।

শিল্পী গৌতম কুমার বিশ্বাসের শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

(ক) প্রাচ্যরীতির চিত্র নির্মাণ করেছেন বৃহৎ আয়তনে।

(খ) বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে সমসাময়িক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অশুভ প্রেক্ষাপট।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) প্রাচ্যরীতির চিত্র এঁকেছেন পাশ্চাত্যের সুরিয়ালিজম আঙ্গিকে।

(ঘ) বীভৎসতা, হিংস্রতা ও অশুভ স্বপ্নের ছবির মধ্যেও প্রাচ্যরীতির দ্বিমাত্রিকতা ও বর্ণিকাভঙ্গের মাধুর্য যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন।

উপরোক্ত গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও তাঁর মিশ্র মাধ্যমের কিছু কাজের টেকনিকে টেক্সচার ব্যবহারে এবং ত্রিমাত্রিক ইলিউশনের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে কাজগুলোকে পাশ্চাত্যের আঙ্গিক থেকে আলাদা করা যায় না। সেক্ষেত্রে এটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্র চর্চায় নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।

কান্তিদেব অধিকারী (জন্ম ১৯৮০)

শিল্পী কান্তিদেব অধিকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক। প্রাচ্যকলা বিভাগের ছাত্র থাকা অবস্থায় কান্তিদেব অধিকারী একাডেমিক কাজের দক্ষতায় আলোচিত ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালের ২৬ আগস্ট নড়াইল জেলার কাঁঠালবাড়ীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নড়াইলের চিত্রা নদী, বিস্তীর্ণ মাঠ তাঁর বাল্যস্মৃতির বিরাট অংশজুড়ে ভর করে আছে। তাঁর বাবা বলদেব অধিকারী স্বশিক্ষিত চিত্রশিল্পী। কাকা সুশান্ত কুমার অধিকারী বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। অর্থাৎ পারিবারিক সূত্রেই তিনি শিল্পকে অনুভব করতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড়ো যে দিক তা হচ্ছে, শৈশব ও কৈশোরে শিল্পী এস.এম সুলতানের সাহচর্য পেয়েছিলেন। সুলতানের শিশুস্বর্গ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। চিত্রশিল্পের শিক্ষা পেয়েছেন শিল্পী এস.এম সুলতানের কাছে।

শিল্পী বলদেব অধিকারী ছেলের খেলাধুলার চেয়ে ছবি আঁকতে বেশি উৎসাহ দিতেন। ফলে আঁকাটাই ছিল কান্তিদেবের ছোটবেলার খেলা।[৭৩] আর খেলার মাঠে খেলায় অংশগ্রহণ না করে খেলোয়াড়দের ছবি আঁকতেন। কখনো বাবা ড্রইং করে দিতেন, কান্তিদেব রং করতেন, কখনো হাশেম খানের আঁকা পাঠ্য বইয়ের ইলাস্ট্রেশন থেকে অনুকরণ করতেন, কখনো বাংলাদেশ টেলিভিশনে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের ছবি আঁকা বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে ছবি আঁকতে চেষ্টা করতেন। এভাবেই ছেলেবেলায় পড়াশোনার চেয়ে চিত্র আঁকা মুখ্য বিষয় হয়েছিল কান্তিদেবের।[৭৪]

সুলতানের শিশুস্বর্গ স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় সুলতানের কাছে ছবি আঁকা শেখা, সুলতানের জন্মদিন উপলক্ষে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া এবং সুলতানের চিত্র আঁকার সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে কান্তিদেব অধিকারীর শিল্পী হবার ইচ্ছাটা ছেলেবেলাতেই পাকাপোক্ত হয়েছিল।[৭৫] এ ছাড়া কাকা সুশান্ত কুমার অধিকারীর কাছে শিখেছেন প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা অঙ্কনের করণ-কৌশল। এভাবে পড়াশোনা ও ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে কান্তিদেব চিত্রাঙ্কনের ভিত পাকাপোক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কান্তিদেব ১৯৯৫ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৯৭ সালে এইচ.এস.সি পাস করেন। এই সময়ের মধ্যে পেনসিল, জলরং, কালি-কলম, প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির জলরঙে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

চিত্র ১৭৪ : হাটুরে, পেনসিল ড্রয়িং
২০ × ১৪ সেমি, ১৯৯৪

চিত্র ১৭৫ : ভিক্ষুক
পাটকাঠির কলম ও কালি
৪৭ × ৩০ সেমি, ১৯৯৩

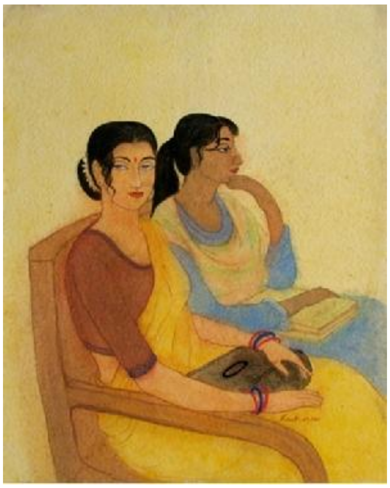

চিত্র : ১৭৬, জলরং, ৫৮ × ৪৫ সেমি, ১৯৯৭

এইচ.এস.সি পাসের পর চারুকলায় ভর্তি হবার জন্য ঢাকা চলে আসেন। ১৯৯৭–৯৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অর্জন করেন এবং পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির কোমল চিত্রের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রাচ্যকলা আমাদের ঐতিহ্যের অর্থাৎ নিজস্ব চিত্রধারা বলেই কান্তিদেব প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৭৬] অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষাজীবনে কান্তিদেব অধিকারী একাডেমিক চিত্রচর্চায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর চিত্রের বিষয় ছিল প্রকৃতি ও মানুষ। প্রকৃতির পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের জীবনাবস্থা, ফুলের সৌন্দর্য এবং নারীর বিভিন্ন অভিব্যক্তি। বিভাগীয় একাডেমিক কাজে দক্ষতার জন্য তিনি চারুকলার বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে ১৯৯৯ সালে পেয়েছেন শিল্পী সৈয়দ শফিকুল আমীন স্মৃতি পুরস্কার। ২০০৩ সালে পেয়েছেন প্রাচ্যকলা বিভাগে জলরঙে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম পুরস্কার ও ২০০৪ সালে পেয়েছেন কাজী আবদুল বাসেত স্মৃতি পুরস্কার।

চিত্র ১৭৭ : স্টাডি, জলরং ও পেনসিল, ৫৫ × ১১৪ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৭৮ : অনিশ্চিত জীবন-১, কাগজে জলরং
৭৬ × ৫৫ সেমি, ২০০০

চিত্র ১৭৯ : অনিশ্চিত জীবন-৩, কাগজে জলরং
৫৫ × ৩৮ সেমি, ২০০৩

পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের জীবনাবস্থা ছিন্নমূল শিশুজীবনের রূপক হিসেবে এঁকেছেন শিল্পী। উদ্ভিদের প্রাণ আছে। প্রাণময় পরজীবী উদ্ভিদের বেঁচে থাকার প্রতিকূলতা, অবহেলিত অবস্থার সাথে শিল্পী ছিন্নমূল শিশুদের একাত্ম করে দেখেছেন। পরজীবী উদ্ভিদের মাটির সাথে সম্পর্ক থাকে না। রুক্ষ ও কঠিন দেয়ালে এবং অন্য জীবিত কিংবা মৃত গাছের আশ্রয়ে বেঁচে থাকে। মানুষ এসব উদ্ভিদকে আগাছা মনে করে বেড়ে উঠতে দেয় না। ঠিক একইভাবে ছিন্নমূল শিশুদেরও শেকড়ের অর্থাৎ তাঁদের পারিবারিক পরিচয় নেই। সুবিধাবঞ্চিত হয়ে অনিশ্চিত জীবন যাপন কনে। শিল্পী কান্তিদেব অধিকারীকে এই ভাবনাগুলো ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাই তিনি প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে অনিশ্চিত জীবন, *জীবন অতো সোজা নয়* এবং *জীবন শিরোনাম*-এ চিত্র এঁকেছেন।[৭৭]

চিত্র ১৮০ : অনিশ্চিত জীবন-৪, জলরং
৫৬ × ৩৩ সেমি, ২০০৫

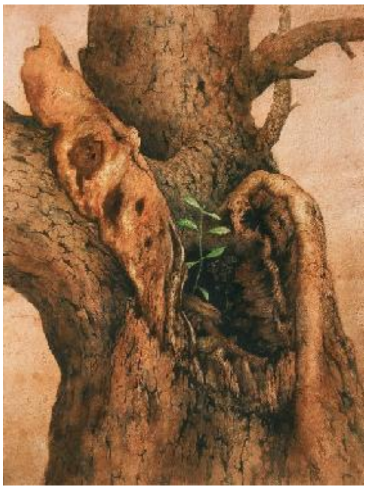

চিত্র ১৮১ : অনিশ্চিত জীবন-২, জলরং
৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯

চিত্র ১৮২ : অনিশ্চিত জীবন-৫
জলরং , ৫৬ × ৩৩ সেমি, ২০০৫

কান্তিদেব পরজীবী পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ হিসেবে বিভিন্ন প্রজাতির মাশরুম, ফার্ন, বটের চারা, জাম গাছের চারা প্রভৃতি বেছে নিয়েছেন। তাঁর বাস্তবধর্মী উপস্থাপনায় বিষয়ের অন্তর্নিহিত গভীরতায় যাওয়ার পূর্বে দর্শকের দৃষ্টি অবজেক্টের সুদৃশ্যায়নের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। এতে দর্শক এক ধরনের চোখের শান্তি ও মনের

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি অনুভব করতে পারে। বিষয়ের গভীরতায় গেলে দর্শক খুঁজে পায় বাস্তব অবস্থার জীবন-দর্শন। যে দর্শন প্রকৃতি ও মানুষের জীবন বাস্তবতাকে একসূত্রে আবদ্ধ করে। কান্তিদেব লিখেছেন :

> ফুটপাতে ফুটফুটে অনেক শিশুই জন্মায়। তাদের জীবন অনেকটা ঐ পরগাছা বা পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের মতই। তারাও সমাজে অবাঞ্ছিত, অবহেলার পাত্র। তাদের জীবনও নিশ্চিত নয়। কেউ তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠায় সহযোগিতা করতে চায় না। তারা সুবিধাবঞ্চিত শিশু হয়েই থাকে। নিতান্তই শখের বশে কোনো একজন প্রকৃতিপ্রেমী যেমন পরগাছাকে বাসার টবে এনে লাগায়, তেমনি কিছু এনজিও হয়তো সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেটা কত দিন? প্রজেক্টের টাকা শেষ হতে বেশি দিন লাগে না। অবজ্ঞা, অবহেলা, অভাবের কারণে তারাও হয়তো একদিন শেষ হয়ে যায়। আমার 'অনিশ্চিত জীবন, জীবন অতো সোজা নয়' এবং 'জীবন' নামের সিরিজ ছবিগুলোতে এ কথাটাই আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি।[৭৮]

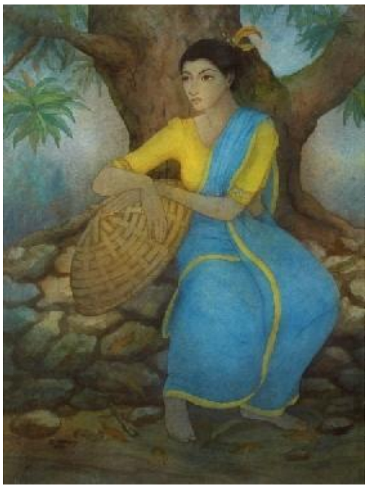

চিত্র ১৮৩ : অপেক্ষারত রমণী-৪
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি

চিত্র ১৮৪ : অপেক্ষারত রমণী-৫
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি

চিত্র ১৮৫ : অপেক্ষারত রমণী-৬
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি

কান্তিদেব নারী চিত্রণে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। একাডেমিক প্রাচ্যরীতির জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির কাজে ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ অনুযায়ী রূপ-লাবণ্য-ভাব আনতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিত্রে নারী এসেছে বিভিন্ন রূপে। কেউ গ্রামের সাধারণ মহিলা, নতুন বউ, শহরের ফ্যাশন সচেতন রমণী ও কিশোরী। এ ছাড়া নারী ও পাখির ভালোবাসারত চিরন্তন রূপ, বেদেনি জীবনের বিভিন্ন অন্তঃকথন এঁকেছেন। তাঁর নারী চিত্রণে *অপেক্ষা* সিরিজে গ্রামের গাছতলায় অপেক্ষারত নারীর চিরন্তন রূপ ফুটে উঠেছে। এই নারীর পরিপাটি পোশাক ও সাজগোজ মফস্বল শহরের আবহের ইঙ্গিত দেয়। তিনি মোবাইল ব্যবহৃত কিশোরী ও নারীর অনেক চিত্র এঁকেছেন, যা সমকালের বাস্তব অবস্থারই প্রতিরূপ। অর্থাৎ তাঁর চিত্রের অতীতচারিতায় ভাবাবেশ নেই, আছে সমসাময়িক জীবন ব্যবস্থার প্রতিরূপ। যা দেখে বর্তমান সময়কেই চিহ্নিত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

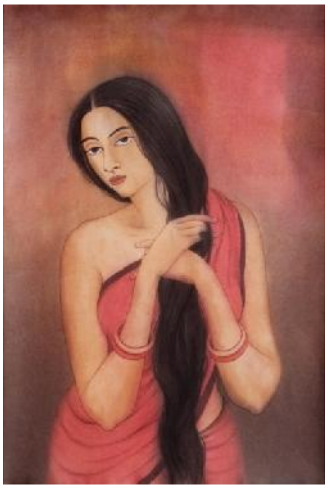

চিত্র ১৮৬ : স্নানের পরে, জলরং
৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৪

চিত্র ১৮৭ : ফুল-১১, জলরং
৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৮

চিত্র ১৮৮ : ভালোবাসা
বোর্ড পেপারে অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৬৬ সেমি, ২০০৮

কান্তিদেব ছেলেবেলা থেকেই ফুলের সৌন্দর্যে বিমোহিত থাকতেন। বি.এফ.এ এবং এম.এফ.এ ডিগ্রিতে পড়ার সময় একাডেমিক বিষয় চিত্রণের বিষয়বস্তু হিসেবে ফুল বিষয় হয়ে এসেছে। এখানে ফুলের বাস্তব রূপকে জলরং ওয়াশ পদ্ধতির তুলির কোমল ছোঁয়ায় এঁকেছেন। এই চিত্রে তাঁর একাডেমিক অনুশীলনের অধ্যবসায় লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, 'পাপড়ি, রেণু, ছন্দোবদ্ধ পাপড়িগুচ্ছের সৌন্দর্য বোঝানোর প্রয়োজনে ফুলকে বড়ো করে এঁকেছি।'[৭৯] তিনি তাঁর *আমার ছবি* শিরোনামের অভিসন্দর্ভে লিখেছেন, 'ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকা *ফুল* সিরিজের ছবিগুলোতে কোনো বক্তব্য তুলে ধরতে চাইনি। ফুলের রূপ, সৌন্দর্য বা লাবণ্যকে দর্শকের নিকট প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য।'[৮০]

লাভ বা *ভালোবাসা* সিরিজের পাখি ও নারীর ভালোবাসা-বিষয়ক কাজ এম.এফ.এ শেষ পর্বের। এই সময়ে কান্তির কাজে মাধ্যমগত পরিবর্তন এলে চিত্রের নারীর দেহভঙ্গিমা কিংবা গঠনগত দিকে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনেননি। তাঁর পরজীবীবিষয়ক সিরিজচিত্রেও মাধ্যমগত পরিবর্তনে অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করেছেন। কখনো ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করেছেন জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির অনুরূপ।

প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় সৃজনশীল কম্পোজিশন এবং নিরীক্ষামূলক কম্পোজিশন কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিজস্ব বিষয়চিন্তাকে কখনো ফর্মে, কখনো নিজস্ব ড্রয়িংশৈলী রচনায় কখনো রং প্রয়োগের নাটকীয়তায় নতুন নতুন রস সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এমনকি নিজস্ব শিল্প ব্যকরণ এবং স্বকীয় স্টাইল সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। শিক্ষকরাও সেভাবেই দেখতে চান। বৈচিত্র্য চান, আধুনিক ও নব নব উদ্ভাবন চান। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা আধা বিমূর্ত, কখনো বিমূর্ত চিত্র অঙ্কন করেন। কান্তিদেব অধিকারী সেই মনস্কতায় বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে, অনেক শিল্পী বাস্তবধর্মী ছবি আঁকতে পারেন না বলেই বিমূর্ত চিত্র করেন। তিনি লিখেছেন : 'শিল্পকর্মকে শুধু শুধু দুর্বোধ্য করে কী লাভ? তার চেয়ে সহজ, সরল, স্বাভাবিক করে কোনো

Dhaka University Institutional Repository

কিছুকে প্রকাশ করাই ভালো। তাতে দর্শকের শিল্পকর্ম বোঝোতে যেমন সুবিধা হয়, শিল্পীর নিজের মনের কথাটাকে প্রকাশ করাটাও সাবলীল হয়।'[৮১]

কান্তিদেব অধিকারী ২০০৩ সালের এম.এফ.এ পরীক্ষা দিয়েছেন ২০০৮ সালে। ২০০৮ সালে ছাত্রাবস্থার শেষ পর্যায়ে তিনি বেদে জনগোষ্ঠীর ভ্রাম্যমাণ জীবন-চরিত্র অঙ্কন করেছেন। বেদে জনগোষ্ঠীর বেদেনিরাই সংসারের প্রধান। এই বেদেনিদের নৌকার বহর দেখেছেন ছেলেবেলায় চিত্রা নদীতে। বেদেনিরা সাপ নিয়ে গ্রামের মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জীবিকা নির্বাহের উপাত্ত সংগ্রহ করত। মানুষের মধ্যে তাবিজ-কবজ বিক্রি করে এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করত। কান্তি তাঁর পরিণত বয়সে বেদে জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ জীবন ও প্রতিকূল জীবিকা নির্বাহের দিকটির নেপথ্য বিষয়টি ফোটাতে চেয়েছেন। বেদেনির বাহ্যিক রূপ অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার এবং সাপের হিংস্রতা, ভয়াবহতা এবং সৌন্দর্য নিখুঁতভাবে এঁকেছেন অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে। এই বাহ্যিক দৃষ্টির বাইরে তাঁর চিত্রের প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে বেদেনির ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা। জীবিকার জন্যই হিংস্র প্রাণীকে পোষ মানায়। ভালোবাসে, আদর-সোহাগ করে এবং এই প্রতিকূল জীবনের মধ্যের তারা জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। কান্তি এই অন্তর্নিহিত দর্শনের আলোকে ছাত্র-পরবর্তী সময়েও এ বিষয় নিয়ে চিত্র এঁকেছেন, আঁকছেন।

চিত্র ১৮৯ : ভালোবাসা-২, জলরং
৭৬ × ৪৬ সেমি, ২০০৯

চিত্র ১৯০ : ভালোবাসা-৪, জলরং
৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১০

চিত্র ১৯১ : প্রসাধন, অ্যাক্রেলিক
৫৬ × ৪১ সেমি, ২০০৮

কান্তিদেব ২০১০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শিক্ষক হবার পরে তাঁর কাজের ধরনে পরিবর্তন আসে। জলরং ওয়াশ-এর পরিবর্তে অ্যাক্রেলিক রঙের ওয়াশে কাজ করেন। রূপচর্চা সিরিজচিত্র ছাড়াও নারীদের বিভিন্ন অপেক্ষারত ও কর্মরত মুহূর্তকে ব্রাউন পেপারে অ্যাক্রেলিক কালারে অঙ্কন করেন। এসব চিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে ছবির ফিগারে এবং অন্যান্য জায়গায়ও পেপারের বাদামি রং রেখে দিয়ে কাগজে রং করেন। এই পদ্ধতিতেও কাগজ সম্পূর্ণ ভিজিয়ে রং করেন। রূপচর্চায় ব্যস্ত নারীরা সুলতানের পেশিবহুল ফিগারের মতো না হলেও ভরপুর দেহ গঠন লক্ষ করা

যায়। আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে প্রসাধনরত নারী ফিগারের মুখের ও হাত-পায়ের আদল গ্রামবাংলার লোকজ পুতুলের আদলে এঁকেছেন।

চিত্র ১৯২ : জীবন অতো সোজা নয়-২
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৯১ × ৭৬ সেমি, ২০০৬

চিত্র ১৯৩ : জীবন অতো সোজা নয়-৪
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৩৮ × ৭৬ সেমি, ২০০৬

চিত্র ১৯৪ : জীবন অতো সোজা নয়-৬
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
৭৬ × ৫১ সেমি, ২০১১

কান্তিদেবের চিত্রাঙ্কনের অন্যতম প্রধান বিষয় পরজীবী উদ্ভিদের *জীবন অতো সোজা নয়* সিরিজেচিত্রে মাধ্যম ও টেকনিকে পরিবর্তন এনেছেন। চিত্রের মাধ্যম কাগজ ও জলরঙের পরিবর্তে ক্যানভাস ও অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই চিত্র সমসাময়িক বাংলাদেশের পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার টেকনিক থেকে আলাদা করা যায় না। আর বিষয় উপস্থাপনে পরজীবী উদ্ভিদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের পরিবর্তে বাহ্যিক রূপের মহিমাই ক্যানভাসে প্রতিভাত হয়েছে।

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী কান্তিদেব অধিকারীর শিল্পকর্ম এবং বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় তাঁর অবদান তুলে ধরা যায় এভাবে :

(ক) নারী, প্রকৃতি ও ফুলের ছবি দৃষ্টিনন্দন করে এঁকেছেন।

(খ) পরজীবী সিরিজচিত্রে সুন্দরের নেপথ্যে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতীকায়ন করেছেন।

(গ) তাঁর চিত্র সহজ-সরল। সাধারণ দর্শকও তাঁর চিত্রের ভাষা বুঝতে পারে।

(ঘ) পরজীবী ও বেদে সিরিজচিত্রে জীবন-দর্শনে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে।

(ঙ) অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করেছেন জলরং ব্যবহারের প্রক্রিয়ায়।

(চ) প্রকৃতির তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্যকে দেখতে শিখিয়েছেন।

(ছ) তাঁর নারী চিত্রগুলোতে সমসাময়িক সময়কালের ফ্যাশন ধরা আছে।

মোছাঃ নাজনীন আকতার (জন্ম ১৯৮১)

শিল্পী মোছাঃ নাজনীন আকতার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা গ্রুপের শিক্ষক। তিনি রাজশাহীর প্রাচ্যকলা গ্রুপের তৃতীয় ব্যাচের ছাত্রী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে প্রাচ্যকলা গ্রুপে শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীর শিক্ষকতায় যে কয়জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চায় মেধার পরিচয় দিয়েছেন, নাজনীন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

নাজনীন রাজশাহীর সন্নিকটস্থ নাটোর জেলায় ১৯৮১ সালের ২৮ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। নাজনীনের বাবার গ্রামের বাড়ি সিংড়া থানার গোয়ালঘাট গ্রামে থাকায় ছোটোবেলায় গ্রামে যাতায়াত করতেন। গ্রামের প্রকৃতির সাথে তাঁর এক ধরনের গভীর সখ্য ছিল। শহরে যেখানে বাল্য-শৈশব কেটেছে সেখানেও নৈসর্গিক খোলামেলা পরিবেশের সান্নিধ্য পেয়েছেন।

খেলাধুলা প্রিয় থাকায় ঘরের চেয়ে বাইরের প্রকৃতির মধ্যেই সময় কাটাতেন বেশি। তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বেই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। প্রাইমারি স্কুলে পাঠ নেয়ার সময় নাটোর জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার অর্জন করেছেন। এ সময় তিনি জলরঙে প্রকৃতি ও মানুষের চিত্র আঁকতেন। তাঁর এই শিশুসুলভ সুকুমারবৃত্তিকে বাবা এ.কে.এম আঃ খালেদ আজাদ খুব উৎসাহ দিতেন।

নাজনীন ১৯৯৬ সালে এস.এস.সি পাস করেন এবং ১৯৯৮ সালে এইচ.এস.সি পাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা দেন। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ১৯৯৮–৯৯ শিক্ষাবর্ষে বি.এফ.এ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। এক বছর সমন্বিত ক্লাসের পর ১৯৯৯–২০০০ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় বর্ষে প্রাচ্যকলা গ্রুপে ক্লাস শুরু করেন। এ সময় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন সুশান্ত কুমার অধিকারী। তাঁর পরিচর্যায় নাজনীন প্রাচ্যরীতির জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে লাবণ্যময় ফিগার পেইন্টিং করেছেন। শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ছাত্রজীবনে। শিক্ষক হিসেবে তিনি সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে জলরং ওয়াশ পদ্ধতি ও মুরাল মাধ্যমের কাজগুলোতে পারদর্শিতা লক্ষ করা যায়।

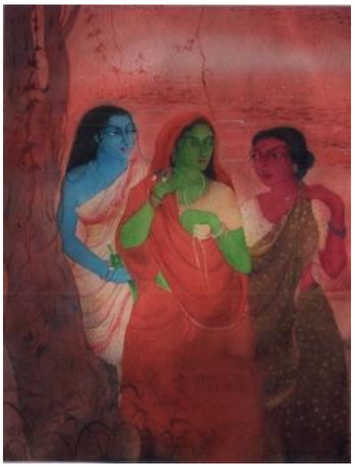

চিত্র ১৯৫ : তিন কন্যা, জলরং, ৭৬ X ৫৬ সেমি, ২০০৩

চিত্র ১৯৬ : অপেক্ষা, মুরাল (স্লাবে), ৭৬ X ৫৬ সেমি, ২০০২

ওয়াশ পদ্ধতির কাজে, বিশেষত তিন কন্যা চিত্রে নাজনীন নারী ফিগারের নারীদের সবুজ, লাল ও নীল রং ব্যবহার করেছেন। রঙের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্র যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যাকগ্রাউন্ডের রং প্রয়োগেও আছে লাল রঙের এক কালারের আভা। সব মিলিয়ে রঙের এই নাটকীয়তা তিন কন্যার অন্তঃকথন বর্ণনে প্রাচ্যশৈলীর রোমান্টিক ভাবাবেশসুলভ ফিগার চিত্রণের ধারাবাহিকতাকেই প্রস্ফুটিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্র চর্চায় মুরাল একটি বিশেষ মাধ্যম। যে মাধ্যমটিতে প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী গুহাচিত্র হয়েছে। নাজনীনের *অপেক্ষা* চিত্রটি ফ্রেসকো পদ্ধতিতে করা। অর্থাৎ চুন, বালির আস্তরণযুক্ত স্লাবে অক্সাইড রং ও চুনের পানি সহযোগে করা। এই চিত্রে চুন-বালির স্লাবে জলরং ওয়াশ পদ্ধতির মতো রং প্রয়োগে বাঙালি নারীর চিরন্তন অপেক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন যথেষ্ট মুনশিয়ানায়। বাঙালি নারী চরিত্রের অপেক্ষারত মন—যা প্রিয়জনের আশায় উদ্বেল, সেই ভঙ্গিকে লাবণ্যময় নারী মুখের আদলে ফুটিয়ে তুলেছেন। রং প্রয়োগের বিশেষত্বে নারী ফিগারের শরীরকে রক্ত-মাংসে গড়া শরীরের অনুভূতি প্রদান করেছে। বাইরের যে প্রকৃতির মধ্যে ফিগার দুটোকে সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতি গ্রামবাংলার চিরচেনা প্রকৃতির গাছপালা, ঝোপঝাড় ও লতাগুল্ম বেষ্টিত। এখানে হালকা রং এবং লাইনের ব্যবহারে গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশেরও বহিঃ এবং অন্তর্গঠন সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে।

নাজনীন তাঁর এই চিত্রে শুধু বাঙালি নারী নয়, বাঙালি নারীর হিন্দু সম্প্রদায় বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন তাদের ব্যবহৃত গহনা এবং সিঁথিতে সিঁদুর যুক্ত করে। এবং হাতের চিঠি অপেক্ষারত নারীর প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা বিভাগে। এখানে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন। চিত্রকলাকে কোনো রীতির অনুষঙ্গে বিচার না করেই চিত্র এঁকেছেন। ফলে স্বাধীন চর্চার প্রতি এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তিনি যেমন চিত্রকর্ম করেছেন তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদেরও উৎসাহিত করতেন। সিলেবাসের বাইরে জাতীয় পর্যায়ে চিত্রকলা-বিষয়ক প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার জন্য স্বাধীন সংযুক্ত ছবি আঁকতে উৎসাহিত করতেন। *সামাজিক প্রতিবন্ধকতা* সিরিজচিত্রও নাজনীনের দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করার সময় ক্লাসের বাইরে নিরীক্ষামূলক কাজ।

চিত্র ১৯৭ : সমসাময়িক বাস্তবতা-১, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি

চিত্র ১৯৮ : সমসাময়িক বাস্তবতা-২, জলরং ৭৬ × ৫৬ সেমি

এই কাজে নাজনীন প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিকে ব্যবহার করে চিত্রতলে যে ফিগার ও অবজেক্ট ব্যবহার করেছেন তা বিষয়চিন্তাকে সমার্থক করার প্রয়োজনে ফিগার ও অবজেক্টের বাস্তবধর্মী গ্রামার অনুসারে আঁকেননি। যা অনেকটা কাল্পনিক, বীভৎস এবং সুরিয়ালিজমের অনুষঙ্গে উপস্থাপিত। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

Dhaka University Institutional Repository

বলতে নাজনীন সামাজিকভাবে নারীদের চলাফেরার প্রতিবন্ধকতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।[৮২] তাঁর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-১ ছবিতে অর্থাৎ কালো হাত, প্রতিবন্ধক রশি, শিকল, মানুষের বিকৃত চেহারা প্রতীকীভাবে ব্যবহার করেছেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-২ চিত্রে একই অবজেক্ট ব্যবহার হয়েছে। সাথে প্রতীকীভাবে সাপকে দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে একটা কালো হাত শুভ্র পোশাক পরা একই নারীকে ধরতে চাচ্ছে। নাজনীনের মতে, আমাদের সমাজে নারীরা স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। অসভ্য শ্রেণির এক ধরনের পুরুষ মানুষ তাদের লোলুপদৃষ্টি দিয়ে অশ্লীল আচরণ করে। যা সমাজের মধ্যে কাম্য নয়। এরা সাপের মতোই অশুভ, ভয়ংকর এবং বিষধর।[৮৩]

মূলত সমাজের এই দুশ্চরিত্র মানুষদের ভয়াবহতা বোঝাতে তিনি তাঁর চিত্রে বীভৎস কিছু ফর্ম, রং, টেক্সচার ব্যবহার করেছেন। তাঁর চিত্রে ব্যবহৃত রং, ফর্ম, টেক্সচার ও প্রতীকী বস্তু বিষয়ের যথার্থ রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সামাজিক এই প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক চিত্র রাজশাহীর প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। বিশেষত দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র গৌতম কুমার বিশ্বাসের কাজও এমনই ছিল। তবে রাজশাহী চারুকলার প্রাচ্যকলা গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমসাময়িক বিষয়চিন্তা নিয়ে কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচলন প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ রাজশাহী চারুকলার প্রাচ্যকলা গ্রুপে সমসাময়িক বাস্তবতাভিত্তিক চিত্রকলা অঙ্কনের একটা ঘরানা প্রবহমান, যা ঢাকা চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে নেই।

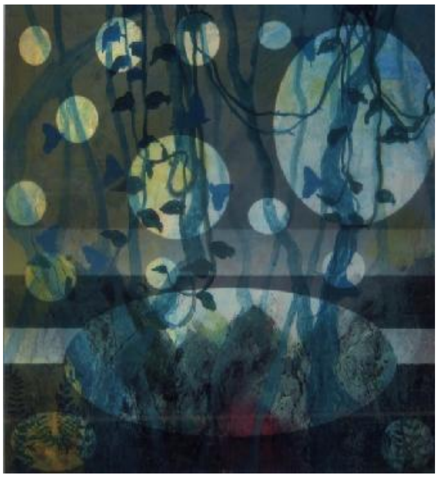

চিত্র ১৯৯ : ছন্দময়তা, অ্যাক্রেলিক, ২০০৪

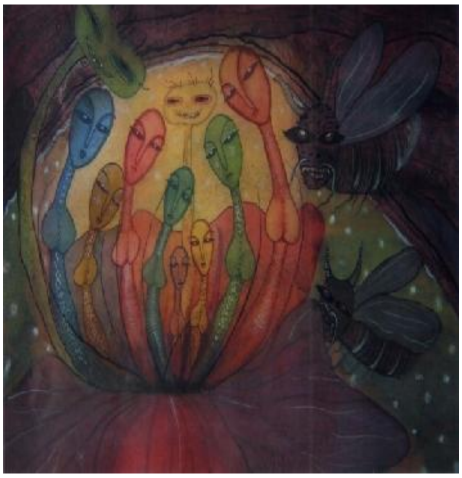

চিত্র ২০০ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, জলরং
৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০৪

নাজনীন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সিরিজে প্রকৃতির অবজেক্ট নিয়েও ছবি এঁকেছেন। তিনি তাঁর ছন্দময় ছবিতে প্রকৃতির লতা-গুল্মের ছন্দময়তা দেখিয়েছেন। যার ওপর আলোর গোলক ধেয়ে আসছে। এই আলোর উৎস সূর্য। এই আলোতে প্রকৃতি আলোকিত হচ্ছে। এই ছন্দময়তা মঙ্গলের বারতা। সমাজের সুস্থতার ভালোত্বের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। আবার প্রকৃতির মধ্যে প্রতীকী অশুভতাও দেখিয়েছেন নারীর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা চিত্রে। এখানে ফুলকে দেখিয়েছেন সমাজের সুন্দর রূপকে। আর পাপড়ির মধ্যে স্থাপন করেছেন নারীর অবয়ব। ফুলের সৌন্দর্যের মধ্যে নারীর প্রতীকী অবস্থান। আর বীভৎস চেহারায় ভ্রমর ফুলের

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীকেশরকে ফলিত করতে চাচ্ছে। নাজনীন এখানে সমাজের নারীর প্রতিবন্ধকতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যেও নির্মলতা ও জটিলতা প্রসঙ্গে প্রতীকী রূপায়ণ করেছেন নারীজীবনের প্রতিবন্ধকতা বোঝাতে।

তিনি বি.এফ.এ সম্মান শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পর ২০০৪ সালে এম.এফ.এ পরীক্ষা দিয়েছেন। এম.এফ.এ পড়ার সময় একমাত্র শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যান। নাজনীন শিক্ষক শূন্য অবস্থায় এম.এফ.এ পর্যায়ের কাজ করেছেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন নিরীক্ষা করেছেন। ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে, দ্বিমাত্রিক রং, লাইন ও পটচিত্রের ক্ষেত্র বিভাজন ব্যবহার করে মানুষের ভেতরের রূপ বিষয়ে ছবি এঁকেছেন। তাঁর মতে, মানুষের দুটি রূপ—একটি তার বহিরাঙ্গ, অন্যটি ভেতরের। এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা যা দেখছি তা বাইরের রূপ। ভেতরের রূপ বাইরের চেহারায় দেখা যায় না। আমি ভেতরের রূপকে দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি।[৮৪]

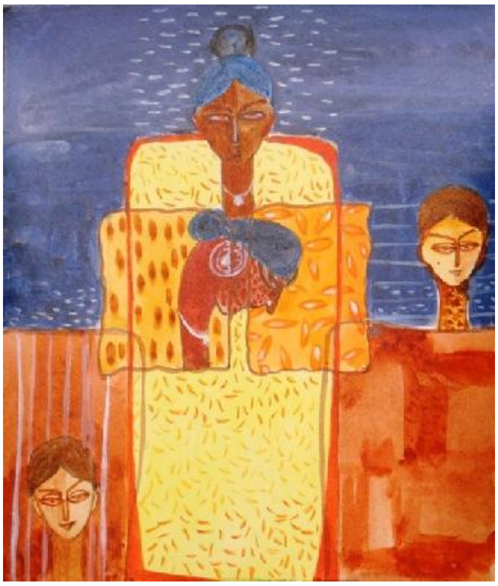

চিত্র ২০১ : ভেতরের রূপ-১, অ্যাক্রেলিক
৩০ × ২০ সেমি, ২০১১

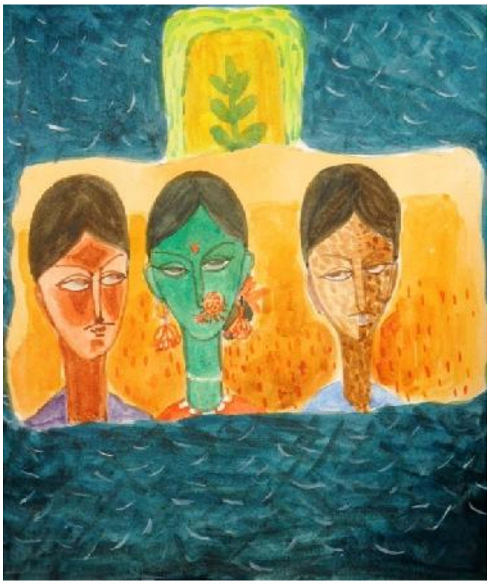

চিত্র ২০২ : ভেতরের রূপ-২, অ্যাক্রেলিক
৩০ × ২০ সেমি, ২০১১

সম্প্রতি তিনি ভেতরের রূপ শীর্ষক চিত্রমালায় চূড়ান্ত রূপ দেয়ার লক্ষ্যে জলরং স্টাডি করে যাচ্ছেন। অ্যাক্রেলিক চিত্রে ফর্ম, টেক্সচার, লাইন, ডিজাইন ও মানুষের, বিশেষত মেয়েমানুষের প্রতিকৃতি ব্যবহার করে কম্পোজিশন করেছেন। তাঁর এই চর্চার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিষয় হিসেবে এই দর্শনটি শিল্পীর আধ্যাত্মিক সাধনার ইঙ্গিত বহন করে। যে সাধনাবলে দিব্য চক্ষু দ্বারা মানুষের ভেতরের রূপ পাঠ করা সম্ভব।

নাজনীন বেগম ২০১০ সালের মার্চ মাস থেকে প্রাচ্যকলা গ্রুপে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী মোছাঃ নাজনীন আকতারের শিল্পকর্ম এবং বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় তাঁর অবদান তুলে ধরা যায় এভাবে :

Dhaka University Institutional Repository

(ক) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় তিনি লাবণ্যময় ফিগার পেইন্টিং চিত্র আঁকার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

(খ) পাশ্চাত্যের ফভবাদ ধারার রং প্রয়োগ করেছেন প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির ফিগার চিত্রণে।

(গ) তাঁর চিত্রে অপেক্ষারত বাঙালি নারী চরিত্রের যথার্থ ভাব ফুটে উঠেছে।

(ঘ) সমসাময়িক বাস্তবতায় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ফুটে উঠেছে প্রতীকী উপস্থানে।

সোহাগ পারভেজ (জন্ম ১৯৮১)

শিল্পী সোহাগ পারভেজ (সার্টিফিকেট অনুযায়ী নাহিদ আলম) ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে কুষ্টিয়া জেলা সদরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আখতারুজ্জামান চিরূ লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও কলামিস্ট। মা সংস্কৃতিমনা। ছেলেবেলা থেকে আবৃত্তি, গান, ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতেন। প্রাইমারি স্কুলে পাঠ নেয়ার সময় কুষ্টিয়ার ধিয়েল আর্ট স্কুলে মীর জাহিদের কাছে চিত্রাঙ্কনে হাতেখড়ি নেন এবং সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এ প্রতিযোগিতায় (জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ১৯৯৩) পেনসিল স্কেচে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক পান। এরপর নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি কুষ্টিয়ার আশপাশের তিনটি থানা শহরে (ভেড়ামারা, কুমারখালী, খোকসা) আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিশুদের চিত্রাঙ্কন শেখাতে থাকেন। এই স্কুলের মাধ্যমে উপার্জন দিয়েই নিজে স্বনির্ভর হয়েছেন।

সোহাগ ১৯৯৭ সালে এস.এস.সি পাস করেন এবং পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হন। পাশাপাশি এইচ.এস.সিতেও ভর্তি হন। পলিটেকনিক্যালের পড়াশোনা বাদ দিয়ে ১৯৯৯ সালে এইচ.এস.সি পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা দেন। প্রথমবার চান্স না হলে দ্বিতীয়বার ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হন।

সোহাগ ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতি চিত্রণে পারদর্শী ছিলেন। জলরং মাধ্যমও প্রিয় ছিল। প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন হাশেম খান শওকাতুজ্জামানকে। উভয় শিক্ষকই সোহাগকে স্নেহ করতেন। ছেলেবেলা থেকে হাশেম খানের ইলাস্ট্রেশন ছিল সোহাগের প্রিয়।

প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সোহাগ পারভেজ ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী হিসেবেই পরিচিত। জলরঙের ওয়াশ ও কালো মোটা লাইনের ব্যবহার তাঁর ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে নতুন মাত্রা এনেছে। তাঁর ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে রামকিঙ্কর বেইজ-এর ল্যান্ডস্কেপ চিত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কালো লাইন ব্যবহার জয়নুল আবেদিনের প্রভাব এবং তাৎক্ষণিক ও ক্ষিপ্ত রেখার চলন ইমপ্রেশনিস্ট ল্যান্ডস্কেপ শিল্পীদের কাজের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল পাওয়া যায়।

চিত্র ২০৩ : ল্যান্ডস্কেপ, জলরং

চিত্র ২০৪ : সুন্দরবন লেকের নৌকা
জলরং, ৩৬ × ২৬ সেমি, ২০০৯

চিত্র ২০৫ : রাঙামটি-১৬, জল ও পেন
৪০ × ২৬ সেমি, ২০১০

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির কাজ যা করেছেন তা ক্লাসের প্রয়োজনেই। সে ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে কালো কালির ড্রয়িং-প্রধান চিত্রকে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া ওয়াশ মাধ্যমে যা এঁকেছেন তার বিষয় ছিল উপজাতীয় নারী-পুরুষের। এসব চিত্রে উপজাতীয় সংস্কৃতির অন্তঃকথন বর্ণিত হয়েছে।

চিত্র ২০৬ : বার্মা মা ও শিশু
জলরং ও মার্কার পেন
৩৭ × ২৬ সেমি, ২০০৮

চিত্র ২০৭ : দরিদ্র মানুষ ও শিশু
পেন, ৩৬ × ২৬ সেমি, ২০০৮

চিত্র ২০৮ : দরিদ্র মানুষ ও শিশু
মার্কার পেন, ৩৬ × ২৬ সেমি, ২০০৮

সোহাগ পারভেজ পাহাড়ি জীবনকে কেন্দ্র করে বেশি ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন। নদী, নৌকা, গ্রামীণ নিসর্গ তাঁর ল্যান্ডস্কেপের বিষয়। মইনুদ্দীন খালেদ যথার্থই লিখেছেন :

> শিল্পী সোহাগ পাখির মত আন্দোলিত উড়ালে অবলোকন করেছে পাহাড়িয়া এলাকা। লম্বমান রেখার নিচে মানুষের বসতি ও জলস্রোত হয়েছে তার ছবির থিম। তারপর চিরকালের বাংলাদেশের সমুদ্র-নদীর বুকে নৌকা, মোষের পিঠে রাখাল এসবই এঁকে গেছে সরস আবেগে। তবে তার তুলি সব সময় শীতল ও ললিত থাকেনি। কখনো খরবেগে ধাবিত হয়েছে। সেই বেগ দিয়েই ভ্যান গগীয় তুলির ঝোপে শিল্পী এঁকেছে।[৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২০৯ : বাঁশঝাড়
জলরং, ৩০ × ২৩ সেমি, ২০১১

চিত্র ২১০ : পাতাল নৌকার ঘাট
জলরং, ৫৬ × ৪০ সেমি, ২০১২

চিত্র ২১১ : সাঙ্গু নদী
জলরং, ৩০ × ২৬ সেমি, ২০১২

সোহাগ পারভেজের মধ্যে একাডেমিক রীতির কলাকৌশল থেকে বেরিয়ে নতুন কিছু করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নতুনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টায় রং ও স্পেসের ব্যবহারে সমন্বয়হীনতা[৮৬] তাঁর চিত্রে ইলাস্ট্রেটিভ ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবু রবিউল হুসাইনের মন্তব্য সোহাগের চিত্রকলা বিচারে প্রণিধানযোগ্য :

> His paintings easily talks about the natural identity of Bangladesh. this is a great achievement for an artist. His works in water colour, pastel, ink and pen and acrylic reflect his well thought use of mediums to express his subjects dynamically.[৮৭]

সোহাগ পারভেজ ২০০৭ সালে বি.এফ.এ এবং ২০০৯ সালে এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি চারটি একক প্রদর্শনী করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি অডিটরিয়াম, আলিয়ঁস ফ্রঁসেস গ্যালারি, গ্যালারি শিল্পাঙ্গন এবং গ্যালারি কায়ায় এসব প্রদর্শনী হয়েছে। ২০১৩ সালে ঢাকা আর্ট সেন্টারে তাঁর পঞ্চম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি অসংখ্য বইয়ের ইলাস্ট্রেশন ও অলংকরণ করেছেন।

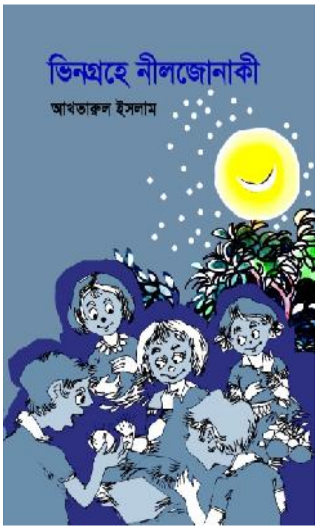

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২১২ : প্রচ্ছদ　　　চিত্র ২১৩ : গ্রন্থ অলংকরণ　　　চিত্র ২১৪ : গ্রন্থ অলংকরণ

এই প্রচ্ছদ চিত্রণ ও অলংকরণে তিনি নিজস্ব একটা ঘরানা তৈরি করেছেন। শিশু চিত্রাঙ্কনে তাঁর এই অবদান বাংলাদেশের প্রচ্ছদ চিত্রণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই প্রচ্ছদচিত্রে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতির লাইন ও দ্বিমাত্রিক রং ব্যবহারকে তিনি নতুন মাত্রা দিয়েছেন।

অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সোহাগ পারভেজ বাংলাদেশের জলরঙে নিসর্গ চিত্রণে বিশেষ অবদান রাখছেন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিক্ষা নিয়ে অনেক শিল্পী নতুন-নতুন বিষয় ও টেকনিকে নিজেদের প্রকাশ করে চলেছেন। যার মধ্যে শুরুতে বাটিক ও ট্যাপেস্ট্রি মাধ্যম অন্যতম। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে সোহাগ পারভেজ ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন, যা বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার বৈচিত্র্য নিশ্চিত করে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী সোহাগ পারভেজের শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায় :

(ক) জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতি ও কালো মোটা লাইনার ব্যবহারে ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে নতুন মাত্রা এনেছেন।

(খ) চিত্রে উপজাতীয় সংস্কৃতির অন্তঃকরণ বর্ণিত হয়েছে।

(গ) নদী, নৌকা, গ্রামীণ নিসর্গ চিত্রকে জনপ্রিয় করেছেন।

(ঘ) প্রচ্ছদ ও শিশুগ্রন্থ অলংকরণে নতুনত্ব এনেছেন।

গোপাল চন্দ্র সাহা (জন্ম ১৯৮৪)

শিল্পী গোপাল চন্দ্র সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে ২০০৭–২০০৮ শিক্ষাবর্ষে এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জন করেন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে। তিনি ১৯৮৪ সালের ২০ আগস্ট নারায়ণগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কেটেছে হিন্দু ধর্মের পূজা-পার্বণ ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। বাড়ির পাশের মন্দিরগুলোতে মূর্তি তৈরি দেখে নিজেই মূর্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। অনুপ্রাণিত হয়েছেন মন্দিরের ফ্রেসকো চিত্র দেখে। এসব চিত্র ছিল রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে। পূজা-পার্বণ আর সামাজিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে সাজসজ্জার কাজ দেখে মুগ্ধ হতেন।[৮৮]

২০০২ সালে এইচ.এস.সি পাসের পর চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হন। একজন শিল্পীর সৌন্দর্যবোধের শিক্ষা চারুকলা শিক্ষার পূর্বেই অর্জন করেছেন ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। তিনি অত্যন্ত শান্ত ও বিনয়ী। এজন্য বিভাগের সব শিক্ষক তাঁকে স্নেহ করতেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন ধীরস্থির। ব্যক্তি চরিত্রের ধৈর্য তাঁর কাজেও প্রতিফলিত হয়েছে। ওয়াশ পদ্ধতির কাজে অসীম ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু ক্লাসের সময়ই নয়, ক্লাস-পরবর্তী সময়েও বিভাগে বসে কাজ করতেন। এর ফলস্বরূপ তিনি চারটি পুরস্কার

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন করেছেন। তাঁর মধ্যে ক্রিয়েটিভ ড্রয়িংয়ের জন্য আমিনুল ইসলাম ট্রাস্টের বৃত্তি প্রকল্পে দুইবার মনোনীত হন এবং অনুষদের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে দুইবার পেয়েছেন নিরীক্ষামূলক কাজের জন্য পুরস্কার।

চিত্র ২১৫ : মননগাথা-১, জলরং
৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০০৯
(২০০৯ সালে বার্ষিক প্রদর্শনীতে নিরীক্ষামূলক পুরস্কারপ্রাপ্ত)

চিত্র ২১৬ : মননগাথা-২, জলরং, ১১২ × ৭৬ সেমি, ২০১১
(২০১১ সালে বার্ষিক প্রদর্শনীতে নিরীক্ষামূলক পুরস্কারপ্রাপ্ত)

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করে এই মাধ্যমকে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার মূল মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয় করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগেও এই মাধ্যমে অধিকাংশ চিত্র অঙ্কন করা হয়। শিল্পী শিক্ষক আব্দুস সাত্তার, নাসরীন বেগম, শওকাতুজ্জামান (প্রয়াত), আব্দুল আযীয প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্টাইলে ওয়াশ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। সাধারণত শিল্পীর কাজের বিষয় দেখে যেমন অনুমান করা যায় তিনি কোন বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন, তেমনি টেকনিক দেখেও বোঝা যায় এটা কোন শিল্পীর কাজ।

প্রাচ্যরীতির প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলায় শিল্পী গোপাল চন্দ্র সাহার চিত্রের বিষয়, টেকনিক, বিশেষ রং, বিশেষ ফর্ম দেখে তাঁর কাজ বোঝা যায়। দীর্ঘ ছয় বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত হতে সময় লেগেছে আট বছর। এই সময়ে প্রাচ্যচিত্ররীতির বহু মাধ্যম ও রীতিতে চর্চা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছেন শিল্পের দরবারে।

ওয়াশ পদ্ধতির কাজে তিনি ইংল্যান্ডের হ্যান্ডমেইড (হালকা টেক্সচারযুক্ত) কাগজ ব্যবহারে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। বর্তমান গবেষকের অধীন তিনি ক্লাসের অনেক কাজ সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং তাঁর কাজের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি গবেষকের জানা। শিল্পী গোপাল তাঁর কাজে মেয়ে ফিগারের বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে কাজ করেন। এজন্য প্রথমে তিনি মডেল দেখে ড্রয়িং করেননি। এরপর ড্রয়িংলব্ধ জ্ঞান থেকে পরিকল্পিত বিষয় নিয়ে একটি লে-আউট চিত্র অঙ্কন করেন। লে-আউট থেকে ট্রেসিং করে ইংল্যান্ডের হ্যান্ডমেইড কাগজে ট্রেস করে ড্রয়িংটি তুলে নেন। ওয়াশ পদ্ধতির বেসিক নিয়মানুসারে কাগজটি ভিজিয়ে প্লাস্টিক বোর্ডে সেঁটে নেন। কাগজটি শুকিয়ে এলে চলে রঙের ওয়াশের কাজ। এভাবে কাজ শেষ হলে আবার ভিজিয়ে অপ্রয়োজনীয় রং

তুলে নিয়ে তিনি ছবির বিভিন্ন অংশের ফর্মে রং দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফল না পান ততক্ষণ এবং ততবার ধোয়া এবং রং দেয়ার কাজ চলতে থাকে। এ এক অভিনব সাধনার কাজ। আর এভাবে করা হয় বলেই চিত্রে এক মায়াবী আবহ তৈরি হয়। নীল রঙে শিল্পীর দুর্বলতা। তাই বেশির ভাগ চিত্রই নীল রঙের বিভিন্ন গ্রেডে করেছেন। আলো-ছায়ার খেলা তৈরি করেছেন কাগজের সাদা অর্থাৎ রঙের ঘনত্ব কম-বেশি দিয়ে। তিনি তাঁর নিজের শিল্পকর্মের ওপর অভিসন্দর্ভে লিখেছেন, 'নীল রঙটা আমার খুব পছন্দের। কেমন যেন এক মোহ কাজ করে রঙটিতে, কেমন এক স্বর্গীয় অনুভূতি পাই রঙটির মধ্যে, আর সবসময়ই অনুভব করতাম নতুন কিছু একটা করতে হবে। নতুন একটি আঙ্গিক কিংবা একটি নির্দিষ্ট রঙ যাকে বৃহৎ অংশের সময়ের জন্য সহচর করা যায়।'[৮৯]

সত্যিকার অর্থে নীল রংকে তিনি সহচরই করেছেন। এসব রং প্রতিষ্ঠা করেছেন জ্যামিতিক ফর্মের মাধ্যমে। প্রাচ্যশিল্পের গুণী শিল্পী অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার লিখেছেন :

> শিল্পীর বিনম্র স্বভাবের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য শিল্পেও প্রতিফলিত হয়েছে। তার শিল্পের রঙ শীতলতায় সমৃদ্ধ। নীলের প্রাধান্য সর্বত্র, নীল প্রশান্তি, মোহনীয়তা, শীতলতা ও নির্মেঘ আকাশের প্রতীক। নীলের সম্মোহনী শক্তি সকলকেই মুগ্ধ করে। সম্মোহিত করে বার বার . . . রঙ প্রয়োগ প্রক্রিয়া এবং ফর্ম নির্মাণের এই ধারা তার প্রায় সকল কর্মেই প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধারা তার সকল কাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।[৯০]

আত্মার অনুসন্ধান (Searching my soul), সৌন্দর্যের অনুসন্ধান (Searching Beauty), পাখার সৌন্দর্য (Wings Beauty), মননগাথা সিরিজচিত্র নিয়ে শিল্পী কাজ করেন। মননগাথা সিরিজচিত্রে তিনি বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের প্রতীকী উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেন। কর্মজীবনে তারা যে সৌন্দর্যের উপাদান তৈরি করে দেয় তা তার ব্যক্তিজীবনের উপভোগে আসে না। আসে শুধু অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে প্রতীকায়ন করেছেন চোখের ফর্ম ব্যবহার করে।

তিনি তাঁর কাজে ওয়াশের মাধ্যমে বহুতল সৃষ্টি করেন, যা প্রাচ্যরীতির দ্বিমাত্রিক ফ্ল্যাটধর্মিতা ছাড়িয়ে ইলিউশন তৈরি করে। এমন আবহ সৃষ্টির নেপথ্যে পিকাসোর কাজের অনুপ্রেরণা স্বীকার করেন। সমাজের নীচু স্তরের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী শাহবাগের ফুল-গাঁথা মেয়েরা তাঁর ছবির বিষয় হয়ে আসে। কিছু প্রাচ্যধর্মী সাবলীল ও মায়াবী রেখার ব্যবহার কিংবা হাত-পা ও মুখের আদলে সুললিত ভঙ্গি ব্যবহার করেন না। তাঁর মডেলগুলো আমাদের চেনাজানা বাস্তব শ্রমিকদের রূপে, রঙে ব্যবহারে প্রাচ্যবাদিতা এবং ফর্মের নকশার বিন্যাসে প্রাচ্যধর্মী আবহ সৃষ্টি করে, যা চুঘতাইয়ের কাজের সুললিত আবেশ সৃষ্টি করে। শিল্পী বলেন :

> বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকসজ্জার আলোকের মাঝে যখন বিভাজিত হতাম তখন ভিন্ন এক অনুভূতি আসত মনে। একবার আয়নার দোকানে নিজেকে খণ্ড খণ্ড রূপে দেখলাম বিভিন্ন আয়নায়। ভাবনায় এলো বাস্তব জীবনেও আমরা বিভিন্ন বিষয়ের মাঝে এইরূপ বিভাজিত হয়ে যাই এবং আলোর খেলায় যে স্পেসের অনুভূতি আসে, এই ধারণাগুলোকেও আমার চিত্রকর্মে স্থানান্তর করলাম।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২১৭ : মডেল-০৪, জলরং
৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০১১

চিত্র ২১৮ : মডেল-০৩, জলরং
৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০১০

সমাজের ঘটনাবহুল বাস্তবতা ছাড়াও প্রকৃতির কীটপতঙ্গ ও প্রজাপতির পাখার সৌন্দর্যকে ফর্মে আবদ্ধ করেছেন শিল্পী। শিল্পী এই সিরিজের কাজ ধীরে ধীরে ফিগারসদৃশ সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে ফর্ম ও স্পেসে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি সৌন্দর্যের দার্শনিক সত্যকে উপস্থাপন করতে চাইছেন। *আত্মার অনুসন্ধান* সিরিজচিত্রে অভিজ্ঞতার চোখ, গোলাপ ফুল ও জ্যামিতিক ফর্ম উপস্থাপন করেছেন। পাশ্চাত্য একাডেমিক ঘরানার তেল রং ও অ্যাক্রেলিক চিত্রের বদলে প্রাচ্যরীতির করণ-কৌশলে নির্বস্তুকতার মধ্যে তাঁর অভিমত প্রকাশ করতে চাইছেন।

চিত্র ২১৯ : পাখার সৌন্দর্য, জলরং
৫৬ × ৭২ সেমি, ২০১১

চিত্র ২২০ : আত্মার অনুসন্ধান, জলরং
৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০১১

উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী গোপাল চন্দ্র সাহার প্রাচ্যশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় যেসব বৈশিষ্ট্য ও অবদান উল্লেখ করা যায় তা নিম্নরূপ :

(ক) তাঁর কাজে সমাজবাস্তবতার বিশেষ বক্তব্য প্রতীকীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

(খ) পাশ্চাত্যের কিউবিজম ধারাকে প্রাচ্যের ওয়াশ পদ্ধতির ধারায় সমন্বয় করেছেন।

(গ) তাঁর কাজের ফিগারের মডেলগুলো পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় উপস্থাপন হলেও প্রাচ্যের তথা বাংলাদেশি মানুষের।

(ঘ) ফর্মের সাথে ওয়াশের পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে সমকালীন নির্বস্তুক চিত্রধারায় রস এনেছেন।

নাজমুল হক বাপ্পী (জন্ম ১৯৮৪)

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় ছবি আঁকার পাশাপাশি পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় ছবি এঁকে যেসব শিল্পী নিজেদের দক্ষতা দেখিয়েছেন, নাজমুল হক বাপ্পী তাঁদের অন্যতম। আর্মি ডাক্তার পিতার ঢাকায় চাকরিসূত্রে নাজমুল হক ১৯৮৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কিছুদিন পরই বাবা চাকরি থেকে অবসরে গেলে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে চলে যান। মোহনগঞ্জ থেকেই ১৯৯৮ সালে এস.এস.সি এবং ২০০০ সালে এইচ.এস.সি পাস করেন। এ সময় গ্রামের বাড়ি ফাগুয়াতে যাতায়াত করতেন। বাল্য ও কৈশোরের এই সময়ে তৃপ্ত হতেন কংস নদী ও গ্রামের দৃশ্য দেখে। বড়ো ভাই ছিলেন অ্যামেচার শিল্পী। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন ছবি আঁকার উৎসাহ। সুতরাং স্কুলের প্রকৃতি, গ্রামের দৃশ্য, মীনা কার্টুন এসব আঁকতেন নিজের ভালো লাগায়।

বাপ্পী এইচ.এস.সি পাস করে ঢাকায় চলে আসেন। ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ) প্রাচ্যকলা বিভাগে বি. এফ.এ. সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন।

বাপ্পী একাডেমিক পড়ালেখার পাশাপাশি চারুকলার অন্যান্য শাখায় কাজ করতেন। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক শিল্পকলায় অংশ নিতেন। সাফল্য হিসেবে তিনি ২০০৩ ও ২০০৪ সালে অর্জন করেন বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের সেট ডিজাইন পুরস্কার। বি.এফ.এ (অনার্স) পড়ার সময়ে তাঁর কাজে নিষ্ঠার ছাপ পাওয়া যায়। ফুল, পাখি, লতা-পাতা, মানুষের ফিগার, জড় বস্তু, ক্যাকটাস তাঁর চিত্রের অবজেক্ট হিসেবে বার বার উঠে এসেছে। সামগ্রিক অর্থে প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টিতে শিল্পী বিভোর ছিলেন। উপস্থাপনার ধরনে বিষয়ের অন্তর্নিহিত বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর চিত্রে ব্যবহৃত অবজেক্টগুলো দৃষ্টিনন্দনের বাইরেও আলাদা মেসেজ দেয়। যে মেসেজ শিল্পী তাঁর চিত্রে পরিকল্পিতভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২২১ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড
জলরং, ২০০৮

চিত্র ২২২ : ওল্ডম্যান
ক্যাকটাস, জলরং, ২০০৮

চিত্র ২২৩ : কম্পোজিশন
জলরং, ২০০৮

মা ও শিশু চিত্র প্রসঙ্গে বাপ্পীর অভিমত হচ্ছে, ফুলের মধ্যে যে পবিত্রতা মা ও শিশুর মধ্যেও সেই পবিত্রতা বিদ্যমান। মা তার সন্তানকে পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে লালন করে। প্রকৃতির মধ্যে মানুষও সে রকম মমতায় থাকে।[৯২] এই মমত্ববোধ তুলে ধরেছেন মা ও শিশুকে প্রকৃতির ফুল-লতা-পাতার মধ্যে নিজস্ব কম্পোজিশনে। সেখানে মা ও শিশুর ড্রয়িং পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ইজম প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত।

শিল্পী নাসরীন বেগমের প্রকৃতি-চিত্রণ ও বিশেষত ক্যাকটাস চিত্রণ দ্বারা বাপ্পী প্রভাবিত। তাই তাঁর অনুশীলন পর্বের কাজগুলোতে ক্যাকটাস বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। যদিও ক্যাকটাস আমাদের দেশীয় ফুল নয়, কিন্তু শহরের পরিবেশে বাড়ির টবে দেখেছেন ছেলেবেলায়। তাই সেই অনুভূতি ক্যাকটাসের ফুলের সৌন্দর্য তাঁর মানসপটে বারবার নাড়া দিয়েছে এবং শিক্ষক নাসরীন বেগমের কাজ দেখে ক্যাকটাস অঙ্কনে প্রভাবিত হয়েছেন। *ওল্ডম্যান ক্যাকটাস* শিরোনামের চিত্রে তিনি ক্যাকটাসকে একটি বৃদ্ধ মানুষের মুখের অবয়ব কল্পনায় দেখেছেন। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়ায় তাঁর কাল্পনিক দৃষ্টিশক্তির পরিচয় মেলে। সেই সাথে প্রকৃতি ও মানুষের অভিন্ন আত্মার দৃষ্টিভঙ্গিজনিত দর্শনও ব্যক্ত হয়েছে এই চিত্রে।

কম্পোজিশন চিত্রে জড়-জীবন তুলে ধরেছেন। কাজটি চতুর্থ বর্ষে সৃজনশীল কম্পোজিশন ক্লাসের কাজ। ক্লাসে সাজিয়ে দেয়া ফুল ও মাটির পাত্র দেখে কম্পোজিশন করেছেন। চিত্রে শিল্পীর কাল্পনিক বোধ চিত্র জমিনকে ফর্মে বিভাজন করার বিশেষত্বে জড়-জীবনের অন্তরালে একটি গল্প তৈরি হয়েছে। প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় অবজেক্টের বিন্যাসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের করণ-কৌশলের সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

শিল্পী তাঁর অনেক ছবিতে ঝরা পাতার কাব্য এঁকেছেন। বিষয়চিন্তার দিক থেকে এ বিষয়টি এবং পাতা হিসেবে অবজেক্টটি নাসরীন বেগমের চিত্র দ্বারা প্রভাবিত। বাপ্পী সে কথা অকপটে স্বীকারও করেন।[৯৩] টেকনিকের দিক থেকে চিত্র জমিনে পেপার হোয়াইট রেখে রেখে বস্তুর ডাইমেনশন বের করা, টেক্সচার তৈরি করাও নাসরীন বেগমের টেকনিক দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন বাপ্পী। তাঁর ওয়াশ পদ্ধতির মধ্যে রিয়ালিজমের আবহ লক্ষণীয়। তিনি প্রকৃতির, বিশেষত ল্যান্ডস্কেপ করেন পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় রঙের টোন ব্যবহারে। সেই টেকনিক প্রয়োগ করেছেন প্রাচ্যরীতির ইনডোর ওয়াশ পদ্ধতির চিত্রে।

বাপ্পীর প্রকৃতি সিরিজের চিত্র বাস্তবঘেঁষা হলেও পরাবাস্তবতার মিশ্রণ লক্ষণীয়। ঝরা পাতা তাঁর চিত্রে ধরা দেয় বাস্তব ও অধিবাস্তবের সমন্বিত রূপ হয়ে। ২০০৮ সালের চারুকলার বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জলরং পুরস্কার অর্জন করেন তিনি। এই চিত্রে পাতার ড্রয়িং ও কর্ম বাস্তবধর্মী হলেও কম্পোজিশন ও রঙের ব্যবহার পরাবাস্তবতার আদল লক্ষণীয়। তিনি এখানে পাতার কাল্পনিক কালার ব্যবহার করেছেন। বিষয়চিন্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ঝরা পাতা নষ্ট জিনিস। কিন্তু তারও আছে সৌন্দর্য। এখানে পাতার বিলীন হওয়ার সৌন্দর্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। জীবন-প্রবাহের কোনো অংশই নষ্ট বা ক্ষয়ে

যাওয়ার নয়। সবকিছুই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের প্রতিটি স্তরই সুন্দর। এখানে প্রকৃতির বিলীন হওয়ার সৌন্দর্য পজেটিভ ভাবনায় তুলে ধরতে চেয়েছি।'[৯৪]

Alliance Francaise de Dhaka গ্যালারিতে ২০১১ সালে বাপ্পীর প্রথম প্রদর্শনী হয়। এ প্রদর্শনীতে তাঁর বি.এফ.এ অনুশীলন পর্বের কাজই বেশি ছিল। এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> মোঃ নাজমুল হক বাপ্পী প্রাচ্যশিল্প ও বাস্তববাদি শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার ছাত্রজীবনের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছে। চিরন্তনী বাংলার সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা যে রূপটি রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে সে শিল্পী হতে চাচ্ছে। প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে যে অনুপুঙ্খতা থাকে তার কাজে তা চিত্রার্পিত হয়েছে নিবিড় অনুশীলনে।[৯৫]

চিত্র ২২৪ : Nature-14
জলরং, ২০১১

চিত্র ২২৫ : Cactus Flower-12
জলরং, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১২

চিত্র ২২৬ : Child in small pond
জলরং, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১১

প্রকৃতি চিত্র অঙ্কনের জন্য তিনি ল্যান্ডস্কেপ, ক্যাকটাস, ঝরা পাতা, আকাশ, চাঁদ, বিভিন্ন রকম গাছ, লতা-পাতা, ফুল, মাটি, নদী, পানি প্রভৃতি উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব কম্পোজিশনে। Nature-14 ছবিতে তিনি ল্যান্ডস্কেপ তৈরি করেছেন। পাশ্চাত্যরীতির বাস্তবধর্মী ড্রয়িং এবং প্রাচ্যের ওয়াশ পদ্ধতির জলরং এবং মোগল মিনিয়েচারের মাল্টি পারস্পেকটিভে একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করে প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন। ছবিতে আকাশের রং দিয়েছেন লাল করে। কম্পোজিশন ব্যালান্স, টেক্সচার ও অলংকরণের প্রয়োজনে পেপার হোয়াইট রেখে রেখে রং দিয়েছেন।[৯৬] Child in small pond ছবিতে বর্ষায় চারুকলা দৃশ্যকে সাজিয়েছেন। মূল বিষয়কে ফোকাস করতে মাঝে ডিম্বাকার একটি ফর্মের মধ্যে ভাস্কর্যকে বসিয়েছেন। এই ফর্মকে তুলনামূলক হাইলাইট রেখেছেন। বর্ষাস্নাত চারুচত্বরের লতানো গাছপালাকে চিত্র জমিনে মনের মাধুরীতে সাজিয়েছেন। এই ছবিতে ভাস্কর্যগুলো পাশ্চাত্য বাস্তবধর্মী এবং প্রকৃতি প্রাচ্যধর্মী। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যরীতির সমন্বিত উপস্থাপনে তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

প্রাচ্যরীতির ছাত্র বাপ্পী ২০১১ সালে চারুকলার বার্ষিক প্রদর্শনীতে 'নিরীক্ষামূলক পুরস্কার' পেয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে পুরস্কার অর্জন করেছেন। ২০০৯ সালে ১৪তম

Dhaka University Institutional Repository

বার্জার নবীন শিল্পী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন জিয়াউর রহমান স্বর্ণপদক, UNAIADS আয়োজিত Vilolence against Woman and HIV/AIDS বিষয়ক চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ২০১২ সালে পেয়েছেন China-Bangladesh friendship award। পুরস্কারপ্রাপ্ত এসব কাজের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি শুধু প্রাচ্যরীতিতেই পারদর্শী নন, পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতেও সমান পারদর্শী।

চিত্র ২২৭ : China Bangladesh Friendship পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি

চিত্র ২২৮ : জিয়াউর রহমান স্বর্ণপদক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি, অ্যাক্রেলিক, ২০১০

চিত্র ২২৯ : Obstacle-6, ২০০৮ জলরং, ৫০ × ৬০ সেমি, ২০১১

বার্জার পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজে তেলরং পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি প্রয়োগে এঁকেছেন শহরের দৃশ্য। জিয়াউর রহমান স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছবি এঁকেছেন অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে। চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিতে অ্যাক্রেলিক রং ব্যবহার করেছেন ওয়াশ পদ্ধতির আদলে। এ চিত্রে কনসেপচুয়ালভাবে উপস্থাপন করেছেন Beautiful Bangladesh Beautiful China বিষয়। দুই দেশের মাতৃত্ব ও জাতীয় ফুল ও দৃশ্য যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন কিছুটা প্রতীকী কম্পোজিশনে। এ ছাড়া দুই দেশের ভাতৃত্বের ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্যালেন্ডারের রিং লাগানো দুটি পাতায় উপস্থাপন করে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এমন অনেক কাজেই বিষয় ও চিন্তার গভীরতা ফুটে উঠেছে। Freedom চিত্রে জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী' কবিতায় আসমানীর দুঃখী জীবন তুলে ধরে সমাজের অব্যবস্থাপনার প্রতি কটাক্ষ ছুড়েছেন। তিনি চিত্র মাঝে নিজের মন্তব্য ক্যালিগ্রাফিতে লিখে দিয়েছেন। লিখেছেন 'আসমানীদের জীবনকথা, আছে তেমনি ছিল যথা'।

নাজমুল হক বাপ্পী ২০১২ সালে আলিয়ঁস ফ্রঁসেস গ্যালারিতে 'Absorbed Nature' শিরোনামে তৃতীয় প্রদর্শনী করেন এবং ডিসেম্বর মাসে The Bangladesh Young Artist Workshop in China 2012-তে যোগ দেন। এই ওয়ার্কশপে তিনি চায়নিজ পেইন্টিংয়ের নানা টেকনিক শেখেন, যা তাঁর পরবর্তী কাজগুলোতে প্রভাব ফেলে। ক্যানভাস ও সিল্কের ওপর অ্যাক্রেলিক রঙের প্রয়োগে প্রাচ্যরীতির চিত্র এঁকেছেন। এসব চিত্রে ক্যাকটাস ও প্রকৃতি উপস্থাপনে সরলীকরণ করেছেন, যাকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় নতুন পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

চিত্র ২৩০ : Cactus-50
জলরং, ২০১১

চিত্র ২৩১ : Close-Up, সিল্কের ওপর অ্যাক্রেলিক
৭৭ × ৬০ সেমি, ২০১২

চিত্র ২৩২ : Love-4, ক্যানভাসের ওপর
অ্যাক্রেলিক, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১১

শিল্পী নাজমুল হক বাপ্পী চীনের ১০০টিরও বেশি আর্ট গ্যালারির কাজ দেখেছেন। যা তাঁর ভ্রমণ-পরবর্তী কাজে প্রভাব ফেলেছে। চীনের চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যম ও টেকনিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এজন্য তাঁর কাজের ধরনে ও বিষয়চিন্তায় পরিবর্তন এসেছে।

তিনি শিখেছেন, মানুষে মানুষে যেমন বৈপরীত্য ও ঐক্য আছে তেমনি Art instrument-এর মধ্যেও বৈপরীত্য ও ঐক্য আছে। কালারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোনো কালার কোনো কালারের সাথে সহাবস্থান করে, কখনো দূরে সরিয়ে দেয়। বাপ্পী কালারের এই রাসায়নিক প্রকৃতি ব্যবহার করে তাঁর চিত্রে টেক্সচার আনতে চেষ্টা করেছেন ২০১২–১৩ সালের কাজে। বর্তমানে তিনি চীন সরকারের স্কলারশিপে পিএইচ.ডি. উচ্চশিক্ষার জন্যও মনোনীত হয়েছেন।

মূলত বাপ্পীর ক্যাকটাস, ঝরা পাতা সহযোগে প্রকৃতির রূপ চিত্রিত ছবিগুলোই প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। পাশ্চাত্য একাডেমিক জলরং পদ্ধতি ও প্রাচ্যের জলরং ওয়াশ এবং বিষয় উপস্থাপনে চিন্তাগত উপস্থিতিতে তাঁর চিত্রকলা দৃষ্টিনন্দিত হয়েছে।

চিত্র ২৩৩ : Cactus Flower-3
জলরং, ৫৫ ×৩৮ সেমি ২০১১

চিত্র ২৩৪ : Fallen Leaves
জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি, ২০০৮

চিত্র ২৩৫ : Nature-39
জলরং, ৯০ × ৬৮ সেমি, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

বাপ্পীর তৃতীয় একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুস্তাফা মনোয়ার শুভেচ্ছা বাণীতে লিখেছেন, 'একটি পরিপূর্ণ শিল্পী-মেজাজ উপস্থাপিত হয়েছে তার শিল্প-সম্ভারে।'[৯৭]

বাপ্পী তাঁর শিল্পভাবনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ধারণা রাখেন। তিনি বলেন :

> শিল্পের গণ্ডিতে ভাবনা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রকৃতির রূপ, রস, ঐকতান আমার ছবিতে বার বার ঘুরে ফিরে আসে। প্রাচ্যরীতি বিষয়ে আমার অধ্যয়ন থাকায় স্বাভাবিকভাবেই আমার ছবিতে প্রাচ্যধারা একটি নির্দিষ্ট পথে আমাকে পরিচালনা করে। কখনো তার সাথে যুক্ত হয় মায়াময় মোহনীয়তার ইন্দ্রজাল। দেখা ও অদেখা ভুবনের একটি সম্মিলিত প্রয়াস আমার ছবিতে কাব্যিকতার বর্ণময়তা তৈরি করে। পশু, পাখি, মানুষ ও তার নিজস্ব গণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে এক মায়াবী পরশে উত্তীর্ণ হয়। শুরুর দিকে মাধ্যম হিসেবে জলরঙে আমি বেশি কাজ করেছি। পরবর্তীতে অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে আমি নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাচ্য ধারা ও তার সাথে নানা রকম টেক্সচার ও বর্ণ প্রলেপের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধারার মিশ্রণ ঘটাতে চেষ্টা করেছি।[৯৮]

উপরোল্লিখিত মন্তব্যে বাপ্পীর শিল্প-ভাবনা স্পষ্ট হয়েছে। বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় নাজমুল হক বাপ্পীর কাজের ধরন, বৈশিষ্ট্য ও অবদান নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায় :

(ক) তাঁর চিত্র উপস্থাপনার বিশেষত্বে দৃষ্টিনন্দনের বাইরেও আলাদা মেসেজ প্রকাশ করে।

(খ) বাস্তবধর্মী অবজেক্ট ব্যবহার করে প্রাচ্যের ইলিউশন এনেছেন চিত্রে।

(গ) তাঁর কাজে সুরিয়ালিজম ভাবধারার সাথে মিল আছে।

(ঘ) প্রাচ্যরীতির চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের রীতিতে চিত্র এঁকেছেন।

(ঙ) সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার অসংগতি দিকগুলো প্রতীকী উপস্থাপনায় তুলে ধরেছেন চিত্রে।

সিনথিয়া আরেফিন (জন্ম ১৯৮৫)

শিল্পী সিনথিয়া আরেফিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের অন্যতম ছাত্রী। তিনি মৌ নামে পরিচিত। সামাজিক ও সাংগঠনিক কাজে নেতৃত্ব দেয়ার কাজে তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকাই তাঁকে সকলের কাছে পরিচিত হতে সাহায্য করেছে। তিনি ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই বিশ্বপ্রকৃতিকে বিস্ময়ের চোখে খুঁজতেন। আকাশে মেঘ দেখলে মেঘের মধ্যে হাতি-ঘোড়ার আকৃতি খুঁজতেন, দেখতে পেতেন নানা রকম জীবজন্তু ও পরিচিত নানা রকম ফর্ম। শেওলা-ধরা দেয়াল কিংবা মাটির তলে খুঁজতেন নানান ফর্ম। অর্থাৎ দেখতে পেতেন বিচিত্র ছবি। প্রকৃতির এসব বিষয় থেকে আকার-আকৃতি খুঁজে নিয়ে নিজের মতো ড্রয়িং করতেন' কখনো পেনসিল, কলমে কিংবা ইটের টুকরা দিয়ে পিচ ঢালা শানে।[৯৯] শিল্পী রেজাউল করিম ছিলেন দুঃসম্পর্কের নানা। তাঁর স্টুডিয়োতে যাতায়াত সূত্রে ছবি আঁকার বিষয়াদি ছেলেবেলা থেকেই জেনেছেন। কচিকাঁচার আসরে ছবি আঁকা শিখেছেন। টাঙ্গাইল শহরের বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন নিয়মিত।

সিনথিয়া ১৯৯৯ সালে এস.এস.সি এবং ২০০১ সালে এইচ.এস.সি পাস করে ঢাকায় আসেন। ঢাকার ইডেন কলেজে জীববিদ্যায় ভর্তি হন। এক বছর ক্লাস করে ভালো লাগেনি। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ সম্মান ভর্তি হন। মূলত এটাই ছিল তাঁর সত্যিকারের বিচরণ-ভূমি।

সিনথিয়া নারী স্বাধীনতার পক্ষে নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। আমাদের সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্য, প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিকারের বিষয়ে তাঁর অনুভূতি তীব্র। নিজের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বেছে নিলেন এসব বিষয়। চতুর্থ বর্ষে সৃজনশীল ড্রয়িং ক্লাস করতে গিয়ে অনুভব করলেন ড্রয়িংয়ের স্বাধীনতা। ড্রয়িংয়ের স্বাধীনতায় নারী স্বাধীনতার বিষয়গুলো ফুটিয়ে তুললেন ক্যানভাসে।

চিত্র ২৩৬ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৩
মিশ্র মাধ্যমে ড্রয়িং, ৬০ × ৬০ সেমি
২০০৯

চিত্র ২৩৭ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৫
মিশ্র মাধ্যমে ড্রয়িং, ৫৬ × ৮৬ সেমি
২০০৯

চিত্র ২৩৮ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৬
মিশ্র মাধ্যমে ড্রয়িং, ৮৬ × ৫৫ সেমি
২০০৯

২০০৭ সালের বি.এফ.এ সম্মান পরীক্ষা ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০৯ সালের এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা হয় ২০১৩ সালে। এ সময়ের মধ্যে সিনথিয়া *সামাজিক প্রতিবন্ধকতা* শিরোনামে অনেক চিত্র এঁকেছেন। ড্রয়িংয়ের আদল, রং ব্যবহার, বিষয়বস্তুতে নিজস্ব একটি ঘরানা তুলে ধরেন। প্রথম দিকের কাজ হ্যান্ডমেইড কাগজ ও ক্যানভাস পেপারে মিশ্র মাধ্যম অর্থাৎ ড্রাই প্যাস্টেল, গ্লাস মার্কার ও পারমানেন্ট মার্কার দিয়ে ড্রয়িং করতেন। এই ড্রয়িংগুলোতে বিভিন্ন মৌলিক রঙের লাইন ব্যবহার করতেন। পরবর্তী সময়ে সিনথিয়া ক্যানভাস ব্যবহার করেন। ক্যানভাসে ড্রয়িং এবং অ্যাক্রেলিক কালারের ওয়াশ দিয়ে এবং মোটা রঙের কালো লাইন ব্যবহার করে ছবি এঁকেছেন। জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতেও চিত্র এঁকেছেন। তিনি বলেন, 'আমার প্রথম পর্যায়ের কাজ অনেক বেশি মৌলিক কালার দিয়ে করা। আমাদের সমাজে ভ্রূণ হত্যার প্রতিবাদে এই মৌলিক কালার ব্যবহার করেছি। নারীর মৌলিকত্ব এবং কন্যাশিশুর মৌলিকত্বের অপমৃত্যু ভাবনায় আমার ক্যানভাসে মৌলিক রঙের ব্যবহার করেছি।'[১০০]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৩৯ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-১৭
ক্যানভাসে ড্রয়িং, ৮১×৬০ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৪০ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-১৮
ক্যানভাসে ড্রয়িং, ৮১×৬০ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৪১ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-২
মিশ্র মাধ্যম, ৭৪×৫৪ সেমি, ২০০৯

সিনথিয়া তাঁর কাজে যেসব অবজেক্ট ব্যবহার করেছেন তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। তাঁর চিত্রের নারীরা বৃহৎ স্তনের অধিকারী। এই স্তন নারীর সৌন্দর্যের অংশ। আবার সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এই সৌন্দর্য নারীর সমস্যারও কারণ। সিনথিয়া চান সমাজের মানুষেরা, বিশেষত পুরুষেরা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এই শারীরিক গঠনকে সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মনে ধারণ করুক। তিনি নারীদের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখিয়েছেন। কারণ, নারীরা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হয়। সেই বাধার রূপক হিসেবে তিনি রশি ব্যবহার করেছেন।[১০১]

সিনথিয়া সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত উভয় শ্রেণির নারীদের সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। উভয় শ্রেণির নারীদেরই প্রতিবন্ধকতা শিকার হতে হয়। হয়তো ক্ষেত্র একটু ভিন্ন। তিনি নারীর গঠনকে ঢাউস অর্থাৎ বলিষ্ঠ করে এঁকেছেন। হাত-পা লম্বা করে এঁকেছেন। এর সপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, নারীরা অনেক সম্ভাবনাময়। তাদেরও আছে হাত-পায়ে চলার শক্তি। কিন্তু মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার কুসংস্কারে তারা তার ব্যবহার করতে পারে না। এজন্য তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামিকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, নারীদের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা প্রয়োগ হচ্ছে। তিনি তাঁর চিত্রের মাধ্যমে সমাজের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে চান। নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে চান। নারীদের অনগ্রসরতা ও পরাধীন অবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান।[১০২]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৪২ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-২৮
অ্যাক্রেলিক, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৪৩ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-২৯
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৪৪ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৪০
অ্যাক্রেলিক, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০১৩

সিনথিয়া প্রাচ্যকলা বিভাগের একাডেমিক চিত্র-ঐতিহ্য বজায় রেখে তাঁর চিত্র রচনা করেছেন। তবে তাঁর বিষয়চিন্তা সমাজের বিশেষ চেতনাকে নাড়া দেয়। প্রতিকার ও প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সমাজসংস্কারে পথ্য ও ওষুধ হিসেবে কাজ করে। প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চায় সাধারণত ক্যানভাস ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সিনথিয়া ক্যানভাস ব্যবহার করে লাইন ড্রয়িং করেছেন। তাঁর এই চিত্রের লাইন ব্যবহার হয়েছে বিষয়চিন্তার সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রতিবাদের ভাষার মতোই দৃঢ়। নারীর লাবণ্য প্রকাশে নয়, তাঁর রেখা হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা।

সিনথিয়ার চিত্রের আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর ফিগার কম্পোজিশন। ফিগারগুলো আঁকেন ঝুলন্ত অবস্থায়। তাঁর ভাষায়, 'নারী হিসেবে আমাদের চিন্তাভাবনা সরল ও সোজা কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ ঝুলন্ত করে দেখে এবং নারীর সম্ভাবনাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখে। নারীর চাওয়া-পাওয়ার সব কিছুই ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।'[১০৩]

এ ছাড়া সিনথিয়ার কাজে আয়না ব্যবহৃত হয়েছে। নারীরা তাদের সমস্যাগুলো আয়নাতে প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখে। উত্তরণের পথ খোঁজে।

শিল্পী নাসরীন বেগমের স্টুডিয়োতে বসে কিছুদিন কাজ করেছেন সিনথিয়া। সে সময় চায়নিজ ইঙ্ক ব্যবহার করে ওয়াশ ও টেক্সচার সৃষ্টির পদ্ধতিগুলো রপ্ত করেছেন। উদ্যমী ও সাংগঠনিক শিল্পী সিনথিয়া বিভিন্ন সংগঠন ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকেন। তিনি নানা আর্টক্যাম্প ও ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছেন। ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি প্রদর্শনীতে তিনি উপস্থিত থাকেন। বর্তমান সময়ে শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাবধান হয়ে চলতে হচ্ছে। তাঁর ছবির কথা, মনের কথা এবং কর্মের ভাষা সমার্থক হিসেবে চলমান।

উপরোল্লিখিত আলোচনায় শিল্পী সিনথিয়া আরেফিনের চিত্রকর্ম ও প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় তাঁর অবদান নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায় :

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় ক্যানভাসের ব্যবহার করেছেন।

(খ) সামাজিক বক্তব্যনির্ভর চিত্র এঁকেছেন।

(গ) প্রাচ্যচিত্রকলায় রেখার ব্যবহারকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন।

সুমন কুমার বৈদ্য (জন্ম ১৯৮৫)

শিল্পী সুমন কুমার বৈদ্য সিলেট সদরে জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৮৫ সালের ১৬ জানুয়ারি। তিনি প্রাইমারি স্কুলের প্রথম ধাপ থেকেই ড্রয়িং ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। শিশু চিত্রাঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা ক্লাস থ্রি-তে পড়াশোনার সময়েই। প্রাইমারি স্কুলে পাঠ নেয়ার পাশাপাশি সিলেট শিশু একাডেমি এবং পরবর্তী সময়ে শিল্পকলা একাডেমিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার কোর্স সম্পন্ন করে সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রাইমারি ও হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২০০টির অধিক সনদপত্র অর্জন করেছেন। যার মধ্যে প্রথম পুরস্কারের সংখ্যাই বেশি।[১০৪]

সুমন কুমার বৈদ্য যেহেতু সিলেট শহরে বড়ো হয়েছেন তাই নগর জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রশিক্ষার সুযোগ ঘটেছে অনায়াসে। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রশিক্ষার গুরু অরবিন্দ দাস গুপ্ত। অরবিন্দ দাসের কাছে ড্রয়িং, পেনসিল স্কেচ ও জলরং শিখেছেন। এসব মাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিত ও কম্পোজিশনও তিনি রপ্ত করেছেন কৈশোরে।

শিল্পী সুমন কুমার এইচ.এস.সি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ)-এর প্রাচ্যকলা বিভাগে ২০০৪ সালে ভর্তি হন। ২০০৭ সালে বি.এফ.এ এবং ২০০৯ সালে এম.এফ.এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। মূলত প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা শিক্ষার শক্ত ভিত থাকায় চারুকলার শিক্ষা জীবনে দ্বিতীয় হতে হয়নি সুমনকে। প্রাচ্যরীতির বিশেষ টেকনিকই সুমন কুমারের ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু প্রকৃতিকে রপ্ত করার নেশায় প্রতিনিয়তই প্রচুর ওয়াটার কালার স্টাডি করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এসব স্টাডি তাঁর প্রাচ্যকলা বিভাগের কোর্সে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাস্তবধর্মী নিসর্গ চিত্র অঙ্কন করে সুমন কুমার তাঁর প্রাচ্যরীতির চিত্রে ব্যবহার করেছেন এবং প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির জলরং ব্যবহারের বিশেষ কৌশলকেও পাশ্চাত্যধর্মী নিসর্গ চিত্র অঙ্কনে ব্যবহার করেছেন।

চিত্র ২৪৫ : ঘরে ফেরা-২
জলরং, ৩৮ × ৫৫ সেমি, ২০১০

চিত্র ২৪৬ : ঘরে ফেরা-৪
জলরং, ৪০ × ৫৫ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৪৭ : ঘরে ফেরা-৫
জলরং, ৪০ × ৫৫ সেমি, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

এসব ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে প্রাচ্যের বেঙ্গল স্কুলের ওয়াশ এবং পাশ্চাত্যের একাডেমিক দৃশ্যচিত্রণের ধরন-ধারণের মধ্যে সমন্বয় লক্ষ করা যায়। শিল্পী সুমন কুমার বৈদ্য চিত্রের বিষয় চিত্রণে সদা নতুনের পিয়াসী। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সিরিজে কাজ করেছেন। কৈশোরে তাঁর চিত্রের বিষয় প্রকৃতি, মানুষ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান হলেও অনার্স লেভেলের শিক্ষায় তিনি প্রাচ্যশিল্পের ষড়ঙ্গ মেনে কাজ করেছেন। প্রাচ্যচিত্রকলার প্রাণ রেখাকে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব ঢঙে। এ পর্বের কাজে গৌতম বুদ্ধ, বাংলাদেশের পুরাকীর্তি, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, নারী-সৌন্দর্য, প্রেম-ভালোবাসার এক্সপ্রেশন প্রভৃতি বিষয় এসেছে। তবে সবচেয়ে যে বিষয়ে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন তা হলো সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার বিষয়। বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রশিল্পীদের কাছে প্রকৃতি ও নারীর একটি নির্দিষ্ট রূপ বারবার চিত্রিত হয়ে আসছে। সাহিত্য-পুরাণনির্ভর এসব চিত্রে প্রায়ই অতীত স্মৃতিনির্ভর অভিব্যক্তির প্রকাশ হতে দেখা যায়। যেন সাহিত্য-পুরাণনির্ভর এবং নারীর বিভিন্ন রাগ-অনুরাগ-অপেক্ষার চিত্রই প্রাচ্যচিত্র। সুমন সেই ধারা থেকে সরে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সমসাময়িক পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীদের উপস্থাপনার আদল ও বিষয়-চিন্তায়। তিনি প্রাচ্যরীতির টেকনিককে ব্যবহার করে সমসাময়িক বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেছি। যা আমার বিভিন্ন সময়ে ভালো লাগা মন্দ লাগা মানবিক অবস্থার প্রতিফলন। এসব বিষয়গুলির মধ্যে আমার ভাবনায় প্রায়ই মানুষের জীবন প্রবাহই অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন টানাপড়েন, দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, লাঞ্ছনা, জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াই ইত্যাদি।'[১০৫]

সুমন বৈদ্য *প্রকৃতির প্রতিশোধ, আমি শান্তি চাই, ছলনার শিকার, পাখি কখন জানি উড়ে যায়, উত্তরণ, ইভ টিজিং* সিরিজচিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রতিটি সিরিজচিত্রে তাঁর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। এসব চিত্রে নারী ফিগারের পাশাপাশি পুরুষ ফিগার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচ্যচিত্রকলায় নারী চরিত্র চিত্রণের প্রবণতা বেশি। সে বিচারে সুমন কুমার বৈদ্যের প্রকাশ ভঙ্গিমায় পুরুষ ফিগার ব্যবহার নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। এসব ফিগারে তিনি পাশ্চাত্য একাডেমিক ঘরানার বাস্তবধর্মী অনুভূতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লাইন ব্যবহার ও রঙের স্বচ্ছ ব্যবহারে প্রাচ্যের রীতি অনুসৃত হয়েছে। এক্ষেত্রেও তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের করণ-কৌশলকে সার্থকভাবে সমন্বয় করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৪৮ : ইভ টিজিং
জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৪৯ : প্রকৃতির প্রতিশোধ
জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৫০ : উত্তরণ
জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৫১ : পাখি কখন জানি উড়ে যায়
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১

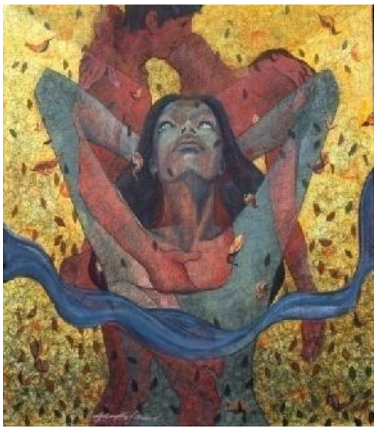

চিত্র ২৫২ : ছলনার শিকার-১
জলরং, ৬০ × ৬০ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৫৩ : আমি শান্তি চাই
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১

প্রকৃতির প্রতিশোধ সিরিজচিত্রে তিনি মানুষ-সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিষয়ের অশনি সংকেত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে :

> মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতির ওপর তার আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে ক্রমশ আগ্রাসন চালাচ্ছে। সবখানে বন-জঙ্গল কেটে বসতভিটা, মিল, কারখানা ইত্যাদি তৈরি করছে। বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু অক্সিজেন দরকার সেটা পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন মনে করছে না। যার ফলে নিজের তৈরি ফাঁদে মানুষ নিজেই ধরা পড়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য ঠিক না থাকার কারণে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যার ফলে মানুষ পড়েছে মহাবিপদে। পতিত হচ্ছে মৃত্যুমুখে।’[১০৬]

সুতরাং বলা যায়, সমাজ সচেতনতা, প্রকৃতি সচেতনতা শিল্পীর বিষয়ের মূল ভাবনা। *প্রকৃতির প্রতিশোধ* সিরিজচিত্রে প্রকৃতির ভয়াবহতা প্রতীকী বস্তু (দুর্বল চেয়ার, বিষাক্ত পানি, পোকা, ঝরা পাতা, পাতা-শূন্য গাছ) ব্যবহার করেছেন। এই চিত্রমালায় মানুষের বিপদগ্রস্ততা কল্পনায় প্রতীকী রূপায়ণে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে শিল্পী তাঁর চিত্রকে সচেতনতার মাধ্যম হিসেবে প্রকাশ করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আতঙ্ক শিল্পীর মনে দুঃস্বপ্ন হয়ে ধরা দেয়। তাই তিনি সেই দুঃস্বপ্নের গল্প আঁকেন চিত্রে। তিনি বলেন, ‘প্রকৃতির প্রতি প্রেম আমার

অতি মাত্রায়। তাই একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে আমি আমার দায়িত্ববোধের মৌলিক জায়গা থেকে রং-তুলির মাধ্যমে এই ভয়াবহ মানব সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনসমক্ষে তুলে ধরি, যাতে করে মানুষ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরো সচেতন হয়।'[১০৭]

উত্তরণ সিরিজচিত্রে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি কারণযুক্ত মানসিক যন্ত্রণায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিত্রিত করেছেন। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতীকী ডানা সংযুক্ত করেছেন মুক্তিকামী মানুষের সাথে। এই সিরিজচিত্রে শান্তির প্রতীক হিসেবে সাদা কবুতর আবার অশনি সংকেত হিসেবে কাক এঁকেছেন। ঘটনা, দুর্ঘটনা, অশান্তি, হতাশার গল্প তৈরি করেছেন চিত্রজমিনে।

শিল্পী সুমন সমাজ সচেতন। চারপাশের পরিবেশ, সামাজিক ও রাজনৈতিক খারাপ বিষয়গুলো তাঁকে প্রতিনিয়ত ভাবায়। তাঁর চিত্রে এসব ভয়াবহতার গল্প প্রতীকী হয়ে ফুটে ওঠে। সমাজে নারীরা বিভিন্ন প্রতারণার শিকার হয়। এসব নারী কখনো অসহায়, কখনো প্রতিবাদী। ছলনার শিকার হবার পর তাঁদের আত্মানুভূতি, মানসিক অবস্থা, অসহায়ত্ব, বিদ্রোহ, নিরূপায় প্রতিশোধের অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন।

শিল্পীর মনে জাগতিক বিষয়, পারলৌকিক ভাবনা এবং আত্মোপলব্ধি কিংবা নিজেকে খোঁজার অনুভূতিতাড়িত করে। এমন ভাবনার সিরিজচিত্র হচ্ছে *পাখি কখন জানি উড়ে যায়*। লালনের দর্শন এবং তাঁর গান সুমনকে ভাবায়।[১০৮] প্রাচ্যের লালন দর্শন যেন তুলে ধরেছেন প্রাচ্যচিত্রকলার দ্বিমাত্রিক সরলীকরণে।

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় প্রকৃতি ও মানুষের ফিগার বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুমনের চিত্রের প্রকৃতি ও মানব ফিগারেরই সহাবস্থান। কিন্তু তাঁর চিত্রের মানুষ ফিগারের ব্যবহার আলাদা রকমের রং, ফর্ম, টেক্সচার পাশ্চাত্যের একাডেমিক চিত্রচর্চার আদলে হলেও ওয়াশ পদ্ধতির রং ব্যবহার সম্পূর্ণ প্রাচ্যরীতির। শিল্পী নাসরীন বেগমের প্রতীকী ঝরা পাতা ব্যবহারের টেকনিকে চিত্রজমিনে টেক্সচার সৃষ্টির প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি প্রভাবিত। তবে করণ-কৌশলে সুমন তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। ঝরা পাতা, স্বচ্ছ পানির স্তর, ছন্দায়িত লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফর্ম তাঁর প্রতিটি সিরিজচিত্রে আইকন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়চিন্তা ও টেকনিকে তিনি নিজস্ব ভঙ্গীমা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী সুমন কুমার বৈদ্যকে প্রাচ্যশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় যেভাবে মূল্যায়ন করা যায় তা নিম্নরূপ :

(ক) তাঁর কাজে সমাজবাস্তবতার সমসাময়িক বিভিন্ন খারাপ দিকগুলো উঠে এসেছে, যা মানুষকে প্রকৃতি সচেতন ও সামাজিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখছে।

(খ) প্রাচ্যের ওয়াশ পদ্ধতি ও রেখার ব্যবহার এবং পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী উপস্থাপনাকে সমন্বয় করে নিজস্ব ভাষা তৈরি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্বশিল্পকলার কনসেপচুয়াল বুদ্ধিবৃত্তিক ধারায় নিজেকে উপস্থাপন করেছেন প্রাচ্যরীতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে।

মমতাজ পারভীন মাধবী (জন্ম ১৯৮৭)

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার দুটি প্রধান ক্ষেত্র। প্রথমটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগ। অন্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা গ্রুপ। শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারীর শিক্ষকতায় রাজশাহী প্রাচ্যচিত্রকলায় স্বতন্ত্র এক ঘরানার উন্মেষ ঘটেছে। ঢাকা চারুকলা অনুষদে নব্য-বেঙ্গল স্কুলের অবনসৃষ্ট ওয়াশ মিডিয়ায় চিত্রকলা অঙ্কন হলেও রাজশাহী প্রাচ্যকলা গ্রুপের শিক্ষার্থীরা শান্তিনিকেতনের নন্দলাল ঘরানার টেম্পারা-প্রধান চিত্রকলা চর্চাই বেশি করে থাকেন। যার নেপথ্য কারণ হিসেবে শিক্ষক শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারীর দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা ও টেম্পারা মিডিয়ায় কাজ করাকে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া চিত্রের বিষয়ের ক্ষেত্রেও সমসাময়িক বাস্তবতার যে ঘরানা উঠে এসেছে—তাও সুশান্ত কুমার অধিকারীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব দ্বারাই প্রভাবিত।

মমতাজ পারভীন মাধবী রাজশাহীর প্রাচ্যকলা গ্রুপের ছাত্রী এবং বর্তমানে ওই গ্রুপেরই শিক্ষক। তিনি ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজশিক্ষক বাবার চাকরিসূত্রে বগুড়ায় যাতায়াত ছিল। অর্থাৎ বগুড়ায় গ্রামবাংলার নিসর্গ সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। মা মালিহা জামান শিল্পানুরাগী। তিনি বাটিক, ক্রিস্টাল ও মোমের শো-পিস, ওয়াশ মেইড তৈরি করতেন। ফলে শিল্পবিষয়ক রুচি তৈরির প্রথম পাঠ মায়ের হাতের কাজ দেখেই শিখিয়েছেন। মায়েরও প্রবল ইচ্ছা ছিল মেয়েকে দিয়ে ছবি আঁকাবার। আলাদা করে ছবি আঁকার স্কুলে না পড়লেও মাধবী প্রাইমারি ও হাই স্কুলের ড্রয়িং ক্লাসে, ছবি আঁকার ক্লাসে সবার চেয়ে ভালো করতেন। তিনি ২০০১ সালে এস.এস.সি পাস করেন রাজশাহীর কাদিরগঞ্জের শহীদ নাজমুল হক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। ওই সময় তাঁর মা বুটিকের একটি শোরুম দেন। যেখানে কারিগরদের নানান শোপিস ও বুটিকের কাজ করতে দেখেছেন। এমনকি কারিগররা বাসায় বসেও কাজ করতেন।

মাধবী ২০০৩ সালে সরকারি মহিলা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর মায়ের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে ২০০৪–০৫ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা গ্রুপে বি.এফ.এ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। প্রাচ্যকলা গ্রুপের একমাত্র শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারী পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য শিক্ষা ছুটি নিয়ে ভারতে অবস্থান করলে মাধবী শিক্ষকবিহীন চিত্রচর্চা করেন। চারুকলার অন্য গ্রুপের শিক্ষকদের ক্লাস এবং প্রাচ্যকলার বড়ো ভাইদের কাজ দেখে চলতে থাকে তাঁর শিল্পশিক্ষা। এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি ২০০৭ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে শিল্পী শওকাতুজ্জামান স্মৃতি পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০৯ সালে অর্জন করেন এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান পদক। এই পদক পেয়েছিলেন জাতীয় জেল

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের আয়োজনে জাতীয় জেল হত্যা দিবস প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনী হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে।

মাধবী শিক্ষক সুশান্ত কুমারকে ক্লাসে পেয়েছেন চতুর্থ বর্ষে। ২০০৮ সালের বি.এফ.এ সম্মান পরীক্ষা দিয়েছেন ২০১০ সালে। তিনি বি.এফ.এ (সম্মান) শ্রেণিতে শিক্ষা গ্রহণের সময় বিভিন্ন মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন। যেহেতু প্রাচ্যকলার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন সেহেতু প্রাচ্যরীতির টেকনিক বিষয়ে সঠিক নির্দেশনায় অভাব ছিল। বই পড়ে, অন্যদের কাজ দেখে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতি, টেম্পারা পদ্ধতি ছাড়াও তেলরং ও অ্যাক্রেলিক রঙে ছবি এঁকেছেন। তেলরং এবং এর সাথে পোড়া মবিল ও অক্টেন মিশ্রণে ওয়াশ পদ্ধতির মতো রং প্রয়োগে তিনি কাজ শিখেছিলেন তৎকালীন প্রাচ্যকলা গ্রুপের ছাত্র হুমায়ূনের কাছ থেকে। যিনি বর্তমানে প্রাচ্যকলা গ্রুপের সহকারী অধ্যাপক।

চিত্র ২৫৪ : নিঃসহায়-২,
তেলরং ও পোড়া মবিল (মিশ্র মাধ্যম)
৩৮ × ২৬ সেমি, ২০০৮

চিত্র ২৫৫ : প্রিয় সখী-১
জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১০

চিত্র ২৫৬ : প্রিয় সখী-২
অ্যাক্রেলিক, ৫৬ × ৪১ সেমি, ২০০৭

নিঃসহায়-২ চিত্রটি এঁকেছেন মাধবী যখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। প্রাচ্যকলা বিভাগে তেলরং মাধ্যমের ব্যবহার কম। জলরং-প্রধান একাডেমিক শিক্ষায় মাধবী তেলরঙের পরীক্ষামূলক টেকনিক ব্যবহার করে নিজের চিন্তা-চেতনার ম্যাচিউরিটির প্রমাণ রেখেছেন। চিত্রে নিঃসহায় অনুভূতি প্রকাশের জন্য তিনি যে অবয়বের ব্যবহার করেছেন সেই অভিব্যক্তি সমসাময়িক বাস্তবতার নিঃসহায় নারীর। লাইন, টেক্সচার, ফর্ম ব্যবহার করে প্রাচ্যরীতির গতানুগতিক রোমান্টিক ভাবাবেশ ছড়িয়ে বিষয় উপস্থাপনে আধুনিকত্ব এনেছেন।

প্রিয় সখী-১ চিত্রে ঘরের অভ্যন্তরে দুজন নারীর একান্ত ভাবাবেশের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। প্রাচ্যরীতির জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে স্বচ্ছ জলরঙের প্রলেপে এই চিত্রের নারীরা বাঙালি। তাদের পরিহিত কাপড়ের ডিজাইন শাড়িকে অতিক্রম করে ব্যাকগ্রাউন্ডের ঘরের দেয়াল জুড়ে আলপনা হয়ে বিস্তার লাভ করেছে। দুটি পাখির ব্যবহার অধিবাস্তব আঙ্গিকে প্রাচ্যরীতির ডিজাইন, আলপনা এবং লাইনের ব্যবহার তাঁর চিত্রে

Dhaka University Institutional Repository

রীতিপ্রধান আবেদন এনেছে। সেক্ষেত্রে হাতের আঙুলের কোমল ভঙ্গি, চোখের ডাগর আদল, দেহের ঢাউস গঠন চিরচেনা বাঙালি নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রিয় সখী-২ চিত্রে তিনি অ্যাক্রেলিক রং এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, জলরংকে টেম্পারার মতো মনে হয়। অ্যাক্রেলিক মাধ্যম প্রাচ্যদেশীয় নয়। এই মাধ্যম একাধারে তেলরং এবং জলরং ইফেক্ট সৃষ্টি করতে পারে। প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বে টেম্পারার ইফেক্টও আনা যায়। সেক্ষেত্রে বলা যায়, মাধবী আধুনিক এই রং প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৌরাণিক বা আমাদের প্রাচ্য ঐতিহ্যিক জলরং টেম্পারা মাধ্যম অনুরূপভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি চিত্রে নারী ফিগারের যে অবয়ব, ফর্ম ও ভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন তাতে আমাদের পট চিত্রকলা, সরা চিত্রকলা এবং কামরুল হাসানের নারী অবয়বের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চিত্রে রং ব্যবহারের দ্বিমাত্রিকতা, লাইনের ব্যবহার পারস্পেকটিভ—সব কিছুই প্রাচ্যচিত্র শৈলীর ধারাবাহিকতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। মাধবী ২০০৮–০৯ শিক্ষাবর্ষের এম.এফ.এ করেছেন ২০১১–১২ সালে। সেশনজটে অনার্স পরীক্ষা ২০১০ সালে হওয়াই এর কারণ। এম.এফ.এ শ্রেণিতে তিনি শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীকে পেয়েছেন। সুশান্ত কুমার অধিকারী ভারতে শিক্ষাকালীন সময়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। দেশে ফিরে একাডেমিক শিক্ষায় তাঁর একটা প্রভাব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবহমান। ক্যানভাস এবং অ্যাক্রেলিক রঙে সমসাময়িক বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রচর্চায়। তবে এসব চিত্র দর্শনগত এবং ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে বৃহৎ প্রাচ্যের আধুনিক চিত্রকলার ধারা হিসেবে মূল্যায়ন করাই প্রাসঙ্গিক।

এম.এফ.এ ডিগ্রি পড়াশোনার সময় তিনি কয়েকটি বিষয়চিন্তা নিয়ে চিত্র এঁকেছেন। যেগুলোকে সিরিজচিত্র বলা যায়। যার মধ্যে পুষ্পিত জীবন, জীবনের স্বপ্ন, সুখস্বপ্নের আশায়, আলোকিত জীবন, মধুর অপেক্ষা, আমার আমি, রুদ্ধ এবং মুক্ত, ভ্রমণ, নারীর স্বাধীনতা, জীবন ও জীবন সংসার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় প্রকৃতি নিয়ে চিত্রচর্চা হয়ে আসছে। প্রকৃতির ফুলের সৌন্দর্য অবনসৃষ্ট ওয়াশ পদ্ধতির আদলে কিংবা চীন-জাপানের জলরং ও কালি-তুলির টেকনিকে চর্চা হয়ে আসছে। মাধবীর চিত্র জমিনকে বিভাজিত করে ফুলের বিভিন্ন অংশকে বিশেষভাবে দেখেছেন। কখনো ফুলের পাপড়ি কিংবা বিশেষ অংশকে বড়ো করে দেখেছেন। পাপড়ি, বৃন্ত, কলি, পাতা, ফুলের ব্যবচ্ছেদ চিত্রতলে টেক্সচার তৈরি করে তিনি ফুলের বাহির ও ভেতরের সৌন্দর্যকে রঙে রেখায় সাজিয়ে পুষ্পিত জীবনের ঈঙ্গিত করেছেন।

চিত্র ২৫৭ : পুষ্পিত জীবন-৩, অ্যাক্রেলিক
৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১

চিত্র ২৫৮ : পুষ্পিত জীবন-৩, অ্যাক্রেলিক
৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১

তাঁর এই চিত্রে মোগল মিনিয়েচার চিত্রের ক্ষেত্র বিভাজন, নকশা, দ্বিমাত্রিক রং ব্যবহার প্রাচ্যরীতির শিল্প-ঐতিহ্যের রীতিকে নতুন নিরীক্ষায় উপস্থাপন করেছেন।

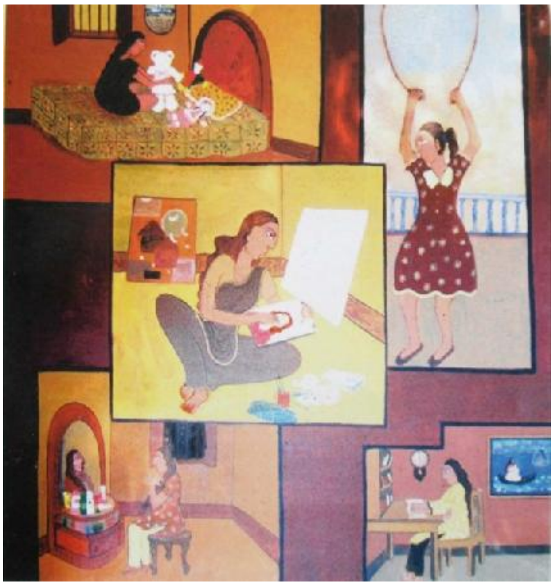

চিত্র ২৫৯ : আমার আমি-১, অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৯২ সেমি, ২০১০

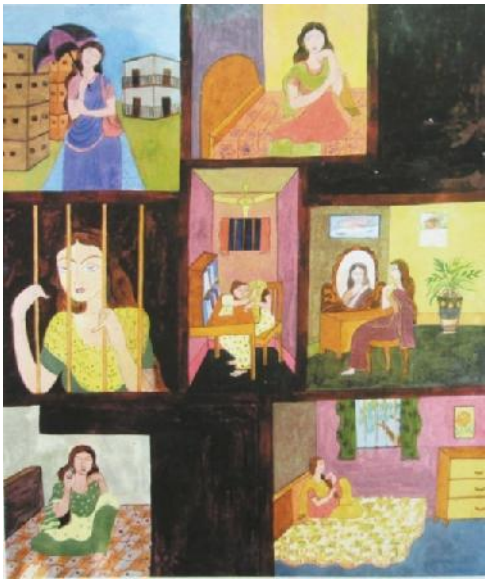

চিত্র ২৬০ : আমার আমি-২, অ্যাক্রেলিক
৪১ × ৬১ সেমি, ২০১০

আমার আমি সিরিজচিত্রে নিজের ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক জীবনগল্প একই চিত্রতলে দেখিয়েছেন, যাকে বাংলার পটচিত্রের অনুরূপ বলা যায়। পটচিত্রের দেব-দেবীর, পীর-গাজির বীরত্ব কাহিনির পরিবর্তে মাধবী নিজের জীবন-কাহিনির গল্প এঁকেছেন। বিষয় ভাবনার দিক থেকে একান্ত ব্যক্তিগত হলেও তাঁর এই ছবির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষের প্রাত্যহিক কাজের স্মৃতিচারণা মনে করিয়ে দেয়। দ্বিমাত্রিক রং ব্যবহার মাল্টি পারস্পেকটিভ মোগল মিনিয়েচার শৈলীর মতো। তবে মাধ্যমের ক্ষেত্রে জলরং টেম্পারার পরিবর্তে আধুনিক অ্যাক্রেলিক কালারকে ব্যবহার করে অ্যাক্রেলিক কালারের প্রাচ্যকরণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

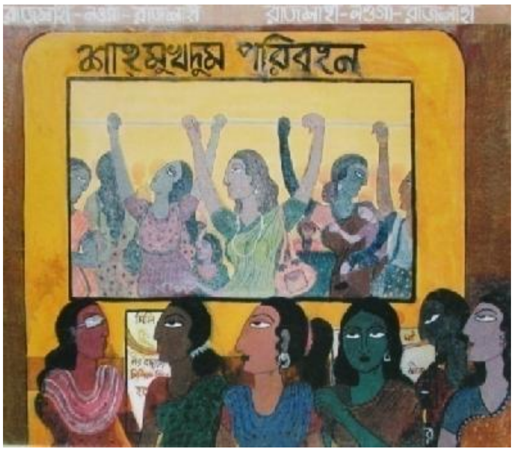

চিত্র ২৬১ : রুদ্ধ এবং মুক্ত-১
অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৭৬ সেমি, ২০১১

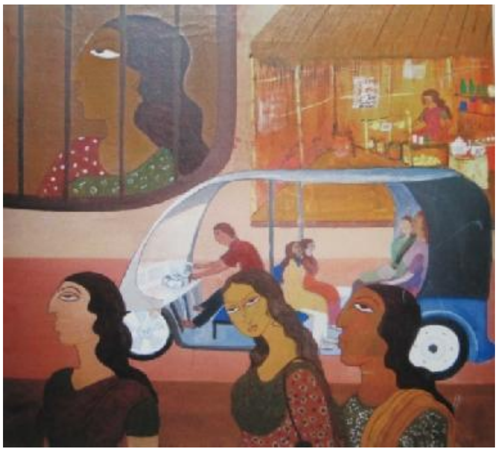

চিত্র ২৬২ : রুদ্ধ এবং মুক্ত-২
অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৯২ সেমি, ২০১১

মাধবীর রুদ্ধ এবং মুক্ত সিরিজচিত্র প্রসঙ্গে শিল্পী সুশান্ত কুমার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উল্লেখ্যের দাবি রাখে। কারণ তাঁর ব্যাখ্যাটি চিত্রের গভীর সত্যকে যথার্থভাবে উন্মোচিত করেছে। তিনি লিখেছেন :

> অনেকগুলো নারী 'শাহ্মুখদুম পরিবহন' নামক বাসে করে গন্তব্যস্থলে চলেছে। এই যে যানটির (গাড়ি) নামকরণ 'শাহ্মুখদুম পরিবহন', কেন নয় 'হানিফ', 'দিগন্ত', অথবা 'ন্যাশনাল, পরিবহন-এর মতো নামকরা গাড়ির নাম? সাধু-সন্ত, পীর-আউলিয়া, অধ্যাত্ম চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ এই বাংলাদেশ। 'শাহ্মুখদুম পরিবহন' নামক গাড়িটা হলো এই দেশ, সংস্কৃতি তথা সাধারণ জনগণের সমাজ। কিন্তু, ধর্মব্যবসায়ীর ফতোয়ায় ও প্ররোচনায় ঘরের সাধারণ নারীরা প্রতিনিয়তই ভোগের সামগ্রীতে পতিত হচ্ছে; তারা ধর্ষিতা, পরিত্যক্তা, কলঙ্কিতা হচ্ছে। গাড়িটির মধ্যের নারীদের বসার সিট নেই অর্থাৎ সাধারণ অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত, দাঁড়িয়ে কেউ এক হাতে সন্তান অন্য হাতে ছাদের রড ধরে নিজেকে সামাল দিতে মরিয়া। গাড়িতে পোস্টার লাগানো—৯ (নয়) বছরের মিলির ধর্ষণকারীর বিচার সংক্রান্ত। প্রতিবাদী নারীরা কুসংস্কার-ফতোয়ার মতো অন্যায়জনক বিষয়কে প্রতিহত করতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এরা কারো স্ত্রী, কন্যা এবং কারো জননী। একে অপরের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কৌশল বিষয়ে পরামর্শ করছে, সম্মুখে তাকিয়ে এক নারীর ভঙ্গিতে সুস্থসমাজ গঠনে সে দৃঢ় প্রত্যয়ী, তার অভিব্যক্তিতে এমন ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।[১০৯]

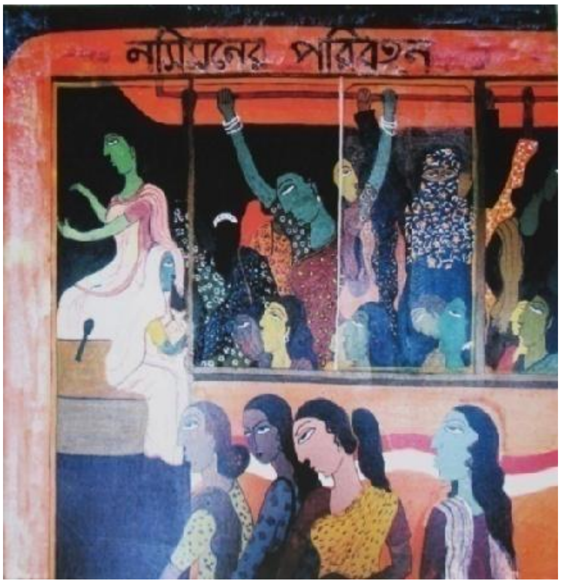

চিত্র ২৬৩ : নারীর স্বাধীনতা, অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৯২ সেমি, ২০১১

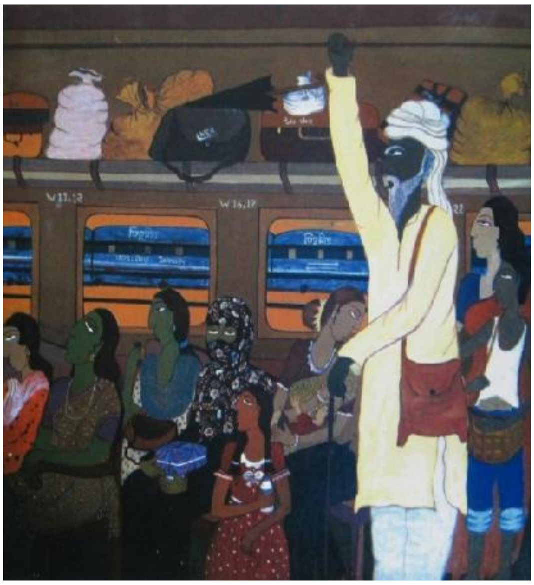

চিত্র ২৬৪ : ভ্রমণ-২, অ্যাক্রেলিক
৯২ × ৯২ সেমি, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

নারীর স্বাধীনতা সিরিজচিত্রে গাড়ির চালক হিসেবে নারীকে দেখানো হয়েছে, যা শিক্ষার প্রতীকী উপস্থাপনা। যেখানে সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে নারীকে দেখাতে চেয়েছেন। শুধু ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাইরে চলার জন্যও নারীর স্বাধীনতা দরকার তারই ইঙ্গিত করেছেন। ভ্রমণ সিরিজচিত্রে রেলভ্রমণের দৃশ্য এঁকেছেন। সমাজবাস্তবতায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে তাদের ব্যক্তি চরিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি বাদাম বিক্রেতা বালকের দুর্দশা ইঙ্গিতও অনুমান করা যায়। কারণ এই বালকটির স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেনের ভেতরকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বাঙালি নারী চরিত্রের চিরন্তন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। কিন্তু সুফি বা বাউলের নির্মোহ জীবন ভ্রমণকে উজ্জ্বল রঙে সবার থেকে আলাদা করে এঁকেছেন। এই ভ্রমণ কাহিনিতে সচরাচর বাস্তবতার কাহিনি চিত্রণ যেমন হয়েছে, তার আড়ালে মানুষের জীবনের নিরন্তর ধেয়ে চলার ভাবগাম্ভীর্য ভাবিয়ে তোলে।

২০১৩ সালে মাধবী তাঁর চিত্রসম্ভার নিয়ে প্রদর্শনী করেছেন। প্রদর্শনী প্রসঙ্গে সুশান্ত কুমার অধিকারী যে মন্তব্য করেছেন তাতে মাধবীর কাজের বিষয় ও টেকনিক এবং সৃজন-ভাবনার যথার্থ রূপটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন :

> মাধবী প্রাচ্যশৈলীর চিত্র বিষয়ে পাঠ নিয়েছে। প্রদর্শনীর ছবিগুলি শিক্ষার্থী অবস্থায় আঁকা। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার নিয়ম-নীতি ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে ছবির বিষয় নির্বাচন, বিষয় উপস্থাপন-ভঙ্গি, রঙ ব্যবহারের পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে। শিল্পঐতিহ্য থেকে উপাদান গ্রহণ, সংযোজন, বিয়োজন করে সমকালীন বাস্তবতার জীবনকে তুলে ধরেছে নিজের মতো করে। সংস্কার-কুসংস্কার পরিবেষ্টিত চলমান সমাজ থেকে রমণী নয়, ভোগবিলাসের নয়, পতিপরায়ণা বঁধু নয়, মানুষ নারীর জীবনই হলো তার ছবির সৃজন ভাবনা।[১১০]

মমতাজ পারভীন মাধবী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগে প্রাচ্যকলা গ্রুপে প্রভাষক পদে শিক্ষকতা করছেন। উল্লিখিত আলোচনায় তাঁর জীবন ও চিত্রকর্ম প্রসঙ্গে যেসব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় তা নিম্নরূপ :

(ক) প্রাচ্যরীতির চিত্রমাধ্যমে অ্যাক্রেলিক রংকে ব্যবহার করেছেন টেম্পারার মতো করে ক্যানভাসে। যে চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় নতুনত্ব এনেছে।

(খ) বাংলার পটচিত্র, মুরালচিত্র ও মিনিয়েচার চিত্রের ঐতিহ্যকে নিজস্ব ভঙ্গিতে পুনর্বিন্যাস করেছেন।

(গ) ফুলবিষয়ক সিরিজচিত্রে মোগল মিনিয়েচার করণ-কৌশলকে আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক চিত্র-কৌশলের সাথে সমন্বিত করে এঁকেছেন।

(ঘ) সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা এবং নারীর প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের বিষয় নিয়ে চিত্র এঁকেছেন, যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার বিষয়ের দিক থেকে নতুন সংযোজন।

(ঙ) মাধবীর প্রতিটি চিত্রই গভীর বক্তব্যপ্রধান। তা ছাড়া নারীর নাক-চোখ-মুখের আদল সুললিত না হলেও আবহমান বাঙালি নারীর প্রকৃত অভিব্যক্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন প্রাচ্যশৈলীকে অক্ষুণ্ন রেখে।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

প্রাচ্যরীতির টেকনিক দ্বারা প্রভাবিত শিল্পীগণ

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা আমাদের এ অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্যের দরবারি শিল্পরীতি এবং লোকায়ত পরম্পরা শিল্পরীতির বিভিন্ন উপদান দ্বারা সমৃদ্ধ। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের নানা উপাদান বারবার এসে যুক্ত হয়ে এই চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে দেশবিভাগের পর অর্থাৎ ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য একাডেমিক ঘরানার আদলে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগে যে চিত্রচর্চা শুরু হয়ে আসছে সেই বিভাগের শিল্পী এবং অন্যান্য বিভাগে অনুশীলনরত শিল্পীরা তাঁদের শিল্পচর্চায় প্রাচ্যরীতির নানান অনুষঙ্গ যুক্ত করে আসছেন। বলা যায়, প্রাচ্যরীতির নান্দনিক রেখার ব্যবহার, রং ব্যবহারের দ্বিমাত্রিকতা, বিষয়ের ভাব প্রকাশে হাত-পা-মুখের বিশেষ অতিরঞ্জন ভঙ্গি, মাল্টি পারস্পেকটিভ ভিউ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে তাঁদের কাজে ব্যবহার করে নতুন এক বাংলাদেশি আর্ট সৃজনে ব্যাপৃত রয়েছেন। ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের পরবর্তী বর্তমান সময় পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্রকলা বিশ্লেষণ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই অনুচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য প্রাচ্যরীতির টেকনিক দ্বারা প্রভাবিত শিল্পীদের কাজের বর্ণনা দেয়া। সেসব কাজ শিল্পীরা সরাসরি প্রাচ্যরীতিতে করেছেন এবং কখনো প্রাচ্যরীতির নানা উপাদান যুক্ত করে করেছেন। এর কয়েকটি প্রমাণ তুলে ধরা হলো। বাংলাদেশের মহান শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমেদ, এস.এম সুলতান, কাজী আব্দুল বাসেত, মুর্তজা বশীর, আব্দুস শাকুর শাহ, নাইমা হক, নাজলী লায়লা মনসুর, নূরুল ইসলাম, নিখিল চন্দ্র দাস, মুকুল কুমার বাড়ৈ, ফরিদা জামান, মুসরাত, আবুল কাশেম প্রমুখ শিল্পীর কাজের চিত্র তুলে ধরে বুঝে নিতে চেষ্টা করা হলো।

আমাদের অঞ্চলে, বিশেষ করে বাংলাদেশে শিল্পচর্চার পথ উন্মুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিককালে। বলা যায় ১৯৪৭-এর পরে। এর পূর্বে শিল্পকলা চর্চার কেন্দ্র ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। এ কারণে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে যাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেই শিল্পীরাই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা শুরু হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সাল পূর্ব বাংলাদেশের একজন মেধাবী শিল্পী ছিলেন শিল্পী আবুল কাশেম। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯১৩ সালে যশোর জেলায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলায়। তিনি যশোরে তাঁর মামাবাড়িতে অবস্থানকালে শৌখিন চিত্রশিল্পী শ্রী অবিনাশ চন্দ্র সরকার এবং শ্রী নগেন্দ্রনাথ কবিরাজের কাছে চিত্রাঙ্কন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন এবং নিজ প্রচেষ্টায় ছবি আঁকা রপ্ত করতে থাকেন। এরপর প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রশিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতা সরকারি চারু ও কারুকলা কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দুইবার কৃতকার্য হয়েও অর্থাভাবে পড়াশোনা করতে পারেননি। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

নিজের চেষ্টায় তিনি শিল্পচর্চা করে সুনাম অর্জন করেন। তৎকালে পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের তিনি ছিলেন একমাত্র মুসলিম শিল্পী।[১১১] শিল্পী আবুল কাশেম-এর কোনো কোনো চিত্রে প্রাচ্যরীতির ছাপ পাওয়া যায়।

চিত্র ২৬৫ : শিল্পী আবুল কাশেম অংকিত 'কলমিশাক'

মহান শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছেন পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায়। কিন্তু তাঁর অনেক কাজই প্রাচ্যরীতির ধাঁচে করেছেন। জয়নুল আবেদিনের এমন কয়েকটি চিত্র নিচে দেয়া হলো।

চিত্র ২৬৬ : শিল্পী জয়নুল আবেদিন
পটুয়া, গোয়াশ ও পোস্টার
১৯.৭ × ১২.৭ সেমি

চিত্র ২৬৭ : শিল্পী জয়নুল আবেদিন
প্রসাধন, ৫০.৮ × ৩৫.৬ সেমি

চিত্র ২৬৮ : শিল্পী জয়নুল আবেদিন
গ্রাম্য মহিলা, জলরং

শিল্পী কামরুল হাসান লোকজ শিল্পকলা থেকে তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁর গোয়াশ পদ্ধতিতে করা 'উঁকি' এবং হাতে লেখা পত্রিকা আঠার-এর সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতিকৃতি প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

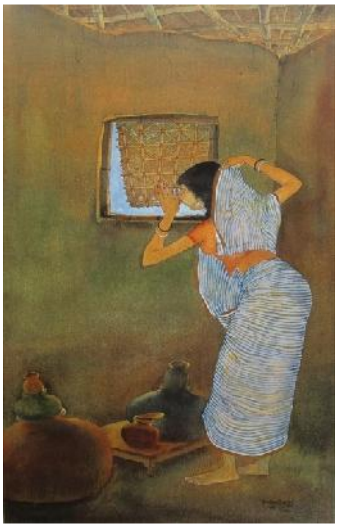

চিত্র ২৬৯ : শিল্পী কামরুল হাসান, উঁকি, গোয়াশ, ৭৫ × ৩৭ সেমি, ১৯৬৭

চিত্র ২৭০ : শিল্পী কামরুল হাসান

চিত্র ২৭১ : শিল্পী কামরুল হাসান হাতে লেখা পত্রিকা আবীর-এ সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতিকৃতি, জলরং ৩২ × ২২ সেমি, ১৯৪৩

শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের তেলরং ও উডকাটে নিচের চিত্রগুলো প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত।

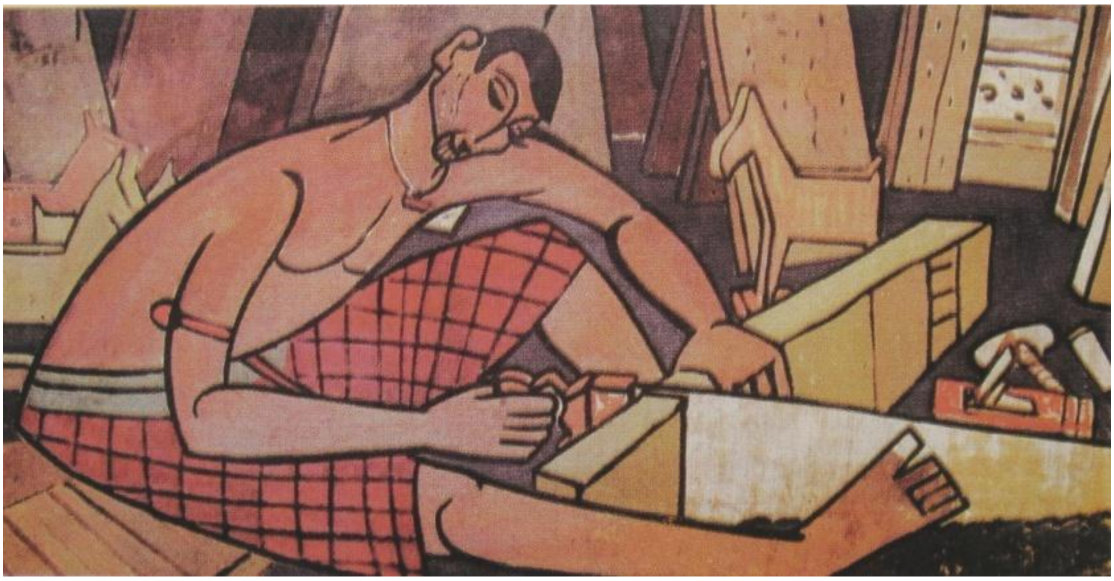

চিত্র ২৭২ : শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, কাঠমিস্ত্রি, তেলরং, ১৯৫৬

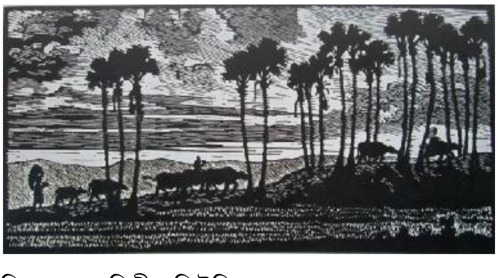

চিত্র ২৭৩ : শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ

চিত্র ২৭৪ : শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, মাছ ধরা

Dhaka University Institutional Repository

এস.এম সুলতানের ‘সাধক’ এবং ‘কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য/নিসর্গ-১’ চিত্রে প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ লক্ষণীয়।

চিত্র ২৭৫ : শিল্পী এস.এম সুলতান, নসর্গ-১, তেলরং
৭৫ × ৫৫ সেমি, ১৯৫১

চিত্র ২৭৬ : শিল্পী এস.এম সুলতান সাধক, জলরং
৭১ × ৫১ সেমি, ১৯৫১

মুর্তজা বশীরের মাছ ধরা। গনক, পাখা হাতে রমণী চিত্র প্রাচ্যরীতির। এ ছাড়া তাঁর ক্যালিগ্রাফি চিত্রও রয়েছে, যা প্রাচ্যের ক্যালিগ্রাফি চিত্রণের আধুনিক রূপ।

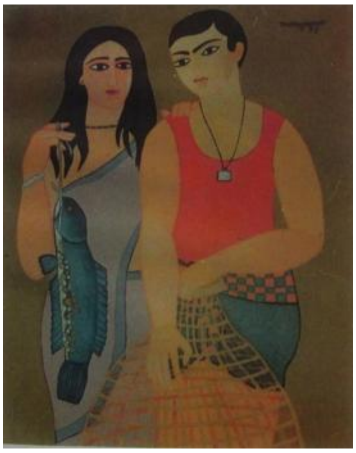

চিত্র ২৭৭ : শিল্পী মুর্তজা বশীর
মাছ ধরা, টেম্পারা

চিত্র ২৭৮ : শিল্পী মুর্তজা বশীর
গনক, টেম্পারা

চিত্র ২৭৯ : গনক, টেম্পারা
পাখা হাতে রমণী, টেম্পারা

শিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত-এর কাজে প্রাচ্যরীতির দ্বিমাত্রিক রং ব্যবহার ও বাঙালি নারীর ভঙ্গি উপস্থাপনায় অতুলনীয় ব্যবহার লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৮০ : শিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত
মা ও মেয়ে-৬
তেলরং ৮০ × ৩০ সেমি, ১৯৯৪

চিত্র ২৮১ : শিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত
মা ও মেয়ে-২ তেলরং
৮০ ×৬৭ সেমি, ১৯৮২

চিত্র ২৮২ : শিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত
পাখা হাতে রমণী-১, তেলরং
৬০ × ৪৫ সেমি, ১৯৯১

শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ প্রাচ্যরীতির লোকজ ধারার চিত্রকলার রং কালার ফর্ম ব্যবহার করেছেন এবং ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেছেন।

চিত্র ২৮৩ : শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ

চিত্র ২৮৪ : শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, ময়ূর ও সাপ
পোস্টার কালার, ৪৮ × ৪৮ সেমি, ১৯৯৩

চিত্র ২৮৫ : তেলরং
৪৮ × ৪৮ সেমি, ১৯৯৯

শিল্পী নাইমা হক তাঁর অনেক চিত্রে লাইন এবং ফিগারের ফ্লাট কালার ব্যবহার করেছেন প্রাচ্যরীতির আঙ্গিকে।

চিত্র ২৮৬ : শিল্পী নাইমা হক
With drow-1
অ্যাক্রেলিক ও পোস্টার কালার

চিত্র ২৮৭ : শিল্পী নাইমা হক, Self Captivity
অ্যাক্রেলিক, ৭৩ × ৫৩ সেমি, ২০১২

চিত্র ২৮৮ : শিল্পী নাইমা হক
৭৪ × ৫৪ সেমি

নাজলী লায়লা মনসুরের কাজে প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ সম্পৃক্ত হয়েছে।

চিত্র ২৮৯ : শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর
Lonis Kahn's Dream (Girl), অ্যাক্রেলিক
১৩৭ × ১০৭ সেমি, ২০০২

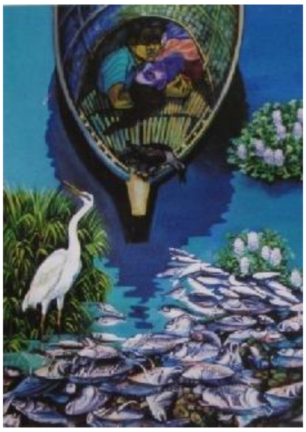

চিত্র ২৯০ : শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর

চিত্র ২৯১ : শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর
রিকশাওয়ালা ও পাখি, তেলরং, ১৯৯২

শিল্পী নূরুল ইসলাম প্রাচ্যরীতিতে কাজ করে আসছেন।

চিত্র ২৯২ : শিল্পী নূরুল ইসলাম
সুখী দম্পতি-২, জলরং ৫৬ × ৩৮ সেমি

চিত্র ২৯৩ : শিল্পী নূরুল ইসলাম

চিত্র ২৯৪ : শিল্পী নূরুল ইসলাম
নারী ও চাবি, জলরং
১৩৮ × ৫৬ সেমি

ভাস্কর শিল্পী মুকুল কুমার বাড়ৈ ভাস্কর্যের পাশাপাশি প্রতিকৃতি নিয়ে জলরং করেন। তাঁর জলরঙে প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। তাঁর 'মুখ' শীর্ষক চিত্রে অজন্তা মুখাবয়বের সাথে মিল পাওয়া যায়। এ ছাড়া আধুনিক অনুষঙ্গের প্রাচ্য ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সংমিশ্রিত শৈলীর ভারতীয় অজন্তা চিত্রের বৈশিষ্ট্য, কামরুল হাসান, যামিনী রায় এবং পাশ্চাত্যশৈলীর সংমিশ্রণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি প্রাচ্যের ওয়াশ পদ্ধতিতে এই জলরং সম্পন্ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

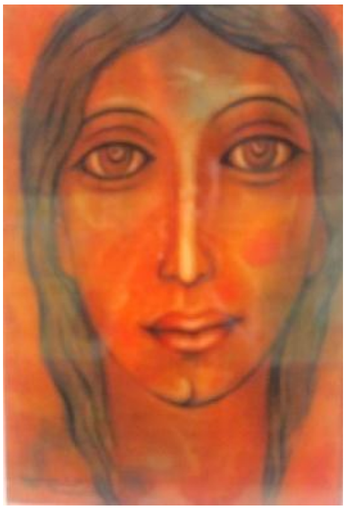

চিত্র ২৯৫ : শিল্পী মুকুল কুমার বাড়ৈ
মুখ

চিত্র ২৯৬ : শিল্পী মুকুল কুমার বাড়ৈ
মুখ

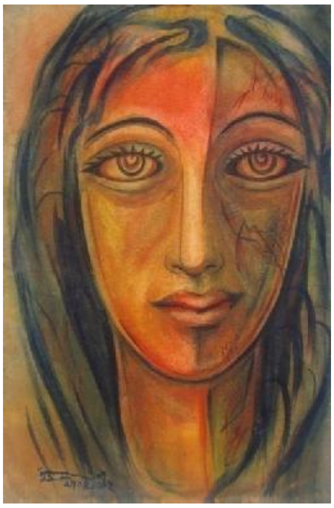

চিত্র ২৯৭ : শিল্পী মুকুল কুমার বাড়ৈ
মুখ

এ ছাড়া নিখিল চন্দ্র দাস, ফরিদা জামান, মুসরাত নিয়াজী-এর চিত্রে প্রাচ্যরীতির অনুষঙ্গ পাওয়া যায়।

চিত্র ২৯৮ : শিল্পী নিখিল চন্দ্র দাস

চিত্র ২৯৯ : শিল্পী ফরিদা জামান

চিত্র ৩০০ : শিল্পী মুসরাত নিয়াজী

চার

উপসংহার

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীগণের অধিকাংশই এখনো কর্মরত, সৃষ্টিশীল এবং তরুণ প্রজন্ম। অর্থাৎ সমকালীন শিল্পী। দেখা গেছে, ১৯৫৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা হলেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী শিল্পচর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন। তাও এখানকার সামগ্রিক শিল্প-আন্দোলনে যার প্রভাব ছিল খুবই নগণ্য। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এর ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে এবং বলা যায়, বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পীদের কাজে ফিগারেটিভ অভিব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করার প্রবণতা সর্বাধিক লক্ষণীয়। যা আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ফিগার-প্রধান কাজ দ্বারাই প্রভাবিত। চিত্র মাধ্যমের ক্ষেত্রে নব্য-বঙ্গীয় রীতির ওয়াশ পদ্ধতি এবং শিল্পী আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ওয়াশ পদ্ধতির বিশেষ কৌশল দ্বারাই প্রভাবিত। আবার রাজশাহী চারুকলায় টেম্পারা-

প্রধান চিত্র ও সমসাময়িক বাস্তবতানির্ভর বিষয়াবলির চিত্রায়ণই বেশি লক্ষ করা যায়। যা আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ছাত্র ও শান্তিনিকেতন ঘরানার শিক্ষিত শিল্পী শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীর কাজ দ্বারা প্রভাবিত।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চারত শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক পথ সন্ধানের পাশাপাশি তাঁদের নিজস্ব অস্তিত্ব খোঁজার তাগিদ অনুভব করেছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সমসাময়িক আর্থসামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের প্রভাবে প্রভাবিত। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, শিল্পীদের কাজে প্রাচ্য-ঐতিহ্যের করণ-কৌশলের সাথে পাশ্চাত্য করণ-কৌশল মেলাবার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

শিল্পীদের কাজের বিষয় ও টেকনিক দেখে শিল্পীদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। বিষয় ও টেকনিকের ক্ষেত্রে শিল্পীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষণীয়। অতএব একথা বলা যায় যে, প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা তাঁদের প্রত্যেকের কাজে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। কখনো কখনো ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পীরা একদিকে অবিভক্ত বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক বেঙ্গল স্কুলের ঐতিহ্যিক শৈলী ও রীতিকে ব্যবহার করেছেন, পাশ্চাত্য একাডেমিক করণ-কৌশল সমন্বিত করেছেন। ফলে আধুনিক চিত্রশৈলীর নানান গুণ সমন্বিত হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রকলায় স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা চর্চার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সে তুলনায় শিল্পীদের অবদান ঈর্ষণীয়। গবেষণায় নির্বাচিত শিল্পীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করলে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী মিজানুর রহমান ফকিরের দৈনন্দিন কর্মজীবন সম্পর্কিত চিত্র, শিল্পী গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদীর লোকশিল্পের আঙ্গিক ব্যবহার, শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারীর সমসাময়িক বাস্তবতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চিত্রণ, শিল্পী আব্দুল আযীযের নারী চরিত্রের স্বরূপ সন্ধান, শিল্পী শংকর মজুমদারের অক্সাই কালারে ওয়াশ ইফেক্টের কাজ, শিল্পী আব্দুল বাতেন খানের কার্টিজ ও সুইজ বোর্ডে জলরং ওয়াশের বিশেষত্ব, শিল্পী ফাহমিদা খাতুনের ফুল বিষয়ক কাজ, শিল্পী মলয় বালার অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে ওয়াশ পদ্ধতির কাজ, শিল্পী গৌতম কুমার বিশ্বাসের প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে সুরিয়ালিস্টিক আবেদন, শিল্পী কান্তিদেব অধিকারীর প্রকৃতির তুচ্ছ বিষয়কে জীবন-দর্শনের গভীর দর্শনের ইঙ্গিত, শিল্পী মোছাঃ নাজনীন আক্তারের সমসাময়িক বাস্তবতার চিত্র, শিল্পী সোহাগ পারভেজের পাহাড়ি সংস্কৃতি চিত্রণ, শিল্পী গোপাল সাহার ওয়াশ পদ্ধতির জলরঙে কিউবিক ফর্মের ফিগারেটিভ কাজ, শিল্পী নাজমুল হক বাপ্পীর প্রাচ্য-পাশ্চত্য সংশ্লেষের প্রচেষ্টা, শিল্পী সিনথিয়া আরেফিনের সামাজিক বক্তব্যনির্ভর চিত্র, শিল্পী সুমন কুমার বৈদ্যর সমাজবাস্তবতার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, শিল্পী মমতাজ পারভীনের সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা এবং নারীর প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে বক্তব্যপ্রধান চিত্র বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বলা যায়, রূপের আড়ালে অরূপের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাচ্যরীতির কাজে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. খুলনা আর্ট কলেজের প্রাচ্যকলা বিভাগ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

২. Lala Rukh Selim, æ50 years of the fine Art Institute” *Art* vol-4, No-3, January–March 1999 (ISSN 1027-0302). P.4

৩. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত সুভ্যেনিয়র, পৃ. ২৫

৪. *Rashid Choudhury*, Art of Bangladesh Series-5, Bangladesh Shilpakala Academy, P.103

৫. *Aminul Islam*, Art of Bangladesh Series-10, Bangladesh Shilpakala Academy, P.111

৬. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, কাইয়ূম চৌধুরী ও হাশেম খান (সম্পা.)। *সাদাকালো ’৭১*, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৪২

৭. গবেষকের সাথে তাজুল ইসলামের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৪ আগস্ট ২০১৩

৮. *Rashid Choudhury*, Art of Bangladesh Series-5, Bangladesh Shilpakala Academy, P.104

৯. গবেষকের সাথে তাজুল ইসলামের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৪ আগস্ট ২০১৩

১০. Courier Correspondent, æTajul’s Fondness for abstraction and organic forms : Solo tapestry exhibition at Shilpangan”, *Dhaka Courier* 14–20 January 2011, Vol. 27, Issue 26, Regn No. 592, P.32

১১. গবেষকের সাথে তাজুল ইসলামের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৪ আগস্ট ২০১৩

১২. *Human to Rashid Chuwdhary Tapestry by Tajul Islam*, 27th June–21 July 2008, Gallery Kaya

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৪. শওকাতুজ্জামান “প্রাচ্যশিল্পের প্রদর্শনী : মিজান ফকির”, ৭ জুন ২০০৩ (মিজানুর রহমান ফকিরের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে শওকাতুজ্জামানের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)

১৫. হাশেম খান লিখিত “শুভেচ্ছা বাণী”, দ্র. 1st Solo Painting Exhibition 2003 by Mizanur Rahman Fakir, Saju Art Gallery, 31 may–07 June 2003

১৬. গবেষকের সাথে মিজানুর রহমান ফকিরের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৯ জুন ২০১৩

১৭. জাহিদ মুস্তাফা, “প্রাচ্যকলার নন্দিতরূপ”, *দৈনিক সংবাদ* ১৯ জুন ২০০৩

১৮. গবেষকের সাথে মিজানুর রহমান ফকিরের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৯ জুন ২০১৩

১৯. গবেষকের সাথে গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদীর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৪ জুন ২০১৩

২০. প্রাগুক্ত

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত

২৩. শওকাতুজ্জামান লিখিত মন্তব্য, দ্র. Solo Painting Exhibition by Gupu Trivedi, Gallery Chitrak, Dhaka, 2003

২৪. মইনুদ্দীন খালেদ, “গুপুর ছবি : মনপবনের রং”, *যুগান্তর* ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

২৫. গবেষকের সাথে সুশান্ত কুমার অধিকারীর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৩০ আগস্ট ২০১৩

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আব্দুল আযীয, *আমার শিল্পকর্ম ও একাডেমিক অভিজ্ঞতা* (এম.এফ.এ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ), শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৬–৯৭, প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮

২৯. শওকাতুজ্জামান, "শিল্পী আযীযের জলরং প্রদর্শনী", *দৈনিক সংবাদ* ৭ জুলাই ২০১২ [রমনী বানান রমণী করা হয়েছে]

৩০. গোলাম আম্বিয়া "প্রাচ্য চিত্রকলার নবীন রূপকার আব্দুল আযীয", *সাপ্তাহিক রোববার* ২৩ জুন ২০০২

৩১. আব্দুস সাত্তার "শুভেচ্ছা বাণী", Water Colour Painting Exhibition by A. Aziz, Zainul Gallery, May 16–22, 2002

৩২. নাসরীন বেগম, প্রাগুক্ত

৩৩. অনি আলমগীর "আযীযের চিত্রকর্ম", *দৈনিক ইত্তেফাক* ৩১ মে ২০০২

৩৪. গবেষকের সাথে আব্দুল আযীযের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৬ জুলাই ২০১৩

৩৫. আব্দুল আযীয, *আমার শিল্পকর্ম ও একাডেমিক অভিজ্ঞতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৩৬. অনি আলমগীর, প্রাগুক্ত

৩৭. আব্দুল আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৩৮. জাহিদ মুস্তাফা, "স্বচ্ছ বর্ণ রেখার খেলায় বর্ণিকাভঙ্গ", সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংবাদ* ২৮ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১৬

৩৯. মনিরুজ্জামান পলাশ, "শিল্পকলার প্রদর্শনী আযীযের রমণী হৃদয়", *দৈনিক ডেসটিনি* ২৫ জুলাই ২০০৮

৪০. মুহম্মদ আবদুল বাতেন, "শিল্পী আবদুল আজিজের ওরিয়েন্টাল আর্ট", *নয়া দিগন্ত* ৪ জুলাই ২০০৮

৪১. আব্দুল আযীয, "শিল্পীর কথা", ডাকসু সংগ্রহশালায় 'চেতনায় একুশ' মুরাল চিত্র উন্মোচনের সুভ্যেনিয়র, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৬

৪২. গবেষকের সাথে মাসুদা খাতুন জুঁইয়ের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

৪৩. প্রাগুক্ত

৪৪. সিলভিয়া নাজনীন, "প্রাচ্যদেশীয় শিকড়ের সন্ধানে", সাহিত্য সাময়িকী, *প্রথম আলো* ১৯ মার্চ ২০১০

৪৫. গবেষকের সাথে শংকর মজুমদারের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৪ জুন ২০১৩

৪৬. রবিউল হুসাইন, লিখিত "ভূমিকা", *ত্রয়োদশ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১০

৪৭. গবেষকের সাথে আবদুল বাতেনের সাক্ষাৎকার, ঢাকা ১৬ জুলাই ২০১৩

৪৮. গবেষকের সাথে আব্দুল বাতেনের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৭ জুলাই ২০১৩

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. গবেষকের সাথে ফাহমিদা খাতুনের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৬ জুলাই ২০১৩

৫১. আবেদ রহমান, "ফাহমিদার ফুলের নান্দনিক প্রদর্শনী", *নয়াদিগন্ত* ১৩ জুলাই ২০১৩

৫২. গবেষকের সাথে ফাহমিদা খাতুনের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৬ জুলাই ২০১৩

৫৩. প্রাগুক্ত

৫৪. Hashem Khan, 2nd Solo Exhibition *Imaye of Life* by Fahmida Khatun, Zainul Gallery, 11th–17th July 2007

৫৫. গবেষকের সাথে ফাহমিদা খাতুনের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৬ জুলাই ২০১৩

৫৬. প্রাগুক্ত

৫৭. তারিক রহমান, "বর্ণিকাভঙ্গ : নিরীক্ষাধর্মী চিত্র প্রদর্শনী", *যুগান্তর* ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩

৫৮. মলয় বালা, *আমার শিল্পচিন্তা* (এম.এফ.এ শিক্ষাবর্ষের অভিসন্দর্ভ), শিক্ষাবর্ষ, ২০০০–২০০১, প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৯

৫৯. প্রাগুক্ত

৬০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬১. জাহিদ মুস্তাফা, "প্রাচ্যগৃহ প্রাচ্য রূপ", *কালি ও কলম,* চতুর্থ বর্ষ : দশম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪১৪ (১৯০৭ খ্রি.), পৃ. ৮৭

৬২. মলয় বালা, প্রাগুক্ত

৬৩. আব্দুস সাত্তার, প্রাচ্যকলা বিভাগের ছয় শিক্ষক শিল্পীর প্রদর্শনী *শিকড় সন্ধান*, জয়নুল গ্যালারি, ১১ মার্চ–১৭ মার্চ ২০১০, পৃ.৭

৬৪. জাহিদ মুস্তাফা, "প্রাচ্য গৃহ প্রাচ্য রূপ", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৬৫. Ershad Kamal, æMalay Bala's Oniental Expression", Culture, *the Daily Star* 11th September 2007, P.14

৬৬. সঞ্জয় দে রিপন, "প্রকৃতির যোজনকলা", *দৈনিক সংবাদ* ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৫

৬৭. মলয় বালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৬৯. গবেষকের সাথে ওমর শাহজাহানের সাথে সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৮ জুন ২০১৩

৭০. প্রাগুক্ত

৭১. গবেষকের সাথে গৌতম কুমার বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১১ জুলাই ২০১৩

৭২. প্রাগুক্ত

৭৩. কান্তিদেব অধিকারী, *আমার ছবি* (এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্ব পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ), শিক্ষাবর্ষ ২০০২–২০০৩, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭

৭৪. প্রাগুক্ত

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩–১৪

৭৭. প্রাগুক্ত, অভিসন্দর্ভ, পৃ. ২০ এবং গবেষকের সাথে কান্তিদেব অধিকারীর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৪ আগস্ট ২০১৩

৭৮. প্রাগুক্ত, অভিসন্দর্ভ, পৃ. ২০

৭৯. গবেষকের সাথে কান্তিদেব অধিকারীর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৪ আগস্ট ২০১৩

৮০. প্রাগুক্ত, অভিসন্দর্ভ, পৃ. ২৪

৮১. প্রাগুক্ত, অভিসন্দর্ভ, পৃ. ৪৮

৮২. মোবাইল ফোন মাধ্যমে গবেষকের সাথে মোছাঃ নাজনীন আকতারের সাক্ষাৎকার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. প্রাগুক্ত

৮৫. মইনুদ্দীন খালেদ, "অবিরাম নয়নাভিরাম", Society of Bangladesh Mariners প্রকাশিত, ২০১০ সালের ক্যালেন্ডার

৮৬. মুনতাসীর মামুন, "সোহাগ পারভেজের জলরং", দ্র. Solo Art Exhibition Nature of Bangla by Shohag Parves

৮৭. Robiul Hassan, "Shohag Parvez's colourful expressions in lines", *Beautiful Bangladesh*, Gallery Kaya

৮৮. গোপাল চন্দ্র সাহা, *আমার শিল্পকর্ম* (এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্ব অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যক্রম অভিসন্দর্ভ), শিক্ষাবর্ষ ২০০৭–০৮, পৃ. ৭–৮

৮৯. প্রাগুক্ত

৯০. আব্দুস সাত্তারের শুভেচ্ছাবাণী, দ্র. 1st Solo Art Exhibition by Gopal Chandra Saha, *ME in My Inner soul*, 13–19 September 2011

৯১. গবেষকের সাথে গোপাল চন্দ্র সাহার সাক্ষাৎকার, ঢাকা ২৩ জুলাই ২০১৩

৯২. গবেষকের সাথে নাজমুল হক বাপ্পীর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৩ জুলাই ২০১৩

৯৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৯৪. প্রাগুক্ত

৯৫. মইনুদ্দীন খালেদ, "শুভেচ্ছাবাণী", দ্র. 1st Solo Painting Exhibition *Expression of freedom* by Nazmul Haque Bappy, Alliance Francaise de Dhaka Gallery, 2011

৯৬. গবেষকের সাথে নাজমুল হক বাপ্পীর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৩ জুলাই ২০১৩

৯৭. মুস্তাফা মনোয়ার লিখিত শুভেচ্ছাবাণী, 3rd Solo Painting Exhibition *Absorbed Nature* by Nazmul Haque Bappy, Alliance Francaise de Dhaka Gallery, 2012

৯৮. গবেষকের সাথে নাজমুল হক বাপ্পীর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

৯৯. গবেষকের সাথে সিনথিয়া আরেফিনের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১ আগস্ট ২০১৩

১০০. প্রাগুক্ত

১০১. প্রাগুক্ত

১০২. প্রাগুক্ত

১০৩. প্রাগুক্ত

১০৪. সুমন কুমার বৈদ্য, *আমার শিল্পকর্ম ও শিল্পভাবনা* (এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্ব পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ) শিক্ষাবর্ষ ২০০৮–০৯, পৃ. ১৩

১০৫. গবেষকের সাথে সুমন কুমার বৈদ্যর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১ জুন ২০১৩

১০৬. প্রাগুক্ত

১০৭. প্রাগুক্ত

১০৮. সুমন কুমার বৈদ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১০৯. সুশান্ত কুমার অধিকারী, "মাধবী'র রঙে সমাজ-বাস্তবতা", মমতাজ জাহান মাধবীর প্রথম একক চিত্রকলা প্রদর্শনী *হৃদয় বীণার ঝংকার*, ২০১৩

১১০. প্রাগুক্ত

১১১. আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্প*, ঢাকা আজমাইন পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৪৩–৪৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা

তৎকালীন ঢাকার ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস’-এর প্রাচ্যকলা বিভাগে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার চর্চা শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। এই ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস’ ১৯৬৩ সালে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট ও ২০০৮ সালে চারুকলা অনুষদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে প্রাচ্যকলা গ্রুপ এবং খুলনা আর্ট কলেজে (বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট) প্রাচ্যকলা বিভাগের মাধ্যমে প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার বিস্তার ঘটেছে। অতএব, বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার ইতিহাস সন্ধান করতে হলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার পঠন-পাঠন, চিত্রশৈলীর ধরন, বাংলাদেশের চিত্রকলা চর্চায় এ শৈলীর অবদান প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার বিষয় হয়ে আসবে।

বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয় ঘটেছে ১৯৭১ সালে। এর আগে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরাধীন ভূখণ্ড ছিল। এরও আগে অবিভক্ত বাংলার পূর্ব বাংলা হিসেবে পরিচিত ছিল। অতএব, বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্পকলার পরম্পরাগত ঐতিহ্য পূর্ববর্তী সহস্র বর্ষের ভারত-ইতিহাসের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে অবিভক্ত বাংলার কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের নব্য-বেঙ্গল রীতির আদলে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার প্রাচ্যচিত্রকলা অর্থাৎ প্রাচ্যকলা চর্চা শুরু হয়েছিল ঢাকায় গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে। নামকরণে Oriental Art বা প্রাচ্যকলা হলেও এ বিভাগের পঠন-পাঠন মূলত চিত্রকলাকে ঘিরে। সে বিচারে এই নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা চর্চাকে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার অভিন্ন রূপ ধরে নেয়া হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠাননির্ভর চিত্রকলা চর্চা শুরু হয়েছিল ১৯০৪ সালে। সে সময় শিল্পী শশীভূষণ পাল খুলনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্ট’। এই স্কুলটি পশ্চিমা সাদৃশ্যবাদী পঠন-পাঠনে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকায় স্থাপিত হয় ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট’। এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পচর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্পচর্চার ইতিহাস।[১]

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট’-এ প্রতিষ্ঠালগ্নে মোট চারটি বিভাগ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। বিভাগগুলো হলো—প্রাথমিক বিভাগ, সুকুমার কলা বিভাগ (Drawing and Painting), বাণিজ্যিক শিল্পকলা বিভাগ (Graphic Design) ও ছাপচিত্র বিভাগ (Printmaking)।[২]

সে সময় এই আর্ট স্কুলে তাত্ত্বিক বিষয় ছাড়া চিত্রকলা প্রশিক্ষণে কলকাতা আর্ট স্কুলের ব্রিটিশ একাডেমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান শুরু হয়।[৩]

এর কারণ হলো আর্ট স্কুলের প্রথম পর্বের শিক্ষক জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পী কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে পাশ্চাত্য একাডেমিক

Dhaka University Institutional Repository

ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁরা যখন বাংলাদেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন তখন স্বাভাবিক নিয়মেই কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যক্রমকেই অনুবর্তন করেছেন। তবে তাঁরা পশ্চিমা একাডেমিক রীতির নির্মাণগুণে সিদ্ধহস্ত থাকলেও ভেতরে ভেতরে দেশজ ঐতিহ্য ও নব্য-বাঙালি ধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ কলকাতা আর্ট স্কুলের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় শিল্পরীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলেও প্রাথমিক পর্বে দেশজ বিষয় ও প্রেক্ষাপটের কথা মনে রেখেছেন।[৪] ফলে আর্ট স্কুলকে যখন কলেবরে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তখন জয়নুল আবেদিন দেশীয় চিত্রকলা চর্চার ঐতিহ্য বিকাশের জন্য প্রাচ্যকলা বিভাগ সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৫] যেহেতু বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষায় প্রত্যেক বিভাগ কলকাতা আর্ট স্কুলের অনুরূপ আদলে গঠন করেছিলেন সেহেতু দেশীয় চিত্রকলা চর্চার প্রয়োজনীয়তায় কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির আদলে প্রাচ্যকলা বিভাগ গঠন করা হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত চিত্ররীতি কলকাতা আর্ট স্কুলের তাঁর প্রথম পর্বের ছাত্রদের চর্চায়, নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির আদল গড়ে ওঠে। এ ধারাটিই কলকাতা আর্ট স্কুলের চর্চায় 'ইন্ডিয়ান আর্ট' হিসেবে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চালু হয়েছিল ১৯১৬ সালে।[৬] বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চায় ১৯৫৫ সালে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' বিভাগের অনুরূপ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নামের পরিবর্তন হওয়ায় প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ দেশবিভাগের পর বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা। রাজনৈতিক কারণে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' শব্দটি ব্যবহার করাও ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর।[৭] ফলে বিভাগ হিসেবে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারা বা ইন্ডিয়ান আর্টের অনুরূপ শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থায় নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এলো। নতুন নামকরণ হলো Oriental Art বা প্রাচ্যকলা। এই বিভাগে পাঠ্যক্রমে শিল্পের অন্যান্য শাখাও যুক্ত নয়। তবু আর্ট বা কলা শব্দটি যুক্ত হয়ে Oriental Art হিসেবে পরিচিত হলো।

প্রাচ্যকলা বিভাগের ক্লাস শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী শফিকুল আমীন। তিনি ১৯৫৫–১৯৬৮ সাল পর্যন্ত প্রাচ্যকলা বিভাগের একক দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় মাত্র একজন ছাত্রী নিয়ে প্রথম ক্লাস চালু হয়। ছাত্রীর নাম কিশোয়ার সুলতানা। তিনি ছিলেন গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের প্রথম শিক্ষক খাজা শফিক আহমেদের স্ত্রী। এ সময় পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তিত ছিল। এরপর ১৯৬৩ সালে 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' প্রথম শ্রেণির সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয়। তখন প্রাতিষ্ঠানটির নামকরণ হয়—'পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' এবং মহাবিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদে অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঠ্যক্রম পূর্বের পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পরিবর্তিত হয়ে দুই বছরের প্রিলিমিনারি/ফাভামেন্টাল কোর্সসহ তিন বছরের বি.এফ.এ (Bachelor of Fine Art) ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। দুই বছরের প্রিলিমিনারি কোর্সে শিক্ষার্থীদের একসাথে সকল বিভাগের সাথে সমন্বিত কোর্স হিসেবে পাঠদান দেয়া হতো। এরপর ছাত্রদের পছন্দ অনুযায়ী এবং মেধাক্রমের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স করতে হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালের পর মাত্র এক বছরের জন্য প্রাচ্যকলা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন শিল্পী রশিদ চৌধুরী এবং ১৯৬৯ সালে যোগ দিয়েছিলেন মু. আবুল হাশেম খান। ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন মোঃ তাজুল ইসলাম এবং ১৯৬৬–৬৭ সালে শিল্পী আব্দুস সাত্তার। এভাবে একজন একজন করে ছাত্র ভর্তির মধ্য দিয়ে প্রাচ্যকলা বিভাগ চালু হয়। ১৯৬৮ সালে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ থেকে শিক্ষকতায় যোগ দেন আমিনুল ইসলাম।[৮]

তবে ১৯৬৯ সাল-পূর্ব প্রাচ্যকলা বিভাগে যে চারজন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের কেউই প্রাচ্যকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। আব্দুস সাত্তার ১৯৭৩ সালে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে পাস করার পরে যখন শিক্ষক হয়েছেন তখন তিনিই প্রথম প্রাচ্যকলা বিভাগের প্রাচ্যকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করা প্রথম শিক্ষক। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যেসব ছাত্র এ বিভাগে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—১৯৬৮–৬৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া রফিক আহমেদ, তসাদ্দুক হোসেন, ১৯৬৯–৭০ শিক্ষাবর্ষে নুরুন নাহার পাপা, লক্ষ্মণ কুমার সূত্রধর ও শওকাতুজ্জামান। এঁদের মধ্য থেকে পরবর্তী সময়ে শিল্পী শওকাতুজ্জামান প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৭৩ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন আব্দুস সাত্তার। প্রাচ্যচিত্রকলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী মেধাবী শিল্পী আব্দুস সাত্তার শিক্ষক হয়ে যোগ দেয়ার পর প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় প্রাণ ফিরে আসে এবং এই সময় প্রাচ্যকলা বিভাগে ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষে একদল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হন। তাঁদের মধ্যে নাসরীন বেগম, ফৌজিয়া ইয়াসমিন, শাম্মী ইয়াসমিন, রেবেকা ইয়াসমিন ও শওকত আলী অন্যতম। এই ব্যাচ থেকে ১৯৮৯ সালে শিক্ষক হয়েছেন শিল্পী নাসরীন বেগম। এ ছাড়া ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষের শওকত-আরা- হোসেন, ১৯৭৭–৭৮ শিক্ষাবর্ষের নাজমা আক্তার, হেলেনা খানম ইরানী; ১৯৭৮–৭৯ শিক্ষাবর্ষে ইলহাম হক খুকু, নাসিমা খানম কুইনি; ১৯৭৯–৮০ শিক্ষাবর্ষে দিলরুবা লতিফ রোজি; ১৯৮১–৮২ শিক্ষাবর্ষে শামীম আরা বেগম, লায়লা বার্কিয়া আজম; ১৯৮২–৮৩ শিক্ষাবর্ষে লায়লা আঞ্জুমান আরা, ক্যামেলিয়া পারভীন; ১৯৮৫–৮৬ শিক্ষাবর্ষে মোঃ জাহিদুর রহমান খান, সৈয়দা সাজিয়া সুলতান; ১৯৮৫–৮৬ শিক্ষাবর্ষে নাজনীন সিরাজী ম্যাডোনা, আব্দুল্লাহ আল-মামুন সিদ্দিকী; ১৯৮৭–৮৮ শিক্ষাবর্ষে মোঃ ইলিয়াস খান, লাইজু আক্তার চ্যারিটি, শঙ্কর কুমার মল্লিক প্রমুখ প্রাচ্যরীতির উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রী।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের দুই দশকে শিল্প কার্যক্রমে অগ্রগতি লাভ করে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। প্রথমত স্বাধীনতার পর এই মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'। ১৯৭৮ সালে দুই বছরের এম.এফ.এ ডিগ্রি চালু করা হয়। অর্থাৎ এস.এস.সি পাসের পর চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে তিনটি স্তরে শিক্ষা দেয়া হতো।

ক) প্রাক-ডিগ্রি বি.এফ.এ—দুই বৎসর

খ) বি.এফ.এ ডিগ্রি (Bachelor of Fine Art)—তিন বৎসর

খ) এম.এফ.এ ডিগ্রি (Master of Fine Art)—দুই বৎসর

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-ডিগ্রি সকল বিভাগের জন্য সমন্বিত কোর্স ছিল। এই কোর্সে ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় বিষয়ে মোট ১০০০ মার্কের পড়াশোনা করতে হতো। নিচে প্রাক-ডিগ্রি কোর্সের নম্বর বিভাজন দেয়া হলো :

প্রাক-ডিগ্রি

১. ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং (১০০)
২. আলোছায়া (১০০)
৩. জলরং: স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ, কম্পোজিশন (১০০)
৪. স্কেচ : পেনসিল ও কালি-কলম (১০০)
৫. পারস্পেকটিভ ও সাধারণ ড্রাফটিং (১০০)
৬. বেসিক ডিজাইন ও লেটারিং (১০০)
৭. প্রিন্টমেকিং (৫০)
৮. মডেলিং (৫০)
৯. মৃৎশিল্প (৫০)
১০. কারুশিল্প (৫০)

তত্ত্বীয় বিষয়

১১. সভ্যতার ইতিহাস (১০০)
১২. ইংরেজি (৫০)
১৩. বাংলা (৫০)।[৯]

বি.এফ.এ তিন বছরের কোর্সে প্রাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক হিসেবে প্রাচ্যকলা বিভাগে পড়ানো হতো—১। ফিগার ড্রয়িং (১০০), ২। ফিগার কম্পোজিশন (১০০), ৩। কপি, মেথড ইন ওরিয়েন্টাল স্টাইল (১০০), ৪। ক্যালিগ্রাফি অ্যান্ড ডিজাইন (১০০), ৫। ফিগার পেইন্টিং (১০০), ৬। স্কেচ (১০০), ৭। মুরাল পেইন্টিং (১০০) এবং ঐচ্ছিক (১০০)।

এ ছাড়া বি.এফ.এ এবং এম.এফ.এ কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিল্পকলার ইতিহাস (১০০) ও সমাজবিজ্ঞান (১০০) পড়ানো হতো।[১০]

এম.এফ.এ কোর্সে—১। ফিগার কম্পোজিশন (১০০), ২। ড্রয়িং অ্যান্ড ডিজাইন ফ্রম নেচার (১০০), ৩। পরীক্ষামূলক কম্পোজিশন (১০০), ৪। প্রাচ্যরীতিতে চিত্ররচনা (১০০) ও মুরাল পেইন্টিং (১০০) ব্যবহারিক কোর্স হিসেবে পড়ানো হতো।[১১]

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনস্টিটিউট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। নামকরণ হয় চারুকলা ইনস্টিটিউট। এরপর ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে চার বছরমেয়াদি বি.এফ.এ (অনার্স) কোর্স এবং দুই বছরমেয়াদি এম.এফ.এ (মাস্টার্স) কোর্স চালু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিন্ন নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য ইনস্টিটিউটের আদলে এবং সংগতি রেখে পরিচালিত হতে থাকে চারুকলা ইনস্টিটিউট। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে ভর্তির শর্ত অনুযায়ী এখানে এস.এস.সি পাসের বদলে এইচ.এস.সি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করানো শুরু হয়।

চারুকলা ইনস্টিউটে অনার্স কোর্স চালুর পূর্ব পর্যন্ত পূর্বে উল্লিখিত শিক্ষাবর্ষের পরবর্তী সময়ে আরো কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রাচ্যরীতির কাজে সুনাম অর্জন করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে ১৯৮৮–৮৯ শিক্ষাবর্ষের সুশান্ত কুমার

অধিকারী অন্যতম। তিনি পরবর্তী সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা গ্রুপের প্রথম শিক্ষক হয়েছেন। এ ছাড়া একই শিক্ষাবর্ষে অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিলেন। শিক্ষক হিসেবেও পেয়েছিলেন সে সময় সদ্য যোগদান করা নাসরীন বেগমকে। ফলে প্রাচ্যকলা বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় একটা নতুন উদ্যম শুরু হলো। এই শিক্ষাবর্ষের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী হলেন শাহনাজ বেগম, কাশ্মীরী বেগম এ্যাঞ্জেল, রিয়াজুল ইসলাম সোহেল, শাহনাজ বেগম, ফারজানা সুলতানা সেবা, মোহসীন কবির, নাবিলা ইকরাম নমি, হোমায়ারা আফরোজ।

১৯৮৯–৯০ শিক্ষাবর্ষের অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে মিজানুর রহমান ফকির, মোঃ আব্দুল আযীয ও গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী একই বিভাগে পরবর্তী সময়ে শিক্ষক হয়ে বর্তমান অবধি কর্মরত আছেন। এ ছাড়া ধীমান কুমার বিশ্বাস, অনাদী কুমার বৈরাগী, সীমা রানী রায় চৌধুরী, ননী গোপাল রায়, অমলেন্দু মণ্ডল বিরাজ, উত্তম কুমার বসাক, খায়রুন আলম শিখা উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০–৯১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা হলেন নাসরীন রহমান, সনাতন বিশ্বাস, টোকন ঠাকুর, অনুকূল চন্দ্র দাস, রিয়াদুল আহসান, পঙ্কজ কুমার রায়, ইশরাত জাহান চৌধুরী, ফাতেমা রিফাত, নাসরিন রহমান। ১৯৯১–৯২ অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতির শেষ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রী হলেন মাসুদা খাতুন জুঁই, মোঃ সেলিম, ফারজানা ইয়াসমিন আহমেদ, রনেল চাকমা।

একটা সময় সনাতন ব্যাচের বি.এফ.এ এবং এম.এফ.এ কোর্স ও অনার্স ব্যাচের বি.এফ.এ কোর্স একই সাথে হতো। বিশেষত সেশনজটের কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই উভয় পদ্ধতির পাঠ্যক্রম চালু ছিল।

১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষে অনার্স কোর্স চালু হওয়ায় ২২০০ নম্বরের অনার্স কোর্স চার বছরে এবং ১০০০ নম্বরের মাস্টার্স কোর্স দুই বছরে করানো হয়। এর মধ্যে ব্যবহারিক বিষয় বেশি। তত্ত্বীয় ও মেটিরিয়াল অ্যান্ড টেকনিক বিষয় পড়ানো হতো কম। প্রথম বর্ষের সমন্বিত কোর্স সকল বিভাগের জন্য একই থাকায় অনেক শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এই সমন্বিত কোর্সের ক্লাসগুলো একই সাথে হতো। এ ছাড়া তত্ত্বীয় বিষয়গুলোও অভিন্ন হওয়ায় এখন পর্যন্ত একই সাথে পড়ানো হয়ে থাকে। ১৯৯৩ সালে ৫ ফেব্রুয়ারির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অনুমোদিত বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম নিচে দেয়া হলো :

বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম

প্রথম বর্ষের সমন্বিত কোর্স ॥ পূর্ণমান : ৭০০

(শিক্ষাক্রম বিশ্বের সমকালীন বিজ্ঞানধর্মী শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলিত হবে)

১। কোর্স ১০১ : অঙ্কন (ড্রয়িং) ॥ পূর্ণমান : ১০০
মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম ও ব্রাশ
বিষয় : ফোলিয়েজ, তৈজসপত্র ও অন্যান্য বস্তু, মানুষ এবং পশুপাখি

২। কোর্স ১০২ : স্কেচ ॥ পূর্ণমান : ১০০
মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম ও ব্রাশ
বিষয় : নিসর্গ, জীবন এবং পরিবেশ
(স্কেচ খাতার নিয়মিত চর্চা এ-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত)

Dhaka University Institutional Repository

৩। কোর্স ১০৩ : বেসিক ডিজাইন ॥ পূর্ণমান : ১০০
মাধ্যম : কালি তুলি, বিভিন্ন রং এবং পেপার কোলাজ
বিষয় : নকশার রীতি ও উপাদান। বাংলা ও ইংরেজি লেটারিং এবং তার প্রয়োগ

৪। কোর্স ১০৪ : পরিপ্রেক্ষিত (পারস্পেকটিভ) ॥ পূর্ণমান : ১০০
(রৈখিক ও বায়বীয়)
মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম ও জলরং ইত্যাদি
বিষয় : বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকৃতির বস্তু, তৈজস ও আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি ও নিসর্গ

৫। কোর্স ১০৫ : অনুশীলন ও কম্পোজিশন ॥ পূর্ণমান : ১০০
মাধ্যম : পেনসিল, কালি তুলি, জলরং ইত্যাদি
বিষয় : লতাপাতা, ফুল, পশুপাখি, জাদুঘরে রক্ষিত সামগ্রী, বিভিন্ন বস্তু ও জড় জীবন
আলোছায়া নির্ণয়ের মাধ্যমে অনুশীলন ও বিন্যাস

৬। কোর্স ১০৬ : বাংলাশেদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ॥ পূর্ণমান : ১০০

৭। কোর্স ১০৭ : সভ্যতার ইতিহাস ও শিল্পকলা ॥ পূর্ণমান : ১০০।[১২]

সমন্বিত প্রথম বর্ষের পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে প্রাচ্যকলা বিভাগে বিভাগীয় করণ-কৌশলে ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ এবং প্রাচ্যকলা বিভাগের পাঠক্রমে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। উভয় বিভাগে চিত্রকলায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। তবে চিত্র নির্মাণ পদ্ধতিতে কৌশলে এবং উপাদানগত বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের চিত্রকলায় পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়, আর প্রাচ্যকলায় চিত্র অঙ্কনে প্রাচ্য-ঐতিহ্যের পরম্পরাগত চিত্র নির্মাণ পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ জীবন-দর্শন ও বিষয়গত বৈচিত্র্যে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা দেশীয় আবহ দ্বারাই পরিবেষ্ঠিত।

ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং যেমন ইউরোপীয় তেলরং ও ক্যানভাস প্রধান। তেমনি প্রাচ্যের ঐতিহ্যে কাগজ ও জলরং প্রধান। তবে মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় বৈচিত্র্য বেশি। বিশেষত ওয়াশ পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন, টেম্পারা পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন এবং মুরাল চিত্র। এ ছাড়া ড্রয়িং, ডিজাইন, ক্যালিগ্রাফি পাণ্ডুলিপি চিত্রণ অন্যতম।

চিত্র ০১ : মুরাল চিত্র, প্রাচ্যকলা বিভাগের দেয়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কিত

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ০২ : এগ টেম্পারা, প্রাচ্যকলা বিভাগের দেয়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কিত

নিচে প্রাচ্যকলা বিভাগের বি.এফ.এ সম্মান কোর্সের পাঠক্রম দেয়া হলো :

বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম

প্রাচ্যকলা বিভাগ ॥ পূর্ণমান : ২২০০

১। প্রথম বর্ষ সমন্বিত কোর্স ॥ পূর্ণমান ৭০০

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ পূর্ণমান : ৫০০

১। কোর্স ২১৭ : ঐতিহ্যবাহী ও খ্যাতনামা শিল্পকর্মের অনুকৃতি ॥ পূর্ণমান : ১০০
২। কোর্স ২১৮ : ডিজাইন ও ক্যালিগ্রাফি ॥ পূর্ণমান : ১০০
৩। কোর্স ২১৯ : অনুশীলন (পশুপাখি ইত্যাদি) ও কম্পোজিশন ॥ পূর্ণমান : ১০০
৪। কোর্স ২২০ : মিউরাল ॥ পূর্ণমান : ৫০
৫। কোর্স ২২১ : শিল্প-উপকরণ ও করণ-কৌশল ॥ পূর্ণমান : ৫০ (২০+৩০)
৬। কোর্স ২৩৬ : শিল্পকলার ইতিহাস ॥ পূর্ণমান : ১০০

তৃতীয় বর্ষ ॥ পূর্ণমান : ৫০০

১। কোর্স ৩১৫ : ফিগার পেইন্টিং ॥ পূর্ণমান : ১০০
মাধ্যম : টেম্পারা, ওয়াশ ও তেলরং
২। কোর্স ৩১৬ : কম্পোজিশন ॥ পূর্ণমান : ১০০
বিষয় : পশুপাখি, মানুষ ও পারিপার্শ্বিক রূপ
৩। কোর্স ৩১৭ : মিউরাল (প্রাচীন পদ্ধতি) ॥ পূর্ণমান : ১০০
৪। কোর্স ৩১৮ : স্কেচ ॥ পূর্ণমান : ৫০
৫। কোর্স ৩৩২ : দক্ষিণ এশীয় শিল্পকলা ॥ পূর্ণমান : ১০০

চতুর্থ বর্ষ ॥ পূর্ণমান : ৫০০

১। কোর্স ৪১৬ : মিউরাল (সৃজনশীল) ॥ পূর্ণমান : ১০০
২। কোর্স ৪১৭ : কম্পোজিশন (সৃজনশীল) ॥ পূর্ণমান : ১০০
৩। কোর্স ৪১৮ : পাণ্ডুলিপি চিত্রণ ॥ পূর্ণমান : ১০০
৪। কোর্স ৪১৯ : ড্রয়িং (সৃজনশীল)॥ পূর্ণমান : ৫০
৫। কোর্স ৪৩১ : পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাস ॥ পূর্ণমান : ১০০।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম

বিষয় : বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি
(কোর্স : ১০৬)
পূর্ণমান : ১০০
(প্রথম বর্ষের সমন্বিত কোর্সে পাঠ্য)

ক. বাংলাদেশের লোকশিল্প ও সংস্কৃতি
খ. বাংলাদেশের সাহিত্য
(শিক্ষার্থীকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলার এবং বিভাগোত্তর ও স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা রাখতে হবে)

ক. বাংলাদেশের লোকশিল্প ও সংস্কৃতি
ক. ১. বাংলাদেশের লোকশিল্প : লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও পাঠ্যের প্রয়োজনীয়তা, মূল কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত : যেমন নকশিকাঁথা, লক্ষ্মীর সরা পুতুল, বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প, আলপনা, ধাতব গহনা ও বিভিন্ন নকশা, মৃৎশিল্প, শিকা প্রভৃতি।

ক. ২. বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি : রীতি ও প্রথা, প্রধান প্রধান ধর্মীয় পালা-পার্বণ, আদিবাসী সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় : যেমন, বাউল, বৈষ্ণব ও নাথ, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগীত

খ. বাংলাদেশের সাহিত্য

খ. ১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য (বিশেষত ময়মনসিংহের গীতিকা) ও রোম্যান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
খ. ২. আধুনিক বাংলা সাহিত্য : উন্মেষ পর্বের বাংলা গদ্য, উনিশ ও বিশ শতকের উপন্যাস, কবিতা ও নাটক, ১৯৪৭-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যের মূল প্রবণতাসমূহ।[১৪]

বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সের অধীনে শিল্পকলার ইতিহাস-সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পাঠ্যক্রম :

১। কোর্স ১০৭ : সভ্যতার ইতিহাস ও শিল্পকলা ॥ পূর্ণমান : ১০ (প্রথম বর্ষে পাঠ্য)
(প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে রেনেসাঁ পর্যন্ত)
২। কোর্স ২৩৬ : শিল্পকলার ইতিহাস ॥ পূর্ণমান : ১০০ (দ্বিতীয় বর্ষে পাঠ্য)
ক. মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ (পাশ্চাত্য শিল্প)
খ. ইসলামী শিল্পকলা
৩। কোর্স ৩৩২ : দক্ষিণ এশীয় শিল্পকলা ॥ পূর্ণমান : ১০০ (তৃতীয় বর্ষে পাঠ্য)
ক. ভারতীয় উপমহাদেশ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)
খ. বাংলাদেশ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

৪। কোর্স ৪৩১ : পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাস ॥ পূর্ণমান : ১০০ (চতুর্থ বর্ষে পাঠ্য)

(রেনেসাঁ-উত্তর যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী)
বিষয় : ম্যানারিজম, বারুক, রকোকো, রোমান্টিক যুগ, ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম, ফভিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, নিউ-ক্লাসিসিজম, অপ ও পপআর্ট।[১৫]

বি.এফ.এ অনার্স কোর্সের পর দুই বছরের এম.এফ.এ কোর্সের পাঠ্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলো :

প্রাচ্যকলা বিভাগ
জলরং, টেম্পারা, ফ্রেসকো, মোজাইক কিংবা তেলরং প্রভৃতি উপকরণ যেকোনো একটি অবলম্বনে স্পেশালাইজড কিংবা সনাতন পদ্ধতিতে এম.এফ.এ উভয় পর্বের কোর্স সম্পন্ন করা যাবে।

এম.এফ.এ প্রথম পর্ব ॥ পূর্ণমান : ৫০০ (৩০০+২০০)	ক্লাস নম্বর +পরীক্ষার নম্বর+মৌখিক
কোর্স ৫১০ : ফিগার কম্পোজিশন	১০০ : ৫০+৫০
কোর্স ৫১১ : ড্রয়িং ও ডিজাইন (ক্যালিগ্রাফি)	১০০ : ৫০+৫০
কোর্স ৫১২ : প্রাচ্যরীতিতে চিত্ররচনা	১০০ : ৫০+৫০
কোর্স ৫২২ : নন্দনতত্ত্ব ও শিল্প-উপচয় (Appreciation)	১০০ : ১৫+৭৫+১০
কোর্স ৫২৩ : বাংলাদেশের শিল্পকলা (আধুনিক যুগ)	১০০ : ১৫+৭৫+১০
এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্ব ॥ পূর্ণমান : ৫০০ (৪০০+১০০)	
কোর্স ৬০৭ : নিরীক্ষামূলক কম্পোজিশন	২০০ : ১০০+১০০
কোর্স ৬০৮: মুরাল পেইন্টিং	২০০ : ১০০+১০০
কোর্স ৬১৫ : আধুনিক এশীয় শিল্পকলা	১০০ : ১৫+৭৫+১০
বিকল্প	
কোর্স ৬১৬ : অভিসন্দর্ভ (নিজ শিল্পকর্ম সম্পর্কে)	১০০ : ৭৫ + ২৫
সর্বমোট :	১০০০ নম্বর।[১৬]

তত্ত্বীয় বিষয়সমূহ :

কোর্স : ৫২২ — নন্দনতত্ত্ব ও শিল্প-উপচয় (Appreciation)-এই বিষয়ে থাকবে—দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং Beauty (সুন্দর), Imitation (অনুকরণ), Form (বিভিন্ন ধরনের ফর্ম), The Renaissance (Theory of Painting) Aesthetics of Modern America সহ বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের শিল্প-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা।

কোর্স : ৫২৩ — বাংলাদেশের শিল্পকলা (আধুনিক যুগ)—এই বিষয়ের আওতায় থাকবে—বেঙ্গল স্কুল (কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল, নব্যবঙ্গীয় রীতি), শান্তিনিকেতন, চারুকলা ইনস্টিটিউট, কলেজ, শিল্পকলা একাডেমি ও জাদুঘরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস.এম সুলতানসহ অন্য প্রধান শিল্পীদের অবদানবিষয়ক আলোচনা।

কোর্স : ৬১৫ — আধুনিক এশীয় শিল্পকলা (১৯৪০ থেকে)—এই বিষয়ের আওতায় থাকবে—ইরান, ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের শিল্পকলাবিষয়ক আলোচনা।[১৭]

১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এফ.এ (অনার্স) কোর্স চালু হলে প্রাচ্যকলা বিভাগের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় পাঁচজনে। পরবর্তী সময়ে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে যথাক্রমে ৮, ১০ ও ১২ জন করা হয়।

অনার্স ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাঁদের ভর্তি তথ্য পাওয়া গেছে তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ[১৮] :

শিক্ষাবর্ষ	ছাত্র-ছাত্রীর নাম
১৯৯২–৯৩	এস.এম সালাহউদ্দিন পান্না, তানজিয়া ইসলাম খান সেতু, মোঃ মহিবুল ইসলাম বাবু

১৯৯৩–৯৪	রাবেয়া বেগম লিপি, এলিজা সুলতান এ্যানি, নাইমা করিম, আসমা-উল-হুসনা (মিলি), রাফিয়া ইয়াসমিন, মোঃ সালাহ উদ্দিন মুরাদ
১৯৯৪–৯৫	ফাহমিদা খাতুন, গাজী মোঃ জহিরুল ইসলাম টিটো
১৯৯৫–৯৬	জাহেদুস সাদাত, প্রাণ রায়, শাহনেওয়াজ কাকলি, মলয় বালা
১৯৯৬–৯৭	দীপা ইসলাম, নুসরাত জাহান, প্রশান্ত কুমার অধিকারী, হাফিজ মোঃ ইসমাইল, মিলন জ্যোতি ত্রিপুরা, আলমগীর কবির ভূইয়া
১৯৯৭–৯৮	কান্তিদেব অধিকারী, সাব্বির আহমেদ, রুবাইয়াত শায়লা, শারমিন ফাতেমা বীণা, মোঃ আনারুল হক, তাহমিনা সুলতানা, সুনীত কুমার মণ্ডল, নিরূপমা মফিদা বেগম, ইসরাত জাহান
১৯৯৮–৯৯	জাকিয়া রায়হান, ওয়াজমুল নাহার রুন্টি, রকিবুল হাসান রাকিব, ফারহানা কবির মিমি, মেহেদী হাসান, তাসনূভা রহমান রাসনা, ইসরাত জাহান, আবুরেজা মোঃ জসিম উদ্দিন, শরীফ-আল-মাসুদুর রহমান
১৯৯৯–২০০০	রেযয়ানা ইসলাম জেসিন, মতুরাম চৌধুরী, আবুল কাশেম (হিমু), মেহেদী হাসান খান (সুমন), রেজওয়ানা হ্যাপী, খন্দকার মেহেদী হাসান
২০০০–২০০১	রুখসানা জামান, রোমেনা আফরোজ, আবু এহসানুল কবির, নাহিদ আলম সোহাগ আরিফুর রহমান, আশীষ কুমার তালুকদার
২০০১–২০০২	মোঃ নাজমুল হক বাপ্পী, আসমা পারভীন, সামিনা হালিম, লুৎফুন নাহার, মোঃ হাসান মোর্শেদ, শারমীন জাহান, অজয় চাকমা
২০০২–২০০৩	গোপাল চন্দ্র সাহা, মোঃ রেদুয়ানুর রহমান, মোঃ সাইফুল ইসলাম, তানবীরা নূর সেতু, নায়েলা হুমায়েরা, এস.এম সোহেল রানা, ফরহাদ আলী খান
২০০৩–২০০৪	নাহিদ রোখসান, সুমন কুমার বৈদ্য, ফৌজিয়া হক, তাহমিনা ফেরদৌস, সিনথিয়া আরেফিন, মামুন, এ.কে.এস জিয়াদ-উল-ইসলাম, মোঃ তোয়াজ্জেম হোসেন, বাসুদেব সাহা
২০০৪–২০০৫	মোঃ রফিকুল ইসলাম, এম.এম আল-নাহিয়ান রবিন, এস.এম ইসমাতুল বনীন, উল্লাস ধর, ফারজানা ববি, মোঃ ওমর খৈয়াম, সাহারা আফরিন, বিকাশ আনন্দ সেতু, মোঃ শফিকুল ইসলাম
২০০৫–২০০৬	হুমায়রা আকতারী, মোঃ আসাদুল ইসলাম, নীলিমা সরকার, কানিজ ফাতেমা জ্যোতি, পূর্ণিমা মণ্ডল, নাজমা আক্তার, খায়রুন নেসা, আশরাফা সিদ্দিকা, মোঃ মাহবুবুর রহমান, জিনাত রেহেনা
২০০৬–২০০৭	মোঃ নাজমুল হোসেন, মোঃ নাজমুল হাসান, মোঃ জাকারিয়া ইসলাম, মোঃ

	ইসকিন্দার মির্জা, সুকান্ত মধু, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ মহসীন কবির, মুস্তাকিনা তারিন
২০০৭–২০০৮	তানজিমা তাবুচ্ছুম এশা, শ্বেততাজ জাহান, মোঃ হাসানুজ্জামান, আইরিন সুলতানা, লিজা, শারমিন আক্তার, সুমন সাহা, অমিত নন্দী, নাহিদা আক্তার নিশা, মাকী ও হীরা
২০০৮–২০০৯	ফাইজা শারজানা, সাবরিনা আক্তার লিমা, তাহমিনা বিনতে কবির, সুস্মিতা সাহা রিমি, মশিউর রহমান, জুলিয়া ইউসুফ, মোঃ আবদুল্লাহ-আল-আমিন, লুবনা ইয়াসমীন, শারীফুন নেছা আঁখি, শাম্মী জাহান মৌ, রুবিনা ইসলাম, মোঃ হোসেন আলী
২০০৯–২০১০	দ্বীন মোহাম্মদ, ফারহানা রহমান ফাউজিয়া, মহিমা বেগম, মোঃ তারেক ইকবাল, মোঃ আবু হোসেন, শুচিস্মিতা, জান্নাতুল ফেরদৌস কেয়া, নাঈম আহমেদ, আরিফুন ইসলাম, রিফাত রিয়াজ, দীপা রানী দাস, গোলাম রসুল
২০১০–২০১১	মোঃ মাজহারুল ইসলাম, অভিজিৎ দেবনাথ, নন্দিতা সুতার, শমস-ই-ইসলাম তাম্মী, রওশন আরা দীপা, লমিয়া রশীদ অন্তরা, নিপা রানী সরকার, জান্নাতুল ফেরদৌস, চন্দন কুমার সরকার, পদ্মাবতী ঢালী, আবুল হাসান, সানজিদা আক্তার
২০১১–২০১২	ইতি রাজবংশী, তৌহিদা হক, শায়লা সিরাজ, তমাশ্রী মণ্ডল, সেহাম সেলিম সিম্মি, নওরীন মিশা, হাসুয়া আক্তার রুমকী, মোঃ মোর্শেদ আলম, নাজনীন ইসলাম, সেলিনা ধৃতি গোমেজ, হাবিবা ইয়াসমিন

উল্লিখিত শিক্ষাবর্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা দেখে অনুমান করা যাচ্ছে বি.এফ.এ (অনার্স) কোর্স চালু হবার পর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। শিক্ষকের সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৯২ সালে যোগ দিয়েছিলেন শওকাতুজ্জামান, ২০০৩ সালে আব্দুল আযীয, ২০০৮ সালে মিজানুর রহমান ফকির, মলয় বালা; ২০০৯ সালে কান্তিদেব অধিকারী ও গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী। ফলে বর্তমান ২০১৩ সালে দুজন অধ্যাপক, সাতজন সহকারী অধ্যাপক কর্মরত আছেন। ২০১২ সালের মধ্যে ২০০৪–০৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের এম.এফ.এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ফলে ২০০৪–০৫ শিক্ষাবর্ষের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো শিক্ষনবিশ আছেন।

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা বিস্তার ও বিকাশের জন্য ১৯০৭ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'। এই সোসাইটির মাধ্যমে নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল। এই একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০০১ সালে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের নির্দেশনায় এবং শিল্পী

শওকাতুজ্জামানের পরিচালনায় ১০ জন শিল্পী নিয়ে ‘বাংলাদেশ সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সালে এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪ জনে।[১৯]

‘বাংলাদেশ সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট’-এর উদ্যোগে ২০০৩ সালে ধানমণ্ডির আড়িয়াল সেন্টারে প্রথম ‘দ্বিবার্ষিক প্রাচ্যকলা প্রদর্শনী-২০০৩’ অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর নির্বাচিত আলোকচিত্র নিচে দেয়া হলো :

চিত্র ০৩ : শিল্পী আব্দুস সাত্তার, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

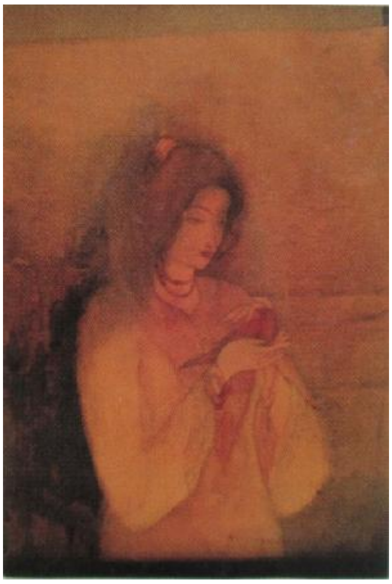

চিত্র ০৪ : শিল্পী নাজনীন সিরাজী ম্যাডোনা
A girl with bird, ৫৫.৮৮ × ৪৩.১৮ সেমি

চিত্র ০৫ : শিল্পী লক্ষ্মণ কুমার সূত্রধর
Tradition

চিত্র ০৬ : শিল্পী ফাহমিদা খাতুন,
টেম্পারা , Flow Up
৮১.২৮ × ৬৩.৫ সেমি

চিত্র ০৭ : শিল্পী জিয়াদুল হক, ওয়াশ
Untitled, ৫২ × ৪১ সেমি

পরবর্তী সময়ে প্রাচ্যকলা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। প্রথমত উল্লেখ করা যায়—প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক নাসরীন বেগমকে। তিনি ২০০৩ সালে তিনজন প্রাচ্যরীতির ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গ্যালারি চিত্রকে ‘বর্ণিকাভঙ্গ’ শিরোনামে জলরং চিত্র প্রদর্শনী করেছেন। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের চিত্রকলায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা স্বতন্ত্র এক অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছে। প্রদর্শনীর নির্বাচিত আলোকচিত্র নিচে দেয়া হলো :

চিত্র ০৮ : শিল্পী নাসরীন বেগম, জলরং
The red door 'A'
৩৭ × ২৮ সেমি, ২০০৩

চিত্র ০৯ : শিল্পী আব্দুল আযীয
Lady with a bird 'B'
৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩

চিত্র ১০ : শিল্পী রাবেয়া বেগম লিপি
Imagination-2
৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩

দ্বিতীয়ত প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক শওকাতুজ্জামানের নেতৃত্বে ২০04 সালে জয়নুল গ্যালারিতে ছয়জন প্রাচ্যরীতির শিল্পীর প্রদর্শনী হয়েছিল। যে প্রদর্শনীতে শওকাতুজ্জামানের সাথে ছিলেন তাঁর ছয়জন ছাত্র-ছাত্রী। এই প্রদর্শনীর শিরোনাম ছিল An Exhibition of Oriental Art 2005। এই প্রদর্শনীতে ওয়াশ, টেম্পারা, জলরং মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির নানা রকম কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীর নির্বাচিত আলোকচিত্র নিচে দেয়া হলো :

চিত্র ১১ : শিল্পী নাসরীন রহমান, ওয়াশ পেইন্টিং
Nature-5, ৩০ × ৪৩ সেমি

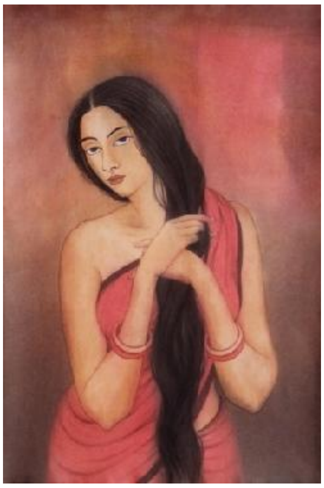

চিত্র ১২ : শিল্পী কান্তিদেব অধিকারী
After Bath
৫৫.৮৮ × ৩৫.৫৬ সেমি

তৃতীয়ত তরুণ শিক্ষক মলয় বালার নেতৃত্বে ছাত্রদের নিয়ে গঠন করা হয় Oriental Painting Study Group। এই গ্রুপের আয়োজনে ২০০৯ সালে জয়নুল গ্যালারিতে 1st Group Painting Exhibition-2009 প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা বিভাগে পাঠরত প্রথম বর্ষ থেকে মাস্টার্স শ্রেণির মোট ২০

জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছেন। বিভাগীয় উদ্যোগে না হলেও এই প্রদর্শনে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ, টেম্পারা, জলরং, পেনসিল, কালি-কলম, প্যাস্টেল, মিশ্র, তেলরং, অ্যাক্রেলিক, চারকোল মাধ্যমে অনেক কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এ প্রদর্শনীতে প্রাচ্যরীতির বিশেষ বিষয় ক্যালিগ্রাফি, মিনিয়েচার এবং খ্যাতনামা শিল্পীদের শিল্পকর্মের অনুকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রদর্শনীর ছবিগুলো মূলত ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসের পাঠ্যক্রম অনুসারে যেসব ছবি এঁকেছেন সেসব ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। প্রদর্শনীর নির্বাচিত আলোকচিত্র নিচে দেয়া হলো।

চিত্র ১৩ : শিল্পী মোস্তাকিন তারিন
Ablution, ওয়াশ পেইন্টিং
৭৫ × ৫৫ সেমি

চিত্র ১৪ : শিল্পী এ.কে.এম জিয়াদ-উল-ইসলাম
Self Analysis, ক্যানভাসে তেলরং
৯১ × ৫১ সেমি

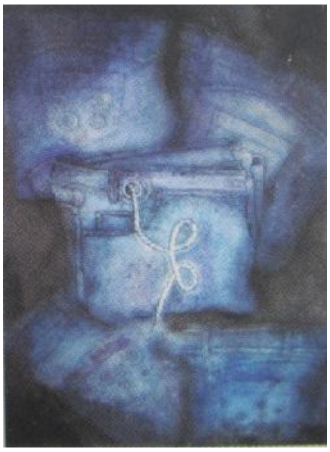

চিত্র ১৫ : শিল্পী ফাইজা হক
Memento of the Trip
ওয়াশ পেইন্টিং
৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩

'ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টাডি' গ্রুপের উদ্যোগে ২০১০ সালে Oriental Painting Exhibition-2010 অনুষ্ঠিত হয়েছিল জয়নুল গ্যালারিতে। এই প্রদর্শনীতে প্রাচ্যকলা বিভাগের তিনজন তরুণ শিক্ষক (মলয় বালা, গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী, কান্তিদেব অধিকারী) এবং সাতজন এম.এফ.এ পর্বের ছাত্র অংশগ্রহণ করেছেন। প্রদর্শনীর নির্বাচিত আলোকচিত্র নিচে দেয়া হলো।

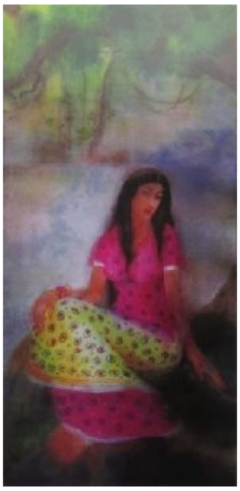

চিত্র ১৬ : শিল্পী রাকিবুল হাসান
Waiting, জলরং (ওয়াশ পেইন্টিং)
১১৪ × ৫৬ সেমি, ২০১০

চিত্র ১৭ : শিল্পী বিকাশ আনন্দ সেতু
Illusion of Nature-01
জলরং (ওয়াশ পেইন্টিং), ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১০

Oriental Painting Study Group ২০১১ সালে তিনজন তরুণ শিক্ষকসহ ২১ জন ছাত্র-ছাত্রীর Calligraphy Exhibition-2011 আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীটি জয়নুল গ্যালারিতে হয়েছে। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা অক্ষরে এমন প্রাচ্যরীতির ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী সে সময় অনেক প্রশংসিত হয়েছে। প্রদর্শনীর নির্বাচিত আলোকচিত্র নিচে দেয়া হলো :

চিত্র ১৮ : জি.সি ত্রিবেদী
মিশ্র মাধ্যম
৭৩.৬৬ × ৩০.৪৮ সেমি, ২০১১

চিত্র ১৯ : শিল্পী অমিত নন্দী
ক্যালিগ্রাফি, জলরং
৫৫.৮৮ × ৩৫.৫৬ সেমি

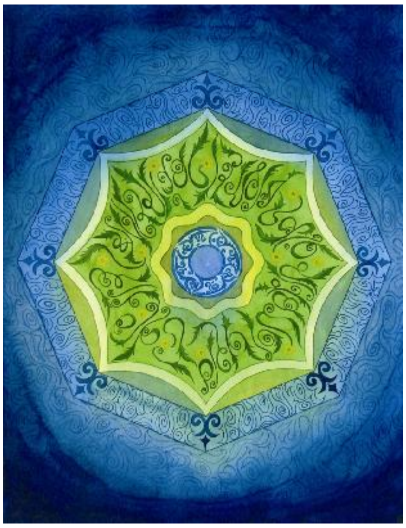

চিত্র ২০ : শিল্পী তাহমিনা বিনতে কবির
জলরং, ৫৫.৮৮ × ৩৫.৫৬ সেমি

চিত্র ২১ : শিল্পী মোঃ হাসান মোর্শেদ
ক্যালিগ্রাফি, জলরং, ৭৬.২ × ৬০.৯৬ সেমি

চিত্র ২২ : রুবিনা ইয়াসমিন, জলরং, ৫৫.৮৮ × ৭১.১২ সেমি

চতুর্থত, প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষকগণ ‘শিকড় সন্ধান’ শিরোনামে ২০১০ সালে জয়নুল গ্যালারিতে প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীকে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বলা যায়। শিক্ষকদের এই প্রদর্শনীতে প্রাচ্যধারায় কৌশলগত দিক এবং বিষয় উপস্থাপনের নিজস্বতার ছাপ ধরা পড়েছে।[২০] প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষকদের উদ্যোগে শিকড় সন্ধান-২ প্রদর্শনী হয়েছিল ২০১২ সালে জয়নুল গ্যালারিতে। প্রদর্শনীর ক্যাটালগে শিল্পী

আব্দুস সাত্তার এই প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত যে পরিচিতি ও আদর্শ উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন, তা প্রাসঙ্গিকতার দাবিতে তুলে ধরা হলো :

> শিকড় সন্ধান একটি আন্দোলনের নাম। সে আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে ২০১০ সালে। আন্দোলনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রাচ্যকলা বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার, সহযোগী অধ্যাপক নাসরীন বেগম, সহকারী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আযীয, সহকারী অধ্যাপক মলয় বালা, সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান ফকির এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক মাসুদা খাতুন জুঁই। এবার এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও দুইজন। কান্তিদেব অধিকারী এবং জি.সি ত্রিবেদী। উভয়ই প্রভাষক পদে কর্মরত আছেন। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাতজনই প্রাচ্যধারার অনুসারী শিল্পী। অর্থাৎ এ দেশের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত শিল্পধারার সৈনিক। সৈনিক শব্দটি উচ্চারিত হলে ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকদের কথাই মনে পড়ে। তবে শিল্পীদের এ উদ্যোগ, এ প্রচেষ্টা এবং এই প্রদর্শনীও এক ধরনের যুদ্ধই। ... বাংলাদেশের পশ্চিমা ধারার নির্লজ্জ অনুকরণ যাতে প্রাচ্য ধারাকে গ্রাস করতে না পারে সেজন্যই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চারুকলা অনুষদে প্রাচ্যকলা বিভাগ খুলেছিলেন। এই বিভাগকে কেন্দ্র করেই টিমটিম করে ঐতিহ্য চর্চার আন্দোলন গড়ে উঠছে। তারই অংশ হচ্ছে সাত শিল্পীর শিকড় সন্ধান। শিকড় সন্ধানের আন্দোলন সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই আমার মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য শিল্পী এবং শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা। যাতে তারা নিজেদের প্রতি, নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। যাতে পশ্চিমা সংস্কৃতির পরিবর্তে নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হন।[২১]

এই প্রদর্শনীটি প্রয়াত শিক্ষক শিল্পী শওকাতুজ্জামানের (১৯৫৩−২০০৫) স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে জলরং ওয়াশ পদ্ধতি ছাড়াও মিশ্র মাধ্যম ও অ্যাক্রেলিক মাধ্যমের কাজ দেখা যায়।

চিত্র ২৩ : শিল্পী আব্দুস সাত্তার
ফুল, কাঠখোদাই
(শিকড় সন্ধান প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত, ২০১০)

চিত্র ২৪ : শিল্পী গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী
Illussion of Line-153, মিশ্র মাধ্যম, ২০১২
(শিকড় সন্ধান-২ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত, ২০১২)

উল্লিখিত প্রদর্শনীর কাজে এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার সাথে জড়িত শিল্পীগণের কাজে নব্য-বেঙ্গল স্কুলের রীতি-পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবি এঁকেছেন। একই সাথে তাঁরা পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন এবং নিজের পছন্দের বিষয় ও মাধ্যমকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক বিশ্ব শিল্পকলার সাথে তাল মিলিয়ে চলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট ২০০৮ সালে আরেক ধাপে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ২০০৮ সালের ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ অনুষদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। 'চারুকলা ইনস্টিটিউট' নামটি 'চারুকলা অনুষদ' নামকরণ হয়।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' নামে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা শুরু হয়েছিল, এরই ধারাবাহিকতা ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম শহরে চারুকলা কলেজ নামক একটি চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যরীতির চারুকলা চর্চার কোনো বিভাগ চালু হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৮ সালে রাজশাহী মহানগরীতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিনে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিজস্ব ভবন গড়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে পরিণত হওয়ায় শিক্ষা পাঠ্যক্রমসহ অন্যান্য নিয়মাবলি সমৃদ্ধ মহাবিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু হয় রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের। এ সময় ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে দুই বছরের প্রাক-ডিগ্রি এবং তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রি পর্যায়ের লেখাপড়া করানো হতো। স্নাতক পর্যায়ে ব্যবহারিক বিষয়ের পড়াশোনা ছিল—চিত্রকলা, গ্রাফিক ডিজাইন, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, কারুকলা, মৃৎশিল্প ও প্রাচ্যকলা। শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত বিষয়ের যেকোনো একটিকে মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে অন্য যেকোনো একটি বিষয়কে সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন।[২২]

প্রাচ্যকলা চালু থাকলেও শিক্ষকের অভাবে এ বিষয় নিয়ে কেউ পড়াশোনা করেননি। এরপর মহাবিদ্যালয়টি ১৯৯৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে অন্তর্ভুক্ত চারুকলা বিভাগ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই চারুকলা বিভাগে পাঠ্যসূচি হিসেবে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রম গ্রহণ করা হয়। চিত্রকলা, গ্রাফিক ডিজাইন, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, কারুকলা, মৃৎশিল্প ও প্রাচ্যকলার মতো পূর্ণাঙ্গ বিভাগগুলোর পাঠ্যক্রম অক্ষুণ্ন রেখেই সেগুলোকে গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা গ্রুপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের চার বছরমেয়াদি ২২০০ মার্কের অনার্স কোর্স চালু হয় সিলেবাসকে অক্ষুণ্ন রেখে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যকলা গ্রুপে কোনো শিক্ষক না থাকায় প্রথম শিক্ষাবর্ষগুলোতে কোনো ছাত্র ভর্তি হননি। এরপর ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষাবর্ষে শংকর মজুমদার ও মামুন নামে দুজন ছাত্র ভর্তি হন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষকশূন্য অবস্থায় তাঁদের পড়াশোনা চলতে থাকে। এরপর ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী প্রভাষক পদে যোগ দিয়ে রাজশাহী চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা বিভাগের হাল ধরেন। পরবর্তী ব্যাচগুলোতে নিয়মিত ছাত্র ভর্তি হয়েছেন এবং সুশান্ত কুমার অধিকারীর নির্দেশনায় রাজশাহী চারুকলায় প্রাচ্যরীতির চিত্র ঘরানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রাচ্যকলা গ্রুপে সহকর্মী হয়েছেন।

শিল্পী সুশান্ত কুমার যোগদান করার পর প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার ওয়াশ পদ্ধতি ও টেম্পারা পদ্ধতির চিত্রকলায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। বিশেষত, প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির কাজে সমসাময়িক বাস্তবতার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে উঠে আসে এবং বিভিন্ন ধরনের টেম্পারা (ওয়াশ টেম্পারা, অ্যাক্রেলিক টেম্পারা) পদ্ধতির কাজে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যাকে রাজশাহী চারুকলার কাজ হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ এক ধরনের স্বতন্ত্র ঘরানার ছাপ লক্ষ করা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে।

চিত্র ২৫ : শিল্পী ওমর শাহজাহান
(রাজশাহী চারুকলার ছাত্র), জলরং

চিত্র ২৬ : শিল্পী সানজিদা সহীদ
(রাজশাহী চারুকলার ছাত্র)
Life, জলরং, ৭৬.২ × ৫৫.৮৮ সেমি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা গ্রুপ-পরবর্তী সময়ে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ২২০০ মার্কের বি.এফ.এ অনার্স ৩০০০ মার্কের মধ্যে করেন এবং এম.এফ.এ কোর্সটি এক বছরের করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫–০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী মূল্যায়ন শুরু হয় কোনো রকম কোর্স ও কোর্স নম্বর পরিবর্তন না করে। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে বি.এফ.এ অনার্স কোর্সে পাঠ্যক্রম ৪০০০ নম্বরে সাজিয়েছেন। যেখানে কোর্সের মধ্যে অনেক সংযোজন লক্ষ করা যায়। নিচে ২০০৮–০৯ শিক্ষাবর্ষের বি.এফ.এ সম্মান শ্রেণির পাঠ্যক্রম দেয়া হলো :

DEPARTMENT OF FINE ARTS
UNIVERSITY OF RAJSHAHI
২০০৮–২০০৯ শিক্ষাবর্ষের বি.এফ.এ সম্মান পাঠ্যক্রম
Syllabus for B.F.A Honours
Session : 2004-2009
FOUR YEAR COURSE TOTAL NUMBER-4000
1st Year Integrated Course, Total Number-1000

Course-101 : Drawing (ড্রয়িং) 100
মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম
বিষয় : হিউম্যান ফিগার, বার্ডস অ্যান্ড এনিমেল ফিগার, ফোলিয়েজ, তৈজসপত্রসহ বিবিধ বস্তু সামগ্রী

Course-102 : Sketch (স্কেচ) 100
মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম
বিষয় : নিসর্গ দৃশ্য, জীবন ও পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

Course-103 : Basic Design (বেসিক ডিজাইন) 100

মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম, পোষ্টার রং এবং পেপার কোলাজ

বিষয় : নকশার রীতি ও উপাদান, বাংলা ও ইংরেজি টাইপোগ্রাফির শৈল্পিক প্রয়োগ

Course-04 : Perspective (পরিপ্রেক্ষিত) 100

মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম এবং জলরং

বিষয় : বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকৃতির বস্তু, তৈজসপত্র ও আসবাবপত্র, নিসর্গ ও স্থাপত্য

Course-105 : Study of Light and shade (আলোছায়া পর্যবেক্ষণ) 100

মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম, জলরং ওয়াশ পদ্ধতি

বিষয় : আলো ছায়ার নির্ণয়ের মাধ্যমে জাদুঘরে সংরক্ষিত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত বস্তু সামগ্রী

Course-106 : Composition (কম্পোজিশন) 100

মাধ্যম : ফাউন্ড অবজেক্ট, জলরং, পোস্টার রং, প্রেস ইঙ্ক, আঠা ইত্যাদি

বিষয় : ফাউন্ড অবজেক্ট দিয়ে থ্রি ডাইমেনশনাল কম্পোজিশন অথবা বিভিন্ন টেক্সচারের ফাউন্ড অবজেক্ট থেকে হ্যান্ড স্টেইন্ড পদ্ধতিতে রং দিয়ে ছাপ নিয়ে কম্পোজিশন তৈরি

Course-107 : Still life (জড়জীবন) 100

মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম, জলরং

বিষয় : শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত জড় জীবনসমূহের অনুশীলন

Course -108 : Art and Culture of Bangladesh (বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতি) 100

বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি : সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও পরিধি, প্রধান প্রধান ধর্মীয় সংগীত, লোকসংস্কৃতির পালা-পার্বণ, আদিবাসী সংস্কৃতি, বাংলাদেশের লোক সংগীত ও ধর্মীয় সংগীত, লোক বাদ্যযন্ত্র, লোকনৃত্য, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় : বাউল, বৈষ্ণব

লোকশিল্পের সংজ্ঞা ও পরিধি, লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও পাঠ্যের প্রয়োজনীয়তা, মূল কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত : যেমন : নকশিকাঁথা, লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি, আলপনা, ধাতব গহনা ও বিভিন্ন নকশা, শিখা, বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্প, নকশি পিঠা ও নকশি পাখা

পুরাকীর্তি : পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি

Course-109 : History of Civilization (সভ্যতার ইতিহাস) 100

বিষয় : সভ্যতাপূর্ব সময়কাল : প্রাইমেট থেকে মানুষের উদ্ভব, প্রস্তর যুগ, গুহা যুগ, আদিম সমাজ, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, অ্যাসেরীয়, সুমেরীয় ও ক্যালডীয়। মিশরীয় সভ্যতা, পূর্ব সময়কাল, বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, কামফুরা যুগ। মায়া ইনকা আজটেক সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা

Course-110 : Tutorial+Viva-Voce+Class Attendance (40+50+10) 100

ORIENTAL ART (প্রাচ্যকলা) GROUP-G

Second Year, Total Number-1000

Course-201-G : Drawing (ড্রয়িং) 100

বিষয় : হিউম্যান ফিগার

মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম, চারকোল ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

Course-202-G: Sketch (স্কেচ) 100
বিষয় : নৈসর্গিক দৃশ্য
মাধ্যম : পেনসিল, জলরং

Course-203-G: Design & Caligraphy (ডিজাইন ও ক্যালিগ্রাফি) 100
বিষয় : আরবি, বাংলা ও ইংরেজি শব্দাক্ষর নিয়ে নতুন ধারার ক্যালিগ্রাফি তৈরি
মাধ্যম : চায়নিজ ও ইন্ডিয়ান ইঙ্ক এবং জলরং

Course-204-G: Study & Composition (অনুশীলন ও কম্পোজিশন) 100
বিষয় : পশুপাখি, মানুষ, ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি
মাধ্যম : জলরং-এ ওয়াশ, গোয়াশ পদ্ধতি

Course-205-G: Replica (Reproduction) (অনুকৃতি) 100
বিষয় : পারস্য, মোগল এবং পাল যুগের চিত্রকলার অনুকৃতি
মাধ্যম : জলরং

Course-206-G: Mural (মিউরাল) 100
বিষয় : প্রাচীন ও আধুনিক ধারায় নৈসর্গিক দৃশ্য ও আবহমান জীবন ধারা
মাধ্যম : ফ্রেসকো শেক্কো বা ফ্রেসকো বুনো

Course-207-G: Miniature (মিনিয়েচার) 100
বিষয় : পশুপাখি, মানুষ, ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি
মাধ্যম : টেম্পারা

Course-208-G: Experimental Materials & Techniques 100
(শিল্প উপকরণ ও করণ-কৌশল) তত্ত্বীয় বিষয়
বিষয় : প্রাচ্যরীতির শিল্প, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের মৌলিক পার্থক্য, পাহাড়ি ও শিখ চিত্র, মোগল চিত্র, সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, বেঙ্গল স্কুল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতীয় চিত্রে ষড়ঙ্গ, চীনা চিত্রে ষড়ঙ্গ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ওয়াশ, টেম্পারা, মুরাল ইত্যাদি

Course-209-G: History of Art (China, Japan & Muslim Art) 100
শিল্পকলার ইতিহাস (চীন, জাপান ও মুসলিম শিল্পকলা)

Course-210-G: Tutorial+Viva-Voce+Class Attendance (40+50+10) 100

Third Year, Total Number-1000

Course-301-G : Drawing (ড্রয়িং) 100
বিষয় : হিউম্যান ফিগার
মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম, চারকোল ইত্যাদি

Course-302-G: Sketch (স্কেচ) 100
বিষয় : নৈসর্গিক দৃশ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ
মাধ্যম : পেনসিল, জলরং

Course-303-G: Design & Caligraphy (ডিজাইন ও ক্যালিগ্রাফি) 100
বিষয় : ফুল, লতাপাতার সংমিশ্রণে ক্যালিগ্রাফি
মাধ্যম : চায়নিজ কালি, পোস্টার কালার, জলরং ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

Course-304-G: Composition (কম্পোজিশন) 100
বিষয় : পশুপাখি, মানুষ, ফুল, লতাপাতা, পারিপার্শ্বিক রূপের বিন্যাস
মাধ্যম : জলরঙে ওয়াশ, গোয়াশ পদ্ধতি

Course-305-G: Manuscript Art (পাণ্ডুলিপি চিত্রণ) 100
বিষয় : মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট প্রেম উপাখ্যান-এর অংশবিশেষের চিত্রায়ণ
মাধ্যম : টেম্পারা, পোস্টার কালার, জলরং

Course-306-G: Mural (মিউরাল) 100
বিষয় : প্রাচীন ও আধুনিক ধারায় নৈসর্গিক দৃশ্য ও আবহমান জীবনধারা
মাধ্যম : ফ্রেসকো শেক্কো বা ফ্রেসকো বুনো

Course-307-G: Figure Painting (ফিগার পেইন্টিং) 100
বিষয় : মানুষের কর্মরত জীবন
মাধ্যম : টেম্পারা, ওয়াশ, গোয়াশ, তেলরং

Course-308-G: History & Aesthetics of Oriental Art 100
(প্রাচ্যকলার ইতিহাস ও শিল্পতত্ত্ব) ব্যবহারিক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বীয় বিষয়
বিষয় : প্রাচ্য চিত্র ও পাশ্চাত্য চিত্রের মৌলিক তুলনা অজন্তা চিত্র, মুসলিম চিত্রকলা ও ক্যালিগ্রাফি, চীন, ভারত ও জাপানের চিত্রকলা ও ক্যালিগ্রাফি, Merits and Demerits of Indian Painting, ভারতীয় চিত্রে ষড়ঙ্গের গুরুত্ব, যামিনী রায়ের চিত্র ও কৌশল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র, কাজরী নৃত্য, শহজাহানের মৃত্যু হোলে নৃত্য, সতী, শিব ও গণেশ, অভ্যন্তর, ঘরে ফেরা, সংগ্রাম সাঁওতাল রমণী, উঁকি, মধ্যযুগের সন্তরা, নামাজ ইত্যাদি, দেশবিভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পকলায় প্রাচ্যরীতির চিত্র চর্চা

Course-309-G: History of Art (Ancient & Sub-Continental) 100
শিল্পকলার ইতিহাস (প্রাচীন ও উপমহাদেশের শিল্প)

Course-310-G: Tutorial+Viva-Voce+Class Attendance (40+50+10) 100

Fourth Year, Total Number-1000

Course-401-G : Creative Drawing (সৃজনশীল ড্রয়িং) 100
বিষয় : হিউম্যান এবং অ্যানিম্যাল ফিগার
মাধ্যম : পেনসিল, কালি-কলম, চারকোল ইত্যাদি

Course-402-G: Experimental Design & Caligraphy 100
(নিরীক্ষাধর্মী সুজনশীল ডিজাইন ও ক্যালিগ্রাফি)
বিষয় : জীবনানন্দ দাশের কবিতা অবলম্বনে নিরীক্ষাধর্মী ডিজাইন ও ক্যালিগ্রাফি সৃষ্টি
মাধ্যম : চায়নিজ কালি, পোস্টার কালার, জলরং ইত্যাদি।

Course-403-G: Creative Composition (সৃষ্টিধর্মী কম্পোজিশন) 100
বিষয় : আধুনিক বিষয় নিয়ে কম্পোজিশন তৈরি
মাধ্যম : জলরং ওয়াশ

Course-404-G: Manuscript Art (পাণ্ডুলিপি চিত্রণ) 100
বিষয় : পশুপাখি, মানুষ, ফুল, লতাপাতা, পারিপার্শ্বিক রূপের বিন্যাস
মাধ্যম : জলরঙে ওয়াশ, গোয়াশ পদ্ধতি

Course-405-G:	Creative Mural (সৃজনশীল মিউরাল) বিষয় : নিজের ধারায় ভিত্তিচিত্র অংকন মাধ্যম : ফ্রেসকো শেক্কো বা ফ্রেসকো বুনো	100
Course-406-G:	Figure Painting (ফিগার পেইন্টিং) বিষয় : প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ধারায় মিশ্রণে ফিগার পেইন্টিং মাধ্যম : টেম্পারা, ওয়াশ, তেলরং অ্যাক্রেলিক ইত্যাদি	100
Course-407-G:	Project Submission (প্রকল্প উপস্থাপন) ব্যবহারিক বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিষয় : প্রাচ্যকলা গ্রুপে বিভিন্ন কোর্সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় নিয়ে প্রকল্প উপস্থাপন করতে হবে	100
Course-408-G:	History of Art (Bengal Art) শিল্পকলার ইতিহাস (বাংলার শিল্পের ইতিহাস)	100
Course-409-G:	History of Art (Western Art) শিল্পকলার ইতিহাস (প্রাচীন ও উপমহাদেশের শিল্প)	100
Course-410-G:	Tutorial+Viva-Voce+Class Attendance (40+50+10)	100

নম্বর বিভাজন : ব্যবহারিক বিষয় নম্বর (শ্রেণি ৫০+ পরীক্ষা ৫০) = ১০০

কোর্সের বিস্তারিত

কোর্স-২০৯ : চীনা, জাপানি ও মুসলিম শিল্পকলা
(ক) মুসলিম শিল্পকলা, ইসলামের উদয়, উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয় যুগ, পারস্য তুরস্ক, স্পেনীয়, ভারতীয়, সুলতানি ও মোগল আমল।
(খ) চীনা শিল্পকলা : প্রাথমিক যুগ ও বিভিন্ন রাজবংশ। চৌন, সান, টাং, সুং, মিং, চিং।
(গ) জাপানি শিল্পকলা : প্রাথমিক যুগ, আর্কাইক যুগ, নোরা যুগ, হেইয়ান যুগ, কামফুরা যুগ, চীন, রেনেসাঁর প্রভাব ও মানার্কি যুগ।

কোর্স-৩০৯ : প্রাচীন ও উপমহাদেশের শিল্প
প্রাগৈতিহাসিক যুগ বা শিল্পকলার উদ্ভব, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক যুগ, মৌর্য যুগ, সুঙ্গ যুগ, কুশান যুগ, (গান্ধার ও মথুরা) গুপ্ত যুগ, পাল ও সেন যুগ, দক্ষিণ ভারতীয় তাম্রশিল্প, রাজপুত, মোগল ও পাহাড়ি

কোর্স-৪০৮ : বাংলার শিল্পের ইতিহাস
পাল যুগের শিল্পকলা, মুর্শিদাবাদের চিত্রকলা, কোম্পানি শৈলী, কালীঘাট, বটতলার ছাপচিত্র, ক্যালকাটা গ্রুপ, বেঙ্গল স্কুল, শান্তিনিকেতন শিল্পচর্চা, যামিনী রায়, চিত্তপ্রসাদ থেকে বাংলার মন্বন্তরের চিত্রকলা, ১৯৪৭-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের শিল্পকলা এবং ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পকলা

কোর্স-৪০৯ : পাশ্চাত্যশিল্প
এজিয়ান শিল্প, গ্রিক শিল্প, রোমান শিল্প, বাইজেন্টাইন শিল্প, রোমানেস্ক শিল্প, গথিক শিল্প ও রেনেসাঁ যুগের শিল্পকলা, বারোক ও রোকোকো শিল্পকলা, রোমান্টিসিজম, নিও-ক্লিসিসিজম।[২৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এফ.এ কোর্স ২ বছরের। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এফ.এ কোর্স ১ বছরের। নিচে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের প্রাচ্যকলা গ্রুপের এম.এফ.এ সিলেবাসের অনুলিপি তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারিক বিষয় : প্রাচ্যকলা (থিসিস গ্রুপ)

Practical Subject : Oriental Art Discipline

থিসিস গ্রুপ : তত্ত্বীয় (লিখিত ৯০% + অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ১০% = ১০০, ব্যবহারিক = ৩৫০

থিসিস = ২০০, মৌখিক = ৪০, ক্লাশ উপস্থিতি = ১০, মোট = ৭০০

কোর্স নং	বিষয়	পূর্ণমান
Course-501-G:	Creative Figure Composition (নিরীক্ষাধর্মী কম্পোজিশন দেহাবয়বসহ) মাধ্যম : উন্মুক্ত	100
Course-502-G:	Creative None Figure Composition (নিরীক্ষাধর্মী কম্পোজিশন দেহাবয়ব বিহীন) মাধ্যম : উন্মুক্ত	100
Course-503-G:	Creative Mural (সৃজনশীল মিউরাল) মাধ্যম : উন্মুক্ত বিষয় : উন্মুক্ত	100
Course-504-G:	Creative Miniature (সৃজনশীল মিনিয়েচার) মাধ্যম : উন্মুক্ত বিষয় : উন্মুক্ত	50
Course-505-G:	Art Aestthetic and Criticism (নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পসমালোচনা)	100
Course-506-G:	Thesis	200
Course-507-G:	Viva-Voce+Class Attendance	50

ব্যবহারিক বিষয় : প্রাচ্যকলা (সাধারণ গ্রুপ)

Practical Subject : Oriental Art Discipline

থিসিস গ্রুপ : তত্ত্বীয় (লিখিত ৯০% + অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ১০% = ৩০০, ব্যবহারিক = ৩৫০

মৌখিক = ৪০, ক্লাস উপস্থিতি = ১০, মোট = ৭০০

কোর্স নং	বিষয়	পূর্ণমান
Course-501-G:	Creative Figure Composition (নিরীক্ষাধর্মী কম্পোজিশন দেহাবয়বসহ) মাধ্যম : উন্মুক্ত	100
Course-502-G:	Creative None Figure Composition (নিরীক্ষাধর্মী কম্পোজিশন দেহাবয়ব বিহীন) মাধ্যম : উন্মুক্ত	100
Course-503-G:	Creative Mural (সৃজনশীল মিউরাল) মাধ্যম : উন্মুক্ত বিষয় : উন্মুক্ত	100
Course-504-G:	Creative Miniature (সৃজনশীল মিনিয়েচার) মাধ্যম : উন্মুক্ত বিষয় : উন্মুক্ত	50

Dhaka University Institutional Repository

Course-505-G:	Art Aestthetic and Criticism (নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পসমালোচনা)	90+10 =100
Course-506-G:	Art of Bangladesh বাংলাদেশের শিল্পকলা	90+10 =100
Course-507-G:	Modern Art আধুনিক শিল্পকলা	90+10 =100
Course-508-G:	সমন্বিত মৌখিক + শ্রেণী উপস্থিতি Viva-Voce+Class Attendance ।[২৪]	40+10= 50

রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের পর 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট' ১৯৮৩ সালে খুলনা আর্ট কলেজে রূপান্তরিত হয়। মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্নে কলকাতা আর্ট স্কুলের সিলেবাস/পাঠ্যক্রম অনুসরণে করা হয়েছিল। কলেজটি ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। এ সময় ডিগ্রি পর্যায়ে ভাস্কর্য, পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং এবং ওরিয়েন্টাল আর্ট বিষয়গুলো পড়ানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মতো প্রাক-ডিগ্রি ও ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী এখানের প্রাচ্যকলা বিষয়ের পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল।[২৫]

বিমানেশ বিশ্বাস ১৯৮৪ সালে খুলনা আর্ট কলেজে প্রভাষক পদে যোগ দেন। তিনি ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্যরীতির কাজের প্রতি ছিল তাঁর দুর্বলতা। জলরং-প্রধান কাজে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ ও রেখার ব্যবহার তাঁর কাজে লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া তিনি ছাত্রজীবনে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার অন্যতম শিক্ষক আব্দুস সাত্তারের সান্নিধ্যে প্রাচ্যরীতির কাজ অনুশীলন করেছেন। আব্দুস সাত্তারের সাথে অনেক কাজ করেছেন। ফলে শিল্পী বিমানেশ বিশ্বাস প্রাচ্যরীতির ফ্রেসকো, ক্যালিগ্রাফি, কপিওয়ার্ক, জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে খুলনা আর্ট কলেজে ওরিয়েন্টাল বিষয় অধিভুক্ত হওয়ার পরের তিনটি ব্যাচে তিনি প্রাচ্যকলা বিষয়ের ক্লাস নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী প্রাচ্যকলার শিক্ষক নিয়োগে অপারগ হওয়ায় এ বিষয়ে পড়ানোর অনুমোদন বন্ধ হয়ে যায়। অতএব বলা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন খুলনা আর্ট কলেজে প্রাচ্যকলা বিভাগ তিনটি শিক্ষাবর্ষের জন্য হলেও চালু ছিল। যার তত্ত্বাবধান বা শিক্ষকতার দায়িত্বে ছিলেন বিমানেশ বিশ্বাস।

চিত্র ২৭ : খুলনা আর্ট কলেজে ছাত্রদের অঙ্কিত মুরাল

চিত্র ২৮ : খুলনা আর্ট কলেজে ছাত্রদের অঙ্কিত মুরাল

চিত্র ২৯ : খুলনা আর্ট কলেজে ছাত্রদের অঙ্কিত মুরাল

১৯৯৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিনে রাজশাহী শহরে 'রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয়' নামে আরেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চারুকলা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই মহাবিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা বিষয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।[২৬]

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হলেও এখন পর্যন্ত এই রীতির চিত্রকলার আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়নি। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারও দীর্ঘদিন পরে (১৯৯৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা গ্রুপ খোলা হয়েছে। এ দুই প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা সীমিত। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু এসব স্থানে প্রাচ্যকলা বিভাগ বা প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাবিষয়ক কোনো বিভাগ খোলা হয়নি বিধায় আমাদের দেশের শিল্পান্দোলনে এ ধারার কাজ পিছিয়ে আছে। অথচ ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ যেখানে এখনো পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির দ্বারা পরিচালিত। অতএব, প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাই বাংলাদেশের স্বকীয় ধারা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে পারে। সৃজনশীলতায়, স্বকীয়তায়, নান্দনিকতায়, আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা যত দূর অগ্রসর হয়েছে তা-ও কম বিস্ময়ের নয়। প্রাচ্যরীতির প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীরা ফ্রেসকো চিত্রণে, ক্যালিগ্রাফি চিত্রণে, ওয়াশ পদ্ধতির চিত্র অঙ্কনে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্র ৩০ : ফ্রেসকো, প্রাচ্যকলা বিভাগের দেয়ালে অঙ্কিত

চিত্র ৩১ : শিল্পী অমিত নন্দী
জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি

চিত্র ৩২ : শিল্পী নাহিদ রোকসানা অনন্যা
জলরং, ৫৬ × ৪০.৫ সেমি

চিত্র ৩৩ : শিল্পী নাজমুন নাহার রুন্টি
জলরং

প্রাচ্যরীতির ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক চর্চারত তরুণ শিল্পীরা নিসর্গ চিত্রণে, ফিগার কম্পোজিশনে প্রাচ্যের ষড়ং বজায় রেখে আধুনিক চিত্রকলার চিত্রবিন্যাসের নানান কলাকৌশল সমন্বিত করেছেন।

চিত্র ৩৪ : শিল্পী আশরাফা সিদ্দিক, Legendary beauty

চিত্র ৩৫ :
শিল্পী এলিজা সুলতানা এ্যানি

চিত্র ৩৬ :
শিল্পী কানিজ ফাতেমা জ্যোতি

অ্যাক্রেলিক ও অয়েল কালার ব্যবহার মাধ্যমে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করেছেন।

চিত্র ৩৭ : শিল্পী মথুরাম চৌধুরী, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

চিত্র ৩৮ : শিল্পী আব্দুল আযীয়
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

উপসংহার

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের চিত্রকলার শেকড় সন্ধানে ব্রতী হয়েই ‘ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে’ প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা আর্ট স্কুলের চিত্ররীতির পাঠক্রমের আদলে। ১৯৫৫ সালে বিভাগটি চালু হওয়ার সময় প্রাচ্যকলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিল না। ফলে এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর কাজে প্রাচ্যরীতির যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। পরবর্তী সময়ে (১৯৭১ এর পর) শিল্পী আব্দুস সাত্তার প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক হওয়ায় তাঁর প্রথম দিকের ছাত্র, শিল্পী রফিক আহমেদ, শিল্পী শওকাতুজ্জামান, শিল্পী নাসরীন বেগম প্রাচ্যরীতির চিত্রকলায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে শিল্পী শওকাতুজ্জামান, শিল্পী নাসরীন বেগম শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছেন। যার প্রমাণ মেলে ১৯৯০-এর দশকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজেও।

১৯৯০ এর দশকে প্রাচ্যচিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার বিস্তার ঘটে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিবুক্ত খুলনা আর্ট কলেজে।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার বিষয় ও টেকনিক পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলার রীতিপদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। ওয়াশ, গোয়াশ, টেম্পারা, ফ্রেসকো মাধ্যমে শিল্পীরা উত্তরোত্তর নিরীক্ষার পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে যাচ্ছেন। ক্যালিগ্রাফি, মুরাল, পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণের মতো ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় নিয়ে চলছে নিত্য-নতুন গবেষণা।

বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিউদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতির ধারাকে জনসম্মুখে তুলে আনা হচ্ছে। ফলে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চারত শিল্পীরা যে আন্দোলন গড়ে তুলে চলেছেন–তা ভবিষ্যতের বাংলাদেশি আর্ট সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আবুল মনসুর, "ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল", দ্র. লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮, *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২৬

২. "চারুকলা অনুষদ পরিচিতি", দ্র. *বিধিমালা ও নিয়মকানুন : গ্রেডিং পদ্ধতি ভিত্তিক বি.এফ.এ সম্মান ও এম.এফ.এ প্রোগ্রাম*, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৫

৩. আবু তাহের, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : জয়নুল আবেদিন, এস.এম সুলতান ও রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০০৮, পৃ. ২৫

৪. আবুল মনসুর, "স্বাধীনতার ২৫ বছর ও বাংলাদেশের চিত্র-ভাস্কর্য : প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিত", বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক পত্রিকা *শিল্পকলা*, অষ্টাদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩

৫. আবু তাহের, প্রাগুক্ত

৬. Lala Rukh Selim, æ50 years of the fine Art Intitute", *Art*, Vol. 4, No. 3, January-March, 1999, P. 4

৭. ibid, PP. 4–5

৮. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর সুভ্যেনিয়র, ২০০৪, পৃ. ২৩

৯. আব্দুস সাত্তার, *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি*, আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ২০

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর ম্যানুয়াল, ১-২-৯৩ তারিখে একাডেমিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ৫-২-৯৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অনুমোদিত, পৃ. ১৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২–২৩

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৮. এই তালিকা প্রাচ্যকলা বিভাগে সংরক্ষিত তালিকা এবং ১৯৯৯ সালের চারুকলা ইনস্টিটিউটে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব ১৯৪৮–৯৮ উপলক্ষে *চিত্র প্রদর্শনী*র ক্যাটালগ থেকে নেয়া হয়েছে

১৯. See Catalogue, 1st Biennnial Oriental Art Exhibition, Organized by Bangladesh Society of Oriental Art, Dhaka, Arial Centre, 2003.

২০. আব্দুস সাত্তার, "শিকড় সন্ধান", প্রাচ্যকলা বিভাগের ছয় শিক্ষক শিল্পীর চিত্রকলা প্রদর্শনী, জয়নুল গ্যালারি, ২০১০, পৃ. ৪

২১. আব্দুস সাত্তার, "শিকড় সন্ধান", প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, জয়নুল গ্যালারি, ২০১০, পৃ. ৩–৪

২২. টি.এম.এম নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী, "রাজশাহী মহনগরীতে চারুকলা শিক্ষা", *রাজশাহী মহনগরী : অতীত ও বর্তমান*, সেমিনার খণ্ড, রাজশাহী, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬৯২

Dhaka University Institutional Repository

২৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত ৪ (চার) বছরমেয়াদি অনার্স কোর্সের অর্ডিন্যান্স Part–1 থেকে Part-IV শিক্ষাবর্ষ যথাক্রমে ২০০৪–০৬ থেকে ২০১১–১২ পৃ. ৫–৬ ও ২৫–২৮

২৪. Syllabus for M.F.A, Session 2010-11, Department of Fine Arts, Faculty of Arts, University of Rajshahi, pp. 12–13

২৫. খুলনা আর্ট কলেজে তৎকালীন প্রভাষক বিমানেশ বিশ্বাসের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর, ২০১৩

২৬. টি.এম.এম নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২–৯৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভৌগোলিক অবস্থান আর দর্শনগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বশিল্পকলায় প্রধানত দুটি ভিন্ন চিত্রধারা প্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান। যার একটি পাশ্চাত্য, অন্যটি প্রাচ্য। মূলত ইউরোপ ও এশীয় চিত্রকলার ধরন ও চরিত্রের পার্থক্য ও স্বতন্ত্রতাকে ঘিরেই এর সারাৎসার। যা মিশে আছে দুই সমাজের মানুষের জীবন-জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি ও সৃষ্টির গতিপ্রকৃতির মধ্যে। সেক্ষেত্রে জীবন-জগৎ প্রত্যক্ষণবোধের সাথে জড়িয়ে আছে বাণিজ্য, অর্থনীতি, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা ও সমাজসংসার নির্বাহের বৈচিত্র্য।

এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু, হোয়াংহো, মিকিং, দামোদর ইত্যাদি নদ-নদীর তীরের সভ্যতাসমূহে চারুশিল্পের বিকাশ ঘটেছে ঐতিহাসিককাল থেকে। এসব সভ্যতায় বেড়ে ওঠা শিল্প অর্থাৎ বৃহত্তর এশিয়া মহাদেশের চিত্রশিল্পই এ গবেষণার আলোচ্য প্রাচ্যচিত্রকলা। উল্লেখ্য, এশিয়ায় নানা কালে ও স্থানে যে খণ্ড খণ্ড শিল্পধারা বিভিন্ন সভ্যতার সাথে গড়ে উঠেছিল, তা ভারতীয় উপমহাদেশের তেজোদীপ্ত বৌদ্ধশিল্প দ্বারা সমগ্র এশিয়ার শিল্পগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছিল অখণ্ড অম্লান Asiatic Art রূপে। এরই ধারাবাহিকতায় পাল পুথিচিত্র বাংলার উল্লেখযোগ্য চিত্রকলা।

বৃহৎ বঙ্গের অতীত শিল্প-ঐতিহ্য সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী সময়ে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতান ও মোগল শিল্পকলার বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতিই বাংলার শিল্পকলার উত্তরাধিকার। এই সুদীর্ঘ সময়ের চিত্রকলায় একই সুরের ঐকতান লক্ষণীয়। যে সুরটিতে মিশ্রিত হয়েছে বৃহৎ প্রাচ্যশিল্পের নানান অনুষঙ্গ। বাংলার চিত্রকলায় এই প্রাচ্য ঐক্যসূত্রের ধারাবাহিকতা অবক্ষয় হতে চলছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কোম্পানি শৈলীর অভিঘাতে। অর্থাৎ প্রাক ঔপনিবেশিক দরবারি ও লোকজ চিত্রকলায় অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশ যুগলবদ্ধ হয়ে রূপের অন্তরালের অরূপ প্রকাশ এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিকতা ও রেখার ও বর্ণের ব্যঞ্জনাময় বিন্যাসে চিত্রকলায় যে ধারা প্রবহমান ছিল তার অবক্ষয় হতে শুরু করে।

কোম্পানি আমলে ইংরেজ পেশাদার শিল্পীদের স্টুডিয়ো (Studio) করে স্বাধীন চিত্রকলা অঙ্কন ও রোজগারের পথ ধরে এ দেশে বাস্তবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই পরবর্তী প্রকাশ পাশ্চাত্য রীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। প্রথম এসব স্কুল কারিগরি বিদ্যা শেখাবার জন্য চালু হলেও ধীরে ধীরে আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যক্ষদের পরিচর্যায় উচ্চাঙ্গের আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে।[১]

তাঁদের মূল লক্ষ্যই ছিল পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক ধারার শিল্পশিক্ষা। দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথভাবে অনুকরণ ও ব্যবহারিক ছবি ও নকশা আঁকায় ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলা। 'অর্থাৎ নূতন উপকরণ ও বিভিন্ন করণ-কৌশল তথা Techonology-র শক্তিতেই পাশ্চাত্য শিল্প এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে, আদর্শ দ্বারা নয়।'[২]

Dhaka University Institutional Repository

স্বচ্ছ জলরং, এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফ, তৈলচিত্র ইত্যাদির পরম্পরা আমাদের দেশে ছিল না। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় এসব মাধ্যমের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় নতুন শিক্ষা ও নতুন আলোর আভাস পেয়ে পরম্পরায় প্রবাহিত দেশীয় চিত্ররীতিকে অবজ্ঞা করতে শেখেন।

শিল্প যে বিলাসিতার অনুষঙ্গ নয়, জাতীয় জীবনে শিল্পের গভীর তাৎপর্য এবং সে তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য সমকালীন শিল্পশিক্ষার বিধি ব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল, কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন কলকাতা আর্ট স্কুলের অন্যতম অধ্যক্ষ ই.বি হ্যাভেল।[৩] তিনি ১৮৯৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। হ্যাভেলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা থেকে চিত্রকলাকে মুক্ত করার জন্য চিত্রে বিশুদ্ধ ভারতীয়তার চর্চা শুরু করেন। প্রাচ্য পরম্পরায় চিত্রধারা ও টেকনিকের সাথে পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক রীতির ব্যাকরণ মিলিয়ে তিনি এক নতুন চিত্রশৈলী গড়ে তুলেছিলেন। যে চিত্রশৈলী কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মধ্য দিয়ে নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি বলে পরিচিত হয়। এই নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারাই বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা।

নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি গড়ে ওঠার নেপথ্যে সমসাময়িককালের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের স্বদেশি আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 'শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতীয়রা এই সত্যটি তখন উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্যকে পুনরুদ্ধার করে স্বদেশি শিল্প ও চারুকলার পুষ্টিসাধনে গভীরভাবে লিপ্ত না হতে পারেন, তাহলে আরোপিত প্রভাবশালী ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।'[৪]—এই মনোবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার ক্ষেত্রে স্বদেশ চেতনা ও আত্মপরিচয়ের নবজাগরণ ঘটালেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, ঐতিহ্যের পরম্পরা এবং মৌলিকতার শেকড় সন্ধানে তাঁর আবিষ্কৃত চিত্রচর্চায় ফিরে আসে প্রাচ্যের হাজার হাজার বছরে অস্থি-মজ্জায় প্রবহমান দর্শন ও রুচিবোধের ভাবনির্ভর রূপ নির্মাণ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ হয়ে যোগদান করার পর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাচ্যরীতির চিত্রধারা চর্চার সূচনা ঘটে। এরপর 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' প্রতিষ্ঠা এবং এ সংগঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে নব্য-বেঙ্গল রীতি বা বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতি খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়। বলা যায়, বিশ্ববাসীর কাছে Oriental Art বা প্রাচ্যশিল্প শব্দটি তৎকালীন সময় থেকেই প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে আসছে। পরবর্তী সময়ে ১৯১৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চায় এই প্রাচ্যরীতির আদর্শের চিত্রচর্চাকে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' এবং ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে Oriental Art বা প্রাচ্যকলা বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়ে আসছে। উভয় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার নামকরণ (Indian Art, Oriental Art) যা-ই হোক না কেন, আদর্শগত জায়গা সম্পূর্ণ এক। উভয় পাঠ্যক্রমে Art শব্দটি যুক্ত থাকলেও বিষয়টিতে শুধু চিত্রকলা চর্চা করা হয়। সুতরাং *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা* শীর্ষক গবেষণায় উল্লিখিত প্রাচ্যচিত্রধারার সবিস্তর

Dhaka University Institutional Repository

একটি পর্যলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারার* যে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

এই অভিসন্দর্ভে ১৯৪৭-পূর্ব অবিভক্ত ভারতবর্ষ এবং ১৯৪৭-উত্তর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাননির্ভর প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা এবং পর্যলোচনার মাধ্যমে প্রাচ্যচিত্রকলার অন্তর্নিহিত নানান তথ্য ও মাধ্যমগত স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণে সচেষ্ট থাকা হয়েছে। প্রবন্ধের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র ব্যবহার করে প্রাচ্যরীতির চিত্রশৈলীর ধারাবাহিকতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উত্তরণ, সংযোজন-বিয়োজন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্প-রসায়ন তুলে ধরা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যশিল্পধারার আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চার প্রেক্ষাপট, সূচনা এবং সমকালীন প্রাচ্যচিত্রকলার অনেক বিষয় বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। যার মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে শিল্প ও শিল্পীর সম্পৃক্ততা উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে প্রাচ্যচিত্রকলার বিভিন্ন শিল্পীর উদ্ভাবনীশক্তি, কাজের ধারা ও টেকনিক সম্পর্কে মূল্যায়ন করার সুযোগ থাকবে।

ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যচিত্রকলার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা মেধা ও নান্দনিকবোধকে পরিশীলিত করে যুগোপযোগী চিত্রকলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। সমসাময়িক সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নান্দনিক চেতনা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন করে আসছেন। প্রতিটি শিল্পীর শৈল্পিক মনোভাব ও স্বতন্ত্র্য জীবনবোধ থেকে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয় প্রাচ্যচিত্রকলায় সংযুক্ত হয়ে আসছে। অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদে সেসব বিষয়-সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলো আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের আলোচনালব্ধ প্রাপ্ত ফলাফল সিদ্ধান্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ অবিভক্ত বাংলার প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট খুঁজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, বৃহৎ বঙ্গের চিত্রকলার অতীত ঐতিহ্য এবং ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যদেশগুলোর চিত্রধারার অতীত ঐতিহ্য একই ঐকতানে গাঁথা।

একই ঐকতান ও ভাবদর্শনের ধারাকেই প্রাচ্যচিত্রকলা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রাচ্যচিত্রকলার ধারার বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বলা যায়, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা প্রাচ্যচিত্রকলার রূপনিয়ামকে ভূমিকা রেখেছে। এর অন্যতম কারণ রাজ্য ও সাম্রাজ্যের বহু পরিবর্তন । রাজ্য শাসক যে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, চিত্রকলা সেই আদর্শের রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা চিত্রকলাকে প্রভাবিত করলেও শিল্পীরা নিজের সামগ্রিক সত্তা দিয়ে, স্বভাব দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ ও আনন্দকে খুঁজেছেন তাঁদের চিত্রকর্মে। ফলে ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত চিত্রকলায় পরম্পরার ঐতিহ্য বজায় ছিল। ইংরেজ শাসনামলে পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির চিত্রচর্চায় প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হতে চলেছিল। যাঁদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় প্রাচ্যচিত্র ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ আধুনিক বিন্যাসে পুনঃপ্রচলন হতে শুরু করল তার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণায় দেখা গেছে, ই.বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টা অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় প্রাচ্যচিত্রকলা বিনির্মাণে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। যা কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষার নতুন একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। বলা যায়, এখান থেকেই বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা এবং ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার যাত্রা শুরু।

এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসুকে নিয়ে দুটি পরিচ্ছেদে যে পর্যালোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে, ই.বি হ্যাভেলের পরবর্তী সময়ে অবনীন্দ্রনাথের পরিচর্যায় কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং তাঁর প্রথম পর্বের ছাত্রদের মাধ্যমে এ রীতির বিস্তার ঘটেছে। তৎকালীন বিশ্বজনীন শিল্পকলা সম্পর্কে অবহিত রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা, স্বদেশি আন্দোলন, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' সংগঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নব্য-বঙ্গীয় তথা প্রাচ্যচিত্রকলা আন্দোলনের উৎকর্ষ লাভে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। অবনীন্দ্র প্রশিক্ষিত ছাত্রদের দ্বারা পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় শিল্পকলা এর বিশাল ব্যপ্তি ধারণ করে।

প্রাচ্যচিত্রকলা রীতির সীমাবদ্ধতাও লক্ষ করা গেছে অনেকের কাজে। অতীতচারিতা এবং কাব্য-পুরাণ ইতিহাসের একঘেয়েমিতার জন্য সমসাময়িক বাস্তবতা অনুপস্থিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের চারুকলা শিক্ষায় এসব বিষয়ের উত্তরণ ঘটেছিল অবনীন্দ্র-শিষ্য শিল্পাচার্য নন্দলালের পদক্ষেপে। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চায় প্রকৃতি, পরম্পরা এবং স্বকীয়তার সূত্রকে কাজে লাগিয়ে প্রাচ্যচিত্ররীতির সীমাবদ্ধতাকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বৈশ্বিক শিল্পকলার উদাত্ত আহ্বানে স্বকীয়তার পরিচয় দেন। যাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১–১৯৫১), তাঁর শিষ্য নন্দলাল বসু (১৮৮২–১৯৬৬) এবং নন্দলাল বসুর ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪–১৯৮০) মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিন প্রজন্মের এই শিল্পীদের শিল্প উপলব্ধিতে একই চিন্তা প্রবাহের সুর লক্ষ করা যায়।[৫] ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা তাঁদের তত্ত্ব ধরেই বিকাশ লাভ করেছে। এই তত্ত্বে ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গকে মান্য করা হয়েছে। টেকনিকের ক্ষেত্রে অতীত ঐতিহ্যের টেকনিক নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। বিশেষত, ফ্রেসকো চিত্র, মোগল মিনিয়েচার চিত্রের বিভিন্ন টেকনিক, ক্যালিগ্রাফি এবং অবনসৃষ্ট জলরং ওয়াশ পদ্ধতি এবং চীন-জাপানের ঐতিহ্যবাহী টেকনিকসমূহ ব্যক্তি-শিল্পীর আবহে নানা নিরীক্ষায় উপস্থাপিত হয়েছে। যার মধ্যে পাশ্চাত্য একাডেমিক নানা উপকরণও সংযুক্ত হয়েছে। ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বলা যায়, চল্লিশের দশকের ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা প্রাচ্যরীতির নানান টেকনিক ও ভাব-দর্শন দ্বারাই পুষ্ট হয়ে আন্তর্জাতিক চিত্রধারায় অবদান রাখছে।

এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার অতীত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশবিভাগের পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের চিত্রকলার শেকড় সন্ধানে ব্রতী হয়েই বাংলাদেশের একমাত্র শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে চারুকলার অন্যান্য বিভাগের সাথে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা আর্ট স্কুলের নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির পাঠ্যক্রমের আদলে। বলা যায়, বাংলার

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় এ প্রতিষ্ঠানেই প্রথম 'প্রাচ্যকলা' নামকরণ ব্যবহৃত হয়। এই বিভাগে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা শিক্ষার প্রাঠ্যক্রমে ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যচিত্রধারায় বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত আছে। ১৯৫৫ সালে বিভাগটি চালু হওয়ার সময় ও বিভাগে যাঁরা শিক্ষকতা করেছেন তাঁরা কেউই প্রাচ্যরীতির চিত্রধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরবর্তী (১৯৭১-এর পর) প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিল্পীশিক্ষক আব্দুস সাত্তারের তত্ত্বাবধানে বিশেষ মাত্রা পায়। এর পূর্ববর্তী সময়ে খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। যাঁদের মধ্যে তাজুল ইসলাম অন্যতম। শিল্পী আব্দুস সাত্তারের প্রথম দিকের ছাত্র শিল্পী রফিক আহমেদ, শিল্পী শওকাতুজ্জামান এবং শিল্পী নাসরীন বেগম বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের কাজে। এঁদের মধ্যে শিল্পী নাসরীন বেগম ও শওকাতুজ্জামান শিক্ষকতায় যোগ দিলে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় বিশেষ জোয়ার আসে এবং ১৯৯০-এর দশক থেকে প্রাচ্যচিত্রকলা একটি আন্দোলনে রূপ নিয়ে বর্তমান অবধি চলমান আছে। অতএব, সে বিচারে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারার সক্রিয় আন্দোলন ও অবদান মূলত খুব বেশি দিনের পূর্বেকার নয়। যাকে সাম্প্রতিক সময়ের চলমান একটা শিল্পধারা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম ও টেকনিকে চিত্রকলা চর্চারত শিল্পীরা এ প্রজন্মের তরুণ শিল্পীরাই।

শিল্পী আব্দুস সাত্তারকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় প্রধান পুরুষ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ বহু মাধ্যমে কুশলী এই শিল্পী প্রাচ্যচিত্রকলায় নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ দেখিয়েছেন প্রাচ্যচিত্রকলার রীতি পদ্ধতিকে আধুনিকতার উন্নীত করে। তাঁর দেখানো পথ ধরে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা প্রাচ্যচিত্রকলাকে আধুনিকতার উন্নীত করে চলেছেন; যা এই অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত শিল্পীদের কাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। শিল্পী আব্দুস সাত্তার শুধু প্রাচ্যচিত্রকলার প্রধান পুরুষই নন। তিনি শিল্পদর্শন, নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় বাংলার চিত্রকলার ধারায় তিনি শিল্পী, শিল্পসমঝদার, দর্শক ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে সচেতনতামূলক শিল্পদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের পরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন—শিল্পী রফিক আহমেদ, শিল্পী শওকাতুজ্জামান ও শিল্পী নাসরীন বেগম। এঁদের প্রত্যেকের কাজে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিশেষত শিল্পী নাসরীন বেগম প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাকে নন্দনতাত্তিক উৎকর্ষে উপলব্ধ করাতে সক্ষম হয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় শিল্পী আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমকে এই ধারার সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিল্পী হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়।

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে ১৯৯০-এর দশকে। এই দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত খুলনা আর্ট কলেজে প্রাচ্যকলা চর্চা শুরু হয়। এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রাচ্যচিত্রকলার উদ্ভব, বিকাশ ও পাঠ্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা চর্চায় যেসব বিষয় ও টেকনিক চর্চা করা হয় তা পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি-পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াশ, গোয়াশ, টেম্পারা, ফ্রেসকো মাধ্যম যার অন্যতম। এ ছাড়া ক্যালিগ্রাফি, মুরাল, পাণ্ডুলিপি চিত্রণের মতো ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়ে নিত্যনতুন গবেষণা করে যাচ্ছেন শিল্পীরা। যা বিশ্বশিল্পকলায় স্বতন্ত্রতার দাবি রেখে আসছে এবং বিশ্বচিত্রকলায় প্রাচ্যচিত্রকলাকে নতুন নন্দনতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচনা-সংশ্লিষ্ট চিত্রাবলি অবলোকন করলে উভয় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রশিল্পীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি তাঁদের কাজের মধ্যে প্রাচ্যরীতির একটি ঐক্যসূত্রও পাওয়া যায়। যা শিল্পীদের কাজে উত্তরোত্তর গবেষণা এবং এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতাকেই নির্দিষ্ট করে।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীগণের অধিকাংশই এখনো কর্মরত, সৃষ্টিশীল এবং তরুণ প্রজন্ম। অর্থাৎ সমকালীন শিল্পী। দেখা গেছে, ১৯৫৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা হলেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী শিল্পচর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন। তাও এখানকার সামগ্রিক শিল্প-আন্দোলনে যার প্রভাব ছিল খুবই নগণ্য। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এর ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে এবং বলা যায়, বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পীদের কাজে ফিগারেটিভ অভিব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করার প্রবণতা সর্বাধিক লক্ষণীয়, যা আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ফিগার-প্রধান কাজ দ্বারাই প্রভাবিত। চিত্র মাধ্যমের ক্ষেত্রে নব্য-বঙ্গীয় রীতির ওয়াশ পদ্ধতি এবং শিল্পী আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ওয়াশ পদ্ধতির বিশেষ কৌশল দ্বারাই প্রভাবিত। আবার রাজশাহী চারুকলায় টেম্পারা-প্রধান চিত্র ও সমসাময়িক বাস্তবতানির্ভর বিষয়াবলির চিত্রায়ণই বেশি লক্ষ করা যায়। যা আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ছাত্র ও শান্তিনিকেতন ঘরানার শিক্ষিত শিল্পী শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীর কাজ দ্বারা প্রভাবিত।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, দেশভাগের আগে ও পরে দুই বাংলাতেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চারত শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক পথ সন্ধানের পাশাপাশি তাঁদের নিজস্ব অস্তিত্ব খোঁজার তাগিদ অনুভব করেছেন। যা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সমসাময়িক আর্থসামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের প্রভাবে প্রভাবিত। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, শিল্পীদের কাজে প্রাচ্য-ঐতিহ্যের করণ-কৌশলের সাথে পাশ্চাত্য করণ-কৌশল মেলাবার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

উভয় বাংলার নির্বাচিত শিল্পীদের ধারাবাহিক কাজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়—জলরং ওয়াশ-প্রধান কাজই শিল্পীরা বেশি করেছেন। যার মধ্যে ফিগারেটিভ কাজই বেশি এবং নারীর সুখ-দুঃখ ও ভেতরমুখী অনুভূতির রূপায়ণ করতে সচেষ্ট থেকেছেন শিল্পীরা। এ ছাড়া তাঁদের কাজে ধ্রুপদী রীতির নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রোমান্টিক অভিব্যক্তি, লোকায়ত দৃষ্টি, মরমি দার্শনিকতা ও সমাজবাস্তবতার বিষয়াবলিও উঠে এসেছে।

শিল্পীদের কাজের বিষয় ও টেকনিক দেখে শিল্পীদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। বিষয় ও টেকনিকের ক্ষেত্রে শিল্পীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষণীয়। অতএব একথা বলা যায় যে, প্রাচ্যরীতির শিল্পীরা তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকের কাজে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। কখনো কখনো ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পীরা একদিকে অবিভক্ত বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক বেঙ্গল স্কুলের ঐতিহ্যিক শৈলী ও রীতিকে ব্যবহার করেছেন, অপরদিকে পাশ্চাত্য একাডেমিক করণ-কৌশল সমন্বিত করেছেন। ফলে আধুনিক চিত্রশৈলীর নানান গুণ সমন্বিত হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রকলায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন।

সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। এই রীতির মাধ্যমগত মাধুর্য, প্রাচ্যের ষড়ং গুণাবলির আশ্রয়ে নির্মিত চিত্র দর্শককে ভিন্ন আবেদনে আকৃষ্ট করতে সক্ষম; যার আবেদন পাশ্চাত্য চিত্রকলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা চর্চার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সে তুলনায় শিল্পীদের অবদান ঈর্ষণীয়। গবেষণায় নির্বাচিত শিল্পীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করলে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী মিজানুর রহমান ফকিরের দৈনন্দিন কর্মজীবন সম্পর্কিত চিত্র, শিল্পী জি.সি ত্রিবেদীর লোকশিল্পের আঙ্গিক ব্যবহার, শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারীর সমসাময়িক বাস্তবতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চিত্রণ, শিল্পী আব্দুল আযীযের নারী চরিত্রের স্বরূপ সন্ধান, শিল্পী শঙ্কর মজুমদারের অক্সাইড কালারে ওয়াশ ইফেক্টের কাজ, শিল্পী আব্দুল বাতেন খানের কার্টিজ ও সুইজ বোর্ডে জলরং ওয়াশের বিশেষত্ব, শিল্পী ফাহমিদা খাতুনের ফুল বিষয়ক কাজ, শিল্পী মলয় বালার অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে ওয়াশ পদ্ধতির কাজ, শিল্পী গৌতম কুমার বিশ্বাসের প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতিতে সুরিয়ালিস্টিক আবেদন, শিল্পী কান্তিদেব অধিকারীর প্রকৃতির তুচ্ছ বিষয়কে জীবন-দর্শনের গভীর দর্শনের ইঙ্গিত, শিল্পী মোছাঃ নাজনীন আক্তারের সমসাময়িক বাস্তবতার চিত্র, শিল্পী সোহাগ পারভেজের পাহাড়ি সংস্কৃতি চিত্রণ, শিল্পী গোপাল সাহার ওয়াশ পদ্ধতির জলরঙে কিউবিক ফর্মের ফিগারেটিভ কাজ, শিল্পী নাজমুল হক বাপ্পীর প্রাচ্য-পাশচত্য সংশ্লেষের প্রচেষ্টা, শিল্পী সিনথিয়া আরেফিনের সামাজিক বক্তব্যনির্ভর চিত্র, শিল্পী সুমন কুমার বৈদ্যর সমাজবাস্তবতার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, শিল্পী মমতাজ পারভীনের সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা এবং নারীর প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে বক্তব্যপ্রধান চিত্র বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বলা যায়, রূপের আড়ালে অরূপের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাচ্যরীতির কাজে।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা প্রাচ্য-ঐতিহ্যের শেকড়ের সাথে জড়িত। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাজাত্যাভিমানে বলীয়ান। প্রাচ্যরীতির করণ-কৌশলকে অন্য বিভাগের শিল্পচর্চারত শিল্পীরা গ্রহণ করে আসছেন। বিশেষত ওয়াশ, দ্বিমাত্রিকতা এবং রেখার ব্যবহার করে আসছেন বাংলাদেশের পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার সৃষ্টিরত শিল্পীরা। এই গ্রহণের সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির শিল্পধারার সাথে সমসাময়িক টেকনিক, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু সমন্বয়ের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশি চিত্রকলা বিশ্ববুকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিতে পারবে। আর এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলাদেশের প্রতিটি চারুকলা শিক্ষালয়ে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এই ধারার চিত্র আন্দোলনকে ভবিষ্যতের পথে

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরতে জাতীয় পর্যায়ের প্রদর্শনীগুলোতে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার। দরকার সেমিনার ও প্রদর্শনীর।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির শেকড় ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে বিশ্ব শিল্পকলায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রবহমান। এই গবেষণায় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার উত্তরণের গতিধারা পরবর্তী সময়ের গবেষকদের তত্ত্ব গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি", দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), *বিশ্বভারতী পত্রিকা : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২-২০০৬ : প্রসঙ্গ শিল্প ও সংগীত*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২০০৭, পৃ. ১৭১-১৭৪

২. প্রাগুক্ত, ১৭৮

৩. প্রাগুক্ত

৪. পরিতোষ সেন, *কিছু শিল্পকথা*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৪১

৫. কে.জি সুব্রহ্মণ্যন লিখিত "ভূমিকা", দ্র. নন্দলাল বসু, *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৯৯২, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক) বাংলা গ্রন্থ

অনির্বাণ রায়। *অবনীন্দ্রনাথ*। কলকাতা, প্যাপিরাস, ডিসেম্বর ১৯৯৮।

————। *অবনীন্দ্রনাথ*। কলকাতা, প্যাপিরাস, ডিসেম্বর ১৯৯৮।

অবনীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৩–২০১১। ৯ম খ—।

————। কলকাতা, প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ২০১১। ৯ম খ—।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪। [পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৭]।

————। *শিল্পায়ন*। ১ম আনন্দ সং। কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর ১৯৮৯।

————। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। ১ম আনন্দ সং। কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ১৯৯৯। [প্র. প্র. ১৯৪১]।

————। *সহজ চিত্রশিক্ষা*। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪০১। [প্র. প্র. পৌষ ১৩৫৩]।

————। *বাংলার ব্রত*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৫০। [পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭]।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। *জোড়াসাঁকোর ধারে*। ১ম সং, কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮। [প্র. প্র কার্তিক ১৩৫১]।

————। *ঘরোয়া*। ২য় সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৩৭৭। [প্র. প্র. আশ্বিন ১৩৪৮]।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.)। *বিশ্বভারতী পত্রিকা : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২–২০০৬*। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জানুয়ারি ২০০৭।

————। "রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল"। *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ২০১১। পৃ. ২৮৬–৩১০।

অর্চি মিত্র (সংকলন ও সম্পা.)। *রবীন্দ্রনাথের লেখার ছবি*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, শ্রাবণ ১৪১৮।

অর—ণ ভট্টাচার্য। *নন্দনতত্ত্বের সূত্র*। কলিকাতা, উত্তরসুরি প্রকাশনী, ১৯৮১।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬৯।

অশোক ভট্টাচার্য। *বাংলার চিত্রকলা*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৪।

————। (সম্পা.)। *চার—কলা ৩য় সংখ্যা ১৪৯১ (২০০৪)*। রাজ্য চার—কলা পর্ষদ পত্রিকা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

————। চার—কলা ৪র্থ সংখ্যা ২০০৯।

অশোক মিত্র। *ভারতের চিত্রকলা*। ১ম আনন্দ সং । কলকাতা, আনন্দ ১৯৯৫–১৯৯৬। [প্র. প্র. ১৯৫৬]।

অসিতকুমার হালদার। *বাগগুহা ও রামগড়*। এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, ১৩২৮(১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ)।

————। *অজ—ড়া*। দ্র. প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌমেন পাল (টীকা. সম্পা. সংযোজনা), সটীক লালমাটি সং, কলকাতা, লালমাটি, জানুয়ারি ২০১০।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সম্পা.)। *সমকালীন : নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন*। কলকাতা, কর—ণা, বৈশাখ ১৪১২–আষাঢ় ১৪১৩। ১ম–৪র্থ খ—।

আবু তাহের। *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : জয়নুল আবেদিন, এস.এম. সুলতান ও রশিদ চৌধুরী*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০০৮।

আবুল মনসুর। *শিল্পী দর্শক সমালোচক*। চট্টগ্রাম, শিল্পসমন্বয়, বৈশাখ ১৩৯১।

————। "বাঙালিবাবুর শিল্পযাত্রা"। *কালি ও কলম*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্র—য়ারি ২০০৭। পৃ. ২৮৯–২৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

———————। *শিল্পী দর্শক সমালোচক*। ঢাকা, মুক্তধারা, ফাল্গুন ১৩৯৩। [প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৯১]।

———————। "নন্দলাল বসুর হরিপুরা চিত্রগুচ্ছ ঃ একটি পর্যালোচনা"। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা *শিল্পকলা*, ষষ্টদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৯৯ (১৯৯২ খ্রি.)। পৃ ১–৯।

———————। "রবীন্দ্রনাথ-চিত্রশিল্প-কলাভবন : পরম্পরার সম্পর্কসূত্র"। ড. আবুল হাসানাত (সম্পা.)। *রবীন্দ্রনাথ : কালি ও কলমে। ঢাকা*, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

———————। "বাঙালি শিল্পীর সৃজন-উদ্যম : রূপ-রূপান্তরের ছয় দশক"। কালি ও কলম, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (চিত্রকলা সংখ্যা), এপ্রিল ২০০৮।

আবদুল খালেক ও আরও অনেকে (সম্পা.)। *সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি*। ২য় সং। ঢাকা, হাসান বুক হাউস, সেপ্টেম্বর ১৯৯০। [প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৮৮]।

আবদুল মমিন চৌধুরী ও ফকরুল আলম (সম্পা.)। *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৬।

আব্দুল মতিন সরকার। ঢাকায় শিল্পচর্চা (বিশেষ সংখ্যা)। *চারুকলা* প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।

———————। "আব্দুস সাত্তার : তাঁর শিল্প আদর্শ"। *আব্দুস সাত্তার-এর চিত্রকলা ও ছাপচিত্র*। চারুকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী [তারিখ নেই]।

আব্দুস সাত্তার। *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি*। কনটেম্পোরারী কনসেপ্ট, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৯।

———————। *জয়নুলের এগারজন সহকর্মী*। ঢাকা, হিমি বুকস এন্ড বুকস, নভেম্বর ২০০5।

———————। *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মে ২০০৩।

———————। *সোমনাথ হোরের পত্র : কলকাতার চিত্র*। ঢাকা, কন্টেম্পোরারী কনসেপ্ট, জুন ২০১১।

———————। *প্রতিকৃতি*। প্রদর্শনী উপলক্ষে ২০০৬ সালে প্রকাশিত।

———————। *শিল্পকলা যুগে যুগে*। ঢাকা, হাসি প্রকাশনী, মে ২০১১

———————। *বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্প*। ঢাকা, আজমাইন পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০১

———————। *শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন*। ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৮৮।

———————। *শিল্পপ্রেমী জিয়া*। ঢাকা, হিমি বুকস এন্ড বুকস, সেপ্টেম্বর ২০০৪।

———————। *শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি*। ঢাকা, কন্টেম্পোরারী কনসেপ্ট, সেপ্টেম্বর ২০০১।

———————। *বাংলাদেশের নতোন্নত দারুশিল্প*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন সংস্থা, আগস্ট, ২০০৬।

আব্দুল মতিন। "বাংলাদেশের চিত্রকলার আঞ্চলিক রূপ"। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক মুখপত্র *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, গ্রীষ্ম, ১৩৮৪।

আমিনুল ইসলাম। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০০৩।

আর. শিবকুমার। *"অবন ঠাকুরের আরব্য রজনী : দিশি ফ্ল্যানেরি এবং উপনিবেশ বিরোধী কিস্‌সা"*, দ্র. বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত (সম্পা.)। *আরব্য রজনী*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা জানুয়ারি, ২০০৪। পৃ. ২৭৭–৩০১।

———————। "*খুদ্দুর যাত্রা*' বিষয়ে একটি প্রাথমিক নিবেদন"। দ্র. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *খুদ্দুর যাত্রা*। পাণ্ডুলিপি সংস্করণ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০০৯। ভূমিকা ও পাঠ সমন্বিত সম্পূরক খণ্ড।

আলাউদ্দিন আল আজাদ। *জীবনী গ্রন্থমালা : রশিদ চৌধুরী*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৪।

ইন্দ্র দুগার। "ভারতীয় শিল্পে ঐতিহ্য ও অতি আধুনিকতা"। দ্র. রঞ্জনকুমার দাস (সম্পা.)। *শনিবারের চিঠি : শিল্প ও শিল্পী সংখ্যা*। কলকাতা, নাথ, এপ্রিল ১৯৯৯।

উমা দেবী। *বাবার কথা*। দ্র. অরুণ দে (ভূমিকা, টীকা, সম্পা.)। কলকাতা, দে'জ, আগস্ট ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকিল আহমদ (সম্পা.)। *বাঙালীর চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, মার্চ ১৯৯০।

এ বি এম হোসেন। *ইসলামী চিত্রকলা*। ঢাকা, খান ব্রাদার্স, জুলাই ২০০৪।

কমল সরকার। *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*। কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪।

————। *রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ*। কলকাতা, রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি, ডিসেম্বর ১৯৮৬।

কামর‍ুল হাসান। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*। ঢাকা, প্রথমা, জুন ২০১০।

কৃষ্ণ কৃপালনী। *দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ*। দ্র. ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনুবাদিত। নতুন অক্ষরবিন্যাসে দ্বিতীয় মুদ্রণ, নয়াদিলিণ্ড, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০০। [প্র. প্র. ১৯৮৪]।

কৃষ্ণলাল দাস। *শিল্প ও শিল্পী*। ২য় সং। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্ড়ক পর্ষদ, ১৯৭৭–১৯৮৩। ২য় খন্ড।

কে. মউদুদ ইলাহী। *গবেষণা পদ্ধতি এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন*। ঢাকা, নভেল পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি ২০১১। [প্র. প্র. মে ২০০৬]।

খগেশকিরণ তালুকদার। *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৮৭।

গোরী ভঞ্জ। "আমার পিতা ও গুর‍ু নন্দলাল"। *রবীন্দ্রভাবনা নভেম্বর ১৯৮৪*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা।

গোলাম মুরশিদ। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা, অবসর, জানুয়ারি, ২০০৬।

গৌতম দাস। *বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*। কলকাতা, পুনশ্চ, বইমেলা ২০০০।

"চার‍ুকলা অনুষদ পরিচিতি"। দ্র. *বিধিমালা ও নিয়মকানুন : গ্রেডিং পদ্ধতি ভিত্তিক বি.এফ.এ সম্মান ও এম.এফ.এ প্রোগ্রাম*। চার‍ুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ২০১২।

চিন্ড়মণি কর। *শিল্পী ও রূপকলা*। ২য় সং। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮। [প্র. প্র. ১৯৯৬]।

জগমোহন মুখোপাধ্যায়। *গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা*। কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ১৯৯২।

জসীম উদ্দীন। *ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়*। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৮।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *চিত্রাঙ্কনে বাংলার মেয়ে*। কলিকাতা, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাসানাল, ফাল্গুন ১৩৭৮।

জাহিদ মুস্ড়ফা, দ্র. ১২তম একক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত *আব্দুস সাত্তার-এর রঙিন আঙিনা*, সাজু আর্ট গ্যালারি, জুন ১৯৮৮

————। "প্রাচ্যগৃহ প্রাচ্য রূপ"। *কালি ও কলম*, চতুর্থ বর্ষ, দশম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪১৪ (১৯০৭ খ্রি.)।

জয়ন্ত গোস্বামী। *সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ*। পরিমার্জিত সং । কলকাতা, পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ১৯৯৯। [প্র. প্র. আগস্ট ১৯৮৯]।

টি.এম.এম নূর‍ুল মোদ্দাসের চৌধুরী। "রাজশাহী মহনগরীতে চার‍ুকলা শিক্ষা"। *রাজশাহী মহনগরী : অতীত ও বর্তমান*, সেমিনার খন্ড। রাজশাহী, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ফেব্র‍ুয়ারি ২০১২।

টোকন ঠাকুর (পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পা.)। *ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী*। খুলনা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও বিস্মৃতির শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ, এপ্রিল ২০০৫।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার‍ুকলা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর ম্যানুয়াল। ১-২-৯৩ তারিখে একাডেমিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ৫-২-৯৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অনুমোদিত।

তপন ভট্টাচার্য। *শিল্পী ও শিল্পভাবনা*। কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, বইমেলা ২০০৭।

তাপস ভৌমিক (সম্পা.)। *রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব*। কলকাতা, কোরক, জানুয়ারি ২০১১।

তপোধীর ভট্টাচার্য। *প্রবন্ধের ভুবন : ব্যক্তি ও সৃষ্টি*। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৭।

তর‍ুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.)। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*। কলকাতা, দে'জ, নভেম্বর ২০০২। [প্র. প্র. ১৯৯৪]।

তোফায়েল আহমদ। *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ড়*, ঢাকা। বাংলা একাডেমি, মে ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

দিনকর কৌশিক। *নন্দলাল বসু : ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*। বাংলা অনুবাদ : শোভন সোম। ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৫।

————। *শান্তিনিকেতনের দিনগুলি*। দ্র. সুশোভন অধিকারী (সংকলক)। কলকাতা, পত্রলেখা, আগস্ট ২০০৯।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.)। *পশ্চিমবঙ্গ*। অবনীন্দ্র সংখ্যা, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩২–৩৬, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, (২৩ ফেব্রুয়ারি এবং ১, ৮, ১৫, ও ২২ মার্চ), ১৯৯৬।

দীপঙ্কর ঘোষ। *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়*। বাংলা সাময়িকপত্রের লোকশিল্প-কারুশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন : ১৯০১–১৯৫০। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০০৪।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। *বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য*। কলকাতা, করুণা, জুলাই ২০০৫।

————। *রূপ রস ও সুন্দর নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা*। কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০৭।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। *শিল্প-প্রবন্ধাবলী* প্রশান্ত দাঁ (সম্পাদিত)। কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০০৬।

দ্র. রাহুল সেন (সম্পা)। *বিভাব*, সাহিত্য ও সংস্কৃত বিষয়ক ত্রৈমাসিক। কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা–৮৭, ১৪১০।

নজরুল ইসলাম। "বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলায় নগর"। আবদুল মমিন চৌধুরী ও ফকরুল আলম (সম্পা.) বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর। ১ম সং। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, জুন ১৯৯৬। পৃ. ২৩৯–২৪৫।

————। *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*। ২য় সং। ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯। [প্র. প্র. জানুয়ারি ১৯৯৫।

নন্দলাল বসু। *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*। অম্লান দত্ত ও কল্লাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন (সম্পা.)। কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯২।

————। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪। [প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৬৩]

————। *শিল্পকথা*। ১ম সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭। [প্র. প্র. কার্তিক ১৩৫১]।

————। *রূপাবলী*। বিশ্বভারতী সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৫৬। প্রথম-তৃতীয় ভাগ। [পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪]।

————। দ্র. *রবীন্দ্র রচনাবলী*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪০৭। অষ্টাদশ খণ্ড। পৃ. ১০৪–১০৬।

নির্ম্মলকুমার ঘোষ। *ভারত শিল্প*। ১ম সং। কলিকাতা, ফার্মা কে.এল, ১৯৭৩।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.)। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭। [৫ম মুদ্রণ ২০১১]।

পঞ্চানন মণ্ডল। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ প্রকাশন। বীরভূম। ১৯৮২–১৯৯৩। সব খণ্ড।

পলল্লব মিত্র। *বাংলার ঐতিহ্য : কলকাতার অহংকার*। ১ম সং। কলকাতা, পারুল, ২০১০।

পরিতোষ সেন। *কিছু শিল্পকথা*। সংশোধিত সং। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০৩।

————। *রং তুলির বাইরে*। কলকাতা, ভাষাবিন্যাস, আগস্ট ২০০৮।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.)। *অগ্রন্থিত অবনীন্দ্রনাথ*। কলকাতা, পত্রলেখা, মে ২০১১।

পূর্ণেন্দু পত্রী। *শিল্প সংক্রান্ত*। কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ১৯৯৭।

————। *রূপসী বাংলার দুই কবি*। ১ম সং। কলিকাতা, আনন্দ, নভেম্বর ১৯৮০।

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। *কবি ও শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ*। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪১০।

প্রতিমা দেবী। *স্মৃতিচিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*। দ্র. সুনীল জানা (সংকলক ও সম্পা.)। অক্টোবর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। নতুন সং। কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০০৭।

প্রদোষ দাশগুপ্ত। *স্মৃতিকথা শিল্পকথা : ক্যালকাটা গ্রুপ*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, অক্টোবর ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

————। *শিল্প প্রবন্ধাবলি*। প্রশান্ড় দাঁ (সম্পা.)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, জানুয়ারি ২০০৯।

প্রবাসজীবন চৌধুরী। *"নন্দনতাত্ত্বিক নন্দলাল"*। *দেশ* ২৬ নভেম্বর ১৯৮৩, বর্ষ ৫১, সংখ্যা-৪। পৃ. ১৯–২১।

————। *সৌন্দর্যদর্শন*। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৬১। [পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৮৭]।

প্রবীর কুমার দাস। *শিল্প জিজ্ঞাসা*। কলকাতা, সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদ, ২০০৭।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। *শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪০৭। [প্র. প্র. ১৩৬৯]।

প্রশান্ড় দাঁ (সম্পা.)। *কিছু স্মৃতিকথা কিছু শিল্পভাবনা*। কলকাতা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা পুস্ড়কমেলা ১৯৯৮।

প্রতিমা দেবী। *স্মৃতিচিত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*। দ্র. সুনীল জানা (সংকলক ও সম্পা.)। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নূতন সং। কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০০৭। [প্র. প্র. ২০০০]।

পূর্ণেন্দু পত্রী। *"রবীন্দ্রনাথের লেখার ছবি"*। দ্র. অর্চি মিত্র (সম্পা.)। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, শ্রাবণ ১৪১৮।

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। *কবি ও শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ*। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪১০।

পূর্ণিমা দেবী। *ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর*। কলকাতা, পুনশ্চ, ১৯৯৯।

ফয়েজুল আজিম। *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও উপনিবেশিক প্রভাব*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী ২০০০।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। *চিত্রকথা*। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৮৪।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী। *লোকায়ত বাঙলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা*। কলিকাতা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৪০৩।

————। *গুহাচিত্র থেকে লোকচিত্র*। কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১১।

বুদ্ধদেব বসু। *সাহিত্যচর্চা*। ষষ্ঠ সং.। কলকাতা, দে'জ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭। [প্র. প্র. এপ্রিল ১৯৫৪]।

বুলবন ওসমান। "বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের চারুকলা"। *শিল্পকলা* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা, অষ্টাদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৯৭। পৃ. ১–১৩।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, কাইয়ূম চৌধুরী ও হাশেম খান (সম্পা.)। *সাদাকালো '৭১*। ডিসেম্বর ২০০৯

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। *লোকশিল্প বনাম 'উচ্চ' মার্গীয় শিল্প : প্রাক-গুপ্ত বঙ্গের প্রেক্ষাপট*। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ১৯৯৯।

ভূদেব চৌধুরী। *লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ*। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ১৯৯৫। [প. প্র. ১৯৭৫]।

মতলুব আলী (সম্পাদিত)। *রূপবন্ধ*। ঢাকা, মানব প্রকাশন, ১৯৯৮।

————। *এশীয় চারুকলা দ্বি-বার্ষিক ঃ এক দুই তিন চার* (সমীক্ষণ. পর্যালোচনা. সমালোচনা)। ঢাকা, মানব প্রকাশন, অক্টোবর ১৯৯১।

মাহবুবুল হক ও আরও অনেকে (সম্পাদনা পরিষদ)। *প্রথম আলো ভাষারীতি*। ৩য় সং। ঢাকা, প্রথম আলো, আগস্ট ২০১২। [প্র. প্র. জুলাই ২০০৯]।

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.)। *হাশেম খান*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুলাই ২০০০।

মুকুলচন্দ্র দে। *আমার কথা*। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২।

————। *জাপান থেকে জোড়াসাঁকো চিঠি ও দিনলিপি* (১৯১৬–১৯১৭)। দ্র. সত্যশ্রী উকিল (সম্পাদিত)। নিউ এজ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৫।

মুস্ড়ফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.)। *বাংলাদেশ : বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*। ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯০।

মৃণাল ঘোষ। *বিশ্বায়ন ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারী ২০০৮।

————। *এই সময়ের ছবি*। ২য় পরিবর্তিত সং। কলকাতা, প্রতিক্ষণ ১৯৯২। [প্র. প্র. ১৮৯৮]।

Dhaka University Institutional Repository

————। *পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকলায় ১৯৬০-এর দশক এবং দশজন শিল্পী*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জুলাই ২০০৬। [প্র. প্র. জানুয়ারি ১৯৯৯]।

————। *শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ১৯৯৪।

————। *"সমকালীন দৃশ্যকলা : রূপের নতুন উন্মেষ"*। *কালি ও কলম*, চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৩।

————। *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৫।

মোঃ মাহবুবুর রহমান (সম্পাদক)। রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ফেব্রুয়ারি ২০১২। সেমিনার খন্ড।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। *দক্ষিণের বারান্দা*। বিশ্বভারতী সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮৮।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। *প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসন*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১২।

রঞ্জনকুমার দাস (সম্পা.)। *শনিবারের চিঠি : শিল্প ও শিল্পী-সংখ্যা*। ১ম সং। কলকাতা, নাথ, এপ্রিল ১৯৯৯।

রানী চন্দ। *শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ*। ১ম সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৪০৬। [প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৭৯]।

————। *সব হতে আপন*। ১ম সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০১। [প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৯১]।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। *বাঙালির নতুন আত্মপরিচয় : সমাজসংস্কার থেকে স্বাধীনতা*। সংশোধিত ২য় সং। কলকাতা, অবভাস, সেপ্টেম্বর ২০১০। [প্র. প্র. জানুয়ারি ২০০৫]।

রাহুল সেন (সম্পা.)। *বিভাব*। কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা ৮৭।

রবি পাল। "পত্রচিত্রণে নন্দলাল"। *দেশ* ২৬ নভেম্বর ১৯৮৩, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪। পৃ. ১৪–১৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "নন্দলাল বসু"। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪০৭। অষ্টাদশ খন্ড, পৃ. ১০৪–১০৬। [পুনমুর্দ্রণ পৌষ ১৪১৭]।

————। *বিচিত্রিতা*। আশিস পাঠক (সম্পা.)। ২য় সং। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০১১। [প্র. প্র. বিশ্বভারতী সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৪০]।

রবীন্দ্র-রচনাবলী। ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬। চতুর্দশ খন্ড। পৃ. ২২৩–২৩৮। [পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭]।

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। *সংস্কৃতি ও শিল্পভাবনা*। কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, মাঘ ১৪১০।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.)। *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*। আদিপর্বের শিল্পকর্ম। ১ম বাংলা সং। কোলকাতা, ভারতীয় সংগ্রহশালা, ১৯৬৬। [পুনর্মুদ্রণ ২০০৬]।

রীণা ভাদুড়ী। *সমুদ্র-হিমাদ্রির মহাসঙ্গমে : ঠাকুরবাড়ি-আশুতোষ পরিবার সংযোগ*। কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, জুলাই ২০১১।

রীণা বসু। *রূপালাপ*। কলকাতা, প্রতিভাস, জানুয়ারি ১৯৯৯।

লালা রুখ সেলিম (সম্পা.)। *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ : চারু ও কারুকলা*। ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

লীলা মজুমদার। *অবনীন্দ্রনাথ*। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৭৩। [পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০২]

শঙ্করীপ্রসাদ বসু। *নিবেদিতা লোকমাতা*। ১ম সং। আনন্দ, বৈশাখ ১৪০১। ৪র্থ খন্ড। [দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৭]।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ বসু (সম্পা.)। *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবাসী : ইতিহাসের ধারা*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৯। ২য় খন্ড।

শঙ্খ ঘোষ। *কল্পনার হিস্টিরিয়া*। প্যাপিরাস সং। কলকাতা, প্যাপিরাস, এপ্রিল ১৯৯৯।

————। *"পাগলামির কারুশিল্প"*। দ্র. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *খুদ্দুর যাত্রা*। পান্ডুলিপি সংস্করণ। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০০৯। ভূমিকা ও পাঠ সমন্বিত সম্পূরক খন্ড।

————। *বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর*। কলকাতা, সুবর্ণরেখা, বৈশাখ ১৪১০।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিদেব ঘোষ। *বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর*। কলকাতা, সুবর্ণরেখা, বৈশাখ ১৪১০।

শামসুজ্জামান খান (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮। ২য় খণ্ড।

শফিকুল আমীন। *নানা রঙের দিনগুলি*। ঢাকা, সাহানা, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

শফিকুল ইসলাম। *প্রাচ্যরীতির শিল্প*। ঢাকা, শিল্পলোক, নভেম্বর ১৯৮৯।

শফিকুল কবীর চন্দন। *তন্তুকলা : ট্যাপেস্ট্রি*। ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

শোভন সোম। "শিল্পের আধুনিকতা ও বাংলার শিল্পস্বাতন্ত্র্য"। *দেশ* ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ২২। পৃ. ৪১–৪৯।

————।*"বাংলার বিশ শতকের শিল্পকলা : একটি নিরীক্ষণ"*। দ্র. হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। ২য় সং। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০১০।

————। *তিন শিল্পী*। কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৫।

————। *চিত্রভাবন*। ২য় সং। কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ১৯৯৯। [প্র. প্র. জানুয়ারি ১৯৮৬]।

————। *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*। নিউ দিল্লি, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, মে ১৯৯৮।

————। *চিত্রভাবন*। ২য় সং। কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। আগস্ট ১৯৯৯। [১ম সং জানুয়ারি ১৯৮৬]।

————। *রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর [১৮৯২–১৯৭০] : জন্মশতবর্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য*। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৩।

শ্রী কৃষ্ণলাল দাস। *শিল্প ও শিল্পী*। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, নভেম্বর ১৯৮২। ২য় খণ্ড।

সঞ্জয় মল্লিক। "শিল্পপাঠ ও শিল্পপীঠ"। *দেশ* ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১, ৬৮ বর্ষ, ২২ সংখ্যা। পৃ. ৫০–৫৩।

সরসীকুমার সরস্বতী। *পালযুগের চিত্রকলা*। কলিকাতা, আনন্দ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

সত্যজিৎ চৌধুরী। *নন্দলাল*। ১ম সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮। [প্র. প্র. ১৯৮৮]।

————। *অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*। নতুন সং, কলিকাতা, সুচেতনা, জানুয়ারি ২০০০। [প্র. প্র. ১৯৭৭]।

স্বাতী ভট্টাচার্য। "বাংলার ক্যানভাসেই জন্ম নবীন ভারত চিত্রকলার"। *দেশ* ১০ জানুয়ারি ১৯৯৮, ৬৫ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৃ. ৫১–৬২।

সুরভি বন্দোপাধ্যায়। *গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি*। ৩য় সং। কলকাতা, দে'জ, জুলাই ২০০৫। [প্র. প্র. জুলাই ১৯৯০]।

সজনীকান্ত দাস। "অবনীন্দ্রনাথ"। দ্র. ড. সাগর মিত্র (সংকলন ও সম্পা.)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা।

————। ''ওকাকুরা তেনশিং ও অবনীন্দ্রনাথ"। *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৩।

সজনীকান্ত দাস, "অবনীন্দ্রনাথ", দ্র. সাগর মিত্র (সংকলন ও সম্পা.), *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা, নাথ, আগস্ট ২০০৬। পৃ. ২১৯–২৩০।

সমর ভৌমিক। *ঠাকুরবাড়ির চিত্রকর*। কোলকাতা, ২৭৬/১, নগেন্দ্রনাথ রোড থেকে রানী ভৌমিক কর্তৃক প্রকাশিত, বৈশাখ ১৪০৮।

সচিত্র সন্ধানী। চতুর্থ বর্ষ, ৩৮তম সংখ্যা, ১১ জানুয়ারি ১৯৮১।

সমীর সেনগুপ্ত। *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০০৮। [প্র. প্র. জানুয়ারি ২০০৫]।

সাগরময় ঘোষ (সম্পা.)। *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৯।

————। (সম্পা)। দেশ : *সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন ১৯০৩–১৯৮৩*। কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর ১৯৮৩। [৬ষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪]।

সুশীল রায় (সম্পা.)। *বিশ্বভারতী পত্রিকা* নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩।

সুকুমার মল্লিক। *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের উৎসব*। কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুখেন বিশ্বাস। *নন্দনতত্ত্বে প্রাচ্য*। কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০১১।

সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহা। *নন্দনতত্ত্বের আলোকে আধুনিক চিত্রকলা*। কলকাতা, ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর আর্ট অ্যান্ড ইস্‌থেটিকস, ১৪১২।

সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। *শান্তিনিকেতন চেনা অচেনা*। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৌষ ১৪১০ [২য় মুদ্রণ ১৪১৬]।

————। *ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা*। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৌষ ১৪০৫। [৫ম মুদ্রণ ১৪১৪]।

সুধীর কুমার নন্দী। *রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব-সূত্র*। ১ম সং। কলকাতা, পি.এম বাক্‌চি। বৈশাখ ১৪০৭।

সুধীর কুমার নন্দী, *এবং রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, সুচেতনা, শ্রাবণ ১৪১৭।

সুনীল কুমার পাল। *কিছু স্মৃতিকথা কিছু শিল্পভাবনা*। দ্র. প্রশান্ড় দাঁ (সম্পা.)। কলকাতা, রাজ্য চারু-কলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা পুস্ড়কমেলা ১৯৯৮।

সুশোভন অধিকারী (সংকলক)। *শান্ড়িনিকেতনের দিনগুলি*। কলকাতা, পত্রলেখা, আগস্ট ২০০৯।

————। "রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্রণ : একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান"। *পরিকথা*-২৬, কলকাতা, ত্রয়োদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০১১।

সেলিম আল দীন। "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর"। দ্র. *থিয়েটার স্টাডিজ*, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৯৯।

————। "শিল্পে সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাঙালীর অন্বেষণ : নাট্যপর্ব", থিয়েটার স্টাডিজ, সংখ্যা ৯, জুন ২০০২, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। *মুসলিম চিত্রকলা*। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জুন ২০০৩। প্র. প্র. জুলাই ১৯৭৯।

সৈয়দ আলী আহসান। *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*। ৩য় সং। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০০৪। [প্র. প্র. ১৯৮৩]।

সৈয়দ মুস্ড়ফা সিরাজ। *মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য*। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, বৈশাখ ১৪১৩। [প্র. প্র. মাঘ ১৪০০]।

সৈয়দ মনজুরু-ল ইসলাম। "জয়নুল আবেদিন ও বাংলাদেশের শিল্পকলার পঞ্চাশ বছর"। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা *শিল্পকলা* উনবিংশ বর্ষ ২য় ও বিংশ বর্ষ ১ম যুক্ত সংখ্যা, জুন ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। পৃ. ১–১২।

————। *রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ*। ঢাকা, নান্দনিক, একুশে বইমেলা ২০১১।

সৈয়দ মুজতবা আলী। *পঞ্চতন্ত্র*। ২য় সং। ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, বৈশাখ ১৪১৫। [প্র. প্র. ১৩৫৯]।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা"। দ্র. আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সম্পা.), *সমকালীন : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, কলকাতা, করু-ণা, বইমেলা ২০০৬। ৩য় খ-। পৃ. ২৭১-২৭৬।

স্বাতী ঘোষ। *রবীন্দ্রভাবনায় শান্ড়িনিকেতনে আলপনা*। কলকাতা, আনন্দ, নভেম্বর ২০১১।

হরিহর দে। *শিল্পে পরম্পরা*। বর্ধমান, এন.জি আর্ট স্টুডিয়ো, ২০০৮।

হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। ২য় সং। কলকাতা, পুস্ড়ক বিপণি, এপ্রিল ২০১০।

————। (সম্পা.)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। ২য় সং। কলকাতা, পুস্ড়ক বিপণি, এপ্রিল ২০১০। [প্র. প্র. মার্চ ২০০০]।

হাশেম খান। *চারু-কলা পাঠ*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়। *সাহিত্যতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*। ১ম পরিমার্জিত দে'জ সং। কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

খ) ইংরেজি গ্রন্থ

Abdus Satter. Contemporary Art Series of Bangladesh–29. Bangladesh Shilpakala Academy.

Agastya. "The Aesthetics of Young India : A Rejoinder". *Rupam*, No. 9, January 1922. [Reprinted : Delhi, B R Publishing, 1985, PP. 24–27].

Ahmed, Jalal Uddin. *Art in Pakistan*. Karachi, Pakistan Publications,1962.

Amrita. "Jamini Roy". *Lalit Kala Contemporary,* No–2.

Anand, Mulk Raj. "The Four Initiators of the Contemporary Experimentalism". *Lalit Kala Contemporary*, No.–2.

———— (Guest Editor). *Lalit Kala Contemporary*. No.–1. [New Delhi-1, Rabindra Bhavan, Lalit Kala Academi].

"Annual Exhibition of the Indian Society of Oriental Art". See Gangoly, Ordhendra, (ed.), *Rupam*, Nos. 13 & 14, Januay-June 1923. [Reprinted : Delhi, B P Publishing 1985, PP. 14–18].

Appasamy, Jaya (Editor). *Lalit Kala Contemporary*. No.4 [New Delhi-1, Rabindra Bhavan, Lalit Kala Academy].

————. *Abanindranath Tagore and the Art of His Times*. New Delhi, Lalit Kala Academy, 1968.

Art Matters, La Gallerie, Publication No. 1, December 1993.

Bailey, Gauvin Alexander. "the End of the 'Catholic Era' in Mughal Painting". *Marg,* Volume 53, Number 2, December 2001.

Bagal Jogesh Chandra. *"History of The Government College of Art and Craft". Centenary*. Government College of Art and Craft, Calcutta, 1966.

Barrett, Doughas. "Some Unpublihed Deccan Miniatures", *Lalit kala*, *A Journal Of Orientat Art.* No. 7, April 1960.

Barrett, Dougas and Basil Gray. *Indian Painting* Geneva, 1978.

Bhattacharya, S K. *The Story of Indian Art.* Delhi, Atma Ram & Sons, 1996.

Binyon, Laurence. *Asiatic Arts, Sculpture and Paintings.* India, Cosmo publication, 1981.

Canby, Sheila R. (ed.). *Persian Master's five centuries of painting*. India, Marg Publications, 1990.

Cousins, Jemes H. "The Art of Asit Kumar Haldar". *Rupam*, No. 9, January 1922. [Reprinted : Delhi, B R Publishing 1985, PP. 1–5].

Das, Asok Kumar. *Moghal Painting During Jahangir's Time*. Calcutta : Asiatic Society, 1978.

Datta Ella. *"Lines and Colours : Discovering Indian Art*. First edition. India. National Book Trust, 2002, [Saka1931].

Debdutta Gupta. "Rediscovering an artist : Nandalal Bose". See. Catalogue, *Post cards by Nandalal Bose*". 5–24 December 2011.

Dey, Bishnu. "The Pioneers of Art in Modern India". *Lalit Kala Contemporary,* No–1.

Dhamija, Ram. *Sixty years of Writing on Art and Crafts in India.* New Delhi, 1988.

Dimand, M S. *Handbook of Muhammadan Art*. Second Edition. New York, Hartsdale House, 1947.

Dutta, Ella. "Abanindranath Tagore : A New Context". *Marg,* Volume 53, Number 3, March 2002.

Falk, Toby. "princes of the timuer : The written Record". *Marg*, Volume XLVI, No. 2, 1994.

Fischer, K. "Calcutta Group". *Marg,* Vol. VI, No. 4, September 1953.

Folsom, Rose. *The Calligraphers' Dictionary*. London, Thames ard Hudson, 1990.

Ghosh, Ajit. "Old Bengal Paintings". *Rupam,* Nos. 27–28, July-October 1926. [Reprinted : Delhi. B R Publishing, 1985, PP. 98–114].

Goetz, Hermaan. "The Great Crisis from Traditional to Modern Art". *Lalit kala Contempory,* No.–1.

Goswamy, B N. "A Matter of Taste : Same Notes on the context of Painting in Sikh Punjab". *Marg,* Volume xxxiv, Number 01.

Haque, Enamul (Editor). *Islamic Art in Bangladesh*. Dacca, Bangladesh National Museum, 1978.

————. *Islamic Art Heritage of Bangladesh*. Bangladesh National Museum. December 1983.

Haque, Mahmudul (Editor). *The Journal of Bangladesh National Museum*. January-June 2005, Number 4.

Huq, Syed Azizul. *Quamrul Hassan.* (Art of Bangladesh Series-3). Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2003

Haque, Enamul. *Islamic Art in Bangladesh : Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum*. Bangladesh, Dhaka Meseum, April 3-28, 1978

Havell, E B. "Fundamentals of Indian Art : A Review". Rupam, Nos. 27-28, July-October 1926. PP. 74-83.

————. "The Mathematical Basis of Indian Iconography". *Rupam,* No. 29, January 1927. [Reprinted : Delhi. B R Publishing, 1985, PP. 6-13].

Hye, Hasanat Abdul. *Murtaza Baseer.* (Art of Bangladesh Series-11). Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2004.

Islam, Nazrul. *Zainul Abedin.* (Art of Bangladesh Series-1). Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, June 1997.

Jain, Jyotindra. *Kalighat Painting.* India, Mapin Publishing, 1999.

Jamal, Osman. *Aminul Islam*. (Art of Bangladesh Series-10). Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2004.

Kar, Amina. "SUNAYANI DEVI–A primitive of the Bengal School". *Lalit kala Contemporary,* No.-4. New Delhi-1.

Khandalavala, karl. "Some problems of Mughal Painting". *Lalit kala,* No.-11, Apri 1962, India, Lalit kala Academi.

Khan, Sades. *S. M. Sultan.* (Art of Bangladesh Series-4. Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2003.

Kumar, R Siva. *Paintings of Abanindranath Tagore.* Kolkata, Pratikshan, 2008.

Kumar, R, Siva & Gulammohammed Sheikh (Curators). *Benodebehari Mukherjee (1904-1980) : Centenary Retrospective*. India, The National Gallery of Modern Art & Vadehra Art Gallery, 2006.

Lala Rukh Selim, (ed.) *Art*. January-March 1999, [Vol. 4, No.3].

————. *Art*. October-December 1998, [Vol. 4, No.2].

Madsen, Juel. "Abanindranath Tagore". *Rupam*, Nos. 19 & 20, July-December 1924. [Reprinted : Delhi. B R Publishing, 1985, PP. 115-119].

————. "Abanindra Nath". *Rupam*, Nos. 19 & 20, July-December 1924. [Reprinted : Delhi. B R Publishing, 1985, PP. 115-17].

Majlish, Naima Khan. "Status of Women in Mughal India (AD 1526-1707) as Reflected in Miniatures". *The Journal of Bangladesh National Museum*, Number 4, January-June 2005.

Mansur, Abul. *Rashid Choudhury*. (Art of Bangladesh Series-5). Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2003

Mitter, Partha. *Art and Nationalism in Colonial India: 1850-1922*. NewYork, Cambridge University Press, 1994.

Mitra, Asok. "Gaganendranath Tagore". *Lalit kala Contemporary,* No.-2.

————. "The Forces Behind the Modern Movement". *Lalit kala Contemporary,* No. 1.

————. *Four Painters.* Calcutta, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

Mittat, Jagdish. "Graphic Art of the Bengal School". *Lalit kala.* No.-1.

————. "An Early Gular Painting". *Lalit kala Contemporary.* No.11, April 1962, India, Lalit kala Academy.

Mukherjee, Benode Behari. "Abanindranath and his Tradition". *Lalit kala Contemporary,* No-1.

Mukherjee, B N. *Kalighat Patas*. Album of Art Treasures, No. 111, Calcutta, Indian Museum, 1998.

Murshid, Sarwar & Z D. Nomani, (ed.), *New Values*. Volume 4 No. 2 & 3, 1952.

National Gallery of Modern Art. Ramkinkar Baij. New Delhi, February 2012.

Quintanilla, Sonya Rhie (General Editor). *Rhythms of India : The Art of Nandalal Bose (1882-1966).* Published in the United States by the San Diego Museum of Art, 2008.

Raja Ravi Varma : The Painter Prince 1848-1906. India, Bangalore, Parsram Mangaram 2002 (?)

Randhawa, M S. *Kangra paintings of Love*. New Delhi : National Museum, 1962.

————. *Basohli Painting*. India : Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, September 1959.

————. *Kangra Vallaly Painting*. India, 1982.

Reneck, Marguerite-Marie. *Indian Art.* London. The Hamlyn Publishing, 1977.

Sanyal, Narayan. *Ajanta*. Calcutta. New Central Book Agency , 1999.

Sarkar, Benoy Kumar. "Tendencies of Modern Indian Art". *Rupam*, No. 26, April 1926. [Reprinted : Delhi. B R Publishing, 1985. PP. 55-58].

Seklon, Robert. "Iranian Artists in the Service of Humanum". *Marg,* Volume XLVI No.-2, 1994.

Seyller, Jobn. "Overpainting in Early Mughal Art". *Marg* Volume XLVI, No. 2, 1994.

Siddiqui, Attq R. *The Story of Islamic Calligraphy.* Delhi, Sarita Book House, 1990.

Singam, S. Durai Raj & Joseph A Fitzgerald. *The Wisdom of Ananda Coomarswamy, reflections on Indian Art, Life and religion.* Bloomington, World Wisdom, 2011.

Sivaramamurti, C. *Indian Painting*. 2nd Edition. India, National Book Trust, 1996. [First Edition 1070]. (Saka1928).

Society for Promotion of Bangladesh Art. *Bangladesh Art Collection of Contemporary Paintings*. Dhaka, 2003.

Thakurata, Tapati Guha. *The making of a new 'Indian' Art : artists, acsthetics and nationalism in Bengal, C.1850-1920*. NewYork, Cambridge University Press, 1992.

Venkatchalam, G. "Some Reminisences about the Bengal School". *Lalit kala Contemporary.* No-1

Venkateswara, S V. "Symbolism in Indian Art", *Rupam,* No. 30, April 1927. [Reprinted : Delhi. B R Publishing, 1985, PP. 38-47].

Vredenbury E. "The continuity of pictorial tradition in the Art of India". *Rupam*, No. 1, January 1920. [Reprinted : Delhi. B R Publishing, 1985, PP. 7-11].

Zaman, Mahamud Al. *Safiuddin Ahmed.* (Art of Bangladesh Seires-2). Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, December 2002.

————. *Kazi Abdul Baset*. (Art of Bangladesh Series-12). Dhaka, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2004.

গ) ক্যাটালগ

আমিনুল ইসলাম লিখিত "আশীর্বাণী" । First Solo Painting Exhibition । *My Country* । Divine Art Gallery, Dhaka, 2005 ।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সাত্তার। *প্রতিকৃতি*। প্রদর্শনী উপলক্ষে ২০০৬ সালে প্রকাশিত।

———— । "শুভেচ্ছা বাণী", Water Colour Painting Exhibition by A. Aziz। Zainul Gallery । May 16–22, 2002.

আব্দুল আযীয। "শিল্পীর কথা"। ডাকসু সংগ্রহশালায় 'চেতনায় একুশ' মুরাল চিত্র উন্মোচনের স্যুভেনিয়র, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৬।

কালীঘাট, যামিনী রায়, জয়নুল আবেদিন, কামর ল হাসান, এস.এম সুলতান ও রশিদ চৌধুরী'র *শিল্পকর্মের বিশেষ প্রদর্শনী*। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৮।

কামর ল হাসানের চিত্রকলা প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২মার্চ ১৯৯১।

জয়নুল উৎসব ও বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী' ৯৭। চার কলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচ্যকলা বিভাগের ছয় শিক্ষক শিল্পীর চিত্রকলা প্রদর্শনী *শিকড় সন্ধান*। জয়নুল গ্যালারী-১, চার কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১১মার্চ–১৭মার্চ ২০১০।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সংগৃহীত *শিল্পকর্মের বিশেষ প্রদর্শনী* ২০১০। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ২০১০।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ আয়োজনে *রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী* উদ্‌যাপন। বাংলাদেশের ১৫০ শিল্পীর বিশেষ চিত্রকলা প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ২০০১।

বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ২০০৯ এবং ২০১০। চার কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডিসেম্বর ২০১১।

বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনী ১৯৮৬। চার কলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯ ডিসেম্বর-১০ জানুয়ারী, ৮৭।

বার্ষিক চার কলা প্রদর্শনী' ৯৫। চার কলা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১২ জানুয়ারী, ১৯৯৫।

মইনুদ্দীন খালেদ, "শুভেচ্ছাবাণী"। দ্র. 1st Solo Painting Exhibition *Expression of freedom* by Nazmul Haque Bappy। Alliance Francaise de Dhaka Gallery। 2011।

মুনতাসীর মামুন। "সোহাগ পারভেজের জলরং"। দ্র. Solo Art Exhibition Nature of Bangla by Shohag Parves

মুস্তফা মনোয়ার লিখিত "শুভেচ্ছাবাণী"। 3rd Solo Painting Exhibition *Absorbed Nature* by Nazmul Haque Bappy। Alliance Francaise de Dhaka Gallery। 2012।

রবিউল হুসাইন। "ভূমিকা", *ত্রয়োদশ নবীন শিল্পী চার কলা প্রদর্শনী*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ২০১০।

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস বিশেষ প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৪–২২ ডিসেম্বর, ২০০৯।

"শওকাতুজ্জামানের চিত্র প্রদর্শনী-১৯৮৮"। চার কলা ইনস্টিটিউট গ্যালারী, শাহবাগ, ঢাকা। ১৯৮৮।

শওকাতুজ্জামান লিখিত মন্তব্য। দ্র. Solo Painting Exhibition by Gupu Trivedi। Gallery Chitrak, Dhaka। 2003।

শিল্পী নিখিল চন্দ্র দাসের একক চার করা প্রদর্শনী *হারানো ছবির কথা*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৩–২২ জুন, ২০১০।

শিল্পীর চোখে বান্দরবান ঃ জলরং চিত্র প্রদর্শনী। গ্যালারী চিত্রক। ২০০৪।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত সুভ্যেনিয়র

সুশান্ত কুমার অধিকারী। "মাধবী'র রঙে সমাজ-বাস্তবতা"। মমতাজ জাহান মাধবীর প্রথম একক চিত্রকলা প্রদর্শনী *হৃদয় বীণার ঝংকার*। ২০১৩।

হাশেম খান লিখিত "শুভেচ্ছা বাণী"। দ্র. 1st Solo Painting Exhibition 2003 by Mizanur Rahman Fakir। Saju Art Gallery। 31 may–07 June 2003।

4th Annual Exhibition. *Watercolours from Nepal & Bangladesh, SAARC Region*. Presented by Nepal watercolous Society. The Nepal Art Council Gallery, August 13– 20, 2010.

A Painting Exhibition of Showkatuzzaman. Dhaka, Alliance Francaise, Gallery. 1991.

A Grand Group Art Exhibition of *Reputed Bangladesh & Foreign Artists*. Dhaka, Saju Art Gallery. 1995.

Dhaka University Institutional Repository

A Grand Group Art Exhibition of *Reputed Bangladesh & Foreign Artists*. Dhaka, Saju Art Gallery. 2006.

A Grand Group Art Exhibition of *Reputed Bangladesh Artist*. Saju Art Gallery. 1991.

A Grand Group Art Exhibition of *Reputed Bangladesh Artist*. Saju Art Gallery. 1992.

A Grand Group Art Exhibition of *Reputed Bangladesh Artist*. Saju Art Gallery. 2011.

A Grand Group Art Exhibition of *Reputed Bangladesh Artist*. Saju Art Gallery. 2012.

A Grand Group Art Exhibition of *Reputed Bangladesh Artist*. Saju Art Gallery. 2013.

A Guaide to the Dacca Museum, Dacca. 1964.

Abdus Sattar. *Water Colour Painting Exhibition*. Organized by Divine Art Gallery. Dhaka 1997.

Academy Exchange Programme 2010-2011. Faculty of Fine Art, Dhaka University Kala Bhavana, Visva Bharati. Bengal Gallery of Fine Art. 2011.

A Group Art Exhibition of the Teachers of the Govt. College of Art and Craft Calcutta. *DISTANT WINDOW.* Zainul Gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 1-7 April, 2009.

An Exhibition of Oriental Art. Organized by 6 Artists. Zainul Gallery. 2004.

Art of Abdus Satter. *On The Occesion of 19th Art Exhibition*. Organized by Saju Art Gallery, Dhaka. 2002.

Artist Camp : Painting Exhibition, Jointly organized by the Bangladesh Shilpakala Academy and Goethe-Institute Dhaka. German Cultural Centre under the fine and Performing Arts Training Project of Bangladesh Shilpakala Academy. 1997.

Asian Biennale Bangladesh 2001. Bangladesh Shilpakala Academy. 2002.

2nd Asian Biennale Bangladesh 1983. Bangladesh Shilpakala Academy. 1983.

8th Asian Biennale Bangladesh 1997. Bangladesh Shilpakala Academy. 1997.

13th Asian Biennale Bangladesh 2008. Bangladesh shilpakala Academy. 2008.

11th Asian Art Biennale Bangladesh 2003. Bangladesh Shilpakala Academy. 2004.

9th Asian Art Biennale Bangladesh 1999. Bangladesh Shilpakala Academy. 1999.

Balobeb Adhikary. 1st Solo Painting Exhibition of *Churning Life.* Organized by Bangladesh Shilpakala Academy. National Art gallery. 28 June to 04 July 2011.

*Barnikabhanga.*Water colour exhibition 2003. Organized by Gallery Chitrak, Dhaka. 2003.

Beyond Human Nature by Nasreen Begum. Athena Gallery of Fine Arts. 25th May thru 11th June 2013.

Bengal Gallery of Fine Arts Presents *Shades of life*, 12 womens Artists of SHAKO

Calligraphy Exhibition 2011. Organized by Oriental Painting study Group, Zainul Gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 02-07 May 2011.

Contemporary Art Series of Bangladesh-29. Abdus Satter. Bangladesh Shilpakala Academy. February 1984.

Contemporary Art Series of Bangladesh-55. Twelfth National Art Exhibition. 1996.

*Contemporary Art Series of Bangladesh-46.*Tenth National Art Exhibition. 1992.

Dhaka Art Summit. Organized by Samdani Art Foundation. Bangladesh Shilpakala Academy & Bangladesh National Museum. 12-15 April, 2012.

Exhibition of Contemporary arts of Bangladesh. Calcutta, Delhi and Bomby. 1973.

Exhibition of Works of ICCR Alumni from Bangladesh, Indira Gandhi Cultural Centre. High Commission of India. 2010.

Farida Zaman. *Bound to the Soil.* Bengal Gallery of Fine Art. 13-26 January 2013.

4th Friendship Art Exhibition 2010. Organized by Youth Society of Bangladesh, National Gallery, Bangladesh Shilpakala Academy. 2010.

Fourth National Art Exhibition. Contemporary Art Series of Bangladesh-11. Bangladesh Shilpakala Academy.

Fourteenth Young Artist' Art Exhibition. Bangladesh Shilpakala Academy. 2002.

Gopal Chandra Saha. 1st Solo Art Exhibition *Me in my inner Soul*. Zainul Gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 13−19 September 2011.

Group Art Exhibition. 12th Batch *Memory Lane.* Zainul Gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 1−5 March 2013.

Group Exhibition by SHAKO. Bay's Galleria. 4−18 May 2012.

Harmony. Organized by Bangladesh artist welfare organization. La Gallery, Alliance Francaise de Dacca, 7−15 May 2006.

Hashem Khan. 2nd Solo Exhibition *Imaye of Life* by Fahmida Khatun. Zainul Gallery. 11th–17th July 2007.

Human to Rashid Chuwdhary Tapestry by Tajul Islam. Gallery Kaya. 27th June–21 July 2008.

Inaugural Exhibition of D D Gallery. Dhaka, Art Craft & Fashion Gallery.

Inauguration. Gallery Chitrak. July 21, 2000.

"Introduction". *Contemporary Paintings of Bangladesh*. OSLO, Norway. 2nd December 2002.

Kantideb Adhikary. 1st Slao Painting Exhibition *Beauty of Nature.* Zainul Gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 17−22 October 2008.

Malay Bala. *Oriental Art : My Style of Expression,* Zainul Gallery. Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 1−5 September, 2007.

Md. Hasan Morshed. *2nd Solo Painting Exhibition 2011.,* Zainul gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka.

Miniature Art Exhibition 2005. Organized by Shilparag Gallery, Dhaka. 3 June to 3 July 2005.

16th National Art Exhibition. Bangladesh Shilpakala Academy. 2005.

18th National Art Exhibition,. Bangladesh Shilpakala Academy. 2009.

Nasreen Begum. *The pagh within*. Organized by Bangal Gallery of Fine Arts, Dhaka. 2004.

———. *3rd Solo Painting Exhibition.* Organized by Divine Art Gallery. Dhaka 1995.

———. *Art Exhibition*. Organized by Hamail Art Galleries, Lahore. 2006.

———. *Dreams*. Organized by La Gallery, Banani. 1991.

———. *2nd Sols Oriental Painting Exhibition*. Organized by Gallery Tone, dhanmondi. 1993.

Nazmul Haque bappy. 2nd Solo Painting Exhibition *Expression of Freedom-2.* Zainul Gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 13−18 November 2011.

Nahid Rokhsana Ananna. 1st Solo Art Exhibition *Manifestation.* Zainul Gallery, faculty of FineArt, University of Dhaka. 24−28 April 2010.

Nurul Amin 2000. Devine Art Gallery. 2000.

Oriental Painting Exhibition 2010., An Art Exhibition by 10 Artists. Zainul Gallery, Faculty of Fine Art, University of Dhaka. 02−07 October 2010.

Prasanta Kumer Adhikary. *2nd Solo Exhibition*. Zainul Gallery, Institute of Fine Art, University of Dhaka. 24−30 July.

Rafique Ahmed. *Solo Painting Exhibition.* Organized by Divine Art Gallery, Dhaka. 2005.

Robiul Hassan. "Shohag Parvez's colourful expressions in lines". *Beautiful Bangladesh*, Gallery Kaya.

Rubaiat Shaila Eti. 2nd Solo Exhibition *Eastern Symphony.* Zainul gallery. 25 February to 3 March, 2009.

7th Showkatuzzaman Painting Exhibition. Dhaka, Gallery 21. 2000.

1st Solo Exhibition *Manifestation* by Nahid Rokhsana Ananna. Zainul Gallery. 2010.

1st Solo Painting Exhibition *Voice of Silence* by Hiza Sultana Annie. Zainul Gallery. 2003.

Seventh National Art Exhibition. Contemporary Art Series of Bangladesh−34.

Showkatuzzaman. "Shawkatuzzaman : Exhibition his Oriental Painting and drawings". alliance Francaise. 3rd November to 2nd December.

Shohag Parvez. 3rd Solo Exhibition *Nature of Bangla.* Shilpangon Gallery, Dhaka. 2010.

Dhaka University Institutional Repository

Teachers Exposition 2008. An Art Exhibition by 16 Teachers of faculty of Fine Art, University of Dhaka, Zainul Gallery. 25-30 November. 2008.

Thirteenth National Art Exhibition. Contemporary Art Series of Bangladesh-60. 1998.

Thirteen Artists Show. Tivoli Art Gallery. 2000.

The Prints of the world. National Culture Festival in Kagawa' 97.

The Paintings & Prints of Abdus Sattare. Bangladesh Shilpakala Academy.

1st Binenial Oriental Art Exhibition 2003. Organized by Society of Oriental Art. Arail Centre, Dhaka. 2003.

1st Group Art Exhibition. Organized by Oriental Painting Study Group. Zainul Gallery, Dhaka. 2008.

19th National Art Exhibition. Bangladesh Shilpakala Academy. 2011.

17th Young Artist' Art Exhibition. Bangladesh Shilpakala Academy. 2010.

Young Artists-'81. Contemporary Art series of Bangladesh-20. Bangladesh Shilpakala Academy.

Water Colour Exhibition 2003. *Barnika Bhanga.* Organized by Gallery Chitrak. 22-31 August, 2003.

Wazmun Nahar Runty. *Sorrow and Happiness.* Zainul Gallery. 17-23 November 2007.

ঘ) সংবাদপত্র

১. অনি আলমগীর। "আযীযের চিত্রকর্ম"। *দৈনিক ইত্তেফাক* ৩১ মে ২০০২।

২. অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস। "নাসরীন বেগমের চিত্রপ্রদর্শনী : ঝরাপাতার কাব্য"। ইত্তেফাক সাময়িকী। *দৈনিক ইত্তেফাক* ৭ জুন ২০১৩

৩. "আব্দুস সাত্তারের চিত্র প্রদর্শনী"। *দৈনিক আল মুজাদ্দেদ* ৩০ জুন ১৯৯৫।

৪. আবেদ রহমান। "ফাহমিদার ফুলের নান্দনিক প্রদর্শনী"। *নয়াদিগন্ত* ১৩ জুলাই ২০১৩।

৫. আশফাকুর রহমান। "নাসরীন বেগমের প্রদর্শনী : রঙ রূপের যুগলবন্দি"। *আজকের কাগজ* ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

৬. ওয়াজেদ আহসান খোকন। "শওকাত-উজ্জামানের চিত্র প্রদর্শনী চলছে"। *দৈনিক ইনকিলাব* ২২ মে ২০০০।

৭. খুরশীদ আলম। "আব্দুস সাত্তারের সাম্প্রতিক চিত্রকর্ম"। *বাংলার বাণী* ৩০ জুন ১৯৯৫

৮. গাজী রফিক। "নৈঃশব্দের শিল্পী"। *দৈনিক সংবাদ* ২৭ এপ্রিল ২০০১।

৯. গোলাম আম্বিয়া। "প্রাচ্য চিত্রকলার নবীন রূপকার আব্দুল আযীয"। *সাপ্তাহিক রোববার* ২৩ জুন ২০০২।

১০. জাহিদ মুস্তফা। "অপরূপ রূপকথা"। *প্রথম আলো* ৬ এপ্রিল ২০০৭।

১১. ————। "প্রাচ্যকলার নন্দিতরূপ"। *দৈনিক সংবাদ* ১৯ জুন ২০০৩।

১২. ————। "স্বচ্ছ বর্ণ রেখার খেলায় বর্ণিকাভঙ্গ"। সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংবাদ* ২৮ আগস্ট ২০১৩।

১৩. তারিক রহমান। "বর্ণিকাভঙ্গ : নিরীক্ষাধর্মী চিত্র প্রদর্শনী"। *যুগান্তর* ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

১৪. *দৈনিক দেশ* ৩ মার্চ ১৯৮৪।

১৫. মনিরুজ্জামান পলাশ। "শিল্পকলার প্রদর্শনী আযীযের রমণী হৃদয়"। *দৈনিক ডেসটিনি* ২৫ জুলাই ২০০৮।

১৬. মুহম্মদ আবদুল বাতেন। "শিল্পী আবদুল আজিজের ওরিয়েন্টাল আর্ট"। *নয়া দিগন্ত* ৪ জুলাই ২০০৮।

১৭. রনি আহমেদ। "শওকাতুজ্জামানের প্রকৃতিচিত্র"। *প্রথম আলো* ২৬ মে ২০০০।

১৮. শাশ্বতী মজুমদার। "চেতনার শিল্প"। *প্রথম আলো* ২২ জুলাই ২০১১, কলাম ৫-৭, পৃ. ৫।

১৯. "শিল্পী শওকাতুজ্জামান : রোমান্টিকতার ভিন্ন ভাষা"। *ছুটি*। পৃ. ৬২ (পত্রিকাটির তারিখ সংগৃহীত হয়নি)।

Dhaka University Institutional Repository

২০. "শওকাতুজ্জামানের চিত্র প্রদর্শনী : সৌন্দর্য ও সংকট"। দ্র. বাংলার বাণী সাময়িকী। *দৈনিক বাংলার বাণী* ১১ আশ্বিন ১৩৯৮ (১৯৯১ খ্রি.)।

২১. শওকাতুজ্জামান। "শিল্পী আযীযের জলরং প্রদর্শনী"। *দৈনিক সংবাদ* ৭ জুলাই ২০১২ [রমনী বানান রমণী করা হয়েছে]।

২২. সঞ্জয় দে রিপন। "প্রকৃতির যোজনকলা"। *দৈনিক সংবাদ* ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৫।

২৩. সিলভিয়া নাজনীন। "প্রাচ্যের ক্যাকটাস"। *প্রথম আলো*, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

২৪. ————। "প্রাচ্যদেশীয় শিকড়ের সন্ধানে"। সাহিত্য সাময়িকী, *প্রথম আলো* ১৯ মার্চ ২০১০

২৫. মইনুদ্দীন খালেদ। "গুপুর ছবি : মনপবনের রং"। *যুগান্তর* ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

২৬. Abu Taher. "Sattar : A Stalwort Printmaker". *Observer* 30 June 1995.

২৭. Shamim akhter. "Passing Beauty". *The weekly MAG*, 1Ñ7April 2006, Pakistan Lahoure, 2006.

২৮. Rafique Islam. "An Oriental Dimension". *The Financial Express* 28th April, P. 11.

২৯. Zahangir Alom. "An artist par excellence : Nasreen Begum's Love affair with Oriental Art and beyond". Arts & Entertainment. *The Daily Star* 9th November 2013. [1st Part of the article was published on 8th November 2013].

৩০. Courier Correspondent. "Tajul's Fondness for abstraction and organic forms : Solo tapestry exhibition at Shilpangan". *Dhaka Courier* 14–20 January 2011. Vol. 27, Issue 26.

৩১. Ershad Kamal. "Malay Bala's Oniental Expression". Culture, *the Daily Star* 11th September 2007.

ঙ) অভিসর্ন্দভ

১. আব্দুল আযীয। *আমার শিল্পকর্ম ও একাডেমিক অভিজ্ঞতা* (এম.এফ.এ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ)। শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৬–৯৭। প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. কান্তিদেব অধিকারী। *আমার ছবি* (এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্ব পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ)। শিক্ষাবর্ষ ২০০২–০৩। প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. গোপাল চন্দ্র সাহা। *আমার শিল্পকর্ম* (এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্ব অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যক্রম অভিসন্দর্ভ)। শিক্ষাবর্ষ ২০০৭–০৮। প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢা. বি.।

৪. মলয় বালা। *আমার শিল্পচিন্তা* (এম.এফ.এ শিক্ষাবর্ষের অভিসন্দর্ভ)। শিক্ষাবর্ষ, ২০০০–২০০১। প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. সুব্রত পাল। *নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা*। এম.এফ.এ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ। শিক্ষাবর্ষ : ১৯৯৫–৯৬। অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. সুমন কুমার বৈদ্য। *আমার শিল্পকর্ম ও শিল্পভাবনা* (এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্ব পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ)। শিক্ষাবর্ষ ২০০৮–০৯। প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢ. বি.।

৭. *Mural Painting Techniques In India*. A Dissertation for M A. (Fine) mural painting 1977. Faculty of Fine Arts, M S University of Baroda.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচি

প্রথম অধ্যায়
অবিভক্ত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ : অবিভক্ত বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক পেক্ষাপট

চিত্র বিবরণ পৃষ্ঠা

০১ : কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে শ্বেতবর্ণে আঁকা সর্পাহারী ময়ূর, আঃ ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১০
০২ : পাল যুগের তালপাতার পুথির একটি পাতা ১১
০৩ : বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, অজন্তা, প্রথম গুহা ১১
০৪ : বোধিসত্ত্ব সমীপে মহাজনক অজন্তা, প্রথম গুহা ১১
০৫ : পাল পুথিচিত্র (মহাশ্রী তারা-নেপাল), সময়কাল : ১০৭৩ খ্রি. ১২
০৬ : আলেকজান্ডার কর্তৃক দারা-কন্যা রোশানকে গ্রহণ, নিজামী রচিত ‘ইস্কান্দারনামা’র পাণ্ডুলিপি-চিত্র ১৫৩১–৩২ খ্রি. ১৩
০৭ : হস্তি ও অশ্বপৃষ্ঠে শিকার, মোগল চিত্রকলা, আনুঃ ১৫৯০ .... ১৪
০৮ : মধুমাধবী রাগিণী, মুর্শিদাবাদ, আনুঃ ১৭৬০ খ্রি. ১৫
০৯ : মধ্যমাদি রাগিণী, প্রাদেশিক, মুর্শিদাবাদ, আনুঃ ১৭৬০ খ্রি. ১৫
১০ : অজ্ঞাতনামা শিল্পী নবদ্বীপে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তন, আনুঃ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ ১৬
১১ : শিবের বুকে কালী, কালীঘাট, পটচিত্র, ৪৭.৫ × ৩৬ সেমি, ১৮৮৯ .... ১৮
১২ : প্রেমিক দ্বারা আদৃত হচ্ছেন এক প্রেমিকা, কালীঘাট পটচিত্র, পেপার, ৪৭.৫ × ৩৬ সেমি, ১৮৮৯ .... ১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র বিবরণ পৃষ্ঠা

০১ : স্বপ্নপ্রয়াণ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ কবিতার চিত্রায়ণ, ১৯৯১) ২৭
০২ : চিত্রাঙ্গদা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাট্যকাব্যের চিত্রায়ণ) ২৮
০৩ : অভিসার, জলরং, ১৮৯৭ .... ৩০
০৪ : রাখালকৃষ্ণ—গোচারণ, জলরং, ২১.৫৯ × ১২.৭ সেমি, ১৮৯৭ .... ৩০
০৫ : মাঝিরূপে কৃষ্ণ—নৌ-বিহার, জলরং, ২১.৫৯ × ১২.৭ সেমি, ১৮৯৭ .... ৩১
০৬ : চাঁদের আলোয় নৃত্য—রাস, জলরং, ২০.৩২ × ১২.৭ সেমি, ১৮৯৭ .... ৩১
০৭ : বুদ্ধ ও সুজাতা, জলরং, ১৮.১ × ১২.৭ সেমি, ১৯০১ .... ৩৩
০৮: অন্তিম শয্যায় সাজাহান, তেলরং, ৩৫.৫৬ × ২৫.৪ সেমি, ১৯০২ .... ৩৪
০৯ : তাজের নির্মাণ, অস্বচ্ছ জলরং, ১৯০১ .... ৩৪
১০ : ভারতমাতা, জলরং, ২৬.৬৭ × ১৫.২৪ সেমি, ১৯০৫ .... ৩৬
১১ : রুবাইয়াৎ অব ওমর খৈয়াম, ভার্স-২, জলরং, ২৩.৫ × ১৬ সেমি, ১৯০৭–০৯ .... ৩৯
১২ : রুবাইয়াৎ অব ওমর খৈয়াম, ভার্স-৩৮, জলরং, ১৮ × ১৩.৫ সেমি, ১৯০৭–০৯ .... ৩৯
১৩ : কোনারকের পথে, তুলি ও কালি, ১৭.৭৮ × ১২.৭ সেমি, ১৯১১ .... ৪০
১৪ : কোনারকের পথে, তুলি ও কালি, ১৭.৭৮ × ১২.৭ সেমি, ১৯১১ .... ৪০
১৫ : রতি, ভালোবাসার দেবী, জলরং, ২২.৮৬ × ১৫.২৪ সেমি, ১৯১২ .... ৪১
১৬ : কামদেব, জলরং, ২৭.৯৪ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১২ .... ৪১
১৭ : প্রেমিক, জলরং, ২৭.৯৪ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১২ .... ৪১
১৮ : রাজা, জলরং, ২৬.৬৭ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১২ .... ৪১
১৯ : দার্জিলিঙ সিরিজ : কাঞ্চনজঙ্ঘা, জলরং, ২৫.৪ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১৯ .... ৪৪
২০ : রবীন্দ্রনাথ (প্রতিকৃতি), প্যাস্টেল, ৪১ × ৩৪ সেমি, ১৯৩০ .... ৪৪
২১ : শাহজাদপুর ল্যান্ডস্কেপ, জলরং, ৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭ .... ৪৫
২২ : শাহজাদপুর খাল, জলরং, ২৬.৬৭ × ২০.৩২ সেমি, ১৯২৭ .... ৪৫
২৩ : তালগাছি হাট, জলরং, ৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭ .... ৪৬
২৪ : উল্লাপাড়া স্টেশান, জলরং, ৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭ .... ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

২৫ : মোকাদম সাহেবের গোর, জলরং, ৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭ .... ৪৬
২৬ : শাহজাদপুর ব্রিজ, জলরং, ৩৬.৮৩ × ২৬.৬৭ সেমি, ১৯২৭ .... ৪৬
২৭ : মুখোশ, জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯ .... ৪৭
২৮ : কুমারসেনের অভিনয়ে আলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯ .... ৪৭
২৯ : মুখোশ, বিক্রমদেবের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯ .... ৪৭
৩০ : মুখোশ, জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯২৯ .... ৪৭
৩১ : নূর-অল-দিনের বিবাহ, জলরং, ২৬.৬৭ × ২৪.১৩ সেমি, ১৯৩০ .... ৪৯
৩২ : বণিক এবং চার ভ্রমণসঙ্গী, জলরং, ২৫.৪ × ২৪.১৫ সেমি, ১৯৩০ .... ৪৯
৩৩ : নাবিক সিন্দাবাদ, জলরং, ২৯.২১ × ২২.৮৬ সেমি, ১৯৩০ .... ৪৯
৩৪ : খুদ্দুর যাত্রার চিত্রায়ণ ৫২
৩৫ : খুদ্দুর যাত্রার চিত্রায়ণ ৫২
৩৬ : কুটুম-কাটাম ৫৩
৩৭ : কুটুম-কাটাম ৫৩
৩৮ : কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজ ৫৪
৩৯ : নেকড়ে বাঘ ও খেঁক শিয়ালের কথোপকথন, জলরং, ২৭.৯৪ × ২০.৩২ সেমি ৫৪
৪০ : কবি কঙ্কন চণ্ডী সিরিজ ৫৪
৪১ : নদী কবিতার অলংকরণ (মুদ্রিত গ্রন্থের পাতায়) ৬৪
৪২ : The Crescent Moon (১৩২০) গ্রন্থচিত্রণ, 'জগৎ পারাবারের তীরে' ৭১
৪৩ : Gitanjali & Fruit-Gathering (১৯১৮) গ্রন্থচিত্রণ 'গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি' ৭১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নন্দলাল বসু

চিত্র বিবরণ — পৃষ্ঠা

০১ : সহমরণের সতী, ওয়াশ ও টেম্পারা, ২৫ × ৩৫.১, সেমি, ১৯০৭ .... ৮৮
০২ : সতী, ওয়াশ ও টেম্পারা এবং স্বর্ণের ব্যবহার, ৩২.৪ × ২২.৭ সেমি, ১৯৪৩ (প্রথম অঙ্কন, ১৯০৭) ৮৮
০৩ : সতীর দেহত্যাগ, ওয়াশ, ২২.৮৬ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯০৯ .... ৮৮
০৪ : জতুগৃহদাহ, ওয়াশ, ২২.৭ × ৩১.৭৫ সেমি, ১৯১০ .... ৯১
০৫ : পার্থসারথী (পার্থের মুখ), ৭৮.৭৪ × ৫৩.৩৪ সেমি, ১৯১২ .... ৯১
০৬ : পদ্মিনী ও ভীমসিংহ, ওয়াশ, ১৭.৭৮ × ১২.৯৮ সেমি, ১৯০৯ .... ৯১
০৭ : বেতালপঞ্চবিংশতি, ২২.৮৬ × ২০.৩২ সেমি, ১৯০৮ .... ৯১
০৮ : রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' অলংকরণ, (যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও) ৯২
০৯ : রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' অলংকরণ, (হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ) ৯২
১০ : অহল্যা উদ্ধার, ওয়াশ, ২১.৫৯ × ১৬.৫১ সেমি, ১৯১০ .... ৯২
১১ : নৌকাবিহার, ওয়াশ ৫৩.৩৪ × ৩৮.১ সেমি, ১৯০৯ .... ৯২
১২ : স্কেচ : কুমারস্বামী ও নন্দলাল, ২৪ × ২৯ সেমি ৯৩
১৩ : ষষ্ঠীপূজা, ওয়াশ, ১৭.৭৮ × ১২.৭ সেমি, ১৯১১ .... ৯৪
১৪ : নন্দলাল অঙ্কিত রামায়ণী পট (হর ধনুভঙ্গের পরে সীতার রামচন্দ্রকে মাল্যদান) ৯৪
১৫ : নন্দলাল অঙ্কিত রামায়ণী পট (বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের তাড়কাবধে যাত্রা) ৯৪
১৬ : কাবুলিওয়ালা ও মিনি ৯৫
১৭ : The home (শৈশব সন্ধ্যা) ৯৫
১৮ : The Hero (বীরপুরুষ) ৯৫
১৯ : শিবের বিষপান, ওয়াশ, ২৫.৫ × ১৭.৭৮ সেমি, ১৯১৩ .... ৯৬
২০ : উমার তপস্যা, ওয়াশ, ১২.৭ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯১৩ .... ৯৬
২১ : এরফান মাতব্বর, স্কেচ, ১৯১৬ .... ৯৮
২২ : বৃষ্টিস্নাত কোনারক, ওয়াশ, ১৫০ × ৬৫ সেমি, ১৯১৭ .... ১০০
২৩ : Frontispiece ১০০
২৪ : Art thou abroad on this stormy night, (আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার) ১০০
২৫ : I asked nothing from thee (কুয়ার ধারে) ১০১
২৬ : When I bring you coloured toys (কেন মধুর) ১০১
২৭ : 'বাংলার পাখি' বইয়ের জন্য নন্দলাল অঙ্কিত স্কেচ ১০৪
২৮ : Floating a canoe, কালি তুলি, ৩৪ × ৮২.৬ সেমি, ১৯৪৭ .... ১০৬
২৯ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা গ্রন্থের অলংকরণ ১০৭
৩০ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা গ্রন্থের অলংকরণ ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

৩১ : নটীর পূজা, সিল্কের ওপর জলরঙে টেম্পারা, ১৯২৭ .... ১০৭
৩২ : ডান্ডিমার্চ, লিনোকাট, ৩৪.৯ × ২২.৫ সেমি, ১৯৩০ .... ১০৯
৩৩ : সহজ পাঠ প্রথম ভাগের অলংকরণ ১০৯
৩৪ : সহজ পাঠ প্রথম ভাগের অলংকরণ ১০৯
৩৫ : সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের অলংকরণ ১১০
৩৬ : কন্যা বিদায় ১১১
৩৭ : হরিপুরা চিত্র (ঢাকি), টেম্পারা, ৬৩.৮ × ৫৯.৭ সেমি, ১৯৩৭ .... ১১৪
৩৮ : হরিপুরা চিত্র (শিকারী), টেম্পারা ৬৩.৫× ৫৯.৪ সেমি, ১৯৩৭ .... ১১৪
৩৯ : হরিপুরা চিত্র (বুল হ্যান্ডেলার), টেম্পারা ৬৩.৪ × ৫৯.৭ সেমি, ১৯৩৭ .... ১১৪
৪০ : হরিপুরা চিত্র (মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে), টেম্পারা, ৬০.৩ × ৫৬.২ সেমি, ১৯৩৮ .... ১১৪
৪১ : ছড়ার ছবি (ছাগল), এচিং, ২০.৬ × ২৭ সেমি, ১৯৩৭ .... ১১৬
৪২ : অভিমন্যু বধ, মুরাল (কীর্তিমন্দির), ১৯৪৬ .... ১১৬
৪৩ : অন্নপূর্ণা, কাগজে টেম্পারা, ৪৩.৮ × ২৯.৮ সেমি, ১৯৪৩ .... ১১৭
৪৪ : তাক ধুমা ধুম বইয়ের জন্য ইলাস্ট্রেশন, ওয়াশ, ১৪.৬১ × ১১.৪৩ সেমি ১১৭
৪৫ : দার্জেলিং এবং কুয়াশা, টেম্পারা, ৬২.২ × ৩৪.৬ সেমি, ১৯৪৫ .... ১১৭
৪৬ : ভারতীয় সংবিধানের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ১১৮
৪৭ : নটীর পূজা, পলেস্তারে টেম্পারা, ১৯৪৬ .... ১১৯
৪৮ : কার্ড ড্রয়িং (মুরগি বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে), ৭.৬২ × ১০.১৬ সেমি, ১৯৫৪ .... ১২৬
৪৯ : সাঁওতাল নৃত্য : উমাকে আশীর্বাদ, লিথোগ্রাফ ১২৮
৫০ : আব্দুল গফ্‌ফর খান, লিনোকাট, ২৯.৮ × ১৮.৭ সেমি, ১৯৩৬ .... ১২৮
৫১ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, ৮.৮৯ × ১৩.৯৭ সেমি ১২৯
৫২ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, ৮.৮৯ × ১৩.৩৪ সেমি, ১৯১৭ .... ১২৯
৫৩ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, মিশ্র মাধ্যম, ১৩.৩৪ × ৮.৮৯ সেমি, ১৯৪৮ .... ১২৯
৫৪ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, জল রং, ৮.৮৯ × ১৩.৩৪ সেমি, ১৯৪৮ .... ১২৯
৫৫ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং, মিশ্র মাধ্যম, ১৩.৯৭ × ৮.৮৯ সেমি ১৩০
৫৬ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং ১৩০
৫৭ : পোস্টকার্ড চিত্র, ৮.৮৯ × ১৩.৯৭ সেমি, ১৯৪৩ .... ১৩০
৫৮ : পোস্টকার্ড ড্রয়িং (বেনারস), কালি তুলি, ১৯২৯ .... ১৩০
৫৯ : কোলাজ, ৮.৮৯ × ১৩.৯৭ সেমি, ১৯৫৯ .... ১৩১
৬০ : রঙিন কোলাজ, ১৫.২৪ × ১০.৮০, ১৯৩৪ .... ১৩১
৬১ : Sabari in Hes youth, টেম্পারা টাচ ওয়ার্ক, ১৯৪১ .... ১৩২
৬২ : New clouds, টেম্পারা টাচ ওয়ার্ক, ৪২.২৪ × ৬৯.৮৫, সেমি, ১৯৩৭ .... ১৩২
৬৩ : Alakananda , (on the way to Mayavati), টেম্পারা (টাচ ওয়ার্ক), ১৯৪২ .... ১৩২
৬৪ : 'শাপমোচন' অভিনয়ের জন্য শান্তিদেব ঘোষকে সাজাচ্ছেন নন্দলাল ১৩৩
৬৫ : দ্বারবর্তিনী, অজন্তা-গুহা খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক–খ্রিস্টীয় ১ম শতক ১৩৭
৬৬ : প্রসাধনরতা, উৎকীর্ণ পাষাণমূর্তি কোণার্ক–মন্দির, খ্রিস্টীয় ১১শ শতক ১৩৭
৬৭ : যক্ষিণী, উৎকীর্ণ পাষাণমূতি বুদ্ধগয়া, খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক–খ্রিস্টীয় ১ম শতক ১৩৭
৬৮ : জয়নুল আবেদিন : Shiaf of rice, কাগজের উপর কালি তুলি, ১২.৫ × ৭.৫ সেমি, ১৯৫১ .... ১৩৮
৬৯ : বোলপুরের পথে, টেম্পারা ১৪১
৭০ : শ্রীচৈতন্যের জন্ম, গ্রন্থাগারে জয়পুরী ফ্রেসকো ১৪১
৭১ : রাধার বিরহ, সিল্কের ওপর টেম্পারা, ৮২.৬ × ৪৯.৮ সেমি, ১৯৩৬ .... ১৪২
৭২ : বীণাবাদিনী, কাঠের ওপর টেম্পারা, ১৯২২ .... ১৪২
৭৩ : মায়াবতী আসাম, কালি ও পেপার, ৬৯.৯ × ৪২.২ সেমি, ১৯৪২ .... ১৪৩
৭৪ : নটী, ব্রোঞ্জ, ২৯.২ × ১৩.৭ সেমি, ১৯৪৩ .... ১৪৫
৭৫: নিবেদিতার 'মিথস' বইয়ের জন্য নন্দলালকৃত 'মথুরার কারাগারে সদ্যোজাত কৃষ্ণ' ১৫০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অন্যান্য শিল্পী

চিত্র বিবরণ — পৃষ্ঠা

০১ : অসিতকুমার হালদার, অজন্তার প্রতিলিপি ১৬২
০২: অসিতকুমার হালদার, অজন্তার প্রতিলিপি ১৬২
০৩ : অসিতকুমার হালদার, অজন্তার প্রতিলিপি ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

০৪ : শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের পাঠ নেয়ার দৃশ্য ১৬৩
০৫ : The Cresent Moon, গ্রন্থচিত্রণ, The Beginning (জন্মকথা) ১৬৩
০৬ : The Cresent Moon, গ্রন্থচিত্রণ, The Merchant (দুঃখহারী) ১৬৩
০৭ : When I go from hence (যাবার দিনে এই কথাটি) ১৬৪
০৮ : নিত্যানন্দ ও জগাই মাধাই, ফ্রেসকো ১৬৬
০৯ : সরাইখানা ১৬৬
১০ : ওমর খৈয়াম চিত্রমালার একটি ড্রয়িং, ২৬.৫ × ২০.৫ সেমি ১৬৬
১১ : শিরোনামহীন (The Procession), কাগজে জলরঙে ওয়াশ, ১২৯.৫ × ৩২.৭৭ সেমি, ১৯৫০ .... ১৬৭
১২ : শিরোনামহীন, জলরং, (graphit and gold on paper), ৪৫.৭ × ৩১.৭ সেমি, ১৯৫১–১৯৫২ .... ১৬৭
১৩ : শিরোনামহীন (মা ও শিশু), জলরং, (gouache and ink on cardboard), ৫০ × ৩৮.৬ সেমি, ১৯৫৫ .... ১৬৭
১৪ : লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন ১৭০
১৫ : The Cresent Moon গ্রন্থের, অলংকরণ (কাগজের নৌকা) ১৭১
১৬ : The Cresent Moon, গ্রন্থের অলংকরণ (আশীর্বাদ) ১৭১
১৭ : কার্তিকেয়, ২৪.৪ × ২৫.৭ সেমি, উড ব্লক প্রিন্ট, ১৯১০ .... ১৭২
১৮ : সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত প্রতিলিপি ১৭৩
১৯ : রাধারানী ও নরেন্দ্রদেব সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথের *কাব্য দীপালি* গ্রন্থের ২য় সংস্করণে, (১৯৩১)
সমরেন্দ্রনাথ 'আবির্ভাব' ১৭৩
২০ : শিরোনামহীন, এচিং, ২৪.১ × ১৪.৫ সেমি, ১৯২০ .... ১৭৪
২১ : বসন্ত (Spring), এচিং, ৩৯.৯ × ১৯.৫ সেমি, ১৯২০ .... ১৭৪
২২ : শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত নির্বাসিত যক্ষ, ১৯১৮ .... ১৭৬
২৩ : শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত জগদ্ধাত্রী ১৭৬
২৪ : নিবেদিতার মিথস বইয়ের জন্য অঙ্কিত 'রাধা ও কৃষ্ণ' ১৭৭
২৫ : বিচিত্রিতা গ্রন্থে মুদ্রিত, ক্ষিতীন্দ্রনাথের 'পুষ্পচয়িনী' ১৭৮
২৬ : যবন হরিদাস ১৭৮
২৭ : রাধিকা ১৭৮
২৮ : রাধাকৃষ্ণের মিলন, টেম্পারা ১৭৮
২৯ : রাধার তমাল বৃক্ষ আলিঙ্গন ১৭৮
৩০ : গণেশ-জনকজননী, আনুমানিক সময় : ১৯৩৫ .... ১৭৯
৩১ : আকাঙ্ক্ষা, ওয়াশ পদ্ধতির জলরং ও সোনা ব্যবহার, ৩৩.৫ × ১৪.৫ সেমি, ১৯২৫ .... ১৭৯
৩২ : সন্ন্যাসী হবার পর শ্রীচৈতন্যের মাতৃদর্শন, before মাউন্ড বোর্ডের ওপর জলরং, ৩৬.১ × ২৫.৪ সেমি, ১৯৫০.. ১৮০
৩৩ : Shri Chaitanoya bidding farewell to mother, leaving for Puri, মাউন্ড বোর্ডের ওপর জলরং
৩৯.৩ × ১৯.৬ সেমি, ১৯৫০ .... ১৮০
৩৪ : জয়দেব পদ্মাবতী ১৮১
৩৫ : গীত-গোবিন্দ, মাউন্ড বোর্ডে জলরঙে ওয়াশ, ৩৩ × ২৩.৪ সেমি, ১৯৫০ .... ১৮১
৩৬ : গীত-গোবিন্দ, জলরং (ওয়াশ) ১৮১
৩৭ : Vasudeva sarvabhouma nursing sri chattanya ১৮১
৩৮ : Here is they tootstout (যেথায় থাকে সবার অধর্ম) ১৮৩
৩৯ : On the store of the desolote river (অনাবশ্যক) ১৮৩
৪০ : বিটিশ মিউজিয়াম স্টাডি থেকে করা প্রথম রঙিন লিথোগ্রাফ ১৮৪
৪১ : আরশি ১৮৫
৪২ : দ্বারে ১৮৫
৪৩ : সাজ ১৮৫
৪৪ : সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র ১৮৬
৪৫ : স্কেচ ১৮৬
৪৬ : শিল্পীর মডেল ১৮৯
৪৭ : সুজাতা ১৮৯
৪৮ : শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাই ১৯১
৪৯ : শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাই ১৯১
৫০ : শিল্পী আবদুর রহমান, চুঘতাই, শিরোনামহীন, কাগজের ওপর জলরং ওয়াশ, ৬৫.৩ × ৪৭.৫ সেমি, ১৯৫০ ... ১৯১
৫১ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত, শ্রীচৈতন্য সিরিজচিত্র ১৯১
৫২ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজকণ্যা, ১৯২৩ .... ১৯১
৫৩ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'ছিপ দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য' ১৯২
৫৪ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জলরং, 'দুর্গাপূজার ভাসানের দৃশ্য' ১৯২
৫৫ : শিল্পী সুনয়নী দেবী, Milkmaid, গোয়াশ এবং জলরং, ৩৯.৯ × ৩২.৩ সেমি, ১৯২০ .... ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৫৬ : শিল্পী সারদাচরণ উকিল, শিরোনামহীন, জলরং ওয়াশ (কার্ডবোর্ডে পেস্ট করা), ৩৬ × ২৫.৯ সেমি, ১৯৩৯ ... ১৯৩
৫৭ : শিল্পী যামিনী রায়, কার্ডবোর্ডের ওপর টেম্পারা, ৬৯ × ৩৬.৮ সেমি, ১৯৫০ .... ১৯৩
৫৮ : শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রাসলীলা, জলরং, ৫১.৩ × ৬৬ সেমি, ১৯২০ .... ১৯৩
৫৯ : শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাউন্ড বোর্ডের ওপর ওয়াশ, ৩৮.৮ × ২২.১ সেমি, ১৯৩০ .... ১৯৩
৬০ : শিল্পী ধীরেন্দ্র দেববর্মণ, কুন্তীর দ্বারে, দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব, টেম্পারা, ৩৮.১ × ২৬.৭ সেমি, ১৯৩০ .... ১৯৪
৬১ : শিল্পী কালিপদ ঘোষাল, শিরোনামহীন, টেম্পারা, ৩৬ × ২৪.১ সেমি, ১৯৪৩ .... ১৯৪
৬২ : শিল্পী খগেন রায়, হরিণ ও নারী, ২৫৪.৫ × ১২১.৯ সেমি, ১৯৪০ .... ১৯৪
৬৩ : শিল্পী রামগোপাল ভিজাইভারগিয়া, জলরং ওয়াশ, ১০১.৬ × ৬৮.৬ সেমি, ১৯৪০ .... ১৯৫
৬৪ : শিল্পী রামগোপাল ভিজাইভারগিয়া, শিরোনামহীন, জলরং, ৯৯.৫ × ৬৬.৫ সেমি, ১৯৪০ .... ১৯৫
৬৫ : শিল্পী রামগোপাল ভিজাইভারগিয়া, শিরোনামহীন, ২২.৯ × ১৭.৮ সেমি, ১৯৪০ .... ১৯৫
৬৬ : শিল্পী রাধাচরণ বাগচী, শিরোনামহীন, (সোনার কাঠি-রুপার কাঠি), স্বর্ণালি রঙের কাগজে গোয়াশ
৩১.৮ × ৪৫ সেমি, ১৯৪০ .... ১৯৫
৬৭ : শিল্পী চিন্তামণি কর, শকুন্তলা, গোয়াশ এবং কালি, ৩২.৪ × ১৫.৬ সেমি, ১৯৩৬ .... ১৯৫
৬৮ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বীরভূম দৃশ্যচিত্র, সিলিং-এ এগ টেম্পারা, কলাভবন কমপ্লেক্স, শান্তিনিকেতন
২৫৩ × ৬০৬ সেমি, ১৯৪০ .... ১৯৬
৬৯ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বীরভূম দৃশ্যচিত্র, সিলিং-এ এগ টেম্পারা, কলাভবন কমপ্লেক্স, শান্তিনিকেতন
২৫৩ × ৬০৬ সেমি, ১৯৪০ .... ১৯৬
৭০ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বৃক্ষপ্রেমিক, টেম্পারা ৭৩.৭ × ৪০ সেমি, ১৯৩২ .... ১৯৬
৭১ : বিনোদবিহারী মুখোপাদ্যায়, নেপাল উৎসবের শোভাযাত্রা, দেয়ালে এগ টেম্পারা, বনস্থালি বিদ্যাপীঠ, ১৯৫০ .... ১৯৬
৭২ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, Hamsadoot, জলরং, ২৯ × ১৯.৪ সেমি ১৯৭
৭৩ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, শিরোনামহীন, জলরং, ৩০ × ১৯.৫ সেমি ১৯৭
৭৪ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, শিরোনামহীন, জলরং, ২৮.৭৫ × ১৯.৫ সেমি ১৯৭
৭৫ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, উপবৃষ্ট রমণী, কাপড়ের ওপর টেম্পার, ১৯ × ৬৪.৫, ১৯৩০ .... ১৯৭
৭৬ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, কলস নিয়ে রমণী, জলরং, ২৯ × ২০, ১৯৬২ .... ১৯৭
৭৭ : শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, শিরোনামহীন, জলরং, ৩৪.৫ × ২৫ .... ১৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট

চিত্র বিবরণ পৃষ্ঠা

০১ : শিল্পী আলম মুসওয়ায়ের চিত্রকর্মে ঈদ উপলক্ষে বেরোনো ঢাকাবাসীর ঐতিহ্যবাহী মিছিল ২১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্দুস সাত্তার

চিত্র বিবরণ পৃষ্ঠা

০১ : আব্দুস সাত্তারের তিন তলা কাঠের বাড়ি ২২৩
০২ : আব্দুস সাত্তারের বাড়ির কাঠের ও দেয়ালের নকশা ২২৩
০৩ : ছাত্রজীবনে অঙ্কিত জলরং, ওয়াশ পদ্ধতির কাজ ২২৫
০৪ : ছাত্রজীবনে অঙ্কিত ড্রয়িং, (ড্রয়িংটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল) ২২৫
০৫ : বার্ড, (ছাত্রজীবনে অঙ্কিত) ২২৫
০৬ : সাঁওতাল মেয়ে, লিথোগ্রাফ, ২৮ × ৪১ সেমি, ১৯৭৫ .... ২২৭
০৭ : মুখ, ১৯৭৪ .... ২২৭
০৮ : মিউজিশিয়ান, এচিং, ১৯৭৪ .... ২২৭
০৯ : মর্নিং বাথ, এচিং, ১৯৭৪ .... ২২৭
১০ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, লিথোগ্রাফ, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৭৪ .... ২২৭
১১ : যুগল, জলরং ও কালি-কলম, ৪৬ × ৭১ সেমি, ১৯৮২ .... ২২৭
১২ : ভারতের চুনারে স্টোন কার্ভিং, ক্যাম্পে করা ভাস্কর্য, শায়িতা রমণী, ১৯৭৪ .... ২২৮
১৩ : লোহার রডের ভাস্কর্য, রমণী, ১৯৭৪ .... ২২৮
১৪ : নারী, কাঠ, ৩.৮১ × ১৯.৫ × ৮২.৪৫ সেমি ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৫ : পাখি, কাঠ, ১৯৯৭ .... ২২৮
১৬ : ঝুলন্ত কম্পোজিশন, উড, মেটাল, কালার; উচ্চতা : ১৮০ সেমি, ১৯৮৩ .... ২২৮
১৭ : পোড়া কাঠ, কাঠখোদাই, ৫৩ × ৪৩ সেমি, ১৯৮১ .... ২২৯
১৮ : প্রিন্ট-এ, কাঠখোদাই, ৮৬০ × ৪৭৬ সেমি, ১৯৮৩ .... ২২৯
১৯ : গোলক, ৯৯ × ৫০ সেমি, কাঠখোদাই, ১৯৮০ .... ২২৯
২০ : বংশীবাদক, বাটিক চিত্র ২৩১
২১ : বংশীবাদক-২, বাটিক চিত্র ২৩১
২২ : সিটেট ওমেন, বাটিক চিত্র ২৩১
২৩ : রমণী, বাটিক চিত্র ২৩১
২৪ : যুগল, বাটিক চিত্র ২৩১
২৫: কাঠখোদাইয়ের লে-আউট ২৩২
২৬ : কাঠখোদাই ২৩২
২৭ : কাঠখোদাই ২৩২
২৮ : সম্পর্ক, কাঠখোদাই, ৫২ × ৮২ সেমি, ১৯৮৫ .... ২৩৩
২৯ : শিরোনামহীন ‘এ’, কাঠখোদাই, ও অফসেট, ৫২ × ৮২ সেমি, ১৯৯৬ .... ২৩৩
৩০ : সম্পর্ক, কাঠখোদাই, ১৯৮৫ .... ২৩৩
৩১ : বার্ড লাভার-১, অ্যাক্রেলিক, ১৫২ × ১২১ সেমি, ২০১২ .... ২৩৫
৩২ : বার্ড লাভার-২, অ্যাক্রেলিক, ১৫২ × ১২১ সেমি, ২০১২ .... ২৩৫
৩৩ : বার্ড লাভার-৩, অ্যাক্রেলিক ২৩৫
৩৪ : পাখি ও রমণী, কাঠখোদাই, ৬৭ × ৪৭ সেমি, ২০০৭ .... ২৩৬
৩৫ : ফুলসহ রমণী, কাঠখোদাই, ৫৯ × ৪৪ সেমি, ২০০৭ .... ২৩৬
৩৬ : উপবিষ্ট মহিলা, উডকাটে, তেলরং, ৬৭ × ৪৭ সেমি, ১৯৭৬ .... ২৩৬
৩৭ : প্রিপারেশন, উডকাট, ৭৫ × ৫০ সেমি, ১৯৮৪ .... ২৩৭
৩৮ : পাখিসহ রমণী, উডকাট, ৭৫ × ৪৫ সেমি, ১৯৮৫ .... ২৩৭
৩৯ : পেইন্টার, উডকাট, ৭৫ × ৪০ সেমি, ১৯৮৪ .... ২৩৭
৪০ : টেলিগ্রাম, অ্যাক্রেলিক, ২০০৪ .... ২৩৮
৪১ : ছেঁড়া ফুল, অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৯ .... ২৩৮
৪২ : দুই বান্ধবী, অ্যাক্রেলিক, ২১৩.৩৬ × ১২১.৯২ সেমি, ২০১২ .... ২৩৮
৪৩ : তিন কন্যা, অ্যাক্রেলিক, ১৫০ × ১২০ সেমি, ১৯৯৯ .... ২৩৮
৪৪: ফুল হাতে রমণী, অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৯ .... ২৩৮
৪৫ : পাঠিকা, অ্যাক্রেলিক, ৮৫ × ৮৫ সেমি, ২০১১ .... ২৩৯
৪৬ : তিন বোন, অ্যাক্রেলিক, ২১০ × ১২৫ সেমি, ২০১২ .... ২৩৯
৪৭ : আঙিনায়, অ্যাক্রেলিক, ১৮০ × ১২০ সেমি, ১৯৯৯ .... ২৩৯
৪৮ : পতিত বৃক্ষ, জলরং, ৭৪ × ৯৩ সেমি, ১৯৯৭ .... ২৩৯
৪৯ : প্রবেশ, জলরং, ৬৩ × ৯২ সেমি, ১৯৯৭ .... ২৩৯
৫০ : কবুতর হাতে রমণী, জলরং ২৪০
৫১ : যুগল-১, জলরং, ১১৫ × ৫৬ সেমি, ১৯৮৩ .... ২৪০
৫২ : লাভ, জলরং, ১১১.৫ × ৬১ সেমি, ১৯৮৩ .... ২৪০
৫৩ : উপজাতি সুন্দরী, জলরং, ৪২ × ২৭ সেমি, ১৯৯৭ .... ২৪১
৫৪ : উপজাতীয় মেয়ে, জলরং, ৫২ × ৩৭ সেমি, ১৯৯৭ .... ২৪১
৫৫ : উপজাতীয় মেয়ে, জলরং, ৫২ × ৩৭ সেমি, ১৯৯৭ .... ২৪১
৫৬ : মেয়ে, জলরং, ৭৯ × ৪১ সেমি, ২০০০ .... ২৪১
৫৭ : চোখ, জলরং, ৪০ × ৩০ সেমি, ১৯৯৮ .... ২৪১
৫৮ : ফুল-পাখি মেয়ে, জলরং, ২১০ × ১২০ সেমি, ১৯৮৯ .... ২৪১
৫৯ : প্রতিকৃতি, জলরং, ৭০ × ৫৬ সেমি, ১৯৮৯ .... ২৪২
৬০ : যুগল, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০০ .... ২৪২
৬১ : দুই মুখ, ৫৬ × ৬০ সেমি ২৪২
৬২ : তিন মুখ, উডকাট ২৪৩
৬৩ : তিন মুখ, মিশ্র (প্রিন্ট ও অ্যাক্রেলিক), ৪৭ × ৭০ সেমি ২৪৩
৬৪ : তিন মুখ, (প্যারিসের শাঁতিও শহরে প্রদর্শিত), ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ২০০৩ .... ২৪৩
৬৫ : তিন মুখ, মিশ্র, ১২১.৯২ × ৯১.৪৪ সেমি সেমি, ১৯৯৯ .... ২৪৩
৬৬ : রমণীর প্রতিকৃতি, জলরং, ৫৪ × ৩৮ সেমি ২৪৪
৬৭ : রাজকন্যা, ৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৩ .... ২৪৪
৬৮ : মুখ, জলরং, ৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৬ .... ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৬৯ : তিন মুখ, তেলরং ২৪৪
৭০ : পাঁচ মুখ, মিশ্র (উডকাট ও অ্যাক্রেলিক) ২৪৪
৭১ : দুই বোন, জলরং, ড্রয়িং ও পেপার পেস্টিং, ২০০৬ .... ২৪৫
৭২ : মুখগুলো, মিশ্র মাধ্যম, ৪৫ × ৮৬ সেমি, ১৯৮৩ .... ২৪৫
৭৩ : দুই মুখ, ঈদকার্ডে পেন ২৪৫
৭৪ : প্রতিকৃতি, অ্যাক্রেলিক, ৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৬ .... ২৪৫
৭৫ : প্রতিকৃতি, অ্যাক্রেলিক, ৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০৬ .... ২৪৫
৭৬ : পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-১, অ্যাক্রেলিক, ১৮ × ৬১ সেমি ২৪৬
৭৭ : পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-২, মিশ্র মাধ্যম, ২৭ × ১৯ সেমি ২৪৬
৭৮ : ছায়া (Shadew), কালি, কলম ও কোলাজ, ৭১.১২ × ৫৫.৮৮ সেমি, ১৯৭৮ .... ২৪৭
৭৯ : প্রসাধন (Toilet), কালি ও কলম, ৭১.১২ × ৫৫.৮৮ সেমি, ১৯৭৮ .... ২৪৭
৮০ : কৃষক (Farmer), কালি ও কলম, ৭১.১২ × ৫৫.৮৮ সেমি, ১৯৭৮ .... ২৪৭
৮১ : স্যাঁতসেঁতে দেয়াল (Damp Wall), জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৮৫ .... ২৪৭
৮২ : স্যাঁতসেঁতে দেয়াল (Damp Wall), জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি ২৪৭
৮৩ : ফুল, জলরং, ১৬ × ৪ সেমি, ২০০২ .... ২৪৭
৮৪ : ফিগার কম্পোজশন, তেলরং, ১১৬.৮৪ × ১৩২.০৮ সেমি, ১৯৮১ .... ২৪৮
৮৫ : ফিগার কম্পোজশন-২, তেলরং, ১০৪.১৪ × ১১১.৭৬ সেমি, ১৯৮১ .... ২৪৮
৮৬ : পদ্ম, অ্যাক্রেলিক ২৪৯
৮৭ : ফুল, কাঠখোদাই ২৪৯
৮৮ : ফুলদানি, অ্যাক্রেলিক ২৪৯
৮৯ : হৃদয়, তেলরং, ৫৬ × ৭২ সেমি, ১৯৯৩ .... ২৪৯
৯০: তিন ফর্ম, তেলরং, ৫৬ × ৭২ সেমি, ১৯৯৩ .... ২৪৯
৯১ : চার মহিলা, মিশ্র, ৬৭ × ১৯০ সেমি, ১৯৯৭ .... ২৫০
৯২ : বৃক্ষপাশে রমণী ২৫০
৯৩ : গোলাপসহ ছাপচিত্র, কাঠখোদাই, ৮৬ × ৫২ সেমি, ১৯৯৮ .... ২৫০
৯৪ : সাদা গোলাপসহ প্রিন্ট, কাঠখোদাই, ৫৫ × ৬৫ সেমি, ১৯৯৮ .... ২৫০
৯৫ : ক্যালিগ্রাফি (ক্ষ ও ঙ) ২৫১
৯৬ : ক্যালিগ্রাফি, ৫৬ × ৭০ সেমি ২৫১
৯৭ : পোড়া কাঠ, উডকাট, ৬১ × ৫২ সেমি, ১৯৮২ .... ২৫১
৯৮ : পোড়া কাঠ, উডকাট, ৫২ × ৫২ সেমি, ১৯৮২ .... ২৫১
৯৯ : স্বাধীনতার মূল্য, ৭৬ × ৬১ সেমি, ২০০৯ .... ২৫২
১০০ : শিরোনামহীন (Untitled), তেলরং, ১৮২.৮৮ × ৯১.৪৪ সেমি, ১৯৮৮ .... ২৫২
১০১ : Pratt's Leaf, লিথোগ্রাফ, ৫৫.৮৮ × ৭৬.২ সেমি, ১৯৮৬ .... ২৫২
১০২ : নতুন ও পুরাতন ঢাকা, জলরং, ৩৮ × ৫৮ সেমি, ২০০৯ .... ২৫৩
১০৩ : Life of Pavement, জলরং, ৩৮ × ৫৮ সেমি, ২০০৯ .... ২৫৩
১০৪ : কাঠখোদাইয়ের জন্য, লে-আউট ২৫৪
১০৫ : কাঠখোদাই ও পেইন্টিংয়ের লে-আউট ২৫৪
১০৬ : প্রিন্ট ও পেইন্টিংয়ের লে-আউট ২৫৪
১০৭ : প্রিন্ট এবং পেইন্টিংয়ের লে-আউট ২৫৪
১০৮: কাঠখোদাইয়ের লে-আউট ২৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রফিক আহমেদ

চিত্র বিবরণ — পৃষ্ঠা

০১ : শেফালী ঝরা ফুল (পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি), জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৩ .... ২৭৮
০২ : লেডি উইথ ফ্লাওয়ার তেলরং, ১২১ × ৯১ সেমি, ১৯৭৮ .... ২৭৮
০৩ : ওয়েটিং-১, জলরং, ৫৫ × ৩৪ সেমি, ১৯৭৯ .... ২৭৯
০৪ : ওয়েটিং-২, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৯ .... ২৭৯
০৫ : খোঁপায় ফুল তোলা, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৮ .... ২৭৯
০৬ : শকুন্তলার গল্প, সিল্কের ওপর ওয়াটার কালার টেম্পারা, ৯১ × ৯১ সেমি, ১৯৭৫ .... ২৮১
০৭ : স্টোরি অফ শকুন্তলা, মুরাল পেইন্টিং সিল্ক, ৬০ × ১৫০ সেমি, ১৯৭৫ .... ২৮১
০৮ : রিং বদল হার্ডবোর্ডে টেম্পারা, ১২১ × ১২১ সেমি, ১৯৭৭ .... ২৮১

Dhaka University Institutional Repository

০৯ : ল্যান্ডস্কেপ, এগ টেম্পারা, ৯১ × ১৫২ সেমি, ১৯৭৫ .... ২৮১
১০ : ল্যান্ডস্কেপ, জয়পুরী ফ্রেসকো, ৩০ × ৯১ সেমি, ১৯৭৪ .... ২৮২
১১ : স্কেচ, খাগ কলম ও কালি ২৮২
১২ : ইয়াং লালন জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি, ১৯৮৬ .... ২৮৩
১৩ : Story of Cowboy, জলরং ৩৭ × ২৮ সেমি, ১৯৯৯ .... ২৮৩
১৪ : Dream of Fisherman, টেম্পারা, ৫৬ × ৩৭ সেমি, ২০০১ .... ২৮৩
১৫ : King and Queen, জলরং, ২৮ × ১৫ সেমি, ২০০৩ .... ২৮৪
১৬ : Summer Land, জলরং, ৩৭ × ২৮ সেমি, ২০০২ .... ২৮৪
১৭ : Life of Bengal, জলরং, ৩৭ × ২৮ সেমি, ১৯৯৮ .... ২৮৪
১৮ : বাংলার বাউল, ক্যানভাসে জলরং, ৮১ × ৮১ সেমি, ২০১৩ .... ২৮৫
১৯ : লাভার, ক্যানভাসে জলরং, ৮১ × ৮১ সেমি, ২০১৩ .... ২৮৫
২০ : লেডি উইথ বার্ড, ক্যানভাসে জলরং ৮১ × ৮১, সেমি, ২০১৩ .... ২৮৫
২১ : Fisherman with Lover, জলরং ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০০৪ .... ২৮৬
২২ : নতুন জীবন, জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০০৪ .... ২৮৬
২৩ : দুই বন্ধু, কাগজে জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০০৩ .... ২৮৬
২৪ : শিরোনামহীন, জলরং, ২৩ × ২৩ সেমি, ২০০৩ .... ২৮৭
২৫ : জ্যোৎস্না রাত, ক্যানভাসে জলরং, ২৩ × ২৩ সেমি, ২০০০ .... ২৮৭
২৬ : শিরোনামহীন, ২৩ × ২৩ সেমি ২৮৭
২৭ : ক্যানভাসে সুতার কাজ (অসমাপ্ত), মিশ্র মাধ্যমের জন্য প্রস্তুত, ২৩ × ২৩ সেমি ২৮৭
২৮ : লেডি উইথ জার, ক্যানভাসে, মিশ্র মাধ্যম (সুতার কাজ), ২৩ × ২৩ সেমি ২৮৭
২৯ : রিভারসাইড, ক্যানভাসে মিশ্র মাধ্যম (সুতার কাজ), ২৩ × ২৩ সেমি ২৮৭
৩০ : মুরাল (মোজাইক পেইন্টিং), ১৫২ × ৩৩৫ সেমি, ১৯৭৯ .... ২৮৮
৩১ : ১৯৮৫ সালে অঙ্কিত মোজাইক পেইন্টিংয়ের লে-আউট ২৮৯
৩২ : বিজয় উল্লাস (মুরাল পেইন্টিংয়ের জন্য লে-আউট), ৩০ × ১২০ সেমি, ১৯৮৫, চিত্রটি শিল্পকলা একাডেমিতে *বিজয় দিবস, চারুকলা প্রদর্শনী* ১৯৮৭-তে প্রদর্শিত হয় ২৮৯
৩৩ : বাংলাদেশের জীবনকাহিনি, জলরং (মিশ্র মাধ্যমে মুরাল করার জন্য), ২০ × ৫০ সেমি ২৮৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শওকাতুজ্জামান

চিত্র বিবরণ — পৃষ্ঠা

০১ : Child Hood Memory, Acrylic on Canvas ২৯৪
০২ : Child Hood Memory, Acrylic on Canvas ২৯৪
০৩ : ছাত্রজীবনে অঙ্কিত মুরাল চিত্র ২৯৭
০৪ : মিউজিশিয়ান, সিল্কের ওপর টেম্পারা ২৯৮
০৫ : বীরভূমের ভূ-দৃশ্য, টেম্পারা ২৯৮
০৬ : ভালোবাসা-১, ওয়াশ টেম্পারা ২৯৯
০৭ : প্রসাধন-১, ওয়াশ টেম্পারা ২৯৯
০৮ : Expecting, (১৯৯৯ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে) ৩০০
০৯ : শিরনামহীন, (১৯৯৯ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে) ৩০০
১০ : শিরনামহীন, (১৯৯৯ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে) ৩০০
১১ : Afinity, ক্যানভাসে টেম্পারা, ৬১ × ৬১ সেমি ৩০০
১২ : Attack, অ্যাক্রেলিক, ৬১ × ৬১ সেমি, ২০০১ .... ৩০২
১৩ : Woman-2, অ্যাক্রেলিক ৩০২
১৪ : Woman-3, অ্যাক্রেলিক ৩০২
১৫ : Woman-1, অ্যাক্রেলিক ৩০২
১৬ : Waiting, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৩০২
১৭ : The Red Bird, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৩০৩
১৮ : Convergent, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৩০৩
১৯ : শিরোনামহীন (ফড়িং) ৩০৩
২০ : শিরোনামহীন (ফড়িং) ৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

২১ : শিরোনামহীন (ফড়িং) ৩০৩
২২ : Birth of a Nation, বোর্ডের ওপর অ্যাক্রেলিক ৩০৩
২৩ : শিরোনামহীন, অ্যাক্রেলিক, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩০৪
২৪ : শিরোনামহীন, অ্যাক্রেলিক, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩০৪
২৫ : শিরোনামহীন, অ্যাক্রেলিক, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩০৪
২৬ : বিশ্রাম, অ্যাক্রেলিক ৩০৪
২৭ : বিশ্রাম, অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৭ .... ৩০৪
২৮ : শিরোনামহীন ৩০৫
২৯ : শিরোনামহীন ৩০৫
৩০ : শিরোনামহীন ৩০৫
৩১ : শিরোনামহীন ৩০৫
৩২ : শিরোনামহীন, অ্যাক্রেলিক, ৭৬ × ৭৬ সেমি ৩০৫
৩৩ : শিরোনামহীন, পেন ও প্যাস্টেল ৩০৫
৩৪ : শিরোনামহীন ৩০৫
৩৫ : শিরোনামহীন, গ্লাস পেইন্টিং ৩০৬
৩৬ : শিরোনামহীন, গ্লাস পেইন্টিং ৩০৬
৩৭ : শিরোনামহীন ৩০৬
৩৮ : শিরোনামহীন ৩০৬
৩৯ : শিরোনামহীন ৩০৬
৪০ : সকাল, ১৯৯৭ .... ৩০৬
৪১ : দুপুর, ১৯৯৭ .... ৩০৬
৪২ : বিকেল, ১৯৯৭ .... ৩০৬
৪৩ : শিরোনামহীন (নিসর্গ) ৩০৭
৪৪ : শিরোনামহীন (নিসর্গ) ৩০৭
৪৫ : জড় জীবন, টেম্পারা ৩৩.০২ × ৩৩.০২ সেমি, ২০০৩ .... ৩০৭
৪৬ : Carb, টেম্পারা ৩৩.০২ × ৩৩.০২ সেমি, ২০০৩ .... ৩০৭
৪৭ : ফুলসহ রমণী, মিশ্র মাধ্যম, ৬০ × ৬০ সেমি, ১৯৯৭ .... ৩০৭
৪৮ : শান্তির প্রতীক, তেলরং ৩০৭
৪৯ : বাউল, ২৯ × ২৩ সেমি, ১৯৮৫ .... ৩০৭
৫০ : শিরোনামহীন (পদ্ম) ৩০৮
৫১ : শিরোনামহীন (ফড়িং) ৩০৮
৫২ : শিরোনামহীন (মোরগ) ৩০৮
৫৩ : শিরোনামহীন (স্কেচ) ৩০৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নাসরীন বেগম

চিত্র বিবরণ পৃষ্ঠা

০১ : ক্র্যাফটস পেইন্টিং (ঝিনুকের ওপর এনামেল কালার), আনুমানিক সময় : ১৯৭৩–৭৭ .... ৩১৪
০২ : ক্র্যাফটস পেইন্টিং (ঝিনুকের ওপর এনামেল কালার), আনুমানিক সময় : ১৯৭৩–৭৭ .... ৩১৪
০৩ : ক্র্যাফটস পেইন্টিং (ঝিনুকের ওপর এনামেল কালার), আনুমানিক সময় : ১৯৭৩–৭৭ .... ৩১৪
০৪ : প্রাতঃকালের ঝাড়ুদার, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৭ .... ৩১৭
০৫ : চারুকলার ছোটো পন্ড, জলরং, ৩০ × ৪১ সেমি, ১৯৭৭ .... ৩১৭
০৬ : জলকে চলে, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৬ .... ৩১৭
০৭ : সূচিকর্ম, জলরং, ৪০ × ৩০ সেমি, ১৯৭৬ .... ৩১৮
০৮ : সুকুমারী, জলরং, ১৯৭৮, ১৯৭৯ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম, প্রদর্শনীতে জয়নুল আবেদিন, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ৩১৮
০৯ : বাউল, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৭৮ .... ৩১৮
১০ : প্রসাধনরত, বাটিক, ৯২ × ৬১ সেমি, ১৯৭৮ .... ৩১৯
১১ : মা ও শিশু, বাটিক, ৯২ × ৭৬ সেমি, ১৯৭৮ .... ৩১৯
১২ : জলকে চলে, বাটিক, ১০০ × ৭৬ সেমি, ১৯৭৮ .... ৩১৯
১৩ : উডকাট ৩২০
১৪ : দ্য ফেইস, লিথোগ্রাফ, ৪০.৬৪ × ৩১.৭৫ সেমি, ১৯৮৩ .... ৩২০

১৫ : স্লিপিং লেডিস, ড্রাই পয়েন্ট, ২৪.১৩ × ৩০.৪৮ সেমি, ১৯৮২ .... ৩২০
১৬ : দ্য ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড, ৬৩ × ৩৬ সেমি, ১৯৮৩ .... ৩২০
১৭ : ভাবনারত, জলরং, ১০.১৬ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯৮৮ .... ৩২২
১৮ : চিন্তারত, জলরং, ১০.১৬ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯৮৮ .... ৩২২
১৯ : প্রসাধনরত, জলরং, ১০.১৬ × ৬.৩৫ সেমি, ১৯৮৮ .... ৩২২
২০ : কলাবৌ, জলরং, ৬০ × ৩৮ সেমি, ১৯৮৯ .... ৩২৩
২১ : Lovely, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি, ১৯৯১ .... ৩২৩
২২ : উৎসবের পরে, (After Ceremony), জলরং, ৭১ × ৫৬ সেমি, ১৯৯২ .... ৩২৪
২৩ : নতুন জীবনের দরজা, (The Door of a New Life), জলরং, ১৯৯৩ .... ৩২৪
২৪ : মর্নিং (Morning), জলরং, ৩০ × ২৭ সেমি, ১৯৯২ .... ৩২৪
২৫ : চাঁদনি রাতে (Moonly Light), জলরং, ১৯৯২ .... ৩২৫
২৬ : প্রজাপতি (Batter Fly), জলরং, ৪০.৬৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩২৫
২৭ : ফুল (Flower), জলরং, ২৩.৭ × ১৪.৫ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩২৫
২৮ : চাঁদের আলোয়, কোলাজ ও জলরং, ২৫.২৪ × ১৬.৫১ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩২৫
২৯ : চাঁদনি রাতে, জলরং, ৫৪ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩২৫
৩০ : ক্যাকটাস-১, জলরং, ২৪.১৩ × ২৭.৯৪ সেমি, ১৯৯৫ .... ৩২৬
৩১ : ক্যাকটাস-এইচ, জলরং ২৪.১৩ × ২৭.৯৪ সেমি, ১৯৯৫ .... ৩২৬
৩২ : ফড়িং সিরিজচিত্র, জলরং, ২৫ × ১৩ সেমি, ১৯৯২ .... ৩২৭
৩৩ : ফড়িং সিরিজচিত্র, জলরং, ২৩.৭ × ১৪.৫ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩২৭
৩৪ : ফড়িং সিরিজচিত্র ৩২৭
৩৫ : স্মৃতি থেকে ‘ডি’ (from Memory ‘D’), জলরং, ২৮ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩২৭
৩৬ : অন্ধকার থেকে উৎসারিত আলো ‘এ’, (Light in the Darkness ‘A’), জলরং, ২৩.৭ × ১৪.৫ সেমি, ১৯৯৩ .. ৩২৭
৩৭ : প্রতিফলন (Reflaction), জলরং, ১৪ × ১৪ সেমি, ১৯৯২ .... ৩২৮
৩৮ : বৃষ্টির পরে (After Rain), ১৯৯৭ .... ৩২৮
৩৯ : ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিরূপ, জলরং, অ্যাক্রেলিক, ২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০ .... ৩২৯
৪০ : ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিরূপ, জলরং, অ্যাক্রেলিক, ২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০ .... ৩২৯
৪১ : ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিরূপ, জলরং, অ্যাক্রেলিক, ২৭ ×৩৭ সেমি, ২০০০ .... ৩২৯
৪২ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-১, (An Image of Sea Shoves-1), জলরং ও কালি, ২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০ .... ৩৩০
৪৩ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-২, (An Image of Sea Shoves-2), জলরং ও কালি, ২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০ .... ৩৩০
৪৪ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-৩, (An Image of Sea Shoves-3), জলরং ও কালি, ২৭ × ৩৭ সেমি, ২০০০ .... ৩৩০
৪৫ : কৃষ্ণচূড়া, জলরং, ৪১ × ৫৬ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩০
৪৬ : বসন্তে (ইন দ্য স্প্রিং), জলরং, ৫০ × ৩৭ সেমি, ২০০৩ .... ৩৩০
৪৭ : লাল জবা, জলরং, ৪০ × ২৮ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩০
৪৮ : অপেক্ষা, জলরং, ২৪ × ৪১ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩১
৪৯ : শহরের বন্যা (Flood in the City), জলরং, ৩০ × ৪২ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩১
৫০ : ক্রিয়েশন-২, জলরং, ৫০ × ৩৭ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩২
৫১ : ক্রিয়েশন-৩, জলরং, ৫০ × ৩৭ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩২
৫২ : ক্রিয়েশন-৪, জলরং, ৫০ × ৩৭ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩২
৫৩ : বাংলাদেশ-৮, জলরং, ৪০ × ২৮ সেমি, ২০০৫ .... ৩৩২
৫৪ : বাংলাদেশ-৩, জলরং, ৪৬ × ২৮ সেমি, ২০০৫ .... ৩৩২
৫৫ : বাংলাদেশ-৮, জলরং, ৫৮ × ৪৩ সেমি, ২০০৬ .... ৩৩২
৫৬ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য-২, (Image from sea shore-II), জলরং, ৩২ × ২৪ সেমি ৩৩৩
৫৭ : সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য- ৫, (Image from sea shore-V), জলরং, ৫৯ × ৪৬ সেমি, ২০০৫ .... ৩৩৩
৫৮ : ঐতিহ্যের দৃশ্য-২, (Image from Heritage-II), জলরং, ৪১ × ৩২ সেমি, ২০০৫ .... ৩৩৩
৫৯ : Yellow Cactus in Bloom-I, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৬১ × ৪৬ সেমি ২০১৩ .... ৩৩৪
৬০ : Feeling Blue Cactus-II, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ১১২ × ৭৬ সেমি, ২০১৩ .... ৩৩৪
৬১ : Red Cactus in Bloom-III, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৭৬ সেমি, ২০১৩ .... ৩৩৪
৬২ : হেরিটেজ-১, অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস, ১০৭ × ৬১ সেমি, ২০১২ .... ৩৩৫
৬৩ : আনরেভেল, অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস, ৬১ × ৬১ সেমি, ২০১২ .... ৩৩৫
৬৪ : ইম্প্রেশন, অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস, ১০৭ × ৬১ সেমি, ২০১২ .... ৩৩৫
৬৫ : বসন্তে, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৬ .... ৩৩৫
৬৬ : মডেল, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০৫ .... ৩৩৫
৬৭ : মডেল, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০০ .... ৩৩৫
৬৮ : রিয়ালিটি-১, ক্যানভাসে তেলরং, ৬১ × ৬১ সেমি, ২০০১ .... ৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৬৯ : রিয়ালিটি-২, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৪৫.৭২ × ৩৫.৫৬ সেমি, ২০০১ .... ৩৩৬
৭০ : রিয়ালিটি-৩, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০১ .... ৩৩৬
৭১ : বান্দরবান, জলরং, ৫৪ × ৩৮ সেমি, ২০০২ .... ৩৩৭
৭২ : বান্দরবান (শঙ্খ নদ), জলরং, ৫৫.৭২ × ৩৮ সেমি, ২০০২ .... ৩৩৭
৭৩ : ল্যান্ডস্কেপ, জলরং, ২৮ × ২৮ সেমি, ২০০৪ .... ৩৩৭
৭৪ : গ্রিন ওয়াটার, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩৩৭
৭৫ : গ্রিন ওয়াটার, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩৩৭
৭৬ : সিটিস্কেপ (মফস্বল), জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩৩৭
৭৭ : সমুদ্রের তলদেশ-১, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩৩৭
৭৮ : সমুদ্রের তলদেশ-২, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩৩৭
৭৯ : সমুদ্রের তলদেশ-৩, জলরং , ৫৫ × ৩৮ সেমি ৩৩৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অন্যান্য শিল্পী

চিত্র বিবরণ — পৃষ্ঠা

০১ : শফিকুল আমীন, জলকে চলে, জলরং, ১৯৬১ .... ৩৫১
০২ : শফিকুল আমীন, যাইয়াও হতে শিলঙ শহর, ১৯৩৭ .... ৩৫১
০৩ : শিল্পী রশিদ চৌধুরী, নবান্ন-২, তেলরং, ৯০ × ৪৫ সেমি, ১৯৮৮ .... ৩৫২
০৪ : শিল্পী রশিদ চৌধুরী, শ্যামাঙ্গিনী, গোয়াশ ৩৫২
০৫ : শিল্পী রশিদ চৌধুরী, ক্যালিগ্রাফি-৩ গোয়াশ, ৭৫ × ৫০ সেমি, ১৯৮৫ .... ৩৫২
০৬ : ড্রয়িং, ১৯.০৫ × ১১.৪৩ সেমি ৩৫৩
০৭ : রাতে গানের আসর, জলরং, ৪৭ × ৬৬ সেমি, ১৯৫১ .... ৩৫৩
০৮ : ফুল ও পাখি, জলরং, ৯০ × ৫৪ সেমি, ১৯৮০ .... ৩৫৩
০৯ : ভানু, জলরং, ৬৫ × ৫৬ সেমি, ১৯৭০ .... ৩৫৩

শিল্পী তাজুল ইসলাম

১০ : কন্যা, জলরং, ৮৫ × ৬০ সেমি, ১৯৯৮ .... ৩৫৩
১১ : Flaying Bird, ট্যাপেস্ট্রি, ২০১০ .... ৩৫৭
১২ : গাংচিল, ট্যাপেস্ট্রি, ৪৫.৭২ × ১২১.৯২ সেমি, ১৯৮৮ .... ৩৫৭
১৩ : Part of Orchidg, ট্যাপেস্ট্রি, ৭৫ × ৭৫ সেমি, ২০০৯ .... ৩৫৮
১৪ : Untitled-5, ট্যাপেস্ট্রি, ২০০৭ .... ৩৫৮
১৫ : ক্যালিগ্রাফি (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম), ৭৬.২ × ১৫২.৪ সেমি, ২০০৯ .... ৩৫৮
১৬ : ক্যালিগ্রাফি, ট্যাপেস্ট্রি, ৬৫ × ৭৫ সেমি, ২০০৫ .... ৩৫৯
১৭ : ক্যালিগ্রাফি, ট্যাপেস্ট্রি, ৭৫ × ৫৭ সেমি, ২০০৭ .... ৩৫৯
১৮ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি, ১৫০ × ৯০ সেমি, ২০০৪ .... ৩৫৯
১৯ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি, ৯০ × ৭৫ সেমি, ২০০৯ .... ৩৫৯
২০ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি, ৭৫ × ৬০ সেমি, ২০০৪ .... ৩৫৯
২১ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি, ৯০ × ১৮০ সেমি, ২০০৮ .... ৩৬০
২২ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি, ২৭৯.৪ ×৭৬.২ সেমি ৩৬০
২৩ : Composition of forms colour, ট্যাপেস্ট্রি, ১৫০ × ১০০ সেমি, ১৯৮৮ .... ৩৬০

শিল্পী মিজানুর রহমান ফকির

২৪ : গাছের গুঁড়ি, জলরং, ৩৫ × ৫৫ সেমি, ১৯৯৪ সালে বার্ষিক শিল্পকর্ম, প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩৬২
২৫ : ফুল, জলরং, ১৯৯৫ সালে বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩৬২
২৬ : কাঠের কাজ, জলরং, ৫৫ × ৩৫ সেমি, ১৯৯৫ .... ৩৬৩
২৭ : কাঁথা সেলাই, জলরং, ৫৫ × ৩৫ সেমি, ১৯৯৫ .... ৩৬৩
২৮ : মোগল মিনিয়েচারের আদলে চিত্র ৩৬৪
২৯ : দম্পতি, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৬৫
৩০ : মা ও শিশু, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৬৫
৩১ : নারী, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৬৫
৩২ : প্রকৃতি-৬, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৩ : প্রকৃতি, জলরং ৩৬৫
৩৪ : কাঁথা ৩৬৬
৩৫ : পটুয়া ৩৬৬
৩৬ : শঙ্খচিল ৩৬৬
৩৭ : কাঁথা সেলাই, ক্যালেন্ডারের চিত্র ৩৬৬
৩৮ : সোলার কাজ, ক্যালেন্ডারের ৩৬৬
৩৯ : পটুয়া, ক্যালেন্ডারের চিত্র ৩৬৬

শিল্পী গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী

৪০ : মীরা বাঈ, তুলি ও কালি, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৭০
৪১ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, তুলি ও কালি, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০০ .... ৩৭০
৪২ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, টেম্পারা, ৬০ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৭০
৪৩ : শিরোনামহীন, (মা ও ছেলে) ৩৭০
৪৪ : ফেসেস, টেম্পারা, ৪৩ × ৫৫ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৭০
৪৫ : ফোক মোটিভ অব বেঙ্গল, টেম্পারা, ৭৬ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৭০
৪৬ : দুই সখী, জলরং (ওয়াশ), ৫০ × ৭৬ সেমি, ২০০০ .... ৩৭২
৪৭ : ময়ূরী, মিশ্র মাধ্যম, ৬০ × ৬০ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৭২
৪৮ : সুজাতা, মিশ্র মাধ্যম, ৫৫ × ৪৩ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৭২
৪৯ : ড্রয়িং-১৫০ .... ৩৭৩
৫০ : ড্রয়িং-২৫৩ .... ৩৭৩
৫১ : রেখার মায়া ৪৩, মিশ্র মাধ্যম ৩৭৩
৫২ : রেখার মায়া ৪৪, মিশ্র মাধ্যম ৩৭৩
৫৩ : রেখার মায়া ৪৫, মিশ্র মাধ্যম ৩৭৩
৫৪ : রেখার মায়া-৬৩, চারকোল, ৯১ × ৯১ সেমি, ২০১৩ .... ৩৭৪
৫৫ : নারী, জলরং, ৫০ × ৩৮ সেমি, ২০১২ .... ৩৭৪

শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী

৫৬ : ল্যান্ডস্কেপ-খুলনা, জলরং, ৩৮ × ৫৫ সেমি, ১৯৮৮, ১৮ ভাদ্র ১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.) ৩৭৬
৫৭ : নড়াইল-শীতের সকাল, জলরং, ৩৮ × ৫৫ সেমি, ১৯৯০, ১৭ মাঘ ১৩৯৮ (১৯৯১ খ্রি.) ৩৭৬
৫৮ : ছিন্নমূল মানুষ-১, (খুলনা রেলস্টেশন), জলরঙের সাথে পেনসিল, ৩৮ × ২৮ সেমি, আনুমানিক সময় ১৯৮৭–৯০ .... ৩৭৭
৫৯ : ছিন্নমূল মানুষ-২, জলরঙের সাথে পেন, ২৮ × ৩৮ সেমি, ২২ আশ্বিন ১৩৯৭ .... ৩৭৭
৬০ : ছিন্নমূল মানুষ-৩, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, আনুমানিক সময় ১৯৮৭–৯০ .... ৩৭৭
৬১ : খুলনার রেলস্টেশনের দৈনন্দিন জীবন, কালি ও তুলি, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯০ .... ৩৭৭
৬২ : এস.এম সুলতানের প্রতিকৃতি ৩৭৭
৬৩ : স্কেচ খাতার ড্রয়িং ৩৭৭
৬৪ : শ্রমজীবী মানুষ–১, জলরং (ওয়াশ), ৩৮ × ৩০ সেমি, ১৯৯৪ .... ৩৭৯
৬৫ : শ্রমজীবী মানুষ-২, ওয়াশ টেম্পারা, ৩৮ × ৩০ সেমি, ১৯৯৪ .... ৩৭৯
৬৬ : শ্রমজীবী মানুষ-৩, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩৭৯
৬৭ : শ্রমজীবী মানুষ-২, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩৭৯
৬৮ : ফুটপাতের দোকান, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ১৯৯৬ .... ৩৭৯
৬৯ : ইনডোর, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯০ .... ৩৮০
৭০ : একাকিনী, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৫ .... ৩৮০
৭১ : স্নেহ, জলরং, ৫৪ × ৩৮ সেমি, ১৯৯৪ .... ৩৮০
৭২ : সে এখন ঢাকায়-১, ক্যানভাসে তেলরং, ১০১.৬ × ১২১.৯২ সেমি, ১৯৯৫ .... ৩৮১
৭৩ : সে এখন ঢাকায়-১, ক্যানভাসে তেলরং, ১০১.৬৮ × ১০৬.৬৮ সেমি, ১৯৯৫ .... ৩৮১
৭৪ : প্রকৃতি-১, অ্যাক্রেলিক, আ: সময়, ১৯৯৭ .... ৩৮২
৭৫ : প্রকৃতি-২, অ্যাক্রেলিক, ১৬৭.৬৪ × ৭৬.২ সেমি, আঃ সময়, ১৯৯৬–৯৮ .... ৩৮২
৭৬ : প্রকৃতি-৩, অ্যাক্রেলিক, ৭৪ × ৫৪ সেমি, আঃ সময়, ১৯৯৬–৯৮ .... ৩৮২
৭৭ : মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-১, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৯২ সেমি, ২০০৮ .... ৩৮৩
৭৮ : মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-২, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৯২ সেমি, ২০০৮ .... ৩৮৩
৭৯ : মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-৩, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৯২ সেমি, ২০০৮ .... ৩৮৩
৮০ : চেয়ার কাহিনি, Metal Enamel on Iron plate, ২০০৬ .... ৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

৮১ : চেয়ার কাহিনি, Metal Enamel on Iron plate ৩৮৩
৮২ : ড্রয়িং–চেয়ার কাহিনি, কালি ও কলম, ২০০৬ .... ৩৮৩
৮৩ : মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-৪, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ২.৫ × ২.৫ সেমি, ২০০৯ .... ৩৮৩
৮৪ : মিথিক উপাদানের পুনঃসৃজন-৫, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ১২১.৯২ × ১০৬.৬৮ সেমি, ২০১৩ .... ৩৮৪
৮৫ : স্নেহ, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ১২১.৯২ × ১০৬.৬৮ সেমি, ২০১৩ .... ৩৮৪
৮৬ : প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-১৮, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ২০১৩ .... ৩৮৪
৮৭ : প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-১, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৩৮৪
৮৮ : প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-২, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৩৮৪

শিল্পী মোঃ আব্দুল আযীয

৮৯ : গাছের গুঁড়ি, জলরং ও পেনসিল, ১৯৯৩ .... ৩৮৬
৯০ : তাঁতিবাড়ি, জলরং, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ১৯৯৩ .... ৩৮৬
৯১ : ঢেঁকিঘর, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০২ .... ৩৮৬
৯২ : ধ্যানে, তেলরং, ৯১ × ৭৬ সেমি, ২০০০ .... ৩৮৭
৯৩ : বসন্ত-২, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি ৩৮৭
৯৪ : প্রকৃতি ও নারী, জলরং, ৩৮ × ৫৬ সেমি ৩৮৭
৯৫ : প্রকৃতি, জলরং ও পেনসিল, ৫৪ × ৩৪ সেমি, ১৯৯৬ .... ৩৮৮
৯৬ : ক্যাকটাস, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯২ .... ৩৮৮
৯৭ : ঐতিহ্য-১, লরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০২ .... ৩৮৮
৯৮ : পাখি ও রমণী-১, জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩ .... ৩৮৯
৯৯ : রমণী ও পাখি-২, জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৭ .... ৩৮৯
১০০ : পাখি ও রমণী, জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩ .... ৩৮৯
১০১ : পাখি ও রমণী, জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০১১ .... ৩৮৯
১০২ : পাখি ও রমণী-২, জলরং ৩৮৯
১০৩ : পাখি ও রমণী-১, জলরং, ২০১১ .... ৩৮৯
১০৪ : পাখি ও রমণী, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি, ২০০৮ .... ৩৯০
১০৫ : নারী ও প্রকৃতি, জলরং, ৩৮ × ২৮ সেমি ৩৯০
১০৬ : নারী ও প্রকৃতি, জলরং, ৩৮ × ২০ সেমি, ২০০৮ .... ৩৯০
১০৭ : টাইলস পেইন্টিং, চেতনায় একুশ, ২০০৬, ডাকসু সংগ্রহশালা ৩৯১

শিল্পী মাসুদা খাতুন জুঁই

১০৮ : অনুশীলন-১, জলরং, ৫৫ × ৫৫ সেমি, ১৯৯৪, (১৯৯৫ সালের বার্ষিক প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত) ৩৯৩
১০৯ : অনুশীলন-২, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ১৯৯৪ .... ৩৯৩
১১০ : ফাতেমা-১, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৬, (১৯৯৭ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত) ৩৯৩
১১১ : ফাতেমা-২, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮ .... ৩৯৩
১১২ : ফাতেমা-৩, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮ .... ৩৯৩
১১৩ : ফাতেমা-৫, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮ .... ৩৯৪
১১৪ : ফাতেমা-৩, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮ .... ৩৯৪
১১৫ : ফাতেমা-৬, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ১৯৯৮ .... ৩৯৪
১১৬ : পাখিসহ রমণী, জলরং, ৮৫ × ৭০ সেমি, ১৯৯৯ .... ৩৯৪
১১৭ : জাতির জন্ম, অ্যাক্রেলিক ও ক্যানভাস, ৮৫ × ৭০ সেমি, ২০০৯ .... ৩৯৫
১১৮ : জন্ম রহস্য, জলরং, ৮৫ × ৭০ সেমি, ২০১০ .... ৩৯৫
১১৯ : বুদ্ধ, জলরং, ৮৫ × ৭০ সেমি, ২০১০ .... ৩৯৫

শিল্পী শঙ্কর মজুমদার

১২০ : স্বাধীনতার সময়, বাবুই পাখির বাসা, ১৯৯৯ .... ৩৯৮
১২১ : ক্ষুধা, অক্সাইড রং, ৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি ৩৯৯
১২২ : বার্ধক্য, অক্সাইড রং, ৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি ৩৯৯
১২৩ : আমার ছেলেবেলা, অক্সাইড রং, ৫৮.৮ × ৫০ সেমি ৩৯৯
১২৪ : মাতৃত্ব-১, অক্সাইড রং, ৫৮.৮ × ৫০ সেমি ৪০০
১২৫ : মাতৃত্ব-২, অক্সাইড রং, ৫৮.৮ × ৫০ সেমি ৪০০
১২৬ : পাট তোলা, অক্সাইড রং, ৫৮.৮ × ৫৩.৯ সেমি, ৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি ৪০১
১২৭ : রাখাল, অক্সাইড রং, ৩৪.৩ × ২৯.৪ সেমি ৪০১

Dhaka University Institutional Repository

১২৮ : কৃষক, অক্সাইড রং ৪০১

শিল্পী আব্দুল বাতেন

১২৯ : যুগল-১, জলরং, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ২০০৩ .... ৪০২
১৩০ : অবসরে, কার্টিজ পেপারে জলরঙের ওয়াশ, ৭৪ × ৫৪ সেমি,২০০৪ .... ৪০২
১৩১ : মেঠোপথে-৬, ফ্রেসকো (ভেজা পদ্ধতি), ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪০২
১৩২ : রূপা-১, কার্টিজ পেপারে জলরঙে ওয়াশ, ৭৬ × ৪৫ সেমি, ২০০২ .... ৪০৩
১৩৩ : রূপা-২, কার্টিজ পেপারে জলরঙে ওয়াশ, ৭৬ × ৪৫ সেমি, ২০০২ .... ৪০৩
১৩৪ : রূপা-৩, কার্টিজ পেপারে জলরঙে ওয়াশ, ৭৬ × ৪৫ সেমি, ২০০৩ .... ৪০৩
১৩৫ : প্রতিচ্ছায়া-১, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৫ .... ৪০৪
১৩৬ : প্রতিচ্ছায়া-২, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৫ .... ৪০৪
১৩৭ : রূপা-৩, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৫ .... ৪০৪

শিল্পী ফাহমিদা খাতুন

১৩৮ : পেঁপে গাছ, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, টেম্পারা ৪০৬
১৩৯ : বুদ্ধ, সিল্কের ওপর লাইন ড্রয়িং, ৫৪ × ৩৪ সেমি, ২০০০ .... ৪০৭
১৪০ : হাঁস, টেম্পারা, ৫৫ × ৭৭ সেমি, ২০০৮ .... ৪০৭
১৪১ : ইমেজ-২ (পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি), জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০২ .... ৪০৭
১৪২ : Life Reflection-23, ৫১ × ৭৭.৫ সেমি, ২০০৭ .... ৪০৮
১৪৩ : Dot from Life-5, জলরং, ৮.৪ × ৫ সেমি, ২০০৬ .... ৪০৮
১৪৪ : Reflection, জলরং, ৭৬.২ × ৫০.৮ সেমি, ২০০২ .... ৪০৮
১৪৫ : Blue Image-2, জলরং, ৭১.১২ × ৫৮.৪২ সেমি, ২০০১ .... ৪০৯
১৪৬ : A way of thinking, জলরং, ৭৬.২ × ৫০.৮ সেমি, ২০০১ .... ৪০৯
১৪৭ : Keep on eye on, জলরং, ৭৬.২ × ৫০.৮ সেমি, ২০০২ .... ৪০৯
১৪৮ : Dot from life-4, কালার পেপারে জলরং, ৮৪ × ৬১ সেমি, ২০০৬ .... ৪১০
১৪৯ : Life Reflection, রঙিন পেপারে জলরং, ৭৭.৫ × ৫১ সেমি, ২০০৭ .... ৪১০
১৫০ : Harmony-6, রঙিন পেপারে জলরং, ১৫ × ১০ সেমি, ২০০৭ .... ৪১০

শিল্পী মলয় বালা

১৫১ : আলিঙ্গন-১, জলরং, ৩৬ × ৭৪ সেমি, ২০০১ .... ৪১২
১৫২ : পরকীয়া-২, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০২ .... ৪১২
১৫৩ : শকুন্তলা ও প্রিয়ংবদা, জলরং, ৭০ × ৪৫ সেমি, ২০০২ .... ৪১২
১৫৪ : উচ্চাঙ্গ নৃত্য-১, অ্যাক্রেলিক, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ২০০৬ .... ৪১৩
১৫৫ : মিউজিক-২১, অ্যাক্রেলিক, ৫৪ × ৭৪ সেমি, ২০০৬ .... ৪১৩
১৫৬ : উচ্চাঙ্গ নৃত্য-৫, অ্যাক্রেলিক, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৬ .... ৪১৩
১৫৭ : শকুন্তলা ও সখীরা-০১, জলরং, ৭৪ × ১৭৬ সেমি, ২০০৩ .... ৪১৪
১৫৮ : শকুন্তলা ও সখীরা-০৭, অ্যাক্রেলিক (কাগজে ওয়াশ), ৫৪ × ১৫০ সেমি, ২০০৪ .... ৪১৪
১৫৯ : সংগীত, ফ্রেসকো, ৭৬ × ৬০ সেমি, ২০০৬ .... ৪১৪

শিল্পী ওমর শাহজাহান

১৬০ : প্রকৃতি, জলরঙে ওয়াশ, ৪০ × ৫৫ সেমি, ২০০৬ .... ৪১৮
১৬১ : পলাশ চত্বর, জলরঙে ওয়াশ, ৪০ × ৪৫ সেমি, ২০০৬ .... ৪১৮
১৬২ : নিরীক্ষাধর্মী প্রকৃতি, টেম্পারা, ৪০ × ৪৫ সেমি, ২০০৭ .... ৪১৮
১৬৩ : টেরর-১, গোয়াশ, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২০
১৬৪ : টেরর-২, গোয়াশ, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২০
১৬৫ : টেরর-২, গোয়াশ, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২০
১৬৬ : স্বপ্ন এবং উপভোগ, জলরং, ২০০৪ .... ৪২১
১৬৭ : সমসাময়িক রাজনীতি, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি ৪২১
১৬৮ : সমসাময়িক বাংলাদেশের পরিস্থিতি-১, মিশ্র মাধ্যম, ৯১ × ৮১ সেমি, ২০০৬ .... ৪২১
১৬৯ : পথশিশু, জলরং, ৩৮ × ৫৪ সেমি, ২০০২ .... ৪২১
১৭০ : রাতের বেদেনি, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২১
১৭১ : পঙ্খীরাজ, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২২

Dhaka University Institutional Repository

১৭২ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা-১, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২২
১৭৩ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা-২, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২২

শিল্পী কান্তিদেব অধিকারী
১৭৪ : হাটুরে, পেনসিল ড্রয়িং, ২০ × ১৪ সেমি, ১৯৯৪ .... ৪২৩
১৭৫ : ভিক্ষুক, পাটকাঠির কলম ও কালি, ৪৭ × ৩০ সেমি, ১৯৯৩ .... ৪২৩
১৭৬ : জলরং, ৫৮ × ৪৫ সেমি, ১৯৯৭ .... ৪২৩
১৭৭ : স্টাডি, জলরং ও পেনসিল, ৫৫ × ১১৪ সেমি, ২০০৪ .... ৪২৪
১৭৮ : অনিশ্চিত জীবন-১, কাগজে জলরং, ৭৬ × ৫৫ সেমি, ২০০০ .... ৪২৪
১৭৯ : অনিশ্চিত জীবন-৩, কাগজে জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি, ২০০৩ .... ৪২৪
১৮০ : অনিশ্চিত জীবন-৪, জলরং, ৫৬ × ৩৩ সেমি, ২০০৫ .... ৪২৫
১৮১ : অনিশ্চিত জীবন-২, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ১৯৯৯ .... ৪২৫
১৮২ : অনিশ্চিত জীবন-৫, জলরং , ৫৬ × ৩৩ সেমি, ২০০৫ .... ৪২৫
১৮৩ : অপেক্ষারত রমণী-৪, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি ৪২৫
১৮৪ : অপেক্ষারত রমণী-৫, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি ৪২৫
১৮৫ : অপেক্ষারত রমণী-৬, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি ৪২৫
১৮৬ : স্নানের পরে, জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৪ .... ৪২৬
১৮৭ : ফুল-১১, জলরং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৮ .... ৪২৬
১৮৮ : ভালোবাসা, বোর্ড পেপারে অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৬৬ সেমি, ২০০৮ .... ৪২৬
১৮৯ : ভালোবাসা-২, জলরং, ৭৬ × ৪৬ সেমি, ২০০৯ .... ৪২৭
১৯০ : ভালোবাসা-৪, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১০ .... ৪২৭
১৯১ : প্রসাধন, অ্যাক্রেলিক, ৫৬ × ৪১ সেমি, ২০০৮ .... ৪২৭
১৯২ : জীবন অতো সোজা নয়-২, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৯১ × ৭৬ সেমি, ২০০৬ .... ৪২৮
১৯৩ : জীবন অতো সোজা নয়-৪, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৩৮ × ৭৬ সেমি, ২০০৬ .... ৪২৮
১৯৪ : জীবন অতো সোজা নয়-৬, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক, ৭৬ × ৫১ সেমি, ২০১১ .... ৪২৮

শিল্পী মোছাঃ নাজনীন আক্তার
১৯৫ : তিন কন্যা, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০৩ .... ৪২৯
১৯৬ : অপেক্ষা, মুরাল (স্লাবে), ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০২ .... ৪২৯
১৯৭ : সমসাময়িক বাস্তবতা-১, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি ৪৩০
১৯৮ : সমসাময়িক বাস্তবতা-২, জলরং ৭৬ × ৫৬ সেমি ৪৩০
১৯৯ : ছন্দময়তা, অ্যাক্রেলিক, ২০০৪ .... ৪৩১
২০০ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০০৪ .... ৪৩১
২০১ : ভেতরের রূপ-১, অ্যাক্রেলিক, ৩০ × ২০ সেমি, ২০১১ .... ৪৩২
২০২ : ভেতরের রূপ-২, অ্যাক্রেলিক, ৩০ × ২০ সেমি, ২০১১ .... ৪৩২

শিল্পী সোহাগ পারভেজ
২০৩ : ল্যান্ডস্কেপ, জলরং ৪৩৪
২০৪ : সুন্দরবন লেকের নৌকা, জলরং, ৩৬ × ২৬ সেমি, ২০০৯ .... ৪৩৪
২০৫ : রাঙামটি-১৬, জল ও পেন, ৪০ × ২৬ সেমি, ২০১০ .... ৪৩৪
২০৬ : বার্মা মা ও শিশু, জলরং ও মার্কার পেন, ৩৭ × ২৬ সেমি, ২০০৮ .... ৪৩৪
২০৭ : দরিদ্র মানুষ ও শিশু, পেন, ৩৬ × ২৬ সেমি, ২০০৮ .... ৪৩৪
২০৮ : দরিদ্র মানুষ ও শিশু, মার্কার পেন, ৩৬ × ২৬ সেমি, ২০০৮ .... ৪৩৪
২০৯ : বাঁশঝাড়, জলরং, ৩০ × ২৩ সেমি, ২০১১ .... ৪৩৫
২১০ : পাতাল নৌকার ঘাট, জলরং, ৫৬ × ৪০ সেমি, ২০১২ .... ৪৩৫
২১১ : সাঙ্গু নদী, জলরং, ৩০ × ২৬ সেমি, ২০১২ .... ৪৩৫
২১২ : প্রচ্ছদ ৪৩৫
২১৩ : গ্রন্থ অলংকরণ ৪৩৫
২১৪ : গ্রন্থ অলংকরণ ৪৩৫

শিল্পী গোপাল চন্দ্র সাহা
২১৫ : মননগাথা-১, জলরং, ৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০০৯, (২০০৯ সালে বার্ষিক প্রদর্শনীতে নিরীক্ষামূলক পুরস্কারপ্রাপ্ত).. ৪৩৭
২১৬ : মননগাথা-২, জলরং, ১১২ × ৭৬ সেমি, ২০১১, (২০১১ সালে বার্ষিক প্রদর্শনীতে নিরীক্ষামূলক পুরস্কারপ্রাপ্ত).. ৪৩৭
২১৭ : মডেল-০৪, জলরং, ৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৩৯

Dhaka University Institutional Repository

২১৮ : মডেল-০৩, জলরং, ৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০১০ .... ৪৩৯
২১৯ : পাখার সৌন্দর্য, জলরং, ৫৬ × ৭২ সেমি, ২০১১ .... ৪৩৯
২২০ : আত্মার অনুসন্ধান, জলরং, ৫৬ × ৭৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৩৯

শিল্পী নাজমুল হক বাপ্পী
২২১ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, জলরং, ২০০৮ .... ৪৪০
২২২ : ওল্ডম্যান, ক্যাকটাস, জলরং, ২০০৮ .... ৪৪০
২২৩ : কম্পোজিশন, জলরং, ২০০৮ .... ৪৪০
২২৪ : Nature-14, জলরং, ২০১১ .... ৪৪২
২২৫ : Cactus Flower-12, জলরং, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১২ .... ৪৪২
২২৬ : Child in small pond, জলরং, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১১ .... ৪৪২
২২৭ : China Bangladesh Friendship, পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি ৪৪৩
২২৮ : জিয়াউর রহমান স্বর্ণপদক, পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি, অ্যাক্রেলিক, ২০১০ .... ৪৪৩
২২৯ : Obstacle-6, ২০০৮, জলরং, ৫০ × ৬০ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৩
২৩০ : Cactus-50, জলরং, ২০১১ .... ৪৪৩
২৩১ : Close-Up, সিল্কের ওপর অ্যাক্রেলিক, ৭৭ × ৬০ সেমি, ২০১২ .... ৪৪৩
২৩২ : Love-4, ক্যানভাসের ওপর, অ্যাক্রেলিক, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৩
২৩৩ : Cactus Flower-3, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি ২০১১ .... ৪৪৪
২৩৪ : Fallen Leaves, জলরং, ৫৫ × ৩৮ সেমি, ২০০৮ .... ৪৪৪
২৩৫ : Nature-39, জলরং, ৯০ × ৬৮ সেমি, ২০১২ .... ৪৪৪

শিল্পী সিনথিয়া আরোফিন
২৩৬ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৩, মিশ্র মাধ্যমে ড্রয়িং, ৬০ × ৬০ সেমি, ২০০৯ .... ৪৪৬
২৩৭ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৫, মিশ্র মাধ্যমে ড্রয়িং, ৫৬ × ৮৬ সেমি, ২০০৯ .... ৪৪৬
২৩৮ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৬, মিশ্র মাধ্যমে ড্রয়িং, ৮৬ × ৫৫ সেমি, ২০০৯ .... ৪৪৬
২৩৯ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-১৭, ক্যানভাসে ড্রয়িং, ৮১ × ৬০ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৬
২৪০ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-১৮, ক্যানভাসে ড্রয়িং, ৮১ × ৬০ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৬
২৪১ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-২, মিশ্র মাধ্যম, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০০৯ .... ৪৪৬
২৪২ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-২৮, অ্যাক্রেলিক, ৮১ × ৫৫ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৭
২৪৩ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-২৯, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৭
২৪৪ : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-৪০, অ্যাক্রেলিক, ৭৪ × ৫৪ সেমি, ২০১৩ .... ৪৪৭

শিল্পী সুমন কুমার বৈদ্য
২৪৫ : ঘরে ফেরা-২, জলরং, ৩৮ × ৫৫ সেমি, ২০১০ .... ৪৪৯
২৪৬ : ঘরে ফেরা-৪, জলরং, ৪০ × ৫৫ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৯
২৪৭ : ঘরে ফেরা-৫, জলরং, ৪০ × ৫৫ সেমি, ২০১১ .... ৪৪৯
২৪৮ : ইভ টিজিং, জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫০
২৪৯ : প্রকৃতির প্রতিশোধ, জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫০
২৫০ : উত্তরণ, জলরং, ৭৫ × ৫৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫০
২৫১ : পাখি কখন জানি উড়ে যায়, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫০
২৫২ : ছলনার শিকার-১, জলরং, ৬০ × ৬০ সেমি, ২০১১ .... ৪৫০
২৫৩ : আমি শান্তি চাই, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫০

শিল্পী মমতাজ পারভীন মধবী
২৫৪ : নিঃসহায়-২, তেলরং ও পোড়া মবিল (মিশ্র মাধ্যম), ৩৮ × ২৬ সেমি, ২০০৮ .... ৪৫৩
২৫৫ : প্রিয় সখী-১, জলরং, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১০ .... ৪৫৩
২৫৬ : প্রিয় সখী-২, অ্যাক্রেলিক, ৫৬ × ৪১ সেমি, ২০০৭ .... ৪৫৩
২৫৭ : পুষ্পিত জীবন-৩, অ্যাক্রেলিক, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫৪
২৫৮ : পুষ্পিত জীবন-৩, অ্যাক্রেলিক, ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫৪
২৫৯ : আমার আমি-১, অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৯২ সেমি, ২০১০ .... ৪৫৫
২৬০ : আমার আমি-২, অ্যাক্রেলিক, ৪১ × ৬১ সেমি, ২০১০ .... ৪৫৫
২৬১ : রুদ্ধ এবং মুক্ত-১, অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৭৬ সেমি, ২০১১ .... ৪৫৫
২৬২ : রুদ্ধ এবং মুক্ত-২, অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৯২ সেমি, ২০১১ .... ৪৫৫

Dhaka University Institutional Repository

২৬৩ : নারীর স্বাধীনতা, অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৯২ সেমি, ২০১১ .... ৪৫৬
২৬৪ : ভ্রমণ-২, অ্যাক্রেলিক, ৯২ × ৯২ সেমি, ২০১১ .... ৪৫৬

২৬৫ : শিল্পী আবুল কাশেম অংকিত 'কলমিশাক' ৪৫৮
২৬৬ : শিল্পী জয়নুল আবেদিন, পটুয়া, গোয়াশ ও পোস্টার, ১৯.৭ × ১২.৭ সেমি ৪৫৯
২৬৭ : শিল্পী জয়নুল আবেদিন, প্রসাধন, ৫০.৮ × ৩৫.৬ সেমি ৪৫৯
২৬৮ : শিল্পী জয়নুল আবেদিন, গ্রাম্য মহিলা, জলরং ৪৫৯
২৬৯ : শিল্পী কামরুল হাসান, উঁকি, গোয়াশ, ৭৫ × ৩৭ সেমি, ১৯৬৭ .... ৪৫৯
২৭০ : শিল্পী কামরুল হাসান ৪৫৯
২৭১ : শিল্পী কামরুল হাসান, হাতে লেখা পত্রিকা আবীর-এ, সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতিকৃতি, জলরং ৩২ × ২২ সেমি, ১৯৪৩ .... ৪৫৯
২৭২ : শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, কাঠমিস্ত্রি, তেলরং, ১৯৫৬ .... ৪৬০
২৭৩ : শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ ৪৬০
২৭৪ : শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, মাছ ধরা ৪৬০
২৭৫ : শিল্পী এস.এম সুলতান, নসর্গ-১, তেলরং, ৭৫ × ৫৫ সেমি, ১৯৫১ .... ৪৬০
২৭৬ : শিল্পী এস.এম সুলতান সাধক, জলরং, ৭১ × ৫১ সেমি, ১৯৫১ .... ৪৬০
২৭৭ : শিল্পী মুর্তজা বশীর, মাছ ধরা, টেম্পারা ৪৬১
২৭৮ : শিল্পী মুর্তজা বশীর, গনক, টেম্পারা ৪৬১
২৭৯ : গনক, টেম্পারা, পাখা হাতে রমণী, টেম্পারা ৪৬১
২৮০ : শিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত, মা ও মেয়ে-৬, তেলরং ৮০ × ৩০ সেমি, ১৯৯৪ .... ৪৬১
২৮১ : শিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত, মা ও মেয়ে-২ তেলরং, ৮০ × ৬৭ সেমি, ১৯৮২ .... ৪৬১
২৮২ : শিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত, পাখা হাতে রমণী-১, তেলরং, ৬০ × ৪৫ সেমি, ১৯৯১ .... ৪৬১
২৮৩ : শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ ৪৬১
২৮৪ : শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ , ময়ূর ও সাপ, পোস্টার কালার, ৪৮ × ৪৮ সেমি, ১৯৯৩ .... ৪৬১
২৮৫ : শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, তেলরং, ৪৮ × ৪৮ সেমি, ১৯৯৯ .... ৪৬২
২৮৬ : শিল্পী নাইমা হক, With drow-1, অ্যাক্রেলিক ও পোস্টার কালার ৪৬২
২৮৭ : শিল্পী নাইমা হক, Self Captivity, অ্যাক্রেলিক, ৭৩ × ৫৩ সেমি, ২০১২ .... ৪৬২
২৮৮ : শিল্পী নাইমা হক, ৭৪ × ৫৪ সেমি ৪৬২
২৮৯ : শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর, Lonis Kahn's Dream (Girl), অ্যাক্রেলিক, ১৩৭ × ১০৭ সেমি, ২০০২ .... ৪৬২
২৯০ : শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর ৪৬২
২৯১ : শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর, রিকশাওয়ালা ও পাখি, তেলরং, ১৯৯২ .... ৪৬২
২৯২ : শিল্পী নূরুল ইসলাম, সুখী দম্পতি-২, জলরং ৫৬ × ৩৮ সেমি ৪৬২
২৯৩ : শিল্পী নূরুল ইসলাম ৪৬২
২৯৪ : শিল্পী নূরুল ইসলাম, নারী ও চাবি, জলরং ৪৬২
২৯৫ : শিল্পী মুকুল কুমার বাড়ৈ, মুখ ৪৬৩
২৯৬ : শিল্পী মুকুল কুমার বাড়ৈ, মুখ ৪৬৩
২৯৭ : শিল্পী মুকুল কুমার বাড়ৈ, মুখ ৪৬৩
২৯৮ : শিল্পী নিখিল চন্দ্র দাস ৪৬৩
২৯৯ : শিল্পী ফরিদা জামান ৪৬৩
৩০০ : শিল্পী মুসরাত নিয়াজী ৪৬৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ : প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা

চিত্র বিবরণ পৃষ্ঠা

০১ : মুরাল চিত্র, প্রাচ্যকলা বিভাগের দেয়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কিত ৪৭৪
০২ : এগ টেম্পারা, প্রাচ্যকলা বিভাগের দেয়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কিত ৪৭৫
০৩ : শিল্পী আব্দুস সাত্তার, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৪৮০
০৪ : শিল্পী নাজনীন সিরাজী ম্যাডোনা, A girl with bird, ৫৫.৮৮ × ৪৩.১৮ সেমি ৪৮০
০৫ : শিল্পী লক্ষ্মণ কুমার সূত্রধর, Tradition ৪৮০
০৬ : শিল্পী ফাহমিদা খাতুন, টেম্পারা, Flow Up, ৮১.২৮ × ৬৩.৫ সেমি ৪৮০
০৭ : শিল্পী জিয়াদুল হক, ওয়াশ, Untitled, ৫২ × ৪১ সেমি ৪৮০
০৮ : শিল্পী নাসরীন বেগম, জলরং, The red door 'A', ৩৭ × ২৮ সেমি, ২০০৩ .... ৪৮১
০৯ : শিল্পী আব্দুল আযীয, Lady with a bird 'B', ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩ .... ৪৮১

Dhaka University Institutional Repository

১০ : শিল্পী রাবেয়া বেগম লিপি, Imagination-2, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২০০৩ .... ৪৮১
১১ : শিল্পী নাসরীন রহমান, ওয়াশ পেইন্টিং, Nature-5, ৩০ × ৪৩ সেমি ৪৮১
১২ : শিল্পী কান্তিদেব অধিকারী, After Bath, ৫৫.৮৮ × ৩৫.৫৬ সেমি ৪৮১
১৩ : শিল্পী মোস্তাকিন তারিন, Ablution, ওয়াশ পেইন্টিং, ৭৫ × ৫৫ সেমি ৪৮২
১৪ : শিল্পী এ.কে.এম জিয়াদ-উল-ইসলাম, Self Analysis, ক্যানভাসে তেলরং, ৯১ × ৫১ সেমি ৪৮২
১৫ : শিল্পী ফাইজা হক, Memento of the Trip, ওয়াশ পেইন্টিং, ৫৬ × ৩৮ সেমি, ২ .... ৪৮২
১৬ : শিল্পী রাকিবুল হাসান, Waiting-0, জলরং (ওয়াশ পেইন্টিং), ১১৪ × ৫৬ সেমি, ২০১০ .... ৪৮২
১৭ : শিল্পী বিকাশ আনন্দ সেতু, Illusion of Nature-01, জলরং (ওয়াশ পেইন্টিং), ৭৬ × ৫৬ সেমি, ২০১০ .... ৪৮২
১৮ : জি.সি ত্রিবেদী, মিশ্র মাধ্যম, ৭৩.৬৬ × ৩০.৪৮ সেমি, ২০১১ .... ৪৮৩
১৯ : শিল্পী অমিত নন্দী, ক্যালিগ্রাফি, জলরং, ৫৫.৮৮ × ৩৫.৫৬ সেমি ৪৮৩
২০ : শিল্পী তাহমিনা বিনতে কবির, জলরং, ৫৫.৮৮ × ৩৫.৫৬ সেমি ৪৮৩
২১ : শিল্পী মোঃ হাসান মোর্শেদ, ক্যালিগ্রাফি, জলরং, ৭৬.২ × ৬০.৯৬ সেমি ৪৮৩
২২ : রুবিনা ইয়াসমিন, জলরং, ৫৫.৮৮ × ৭১.১২ সেমি ৪৮৩
২৩ : শিল্পী আব্দুস সাত্তার, ফুল, কাঠখোদাই, (শিকড় সন্ধান প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত, ২০১০) ৪৮৪
২৪ : শিল্পী গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী, Illussion of Line-153, মিশ্র মাধ্যম, ২০১২, (শিকড় সন্ধান-২ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত, ২০১২) ৪৮৫
২৫ : শিল্পী ওমর শাহজাহান, (রাজশাহী চারুকলার ছাত্র), জলরং ৪৮৬
২৬ : শিল্পী সানজিদা সহীদ, (রাজশাহী চারুকলার ছাত্র), Life, জলরং, ৭৬.২ × ৫৫.৮৮ সেমি ৪৮৬
২৭ : খুলনা আর্ট কলেজে ছাত্রদের অঙ্কিত মুরাল ৪৯২
২৮ : খুলনা আর্ট কলেজে ছাত্রদের অঙ্কিত মুরাল ৪৯২
২৯ : খুলনা আর্ট কলেজে ছাত্রদের অঙ্কিত মুরাল ৪৯২
৩০ : ফ্রেসকো, প্রাচ্যকলা বিভাগের দেয়ালে অঙ্কিত ৪৯৩
৩১ : শিল্পী অমিত কুমার নন্দী, জলরং, ৭৪ × ৫৪ সেমি ৪৯৩
৩২ : শিল্পী নাহিদ রোকসানা অনন্যা, জলরং, ৫৬ × ৪০.৫ সেমি ৪৯৩
৩৩ : শিল্পী নাজমুন নাহার রুন্টি, জলরং ৪৯৩
৩৪ : শিল্পী আশরাফা সিদ্দিক, Legendary beauty ৪৯৪
৩৫ : শিল্পী এলিজা সুলতানা এ্যানি ৪৯৪
৩৬ : শিল্পী কানিজ ফাতেমা জ্যোতি ৪৯৪
৩৭ : শিল্পী মথুরাম চৌধুরী, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৪৯৪
৩৮ : শিল্পী আব্দুল আযীয, ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক ৪৯৪